# নব্যভারত

## মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত।

চতুর্বিংশ খণ্ড—১৩১৩।

কলিকাতা,

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৩ তিন টাকা।

# চতুর্বিংশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী। (১৩১৩)

বিষয়। পৃষ্ঠা।


১। অপূর্ব্ব কৃষি-কাহিনী। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল) ... ৩৭০
২। অথর্ব্ববেদে ব্রাহ্মণী ও গোধন। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ৩১৩
৩। আত্মরক্ষা। (শ্রীগোপালনারায়ণ মজুমদার) ... ... ৩৭
৪। আমাদের গলদ কোথায়? (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল, Bar-at-law) ১৪৬
৫। আছি সুখে। (পদ্য) (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ৪৪৭
৬। আহ্নিক। (শ্রীজ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ, এম-এ) ... ... ৫০৬
৭। আকাঙ্ক্ষিতা। (পদ্য) (শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, বি-এল) ... ৬৪১
৮। ইংরাজ ও আমরা। (শ্রীসতীশচন্দ্র রায়) ... ... ১৯০
৯। ইয়োরোপ ও আসিয়া। (পদ্য) (শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, বি-এল) ... ২০০
১০। উপনিষদের উপদেশ। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ৬৫, ২১০, ২৮০, ৩[illegible]
১১। উপনিষদ গ্রন্থাবলী। (শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল) ৪২, ২০১, ২৬১, ৫০৩
১২। উদ্বোধন। (পদ্য) (শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত) ... ... ৫৭৩
১৩। একটী জাতক কথা। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ৬২৬
১৪। কবিওয়ালা। (শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল) ... ... ২০৩, ৫৭৫
১৫। কবিবর ৺ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। (শ্রীমহিমচন্দ্র মাহিন্তা) ... ৪৬
১৬। কাব্য ও সমালোচন। (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী) ... ৪৫
১৭। ৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী) ... ৬২
১৮। ক্রমবিকাশ। (শ্রীআশুতোষ দেব, এম-এ) ... ৩৫৯, ৩৯৮, ৪৯:
১৯। খিচুড়ী। (সমালোচনা) (শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, এম-এ) ... ১৩৩
২০। খেয়া। (পদ্য) (শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ) ... ... ২৯০
২১। চীনদেশে সন্তান চুরি। (শ্রীরামলালসরকার) ... ... ৭৫
২২। জাপানের অভ্যুদয়। (শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়) ১১, ১০০, ১৬৯, ২২৯, ৩৪৪
২৩। জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law) ... ২২০
২৪। ত্রিপুরা-বিজয়ী শমশের গাজী। (শ্রীসৈয়দনুরুল হোসেন) ... ৬০৫
২৫। ত্বক। শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল) ... ... ৬২০
২৬। দুষ্টের দমন না দুর্ব্বল পীড়ন। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law) ... ৬৩৭
২৭। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সেবা। (সম্পাদক) ... ... ৪২১
২৮। নারীর প্রার্থনা। (পদ্য) (শ্রীপ্রিয়বালা রায়) ... ... ৫৪
২৯। পঙ্কোদ্ধার। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law) ... ৫৮৭
৩০। পরলোকগত মহাত্মা চন্দ্রকান্ত সেন। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস) ৫৩৪
৩১। পরেশনাথ দর্শন ও জৈনধর্ম্ম। (শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়) ... ৪৪৯
৩২। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি) ১৫৪, ১৮০
৩৩। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ২২৩, ৩২৯, ৩৯১, ৪৪৭, ৬১২ ও ৬৫৭
৩৪। বন্দেমাতরম মন্ত্র, ডেমক্রেসি ও দারিদ্র্য-সমস্যা। (সম্পাদক) ... ৪২৩
৩৫। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের প্রাচীন কাহিনী। (শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য) ... ২৮৫
৩৬। বঙ্গের কৃষক। (পদ্য) (শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ) ... ৩০৪
৩৭। বার্ষিকী। (সম্পাদক) ... ... ... ১
৩৮। বালযোগী ধ্রুব। (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী) ... ৩৩৭, ৪৯১ ও ৫৭৯
৯। বিলাতী বর্জ্জনে স্বদেশী দীক্ষা। (শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, বি-এ) ... ২৯০
০। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস। (শ্রীকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ) ... ৯২

৪১। বিধবা রমণী। (পদ্য) (শ্রীব্রজনাথ মুন্সী) ... ... ৬১০
৪২। বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ। (সম্পাদক) ... ... ১৩৯
৪৩। বৌদ্ধযুগের শিল্প-বাণিজ্য। (শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল) ... ২৬৭
৪৪। ভণ্ডামী। (শ্রীরামকৃষ্ণ দাস কবিরাজ, এম-এ) ... ... ২১৪
৪৫। ভারতের সৈন্য ব্যয়। (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ) ... ২৮
৪৬। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য। (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ) ... ৫৭
৪৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি। (শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী) ১৯৫
৪৮। ভারতে মুসলমানের প্রথম উপনিবেশ। শ্রীসৈয়দ নুরুল হোসেন) ... ২৭৪
৪৯। ভারতে মুসলমান। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল) ... ৪৩৭
৫০। ভারতে ব্রিটিশ শান্তি। (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ) ... ৫৬১
। ভূপ্রদক্ষিণের পত্র। (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র. এম-বি, এম, আর, সি, পি) ৫৯৪
৫২। মহারাষ্ট্রের উদ্বোধন। (পদ্য) (শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, বি-এল) ... ৩৫
৫৩। মরীচিকা। (শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার) ... ... ৪৮
৫৪। মহানুভব শ্রীলোচনদাস ঠাকুর। (শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী) ... ১২৮
৫৫। মহাকবি ৺রাজকৃষ্ণ মজুমদার। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত,এল-এম-এস) ৬১৭
৫৬। মায়ের মিনতি। (পদ্য) (শ্রীমা) ... .. ২৭৯
৭। মিলনের প্রকৃত পথ। (শ্রীআমানত উল্লা আহাম্মদ) ... ২৫৫
৮। মুট ফকির। (শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষ) ... ... ৩৬৮
৯। যোগী সাঁজাল। (শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত) ... ... ৪০৯
৬০। রাজভক্তি। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law) ... ২২৫
৬১। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত, এল, এম, এস) ২৬৩
৬২। রাষ্ট্রতন্ত্রে নগর ও পল্লী বিপর্যায়। (শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি-এল) ... ৩০৫
৬৩। রাষ্ট্রতন্ত্রে দেশ-নেতৃত্বের প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠা। শ্রীযামিনীকান্ত সেন,বি-এল) ৫৩৭
৬৪। রেনেলের সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ। (শ্রীআনন্দনাথ রায়) ... ৩৭৪
৬৫। লোকশিক্ষার সনাতন আদর্শ। (শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি-এল) ... ৬৪৩
৬৬। শিক্ষার ইতিহাস ও জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়,এম-এ,বি-এল) ২৪২
৬৭। শিশু। (পদ্য) (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ... ৬৩৭
৬৮। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির। (শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ) ... ৪১৭ ও ৪৭৬
৬৯। সংশয়বাদ। (শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী, বি-এ) ... ৬৭, ১৮৪, ৪৫৯, ৪৯৬
৭০। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। (শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ, এম-এ) ৪০৪, ৫১১, ৫৬৬
৭১। সাহিত্য সমালোচনায় অধিকার-ভেদ। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু) ... ৩৭৯
৭২। সাধু আনন্দমোহন। (সম্পাদক) ... ... ... ৩২৪
৭৩। সুখের সংসার। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ... ৩৩
৭৪। সুপ্রতিষ্ঠ। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law) ... ... ২৪০
৭৫। সোণার বাংলা—নূতন সংস্করণ। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল)... ৫৩
৭৬। স্ত্রী-পুং-ভেদ। (শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল) ... ... ৭২, ২৩৫, ৩৯৬
৭৭। স্ত্রী জাতি ও পুরুষ। (শ্রীশশধর রায়, এম এ, বি-এল) ... ৪৬৫
৭৮। স্বদেশী উচ্ছ্বাস ও জাতীয় শিক্ষা-সমিতি। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল)১২৩
৭৯। স্বদেশী ভাব ও আকবর। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল)... ৪৭[illegible]
৮০। স্বপ্ন। (সম্পাদক) ... ... ... ৬৫
৮১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার,বি-এল
শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীতারাপ্রসন্ন রায়, শ্রীকালীনাথ
ঘোষ [illegible] শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী,
[illegible] গুপ্ত) [illegible]

# নব্যভারত

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড—১৩১৩।

## বার্ষিকী।

বহুকালের তপস্যার ফলে দেশে সুদিনের অভ্যুদয় হয়—নবযুগের আবির্ভাব হয়। বঙ্গ-সাহিত্য-জগতের মহা ঋষিদিগের কঠোর তপস্যা-ফলে বঙ্গে নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। ৩০শে আশ্বিন (১৩১২) ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) এ দেশের পক্ষে মহা সুদিন। বঙ্গ-ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে বা শোণিতাক্ষরে এই স্মরণীয় দিনের কথা লিখিত থাকিবে।

আজ রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্য-জগতের স্বর্গগত অমর মহাত্মাদিগকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের তপস্যার ফল এতদিন পরে বঙ্গে ফলিয়াছে। তাঁহাদের অমর লেখনী ধন্য—তাঁহাদের পূতজীবন-কাহিনী শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদে আজ জগতে বিঘোষিত হউক। বঙ্গভাষা—বঙ্গে নবযুগের কারণ রূপে আজ অবতীর্ণ। নগণ্য আজ গণ্য, উপেক্ষিত আজ সাদৃত, ঘৃণিত আজ সর্ব্বপূজ্য। জননী জন্মভূমির জয় হউক।

১৩১২ সালের নানা প্রকার অমানুষিক ইংরাজ-অত্যাচারের কথা শুনিয়া কেমব্রিজের জনৈক প্রোফেসর বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"কখনও চির-স্বাধীনতা-ভক্ত দাস-ব্যবসায় উচ্ছেদকারী ইংরাজ অঙ্গের প্রতি রুশিয়ার ন্যায় অত্যাচার করিতে পারে না।" যখন পুনঃ পুনঃ ছাত্রেরা তাঁহাকে নানা অত্যাচারের কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যে ইংরাজ এইরূপ অত্যাচার করিতে পারে, তাহার শরীরে ইংরাজ-রক্ত নাই!"

সে দিন আর একজন নবাগত সদাশয় ইংরাজ-প্রোফেসর আমাদের জনৈক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—"The Bengalees are destined to rise."

ইংরাজের অত্যাচার ভিন্ন ভারতের আর উদ্ধারের উপায় ছিল না। বুঝিবা এইজন্যই, চিরস্বাধীনতার পক্ষপাতী দেবোপম ইংরাজ, ভারতের জল বায়ুতে বর্দ্ধিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারই ফলে ভারত আজ জাগিতেছে। ইংরাজের অত্যাচার এবং ভারতের জাগরণ—সমসূত্রে গ্রথিত। ইংরাজ অত্যাচার করিতে সক্ষম হইতেছেন, বিধাতার কৃপায়। তাঁহার কৃপাতেই আজ এদেশ জাগিতেছে।

বঙ্গের জাগরণ যে ভারতের জাগরণের কারণ, এ কথা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। ভারতের সর্ব্ব কর্ম্মে এখন বঙ্গের উত্তেজনা ও উদ্দীপনা মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। বঙ্গ এবং ভারত আজ মহাপ্রেমসূত্রে গ্রথিত।

সকল কার্য্যই সীমাবদ্ধ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। এক দিন ইংরাজ অত্যাচার-ধর্ম্মে উদ্দীপ্ত হয় নাই। ধীরে ধীরে—ইংরাজের এই লীলা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। শেষে—বিশেষ রূপে, ৩০শে আশ্বিন (১৩১২)—এ দেশকে জাগাইবার কারণ হইয়াছে। মৃত জাতি আবার মোহিনী শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে। দেবশক্তি ভিন্ন ইহা কি কখনও হইতে পারিত? কখনও সে সম্ভাবনা ছিল না। চিন্ময়ী মা আজ মৃণ্ময়ী স্বদেশ-রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণা। বহু দিনের তপস্যার ফলে আজ সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা মাতৃভূমি নবযুগের মুখ দেখিয়াছে। "বন্দে মাতরম্"—শব্দ বহু তপস্যার ফলে সুষুপ্ত মৃত ব্যক্তির প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি ঢালিয়া দিতেছে। জয় চিন্ময়ীর জয়।

সেদিন একজন সহৃদয় বন্ধু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনেক প্রশংসা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এদানীন্তনকালে গবর্ণমেণ্টের কোন্ কাজটার প্রশংসা করা যাইতে পারে? তদুত্তরে তিনি তেমন কোন সংকাজের উল্লেখ করিতে পারিলেন না, যাহার পশ্চাতে স্বার্থের অঙ্কুর দেখা যায় না। তিনি যে সকল সৎকাজের উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমরা যখন একে একে তাহার প্রত্যুত্তর দিলাম, তখন তিনি বলিলেন—"আপনি স্বদেশকে বড় ভালবাসেন, তাই গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক প্রত্যাশা করেন; তাহা পান না বলিয়াই নিন্দা করেন; বাস্তবিক এমন গবর্ণমেণ্ট আর হয় না।" * এ কথার উত্তরে আমরা যখন বলিয়াছিলাম যে, পুণ্য ও ন্যায়, পাপ ও অধর্ম্ম, যে দেশে এই দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে পুণ্য ও ন্যায়ের স্থান পাপ ও অধর্ম্ম গ্রাস করিবে, সে দেশের পতন অনিবার্য্য। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা পায় নাই, কিম্বা পাইয়া হারাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনও দীর্ঘকাল স্বাধীন থাকিতে পারে না; যে রিপুর অধীন, সে জগতের সকলের অধীন। ইংলণ্ডে এখন পাপ ও অধর্ম্মের রাজত্ব, পুণ্য ও ন্যায়মূলক আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লুপ্ত, পরিম্লান, সুতরাং সর্ব্ববিভাগেই ইংলণ্ডের অবনতি দেখা যাইতেছে। তিনি অনেক কৌশলে ইংলণ্ডের ন্যায় ও পুণ্য-মূলক আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। যদি কোন নিরপেক্ষ সাহসী ব্যক্তি ইংলণ্ডের ঐ সকল সৎগুণ প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হন, আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

কথা এই,—সব লোক ও সব দেশের মধ্যেই যখন বিধাতার ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে, তখন ইংলণ্ডের ও ইংরেজের মধ্যে কি কিছুই ভাল নাই? ভাল আছে বই কি? কিন্তু সে ভাল তোমার আমার জন্য নয়, সে ভাল তাহাদের নিজের পরিবার ও দেশের জন্য,—আমাদের সহিত তাহাদের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। আমাদের তিরোধান তাহাদের পরিপুষ্টি ও আমাদের দারিদ্র্য তাহাদের সম্পদের কারণ;—এখন নিজ দেশের মঙ্গল সাধন করাই ইংরাজ-নীতির মূল। নচেৎ, এমন করিয়া, এ জাতিকে দিন দিন মরণের পথে যাইতে

* বন্ধুকে অনুরোধ করিতেছি, ১লা ও ২রা বৈশাখ (১৩১৩) বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির প্রতিনিধিগণের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করিবেন। এই দুইদিনও বঙ্গ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে। আশা করি, এই দুইদিনের অত্যাচারে আবেদন-নিবেদনের দলের লোকের মুখ ভাঙ্গিবে।

তাঁহারা দিতেন না। এবং যখন মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি বিভীষিকা দেখাইয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিতেছে, তখনও অবাধে লুণ্ঠন কার্য্য চলিত না। হয় ভারতকে নিজলীলা সংবরণ করিতে হইবে, নয় ইংলণ্ডকে সংযত হইতে হইবে। একদিনে কিন্তু ইংরাজের এই দুর্গতি হয় নাই। বহু দিনের পর ইংরাজ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হারাইয়াছে, রিপুজয়ে অক্ষম হইয়া অসংযত হইয়া উঠিতেছে। তাহার ফলে তাহারাও রুষের দৃষ্টান্তানুকরণে অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কখনও অত্যাচার করিতে পারে না। ধর্ম্ম-হীনতাই চরিত্রহীনতার কারণ। চরিত্র-হীনতাই মানুষকে পরপীড়ক, পরশ্রীকাতর ও অত্যাচারী করে।

আমরা অনেক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছি, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হারাইয়া এখন ইংরাজ ভারতকে চিরদাসত্বে নিমগ্ন রাখিতে বদ্ধ-পরিকর। ভারতের অভ্যুদয় বা অভ্যুত্থান, পূর্ব্বে ইংরাজনীতির অনুমোদিত থাকি-লেও, এখন তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী কথা। তাঁহারা যে প্রকারে পারেন, ভারতবাসীকে দাসত্বে ডুবাইয়া রাখিবেন। প্রকৃত পক্ষে, এত দিন ডুবাইয়া রাখিতে সক্ষমও হইতে-ছিলেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়াই কাপুরুষের ন্যায় ভীত হইয়া উঠিতেছেন ও রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়া তীব্র-ভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, অত্যাচারের ভয়ে অনেকে ইংরাজভক্ত হইতেছে। নেতা-প্রমুখ কংগ্রেস প্রকৃত পক্ষে যেন ভারতের অভ্যুত্থানের জন্য নয়, দাস-[illegible]রই অভিব্যক্তি, তাঁহাদের জাতীয় ভাষার [illegible]ধন যেন আরো ভাল করিয়া দাসত্ব [illegible]ার জন্য! নচেৎ ষোড়শ বৎসর বঙ্কিম-চন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র এদেশে অনাদৃত থাকিত না। দাসত্বের মাত্রা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অন্য দিকে মানুষের মন ধাবিতই হইত না। কেবল তাহাকে ধরিব, তাহাকে ডাকিব, কেবল ষোল আনা তাহাকে লইয়াই আমাদের সকল সাধন-ভজন, গতি-মুক্তি, চলা-ফেরা। আমরা স্বাধীনভাবে সকল কার্য্য করিব, আমরা স্বাবলম্বনের পথে চলিব, এ কথা পূর্ব্বে কোথাও শুনিতে পাই নাই। গবর্ণমেণ্টের দাস-নিষ্পেষণ-সাধনার খুব সুফল ফলিতেছিল। যে যেমন, অন্যকে সে তেমনই করিতে চায়। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যে দিন ইংলণ্ড হারাইয়াছে, সেই দিন হইতেই নিষ্পেষণ-পলিসি ইংলণ্ডের মূলমন্ত্র হইয়াছে। ব্রাইট, কবডেন আর ইংলণ্ডে অভ্যুদিত হইবে না। চলিতে ফিরিতে, খাইতে শুইতে, ইংরাজানুকরণে, ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক স্বাধীনতার শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হইতেছিল। বিধাতা দেখিলেন,—এ জাতি একেবারে যায়, তাই মুখ তুলিয়া চাহিলেন। যাঁহারা বিধাতার বিধানকে অস্বীকার করি-বেন, তাঁহারা দেশের প্রকৃত বন্ধু নন্।

বহুদিনের সাধনার ফলে একটু অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। এখন কাজের প্রতি অনেকের মনোনিবেশ হইয়াছে। সকলে না হইলেও, অধিকাংশ ব্যক্তি ব্রত লইয়া নীরবে সাধনার পথে যাইতেছেন। বরিশালের উত্থান ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহা গত বর্ষের বিশেষ শুভ ঘটনা।

আজকাল এ দেশে তিন শ্রেণীর লোক দেখা যাইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলিতে-ছেন—"যতদিন বঙ্গবিভাগ রহিত না হইবে, ততদিন আমরা বিলাতী জিনিষ স্পর্শ

করিব না ও আন্দোলন করিব।" দ্বিতীয় শ্রেণী বলিতেছেন—"বঙ্গবিভাগ থাক্ বা যাক্, জানি না, আমরা চিরকাল স্বদেশী থাকিব ও দেশের জন্য খাটিয়া মরিব।" তৃতীয় শ্রেণীর লোক বলিতেছেন, "আমরা পার্টিসনও বুঝি না, স্বদেশীও বুঝি না,—আমরা বুঝি কেবল মান ও সম্মান।" এই তৃতীয় শ্রেণীর লোক রাজভক্ত—ইঁহারা আজকাল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রতিপত্তি বাড়ে ও এদেশের লোক নিষ্পেষিত হয়। স্বদেশীর সর্ব্বনাশ করিয়া, এই সকল ঘরের লোক, ইংরাজের নিকট প্রতিপত্তি এবং সম্মান, বড় বড় উপাধি এবং বড় বড় চাকরী উপঢৌকন পাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এই স্বদেশদ্রোহী শ্রেণীর বংশধরেরা, এদেশের রাজার নিকট, মীরজাফরের বংশের ন্যায় মহা সম্মান পাইবেন ও আত্মত্যাগী মার্টার বলিয়া পরিচিত হইবেন!

প্রথম শ্রেণীর লোক জাতীয় মহাসমিতির সেবক, তাঁহারা চোক রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইয়া বা কান্নাকাটি করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে কাজ আদায় করিতে চাহেন;—বঙ্গবিভাগ রহিত করিতে পারিলেই তাঁহাদের সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং অবাধে দীর্ঘকালের জন্য গাঢ়-নিদ্রার অঙ্কে আত্ম সমর্পণ করিতে পারেন। এই শ্রেণীর লোক কেবল আবেদন নিবেদনে, আন্দোলন চীৎকারে সকল কার্য্য সমাপ্ত করিতে চাহেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন নেতা গবর্ণমেণ্টের খোসামুদী করিবার জন্য কংগ্রেস-সভা পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রের পা চাটিবার জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন! তাঁহারা নিজেরা বড় কিছু করিতে চাহেন না, শয়নে স্বপনে চিন্তা করেন, "হায়রে বিলাসিতা ও সাহেবী-অনুকরণ! কত-দিন আর তোদিগকে ভুলিয়া থাকিব?" এবং সজনে নির্জ্জনে প্রকৃত স্বদেশভক্তের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া গালিগালাচ করেন। তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের সংস্পর্শে আসিতে কিছুতেই রাজি নহেন, তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করেন। তাঁহাদের আদর্শ হিউম, কটন এবং ওয়েডারবরণ।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন—"আমরা আর কিছু চাই না। চাই কেবল স্বদেশ ও স্বদেশের উন্নতি।" তাঁহারা নির্ভয়ে বলেন—"আমরা চিরকাল স্বদেশী থাকিয়াই মরিতে চাই। বলেন, হাতে কলমে কাজ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিব, নচেৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইব।" প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর মত ভাল, সে বিচার কে করিবে? বিচার কেহ করিতে রাজি নহে।

এই দুই শ্রেণীর মধ্যে গোপনে গোপনে খুব দলাদলি চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার আভাস পাইতেন, তবে নিশ্চয় একটা কিছু করিয়া বসিতেন। তাহার প্রমাণ, মুসলমান-দিগকে একটু হিন্দু-বিরোধী জানিয়া ফুলার মহোদয় কত প্রকারে, মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর মস্তকে আঘাত করাইয়া নিষ্পেষণ-লীলা প্রকাশ করিতেছেন!!

আজ নববর্ষের পুণ্যময় দিনে, আমরা করযোড়ে, সকলের চরণে নিবেদন করিতেছি, দলাদলি ঢের হইয়াছে, আর না। এখন সকলে এক-প্রাণে এক-মনে স্বদেশের হিতের জন্য সচেষ্ট হউন। নিশ্চয় পূর্ব্বতন সাধকদিগের তপস্যার ফল ফলিবে এবং সুদিন আসিবে।

এখন এমন দিন আসিয়াছে, যখন [illegible] [illegible]রি, এই মূর্খ ও জ্ঞানী, চাষা ও বণিক, [illegible] দলের রাজাকে এক ব্রতে ব্রতী হইতে হই[illegible]

এ দল, সে দল, সকল দলকে এক হইতে হইবে। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব?

কঙ্গ্রেস যখন স্বদেশী গ্রহণে ও "বয়কটে" সম্মতি প্রদান করেন নাই, তখন কঙ্গ্রেসের জন্য অর্থ নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। এখন বঙ্গপ্রদেশকে একটু সংযত হইতে হইবে।

এবার বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির পরিণাম যাহা হইল, তাহা দেখিয়া, এত অপমানের পর আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের আদরের প্রাদেশিক-সমিতি, প্রধান নেতৃসমাজ রূপে দণ্ডায়মান হউন। প্রতি জেলায় তাহার শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রতি সবডিবিসন ও প্রতি থানায় তাহার উপশাখা-সভা গঠিত হউক। সর্ব্বশ্রেণীর লোক—নিরীশ্বরবাদী ও সেশ্বরবাদী, নিরক্ষর ও সাক্ষর, সকলে এই সকল সভায় যোগ দিবেন। প্রতি গ্রামের প্রধানগণ উপশাখা সভার সভ্য হইবেন; প্রতি উপশাখা সভার নেতাগণ শাখাসভার সভ্য হইবেন এবং শাখাসভার নেতাগণ প্রাদেশিক সমিতির সভ্য হইবেন। এই রূপে প্রধান সভার প্রধান ব্যক্তি উপশাখা সভার সর্ব্ব নিম্ন ব্যক্তির সহিত এক যোগে, এক সূত্রে গ্রথিত হইবেন। এক ডাকে সকলে আহূত হইবেন, এক মন্ত্রে সকলে মিলিত হইবেন;—সে মন্ত্র "স্বদেশের হিত কামনা।" যে উপায়ে যে রূপে দেশের হিত হইতে পারে, সকলকে কায়মনোবাক্যে কেবল সেই চেষ্টা করিতে হইবে। মতের ঝগড়া সর্ব্বদা পরিহার করিয়া কেবল কাজ লইয়া সকলে আত্মহারা হইবেন। দারিদ্র্য-সমস্যা, রোগ-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, মকদ্দমা-সমস্যা, সকল সমস্যার পূরণ এই সকল সমিতি করিবেন। এদেশের এ সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কাজ দরিদ্রদিগকে রক্ষা করা। সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা করিতেই হইবে। তাহারা অনাহারে, ম্যালেরিয়ায়, অশিক্ষায় ও মামলা মকদ্দমায় একেবারে যায় যায় হইয়াছে! তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। তাহারা দেশের মেরুদণ্ড, তাহারা না খাটিলে আমরা একদিনও বাঁচিতে পারি না, তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িলে কি অবলম্বন করিয়া দেশ দাঁড়াইবে, বলত? তাহারাই যে দেশের মূল। তুমি, আমি, সে,—যাহারা সহরে দলাদলি করিয়া বিচ্ছেদ প্রচার করিতেছি, আমরা কি তাহাদের কোন খোঁজ খবর রাখি? হায়, যদি রাখিতাম, তবে এমন করিয়া এ দেশটা হতশ্রী হইয়া যাইত না! তাঁহাদের হতাশের দীর্ঘ উষ্ণ-নিশ্বাসে এদেশ এরূপে পুড়িয়া জ্বলিয়া যাইত না!! তুমি, আমি, সে,—আমরা ক'জন লোক? আমরা দুই চারি সহস্র লোক কত প্রকার চেষ্টা করিয়াও জাতীয়-ধনভাণ্ডারে লক্ষ্য টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; আর তাহারা সকলে যদি আমাদের সংস্পর্শে আসিত, একটী একটী পয়সা দান করিলেও ৮ কোটী লোকের সাহায্যে কত টাকা সংগ্রহ হইত। কিন্তু আমি, তুমি, সে—আমরা সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ভুলিয়া থাকিতে চাই। ভুলিয়া থাকি বলিয়া আজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ডাকিয়া, তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া, আমাদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন। হায়—আজ ৮ কোটী লোকের মুখে যদি "বন্দে মাতরম্" শব্দ এক সুরে নিনাদিত হইত, না জানি, কি সুন্দর দৃশ্য হইত! হায়, যাহারা কোটি কোটী, তাহারা শিক্ষিতদের সহিত যোগ দিল না কেন? এ দোষ কি শিক্ষিতদের নয়? শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চিরকাল তাহাদিগকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়া-

ছেন ; তাই তাহাদের এত হীনাবস্থা, নচেৎ তাহারা এতদিন জাতীয় একতার নিশান হস্তে লইয়া আমাদের সহিত একাত্মক হইয়া দণ্ডায়মান হইত। এই কলঙ্কের অপনয়ন না হইলে কিছুতেই এদেশ জাগিবে না। ঘৃণা লইয়া যাহারা জীবন ধারণ করে, একতা সাধন তাহাদের কর্ম্ম নয়। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন, "নিম্নশ্রেণীর গতি কি ফিরিবে ? হায়, তাহাদিগকে ত আমরা মানুষ মনে করি না, তাহাদিগকে যে পশুর ন্যায় মনে করি। পশুর উপকার কি মানুষের দ্বারা হয় ?" এই কথা বলিবার সময় তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতেছিল। বাস্তবিক আমরা যদি তাহাদিগকে পশুর মত মনে না করিতাম—যদি তাহাদের সহিত মিলিতে চেষ্টা করিতাম,—তাহাদের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ মিশাইতাম,—যদি আমরা তাহাদের আত্মীয়দের মধ্যে গণ্য হইতাম, তাহাদের মঙ্গলের জন্য যদি দিবানিশি খাটিতাম, তবে এমন করিয়া তাহারা মরণের মুখে চলিত না—এবং তাহাদের দলের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের গোলামগিরির জন্য কোমর বাঁধিয়া ছুটিত না, গবর্ণমেণ্টের চাকরীর খাতিরে আমাদের উপর লাঠী চালাইত না। আমরা নিম্নশ্রেণীর নিকট যে মহা অপরাধে অপরাধী, তাহার প্রায়শ্চিত্ত না হইলে এই সোণার বাঙ্গালার উন্নতি কিছুতেই হইবে না, একথা নিশ্চয় জানিও।

কি করিলে এখন তাহাদিগকে জাগরিত করা যায় ? এ বিষয় সকলের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এদেশের সকলকেই ডাকিতে হইবে—সকলকেই আদর করিতে হইবে—কাহাকেও পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, সকলকেই মহামিলনে সম্মিলিত করিতে হইবে। যদি তুমি মনে কর, তুমি বড়, সে ছোট, অহঙ্কার-সর্ব্বস্ব তোমা দ্বারা তাহার উপকার হইবে না। যদি তুমি মনে কর, তুমি জ্ঞানী, সে মূর্খ, তবে তোমা দ্বারাও তাহার মঙ্গল হইবে না। যদি তুমি মনে কর, তুমি ধনী সে কাঙ্গাল, তবে তোমা দ্বারাও তাহার উপকার হইবে না। তোমাকে ভাবিতে হইবে,—বৈচিত্র্যময়ী বিশ্বজননীর মহাচিদ্ বৈচিত্র্যের একাংশ তুমি, আর এক অংশ ঐ নগণ্য কৃষক, মুটে, মজুর। সেও কো বিষয়ে তোমার শ্রেষ্ঠ, তুমিও তাহাপেক্ষ কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ;—অথবা তুমি ও সে-রূ অনন্ত লোমমণ্ডলী মিলিলেই তাঁহার চিদংশে পূর্ণ ব্যাপ্তি শোভা পাইবে। এই রূপ সাধ করিতে করিতে, সকলের সহিত একাত্মক হইয়া যাইতে হইবে। তাহার স্বার্থ তোমার স্বার্থ, তোমার স্বার্থ তাহার স্বার্থ হইবে সে মরিলে তুমি কাঁদিবে, তুমি মরিলে সে কাঁদিবে ;—এই রূপ এক-স্বার্থক, এক-ধর্ম্মক একাত্মক হইয়া মহামিলনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মহা সাধনার পথে যে ব্যক্তি ঘৃণা বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিবে, সে দিগ্বিজয়ী সুবক্তা হইলেও, তাহা দ্বারা এদেশের প্রকৃত উন্নতি কিছুই হইবে না। ঘৃণা বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার, আত্মাভিমানকে বিসর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

ভাবিতেছিলাম, যিনি এইরূপ মহামিলন সংগঠিত করিতে সক্ষম, সে রূপ নেতা কোথায় পাই ? ভ্রূকুঞ্চিত করিতে, উপেক্ষা করিয়া চলিতে, এখানে সেখানে কত নেতাকে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি! "আঃ ঐ লোকটা গিয়াছে ? বেশ হয়েছে, গেলই বা, সে সামান্য দরিদ্র ব্যক্তি, তাহা দ্বারা কি হইবে ?"

এই রূপ উপেক্ষাকে না ডুবাইলে হইবে না। "আঃ ঐ সম্পাদকটা বিরোধী হইয়াছে, হলোই বা;—তাহার চরিত্র নাই।" এই রূপ ঘৃণাকে না নির্ব্বাণ করিলে হইবে না। "নিতাই যারে পায় দেয় কোল, কোল দিয়া বলে হরি বল"—আমাদের এই রূপ দেশ-জয়ী প্রেম-মন্ত্র সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। ঘৃণা বিদ্বেষ, আত্মাভিমান অহঙ্কার, পরনিন্দা পরচর্চ্চাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রিপুকে সংযত করিয়া, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায় ভূষিত হইয়া, সকলের চরণে পড়িয়া পড়িয়া সকলের কাণে কাণে মন্ত্র দিতে হইবে—"বন্দে মাতরম্।" এক দিন, দুদিন, দশ দিনে কি এহেন স্বদেশী-গ্রহণ-ব্রত সিদ্ধ হইবে? আত্মজয়ী না হইলে ও অগণিত স্বদেশীকে বাদ দিলে কখনও স্বদেশী-গ্রহণ-ব্রত সিদ্ধ হইবে না।

আমরা রাজা নই যে, আইন জারি করিব, আর সকল লোক স্বদেশী-মন্ত্র-গ্রহণ করিবে ও একপ্রাণতায় মাতিবে। আমাদের কল নাই, কারখানা নাই যে, যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা প্রস্তুত করিয়া সকল অভাব পূরাইব। জাহাজ নাই যে, নিজেদের দ্রব্যাদি বিদেশে বিক্রয় করিয়া ধনী হইব। টাকার অভাবে কত কত কার্য্য পণ্ড হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইতেছে। ব্যবসা নাই, বাণিজ্য-বুদ্ধি নাই —আমরা চিরাভ্যস্ত কেবল গোলাম-গিরিতে। গোলামগিরিতে সিদ্ধ ও আত্ম-জয়ে অক্ষম আমরা, অহঙ্কারের প্রভাবে, ভাবিতেছি যে, আমাদের ন্যায় এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই;—আমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা বুঝিতেছি না যে, আমরা কত অব-নমিত হইয়াছি। কত চিন্তার প্রয়োজন, কত টাকার প্রয়োজন, কত স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, কত সংযম ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, আমরা এতই অবনত হইয়াছি যে, তাহাও বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। আছে কি? কেবল অহঙ্কার, আত্মাভিমান, ঘৃণা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা। ইহা লইয়াই আমরা মহাপুণ্যময় স্বদেশী-গ্রহণ-যজ্ঞে আহূত হইয়াছি! হায়, যদি এবার এই স্বদেশী-গ্রহণ-ব্রত পণ্ড হয়—এদেশের আর আশা নাই। এতকাল পর যদি "স্বদেশী-গ্রহণ" রাণী স্বর্গ হইতে আসিয়াছে—সকলের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া, ধীর, স্থির এবং প্রশান্ত মনে সংযমকে অবলম্বন করিয়া সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত। এক দিন, দুদিন, এক বৎসর, ৫ বৎসরে ইহা সিদ্ধ হইবে, আমরা মনে করি না। কঠোর সাধন, কঠোর তপস্যা—দীর্ঘকাল স্বার্থ বলিদানের প্রয়োজন। নিম্ন শ্রেণীকে পরিত্যাগ করিয়া যে পাপ করিয়াছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কিছুতেই দেশ একপ্রাণ হইবে না।

যে তিন শ্রেণীর লোকের কথা বলিতে-ছিলাম, তাঁহাদের পরস্পরের মিলন হইলে, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় অন্য জাতি সমূহ মিলিবে। যত জাতি, যত সম্প্রদায়, যত শ্রেণী থাকে, সে সকলকেও মিলাইয়া একাকার করিতে হইবে। সোজা কথা কি? দেশোদ্ধার ছেলে খেলা কি?

তোমরা আশা করিতেছ, কটন, হিউম, ওয়েডারবরণ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন; আমরা বলি, তাহা ভুল। যেরূপে হয়, তাঁহারা ভারতকে দাসত্ব-শৃঙ্খলেই বদ্ধ রাখিতে চাহেন।* উদ্ধার করিতে আছে কেবল এ

* "কিন্তু হিউম বল, কটন বল, ওয়েডারবরণ বল, কেহই এই (দাসত্ব) শৃঙ্খল মোচন করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহার সাক্ষী হিউম, যিনি সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা স্মরণ করিয়া চিরদিন আমাদিগকে

দেশের অগণিত, নগণ্য লোকসমূহ। যদি আর সকল পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে পার, তবে তাহারা দেশকে তুলিয়া ধরিবে। যদি তোমরা তাহাদের হইতে পার, তবে দশ বৎসরের কাজ দশদিনে সম্পন্ন হইবে, নিশ্চয় জানিও।

---

নিরস্ত্র করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। তাহার সাক্ষী ওয়েডারবরণ, যিনি সেদিনও ব্রিটিশশাসনের স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধানই কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া কংগ্রেসীগণের সদিচ্ছাকে স্বজাতির নিকটে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তাহার সাক্ষী কটন, যিনি, রাজকুমারের নিকট নতজানু হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিলেন বলিয়া, অমৃতবাজার সম্পাদকের রাজভক্তি পার্লামেণ্টে প্রচার করিয়াছেন এবং আমরা ইংরাজরাজ কেবল নহে, ইংরাজের হস্তে কোমল ও সহৃদয় ব্যবহার চাহিতে পারি, এই কথা বলিয়াছেন। সর্ব্বোপরি এ কথার সাক্ষী, কটন-গুরু কোমতমতাচার্য্য ফ্রেডেরিক হ্যারিসন, যিনি সে দিন প্রকাশ্য বক্তৃতায়, ভারতমাতার যে সকল চক্ষুষ্মান সন্তান প্রজাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, অম্লানবদনে তাহাদিগকে অরাজকদল বা এনার্কিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" যুগান্তর, ৫ম সংখ্যা, ১৩১২।

বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টারি কমিটী কিরূপ আশাপ্রদ, তাহা বেঙ্গলীর লণ্ডন-লেটারে দেখুন ;—

"I am bound to say that I cannot consider the proceedings of the Indian Parliamentary Committee to be altogether satisfactory.

On Monday last it held a meeting in one of the commitee rooms of the House of Commons. It was a meeting of importance, for its object was to approve or reject the alternative scheme to the Partition, drafted by Sir Henry Cotton, the details of which I sent out to you last week :—A scheme for making Chota Nagpur and Behar into an additional Lieutenant-Governorship, and leaving Bengal, Assam and Orissa as a separate Province under a Governor and Council. Well. As I say, this was an important meeting. And what was the result? There are something like a hundred members of the Indian Parliamentary Committee. Out of these, thirteen only condescended to put in an appearance.

* * *

Sir Henry Cotton, it seems, adumbrated his scheme, explaining it with the aid of a map. So far so good. Then who should jump up but that stormy petrel, Mr. Rees. Now Mr. Rees's sympathies with India are of such a peculiar character that I cannot for the life of me understand why he is on the Indian Parliamentary Committee at all. Those peculiar sympathies, I gather, he exhibited fully upon this occasion.

Quoth Mr. Rees—I take this from the *Times*—as the partition of Bengal was now an accomplished fact, he thought it better to leave the matter alone. Moreover, he strongly objected to Sir Henry Cotton's proposal for a Governor and Council for Bengal :

* * *

It was eventually agreed to lay before M. Morley Sir Henry Cotton's scheme with the omission of the paragraph relating to the appointment of a Governor and Council for Bengal. It will now be presented in its emasculated form by an informal deputation representing the different views expressed by members of the Commitee.

* * *

I come to the moral. What is the good of an Indian Parliamentary Committee like this?

* * *

It is not much good sending memorials to the Secretary of State."

Bengalee, April 18, 1906.

তিনি বলিতেছিলেন, "মানুষকে ভাল বাসিতে চাহেন, অথচ ইংরাজকে বাদ দিতে চাহেন, এ কিরূপ কথা?" প্রেম-সাধনা ব্যষ্টি হইতে আরম্ভ, সমষ্টিতে পরিপুষ্ট। নিজ আত্মা, নিজ পরিবার, নিজ প্রাণ, নিজ দেশ—এই রূপ আরম্ভ করিতে করিতে শেষে অনন্তে পরিব্যাপ্তি হইবে। আত্মা ভুলিলাম, পরিবার ভুলিলাম, গ্রাম ভুলিলাম, দেশ ভুলিলাম, কেবল কর্ত্তাদের গোলামীগিরিতে মজিলাম—অমনি বিশ্বপ্রেমের উদয় হইবে? গাছের গোড়া কাটিয়া মাথায় জল ঢালিতে কত বিশ্বপ্রেমিক লালায়িত গো! হায়, প্রেমের মূল, বিধাতার সৃষ্টি-রহস্য তাঁহারা কিছুই বুঝিলেন না!

আমরা সান্ত ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিব—তবে ত অনন্তে পৌঁছিব? প্রকৃত প্রেম-সাধনার পথে একটুও অগ্রসর হইলাম না, অথচ "অনন্ত অনন্ত"মুখে বলিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে না। সীমা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। সান্তে বীজ রোপণ করিতে হইবে; শেষে অসীমে, অনন্তে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইবে। অণু অণু বারিকণা ধারণে সক্ষম হও, হে মানুষ, তার পর তুমি অনন্ত সিন্ধু ধারণার জন্য ধাবিত হইও। তোতা পাখীর ন্যায় মুখে "অসীম, অনন্ত প্রেম প্রেম"বলিয়া বলিয়া আর হাস্যাস্পদ হইও না।

একদিন ভাবিতেছিলাম, এদেশের দুই শত নেতা ও দুই শত সম্পাদক একমত হইতে পারিতেছেন না, কিরূপে ত্রিশ কোটী লোকের মিলন হইবে? মিলন সম্ভব—কেননা, সকলের উদ্দেশ্যই স্বদেশের উন্নতি। যে যেরূপে পার, স্বদেশের উন্নতিসাধন করিয়া যাও। তুমি বেশী করিতেছ, কি সে বেশী করিতেছে, সে বিচারের প্রয়োজন কি? যাহার যত টুক শক্তি, স্বদেশের হিতার্থ তাহা অর্পণ কর। কিছু করিতে না পার, বিধাতার নিকট দেশের জন্য প্রার্থনা কর। সকলে যদি কর্ম্মযোগে যোগী হইতে পারি, তবে, কর্ম্মযোগ-সূত্রে সকল হৃদয় গ্রন্থিত হইবে,—যূঁই, চামেলী, গোলাপ, মল্লিকা, সব মিলিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকীর্ণ করিবে। নীরবে, নিস্পৃহ ও নিষ্কাম ভাবে সকলে খাটিতে খাটিতে দেহখানিকে স্বদেশের হিতার্থ উৎসৃষ্ট করিয়া দেও। যখন অহং বস্তুটা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন দেখিবে,—দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, একটা স্বদেশ-হিত-কামনার অদেহী বিরাট চিন্ময় সত্তা। সেখানে বিভেদ বা বৈষম্য-জ্ঞান নাই—সব একাকার। সেই একাকারে লীন হইবার জন্য সকলে মহা কর্ম্মযোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

কিন্তু একটা চিন্তা না জাগিলে এই মহতী ইচ্ছার উদ্বোধন সম্ভব নয়। সে চিন্তা—চিন্ময়ের ধ্যান ধারণা। মৃণ্ময়ের ধ্যান ধারণায় পাশ্চাত্য জগৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে; কিন্তু প্রাচ্য বিশেষত্ব চিন্ময়ের ধারণায় সিদ্ধি লাভ করা। যে গুণে এক সময়ে এই ভারত জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই সাধনা ভিন্ন এদেশে লুপ্ত বা সুপ্ত বিশেষত্ব আবার জাগিবে না। চিন্ময়ের ধ্যান ধারণা ভিন্ন মানুষ জাতি বিচার ভুলিতে পারে না; অথবা—অহং-জ্ঞান ভুলিতে পারে না;—অথবা পরকে আদর করিয়া তাহার নিকট বিশেষত্বের মহা শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। আমি যাঁহার, তুমিও তাঁহারই, এ জ্ঞান না জন্মিলে আমি তোমাকে আপন বলিয়া কখনও ধারণা করিতে পারি কি? কেহ কেহ বলেন, "এক স্বার্থে আমরা মিলিতে পারিব।" কিন্তু স্বার্থের বাঁধ কদিন? স্বার্থ চলিয়া গেলে, আর মিলন থাকিবে না। অথবা তোমার স্বার্থ ও আমার স্বার্থ চিরদিন একরূপ থাকিতে পারে না। সুতরাং এক-স্বার্থক বলিয়া ভারত মহা মিলনে মিলিবেন, ইহা যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা মহা ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তির জন্যই কতক ভারত-বাসী ইংরাজের গোলাম, কতক স্বদেশী। স্বদেশীর মধ্যেও কত জন হিউম, কটন বা ওয়েডারবরণের গোলাম! তাঁহারা জানেন না যে, উঁহাদের ক্ষমতা কত সামান্য। স্বার্থে মিলন সম্ভব নয়, মিলন—কেবল চিন্ময়ের বিশ্ববিজয়ী প্রেমে সম্ভব। সেই অরূপ ও অব্যক্ত, পরিস্ফুট ও ব্যক্ত হইয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্রের সুজলা সুফলা মাতৃভূমির সপ্তকোটী সন্তানদলে। এই জন্যই

মহাজনেরা বলিয়াছেন, সকল যজ্ঞ অপেক্ষা নৃযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে একথা বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলনতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আনন্দমঠের মহা শিক্ষা চিন্ময়ের জ্ঞানে পূর্ণ, তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় চিন্ময়ের ভাব প্রস্ফুট এবং তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বের" অনুশীলন-তত্ত্বে এই চিন্ময় ভাব পরিকীর্ত্তিত। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র গ্রহণ করিলে, তাঁহার এই মন্ত্রের অন্তরালে যে চিন্ময়ের ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার শেষ জীবনের পুস্তক সকল অধ্যয়ন কর, আমাদের কথা বুঝিতে পারিবে। শেষ পুস্তক সকলে ও সাম্যে, জাতিভেদ ও জাতিরক্ষার বিরুদ্ধে যে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা এদেশের অমূল্য সম্পত্তি। "ধর্ম্মতত্ত্বে" তিনি চিন্ময়ের যে তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবলম্বন করা উচিত। তাহা গ্রহণ না করিয়া, যাঁহারা মুখে মুখে "বন্দে মাতরম্"বলিবেন, তাঁহারা ভিত্তিহীন আকাশ-কুসুমের ভ্রান্তিতে প্রতারিত হইবেন। আসল কথা চিন্ময়ের সাধনা ভিন্ন ভারতের মহা মিলন অসম্ভব। চিন্ময় মহাপুরুষ জন্মভূমির সর্ব্ব ঘটে, সকল লোকে বিরাজিত। আমাদিগকে, জন্মভূমির সর্ব্ব ঘটে তাঁহার প্রকট লীলা দেখিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, এবং পিতার সকল সন্তানদলকে ভাই বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া একপ্রাণ, একহৃদয় হইতে হইবে। নচেৎ মহামিলন সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর প্রকৃত পক্ষে সেই দিন হইবে, যেদিন জন্মভূমির সন্তান-বৃন্দের মহামিলনে চিন্ময় প্রস্ফুটিত হইবেন এবং জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে। সে দিনের বিলম্ব আছে বলিয়াই, ঐ মহাত্মা তদীয় জীবনচরিত বহু বৎসর পরে লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন, তাঁহাকে ভাই-ভাই-ঠাঁই-ঠাঁই বাঙ্গালীরা এখন বুঝিতে পারিবে না। তাঁহার লেখা বাদ দিয়া তাঁহাকে কে বুঝিবে? তাঁহার লেখা বাদ দিলে তাঁহার যে মৃন্ময় দেহ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে পাপকীট প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নীমতলার শ্মশানে বহুবৎসর পূর্ব্বে ভস্ম হইয়া গিয়াছে! তিনি চিন্ময়ের চিন্তনে যে চিন্ময় রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত।* সেই ভক্তির রাজ্যে তোমরা যদি বিচরণ করিতে না পার, তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না, তাঁহার মন্ত্রও গ্রহণ করিতে পারিবে না। জন্মভূমি আমাদের সকলের পিতা মাতা এবং আমরা সকলে তাঁহার সন্তান। জন্মভূমিতে প্রস্ফুট সেই চিন্ময় দেবতা। এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক সুধা-রস-পান করিয়া করিয়া, অভেদাত্মক আত্মজয়ী সন্তানমণ্ডলী সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হউক,—এ দেশ ধন্য হইবে, পুণ্য ও ধর্ম্মে উজ্জ্বল হইবে। সন্তানদল পুণ্য ও ধর্ম্মের মহা সঙ্গীত গাইতে গাইতে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পরিণাম, জাতীয় স্বাধীনতা। প্রথমটী আসিলে দ্বিতীয়টী আসিবেই আসিবে। অতএব—সর্ব্বাগ্রে প্রথমটীর সাধনা কর—সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হও। সন্তানধর্ম্ম আর কিছুই নয়—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি যে চিন্ময়ীর দিব্য প্রকাশ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকল

* ধর্ম্মতত্ত্ব ( ১২৯৪ ) ১৮৮ হইতে ২৩৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

ভাই এই ঠাঁই হইয়া একাত্মক হওয়া এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বলে মাতৃসেবা করিয়া স্বাধীন জীবে পরিণত হওয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তানবৃন্দে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

# জাপানের অভ্যুদয়।*

## ভূমিকা।

সেই যে কবে রুশ জাপানে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তদবধি জাপান কথা শুনিয়া শুনিয়া লোকের বিরক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। এখন আবার কাহারও মুখে জাপান কথা শুনিতে আতঙ্ক হইবারই কথা, বিশেষতঃ যখন নূতন কথা বলিবার বড় কিছু নাই। দেখিতে জানিলে অবশ্য পুরাতনের ভিতরও অনেক নূতন জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়, বৃক্ষচ্যুত ফল-পতন ব্যাপার হইতে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করা যায়। তেমন করিয়া দেখিবার শক্তি কয় জনের আছে? আজ কাল অনেক ভারতীয় যুবক বিদ্যাশিক্ষার্থ জাপানে বাস করিতেছেন, এদেশেও দু এক জন শিক্ষিত জাপানী পুরুষের মধ্যে মধ্যে শুভাগমন হয়। জাপান সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব জানিবার আমাদের এইরূপ বিস্তর সুবিধা থাকিলেও উক্ত দেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সামান্য, প্রায় সমস্তই পরের মুখে ঝাল খাওয়া। যাহা হউক, যখন জাপান লইয়া এত হৈ হৈ রৈ রৈ হইয়া গেল, তখন এযাবৎ আমরা জাপান সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছি, একটু গুছাইয়া মনে করিবার চেষ্টা করিতে দোষ নাই।

মঙ্গলবারের রাত্রি। ৺কালীঘাট যাত্রীর জন্য ট্রামে বেজায় ভিড়। প্রধানতঃ মাড়োয়ারিরাই গাড়ী খানি বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছেন এবং উঁহাদের কথোপকথন ধ্বনিতে উহা মুখরিত। শুনা যায়, বাঙ্গালীরা বাক্যপটু। এ সম্বন্ধে আমাদের মাড়োয়ারি ভায়ারাও কম নহেন, অন্ততঃ উঁহাদের ন্যায় অত উচ্চৈঃস্বরে ও উদ্যমপূর্ণ ভাবে কথোপকথন চালাইতে আমরা সক্ষম নহি।

উঁহাদিগকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া একটু জায়গা করিয়া বসিয়া আছি, কিছুক্ষণ পরে আর একজন আরোহী আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। ইনি বাঙ্গালী, প্রৌঢ় বয়স, নগ্নপদ, পরিধানে তসর কাপড়, অর্থাৎ ইনিও একজন কালীঘাট যাত্রী।

বসিবার অল্পক্ষণ পরেই আমাকে বাঙ্গালী পাইয়া ইনি একেবারেই বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মহাশয় এ হলো কি? দিন কত আগে যে জাপান বার্ণিশ ও জাপানী বেশ্যা ছাড়া জাপানের আর কিছু কেহ জানিত না, সে জাপান আজ করে কি?"

আমি বলিলাম "সত্যই মহাশয়! হেমবাবু ত বলিয়াই গিয়াছেন, জাপান স্বাধীন ও প্রধান, কিন্তু তিনি বাঁচিয়া থাকিলে উহাদিগকে হয়ত আর অসভ্য বলিতে সাহসী হইতেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঠকগণের অবগতির জন্য বলা উচিত, তখনও পূরাদমে রুশ জাপানে যুদ্ধ চলিতেছে। যেখানে সেখানে সকলেরই মুখে, জাপানের অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয়ের কথা।

বস্তুতঃ রুশ জাপান যুদ্ধের পর হইতেই, জাপানের উন্নতি সহসা সমুদয় সভ্য জগতের এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ

* চৈতন্য লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে স্বর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত।

করিয়াছে, কিন্তু এ উন্নতির অর্থ, জাতীয় কবি হেম বাবু যাহা ধরিয়াছেন, তাহাই, অর্থাৎ প্রবল বিপক্ষ সহ সংঘর্ষে আসিয়াও, জাপানের স্বাধীনতা রক্ষার শক্তি। জাপানের অভ্যুদয় বলিলে লোকে ইহাই বুঝে। যদি দেশের লোকের দৃষ্টিতে দেখিতে হয়, তাহা হইলে জাপান কিরূপে এত প্রবল হইল, সেই আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হয়।

উক্তরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই, কিন্তু অন্য নানা দিকে আমাদের দৃষ্টি যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জাপান যে একটা প্রবল শক্তি-রূপে পরিণত হইয়াছে, রুশ জাপান যুদ্ধ হইতেই বুঝিতে পারি, কিন্তু জাপান যে পূর্ব্বে দুর্ব্বল ছিল, কে বলিল? জাপান যদি গ্রীসের ন্যায় স্বাধীনতা হারাইয়া পুনঃ স্বাধীন হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম, দুর্ব্বল জাপান প্রবল হইয়াছে, কিন্তু তাহাত নহে। জাপান চিরস্বাধীন। ইহার পূর্ব্বেও জাপান, কোরিয়া ও চীনকে হারাইয়াছে। বর্ত্তমান কালে রুশের ন্যায় সেকালেও কুচলয় খাঁ জাপান জয়ার্থ প্রায় ৩০০ পোত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ঘোর দুর্দ্দিনেও জাপান বিজয়-লাভে সমর্থ হইয়াছিল। চিরস্বাধীন জাপান, আত্মরক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত জাপান এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মাত্র প্রতীচ্য শক্তি সহ সমরে আপনাদের অসহায় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তদবধি সম্রাট হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই উহার প্রতীকারার্থ সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা পাইতেছেন। অতীত যুগে আমাদের নবাব মীরকাশেমও ইংরাজগণের সংসর্গে আসিবার পর মুঙ্গেরে কারখানা বসাইয়া এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমাদের দেশীয় অন্যান্য নরপতিবৃন্দও ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে সমর-কৌশল শিখিতেছিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ও ইংরাজের সতর্ক দৃষ্টিতে এ সম্বন্ধে আমাদের হীনতা বাড়িয়াই গেল।

বর্ত্তমান যুগে সামরিক বল বৃদ্ধির প্রয়াসী হইলেই, নানা দিকে বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রয়োজন হয়। বুয়রগণের ন্যায় জাপানীরাও বিদেশ হইতে অস্ত্র শস্ত্রাদি কিনিয়া দেশ বোঝাই করিতেছেন, কিন্তু উহাতেই উঁহারা তৃপ্ত নহেন, সঙ্গে সঙ্গে পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করিয়া নিজেরাই ঐ সমস্ত প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এই জন্য জাপান-সম্রাট বিদেশে শিক্ষার্থিগণকে পাঠাইয়া এবং বিদেশ হইতে শিক্ষক আনাইয়া দেশের উক্ত অভাব মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইহারই মধ্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কামান, বন্দুক, বারুদ, জাহাজ, রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি যুদ্ধে সিদ্ধিলাভার্থ যাহা কিছু প্রয়োজন, জাপানীরা অনেকটা নিজেরাই করিতেছে, কিন্তু এখনও বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত, কামান, টর্পেডো প্রভৃতির জন্য ইয়ুরোপ ও আমেরিকার মুখাপেক্ষী রহিয়াছে। এ সব বিষয়ে সিদ্ধকাম হইলেও, জাপানীরা সংকল্প করিয়াছে, অতঃপর উহারা সর্ব্বদেশে নব নব আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ রাখিবে। নিজেরা অহরহঃ উন্নতির চেষ্টাত পাইবেই, অধিকন্তু বিজ্ঞানের বরপুত্র ইয়ুরোপ ও আমেরিকা-বাসিগণের আনাচে কানাচে দিনরাত ঘুরিবে।

আবার অর্থবল না থাকিলে, বর্ত্তমান কালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই পাগলামি। জলের ন্যায় অর্থব্যয়ে শক্তি না থাকিলে, বর্ত্তমান যুগে সামরিক শক্তি মধ্যে পরিগণিত হওয়ার আশা বৃথা। সুতরাং দেশের দারিদ্র্য মোচন

অত্যাবশ্যক। দারিদ্র্য মোচনের অর্থ, দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। বিজ্ঞানচর্চ্চা ফলে, উক্ত উদ্দেশ্য সাধনেরই সহায়তা হয়। আমাদেরও সম্প্রতি এই দিকে নজর গিয়াছে, কিন্তু জাপানী ও আমাদের অবস্থার মধ্যে এ সম্বন্ধে একটু পার্থক্য আছে। এক রাজার অধীন হইলেও, ইংরাজ প্রজা ও ভারতপ্রজা এক বস্তু নহে। আমরা ভুলিয়া যাই, আমরা ইংরাজরাজের প্রজা নহি,ইংরাজ জাতির প্রজা. উঁহাদের প্রজাতন্ত্র-মূলক শাসন নীতি ফলে রাজা, প্রজা শক্তিরই নামান্তর মাত্র। আমরা বলিতে চাহি, রাজাই আমাদের প্রভু, ম্যাঞ্চেষ্টার আবার কে? একথা শুনিয়া রাজা হয় ত একটু হাসেন ও মনে মনে বলেন, সেরূপ হইলেত ভালই হইত, কিন্তু আমি বাপু কেহ নহি, তোমাদের ঐ ম্যাঞ্চেষ্টারই প্রকৃত প্রভু। জাপানের ন্যায় অভ্যুদয় সাধনে ইচ্ছা থাকিলে, আমাদিকে গুরুতর বিঘ্নরাশি দূর করিতে হইবে এবং স্বচেষ্টা বলেই তাহা করিতে হইবে। যদি কখন কৃতকার্য্য হই, এ সম্বন্ধে আমাদের কৃতিত্বও অধিক হইবে।

স্বদেশের উন্নতি সাধনে মন দিয়া জাপান আরও কতকগুলি কার্য্য করিয়াছেন। দেশময় শিক্ষা বিস্তার একটা দৃষ্টান্ত। এবিষয়ে জাপানীরা উঁহাদের গুরুদিগকেও প্রায় পরাস্ত করিয়াছেন। দেশের কল্যাণ চিন্তায় সর্ব্বসাধারণের যোগদান, দেশবাসিগণের মতামত লইয়া দেশ শাসন, এক কথায় প্রজা শক্তির বিকাশের উপর প্রতীচ্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। দেশময় এতদুপযোগী শিক্ষা বিস্তারই, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান এবং প্রথম সোপান। এ বিষয়ে আমরাও জাপানীদের অনুকরণ করিতে পারি। কিন্তু উঁহাদের অনুকরণে সামরিক শক্তি অর্জ্জন চেষ্টায় বড় সুবিধা দেখিনা। দেশে যখন অস্ত্রআইন প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তখন বুঝাই যাইতেছে, রাজা আমাদের এ বিষয়ে বিরোধী। তথাপি যদি সামরিক শক্তি বাড়াইবার প্রয়াস পাই, সে চেষ্টার পরিণামে একটা নিহিলিষ্ট ও আনার্কিষ্টদলের সৃষ্টি হইয়া দেশে অরাজকতা আনয়ন করিবে মাত্র।

সর্ব্ব সাধারণ মাঝে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা নূতন কাণ্ড করিয়া জাপান তাঁহার সমাজের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। জাতিভেদ ঘুচাইয়া রাজচক্ষে প্রজা মাত্রকেই সমান করিয়াছেন। জাপানে জাতিভেদ সত্যই ঘুচিয়াছে কি না, সন্দেহ করি। অন্ততঃ উঁহাদের সম্রাট্ সম্বন্ধে একথা খাটে না। সাধারণতন্ত্র-মূলক শাসন-নীতি-শাসিত দেশবাসিগণের ন্যায়, যে কোন জাপানী, অন্ততঃ দু দিনের তরেও রাজা বা প্রেসিডেণ্ট হইবার কল্পনা করিতে পারেন না। রাজপদ-প্রাপ্তি রাজবংশেই আবদ্ধ আছে। প্রজাকুল মধ্য হইতে জাতিভেদ ঘুচাইয়া জাপান সুখী হইয়াছেন কি না, জানি না, কিন্তু এই বহু ধর্ম্ম, বহু বর্ণ-সমন্বিত ভারতভূমে, উক্তবিধ সমাজ-সংস্কারের কল্পনাতেও আমরা আতঙ্কিত হই। এখানে বলা উচিত, বর্ত্তমান কালে জাতিভেদ ঘুচানের অর্থ, যাহার তাহার সহিত যে সে বস্তু আহার, যাহার তাহার সহিত বিবাহ, এবং কৌলিক আচারাদির (যথা ব্রাহ্মণ সন্তানের উপবীত গ্রহণ প্রভৃতির) পরিবর্জ্জন। দেশোন্নতি করিতে এরূপ জাতিভেদ ঘুচান আমরা অনাবশ্যক মনে করি, নতুবা জগতে জন্মিয়া সুখ ভোগে সকলেরই সমান অধিকার, এই ভাব বিস্তৃতি পক্ষে, এবং আত্ম সম্মান, জ্ঞানের বিকাশ ও পোষণ জন্য যতটুকু জাতি-

ভেদ ঘুচান আবশ্যক, তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করি। আত্ম মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলেই যে হৃদয় হইতে ভক্তি শ্রদ্ধার ভাবগুলি জলাঞ্জলি দিতে হইবে, অথবা অন্যকে আমাপেক্ষা হীন মনে করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

জাপান জাতিভেদ ঘুচাইয়াছেন, সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজাকেই সমর বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অধিকারী করিবার জন্য। বহুপূর্ব্ব হইতেই ইংরাজ আমাদিগকে এ অধিকার দিয়াছেন। হয়ত উহাতে আমাদের আশা মিটে নাই, হয়ত এ সম্বন্ধে মুসলমান আমলে আমাদের অবস্থা আরও ভাল ছিল, কিন্তু সে সব এখানে বিচার্য্য নহে।

আমরা দেখিলাম, জাপানের অভ্যুদয়ের অর্থ প্রধানতঃ উহার সামরিক বল বৃদ্ধি হইলেও, উহা এই কয়ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১ম। রাজনৈতিক, অর্থাৎ যেরূপে অন্য রাজগণ সহ সংসর্গে আসিয়া জাপানের স্বীয় শক্তিহীনতার উপর দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, ও তাহার প্রতীকার চেষ্টার ইতিহাস।

২য়। সামাজিক, অর্থাৎ উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রজাকুলকে উপযোগী করিবার চেষ্টা।

৩য়। ধন বৃদ্ধ্যর্থ এবং বিজ্ঞান চর্চ্চাফলে দেশের কৃষি শিল্পাদির উন্নতি।

৪র্থ। বাণিজ্য ফলে দেশের ধন বৃদ্ধি।

অতঃপর এইগুলিরই আমরা একটু বিস্তৃতভর ভাবে আলোচনায় চেষ্টা পাইব।

## জাপানের রাজনৈতিক অভ্যুদয়।

জাপান কি ছিল ও কি হইয়াছে, বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উহাদের দেশের ইতিহাসের একটু সংক্ষিপ্ত জ্ঞান প্রয়োজন।

জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট্ "মৎসুহিতো" ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে পঞ্চদশবর্ষমাত্র বয়সে রাজপদ লাভ করেন। তৎপূর্ব্বে তদ্বংশীয় ১২০ জন নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। প্রথম নরপতির নাম জিম্মু—রাজত্বকাল ৬৬০ খ্রীঃ পূঃ।

জাপানীদের ধারণা, আমাদের সূর্য্য বা চন্দ্রবংশীয় রাজপুত রাজগণের ন্যায় উঁহাদের সম্রাট্ বা মিকাডো দেববংশ সম্ভূত। মিকাডো কতক যোগী, কতক রাজা। সংসার ও সংসারীর চিন্তায় কালাতিপাত করা তাঁহার শোভা পায় না, তাই পূর্ব্বতন মিকাডোগণ নির্জ্জনে থাকিতেন, প্রজা সাধারণকে দর্শন দিতেন না। মিকাডো যাঁহাদিগকে অনুমতি দিতেন, তাঁহারাই তাঁহার নামে রাজ্য চালাইতেন। ফলে, মন্ত্রী ও সর্দ্দারগণই রাজ্যের প্রকৃত প্রভু ছিলেন। রাজা সম্মানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু রাজ্য মধ্যে তিনি যেন কতকটা সাক্ষী গোপাল। এভাব এখন নাই। একটা লক্ষণীয় বিষয় এই, একই রাজ্যে এইরূপ একাধিক রাজার প্রথা অন্য কোন কোন প্রাচ্য দেশেও দৃষ্ট হয়। ভুটিয়াদের ধর্ম্মরাজের সহকারী রূপে আবার একজন দেবরাজ আছেন, তিব্বতীয়গণেরও দলুই লামার ন্যায় তাসিলামা বা আর একজন বড় লামা আছেন, আর জাপানীদের মিকাডো ও শোগুণ ত আমাদের আলোচ্য। ধর্ম্মরাজ ও দলুই লামার ন্যায় মিকাডো এখনও প্রজাকুলের নিকট প্রায় দেব-পূজা প্রাপ্ত হন। ইহা কি কোন এক অতীতযুগে ঐ ঐ দেশ সহ জাপানের ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক? জাপান বড় হইতে চলিল, ঐ সব দেশ এখনও অন্ধকারে কেন? জাপানের ন্যায় উহারাও সহসা একদিন মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে কি?

জাপানে রাজার ছেলেই সকল সময় রাজা হন নাই। প্রাচীন কালে মন্ত্রিগণই অনেক সময় রাজ নির্ব্বাচন করিতেন এবং বরাবর রাজবংশ হইতেই কেহ না কেহ নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন।

বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে পুত্র বা স্ববংশীয় কাহাকেও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজকার্য্য হইতে স্বয়ং অবসর গ্রহণ, পূর্ব্বতন মিকাডোগণের আর এক রীতি ছিল। (ইহা কি ভারতীয় প্রভাব? দশরথ কর্ত্তৃক রামের রাজ্যাভিষেক তুলনীয়)। জাপানে কখন কখন দু-তিনজন অবধি পুরাতন সম্রাট্ জীবিত ছিলেন। নূতন সম্রাটের রাজ্যশাসনের ইঁহারা যে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিতেন, সহজেই বুঝা যায়। যাহা হউক, ইক্ষাকুবংশীয় নরপতিগণের চরিত্রবর্ণন উপলক্ষে কালিদাসের "বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাম্ যোগেনান্তে তনুত্যজাম্" শ্লোকটী জাপানের পুরাতন মিকাডোগণের প্রতিও কতকটা প্রযুক্ত হইতে পারে।

জাপানে, বোধ হয়, কালে এই প্রথার বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে যেমন শুনা যায়, মগমাত্রকেই কিছু দিনের জন্য ব্রহ্মচারী হইতে হয়, তদ্রূপ বোধ হয় রাজ্যত্যাগ করাও একটা ফ্যাসন বা রীতি হইয়া পড়িয়াছিল। একজন সম্রাট্ নবম বর্ষে রাজ্য গ্রহণ করিয়া ষড়বিংশবর্ষ বয়সে রাজপদ ত্যাগ করেন। আর একজনের রাজ্যকাল ৫ম হইতে বিংশবর্ষ পর্য্যন্ত। তৃতীয় একজনের রাজপদ প্রাপ্তি দ্বিতীয়বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এবং ত্যাগ কাল চতুর্থ বর্ষে। এই সব কি ভগবান্ বুদ্ধদেবের রাজ্যত্যাগের অনুকরণে করা হইত? কে বলিবে? প্রধান পুরুষগণের দুষ্টামিও ইহার একটা কারণ হইতে পারে। তির্ব্বতের দলুই লামাও, প্রায়ই অল্প বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়া নবদেহ ধারণ করেন।

আপাততঃ আমরা রাজাকে ছাড়িয়া মন্ত্রী বা রাজপুরুষগণের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। প্রাচীন জাপানের ইতিহাসে রাজার তেমন স্থান নাই।

প্রাচীনতম মন্ত্রিবংশ "ফুজিবারা"। ১১৫৬ খ্রীঃ অব্দে ইঁহাদের পতন এবং অল্প দিনের জন্য "কিয়োমরি" বংশের মন্ত্রিপদ প্রাপ্তি ঘটে। ১১৯২ খ্রীঃ অব্দে ইঁহাদেরও পতন এবং "মিনা মোটো" বংশের অভ্যুত্থান হয়। এই বংশীয় "ইয়োরিটোমোই" প্রথম "শোগুণ" উপাধিতে ভূষিত হন। জাপানের ইতিহাসে শোগুণ বংশের নাম প্রসিদ্ধ। সুদীর্ঘ কাল ইঁহারাই জাপানের কার্য্যতঃ প্রভু ছিলেন। যাহা হউক, রাজার অনুকরণে, কালে এই শোগুণ বংশেরও সহকারীরূপে অন্য এক বংশের অভ্যুত্থান ঘটিল। তাহাদের নামে "হোজো" বংশ। জাপানের শাসন শক্তি ক্রমশঃ এইরূপে হস্ত হইতে হস্তান্তরে আসিতে থাকে। ১২৫৬ খ্রীঃ অব্দে এমনই ঘটিল যে, হোজো বংশীয় জনৈক শিশুর শিক্ষকই রাজ্যের কর্ত্তা বলিলে চলিত। একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই, যিনি কোনরূপে একবার রাজ্যশাসনের অধিকার পাইতেন, সে অধিকারে তাঁহার বংশও অধিকারী হইত, কিন্তু শাসনশক্তি হস্তগত করিয়া নূতন প্রভু পূর্ব্ব প্রভুর উচ্ছেদে প্রয়াসী হইতেন না, তাঁহাকে শক্তি না হউক, সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হোজো বংশ, শোগুণ বংশের বিনাশে, বা শোগুণ বংশ রাজবংশের বিনাশে চেষ্টা পায় নাই।

হোজোবংশীয়গণের পূর্ণ প্রতাপকালে, মোঙ্গলীয়গণ জাপান আক্রমণে প্রয়াস পায়। কুচলয় খাঁ জাপান জয়ার্থ ৩০০ পোত প্রেরণ

করেন। দৈব কৃপায় প্রবল ঝটিকা উঠায় জাপানের বিস্তর সুবিধা হয় এবং বর্ত্তমান কালে টোগোর ন্যায়, সে কালের হোজাবংশীয় জাপবীরও কুচলয় খাঁর সৈন্য ও লোক বিধ্বস্ত করিয়া যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করেন।

১৩৩৩ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ গোডাইগোর হৃদয়ে বাসনা হইল, অন্যের হস্তে আর তিনি ক্রীড়াপুত্তলী থাকিবেন না। নামে রাজা না হইয়া অতঃপর কার্য্যেও রাজা হইবেন। কতকগুলি সহৃদয় বন্ধুবর্গ সাহায্যে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্যও হইলেন, এবং প্রজাকুলও এ পরিবর্ত্তনে সন্তোষ লাভই করিল, তথাপি ইহা স্থায়ী হইতে পারিল না। গোডাইগো কিরূপে তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ অনুচর "আশিকাগা টাকাউজি"কে চটাইয়া দেন। রাজা ও তাঁহার শক্তিশালী অনুচরে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে রাজাই পরাস্ত হইলেন। দক্ষিণে পলায়ন করিয়া "ইওশিনো" অঞ্চলে তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। বিজয়ী রাজানুচর তাঁহার পূর্ব্ব প্রভুকে আর অধিক নিগৃহীত করিলেন না। ১৩৩৬ খ্রীঃ অব্দে নূতন এক সম্রাট্ নির্ব্বাচিত করিয়া তিনি স্বয়ং শোগুণ মাত্র হইলেন। জাপান ইতিহাসের এবং জাপানী চরিত্রের এই এক বিশেষত্ব। সমর্থ হইলেও, রাজপদ অধিকার জন্য কেহ প্রয়াসী হন নাই। ইহার কারণ কি? জাপানী রাজকার্য্যে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকিতেন, সেই জন্য কি? আমাদের সন্দেহ হয়, আরও একটা কারণ আছে। ভারতবাসিগণের ন্যায় জাপানীরাও হয় ত জন্মানুসারে বৃত্তিভেদের ভাবে অনুপ্রাণিত, অন্ততঃ এক সময়ে হয় ত সেরূপ ছিলেন। চতুর্ব্বর্ণাত্মক আর্য্য সমাজে ক্ষত্রিয়গণই রাজ পদবী লাভের একমাত্র অধিকারী বিবেচিত হয়। পরশুরাম ও বিশ্বামিত্র, রাজ্য পাইয়াও রাজা হন নাই। যাহা হউক, ভারতীয় সমাজ এখন আর শুধুই চতুর্ব্বর্ণাত্মক নহে, অন্য বহু সমাজ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। জগতের মধ্যে জাপানই বোধ হয় একটীমাত্র দেশ, যথায় শুধু একটী রাজবংশ রাজপদ লাভের অধিকারী বিবেচিত হয়। এ ভাবটা কি স্থায়ী হইবে?

আশিকাগা টাকাউজির বিদ্রোহ ফলে একই দেশে দুই জন নরপতির প্রতিষ্ঠা হইল। ১৩৯২ খ্রীঃ অব্দে যিনি শোগুণ ছিলেন, তিনি গোডাইগো বংশীয় নরপতিকে দেশের মুখ চাহিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণে এবং অপর নরপতির হস্তে স্বেচ্ছায় স্বীয়রাজ্য সমর্পণে সম্মত করিলেন। এইরূপে দুইজন রাজার পরিবর্ত্তে জাপানে পুনরায় একজন মাত্র রাজা হইলেন। অন্য দেশ হইলে এইরূপ স্থলে সম্ভবতঃ "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" নীতির আশ্রয় বিনা কে রাজা হইবে, স্থির হইত না। যাহা হউক, এই সব দৃষ্টান্ত ফলে অথবা জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব গুণে, দেশের কল্যাণার্থ আত্মত্যাগ জাপানী চরিত্রে বড়ই পরিস্ফুট। উত্তরকালে আমরা ইহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব।

আশিকাগা শোগুণ বংশীয়গণ সুদীর্ঘকাল জাপানে প্রভুশক্তি চালনা করেন (১৩৩৪—১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত)।

যাহা হউক, সর্ব্বত্রই যেমন ঘটিয়া থাকে, কালবশে আশিকাগা শোগুণগণও শক্তিহীন হইলেন। বঙ্গের দ্বাদশভৌমিকগণের অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী বা ব্যারণগণ মাথা তুলিলেন। ইঁহারা স্বাধীনবৎ রাজ্য শাসনে এবং পরস্পরের শক্তির সঙ্কোচ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশে সৈনিকগণের ও কলহপ্রিয়

ব্যক্তিগণের প্রভুত্ব বাড়িয়া গেল। শান্তিপ্রিয় সাধারণ লোকের কষ্টের অবধি রহিল না। জলদস্যুগণের অত্যাচারে সমুদ্র পথ অগম্যপ্রায় হইল। দেশব্যাপী দারিদ্র্যের এতটা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, অর্থাভাবে জনৈক সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চল্লিশ দিন স্থগিত ছিল। আমাদের দেশে যে সময় চটা পাখীতে ধান খাইয়া গেলে খাজনা দিবার চিন্তায় গ্রাম্য গীতি রচিত হইয়াছিল, যে সময় অনেক গৃহে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে লুকাইবার জন্য চোরা কুটুরি বা গুপ্তকক্ষ নির্ম্মিত করিতে হইত, যে সময় জমিদারগণ অনেকেই কার্য্যতঃ দস্যুপতি ছিলেন, যে সময় ধনিগণ অন্য গ্রামের দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজ গ্রামের দস্যুগণকে স্বেচ্ছায় অর্থ দিয়া পালন করিতেন, দূরদেশে গমনকালে যে সময় লোকে ঘরে ফিরিবার আর বড় আশা রাখিত না, সেই সময়কার অবস্থার সহিত জাপান ইতিহাসের এই সময়কার অবস্থার সাদৃশ্য আছে। অরাজকতার সময় সর্ব্বদেশের ইতিহাসেই এইরূপ সময়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সেই অবস্থা অন্য দেশগুলা কাটাইয়া উঠিল কিরূপে, তাহাই আমাদের লক্ষ্যণীয়। আমাদের নিজদেশ সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি, প্রতীচ্যখণ্ড হইতে সমরনিপুণ মহা কৌশলী বৈদেশিক জাতি আসিয়া আমাদেরই সাহায্যে আমাদের পরস্পরের শক্তি খর্ব্ব করিয়া দেশের রাজশক্তি স্বহস্তে গ্রহণে এবং দেশ মধ্যে শান্তি সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছেন। শান্তিভিখারী আমরা কি মূল্যে শান্তি ক্রয় করিয়াছি এবং আমাদের দেশের অরাজকতা যুগের শোচনীয় পরিণাম আমরা ভালরূপ বিদিত আছি। দেখা যাউক, জাপান ঐ অবস্থা কাটাইয়া উঠিল কিরূপে।

পাঠকগণের একটা কথা স্মরণ রাখা মন্দ নহে। অরাজকতা যুগের ভীষণ-চিত্র স্মরণে আমাদের রক্ত এখনও জল হইয়া যায় বটে, কিন্তু কি এদেশে কি জাপানে, অথবা অন্য যে কোনও দেশে, ঐ সময়টা প্রকৃতিপুঞ্জ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করে, ভাবিলে ভুল করা হইবে। ঐ সময়ে লোকের অবস্থা দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল হয় মাত্র। আজ যে অত্যাচারী, কাল সে নিগৃহীত, আজ যে ধনী কাল সে নির্ধন, কিছুদিনের তরে দেশের এক স্থানে সুখ-সৌভাগ্য-বৃদ্ধি, আবার দুদিন পরেই তাহা অন্তর্হিত, এইরূপ অবস্থা আসে। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতির যত্নে বঙ্গের একাংশে যে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হইল, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। কমলা চঞ্চলা হন বটে, কিন্ত এখানে সেখানে তাঁহার কৃপাদৃষ্টিপাতের ব্যাঘাত হয় না। জাপানেরও উক্ত অবস্থা ঘটিয়াছিল। অরাজক যুগের মাঝেও কিছুদিনের জন্য প্রতাপশালী দু এক জন ভূস্বামী দেখা দিয়া যথা সম্ভব দেশে শান্তি সংস্থাপন এবং শিল্প বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হন।

আমাদের দেশের ন্যায় জাপানেও এই সময় ইয়ুরোপীয়গণের প্রথম শুভাগমন হয়। ভারত আবিষ্কারের ন্যায় স্পেন ও পোর্ত্তুগালবাসীরাই এ কার্য্যে অগ্রণী। ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে মেণ্ডেজ পিণ্টো, জাপানবাসিগণের সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বন্দুক ও বারুদের ব্যবহার শিক্ষা দেন। আগ্নেয়াস্ত্রের সহিত এইরূপে পরিচিত হইয়া জাপানের কুশলী শিল্পীকুল পাঁচ মাসের মধ্যে ছয় শত বন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। আমাদের কিন্তু এ বর্ণনা প্রকৃত কিনা, একটু সন্দেহ

হয়। ভারতের লোক বহু পূর্ব্ব হইতেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ পরিচিত ছিল, চীনদেশেও বারুদের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল না। ঘরের পাশে থাকা সত্বেও জাপানীরা যে আমেরিক ইণ্ডিয়ানগণের ন্যায় বন্দুকের ব্যবহারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল এবং সেইরূপ থাকা সত্বেও যে আমেরিকা গ্রাসকারী জাতির হস্তে রক্ষা পাইয়াছিল, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এরূপও হইতে পারে, মেণ্ডেজ পিণ্টো জাপানিগণকে তখনকার দিনের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বন্দুক নির্ম্মাণ প্রণালী শিখাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যগণ এখনও প্রতীচ্যগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। যাহা হউক, সত্যই যদি জাপানিগণ, আপনাদের সদয় ব্যবহারের গুণে, পিণ্টো মহোদয়ের হৃদয় আকর্ষণে সক্ষম হইয়া ঐরূপে আগ্নেয়াস্ত্র সহ প্রথম পরিচিত হয়েন, তাহা হইলে উঁহাদের ইতিহাসে ইহা একটী অতীব স্মরণীয় ঘটনা। আত্মরক্ষায় শক্তিলাভ ব্যতীত রাজনৈতিক উন্নতি অসম্ভব এবং বর্ত্তমান যুগে আগ্নেয়াস্ত্রই আত্মরক্ষার ও শত্রুপীড়নের সর্ব্ব প্রধান সহায়। জাপানের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের এই দিন হইতে সূত্রপাত বলা যায়। এখানে আরও একটী লক্ষণীয় বিষয় আছে। ভারত যেমন কোথাও বা অধিক শুল্কের লোভে, কোথাও বা বৈদেশিকের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া বা ঐরূপ অন্যান্য কারণে বৈদেশিক সহ সম্পর্ক পাতাইতে অগ্রসর হইয়াছে, জাপান প্রধানতঃ স্বীয়-সামরিক শক্তির উৎকর্ষ-সাধন লক্ষ্য রাখিয়াই সেরূপ করিয়াছে। যে কোন ইয়ুরোপীয় জাতি উঁহাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করিয়াছে, তাঁহারাই জাপ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নানা আদর ও অধিকার পাইয়াছেন। আমরা পরে ইহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাইব। এখনও জাপানে এই নীতি অবলম্বিত, বলা চলে। ভারতীয় রাজগণও এই নীতির অনুসরণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হন নাই। একটী অতি প্রবল সতর্ক দৃষ্টি ইয়ুরোপীয় শক্তির নিতান্ত সন্নিধানে বাস এবং অন্য ইয়ুরোপীয় শক্তি নিচয়ের সহিত সংস্রবে আসার অসুবিধা, এই দুইটা গুরুতর বাধা জাপ গবর্ণমেণ্টের উন্নতির পথে কণ্টক হয় নাই। নতুবা গুর্খা, তিব্বতী, কাবুলী, আফ্রিদী, শিখ ও রাজপুতগণও সাহস ও সমরপ্রিয়তায় জাপানী অপেক্ষা অধিক ন্যূন নহে। উৎকৃষ্ট বন্দুক সংগ্রহ জন্য কত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া আফ্রিদীরা ইংরাজ শিবিরে চুরি করিতে আইসে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিব্বতীয়েরা ও কাবুলীরা রুশের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছে কি না পাতাইয়াছে, অমনই সতর্ক ইংরাজ বাধা দিতে যান। ইংরাজেরা ভারতে থাকিয়া ঐ সব দেশ সম্বন্ধে যেরূপ করিতেছেন, তুরস্কের নিকটে থাকিয়া রুশ যাহা করিতেছেন, পাছে রুশ জাপানের গৃহদ্বারে আড্ডা গাড়িয়া জাপানেরও সেই দশা করেন, এই ভয়ে কোরিয়ায় আসিতে না আসিতেই জাপান রুশকে তাড়াইয়া দিলেন। ফলতঃ রুশ-জাপান যুদ্ধের ইহাই প্রধান কারণ। আমাদের আশঙ্কা হয়, জাপানের নব অভ্যুদয় দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া পাছে প্রতীচ্য রাজগণ আপনাদের মাঝে দল বাঁধেন এবং জাপানকে কোন রূপে সাহায্য করিতে নিরস্ত হন। আশার কথা এই, উঁহারা পরস্পরকে এরূপ সন্দেহ চক্ষে নিরীক্ষণ করেন যে, প্রাচ্যের সর্ব্বনাশ সাধন জন্য সহসা যে ওরূপ দল বাঁধিতে পারিবেন, মনে হয় না।

১৫৪৭ খ্রীঃ অব্দে পিণ্টো মহোদয় দ্বিতীয় বার জাপান গমন করেন। এইবার প্রত্যাগমন কালে তিনি দুই জন জাপানীকে সঙ্গে লইয়া আসেন। এই দুইজন জাপানী, খ্রীষ্টধর্ম্মাশ্রয়ী মহাত্মা জেভিয়র কর্ত্তৃক, আমাদের এই ভারতেরই গোয়ানগরীতে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। জেভিয়ার ঐ জাপানী দুই জনকে লইয়া ১৫৪৯ খ্রীঃ অব্দে জাপান গমন করিলেন এবং দুই বৎসর ধরিয়া নানা স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলেন, কিন্তু তাদৃশ ফললাভে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক, ১৫৫১ খ্রীঃ জেভিয়র জাপান হইতে চলিয়া আসিলে খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটিতে আরম্ভ হইল। পর্ত্তুগিস ও স্পানিশ মিশনরিগণ দলে দলে জাপানে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ইহাঁরা একজন উচ্চপদস্থ জাপানী পুরুষকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সফলকাম হইলেন। এই বার জাপানে খ্রীষ্টিয়ান হইবার ঘটা পড়িয়া গেল। বৌদ্ধ আশ্রমগুলি নষ্ট করিয়া গির্জ্জা সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। আমাদের দেশে খ্রীষ্টিয়ান হইবার জন্য তেমন আগ্রহ কোন কালে হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান না ঘটিলে কি হইত, বলা যায় না। যাহা হউক, দিনকত যেমন আমরা হেয়ার, ডিরোজিও প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আপনহারা হইয়াছিলাম এবং যে ভাবটা এখন অতিধীরে কাটাইয়া উঠিতেছি মাত্র, জাপানীরাও মিশনরি গুরুগণের চরণে আত্মসমর্পণে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু মিশনরি গুরুগণের নিজেদের দোষে অথবা বিধাতার ইচ্ছায় ভারতের ন্যায় জাপানেও শীঘ্রই খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রমাভ্যুদয়ে ব্যাঘাত ঘটিল।

জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সময় আবার দৃষ্টি প্রয়োজন। আশিকাগা শোগুণ বংশীয়গণের মধ্যে, একবার কে শোগুণ হইবে, মীমাংসা জন্য গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইলে, "ওটা নোবুঙ্গা" নামক জনৈক সমরকুশল জাপানী সামন্ত একজনের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক সমরে জয়ী হন। নূতন শোগুণ কিন্তু পুত্তলিকাবৎ ইহাঁর হস্তচালিত হইতে অসম্মতির চিহ্ন দেখাইলে, ইনি আবার তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়া শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। শোগুণ উপাধি গ্রহণ না করিয়া ইনি সম্রাটের নিকট হইতে "নাই দাই জিন" নামে নূতন উপাধি গ্রহণ করেন। আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতেছি, জাপান ইতিহাসে এই এক বিচিত্র ব্যাপার। শাসন শক্তি গ্রহণ জন্য অনেকেই লোলুপ কিন্তু পূর্ব্ব প্রভুর উপাধি হরণে কেহই ব্যগ্র নহেন। এ রহস্য আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। হয় ত কৌলীন্য প্রথার ন্যায় ঐ সমস্ত উপাধি বংশগত। বংশে না জন্মিলে উপাধিতে অধিকার নাই। মিকাডো তাই শক্তিশালী হউন বা নাই হউন, তদ্বংশীয়দের মধ্য হইতেই একজন মিকাডো হইবেন। শোগুণদের সম্বন্ধেও এই ভাব দৃষ্ট হয়। অথবা ইহাঁদের এই গৃহবিবাদ রাজপুতগণের গৃহবিবাদ সহ তুলিত হইতে পারে।

যাহা হউক, নোবুঙ্গা মিশনরিভক্ত ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর অনুরাগ জন্য ততটা নহে, যতটা বৌদ্ধ পুরোহিতগণের উপর আক্রোশ বশতঃ। কারণ বৌদ্ধ পুরোহিতগণ শোগুণের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। কোন যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় নোবুঙ্গা হারাকিরি ব্রত পালন করিয়া অর্থাৎ স্বহস্তে উদর বিদীর্ণ করিয়া দেহপাত করিলেন, (১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে)। খ্রীষ্টিয়ানগণ

এইরূপে তাঁহাদের একজন প্রবল প্রতাপ-শালী স্বপক্ষীয় বীরপুরুষকে হারাইলেন।

নোবুঙ্গার পর তাঁহারই একজন সেনা-পতি, আসরে দেখা দিলেন। ইহাঁর নাম "টয়োটোমি হিদিয়োশী। সম্রাটের নিকট হইতে ইনি "কোয়াম্পাকু" উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং সমুদয় বিরোধী দলকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, নামে না হউক, কার্য্যে শোগুণের স্থান অধিকার করিলেন। ইহাঁর সময় হইতে খ্রীষ্টিয়ানগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল এবং সে অত্যাচারের কারণও অপূর্ব্ব।

মিশনরিগণ সৌভাগ্যগর্ব্বে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যথেষ্ট অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং পরধর্ম্মাবলম্বিগণকে নানারূপে নিগৃহীত করিবার জন্য উচ্চপদস্থ স্বীয় শিষ্যগণকে সর্ব্বদা উত্তেজিত করিতেন। এই সব কারণে শিন্টো ও বৌদ্ধ প্রজাগণের উঁহাদের উপর বিরাগ হওয়া স্বাভাবিক। এই সময় ইহার উপর একটী ঘটনা ঘটিয়া গেল পোর্ত্তুগালবাসী জনৈক পোতাধ্যক্ষ কথা প্রসঙ্গে একবার বলিয়া বসেন "উহাঁদের রাজা কোন নূতন দেশে প্রথমে মিশনরিদের পাঠা-ইয়া দেন। মিশনরিরা যাইয়া তদ্দেশবাসী কতকগুলা লোককে স্বদলভুক্ত করেন। রাজা তারপর সৈন্য পাঠাইয়া এই সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের রক্ষক ও সহায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হন। দেশের লোকের সাহায্য পাইয়া তিনি এইরূপে অতি সহজে অন্য দেশ জয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন।" কথা শুনিয়া জাপানীদের ত চক্ষুঃ স্থির। ভারত অন্যান্য দেশের অবস্থা আলোচনা করিয়া উহাঁদের হৃদয়ে দারুণ সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। স্বদেশপ্রীতি জাপানী-দের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত। হিদিয়োশী অন্য দেশ সহ সম্পর্ক ত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না। বৈদেশিক বাণিজ্য মন্দ ব্যাপার নহে, কিন্তু ভয়াবহ বৈদেশিক রাজ-নীতি হইতে রক্ষার উপায় কি? বৈদেশিক রাজনীতির সূত্রপাত বৈদেশিক ধর্ম্মের প্রচ-লনে, অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক আদেশ বাহির করিলেন, সমুদয় পরধর্ম্ম-প্রচারকগণকে ২০ দিনের মধ্যে জাপান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, (১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দ)। এ আদেশ সম্ভবতঃ কার্য্যে প্রতি-পালনের চেষ্টা হইত না, কিন্তু মিশনরিগণের উদ্ধত ব্যবহার না কমায়, চারি বৎসর পরে (১৫৯১ খ্রীঃ অব্দে) বক্সার বিদ্রোহের ন্যায় বিপ্লব ঘটিয়া প্রায় ২০০০০ বিশ হাজারেরও অধিক খ্রীষ্ট শিষ্যের প্রাণ হানি হইল। দুই বৎসর পরে (১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে) পুনরায় নয়জন বৈদেশিক খ্রীষ্টিয়ানকে নাগাসাকি নগরে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করা হয়। খ্রীষ্টিয়ান-গণের উপর অত্যাচার ইহার পরে আরও ভীষণাকার ধারণ করে, সে কথা যথাস্থলে উল্লেখনীয়।

এইখানে একটী বিষয় আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। যে খ্রীষ্টিয়ানগণের উপর অত্যাচার ফলে, মধ্যযুগে সমস্ত ইয়ুরোপ মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রুশেড যুদ্ধের অবতারণা করে, যে একই কারণে উহাঁরা গত বক্সার বিপ্লবের সময় চীনাদিগকে জব্দ করিতে একত্র হইয়াছিলেন, জাপানে সেই একই কারণ উপস্থিত হইলে উহাঁরা নীরব রহিলেন কেন? শুধু নীরব নহে, আমরা পরে দেখিব, একটুখানি বাণিজ্যাধিকার বিস্তৃ-তির লোভে বা অন্য অব্যক্ত কারণে কেহ কেহ একার্য্যে জাপ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য অবধি করিয়াছিলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথ-লিক খ্রীষ্টিয়ানগণের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষ কি

ইহার কারণ? যাহাই হউক, এই সময় ইয়ুরোপের হাতে লাঞ্ছিত হইলেও, জাপানের অভ্যুদয় সম্ভবতঃ স্থগিত হইত না। রিভিউ অব্ রিভিউ পত্রের সম্পাদক মহাত্মা ষ্টেড্ সাহেব দেখাইয়াছেন, অতি ধীরে প্রাচ্য-ভূমি বল সংগ্রহ করিতেছে। এ বল পরীক্ষার দিন কবে আগত হইবে, কেহ জানে না, কিন্তু উহাকে পীতাতঙ্ক নাম দিয়া উহাঁরা এখনই ইচ্ছা করিয়া সময়ে সময়ে কাল্পনিক ভয়ে অভিভূত হন। চীনদেশ সহ প্রথম যুদ্ধ কালে ইংরাজের এক দল মাত্র সৈন্য বিজয় লাভে সমর্থ হয়। কিছুকাল পরে ফরাসীর সহিত বিবাদ হইলে, ফরাসীও তাহাতে অসুবিধাই বোধ করে। তারপর গত বক্সার বিদ্রোহ কালে সমগ্র ইয়ুরোপের শক্তি সমবেত করিতে, এবং লক্ষাধিক সৈন্যও বহু রণপোতের প্রয়োজন হয়। দেখা গেল, বরাবার পরাজয় সত্বেও চীনের সাময়িক বল ক্রমশঃ বাড়িতেছে। জাপান সম্বন্ধেও এই কথা। খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অত্যাচার কালে না হইলেও, ইহার পরে প্রতীচ্য হস্তে জাপানকে অশেষ লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে, আর আজ জাপান, অন্ততঃ একটী প্রতীচ্য শক্তিকে কি লাঞ্ছিতই না করিল।

হিদিয়োশীর শাসন কালেই জাপান স্বদেশের বাহিরে বিদেশ সহ বল পরীক্ষায় প্রথম প্রবৃত্ত হন। এখনকার ন্যায় তখনও ঘরের পাশের ঐ কোরিয়াই, জাপানের বল পরীক্ষার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। সেবারকার আয়োজনও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। দুইজন সেনাপতির অধীন (ইহাঁদের মধ্যে একজন খ্রীষ্টিয়ান) তিন লক্ষ জাপানী সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় কোরিয়া সমাচ্ছন্ন করিল। দুর্ব্বল কোরিয়া রাজ রাজ্যত্যাগ করিয়া চীনদেশে পলাইয়া চীন সম্রাটের আশ্রায় ভিক্ষা করিলেন। চীন সম্রাট্ও সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হন নাই, কিন্তু জাপানীদের হস্তে চীনাদেরও পরাজয় ঘটিল। বিজয়ী জাপানীরা অনন্তর সন্ধি করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেল। সন্ধির মধ্যে একটা সর্ত্ত এই ছিল, চীন সম্রাট্ জনৈক উচ্চপদস্থ বৌদ্ধ পুরোহিতকে জাপানে হিদিয়োশীর অভিষেকার্থ প্রেরণ করিবেন। এই অভিষেক ব্যাপারই কাল হইল। অভিষেক পত্রে এরূপ কতকগুলি কথা লিখিত ছিল, যাহাতে হিদিয়োশী মর্ম্মে মর্ম্মে চটিয়া যান এবং পুনরায় কোরিয়া ও চীন আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন। সেই সেনাপতি, সেই সৈন্য, কিন্তু এবার ফল ভিন্নরূপ হইল। জাপানী সৈন্যের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। মনোভঙ্গ জন্য হিদিয়োশী ১৫৯৮ খ্রীঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করিলেন।

হিদিয়োশীর দেহ ত্যাগের পর তৎপক্ষীয় সুদক্ষ বীরপুরুষ ইয়াসু স্বহস্তে শাসনভার লইয়া সৈন্যগণকে জাপানে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। এদিকে কিন্তু জাপানে আবার গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। একপক্ষ পূর্ব্ব প্রভু হিদিয়োশীর পুত্র হিদিয়োরীর পক্ষে, দ্বিতীয় দল ইয়াসুর দিকে। প্রথম দলের বিবেচনায় হিদিয়োরীর উপর ইয়াসু সদ্ব্যবহার করেন নাই এবং নিজ হস্তে প্রভুত্ব লইতে তাঁহার অভিলাস। উভয় দলে বহু বহু প্রসিদ্ধ সেনানী যোগ দেন। যুদ্ধে ইয়াসুই জয়ী হন। অনন্তর ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে সম্রাটের নিকট হইতে ইনি শোগুণ উপাধি লাভ করেন। মিনামোটো বংশে জন্ম হেতু শোগুণ হইতে ইঁহার বাধা ছিল না। এই মিনামোটো বংশেই প্রথম শোগুণ উপাধি প্রদত্ত হয় এবং এখন হইতে এই বংশীয়গণই বরাবর শোগুণ

পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহা হউক, কাল চক্রে প্রকৃত শক্তিশালী ব্যক্তিই শোগুণ হইলেন। নামে শোগুণ, কার্য্যে শক্তিহীন হইয়া আর বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল না। এই বংশীয় শেষ শোগুণ "যোশীনোবু" ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে স্বেচ্ছায় বর্ত্তমান সম্রাটের হস্তে রাজশক্তি প্রত্যর্পণ করেন, আর ইহাঁরই পূর্ব্ব পুরুষ ইয়াসু অত কষ্টের পর শোগুণ হইয়া, দুই বৎসর পরেই যখন তাঁহার প্রতাপ-সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে অবস্থিত স্বেচ্ছায় পুত্র হস্তে শাসন ভার দিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি প্রাচীন ভারতের ন্যায় জাপানীদেরও আদর্শ। কবে আমরা আমাদের ভারত তপোবনে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" রীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইব।

হিদিয়োশীর ন্যায় ইয়াসুরও ধারণা ছিল, খ্রীষ্টিয়ানগণের হস্তে জাপানের বিপদ সম্ভাবনা, তজ্জন্য তিনি নানারূপে ইহার দমন জন্য চেষ্টা পান। ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে প্রজাগণকে খ্রীষ্টিয়ান হইতে নিষেধ করিয়া এক আদেশ বাহির হইল। ১৬১১ খ্রীঃ অব্দে সমগ্র দেশ মধ্যে দুইটী মাত্র স্থানে খ্রীষ্টিয়ানগণকে বাসার্থ অনুমতি দেওয়া হয়। জাপনী খ্রীষ্টিয়ানগণ যাহাতে খ্রীষ্টাশ্রয় ত্যাগ করে, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা পাইতে একটা স্বতন্ত্র রাজপদ অবধি স্থাপিত হইল। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। জাপানীরা "শিশোকো" নাম দিয়া ইঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করেন।

• ইয়াসুর মৃত্যুর সঙ্গে কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণের উপর নির্য্যাতন বন্ধ হইল না। নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে উঁহাদিগকে নিহত করা হইতে লাগিল। তাহাদেরও পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিয়া, কাহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃষভ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট ও দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া, কাহারও নখ মধ্যে সূচি প্রবিষ্ট করিয়া, কাহাকেও বা পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া ও পিঞ্জর বাহিরে প্রচুর খাদ্য রাখিয়া অনশনে মারিয়া ফেলা হইতে লাগিল। এরূপ স্থলে যেমন হইয়া থাকে, এক দিকে যেমন অত্যাচার বাড়িতে লাগিল, লোকেও তেমনি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। স্ত্রীলোক ও বালক অবধি মৃত্যুকে আলিঙ্গন জন্য ব্যগ্র হইল। ১৬২৯ খ্রীঃ অব্দে একজন শাসনকর্ত্তা খ্রীষ্টিয়ানগণের সমূলোৎপাটন জন্য অবশেষে প্রতিগৃহে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে হতাবশিষ্ট খ্রীষ্টিয়ানগণ মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন এবং একটী দুর্গ হস্তগত করিয়া তন্মধ্যে ১২০ দিন আত্মরক্ষার পর সকলেই নিহত হইলেন। এই বিদ্রোহ প্রশমনে ওলন্দাজগণ কামান দিয়া জাপ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য খ্রীষ্টিয়ানগণের উহাঁরা নিন্দাভাজন হইয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপে রক্তের নদী বহাইয়া জাপ-গবর্ণমেণ্ট, সত্য হউক কাল্পনিক হউক, খ্রীষ্টিয়ান বিভীষিকার হাত এড়াইলেন। বহু বর্ষ পরে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মতের প্রতিষ্ঠা হইলে, জাপানে খ্রীষ্টধর্ম্ম আবার স্থান পায়। বর্ত্তমান কালে জাপানে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা প্রায় ১২০০০০ এক লক্ষ কুড়ি হাজার।

ভারতে যেমন ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পোর্ত্তুগিস প্রভৃতি বহুজাতি সকলেই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়া একমাত্র ইংরাজ ব্যতীত অপর সকলে ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়াছেন, জাপানেও তদ্রূপ পোর্ত্তুগিস, ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি বহুজাতি আধিপত্য

লাভে প্রয়াস পান। সর্ব্বপ্রথম পোর্ত্তুগিসেরা প্রধানতঃ ধর্ম্মব্যপদেশে প্রবেশ লাভ করেন। অনন্তর ওলন্দাজগণ উপস্থিত হইলেন। জাপ গবর্ণমেণ্টের শক্তি-বর্দ্ধনে যাঁহারা সহায়তা করেন, তাঁহারাই জাপানে আদর পান। প্রথমে আমরা দেখিয়াছি, একজন পোর্ত্তুগিস জাপানিগণকে বন্দুক বারুদের শিক্ষা দেন। ওলন্দাজগণ জাহাজ নির্ম্মাণে এবং খ্রীষ্টিয়ান-দমনে সাহায্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইলেন। এই সময় ইংরাজগণ দেখা দেন। ওলন্দাজগণের চেষ্টায় ইহাঁদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হইল এবং প্রায় চল্লিশ সহস্র পাউণ্ড বা ছয় লক্ষ টাকা নষ্ট হইল। ওলন্দাজগণ চেষ্টা করিয়া অনন্তর পোর্ত্তুগিসগণেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন, কিন্তু বৈদেশিক মাত্রেরই উপর জাপানিগণের সন্দেহ উদ্রিক্ত হওয়ায় ওলন্দাজরাও ভালরূপে উঠিতে পারিলেন না। উহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট দ্বীপে মাত্র কুঠি করিতে অনুমতি দেওয়া হইল। এইরূপে নানা চেষ্টা ফলে প্রায় ২০০ বৎসর অবধি জাপান য়ুরোপের সংসর্গ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল। প্রাচীন জাপানের এইখানে শেষ। ইহার পরেই নব্য-জাপানের ইতিহাস আরম্ভ। জাপানী অভ্যুদয় বুঝিতে প্রাচীন ও নব্য-জাপানের তুলনা অত্যাবশ্যক।

প্রাচীন জাপানে রাজ্য মধ্যে রাজার স্থান সর্ব্বোচ্চ। ইহাঁর শক্তি থাকুক বা না থাকুক, রাজপদ গ্রহণে এই বংশীয় ব্যতীত কাহারও অধিকার নাই। অন্ত দেশের ইতিহাসে যেমন সিংহাসন লইয়া এক বংশের ভিতরও রক্তারক্তি হয় (মুসলমানগণ এ বিষয়ে বোধ করি সর্ব্বাগ্রগণ্য), জাপানের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত বড় কম। প্রাচীন জাপানে রাজা, কিন্তু অনেকটা সাক্ষী-গোপাল। (প্রজাতন্ত্র-মূলক রাজ্য সমূহেই বা রাজার স্থান কোথায়?) সামন্তবর্গ-মাঝে গৃহবিবাদ-দমন ও অন্য নানারূপে দেশ-শাসনে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত না থাকিলেও, জাপানে রাজা সত্য সত্যই হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত সেই "মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" রূপে পূজা প্রাপ্ত হন। নিয়ত গৃহবিবাদরত রাজপুতগণের রাজভক্তি অথবা দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ-শাসিত হিন্দু-সমাজের সহিত ইহা কতকটা তুলিত হইতে পারে। রামদাসস্বামী যেমন "গো ব্রাহ্মণ হিতার্থ প্রাণদানে মহাপাতকেরও প্রায়শ্চিত্ত হয়" প্রভৃতি শাস্ত্রানুশাসন প্রচার দ্বারা হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য দৃঢ়তররূপে সংস্থাপন ও তৎফলে মারহাট্টাজাতির অভ্যুদয় সাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, নব্য জাপানও তদ্রূপ, অভ্যুদয়-মার্গে অগ্রসর হইবার সুবিধার জন্য, রাজার ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষাও বাড়াইয়াছেন। রাজ-পূজাই এখন জাপানীদের ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সমস্ত পূজা কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণের ন্যায়, বা শিখগণের "গুরুজিকা ফতের" ন্যায় বিজয়-গৌরব রাজচরণে সমর্পণ করিয়া সমরে প্রাণদানই এখন জাপানীদের দীক্ষামন্ত্র। প্রকৃত কথা এই, অবলীলাক্রমে আত্মোৎসর্গে অভ্যস্ত হইলেই, জাতীয় উন্নতির আরম্ভ হয়। দুর্ব্বলের রক্ষার্থ ইয়ুরোপীয় নাইটগণের ও প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের (ক্ষতঃত্রায়তে ইতি-ক্ষত্রিয়ঃ), ধর্ম্ম-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার্থ মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় মার্ত্তারগণের, মানবমণ্ডলী মাঝে সাম্যস্বাধীনতা-মৈত্রীর মহামন্ত্র প্রচারার্থ ফরাসি বিপ্লবকারিগণের এবং আধুনিক নিহিলিষ্টগণের, রোমক ও গ্রীকগণের দেশ-

রক্ষার্থ এবং গো ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের জন্য মারহাট্টা ও শিখগণের আত্মোৎসর্গ-বীজে সর্ব্বত্র এই অমৃতফল প্রসব করিয়াছে। এখনকার দিনে ভারতীয় সমাজ কি আদর্শের অনুসরণে ঐরূপ আত্মোৎসর্গ-সাধনে পুনরায় সক্ষম হইতে পারে, তাহাই শুধু বিবেচ্য।

রাজার নীচেই মন্ত্রীর স্থান। মন্ত্রীর সংখ্যা অনেকগুলি, যথা প্রধান মন্ত্রী, মহা-মন্ত্রী, দক্ষিণ-হস্তের মন্ত্রী, বামহস্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ন্যায় ইঁহাদেরও কার্য্যাকার্য্য ইতিহাসে তেমন দৃষ্ট হয় না।

মন্ত্রীর পর শোগুণের পদ। কতকটা কোটাল বা সেনাপতির পদের মত। প্রাচীন জাপানের ইতিহাসে ইঁহারাই কার্য্যত রাজা বা প্রভু।

শোগুণ অপেক্ষা সম্মানে কিঞ্চিন্ন্যূন অন্যান্য সামন্ত বা সম্ভ্রান্তবংশ জাপানে অনেকগুলি আছে। ইঁহারা রাজার অধীন—শোগুণের নহে। ইহা ব্যতীত শোগুণের প্রত্যক্ষাধীনেও কতকগুলি সম্ভ্রান্তবংশ আছে। এই সমস্ত সম্ভ্রান্তবংশের অনুচর ও সৈন্যগণের নাম সামুরাই। আমাদের ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় ইঁহারাও, ব্যবসায়ী, কৃষক বা শিল্পীকুল অপেক্ষা উচ্চতর বর্ণরূপে গণনীয়। সামুরাইগণের মধ্যে যাঁহারা কাহারও অধীনে কার্য্য করেন না, তাঁহাদের নাম (Ronin) রোণিন। কোন দোষ দেখিয়া প্রভু যদি কোন সামুরাইকে তাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলেও সে রোণিন, আবার স্বেচ্ছায় কর্ম্ম ছাড়িলেও তাহাই। কোন বিশিষ্টরূপ বিপজ্জনক বা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধন প্রয়োজন হইলে, কোন কোন প্রভুভক্ত সামুরাই স্বীয় প্রভুর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া রোণিনরূপে সে কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইত। তখন উহার সিদ্ধি বা অসিদ্ধি জন্য নিন্দা, অপমান বা দায়িত্ব সমুদয় তাহার নিজের। প্রভুর জন্য ভৃত্যের এরূপ আত্মোৎসর্গ প্রথা জাপানী-চরিত্রের এক অদ্ভুত অংশ। আমাদের দেশে সন্ন্যাসাশ্রমের শরণ লইলে, কতকটা এইরূপ করা যায়। মনে কর ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্প্রদায়ের কেহ, দেশহিতার্থ ইয়ুরোপ বা আমেরিকায় যাওয়া অত্যাবশ্যক মনে করিলেন। তিনি গৃহীরূপে ঐরূপ করিলে, সামাজিক বন্ধন শিথিল মাত্র করিবেন, কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া ঐরূপ যদি করেন, সমাজের কোন কথা উঠিতে পারে না। এই সব নব্য সন্ন্যাসি-গণের চেষ্টায় বিদেশে যদি হিন্দুর আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোনরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা হইলে জাতিকুল বজায় রাখিয়াও হিন্দু-সন্তানের হয়ত বিদেশ গমন চলে। যাউক, এ বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ জাপানের ইতিহাসে স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর হইতে নব্য-জাপানের ইতিহাস আরম্ভ। অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাপান ভারতের ন্যায় অবশিষ্ট সমুদয় জগৎ হইতে আপনাকে একরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু ঐ বৎসর আমেরিকগণ ইঁহাদের গৃহদ্বারে আঘাত করিয়া উঁহাদের নিদ্রা ভাঙ্গাইলেন। আমেরিকা হইতে হংকং আসিবার পথে একটা কয়লা বোঝাই-য়ের আড্ডার প্রয়োজন হওয়ায়, আমেরিকগণ জাপানের কোন বন্দরে প্রবেশাধিকার লাভ জন্য কমোডোর পেরিকে চারিখানি বৃহৎ অর্ণবপোত সহ পাঠাইয়া দেন। বহুদিন পরে আবার বিদেশীয়েরা উৎপাত করিতে

আসিল। এখন কর্ত্তব্য কি? জাপানময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শোগুণ প্রথমে বলিয়া পাঠাইলেন, পেরি যেন নাগাসাকিতে গিয়া সন্ধির কর্ত্তাবার্ত্তা কহেন, কারণ ঐ বন্দরটীতে মাত্র বিদেশীয়দের প্রবেশাধিকার আছে। পেরি এরূপ বন্দর বিশেষে মাত্র প্রবেশাধিকারের কথা আমলেই আনিতে চাহিলেন না। তখন আবার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য হৈ চৈ আরম্ভ হইল। শোগুণ একরূপ হাতে পায়ে ধরিয়া পেরিকে এক বৎসরের জন্য দেশে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং ইহারই মধ্যে, যাহা হয়, একটা কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন ভাবিলেন। পেরি জাপানিগণকে চিন্তার সাগরে ভাসাইয়া আমেরিকা চলিয়া গেলেন। জাপানে দুই দলের সৃষ্টি হইল। শোগুণ ও তাঁহার পক্ষীয় সম্প্রদায়, নব্য দলে নাম লিখাইলেন। ইঁহাদের মতে বৈদেশিকগণকে প্রবেশাধিকার দেওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ যুদ্ধে উঁহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে (বাধা দিতে) পারা যাইবে না। প্রাচীন তন্ত্রের দিকেও বিস্তর লোক। ইঁহারা আপনাদের সাহস ও বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া বৈদেশিকগণ সহ সম্পর্ক ত্যাগে ইচ্ছুক। শেষে এ বিষয়ে রাজার মতামত জানাই স্থির হইল। কত শতাব্দী পরে জাপানের রাজা এইরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজকার্য্যে যোগ দিলেন। তিনি বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ সহ বহু পরামর্শের পর স্থির করিলেন, বৈদেশিকদিগকে আসিতে দেওয়াই উচিত নহে। আমরা পরে দেখিব, শোগুণ ও তাঁহার পক্ষীয় সম্প্রদায়ই এ সম্বন্ধে দূর দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু জাপানী সম্রাটের উক্তরূপ সিদ্ধান্ত ফলেই জাপান আজ তাহার দুর্ব্বলতা সম্যক্‌রূপ উপলব্ধি করিয়া তৎপরিহারে প্রাণান্ত পণ করিয়াছে। যাহা হউক, জাপানে এই সময় প্রজাকুল মাঝে ধীরে ধীরে অতি গুরুতর একটী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছিল। শোগুণদের প্রতাপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। শিক্ষিত জাপানিগণ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, শোগুণ আবার কে? তাঁহারা সকলেই সম্রাটের প্রজা। শোগুণ তাঁহাদের ন্যায় একজন প্রজা হইয়াও, সম্রাটের রাজশক্তি সঙ্কুচিত করিতেছে মাত্র। যখন সমুদয় সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব জাপানীর মতামত জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন অত্যুচ্চ কুলোদ্ভূত জনৈক জাপানী শোগুণকে লিখিয়া পাঠান, তিনি যেন অচিরে সমুদয় রাজশক্তি সম্রাট্‌কে প্রত্যর্পণ করিয়া বৈদেশিকদের বিরুদ্ধে উত্থান জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই সব স্থির হইতে হইতেই বৎসর কাটিল। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে পেরি আবার দেখা দিলেন। শোগুণ কাহারও কথা না শুনিয়া সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। বৎসর কত মধ্যে অনুরূপ সন্ধি, ইংলণ্ড, রুশিয়া ও হলণ্ড সহও করা হয়। সন্ধির সর্ত্তানুসারে অনেকগুলি বন্দরে বৈদেশিকগণ প্রবেশাধিকার পাইলেন। অহিফেনের আমদানী নিষিদ্ধ হইল। অন্য মাদক দ্রব্যের উপর শতকরা ৩৫৲ এবং অপর সমুদয় আমদানীর উপর শতকরা ৫৲ শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের পর, এই সন্ধি পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। রাজদূতগণ সাম্রাজ্য মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণে, কিন্তু সাধারণ বৈদেশিকগণ নির্দ্দিষ্ট স্থান সমূহে মাত্র বিচরণাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। বৈদেশিকগণ সহ বিবাদ হইলে, জাপানী যদি আসামী হয়, বৈদেশিক কন্সল বিচার করিবেন, আর ফরিয়াদি জাপানী হইলে, জাপানী আদালতে বিচার হইবে।

এই সন্ধি শোগুণের সহিত করা হইল। বৈদেশিকগণ একবার সম্রাটের মতামত লওয়া

আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। উঁহাদের চক্ষে, যাঁহার হাতে শক্তি তিনিই গণনীয়। দেশের লোক আগে হইতেই শোগুণের উপর বীতরাগ ছিলেন, এখন এই সন্ধি বন্ধন ব্যাপারে আরও বিরূপ হইলেন। শোগুণ কিন্তু একজন পরিণামদর্শী পুরুষ ছিলেন এবং বৈদেশিক সমস্যার যথাসাধ্য সুমীমাংসা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বহু লোকের ক্রোধাগ্নি অর্জ্জন ফলে, তাঁহাকে শীঘ্রই আততায়ী হস্তে প্রাণ দিতে হইল। নূতন শোগুণ হইয়াও জাপানের বিশেষ লাভ হইল না। এই সময় জাপানের বড় সঙ্কট অবস্থা। দেশে একটা অশান্তি ও উত্তেজনার হাওয়া উঠিয়াছে; দেশময় রোণিন সম্প্রদায়, বৈদেশিকদের উপর জাতক্রোধ হইয়া বেড়াইতেছে। ইঁহারা যখন কাহারও অধীন নহে, তখন উঁহাদিগকে আয়ত্তে রাখা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। বৈদেশিকগণ সে কথা বুঝিতে চাহে না। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে জনৈক আমেরিক নিহত হইলে, শোগুণকে দায়ী করিয়া আমেরিক গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেড় লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইলেন। পরবর্ষে দুই জন ইংরাজ নিহত হয় এবং ক্ষতিপূরণ কল্পে জাপান গবর্ণমেণ্টকে আবার দেড় লক্ষ মুদ্রা দিতে হইল। বিব্রত হইয়া,জাপানে বৈদেশিকগণের প্রবেশাধিকার অন্ততঃ কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখিতে, জাপান হইতে দূত প্রেরণ সাব্যস্ত হইল। ইটো এবং ইনুই, এই দূত দলের সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন। দৌত্য প্রেরণে সুফল ফলিয়াছিল। প্রতীচ্য রাজন্যবর্গ উঁহাদের আবেদনে কর্ণপাত করেন। দূতগণের আচরণে জাপানের উপর তাঁহাদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয় এবং জাপানীরাও স্বচক্ষে দেখিয়া স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসিলেন, প্রতীচ্য রাজ্য সমূহের তুলনায় জাপানের সমর শক্তি কতটা নগণ্য। কিরূপে তাঁহাদের প্রিয় জন্মভূমি আত্ম রক্ষায় সমর্থ হয়, এই চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিল।

দেশে ফিরিয়া আসিয়াই কিন্তু দূতগণ দেখিলেন, প্রতীচ্যগণ সহ জাপানের যুদ্ধ বাধিয়াছে। সম্রাটের আদেশে এবং শোগুণের কর্ত্তৃত্বাধীনে, সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের একটা সমিতি আহূত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বৈদেশিক সমস্যার কোনই মীমাংসা হইল না। সভান্তে সাৎসুমা প্রদেশের অধিপতির পিতৃব্য ও অভিভাবক, অনুচরগণ সহ যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, একদল ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়। জাপানীদের মধ্যে নিয়ম এই, পথি মধ্যে উক্তরূপ সম্ভ্রান্ত বংশীয় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে,অশ্ব হইতে অবতরণ ও অভিবাদন করিতে হয়। রিচার্ডসন নামধেয় জনৈক ইংরাজ তাহা না করায়, জনৈক জাপানী তাঁহাকে এমনই অস্ত্রাঘাত করে যে, অল্পকাল পরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে ইংরাজগণ শোগুণের নিকট এক লক্ষ পাউণ্ড বা পনর লক্ষ টাকা এবং সাৎসুমার অধিপতির নিকট কুড়ি হাজার পাউণ্ড বা তিন লক্ষ টাকা দাবী করেন। নির্দ্দোষ হইলেও শোগুণ তাঁহার জরিমানা বিনাপত্তিতে গণিয়া দিয়া, শান্তিরক্ষার অসামর্থ্যের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, কিন্তু দোষী সাৎসুমার অধিপতি ইংরাজের ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করিলেন না। ইংরাজগণ এই জন্য তাঁহার রাজ্য বা জমিদারি আক্রমণ করিয়া কাগোশিমা নগরী পুড়াইয়া দিলেন ও সমুদয় কামান নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া চৈতন্যোদয় হইলে, সাৎসুমার অধিপতির হৃদয়ে য়ুরোপীয়গণের ন্যায় রণ-

কৌশল শিখিতে প্রবল বাসনা জন্মিল এবং তিনি যথাসম্ভব সত্বর কতকগুলি ছাত্রকে এতদর্থ য়ুরোপে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট্ ও তৎপক্ষীয়গণ কিন্তু এখনও অটল। পুনরায় আর একটী মন্ত্রণাসভা আহুত হইল। বৈদেশিকগণের উৎপাতে উত্ত্যক্ত শোগুণ এবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে যোগ দিলেন, সুতরাং প্রকারান্তরে সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিলেন। এই সভাতে বৈদেশিক বিরোধিগণেরই আবার জয়লাভ হইল। শোগুণের উপর আদেশ হইল, তিনি যেন অবিলম্বে বৈদেশিকগণকে তাড়াইবার জন্য প্রস্তুত হন। আপনার অক্ষমতা ভালরূপ বুঝিয়াই হউক, বা যে কারণেই হউক, শোগুণ, সম্রাটের এই আদেশ বৈদেশিক রাজন্যবৃন্দকে জানায়াই ক্ষান্ত হইলেন, আর অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না। অন্য সামন্তবর্গ তখন আর তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই বৈদেশিকগণ সহ যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৮-৬৩ খ্রীঃ অব্দে শিমোনিসিকি প্রণালী মধ্য দিয়া গমনকালে, আমেরিক, ফ্রেঞ্চ ও ওলন্দাজগণের এক একখানি জাহাজের উপর তোপদাগা হয়। এই ঘটনায় আমেরিক ও ওলন্দাজগণ ঐ স্থানের যাবতীয় কামান নষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া কঠিনতর শাস্তি প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্বকথিত দূত দল জাপানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইটো এবং ইনুই চোশুর অধিপতিকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিস্তর সাধ্য সাধনা করিলেন কিন্তু সমুদয়ই নিষ্ফল হইল। বৈদেশিকগণ সাধ মিটাইয়া জাপানের লাঞ্ছনা করিলেন। এই ঘটনায় সাৎসুমার ন্যায় চোশুরও চক্ষু খুলিল। জাপানের সুসন্তানগণ নিজেদের শক্তিহীনতা যে পরিমাণে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, সেই পরিমাণে প্রিয় জন্মভূমির বল বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদের হৃদয়ে উৎকট আগ্রহ জন্মিতে লাগিল।

এইখানে কয়েকটী বিষয় আমাদের লক্ষণীয়। বৈদেশিকগণ জাপানকে লাঞ্ছিতমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছিলেন, জাপানের কোন অংশ অধিকার জন্য ব্যগ্রতা দেখান নাই, ইহার কারণ কি? বোধ হয়, আরও কিছুদিন যাইলে ঐরূপ করিতে আরম্ভ করিতেন। জাপানের ন্যায় ভারতে বৈদেশিক বিদ্বেষ দেখা দেয় নাই, পক্ষান্তরে ভারতের ন্যায় জাপানে ভেদনীতির প্রবর্ত্তনে অর্থাৎ দেশের লোকেরই সাহায্যে দেশের লোককে দমনে বৈদেশিকগণ চেষ্টা পান নাই, ইহারই বা কারণ কি? আত্মরক্ষার্থ সামরিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনে জাতি মাত্রেরই আগ্রহ হয়, সমরকুশল জাতি নিচয়ের ত কথাই নাই। ভারতে রাজপুত, শিখ, গুর্খা, আফ্রিদী, পূরবিয়া প্রভৃতি সমরপ্রিয় বহুজাতির অস্তিত্ব সত্ত্বেও কি কৌশলে উহাদের সামরিক বল-বর্দ্ধনস্পৃহা নির্ব্বাপিত হইল, এবং কি উপায়েই বা তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, তীব্বত, চীন, শ্যাম প্রভৃতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া জাপান তাহার এ লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হইতেছে, এই সব প্রশ্নের মীমাংসায় সক্ষম হইলে তবে জাপানের অভ্যুদয়-রহস্য বুঝা যায়, কিন্তু একথা এখন যাউক। ক্রমশঃ।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

# ভারতের সৈন্য-ব্যয়

"If the gatherer gathers too much, nature takes out of the man what she puts into his chest ; swells the estate, but kills the owner. Nature hates monopolies and exceptions."

Ralph Waldo Emerson.

সম্প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্য-ব্যয় কমাইবার একটা প্রস্তাব চলিয়াছে। খোস খবরের ঝুটাও ভাল, এই ন্যায়ানুসারে কথাটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয়। কেন না, যেরূপেই হউক, ভারত-সাম্রাজ্যের অংশ এবং সৈন্য সম্বন্ধে ভারতই সাম্রাজ্যের বড় গুদাম। ভারতের নিরন্ন প্রজার বুকের রক্তের অধিকাংশ সৈন্য বিভাগ রাক্ষসরাই পান করিতেছে। তাই বলিয়া ব্যয় কমাইবার কথাটা ভারতপ্রজার দুঃখের জন্য উঠে নাই। যেহেতু, এখানকার সৈন্যের জন্য যত টাকাই লাগুক না কেন, তাহা তো গৌরীসেনই দিবে এবং এ গৌরীসেনের যে রক্ত মাংসের শরীর, তাহা প্রমাণ করার সাধ্য কাহারও নাই। যাহার voice নাই এবং এত শোষণেও যাহার চৈতন্য নাই, সে যে নির্জ্জীব জড় ছাড়া আর কিছু, তাহার একান্ত প্রমাণাভাব। সমস্ত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যত সৈন্য প্রয়োজন, তাহার ব্যয়ভার গৌরীসেন একাই বহন করিবে, এ ব্যবস্থা ভারত ছাড়া আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। ইহার শতাংশ অবিচার সাম্রাজ্যের অন্য কোনও অংশের প্রতি হইলে, এক দিনেই তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইত। কথাটা উঠিয়াছে ইংরাজ প্রজার আপত্তিতে। এই প্রস্তাবের একটু ইতিহাস আছে। ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদিগকে Blue water school বলা হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, ইংলণ্ড রক্ষার জন্য স্থল-সৈন্যের একেবারেই কোন প্রয়োজন নাই। যে সুদৃঢ় নৌবলে ব্রিটেন রক্ষিত, তাহা ভেদ করিয়া দেশ আক্রমণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সে নৌব্যূহ কেহ ভেদ করিতে পারে, তবে লক্ষকোটী সুশিক্ষিত সৈন্যও ইংলণ্ড রক্ষা করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডে যে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা দেশের পক্ষে তিন মাসের জন্যও প্রচুর নহে। সুতরাং নৌবল ধ্বংস হইলে, সমুদ্র হস্তচ্যুত হইলে আহারাভাবে তিন মাসের মধ্যেই ইংলণ্ডকে বিনা যুদ্ধে শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। কেন না, বিদেশ হইতে খাদ্য আনিবার পথ রুদ্ধ হইলে ইংলণ্ডের উপায়ান্তর নাই। সুতরাং আক্রমণকারী বিনাযুদ্ধে দেশ দখল করিবে। এ যুক্তি অকাট্য। তাই ইংরাজ প্রজা বলিতেছে যে, সে কেন বৃথা স্থল-সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিবে। ইংরেজ প্রজা যতই কেন ধনী হউক না, সে এক কপর্দ্দকও অপব্যয় করিতে প্রস্তুত নহে। এই তো সেদিন পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনের ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়ার কথা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। যাহা হউক, ইহাই সৈন্যব্যয় কমাইবার প্রস্তাবের ইতিহাস। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে

পরিণত হইবার পক্ষে অনেক বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংলণ্ডে যে সৈন্য প্রস্তুত হয়, তাহা কেবল ইংলণ্ড রক্ষার জন্য নহে। ইংলণ্ড বাহিরে যত সৈন্য পাঠায়, তত সৈন্য তাহাকে ঘরে রাখিতে হয়। ইহাকে Linked battalion বলে। বাহিরে একজন সৈন্যের মৃত্যু হইলে, তাহার শূন্য স্থান পূরণের জন্য ঘর হইতে একজনকে পাঠাইতে হইবে। এই ভারতের কথা ভাবা যাক্। এখানে ৭০।৮০ হাজার ইংরাজ সৈন্য রহিয়াছে। এই ৭০।৮০ হাজার সৈন্য ইংলণ্ডেও মজুত থাকা চাই। ভারত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, এখানে এক দল ইংরাজ সৈন্য বেশী দিন থাকিতে পারে না। সুতরাং জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মাঝে মাঝে তাহাদিগকে দেশে যাইতে হয়। কিন্তু যখন তাহারা দেশে যাইবে, তখন তাহাদের স্থান খালি থাকিতে পারে না। এক দল যাইবার পূর্ব্বে আর এক দল আসিয়া উপস্থিত হওয়া চাই। এইরূপ আদান প্রদান সর্ব্বদাই চলিতেছে। সুতরাং সৈন্য কমাইতে হইলে এই Linked battalion সমস্যা পূরণ করা চাই। ইংলণ্ডের ১০ হাজার সৈন্য কমাইতে হইলে বাহিরেও দশ হাজার সৈন্য কমাইতে হয়। কিন্তু ইংলণ্ড যেন সমুদ্র-বেষ্টিত, নৌবল তাহাকে রক্ষা করিবে। এ বিরাট সাম্রাজ্যের সকল অংশই তো আর নৌবলে রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং ইংলণ্ডের সৈন্য সংখ্যা কমাইতে হইলে বাহিরের সেই পরিমাণ সৈন্য কম হইলেও সাম্রাজ্যের কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে; না হয়, Linked battalion প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এটা একরূপ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে যে, এ প্রথা অপরিহার্য্য, সুতরাং দেখাইতে হইবে যে বাহিরে—উপনিবেশেই হউক, আর ভারতেই হউক—যেখানে যত সৈন্য আছে, তাহার কতক অংশ, সাম্রাজ্যের কোনও ক্ষতি না করিয়াও কমান যাইতে পারে। তাহা হইলে, প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তি সমূহের বলাবল বিচার করিতে হইবে। কেন না, আমার ইচ্ছা না থাকিলেও প্রতিদ্বন্দ্বীর ইচ্ছানুসারেই আমাকে অনেক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। শক্তি সকলের যে সৈন্যবল দিন দিন বাড়িতেছে, তাহা কেবল প্রতিযোগীতার ফল। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনাদের সৈন্যবল না কমাইলে কোনও শক্তি বিশেষের পক্ষে স্বীয় বল কমান নিতান্তই অবিবেচনার কাজ, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ভারতে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ। ভারতের সৈন্যবল হ্রাস করা যায় কিনা, তাহা রুশভল্লুকের বলাবল ও গতিবিধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রুশ ভারত আক্রমণে সমর্থ কিনা, সৈন্যবল কমাইবার পূর্ব্বে তাহাই নির্দ্ধারণ করা সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। তাহা না করিয়া যে কোন যুক্তি দেওয়া যাক্ না কেন, তাহা ভারতবাসীর দারিদ্র্যই হউক, অথবা তাহার শিক্ষা ব্যয়ের অনাটনই হউক, কিছুই কাজে লাগিবে না, অরণ্যে রোদন মাত্র হইবে।

ইংলণ্ডের উপর যে রুশিয়ার ভীষণ আক্রোশ আছে এবং জাপান যুদ্ধে যে তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। রুশ যে এক দিন প্রতিশোধের চেষ্টা করিবে এবং তাহা যে ভারত সীমান্তেই সংঘটিত হইবে, তাহাও নিশ্চয়। তবে প্রশ্ন এই, রুশিয়ার শক্তিতে তাহা কুলাইবে কি? রুশের পক্ষে ভারতাক্রমণের সর্ব্বপ্রধান অনুকূল অবস্থা গিয়াছে বুয়র যুদ্ধের সময়।

সে সময়ে এক দিকে ভারতের সৈন্য সংখ্যা দশ সহস্র কমিয়া গিয়াছিল, অন্যপক্ষে ইংলণ্ডের সমস্ত বল দক্ষিণ আফ্রিকায় আবদ্ধ ছিল এবং তাহাতেও কুলাইতেছিল না। তারপর ইংরাজের সৈন্য বিভাগের দুর্ব্বলতা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বোপরি, ইংলণ্ড জগতের সহানুভূতি একেবারে হারাইয়াছিলেন। সে সময়ে এমন কেহ ছিল না, যে ইংলণ্ডের কোনও বিপদে ধর্ম্মের হাত না দেখিত এবং আনন্দ প্রকাশ না করিত। এই যে নৈতিক বল, ইহা সৈন্য বল অপেক্ষাও উচ্চতর। রুশিয়া যখন এরূপ সুযোগেও স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, তখন যে সে চেষ্টা করিলেও আর কিছু করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা কম। এখন তো রুশের অবস্থা শোচনীয়, ঘরে বাহিরে বিপদ। কেবল যে রুশিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু জাপানের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্তানুসারে ভারত প্রান্তে ইংরাজের পৃষ্ঠবল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং ভিতরে কোনও গোলযোগ না হইলে রুশের আক্রমণের ভীতি আর নাই বলিলেই হয়। ইংরাজ রাজ এদেশেবাসীর আবেদন নিবেদন, কাতর ক্রন্দনের প্রতি যেরূপ অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি ভিতরের গোলমালের কোনই আশঙ্কা করেন না। ভারতবাসীও সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। তার গোলমালের দৌড় আবেদন নিবেদন, আর সেই সনাতন প্রথা—"বালানাং ক্রন্দনং বলম্।" সুতরাং ভিতরের গোলমাল নিবারণে সৈন্যের কিছুই প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে ইংলণ্ডের দশ সহস্র সৈন্য কমাইতে যাইয়া নির্ব্বিরোধে ভারতের দশ সহস্র সৈন্য কমান যাইতে পারে। যখন ইংলণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল ( বুয়র যুদ্ধের সময় ) এবং রুশিয়া প্রবল ছিল ( জাপান-যুদ্ধের আগে ) তখন ১০ সহস্র সৈন্য তিন বছর ধরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আবদ্ধ ছিল, তাহাতে কোনও গোলযোগ হয় নাই। ইহাতে নিরন্ন ভারতপ্রজার গুরুভারের কথঞ্চিৎ উপশম হইবে। কিন্তু সে পথের প্রথম বিঘ্ন এই যে, সৈন্যবল এমন একটী জিনিষ, যাহা একবার বাড়িলে হ্রাস করা একরূপ অসম্ভব। তথাপি, যদিও রাজপুরুষগণের ইচ্ছা হইলে এ বিঘ্নটি সহজেই অতিক্রম করা যাইতে পারে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের পথে তিনটী অতি গুরুতর বাধা মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যাহাদিগকে অতিক্রম করা অতি দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই পৃথিবীতে যাহা অতি অনাবশ্যকীয়, তাহারও সঙ্গে কত লোকের কত স্বার্থ জড়িত থাকে, সৈন্য বিভাগতো অতি গুরুতর জিনিষ। সাম্রাজ্যের দিক্ হইতে বিচার না করিয়া যে সকল ব্যক্তিগত স্বার্থ সৈন্য বিভাগের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে,তাহাদের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, হঠাৎ সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতে যাওয়া কি কঠিন সমস্যা। ইংলণ্ডে কর্ম্মহীন লোকদিগের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে কি করা যাইবে, তাহা লইয়া রাজনীতিবিদ্‌গণ মহা গণ্ডগোলে পতিত হইয়াছেন, এরূপ স্থলে হঠাৎ বিশ হাজার অকর্ম্মা লোকের সৃষ্টি ব্রিটিশ রাজনীতির পক্ষে নিতান্ত সামান্য বিষয় নহে। দ্বিতীয় বাধা এই যে, সৈন্য বিভাগ ইংলণ্ডের ক্ষমতাশালী পরিবার সমূহের জ্যেষ্ঠেতর পুত্রগণের শেষ ভরসাস্থল। এই সব পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রগণই পৈতৃক সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী। অন্যান্য পুত্রগণের জীবিকা নিজদিগকেই অর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু একজন লর্ডের ছেলে যা তা করিতে পারে না, তাঁহাকে বংশের মানরক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সৈন্য বিভাগ সেই মানরক্ষার প্রধান আশ্রয়। সুতরাং সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতে গেলে এই সব পরিবার পেটের দায়ে বাধা প্রদান করিবে, সেখানে যুক্তি তর্ক খাটিবে না। পেটের দায়ের কাছে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার স্থান পায় না। তৃতীয় বাধা, এক দল ব্যবসাদার, যাহারা সৈন্যবিভাগের সাজ সরঞ্জাম জিনিস পত্র যোগায়। এক কলমের খোঁচায় তাহাদের বিশ হাজার গ্রাহক কমিয়া যাইবে এবং তাহারা ইহা কেবল চুপ করিয়া বসিয়া দেখিবে, তাহা কখনও হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা আপনাদের সমুদায় ক্ষমতা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবে। কাজেই, দেখা যাইতেছে যে, রাজপুরুষগণ ইচ্ছা করিলেও সহজে ভারতের সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া যে তাঁহারা ভারতের বুকের পাষাণ লঘু করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা মনে হয় না। সৈন্য ব্যয় বাড়াইতে চাও, কুচপরওয়া নাই, লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন। কিন্তু কমাইবার বেলায় কত স্থান দিয়া কত লোকের আঁতে ঘা পড়ে, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। আমরা শতবার বলিয়াছি, আবার বলি, ভারতের অধীশ্বর একজন দুই জন লোক নহে যে, বুঝাইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করা যাইবে, কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা ৪ কোটী লোক, সকলকে বুঝ দিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা যে বুঝিয়াও না বুঝিবে, তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। আবেদন নিবেদনে হইবে না, আমাদিগকে এমন শক্তি লাভ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা জোরের সহিত বলিতে পারি যে, চাই না বিদেশী সৈন্য, আমরা নিজেই আপনাদের দেশ রক্ষা করিব। তা ছাড়া আর যা কিছু সব ভস্মে ঘৃতাহুতি। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তার জন্য পৃথিবীও নাই, পৃথিবীর সহানুভূতিও নাই।

এই Linked battalinon প্রথা যে কি সর্ব্বস্বান্তকারী প্রথা, এই প্রথায় সৈন্য ব্যয় বহন করা যে কি বিষম দায়, তাহা বোধ হয় আর কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। এ দায়ে ভারতের মত গৌরীসেনও একেবারে জেরবার হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লী দরবারই কর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালই উঠাও, আর রাজপুত্রের আগমনই জাঁকাও—বাহিরের জাঁকজমকে জগৎকে মুগ্ধ করিতে যতই চেষ্টা কর না কেন, ভিতরের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝিতে আর কাহার বিলম্ব হইবে না। দুর্ভিক্ষ মহামারী তোমার ঐ ঢাকঢোলে নিরস্ত হইবার নহে। বাহির হইতে সাতটা, ঘরে কিন্তু সব ফাঁক। এক কুমীর এক শেয়াল পণ্ডিতের কাছে আপনার সাত পুত্রকে অধ্যাপনার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল। পণ্ডিত এক একটী ছাত্রের দ্বারা এক এক দিন স্বীয় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। একদিন কুমীর পুত্রগণকে দেখিতে আসিল, তখন একটী মাত্র অবশিষ্ট। পণ্ডিত উপর হইতে একটাকেই সাতবার দেখাইয়া কুমীরকে বিদায় করিল। আমাদের দশাও তাই, বাহির হইতে সব ঠিক দেখিতেছি, ভিতর কিন্তু সব ফাঁক্। যে সৈন্য ব্যয়ে ইংলণ্ডবাসীর আপত্তি, সে সৈন্য ব্যয়ে ভারতের মত গরীব দেশের পক্ষে যে মারাত্মক, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সৈন্য-ব্যয়েই ভারত উজাড় হইল।

এখন কথা এই, এই সৈন্য ব্যয়ে সাম্রা-

জ্যের যতই কেন উপকার হউক না, ভারতের তাহাতে লাভ কি? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, উহাতে ভারতে শান্তি বিরাজ করিতেছে। অন্তঃশত্রু কি বহিঃশত্রু সকল উৎপাত হইতে ভারত আজ রক্ষিত। ইংরাজের বাহুবল দ্বারা রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে কত বিপ্লব গিয়াছে, কত লুঠ তরাজ গিয়াছে, এখন কেবল শান্তি। কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু একেবারে ঠিক নয়। এ কথা অবশ্যই ঠিক আলেক্‌ডাণ্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া নাদেরসা পর্য্যন্ত —নাদেরসা কেন, ক্লাইভ পর্য্যন্ত ভারত কোন আক্রমণকারীকেই প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, কোন আক্রমণকারীই ভারত লুঠ না করিয়া ফিরিয়া যায় নাই। কিন্তু ইংরাজ আসিবার পরে আর কোন বিদেশী ভারত লুঠ করিতে সাহসী হয় নাই, তাহাতে ভারতের লুণ্ঠন থামিয়াছে কি? মহামতি ডিগবি সাহেব তাঁহার Prosperous British India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"England's unbounded prosperity owes its origin to her connection with India. Possibly, since the world began, no investment has ever yielded the profit reaped from the Indian *plunder*. What was the extent of the wealth thus wrung from the East Indies? Estimates have been made which vary from £ 500000000 to nearly £ 1000000000. Probably between plassey and Waterloo the last mentioned sum was transferred from Indian hoards to English banks. In an appendix to this chapter will be found some details of individual embezzlements."

এখন দেখা যাক্, ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে ভারতের কি অবস্থা হইয়াছিল। ভারতের দুইজন সর্ব্বপ্রধান লুঠকারী তিমুরলেন ও নাদের সা। তিমুর ১৩৯৮ খ্রীঃ ভারত আক্রমণ করে, আর নাদের সার আক্রমণের কাল ১৭৩৮ খ্রীঃ এবং ইহারা দুইজন উর্দ্ধ সংখ্যা ১৪।১৫ কোটী টাকা ভারত হইতে লইয়া যায়। অর্থাৎ ভারত যখন বহি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ ছিল না, তখন দুইজন লুণ্ঠনকারী ভারত হইতে ১৫ কোটী টাকা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আর ইংরাজের সুদৃঢ় বাহুবল রক্ষিত ভারতে লুঠ হইয়াছে ১৫ শত কোটী টাকা। ইহার অর্থ এই যে, অরক্ষিত ভারতে ১৩৯৮ খ্রীঃ হইতে ১৭৩৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসরে লুঠতরাজে ভারতের যত অর্থ বিদেশী কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল, ইংরাজ রাজ সুশাসনের প্রভাবে পলাসী হইতে ওয়াটার্লু পর্য্যন্ত এই ৬২ বৎসরেই তাহার শতগুণ বেশী অর্থ ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এ ১৫ শত কোটী টাকা হইল খাতাপত্রের কথা। ইহার উপর, ব্যক্তি বিশেষেরা, যাঁহারা ভারত হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া Oriental Nawab বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া আর কয় শত কোটী লুঠ করিয়া লইয়াছেন, তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অশান্তি অপেক্ষা শান্তিতে আর্থিক হিসাবে ভারতের অনিষ্ট হইয়াছে, অন্ততঃ ছয়শতগুণ বেশী। ইহাই বুকের রক্ত দিয়া ইংরাজ সৈন্য প্রতিপালনের পুরস্কার। কেহ এখন বলিতে পারেন যে, কেবল আর্থিক ক্ষতিই তো অরাজকতার একমাত্র অনিষ্ট ফল নহে, উহাতে লোকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হয়। কথাটা ঠিক্। তবে ইংরাজ কি আমাদিগকে প্রাণে না মারিয়া আস্ত রাখিয়াছেন? বিগত এক শত বৎসরে যুদ্ধবিগ্রহে পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিতে সমগ্র ভূমণ্ডলে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, একা ভারতে মাত্র দশ বৎসরে দুর্ভিক্ষ-জনিত অনাহারে তাহা অপেক্ষা চার গুণ অধিক

লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাই আমাদের শান্তির পরিণাম !! চাই না তোমার শান্তি, যে শান্তির এই পরিণতি। আর এই দুর্ভিক্ষের কারণ যে "অতি বৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ" কিম্বা "প্রত্যাসন্নাঃ চ রাজানঃ" নহে, তাহার একমাত্র মুখ্য কারণ যে রাজা কর্ত্তৃক প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, অতিরিক্ত করভার, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদী-সম্মত। এরূপস্থলে শান্তি ও সুশাসনের বড়াই মিছা বড়াই। এরূপ সু-শাসন আর ২৫ বছর চলিলে একেবারে নিকাশ। ইহা যদি সু-শাসন হয়, কু-শাসন কি, জানি না। রোগীর জ্বর সারাইবার জন্য উৎকট ঔষধ প্রয়োগে তাহার প্রাণান্ত করিয়া "রোগী মরেছে মরেছে, জ্বর তো ছেড়েছে" বলিয়া ডাক্তারের বড়াইও যা, এরূপ সু-শাসনের বড়াইও তা। ভারতের ভাগ্যে সব সমান—সাপে খেলেও নির্ব্বংশ, বাঘে খেলেও নির্ব্বংশ। বিদেশীর সাহায্যে আত্ম-রক্ষার ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তবে মুখের অন্ন তুলিয়া দিয়া এই বিরাট সৈন্য-ব্যয় বহনের সার্থকতা কি?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

---

# সুখের সংসার।

সংসারে পাপ অধিক, না পুণ্য অধিক; স্বাস্থ্য অধিক না ব্যাধি অধিক; আনন্দ অধিক না বিষাদ অধিক? এটা সুখের সংসার, না দুঃখের সংসার? ধর্ম্ম-যাজকেরা বলিবেন যে, এটা দুঃখের সংসার, এবং আমরা প্রতি নিঃশ্বাসে পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকি। একথা না বলিলে তাঁহাদের ব্যবসা চলে না; কেন না, পাপক্ষয় করাইয়া দুঃখাতীত মুক্তিদান করিবার জন্যই ধর্ম্ম-যাজন।

যাহারা চুরি ডাকাতি করে, ঘরে আগুন দেয়, নরহত্যা করে, প্রতিবেশীকে প্রবঞ্চনা করিয়া আদালতে মোকদ্দমা করে, তাহাদের সংখ্যা অধিক, না যাহারা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে, উপার্জ্জিত ধন বর্দ্ধন করে, নির্ব্বিবাদে ঘর সংসার করে, তাহাদের সংখ্যা অধিক? ধর্ম্মযাজক এবং পুলিশের সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, জেলের অধিবাসী অপেক্ষা যে গৃহের অধিবাসী অধিক, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। ধর্ম্মযাজকেরা বলিয়া থাকেন বটে যে, পাপের পথ প্রশস্ত এবং পুণ্যের পথ অতি সরু। কিন্তু তাহা কি সত্য? চোর হইতে হইলে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া, ভয়ে ভয়ে চলিয়া ফিরিয়া, উপার্জ্জনের অপেক্ষাও অধিক ক্লেশ এবং কৌশল অবলম্বন করিয়া, পরের ধন সংগ্রহ করিতে হয়; সংগ্রহ করিয়াও প্রতিবেশী-দিগকে ভয় করিয়া সংগোপনে অর্থ পুষিয়া জীবন কাটাইতে হয়। এই পথ কি সরল এবং বিপদশূন্য সাধুতার পথ অপেক্ষা প্রশস্ত? সকলেই বুঝিতে পারে, যে পাপের পথ অতি পিচ্ছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সংকীর্ণ; সেই জন্যই এ সংসারে চোর অল্প এবং সাধু বেশী; সংসারে কতলোক পরের গলায় ছুরী দিবার জন্য উদ্যোগ করিয়া বসিয়া থাকে, এবং কেবল পুরোহিত-সম্প্রদায়ের উপদেশ শুনিয়া পিছাইয়া যায়? স্বভাবতঃই যদি মানুষের সাধুতা অধিক না হইত, তাহা হইলে সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারিত না। বিধাতার

সৃষ্টির এই কারিগুরি যে, সামাজিক না হইলে মানুষের জীবন ধারণ করা অসম্ভব; এবং সামাজিক হইতে হইলে আত্মসুখ ছাড়িয়া পরের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে চলে না। যাহা নিজের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন, যাহা সামাজিক হইবার জন্য প্রয়োজন, তাহা আমরা অবলম্বন করিবই করিব, এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া অভ্যাসবশে তাহা আমাদের সংস্কারবদ্ধ হইয়া যাইবেই যাইবে। এইরূপে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানুষেরা আপনাকে বাঁচাইতে গিয়া সাধুতা অবলম্বন করিয়া সাধু হইয়া আসিতেছে।

প্রতিবেশীরা যদি ক্রমাগত রোগে মরে, তবে সে রোগ আমাকেও স্পর্শ করিবে। রোগের মূল যদি উৎপাটন করিতে না পারি, ক্ষুদ্ররোগও কালে সংক্রামক হইয়া উঠিতে পারে। প্রতিবেশীরা যদি না খাইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যু হইতেই নানা রোগ এবং নানা পাপ জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। প্রতিবেশীকে না বাঁচাইয়া আমরা বাঁচিতে পারি না। এত কথা ভাবিয়া আমরা এখন পরোপকার করিতে চাই না বটে; কিন্তু একদিন ভাবিয়াছিলাম। সেই ভাবনাই এখন সংস্কারবদ্ধ পরোপকার করিতে প্রবৃত্তি সাজিয়া, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তেজনা করিতেছে। আমাদের স্বার্থের প্রবৃত্তিটুকু বিধাতা এমন উপাদানে গড়িয়া দিয়াছেন যে, উহাকে বিকশিত করিতে হইলেই রূপান্তরিত ভাবে পরোপকার প্রবৃত্তির জন্ম হয়। আমরা ইচ্ছা করিয়া সাধু হইব, এতটা বিশ্বাস করিয়া, বিধাতা আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন নাই; এবং আমাদের অবাধ স্বাধীন পথের রক্ষক এবং চালকরূপে ধর্ম্মযাজকদিগকে পাঠান নাই। আমাদের প্রবৃত্তিকেই এমন করিয়া গাড়িয়া দিয়াছেন, যাহাতে আমরা জীবনের পথ বা সাধুতার পথেই বিচরণ করিয়া থাকি।

পাপ একটু বেশী হইলে ধর্ম্মযাজক অপেক্ষা উকীলদের একটু বেশী সুবিধা হইত। কিন্তু হয় কৈ? স্বাস্থ্যের অপেক্ষা রোগ অধিক হইলে ডাক্তারের সুবিধা হইতে পারিত; কিন্তু সুস্থ লোকের উপার্জ্জিত অর্থই নাকি ডাক্তারের ফিস্, কাজেই রোগাধিক্য তাঁহার বড় প্রীতিকর না হইতে পারে। রোগ অপেক্ষা যে স্বাস্থ্য অধিক, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। প্রতি রোগীও যদি ভাবিয়া দেখে যে, তাহার জীবনে রোগ কতটুকু এবং স্বাস্থ্য কতটুকু, তাহা হইলেও সে বুঝিতে পারিবে যে, রোগাধিক্যের কথাটা কেবল ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার করুণ-রসের উপাদান মাত্র।

সংসারে ধন সম্পদ বাড়ুক, সে ভাল কথা। কিন্তু অধিকাংশ লোক না খাইয়া মরিতেছে, রাত্রিদিন হাঁহাকার করিতেছে, এটা কেবল রাজনীতিজ্ঞ পেট্রিয়ট্‌দিগের মুখেই শোভা পায়। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যাও, প্রতিগৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাও, হাহাকার অপেক্ষা আনন্দধ্বনি অধিক শুনিতে পাইবে। আমাদের সমগ্র জীবনের মধ্যে একটী দিনের অভিজ্ঞতায়ও এমন অবস্থা দেখিতে পাই না যে আনন্দ অপেক্ষা হাহাকার অধিক। সংসারটা সুখের, দুঃখের নয়। দুঃখ কচিৎ বলিয়াই উহা সঙ্গীতের প্রাণ; এবং সুখের সময়ে সেই গান গাহিয়া অধিক সুখবর্দ্ধন করি। আমাদের পিপাসা, অতৃপ্তি

এবং আশা, সুখের পর নূতন সুখ আনিবার উদ্যোগ করিয়া আমাদিগকে সুখী করে। আমরা যে বাঁচিয়া আছি, তাহার অর্থই এই যে, দুঃখ অপেক্ষা সুখ অধিক। যে মরিয়া যায়, তাহার জীবনেও সুখ অধিক ছিল। সুখ আছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই। ক্ষণিক উন্মত্ততায় আত্মহত্যা করে কয়জন? আর যমরাজাকে কঠোর বোঝা মাথায় তুলিয়া দিতে বলে কয়জন?

প্রাচীনতার প্রভাবের দিনে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি, মায়ামোহ কাটাইয়া মুক্তি দিবার জন্য লোকদিগকে উত্যক্ত করিতেন; লোকেরা কিন্তু গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়াই সংসার করিত। একালের জেতা জাতির ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়েরা আবার 'পাপ' 'পাপ' বলিয়া একটা মহা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। কোন্ পূর্ব্বপুরুষে নাকি কোন্ পাপ করিয়াছিল, এবং আমরা নাকি তাহার কর্ম্মফলে নরকে বসিয়া আছি; এবং লোক বিশেষের আশ্রয় না লইলে নাকি মুক্তি নামক একটা সূক্ষ্ম-রকমের "বস্তু কিঞ্চিৎ" লাভ করিতে পারিব না। মানুষেরা যদি বৃথা একটা পাপের ধুয়া না তুলিয়া, সোজা রকমের পথে আপনার কার্য্যে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে এই সুখের সংসার আরো সুখের হইত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# মহারাষ্ট্রের উদ্বোধন

মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের নেতা, শিবাজীর দীক্ষাগুরু জ্ঞানবীর রামদাস দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে নিম্নের লিখিত গান গাহিয়া বেড়াইতেন, উহার ফল ইতিহাস প্রমাণিত করিতেছে।

হে আমার দেশবাসিগণ!
নয়নে লেগেছে মোর প্রভাতের আলো
হেরিতেছি প্রভাত তপন!

জাগগো এই বেলা;
কতকাল ঘুমে আর অন্ধ তামিস্রের মাঝে
করিবিরে খেলা!
এ নহে জীবন, এ যে মৃত্যু মহামৃত্যু ঘোর,
শান্তি নহে নরক ভীষণ!
চেয়ে দেখ আঁখি মেলি হইতেছে মহাবিশ্বে
মহা আয়োজন!

এ মহা আকাশ ব্যাপি আলোক সায়ক রাশি
ছুটিয়াছে তর' তর' তর';
লোক লোকান্তর হতে উদাত্ত বোধন-মন্ত্র
ছুটিয়াছে দেশ দেশান্তর;
শুনি এ ভৈরব রাগ কে রবে এ দেশ মাঝে
নিশ্চেষ্ট নিশ্চল,
কে চাহে করিতে হেতা সামান্য সুখের ব্যয়ে
জনম সফল;
কে কাঁদে শৃঙ্খল ভাঙ্গি উন্মুক্ত এ বিশ্ব দেশে
হতে ধাবমান;
শশী সূর্য্য করোজ্জ্বল বিপুল অম্বর পথে
কে তুলিবে আপনার প্রাণ!

শোণিতের মূল্যে হয় মহত্ত্ব বিক্রীত এই
বিশ্ব-বিপণিতে;
আপন হৃদয়-রক্তে কে নিবে কিনিয়া তারে
ভারত-ভূমিতে!

এ দেহ নশ্বর দেহ একবার ডালি দিলে
পাবে তাহা জন্ম জন্মান্তর ;
এ জীবন দুঃখভরা দিয়ে যাও এ ধরারে
হবে তাহা অমৃত অক্ষর।
ভেবে দেখ একবার যুগে যুগে এই বিশ্বে
কত লোক এসেছে গিয়েছে ;
তাহাদের সুখ দুঃখ অতি প্রিয় জীবনের
ধরা মাঝে কিছু কি রয়েছে ?
রয়েছে অটল শুধু নির্ব্বাক বেদনা শান্তি,
মানবের রুদ্ধ হাহাকার ;
রয়েছে প্রকাণ্ড ভিক্ষা ঘরে ও বাহিরে শুধু
মর্ম্মপীড় মহা অন্ধকার !
দেশে দেশে এই শিক্ষা—মরিতে জানে না যারা,
তাহাদের অনন্ত অভাব ;
এ ধরণী নিজ গ্রন্থে মানবের নাম লেখে
নাহি রাখে পশুর হিসাব।
মানব হৃদয় রক্তে নিসিক্ত নহিলে কভু
উর্ব্বরতা বাড়েনা ধরার ;
পড়িয়ে তাহারি প্রেমে হয় সে আকাশ হতে
বিশ্বোজ্জ্বল আলোক সঞ্চার !
না ফুটে কুসুম সেথা না ডাকে বিহগকুল
নাহি বহে বায়ু ;
মানব যাপিয়া যায় মোহান্ধ পশুর মত
শত বর্ষে পল পরমায়ু।
জীবন প্রকাণ্ড শূন্য ঘটনা চেতনা হীন ;
মরুভূমি এ বিশ্ব জগৎ
আলস্যে অঙ্কিত দৃষ্ট দাসেরা জানে না কভু
জীবনের ভূমা ও মহৎ ;
জঘন্য জীবন নিয়ে মোহ পঙ্কে পড়ে থাকে
দিবা নিশি কৃমির সমান,
কোটি কোটি জড় করি তুলে দিলে মানদণ্ডে
হয় না সে তিল পরিমাণ।

কে আছ এ মহা দেশে নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে কার
জাগিয়াছে কাহার বাসনা ?
বিশ্বের নিয়তি তন্ত্রে জাগিয়াছে প্রাণ কার
অমরত্ব কে করে কামনা !
রোগে শোকে দুঃখ দৈন্যে দুর্ভিক্ষেতে মরিতেছ,
মরিতেছ শত অত্যাচারে !
মরণের দেশে থাকি বুঝিতে পারনি আজ [ও]
প্রকৃত মরণ বলে কারে।
বোঝনি সে কি মরণে, জীবনে জাগিয়া উঠে
রক্ত বীর্য্যে ছেয়ে ফেলে ধরা।
সকল অভাব দুঃখ যাতনা ও অভিযোগ
অবসান হয়ে যায় ত্বরা।
সে জীবন চাহ যদি এস তবে অভিমুখে
তুচ্ছ করি বিপদ মরণ ;
শক্তি-রূপা ভবানীরে স্পর্শ করি বল তবে
'পুণ্য ব্রত করিনু গ্রহণ।'
আজি এ ভারত জুড়ি ছুটেছে ভৈরবী মার
মহা আবাহন ;
যুগান্তের নিদ্রা ভাঙ্গি জাগিয়াছে মা আমার
শুন মোর দেশবাসিগণ !
শক্তি মুক্তি প্রদায়িনী করুণা ভীষণ বেশা
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ তৎপরা,
পূর্ণ স্বাধীনতা মূর্ত্তি শোণিত-পিষিতা ধরা
বরাভয় করা !
এ বিশাল শাক্ত দেশে ভীরু কাপুরুষ সব
চাহিবে না জননীর পানে।
মায়ের শাণিত অসি সমররঙ্গিণী মূর্ত্তি
নিরখিবে শঙ্কিত নয়ানে !
এ দেশে কি নাহি আজ মায়ের সন্তান কেহ
বলি যায় ভক্তের মতন ?
বলে উঠে কায়মনে "এই মা তোমার পদে
এ জীবন করিনু অর্পণ ?"
ত্রেতা যুগে সাহসিক দশ স্কন্ধ কাটি শির
করেছিল পূজা !
সপ্ত বিংশ কোটি স্কন্ধে পূজিবে ভারত আজি
অয়ি চতুর্ভুজা !

বহু দিন—বহু দিন এ দেশে হয়নি যাহা
কত অন্ধ শতাব্দীর পরে,
মহা নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভিব পুনরায়
যজ্ঞভূমি ভারত ভিতরে;
জীবনের যত আশা সুখ শান্তি যশোমান
সর্ব্বাগ্রে ফেলিব হোম করে;
হৃদয় শোণিত সহ দারা সুত পরিজন
বলি দিব তাহে অকাতরে;
এক ধর্ম্ম এক লক্ষ্য, করিব বিশাল যজ্ঞে
সবে মিলি মহা আয়োজন,
শত লক্ষ রক্ত পদ্ম উৎসর্গ করিয়ে মাতঃ
পূজিব ও রাতুল চরণ!
নৃমুণ্ড স্রগুরে আজি কণ্ঠ সাজাইব তোর
অয়ি মহাকালী।
অয়ি মা ভৈরবি ভীমা সর্ব্ব দুঃখ তাপহরা
ঈশানি করালী!
বহু পূর্ব্বে—পূর্ব্বে তোর যে মানসী মূর্ত্তি গড়ি
এক দিন এ ভারতে করেছিনু ধ্যান,
সে মূর্ত্তি পাষাণে শুধু পাষাণি ফেলিয়া কবে
শাস্ত্রের গহন দিয়ে হলি অন্তর্ধান!
চাহিনা পাষাণী মূর্ত্তি চাহি মা জীবন্ত তোরে,
এ জীবনে চাহি তোরে স্বরূপে জননী;
যাহার আভাস পাই অমানিশীথের কোলে
মেঘে যবে লিহ লিহ সঞ্চরে দামিনী!
চাহি সে ভয়াল ছায়া মানব জাগায় যবে
যুগান্তের ধূলি শয্যা হতে,
লক্ষ, লক্ষ প্রাণ যবে জাতীয় কলঙ্ক কালি
ধুয়ে ফেলে হৃদয়-শোণিতে।
সে মূরতি চাহি তোর, মানব-তারিণী শ্যামা
করালিনী ত্রিকালনয়না,
অয়ি মা শিবে শঙ্করি প্রলয় অভয়ঙ্করি,
শক্তি মূর্ত্তি প্রকট বদনা।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

# আত্ম-রক্ষা।

জীব-জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পওয়া যায় যে, কীটাণু-কীট হইতে প্রমত্ত মাতঙ্গ সকলেই আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত পরিব্যস্ত। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার জগতের নিত্য ঘটনা হইলেও, স্ব স্ব শক্তি অনুসারে সকলেই নিজ মঙ্গল সাধনে তৎপর, আত্মসাধনে ব্যতিব্যস্ত।

জ্ঞানে, গুণে, শক্তি-মাহাত্ম্যে, জীব-জগতে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের বুদ্ধির নিকট, মানবের কল-কৌশলের নিকট অন্যান্য সমস্ত প্রাণী পরাভূত, অবনত-মস্তক।

মানবও মানবের অধীন, বশ্যতায় অবনমিত। যে মানবের শক্তি বেশী, যে মানবের ক্ষমতা বেশী, যে মানব কল-কৌশল-সম্পন্ন, সে অন্য মানুষকে আপনার আয়ত্তাধীনে রাখে, সে অন্য মানবের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। কি জীব-জগতে, কি জড়-জগতে সকল স্থলেই শক্তিবলের প্রবল আধিপত্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। শক্তিবল ক্ষমতার প্রভাবে এই বিশ্ব সর্ব্বদা সঙ্কুচিত, প্রসারিত, আকুলিত, ব্যাকুলিত, সন্ত্রাসিত।

বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর সমস্ত মানবের সম্রাট। কিন্তু বিশ্বপিতা বিশ্বেশ্বরের সন্তানগণও শক্তির বল, ক্ষমতা অনুসারে মানবমণ্ডলীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অবস্থান

করিতেছেন। ইহারাই রাজা শব্দে অভিহিত।

প্রাচীন ও নবীন সকল রাজ্যে, সকল দেশেই এক রাজার পর অন্য রাজার, এক শাসনকর্ত্তার পর অন্য শাসনকর্ত্তার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে ও হইতেছে। কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এ কথার যাথার্থ্য সকল স্থলেই দেদীপ্যমান। যিনি ন্যায়দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া রাজ্য-শাসন ও প্রজা পালন করিয়াছেন, তাঁহারও স্থায়িত্ব হয় নাই; আবার যিনি অত্যাচারপরায়ণ হইয়া জন-সাধারণের অমঙ্গলের ও উদ্বেগের কারণ হইয়াছেন, তাঁহারও বিনাশ হইয়াছে। তবে যিনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ রাজ্য রক্ষা, দেশ-রক্ষা করিয়া কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ অনুশোচনা করে, তাঁহার চিরস্থায়িত্ব কামনা করে; আর যিনি অত্যাচার-পরায়ণ, উশৃঙ্খল, অসংযত, তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত জন-সাধারণ সততই অভিলাষী হয়। এভাব সকলে মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারিলেও, ইহাই স্বাভাবিক—ইহাই জগতের অবস্থা।

কোন দেশ কি কোন মহাদেশই চিরদিন স্বাধীন ছিল না, চিরদিন স্বাধীন থাকিতে পারে না। শক্তির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে তাহা শিথিল হয়, তাহার কার্য্যকারিণী শক্তি বিনষ্ট হয়। মানবের জীবনে যেমন বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, সমাজ-শরীরেও রাজত্ব-রক্ষা-ব্যাপারে এ ভাব পরিগৃহীত হইতে পারে। মানুষের শারীরিক, মানসিক সুস্থতা পরিরক্ষা করিতে হইলে যেমন উপযুক্ত খাদ্য, ব্যায়াম, নির্ম্মল পানীয়, বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন, রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব রক্ষার নিমিত্তও, তেমনি, প্রজারঞ্জন, ন্যায়-ধর্ম্মের অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। ন্যায়ধর্ম্মের অনুসরণ ও প্রজারঞ্জন সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়াই বিদ্রোহ, বিপ্লব ও অশান্তি উপস্থিত হয়।

শরীর রক্ষা, প্রাণ-রক্ষা যেমন মানবের কর্ত্তব্য, দেশ-রক্ষা, স্বার্থ-রক্ষাও তেমনই কর্ত্তব্য। সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম-রক্ষা। সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শত্রু আছে। দস্যু আছে। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে। তদ্ভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রু দমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে, পরম ধার্ম্মিকও এমন অবস্থায় অধর্ম্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না।" ধর্ম্মতত্ত্ব ৯৫ পৃষ্ঠা।

ঐ পুস্তকের অন্য স্থলে আছে,—

"যদি আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশ রক্ষাও ধর্ম্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না।"

সকল শ্রেণীর মানবকেই আত্মরক্ষার জন্য বল সঞ্চয় করা প্রয়োজন। রাজা, রাজ্য রক্ষার জন্য 'বল' সঞ্চয় করিবেন; প্রজা, প্রজাত্ব, আমিত্ব পরিরক্ষার নিমিত্ত বল-লাভের জন্য সাধনা করিবেন। সংসারে আসিতে হইলে, জীবন-সংগ্রামে মানবকে জয়ী হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বল সঞ্চয়, বল সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। নচেৎ রাজার রাজ্য থাকে না, প্রজার সুখ শান্তি বিনষ্ট হয়। এই জন্যই ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতোবিদ্রুতে ভয়াৎ
রক্ষার্থ মস্য সর্ব্বস্য রাজানাম্ সৃজৎ প্রভুঃ।

জগৎ অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে আকুল হয়, এইজন্য সমুদয় চরাচর রক্ষার জন্য পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

অন্যত্র,—

মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবাঃ॥

যে রাজা নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু উগ্রভাবে প্রজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি অচিরাৎ রাজ্য-ভ্রষ্ট ও সবংশে ধ্বংস হন।

রাজা প্রজার সম্বন্ধ, অতি পবিত্র, অতি গুরুতর। ভারতীয় ক্ষত্রিয় নরপতিগণ অপত্য নির্ব্বিশেষ প্রজা পালন করিতেন। প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত অযোধ্যাধিপতি ভগবান রামচন্দ্র সাধ্বী পত্নী সীতা দেবীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সকল কথা ঐতিহাসিক সত্য হইলেও, আজি কালিকার দিনে যেন আকাশ-কুসুমবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের রাজা প্রজার সম্বন্ধ যেন খাদ্য খাদক। নির্ভীক, স্বাধীন-চেতা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"যে সমাজে রাজ শাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তি-গণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায়, সে তার কড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি, তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়।"

রাজা যদি প্রজাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে সন্দর্শন করেন, প্রতিপালন করেন, তবে প্রজার আত্মরক্ষার জন্য চিন্তিত হইতে হয় না। কিন্তু রাজা যদি প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া লইতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন, প্রজার জীবন রক্ষা হউক কি বিনষ্ট হউক, সেদিকে দৃষ্টি না থাকে; কেবল আত্ম সুখ, আত্ম স্বার্থ সাধনে তৎপর হন, তবে সে স্থলে, প্রজার আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। অন্য দেশের কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা কেবল ভারতের রাজা প্রজার সম্বন্ধই এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ইংরাজগন সর্ব্ব প্রথম এদেশে বণিকবেশে আগমন করেন। কিন্তু যে সময় ভারতে উপনীত হন, সে সময় মোগল সম্রাটের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইতেছিল। ইংরেজ বণিকগণ গুপ্ত শৃগাল বৎ গুহায় অবস্থান করিতেছিলেন। অশুভক্ষণে দিল্লীর সম্রাট-তনয়ার স্ফোটক হইয়াছিল; অশুভক্ষণেই বৌটন নামক ইংরেজ চিকিৎসক সম্রাট-তনয়াকে আরোগ্য করিয়া সুতানটী গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে বানিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন। ইংরেজ রাজত্বের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

কি ইংরেজ বণিক, কি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, সর্ব্বত্রই ইহাদের স্বার্থ সমসূত্রে অবস্থিত, সমসূত্রে গ্রথিত। ইংরেজের রাজত্বের মূল ভিত্তি স্থাপনা বণিকবেশে, রাজ-কার্য্য পরিচালনা বণিক ভাবে, প্রত্যেক কাজেই বণিকবৃত্তির প্রভাব সুপরিস্ফুট।

আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত লোক মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, নবাবী বাদসাহী অত্যাচার হইতে পরিরক্ষার জন্য ভগবান ইংরেজ জাতিকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, ইংরেজ-প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে ধর্ম্মার্থ কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে। এ বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে; সুখের নেশা বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণ পূর্ব্বকৃত পাপ কার্য্যের জন্য গতানুশোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

ইংরেজী শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, ভব্যতার অনুসরণ করায় আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, আমাদের আত্ম রক্ষার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের কোন কোন বিষয়ে উপকার হইলেও, মোটের উপর অপকারই হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষায় আমরা জাতীয়ত্ব হারাইয়াছি, জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি যে স্বদেশানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ইংরেজের মূলনীতি—স্বার্থপরতা; আমাদের মূলভিত্তি—পরার্থপরতা; সুতরাং এই বৈষম্যভাবে উভয় জাতির মধ্যে আমরাই ক্রমশঃ সঙ্কুচিত, হীনবীর্য্য হইয়া যাইতেছি।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, ইংরেজের সকল কাজেই বণিকবৃত্তি। কি দেশপালন, কি রাজ্যশাসন, সর্ব্বত্রই এই বণিকভাব দেদীপ্যমান। ভূমির কর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যাহা ধার্য্য হইয়াছিল, রেগুলেশন দ্বারা প্রচার করা হইয়াছিল যে, আর কস্মিন কালেও এই করের বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু সেই ভূমির উপর পথকর, পাবলীক ওয়ার্কসেস্ প্রতি দশ বৎসর অন্তরই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া "খাজানা অপেক্ষা বাজনার বৃদ্ধি" কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। বিচার ও শাসন বিভাগের ত কথাই নাই। দিন দিন টেক্‌সে টেক্‌সে লোক নিরন্ন ও জ্বালাতন হইয়া উঠিতেছে। বিচার বিভাগে একরূপ বিচার বিক্রয়ই হইতেছে। পাঁচ টাকার অথবা পাঁচ পয়সার একটী নালীশ করিতে হইলে ন্যুনকল্পে দশ টাকা ব্যয় করিতে হয়। অর্থী প্রত্যর্থী উভয় পক্ষ যদি ন্যায় বিচারের জন্য, ইংরেজের ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হন, তবে পাঁচ টাকায় পাঁচ শত অথবা পঞ্চদশ সহস্র রজত মুদ্রা ব্যয় হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। এ তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে বুঝান বিড়ম্বনা, বিচার আদালত সংস্পর্শে যতগুলি লোক সংসৃষ্ট, সকলেই এক একটী মূর্ত্তিমান বণিক,—স্বার্থপরতার মহান ও বিরাট জীবন্ত রাক্ষস। ব্যবসায়িগণের দোকানের সহিত ইংরেজের আদালতের সাদৃশ্য আছে। ব্যবসায়ীর দোকানে মূল্য দিয়া জিনিস খরিদ করা হয়, ইংরেজের আদালতে, অর্থ ব্যয়ে বিচার-প্রার্থী হইতে হয়। এ রহস্য অবগত নহেন, এরূপ মানব ভারতে বিরল।

প্রাচীন ভারতে যাহা ছিল, নব্যভারতে তাহার কিছুই নাই। বিপরীত ও বিপর্য্যয় ভাব ভারতকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ভারত এক্ষণে দানবের করাল বদনের ভিতর নিপতিত।

বাল্যকালে পাঠ করিতাম, রুশিয়ায় নিহিলিষ্ট, ইংলণ্ডে সোসিয়ালিষ্ট, ফ্রান্সে কমিউনিষ্ট নামে এক এক সম্প্রদায় আছে। সে সকল সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য, ধনীর গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিয়া দরিদ্রকে প্রদান করা; রাজশক্তি অযথা ভাবে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে, তাহাকে প্রহত করিয়া যথাভাবে শক্তি পরিচালন করিতে দেওয়া। এ সকল কাজে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কত লোকের জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। পাঠ করিতাম, আর মনে করিতাম যে, এই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক কি লোমহর্ষণ ব্যাপার উপস্থাপিত করে। ইহাদিগকে দস্যু আখ্যা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। এক্ষণ দেখি, সমাজ রক্ষা, দেশ রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইলে, এরূপ দলের, এরূপ সম্প্রদায়ের গঠন প্রত্যেক দেশেই আবশ্যক। নহিলে জীবন-যুদ্ধে আমরা ক্রমশঃ রসাতলেই যাইতে বসিব।

এ দেশ সাত্ত্বিকভাব প্রধান। ধর্ম্ম-প্রধান বলিয়া, সকলে কর্ম্মের প্রতি আনুরক্তি প্রকাশ করিতেন না। ফলে সন্ন্যাসী ফকিরের যেরূপ দুরবস্থা হয়, এ দেশবাসীরও তাহাই হইয়াছে। যে দেশ অন্নপূর্ণার বাসভূমি, পৃথিবীর সমস্ত স্থানের অন্নাভাব যে দেশ হইতে দূরীভূত হইত, সেই দেশের লোক অশন বসনে ক্লিষ্ট, জীর্ণ শীর্ণ। কোটী কোটী লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে, বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া অবস্থান করিতেছে। ভারতবাসী যদি আত্ম রক্ষায় যত্নবান হইত, তবে এ কষ্ট পাইতে হইত না।

প্রত্যেক দেশের ধনাগমের মূলকারণ,—শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য। দ্বিতীয় কাজটী এদেশে একরূপ চলিতেছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় কার্য্য একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। শুধু কৃষিকার্য্যে কোন দেশ চলিতে পারে না, বিশেষতঃ ভারতের ন্যায় বহু-জন-পরিপূর্ণ স্থান। ইংরেজ বণিক এদেশে আগমন করিয়া, কতক অত্যাচার দ্বারা ও কতক প্রলোভন দ্বারা, এদেশবাসীর শিল্প বাণিজ্য নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবাসী মনে করিলেন, ইংরেজ বণিক আমাদের রাজার জাতি, ইহারা যখন আমাদের মুরুব্বি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আর আমাদের চিন্তা কি? সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহারা বিশ্রাম সুখলাভ করিতে লাগিলেন। বিশ্রামসুখে ক্রমে বিলাসিতা আক্রমণ করিল। ফলে সকল কার্য্য বিনষ্ট হইয়া গেল। এক্ষণে মস্তকে হাত দিয়া কেবল হায় হায় করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন!

আমরা নানাবিধ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের সুখ সৌভাগ্য সমস্তই হারাইয়াছি। আমরা ইংরেজী শিক্ষা করিয়া মনে করিয়াছিলাম, কত বড় পণ্ডিত হইয়াছি। গবর্ণমেন্ট আফিস আদালতে কার্য্য পাইয়া নিজকে খুব সুখী মনে করিয়াছি। বংশ পরম্পরায় এই যে সুখের নেশা, ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া গোলামীর শেষ পরিণাম যে অপার দুঃখ, তাহাই আমারে উপস্থিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনই আমাদের সকল প্রকারের সুখ-সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধনের একমাত্র উপায়। এই আন্দোলনকে জীবনের প্রধান সম্বল মনে করিলে, ইহার প্রভাব প্রাণে অনুভব করিলে, বীরের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিলে, আমাদের দুঃখ দুর্গতি বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের যেরূপ বিদ্বেষ ও রুদ্রমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, এ ভাব বুঝি গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিতে দিবেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের রাজা বণিক্, প্রত্যেক কাজেই এই বণিক ভাব। কাজেই বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে বণিক ব্যবসায়ীর বিশেষ ক্ষতির কারণ। এজন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রযত্নে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন।

এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? গবর্ণমেণ্ট আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে আমরা ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া যাইব, কি গুর্খার গুতা, পুলিসের জুতা খাইয়াও স্বীয় দেশের শিল্প-পণ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিব? বোধ হয়, সকলেই বলিবেন কপালে যাহাই থাকুক, দেশের শিল্প বাণিজ্যে যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, প্রাণ পণে তাহাই করিব। কারণ, যাহার উপর জীবন মরণের ফলাফল নির্ভর করিতেছে, সে কার্য্যে ভীরুতা নীচতা প্রকাশ করা, পুরুষত্বের পরিচায়ক নহে, প্রত্যুত কাপুরুষতা পরিব্যঞ্জক।

আত্মরক্ষা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিও

করে। জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব সবল দেহ, হস্ত পদ, বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া জড় পিণ্ডবৎ বসিয়া থাকিবে, আর দুর্দ্দান্ত পিশাচের দল, তাহার রক্ত মাংস লইয়া খাইয়া স্বীয় ভাণ্ডার পরিপূরণ করিবে, ইহা জীবন থাকিতে দৃষ্টি করা বড়ই কষ্টকর।

ভাই বাঙ্গালি! আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে, বন্দে মাতরম্ রবে দিক্‌দিগন্তর বিকম্পিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। চির দিনই ত এ জীবনের মায়া করিলে। দেখিলে, এ জীবনের মূল্য এক কাণাকড়িও নহে। তোমারা যে-সে দেশের লোক নহ। তোমরা সেই দেশের লোক, যে দেশের লোক পঞ্চ নদের পবিত্র কূলে বসিয়া, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উচ্চৈস্বরে বলিতেন,—বন্দে মাতরম্। তোমরা সেই দেশের লোক, যে দেশের অসংখ্য নরনারী গললগ্নীকৃত-বাসে, ভক্তিভরে, বিনম্র বদনে বলিতেন, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। তোমরা সেই দেশের লোক, যে দেশের কোটী কোটী নর নারী সোৎসাহে বলিতেন, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। তোমরা সেই দেশের লোক, যে দেশে ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, ভারবী, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ; সাংখ্য, কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণ; মন্যত্রি বিষ্ণু হারিত বিংশতি সংহিতা-কারগণ; ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থমা, ভীম, অর্জ্জুন, অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ; বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রচারক-গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমরা মহা দেশের মহাবংশের লোক। তোমরা জুলু, জঙ্গলী কি অসভ্য দেশের লোক নও। তোমরা যে ভেড়ার মত পড়িয়া পড়িয়া প্রহার খাইতেছ, ইহা তোমাদের আত্মকর্ম্মের প্রতিফল। তোমাদের উপর সর্ব্ববিধ অত্যাচারই ইহ-য়াছে! সতীর সতীত্ব নাশের জন্য যে গবর্ণ-মেণ্টের দ্বিধা নাই, যে গবর্ণমেণ্ট গুরখা বসাইয়া মা ভগিনী নির্ব্বিশেষে সকলের উপর প্রকাশ্য অত্যাচারের ঘোষণা করিতে পারে, সে গবর্ণমেণ্টের সততায়, সে গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্যতায় আর ভুলিও না। আত্ম শক্তি জাগরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। সর্ব্বদা জপ কর, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।" জীবনের মূল্য যখন এক কাণা কড়িও নহে, তখন জীবনের জন্য ভয় কিসের?

শ্রীগোপাল নারায়ণ মজুমদার।

---

# উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

## সর্ব্বোপনিষৎসার।

প্র। আত্মার বন্ধন কিবা, মোক্ষ কিসে হয়?
অবিদ্যা কি, বিদ্যা কিবা? কহ দয়াময়।
উ। দেহ ও ইন্দ্রিয়গণে আত্মা বলি জ্ঞান,—
সেই ত বন্ধন, বৎস, বুঝহ সন্ধান।
"এই আমি, এই আমি," বলি হস্ত দিয়া
দেহেরে দেখাও তুমি নিশ্চয় করিয়া;
কিন্তু তুমি দেহ নহ, জানিবা নিশ্চয়;
দেহে আত্মজ্ঞান-ই ভ্রম, সেই বন্ধ হয়।
অবিদ্যা করিছে এই ভ্রম উৎপাদন,
বিদ্যা জনমিলে ভ্রম হয় বিমোচন।
এ ভ্রম ঘুচিয়া গেলে বন্ধ ঘুচি যায়।
বন্ধ-মুক্ত হ'লে মোক্ষ, নাহিক সংশয়।

প্র। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, তুরীয় ভাবের
স্বরূপ শুনিব, দেব, বাসনা মনের।
উ। মন আদি চতুর্দ্দশ করণ * সহায়ে,
ইন্দ্র † আদি চতুর্দ্দশ দেবতা আশ্রয়ে,
শব্দ ‡ আদি চতুর্দ্দশ স্থূল বিষয়,
উপভোগ করে আত্মা জাগ্রত সময়।
আত্মা এ সময়ে মন আদি দিয়ে
বাহ্য জগতে পশি,
শব্দ, স্পর্শ আদি করে উপভোগ
দেহের মাঝারে বসি।
বাসনা লাগিয়া এ বাহ্য সম্ভোগ,
বাসনা পূরাতে তিনি,
শব্দ স্পর্শ আদি উপস্থিত যবে,
করেন ভোগ তখনই।
কিন্তু শব্দ স্পর্শ আদি চতুর্দ্দশ
নাহি উপস্থিত যবে,
তখনও জীবাত্মা বাসনার বশে
উপভোগ করে সবে;
মন বুদ্ধি চিত্ত আর অহঙ্কার
এ চারি আশ্রয় করি,
করে উপভোগ কল্পিত বিষয়; ২
স্বপন নাম তাহারই।
স্বপনে জীবাত্মা করেন সম্ভোগ
কল্পিত বিষয় সব।
বাসনা কেবল কারণ ইহার,
মন আদিতে অনুভব।
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
স্বপ্নে নিষ্ক্রিয় হয়।
মন বুদ্ধি চিত্ত আর অহঙ্কার
এ চারি প্রবুদ্ধ রয়।
এরাও সুপ্তিতে হয় নিষ্ক্রিয়,
চতুর্দ্দশই হয় শান্ত;
বিষয়ের বোধ বিষয়ের জ্ঞান
সব হ'য়ে যায় অন্ত।
প্রত্যক্ষ থাকে না থাকে না বাসনা,
স্বকারণে হয় লীন,
চৌদ্দ-করণ চৌদ্দ-দেবতা
চৌদ্দ-বিষয়-হীন।
আত্মার সুষুপ্তি এই কহিনু তোমারে,
তুরীয় অবস্থা কহি, শুন ভক্তিভরে।
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুপ্ত, এ তিন ভাবের
উপশম যবে হয়,

---

* (বাহ্যজগৎ উপলব্ধি নিমিত্ত সচেষ্ট) মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা, নাসিকা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই ১৪।

† চন্দ্র, অচ্যুত, শঙ্কর, চতুর্ম্মুখ, দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও ব্রহ্মা—এই ১৪।

যেরূপ বিভিন্ন বস্তু সকলকে একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করুন। দেবতা, অর্থাৎ অনুগ্রাহক। তাৎপর্য্য এই যে, মন ইত্যাদি চতুর্দ্দশ করণ, চন্দ্র ইত্যাদি চতুর্দ্দশ প্রতিপাদ্য বিষয়কে (অর্থাৎ দেবতাকে) অবলম্বন করিয়া বাহ্যজগতে স্ব স্ব ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহাও ফলে শব্দ আদি বিষয় জীবাত্মা উপভোগ করেন। এই অবস্থাই অর্থাৎ যখন জীবাত্মা মন ইত্যাদি দ্বারা চক্ষু কর্ণাদির সাহায্যে জগৎকে উপলব্ধি করেন, তখন জীবাত্মার জাগ্রত অবস্থা।

‡ সংকল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মুখ-ব্যাদান, গ্রহণ, গমন, বিসর্গ, (মলমূত্র ত্যাগ) ও আনন্দ—এই ১৪।

এক্ষণে লক্ষ্য করিতে হইবে যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার দ্বারা সংকল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান উপভোগ হইতেছে। কর্ণ ত্বক্ চক্ষু রসনা নাসিকা দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, উপভোগ হইতেছে। এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ দ্বারা মুখব্যাদান, গ্রহণ, গমন, বিসর্গ, আনন্দ উপভোগ হইতেছে।

২ শব্দ আদি চতুর্দ্দশ বিষয় স্বপ্নে উপভোগ হয়; কিন্তু তাহা কল্পিত মাত্র।

ভাব কি অভাব কিছুই থাকেনা,
বিলুপ্ত হয় বিষয় ;
জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান প্রভেদ থাকেনা,
নাহি থাকে ব্যবধান,
শুধু স্বপ্রকাশ আত্মা সাক্ষী রূপে
ক'রে যবে অবস্থান ;
এক অদ্বিতীয় চৈতন্য যখন,
নিরুপাধি হ'য়ে রহে ;
সেই ত আত্মার চতুর্থ অবস্থা,
তুরীয় তাহারে কহে।

প্র। কহ দেব, অন্নময় কোশের লক্ষণ,
প্রাণময়, মনোময় কোশ বা কেমন।
কেমন বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ,
শুনিব আনন্দময় কোশ বা কিরূপ।

উ। বায়ু,অস্থি, মজ্জা, ত্বক্, মাংস ও শোণিত,
অন্ন হ'তে হয় জাত, জানিবা নিশ্চিত।
এসবে গঠিত দেহ, অন্নময় কোশ,
অন্নের বিকারে হয় দেহ পরিতোষ।
প্রাণ আদি চতুর্দ্দশ ৩ বায়ু যে সময়
অন্নময় কোশ সহ যুক্ত হ'য়ে রয়,
প্রাণময় কোশ তা'রে কহে সেই কালে,
বায়ু ৪ যোগে-অন্নময়ে প্রাণময় বলে।
প্রাণ আদি বায়ু যবে ক্রিয়া করে দেহে,
দেহ আর ক্রিয়া মাঝে জীব-আত্মা রহে ;
দেহ আর দেহ ক্রিয়া সমষ্টির নাম,
প্রাণময় কোশ, বৎস, বুঝহ সন্ধান।
অন্নময় প্রাণময় কোশ যুক্ত হ'য়ে
মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর অহঙ্কার ল'য়ে।
আত্মা যবে শব্দ আদি ৬ বিষয় নিচয়
ভোগ করে ; কিম্বা করে সঙ্কল্প নির্ণয় ;
মনোময় কোশ তা'রে কহে জ্ঞানীগণ,
বিবরিয়া কহি, বৎস, করহ শ্রবণ।
মন আদি ৭ চারি অন্তঃকরণের যোগে
অন্ন-প্রাণময় কোশে জীবাত্মা সম্ভোগে
বিষয় সকল, আর সংকল্প নিয়ম ;
তখন তাহারে কহে কোশ মনোময়।
আর, আত্মা এই তিন কোশ যুক্ত হ'য়ে,
বিশেষ ও অবিশেষ বুঝে যে সময়ে,
জ্ঞানময় কোশ তা'রে কহে জ্ঞানীগণ,
এই দুই ভেদই হয় জ্ঞানের লক্ষণ।
ব্যক্তিগত জ্ঞান যাহা তাহাই বিশেষ,
সামান্য যে জ্ঞান, বৎস, তাহা অবিশেষ ;
একটী বিষয় আর, তা'র বিপরীত,—
এ ভেদ জ্ঞানের মূল, বুঝহ নিশ্চিত।
অন্নময় কোশ, মনোময়, প্রাণময়,
এ তিন ব্যাপিয়া জীব আত্মা যবে রয়,
বিশেষ ও অবিশেষ বুঝিলে সে কালে,
জ্ঞানময় কোশ যুক্ত আত্মা তা'রে বলে।

৮ আনন্দময় কোশের লক্ষণ,
কহি শুন এই ক্ষণে ;
একথা বুঝিলে সকলই বুঝিবা,
বুঝিবা মূল কারণে।
বট বৃক্ষ-বীজ মাঝারে যেমন
বট বৃক্ষ রহে গুপ্ত।
প্রকৃতির মাঝে কোশ চতুষ্টয় ৯
সেই মত রহে লুপ্ত।
অজ্ঞান প্রকৃতি, বীজরূপে স্থিতি
সর্ব্ব কোশ তাহে রয় ;

---

৩ তাহা কল্পিত মাত্র। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, বৈরম্ভণ, স্থানমুখ্য, প্রদ্যোত ও প্রাকৃত।

৪ বায়ু শব্দে, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ক্রিয়া-শক্তিকে বোধ করে।

৬ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

৭ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার।

৮ আ, দীর্ঘ উচ্চারণ।

৯ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়।

সে প্রকৃতি মাঝে   আত্মা যবে রাজে,
সেই ত আনন্দময়।
আনন্দময়   কোশ তা'রে কহে
অব্যক্ত অরূপ ভাব।
মূল কারণ,   বুঝিলে তাহারে
দূরে যায় পরিতাপ। ১

১ অস্থি মাংসাদি যুক্ত স্থূল দেহই অন্নময় কোশ। প্রাণময় কোশ, দেহ ও দৈহিক ক্রিয়ার সমষ্টির নাম। প্রাণ, অপান, ইত্যাদি পঞ্চবায়ু দেহেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ক্রিয়াশক্তির নামান্তর মাত্র। প্রাণময়-কোশ বুঝিতে হইলে দৈহিক ক্রিয়াকে পৃথক্‌রূপে বুঝিতে হইবে। মনে করুন, একটী ভেকের মাথা কাটিয়া লওয়া হইল, সে মরিয়া গেল। এক্ষণে তাহার এক পায়ের উরুতে এক বিন্দু তীব্র জ্বালাকর-দ্রাবক পদার্থ দিলে, সে অপর পা ঠিক সেই বিন্দুর নিকট আনিয়া ঐ বিন্দুকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। ইহা দৈহিক-ক্রিয়া। কেহ চক্ষে খোঁচা দিবার ন্যায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে, যদিও নিশ্চয় বুঝি যে সে খোঁচা দিবে না, তথাপি চক্ষের পাতা পড়িয়া যায়। ইহাও দেহের ক্রিয়ামাত্র। এ সময়ে আত্মা মনোময় কোশে কিম্বা জ্ঞানময় কোশে অবস্থিত নাই, সেই জন্যই বিচারশক্তির ক্রিয়া নাই। আত্মা, এই সময়ে কেবল প্রাণময় কোশস্থ, সুতরাং শরীর ও তাহার ক্রিয়াবশতঃ চখের পাতা আপনি-ই পড়ে, ইচ্ছা পূর্ব্বক নহে। হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধকি, শ্বাসযন্ত্রের কুঞ্চন প্রসারণ, এ সকলও দৈহিক ক্রিয়ামাত্র। দেহ এবং দৈহিক ক্রিয়ার মূলে যে শক্তি নিহিত আছে, এতদুভয়ের একত্রে নাম দেওয়া হয়, প্রাণময় কোশ।

মনোময়-কোশ জগতের বিষয় সকল উপভোগ করিবার অব্যবহিত কারণ। দেহ এবং দৈহিক ক্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রিয় সংযোগে আত্মা বিষয় ভোগ করে; তাহারই নাম মনোময় কোশ। অবস্থায় ডাকিতেছি, তুমি শুনিতেছ না; এস্থলে জীবাত্মা মনোময় কোশ হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। কারণ কর্ণও আছে, তাহার ক্রিয়াশক্তিও আছে; কেবল মন সংযোগ না থাকায় শব্দ বোধ হইতেছে না। দেহ ও দৈহিক ক্রিয়ার সহিত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের যোগ হইয়াই শব্দ, স্পর্শ আদি বিষয় উপলব্ধি হয়। জীবাত্মা এই উপায়েই বিষয় উপভোগ করেন। ইহাকেই মনোময় কোশ বলে।

জ্ঞানময় কোশ। উক্ত কোশত্রয়ের সম্মিলনেই যে বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান হইবে, তাহা নহে। তুমি যে শব্দ শুনিলা, তাহা কিসের শব্দ, প্রকৃত বুঝিতে পারিলা না; এরূপ অনেক সময় হইতে পারে। কিন্তু যদি বিশেষ করিয়া সর্ব্ব প্রকার শব্দের সহিত তুলনা কর, তবে বুঝিতে পার যে, উহা কাকের শব্দ। কারণ, উহা কাকের শব্দের অনুরূপ, এবং অন্য শব্দের অনুরূপ নহে। এইরূপে যে কোন বিষয়ই হউক, তাহা এবং তাহার বিপরীত,—এই দুই-এর তুলনা করিয়া সর্ব্ব বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে। এই জন্যই বলে যে, জ্ঞান আপেক্ষিক। কিন্তু শব্দ এই মাত্র জ্ঞান সাধারণ অথবা সামান্য জ্ঞান; আর কাকের শব্দ, এই জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান। বিশেষ অবিশেষ, উভয় প্রকার জ্ঞানই পূর্ব্বোক্তরূপে জন্মে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মনোময় কোশ যেমন বিষয় উপভোগ করে, তেমনি বিষয় সকলকে বিশেষ ও অবিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইল আত্মা জ্ঞানময় কোশ যুক্ত হন। বিশেষ এবং অবিশেষ, এই প্রভেদ উপলব্ধি করাই জ্ঞানের মূল। প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, ইহা বুঝাই জ্ঞানের সফলতা। জীবাত্মার এই অবস্থার নাম-ই জ্ঞানময় কোশ।

আর আনন্দময় কোশ একবারে মূল অবস্থা। যেমন বটগাছের বীজের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে গূঢ়ভাবে সমস্ত গাছটাই রহিয়াছে, উপযুক্ত অবস্থায় উহা প্রকাশ হয় মাত্র, সেইরূপ প্রকৃতির মূল-কণিকা মধ্যে সমস্ত জগৎই ছিল, এবং আছে। কেবল উপযুক্ত সময়ে প্রকটিত হইয়াছে ও হইবে, এই মাত্র। আত্মা যখন গূঢ় ভাবে এই কণিকা-প্রবিষ্ট থাকেন, তখন তাহাকেই আনন্দময় কোশ বলা যায়।

প্র। কর্ত্তা কারে কহে   কারে কহে জীব,
কহ মোরে দয়া করি।
শুনিতে বাসনা   হ'য়েছে বড়ই
শুনিব পরাণ ভরি।

প্র। কর্ত্তা কে? করুণা করি কহ দয়াময়।
উ। দেহযুক্ত হ'লে আত্মা, কর্ত্তা নাম হয়।
স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহ-ধারী জীবাত্মা যখন,
সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি—এই তিন প্রাপ্ত হন।
ইষ্ট বুদ্ধি সুখ, দুঃখ বিপরীত তা'র,
শব্দ আদি পঞ্চ১ সুখদুঃখের আধার।
এই পঞ্চযোগে, ঐ তিনের২ আশ্রয়
করিলে দেহস্থ আত্মা, কর্ত্তা নাম হয়।
প্র। জীব কারে বলে? তার কিরূপ লক্ষণ?
উ। পাপ পুণ্য অনুসারে শরীর গ্রহণ
করেন যখন আত্মা, তখন তাঁহারে
জীব বলে; জীব হন দেহে বাস ক'রে।
পাপ পুণ্য কর্ম্মে জন্মে জ্ঞান ও সংস্কার,
এ দুই-এর হেতু দেহে বাস হয় তাঁর।
দেহ হ'তে দেহান্তর ভোগ এ কারণ;
দেহধারী আত্মা জীব, ইহাই লক্ষণ।

---

এই অবস্থায় বিষয় উপস্থিত নাই; বীজরূপে বিষয় সকল প্রকৃতিতে লীন, আত্মাও তদাশ্রিত। এ অবস্থায় বিষয় ভোগ না থাকায় ইহা সুখ দুঃখের অতীত সুতরাং আনন্দময়।

এইরূপে কোশ সকলকে বুঝিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জীবাত্মা কখন এক, কখন একাধিক কোশকে আশ্রয় করিয়া অন্য কোশ হইতে পারেন। এ অভ্যাস এ জীবনেই প্রায় প্রত্যহই হইতেছে। ইহা হইতেই এ জীবনের পরবর্ত্তী সময়েরও আভাস পাওয়া যাইতেছে। জীবাত্মাকে বহু প্রযত্নে ইচ্ছাসুরূপে কোশ হইতে কোশান্তর আশ্রয় করিতে অভ্যস্ত করিলে, যেমন জীবাত্মা ভোগের দ্বারা ক্রমে বিশুদ্ধ হইতে থাকিবে, তেমনি উন্নত কোশ আশ্রয় করিতে সক্ষম হইবে। ভোগবাসনা পরিত্যক্ত হইলে, ভোগের আধার-ভূত গুলি কোশ হইতেও আত্মা বিমুক্ত হইবেন। পরিশেষে আত্মা আনন্দময় কোশ আশ্রয় করত ক্রমোন্নতির শেষ অবস্থায় উপনীত হইবেন। এই অবস্থা নিষ্কল, নিরঞ্জ এবং অবিষয়।

১ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।
২ সুখ, দুঃখ ও বুদ্ধির।

প্র। ক্ষেত্রজ্ঞ কে? কহ দেব, কহ বিবরিয়া।
উ। গুরুতর কথা, সুধি, শুন মন দিয়া।
মন আদি৩, প্রাণ আদি৪, সত্ত্ব আদি৫, আর
ইচ্ছা আদি৬, পুণ্য আদি৭, পঞ্চবর্গ সার;
এ পঞ্চের নাশ কভু আত্মজ্ঞান বিনে৮
নাহি হয় এ সংসারে, বুঝি লও মনে।
এই আত্মা, নিত্য-আত্মা সন্নিধান বশে,
নিত্য বলি বোধ হয়, বুঝ অনায়াসে।
এই আত্মা, ইহাই ত লিঙ্গ-শরীর
হৃদ্‌গ্রন্থী, এর-ই নাম, বুঝি লও ধীর।
এই হৃদ্‌গ্রন্থী মাঝে চৈতন্য বিকাশ,
তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বৎস, তিনি স্বপ্রকাশ।
প্র। সাক্ষী কে? কূটস্থ কেবা? কেবা অন্তর্যামী?
তিনের লক্ষণ কিবা? কহ শুনি আমি।
উ। যিনি জানে, তিনি জ্ঞাতা; জানে যা'র বলে
তা'ই জ্ঞান; যাহা জানে, তাহাই বিষয়;—
জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান;—যিনি উপলব্ধি করে
এ তিনের উৎপত্তি, তিনের বিলয়;
কিন্তু উৎপত্তি বিলয় নাহিক যাঁহার,
তথাপিও স্ব-প্রকাশ, সাক্ষী নাম তাঁ'র।
উৎপত্তি, বিলয়, তিনি বুঝেন সকল,
দেখেন, বুঝেন,—তিনি সাক্ষী অচঞ্চল।
তাঁহারই সাক্ষাতে উৎপত্তি বিলয় হয়;
তাই সাক্ষী তিনি, বৎস, বুঝিও নিশ্চয়।
কূটস্থ বুঝিতে, অগ্রে বুঝ এক ক'রে
ভিন্ন ভিন্ন যত আছে সংসার মাঝারে;

---

৩ মন বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার।
৪ প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান।
৫ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।
৬ কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভী, ধী।
৭ পুণ্য, পাপ, জ্ঞান, সংস্কার।
৮। বিনা, ব্যতীত।

ব্রহ্ম হ'তে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলই,
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সব চৈতন্য-মণ্ডলী ;
সকলের বুদ্ধি মাঝে অবিশেষ ভাবে
যে চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত, একরূপে জাগে ;
তাহাই কূটস্থ আত্মা, জানিও নিশ্চয় ;
সর্ব্ব বুদ্ধি, সর্ব্ব জ্ঞান, তাঁহারই আশ্রয়।
ভিন্ন ঘটে ভিন্ন বুদ্ধি, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান,
ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য, অসংখ্য প্রমাণ ;
কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র, কিছু ভিন্ন নহে ;
একমাত্র চৈতন্য সর্ব্ব ঘটে রহে।
সর্ব্ব বুদ্ধি, সর্ব্ব জ্ঞান, সকল চেতনা,
এক করি কূটস্থের করহ ধারণা।
মণিগণ সূত্রে থাকে গ্রথিত যেমন,
সেই মত যে আত্মায় নিখিল ভুবন
থাকে প্রতিষ্ঠিত, বৎস, জানিও তাহারে,
কূটস্থ কি অন্যবিধ উপাধি[৯] মাঝারে
তিনিই কারণ এক ; এই ভাবে তিনি
সর্ব্বগত এক-আত্মা, সর্ব্ব অন্তর্যামী।
অন্তর্যামী তাঁর-ই নাম, বুঝ সবিশেষ,
অশেষের মাঝে সেই আদি মধ্য শেষ।
প্র। প্রত্যগাত্মা,পরমাত্মা,আত্মা বলে কা'রে ?
উ। কহি বৎস, সেই তত্ত্ব, শুন ভক্তিভরে।
সকল উপাধি শূন্য, ভেদাভেদ-হীন,
আত্মা যবে জ্ঞানরূপ, চিন্মাত্রে বিলীন।
একমাত্র, স্বতন্ত্র, তখন তাঁহার
প্রত্যগাত্মা নাম, সুধি, এই বুঝ সার।
তত্ত্বমসি, তুমি তা'ই, এইরূপে যবে
জ্ঞানীগণ ডাকে তাঁরে এ নিখিল ভবে ;
সে সময় তুমি বলি সম্বোধে যাঁহারে,
তিনিই ত প্রত্যগাত্মা, শুন ভক্তিভরে।
প্র। কেমনে বুঝিব তবে সেই নিরঞ্জন ?
উ। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ ব্রহ্ম-ধন।

সত্য অবিনাশী, সত্য চির-প্রতিষ্ঠিত,
নাম-দেশ-কাল-বস্তু-নিমিত্ত-অতীত।
এই পঞ্চ নাশ হ'লে, সত্য রহে স্থির,
তাই সত্য অবিনাশী, বুঝি লও ধীর।
জ্ঞানের উদ্ভব নাহি, নাহি তিরোধান,
উৎপত্তি-বিনাশ-হীন চৈতন্যই জ্ঞান।
অনন্ত নাহিক অন্ত, গূঢ় সর্ব্বময়।
মৃত্তিকা যেমন ঘটে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়[১],
কুণ্ডলে যেমতি স্বর্ণ রয়েছে ব্যাপৃত,
বস্ত্রে যথা তন্তু রহে সর্ব্বত্র গ্রথিত।
মৃত্তিকা, সুবর্ণ, তন্তু অব্যক্ত সকল,
ব্যক্তরূপ মাত্র ঘট, বস্ত্র ও কুণ্ডল।
সেই মত ব্যক্ত বিশ্বে অব্যক্ত হইয়া
যে চৈতন্য সর্ব্বমাঝে রয়েছে ব্যাপিয়া,
অনন্ত তাহার-ই নাম, সর্ব্বময় তিনি,
তিনিই প্রধান, তাঁরে জ্ঞানে বুঝে জ্ঞানী।
আনন্দও নাম তাঁ'র, সুখের স্বরূপ,
অগাধ অসীম সুখ-সমুদ্রের রূপ।

ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, বিবিধ দেহেতে
বিবিধ আনন্দ রাশি
উথলি পড়িছে, জগৎ মাঝারে ;
কি সুখের মেশামিশি !
এ সব সুখের অসীম আধার,
মহা আনন্দের মেলা।
অনন্ত আনন্দ স্বরূপ তিনিই ;
আনন্দ তাঁহারই খেলা।
সত্য আর জ্ঞান অনন্ত আনন্দ
দেশ কাল নাহি মানে,
না মানে নিমিত্ত, সত্য সদা সত্য,
সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব স্থানে।
এই চতুষ্টয়[২] স্বরূপ যাঁহার,
সে মহা চৈতন্যে ভাব।

৯ লক্ষণ।

১ রহে।
২ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ।

ভাবো বৎস তাঁরে, তিনি পরমাত্মা,
পরব্রহ্ম, নিত্যভাব।
"তত্ত্বমসি" পদে "তৎ" পদ তিনি,
তিনি "ত্বং" তিনি "তৎ,"
এ দুই-এর পারে, দুই-এর-ই অতীত,
তিনি শুদ্ধ, তিনি সৎ।
এই দুই উপাধি হইতে বিভিন্ন,
তিনি সূক্ষ্ম আকাশ-বৎ।
তিনি সর্ব্বগত, সত্তা মাত্র তিনি,
তিনি শুদ্ধ, তিনি সৎ।
এ ভাবে তাঁহারে, বুঝ আত্মা রূপে
এই ভাবে তিনি আত্মা;
প্রত্যগাত্মা আর পরমাত্মা যিনি,
এই ভাবে তিনি আত্মা।
প্র। মায়া কি? বিবরি মোরে কহ দয়া ক'রে।
উ। বড়ই কঠিন প্রশ্ন, শুন ভক্তিভরে।
ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, মায়া হেতু বিকারের;
সে বিকার হেতু হয় বিশ্ব-প্রসবের;
সে বিকার গতে বিশ্ব ব্রহ্মে হ'বে লয়,
পূর্ব্বেত ছিল না মায়া, পরে নাহি রয়।
এহেতু অসৎ তা'রে কহে জ্ঞানীগণ;
তবু৩ সৎ, ছিল মনে ব্রহ্মে নিমগন।
সৎ ও অসৎ, এই দুই-ই হয় মায়া,
কিন্তু পুনঃ দুই-ই নহে, নাহি তার ছায়া।
কোনই লক্ষণ নাহি, এহেতু মায়ার
নির্দ্দেশ নাহিক হয়; কি কহিব তা'র?
নিজের স্বরূপ নাহি প্রকাশে কখন,
অব্যক্ত তাহার-ই৪ বশে ব্যক্ত মাত্র হন।
নির্গুণে সগুণ করে, এই লীলা তা'র;
অদ্ভুত বিশ্বের খেলা, এ খেলা মায়ার।
অহো! এ খেলা মায়ার॥
ওঁ তৎসৎ।
শ্রীশশধর রায়।

৩ শুধাপিণ্ড।
৪ মায়ার।

# মরীচিকা।

সীমাশূন্য উত্তপ্ত মরুভূমিতে তৃষিত পান্থ যেমন মরীচিকা দেখিয়া জলাশয় ভ্রমে তাহার পশ্চাতে উর্দ্ধশ্বাসে প্রধাবিত হয়, তেমনি আমরা দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে এক আশা-মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম। কুহকিনী আশার মোহে সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সকল দায়িত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, সকল স্বার্থ পদদলিত করিয়া ছুটিয়াছিলাম। একদিন নয়, দুই দিন নয়, দেড় শত বৎসর এই আশার আলোময় পশ্চাতে ছুটিয়াছি। কিন্তু হায়! এতদিনে চৈতন্য হইয়াছে, এ আশা মরীচিকা মাত্র!

ভগবান এ কঠোর সত্য এখন সমগ্র জাতির সম্মুখে প্রকটিত করিয়াছেন। তাই নিদারুণ মর্ম্ম জ্বালায় আমরা ছটফট করিতেছি। ক্ষোভে, দুঃখে, গতানুশোচনার তীব্র বৃশ্চিক দংশনে প্রাণ অধীর হইয়াছে।

এতদিন ইংরেজকে আমরা ভারত-উদ্ধারের জন্য প্রেরিত ভগবানের দূত মনে করিয়াছি। তাই ইংরেজের হাতে ত্রিশ কোটি অধিবাসীর জীবনের দায়িত্ব-ভার ন্যস্ত করিয়া আমরা দীন-প্রজা সাজিয়াছিলাম। আমরা মনে করিতাম, যে স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরেজ আপন ধন-ভাণ্ডার হইতে অজস্র ধন বর্ষণ করিয়া অশিক্ষিত নিগ্রো জাতির দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করিয়াছিল, তাহারা সভ্যতার আদি-স্থান পবিত্র ভারতবর্ষকে উন্নতির উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী

হইবে। মহামতি 'মেকলে' বলিয়াছিলেন, ইংরেজ ভারতবাসীর উন্নতি সাধনের শুভ সংকল্প লইয়াই সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করিয়া এদেশে পদার্পণ করিয়াছে। আমরা 'মেকলে'-কথিত শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিয়া দিন গণিতেছিলাম, কিন্তু দেড় শত বৎসর অতীত হইয়া গেল, ভারত অদৃষ্টাকাশে আর সৌভাগ্য-রবি উদিত হইল না। এতদিনে আশার শেষ ক্ষীণ আলোক রেখাটীও নৈরাশ্যের নিবিড় তিমির-রাশির মধ্যে তিরোহিত হইয়া গেল।

ভারতের প্রজা চিরদিনই রাজানুগ্রহে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ রাজার চরণে অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভারতবাসী আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছে। রাজভক্তি আমাদের মজ্জাগত। এরূপ হইবার কারণ আছে। ভারতের প্রাচীন নৃপতিগণ প্রকৃতি-পুঞ্জকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। প্রজা-রঞ্জন করাই রাজার একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। তখন রাজা বিদেশী ছিলেন না, তাই রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হইত না; উভয়ের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন ছিল। প্রজার অশান্তি এবং অমঙ্গল ঘটিলে রাজা নরক গমনের ভয়ে অধীর হইয়া পড়িতেন। সেই জন্যই ভারতের প্রজা রাজভক্ত। যে দেশের রাজা কেবল প্রজার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীকে বনবাসিনী করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সে দেশের প্রজা আত্মশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তির উপর অধিক নির্ভরশীল হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

ইংরেজ যখন এ দেশের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল, তখনও এ দেশের প্রজা চির পরম্পরাগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইংরেজ-রাজকে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগের সহিত পূজা করিতে আরম্ভ করিল। ভারতের অধিবাসিগণ বিনা দ্বন্দ্বে, বিনা সংশয়ে রাজপুরুষদের হস্তে সকল ক্ষমতা প্রদান করিয়া সুখী হইতে অভিলাষ করিল। প্রাণের জ্বালায় অধীর হইয়া, আত্ম কলহের অনলে বিদগ্ধ হইয়া, শান্তির আশায়, ভারতবাসী আত্ম সমর্পণ করিল। তখন নির্ব্বিঘ্নে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই সকলের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইল। জাতির মঙ্গল, সমাজের পুষ্টি, দেশের উন্নতি প্রভৃতি সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠান সকলও রাজপুরুষদিগের হস্তে নিশ্চিন্তে প্রদান করিল। তখন এরূপও আশা হইয়াছিল যে, রাজা প্রজার ভিতর আর ব্যবধান থাকিবে না, শাদা কালোর পার্থক্য উঠিয়া যাইবে। এই দুরাশার মোহে পড়িয়াই, দেশের শিক্ষিত সমাজ, আপনাদের জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া, রাজপুরুষদের সহিত মিশিয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাই ইংরেজের ধর্ম্ম, ইংরেজের কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, এমন কি, বেশভূষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া সকলেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন। তখন মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া রাজার ভাষায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করাই স্পর্দ্ধার বিষয় ছিল। আমাদের যে মোহ-পাশ এখন ছিন্ন হইয়াছে! ভগবান সুসময়ে এই ভ্রান্ত, মায়ামুগ্ধ জাতির চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছেন। আজ মরীচিকা তিরোহিত হইয়াছে। পতিতপাবন এই পতিত জাতির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত না করিলে আরও যে কত কাল আমরা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিতাম, তাহা কে বলিতে পারে?

আঘাতের পর আঘাত করিয়া বিধাতা এই পতিত, সুষুপ্ত জাতির মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কৌশল অচিন্তনীয়, তাঁহার

কার্য্য মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। আমাদের হৃদয়-নিরুদ্ধ চিরপোষিত ভ্রান্তির মূল উৎপাটিত করিবার মানসেই ভগবান লর্ড কার্জ্জনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী কার্জ্জনী উৎপীড়নে আমাদের দেড় শত বৎসরের গভীর সুষুপ্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কার্জ্জন প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে নির্ম্মম আঘাত করিয়া চিররুদ্ধ স্বদেশ-প্রেমের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। সমবেত প্রজামণ্ডলীর তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ভারতবাসীর কোটী কোটী মুদ্রা তিনি দীল্লির তামসায় অপব্যয় করিলেন, কঠোর আইনের নাগ-পাশে সমগ্র জাতির কণ্ঠ রোধ করিলেন, তথাপি চৈতন্য হইল না। নিদারুণ আঘাতের যন্ত্রণায় সমস্ত জাতি কেবল একবার পাশ ফিরিল মাত্র,কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিল না, জাগরণ আসিল না, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তখন বঙ্গ বিভাগের ব্যবস্থা হইল। সেই ভীষণ শক্তিশেলের জ্বালায় সমগ্র জাতি উঠিয়া বসিল। শতাব্দীর প্রগাঢ় নিদ্রা দূরীভূত হইয়া গেল। তাই আজ জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তনের স্রোত দেখা দিয়াছে। বহু শতাব্দীর অবসানে বাঙ্গালায় নবজীবনের বিকাশ হইয়াছে। নবজীবনের চিহ্ন আজ সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে,গৃহে গৃহে নব জাগরণের নবোচ্ছ্বাস দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কার্জ্জন ভাগীরথের ন্যায় পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য স্বদেশপ্রেমের পবিত্র মন্দাকিনী স্রোত আনয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি কার্জ্জনের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

লর্ড কার্জ্জন আমাদের ভ্রান্তি দূর করিয়াছেন, অন্ধ বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। আমরা এতদিন আত্ম শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, স্বাবলম্বন বিসর্জ্জন দিয়া, রাজানুগ্রহ লাভই একমাত্র উন্নতির সোপান বলিয়া মনে করিতাম। পার্লিয়ামেণ্টের আইন এবং মহারাণীর ঘোষণা পত্রের কথা স্মরণ করাইয়া কখন জলদ গম্ভীর স্বরে, কখন বা তোষামোদ করিয়া রাজপুরুষদিগের নিকট সময়ে অসময়ে কত দাবীই করিয়াছি! কিন্তু বার বার উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত এবং বিড়ম্বিত হইয়াও নিরাশ হই নাই। ভাবিয়াছি, আজ না হয় কাল মনোরথ পূর্ণ হইবে। পরম হিতৈষী লর্ড কার্জ্জন সর্ব্ব সমক্ষে আমাদের পবিত্র দলিলপত্রগুলিকে পদদলিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, উহাতে কোনই পদার্থ নাই, উহা ছায়া মাত্র। মিছামিছি আমরা উহাদিগকে ম্যাগনাকার্টার সহিত তুলনা করিয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতেছি।

ইংলণ্ডের সমবেত প্রজাশক্তি রাজা 'জনের' নিকট হইতে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ম্যাগনাকার্টা আদায় করিয়া লইয়াছিল, তাহার সহিত আমাদের ঘোষণা পত্রের তুলনা করা বাতুলের কর্ম্ম। অনল এবং তাহার প্রতিচ্ছায়ার যে পার্থক্য, সর্প এবং তাহার খোলসে যে পার্থক্য, ম্যাগনাকার্টা ও ঘোষণা-পত্রে সেই পার্থক্য। ইংলণ্ডের ম্যাগনাকার্টার পশ্চাতে সমগ্র প্রজাশক্তি বিনিদ্র নয়নে সশস্ত্র বিদ্যমান। তাহার একটী অক্ষরের ব্যতিক্রম ঘটিবার সাধ্য নাই। প্রথম চার্লস্ প্রকৃতি-পুঞ্জের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রজাশক্তির নিদর্শন স্বরূপ ম্যাগনাকার্টাকে পদদলিত করিয়াছিলেন, উদ্ধত জনসাধারণ তাহার মস্তকচ্ছেদ করিল। দ্বিতীয় জেম্‌স ম্যাগনাকার্টা-প্রদত্ত অধিকার বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে তিনি রাজসিংহাসনচ্যুত হইলেন; ইংলণ্ডে তাহার মস্তক রাখিবার স্থান হইল না।

যদি আমাদের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ম্যাগনাকার্টা স্বরূপ ঘোষণা পত্রও পদদলিত হইত না; রাজপুরুষেরা অবিচলিত চিত্তে আমাদের ন্যায্য দাবী হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে সাহস পাইত না; লর্ড সল্‌স্‌বেরীও প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া ঘোষণা-পত্রকে রাজনৈতিক কপটতা মাত্র (political hypocrisy) বলিবার সময় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিতেন। যাহার শক্তি নাই, তাহার নিকট কেহই মস্তক অবনত করে না। সবল দুর্ব্বলের নিকট কৃত-অঙ্গীকার রক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে না। স্বেচ্ছায় আত্মশক্তি কেহ খর্ব্ব করিতে চায় না। সুতরাং ইংরেজ-রাজ-পুরুষদের নিকট আমাদের আবেদন নিবেদন বৃথা।

কবি বলিয়াছেন "To be weak is miserable, doing or suffering," ইহা বড়ই খাঁটি কথা। সংসারে দুর্ব্বল হওয়াই বিড়ম্বনা। লর্ড কার্জ্জন এই সার সত্য উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব হইল; সমস্ত বাঙ্গালী জাতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কার্জ্জন তাহাতে একটুও ভীত বা বিচলিত হইলেন না। জন-সাধারণের উত্তেজনাকে তিনি sentiment বা ভাবপ্রবণতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। আবেদন, নিবেদন এবং অসার আন্দোলনকে তিনি গ্রাহ্যও করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন, বাঙ্গালী নির্ব্বিষ, বাঙ্গালী দুর্ব্বল। যদি বাঙ্গালীর বিষদন্ত থাকিত, তাহা হইলে তাহার গর্জ্জনে কার্জ্জন শঙ্কিত হইয়া স্বীয় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতেন।

দুর্ব্বলের কথা কেহ শুনিতে চায় না, ভিক্ষুককে কেহ সম্মান করে না; ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। মানুষ মাত্রই ক্ষমতা-প্রিয়; স্বেচ্ছায় কেহ আপন ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া পরকে সুখী করে না। ইহাকে দুর্ব্বলতাই বল আর স্বার্থপরতাই বল, ইহা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, সর্ব্বত্রই এই সত্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে।

আমাদের সহিত ইংরেজের জাতিগত, ধর্ম্মগত, ভাষাগত এবং আদর্শমূলক অনেক পার্থক্য রহিয়াছে, কিন্তু আয়র্লণ্ডের সহিত এই ইংলণ্ডের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তথাপি বহুবর্ষব্যাপী প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও আয়র্লণ্ডবাসী হোম্‌রুল্‌ প্রাপ্ত হইল না! কত বাদ বিসম্বাদ হইয়াছে, কত স্বদেশ-প্রেমিক নির্ভীক সুসন্তান ফাঁসী কাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, কিন্তু আজও আয়র্লণ্ডবাসী হোমরুল প্রাপ্ত হয় নাই। আয়র্লণ্ডবাসী আমাদের ন্যায় কৃষ্ণকায় নহে, বিজাতীয় কিম্বা বিধর্ম্মীও নহে; পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় তাহাদের এক শত সভ্যও রহিয়াছে, তথাপি তাহাদের সর্ব্ববিধ চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। আমরা এখনও আন্দোলন করিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে ন্যায্য দাবী লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা, বামনের চাঁদ ধরিবার আশার ন্যায় হাস্যজনক নয় কি? হায়! এখনও আমাদের চৈতন্য হইল না। ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় মরীচিকার পশ্চাতে এখনও আমরা ছুটিতেছি।

স্বভাব-দোষ সহজে দূর হয় না। যে জাতি চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে, আত্মশক্তি বিকাশের প্রয়াস কখনও করে নাই, সে জাতি সহজে পরানুগ্রহের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভিক্ষুক শত বার অপমানিত, লাঞ্ছিত হইলেও অন্যের দ্বারে যাচ্ঞা করিতে ঘৃণা বোধ করে না। লর্ড কার্জ্জন আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া গেলেন, আমরা অসার কল্পনাকে বাস্তবের

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখস্বপ্নে নিমগ্ন রহিয়াছি! আমরা দুরাশার কুহকে ভুলিয়া দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় গন্তব্য পথ সম্মুখে রাখিয়া ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। কার্জ্জনের চেষ্টায় বাঙ্গালী চৈতন্য লাভ করিল; সমগ্র জাতি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া জাগিল, কিন্তু আবার কাল-মরীচিকা তৃষিত পান্থের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করিল।

বিলাতে উদার নৈতিকদলের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইল, আমরা আবার 'আশার ছলনে' মজিলাম। আবার কত আশার কল্পনা-প্রাণে স্থান দিলাম। উদার-নৈতিক-দলের লোক, শুনিয়াছি, বড় ন্যায়-পরায়ণ, বড় পক্ষপাতশূন্য; তাঁহারা অত্যাচার অবিচার দেখিতে পারেন না; ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহাদিগের একমাত্র জীবনের ব্রত, তাই আমরা প্রপীড়িত জাতি আবার আশায় বুক বাঁধিলাম। ভগবান দেখিলেন, তিনি যে জাতিকে এত কৌশলে জাগাইলেন, মোহ-পাশ ছিন্ন করিয়া দিলেন, সে জাতি আবার ধরা পড়িতে যায়, সাধ করিয়া বিপথ-গামী হয়। পতিতের বন্ধু সর্ব্বদর্শী ভগবান, তাই আমাদের সে দুরাশারও মূলোৎপাটন করিয়া দিলেন। এবার জন্ মরলি ভারত-তরণীর কর্ণধার হইয়াছেন। ইনি সুবিখ্যাত এডমাণ্ডবার্কের মন্ত্রশিষ্য। যে বার্ক একদিন উৎপীড়ক ওয়ারেন্‌হেষ্টিংসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বৃটিশ জনসাধারণের সম্মুখে তৎকৃত অপরাধের বিচার করাইয়াছিলেন, মরলি সেই সদাশয় মহাত্মা বার্কের জীবনী-লেখক এবং তদীয় উদার-নীতির পরিপোষক। তাই সকলই আশা করিয়াছিল, মরলি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রূপ শক্তিশেল উন্মূলিত করিবেন। কিন্তু ভগবানের তাহা ইচ্ছা নয়; মরলির দোষ নাই। তাঁহার কি ক্ষমতা, ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করেন!

যদি বঙ্গ-বিভাগ রহিত হইত, তাহা হইলে বঙ্গে আবার শিথিলতা আসিত, আবার গভীর নিদ্রার আবির্ভাব হইত। সকল উৎসাহ, উদ্যম, কার্য্যতৎপরতা মুহূর্ত্তের মধ্যে লোপ পাইয়া যাইত। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, এ জাতি চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া জড়ের মত পড়িয়া থাকে। তাই তিনি অশান্তি এবং অতৃপ্তির নিরাকরণ করিলেন না। অধঃপতিত জাতির উদ্ধারের জন্যই মঙ্গলময় ভগবান এই সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

বিধাতার ইঙ্গিত আর কেহ উপেক্ষা করিও না। তাঁহার সুব্যবস্থার কেহ প্রতিবাদ করিও না, আর মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিও না। দেখিলে তো ভাই! যে মেঘের পানে তাকাইয়া ঊর্দ্ধমুখে বারি ভিক্ষা করিয়াছ, সে মেঘ কোমল হৃদয়ে বজ্র নিক্ষেপই করিয়াছে, বারি-বর্ষণ করিয়া তৃষিত কণ্ঠ শীতল করিল না। তবে আর কেন? এখন আর ভিক্ষার কথা মুখে আনিও না; আবেদন নিবেদনের উপর নির্ভর করিও না। এখন আত্মশক্তি পরিচালনের জন্য বদ্ধপরিকর হও। যে আপন শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করে, ভগবান তাহাকেই সাহায্য করেন।

এবার ভগবান আমাদিগকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন—ইহা গৌরবের পথ—আত্মমর্য্যাদার পথ। এ পথ ছাড়িয়া আর বিপথগামী হইব না। যতদিন বাঙ্গালী জীবিত থাকিবে, ততদিন এ স্বদেশী আন্দোলন

পূর্ণমাত্রায় চলিবে। বঙ্গ-বিচ্ছেদ রহিত হউক বা না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না; বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পথ আমরা ছাড়িব না, আত্মশক্তি বিকাশের প্রয়াস আমরা বিসর্জ্জন দিব না। আর মরীচিকা দেখিয়া ভুলিব না, আর প্রলোভনে মজিব না। ভাই! যে তোমাকে ভগবানের আদেশ উপেক্ষা করিতে বলিবে, আত্ম-প্রতিষ্ঠা শ্রম বিফল বলিয়া বুঝাইবে, তাহাকে দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিও, তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না। সে পণ্ডিত হউক, জ্ঞানী হউক, কিন্তু সে ভ্রান্ত, মরীচিকা দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

# সোণার বাংলা।

## ( নূতন সংস্করণ। )

আমার সোণার বাংলা,
এবার তোমায় দেবে ফাঁসি।
চিরদিন থাক্‌বে আকাশ, থাক্‌বে বাতাস,
ফুঁক্‌বে তুমি শিঙ্গে—বাঁশি।
ফাগুনে তোর আমের বনে
যাবেরে বোল্ ঝরে;
অঘ্রাণে তোর পাকা ধানে
মই দেবেরে আসি।
যাবেই শোভা, কায়া গো!
কাটাও স্নেহমায়া গো!
ও আঁচল্ বিছাবেরে শ্মশান মূলে,
নদীর কূলে কূলে;—
তোমারি মুখের বাণী বাজবে কাণে
অতীত কথার মত;
তোমার মুখে দেবে আগুন জ্বেলে
প্রাপ্তি হবে গয়া কাশী।
লীলাখেলা ফুরাল রে; বৃদ্ধকাল কাটিল রে;
এখন অঙ্গ হবে ধূলা মাটি
যাবে জীবন খানি।
দিন ফুরালো সন্ধ্যা হ'ল,
দীপ জ্বলে না ঘরে।
এখন চুলায় গেল খেলা ধূলো,
যমের কোলে বস্‌বে আসি।
ঘুঘুচরা ভিটেয়, মাঠে, বৈতরণীর খেয়া ঘাটে,
সারাদিন জ্বরে কাঁপা, বাঁশে ছাপা
তোমার পল্লী বাটে,—
তোমার কান্নাভরা আঙ্গিনাতে
জীবনের দিন কাটে।
মিছে ভাবাই, মর্‌বে সবাই
গরুর রাখাল, জমীর চাষী।
আজিতো মরণেতে দিয়েছ মাথা পেতে;
থাক্‌বে খালি গায়ের ধূলা, সেওত আবার
ধামা খানিক হবে।
গরিবের ধন যা আছে তাই,
দিব পায়ের তলে;
আমি নিজহাতে কিন্‌ব না তোর
দড়াদড়ি—গলার ফাঁসি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# নারবী প্রার্থনা।

## (স্বদেশী)

কবির কবিতা উঠেছে ফুটিয়া,
গায়কের গীত চলেছে ছুটিয়া,
বক্তা হয়েছে বাগ্মী।

সুপ্ত উঠেছে নিদ্রা টুটিয়া,
বিপ্র উঠেছে পূজা পাঠ নিয়া,
আজিকে সকলে যাগ্মী।

ক্ষীণ দুরবল বাহু ছিল যার,
সেও তুলিয়াছে বাহু দুটী তার,
পঙ্গু উঠেছে দাঁড়ায়ে।

মলিন ছেড়েছে চির-মলিনতা,
হতাশের প্রাণে নিত্য কাতরতা
গিয়াছে আজি মুছিয়ে।

অলস যে জন সে আজ কর্ম্মী,
পাতকী যে জন সে আজ ধর্ম্মী
"জাতীয় ধর্ম্ম" প্রান্তরে।

লক্ষ্যহীনের হয়েছে লক্ষ্য,
"অপারক" যারা তারাও দক্ষ,
সক্ষমের পার্শ্ব লভিরে।

লেখকের আজি লেখনীর তুলি,
অজস্র ঢালিছে সার কথাগুলি
"সংবাদ-পত্র" বাহিয়ে।

দ্বারে দ্বারে দ্বারে যেতেছে প্রচারি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলিয়া লহরী
আশার কাহিনী গাহিয়ে।

কৃষক সবলে ধরেছে লাঙ্গল,
তাঁতী শিখাতেছে তাঁতের কৌশল,
বণিক চলেছে বাণিজ্যে—

যেই "অন্ন বস্ত্র" আপনার ঘরে,
তাহাতেই সুখী "বাঙ্গলা" আজিরে
কি "সুখ" স্বদেশ-সমাজে।

আজি বালক বৃদ্ধ শিশু ও যুবক,
স্পর্শ করিয়া "জাতীয় পাবক।"
একই দীক্ষা যে লভেছে।

এক সূত্রে গাঁথা সব প্রাণতন্ত্র,
হৃদয়ে হৃদয়ে এক বীজ-মন্ত্র,
অন্তরে বাহিরে ধ্বনিছে।

পরাধীনতার যত হীন সাজ,
সঙ্কোচ সংশয় গুণ্ঠন লাজ,
আজিকে গিয়াছে ঘুচিয়ে।

এহেন প্রভাত এহেন অরুণ,
বঙ্গ-ললাটে আজি যে তরুণ
আগত গৌরব মাখিয়ে।

এ নব আলোক এ নব কিরণ,
মরণেতে দিবে অমর জীবন,
আজি যে বিধির করুণা।

লেগেছে বেদনা লভি পদাঘাত,
তাই বাঙ্গালীর আজ সু-প্রভাত
ছিলনা ব্যথার ধারণা।

আজি হইয়াছে বেদনার বোধ,
বদ্ধপরিকর নিতে প্রতিশোধ,
ঘুচাতে এ দুঃখ যাতনা।

কত যে লাঞ্ছনা কতই যে দুঃখ,
সয়েছে বাঙ্গালী নীরব মূক,
আজিকে আর ত স'বেনা।

হারায়ে ধরম, হারায়ে করম,
কত যে ব্যথায় ভেঙ্গেছে মরম,
কত যে শ্লেষের যাপনা।

কত ভিক্ষা-মাগা কত প্রত্যাখ্যান,
নিত্য ভিক্ষুকের শত অপমান,
তবু ত ভিক্ষা মিলে না!

আপনার ধন আপনি সাজায়ে,
দিয়াছে যাদের ভাণ্ডার ভরিয়ে,
মজুরীও তারা দেয় না!

আপন ভিটাতে করিয়াছে চাষ,
ওরা শস্য নেয় ভরিয়া আবাস,
এদের সন্তান ক্ষুধিত।

যারে জলাশয় করেছে খনন,
ওরা করে তাহে বারি আহরণ,
এদের পরাণ তৃষিত।

যাহাদের দেশ "সুজলা সুফলা,"
যাহাদের দেশ "শস্যতে শ্যামলা"
তাহারা মরুর প্রান্তরে।

তারা গৃহহীন, তারা অন্নহীন,
তারা বারি বিনা তৃষিত মলিন,
সকলি সঁপিয়া অপরে।

আপনার ঘরে আপনি বন্দী,
নাহি সুবিচার নাহিক সন্ধি,
চরণ-কর্দ্দমে মর্দ্দিত।

পথের কুকুর তারো আছে মান,
তাহারো অধম বাঙ্গালীর প্রাণ,
তাই ভেবে করে লাঞ্ছিত।

ধন লয়ে ধূলা, প্রাণ লয়ে জ্বালা,
অবোধে ভুলায় করি কত ছলা,
কুহকে রেখেছে পাশরি।

সুধা বলি বিষ দিতেছে বদনে,
আমরাও রত তাহাই লেহনে
পরিণাম সদা বিসরি।

ন্যায়েতে পালিবে তাহারা যে রাজা,
নিয়ত নমিব আমরা যে প্রজা,
আর ত সে কথা খাটে না।

নিজ পায়ে যার নাহিক বল,
অপরে রাখিবে সে শুধু ছল,
বোলনা সে কথা বোলনা।

আপনার পায়ে দাঁড়াও আপনি,
ভাইএ ভাইএ কর প্রাণের বাঁধুনি
এক সাধনা উদ্যাপনা।

আয়না আয়না, জেগেছেরে প্রাণ,
মহাকাল-ভেরী-ত্র্যম্বক-বিষাণ
বাজিছে "মাভৈ" আরাবে,

শিব-সুন্দর "কাল-ভৈরব",
সুন্দর কঠোর অপূর্ব্ব বৈভব,
পাপ-অসুর নাশিবে।

কালের কৃপাণে ধর্ম্মের শাণ
লাগিয়াছে আজ হয়ে তেজীয়ান
সে কৃপাণ খানি খোলরে।

শত বাহুবল করিয়া যোজিত,
খরসান অসি কর নিষ্কোষিত,
অন্যায় টুটিবে অচিরে।

এ ভারতবাসী এই হিন্দুস্থান,
চিরদিন রাখি সততার মান,
তস্করে পেয়েছে তাড়না।

আগন্তু, পথিক, বণিক, বা চোর,
যে ছলে বেঁধেছে ধরমের ডোর,
করেছে আশ্রয় কামনা।

দিয়াছে আশ্রয় দিয়াছে প্রেম,
অঞ্জলি অঞ্জলি দিয়াছে হেম
বিনিময়ে অবমাননা।

যে আসি দিয়াছে 'ন্যায়ের" দোহাই,
"চির ন্যায়দাস" এ ভারত তাই
লয়েছে আনত মস্তকে।

সত্যের চরণে ধর্ম্মের পায়ে,
যখনি আঘাত তখনি কাঁপায়ে
রিপুর হৃদয় আতঙ্কে।

জেগেছে ভারত রোষক্ষিপ্ত প্রাণ,
সবলে করেছে অন্যায় দমন,
এসেছে সেদিন আজিকে।

তাই এ বাঙ্গালী, সে ভারতবাসী,
ন্যায়ে নত সদা অন্যায়েতে রুষি
জাগিয়াছে আজ বিপাকে।

দেখমা বঙ্গ, জেগেছে সন্তান,
অভাগিনী, তব ভাগ্য অভিযান
অদূরে এসেছে দেখমা।

অয়িমা বঙ্গ! স্নিগ্ধ পয়োধরে
জাগ্রত সন্তানে আর ঘুম ঘোরে
পানেতে লুটায়ে দিও না।

জাগায়ে রাখো, জেগে মা থাকো,
আততায়ীদের সুদূরে রাখো
নতুবা বাঁচিবে কি দিয়া ?
চারিদিকে আজ এ প্রাণ-নিক্কণ,
গম্ভীর গৌরবে করিছে ঝনন্,
জন্মভূমিরে ছাপিয়া !
ঘোর অবিচার তমিস্রা-নিশীথে,
সুপ্তিবিহীন রহিয়া জাগ্রতে
"কোজাগর" সবে সাধিছে।
এ নব জীবন নব জাগরণ,
ব্যথিতা মায়ের ব্যথা বিমোচন
করিতে সবাই উঠেছে।
জননীর এই গর্ভ-বেদনা,
সন্তানেরা আর করেনা কামনা,
তাই—করেছে সকলে এপণ।
জননীর ব্যথা ঘুচাতে তাই,
ভাই সনে আজ জেগেছে ভাই,
লভিতে নূতন জনম।
শত সভাতলে, হের দলে দলে,
যবনে ব্রাহ্মণে বেঁধে গলে গলে
করিছে শকতি চালনা—
দিকে দিকে হের কি তেজ সঞ্চার,
ছোট বড় মাঝে ভেদ নাই আর,
একই কামনা সাধনা।
ধনী কি নির্ধনী, জ্ঞানী কি অজ্ঞানে,
সবাই জেগেছে আজিকার দিনে
আমরাই শুধু ঘুমাব ?
নারী কি শুধুই পাষাণ পুতলী,
তুচ্ছ হতে তুচ্ছ পথেরই ধূলি
এদিনে নিশ্চেষ্ট রহিব ?
আমরা যে মাতা, আমরা যে বধূ,
আমরা যে বোন, নহি জড় শুধু,
মোদের জাগিতে হবে না ?
আলোক-বিহীন অন্ধকারে বসি,
নিয়ত সাধিব নিজ ভাগ্যমসী,
মানুষের মত হব না ?
তাই আজ মোরা চাহি অধিকার,
চাহি মোরা পথ, ঘুচাতে আঁধার,
অচেতন প্রাণে চেতনা।
তোমরা ইন্ধন জ্বালাও সবলে,
আমরা আহুতি দিবগো সকলে
শুধুই বিফলে রব না।
পিতা পতি বন্ধুঃসোদর সন্তান,
যে পথে তাদের নিত্য হতমান,
সে পথ আমরা ত্যজিব।
তাঁদের প্রতিজ্ঞা তাঁদের শপথ,
না রাখিলে মোরা হইব পতিত,
এ কথা কভু না ভুলিব।
জননীর ঘরে যাহা কিছু আছে,
তাই আদরের আমাদের কাছে,
যতই তুচ্ছ সেঃহোক্ না।
গৃহলক্ষ্মী মোরা গৃহের কল্যাণ,
যাহে হবে তার রাখিব সে মান,
আমাদের এই সাধনা।
শিখাব মেয়েরে শিখাব বধূরে,
প্রতিবাসী জনে বলিব সাদরে
আজিকার এই কাহিনী।
বিদেশের বেশ, বিদেশের ভূষা,
বিদেশী জিনিষে এই ছার তৃষা,
আজি যে অন্তর-দাহিনী।
অপরের ধনে নিত্য ভিক্ষা দুঃখ,
নিজ সদ্য ধনে আছে স্বাস্থ্য-সুখ
পুণ্য পরাগ মাখান।
নারী মোরা কত পালিতেছি ব্রত,
সব হ'তে উচ্চ এ "জাতীয় ব্রত"
করিব এ ব্রত ধারণ।
ওহে দয়াময় সত্য সনাতন,
যদিও আমরা অতি ক্ষুদ্রতম
তথাপি আমরা জাগিব।
জন্মভূমির অগণিত দুঃখ,
ঘুচাতে যাঁহারা আজিকে উন্মুখ
তাঁদের কল্যাণ চাহিব
হেরিব জাগ্রত ! কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচাও বঙ্গের ঘোর পরমাদ,
শ্রীচরণে এই কামনা।
কল্যাণ-কুশল-বলে বলীয়ান,
কর দীননাথ বাঙ্গালীর প্রাণ
তব কৃপা বিনা চলে না।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

# ভারতের শিল্প-বাণিজ্য।

"The arrival in the port of London of Indian produce in India-built ships created a sensation among the monopolists which could not have been exceeded if a hostile fleet had appeared in the Thames." Tailor's History of India.

ভারতবাসীর বাণিজ্য-প্রবৃত্তি কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে মতদ্বৈধের সম্ভাবনা থাকিলেও, ভারতের পণ্যদ্রব্য যে একদিন তদানীন্তন সভ্য জগতের সমস্ত বাজার অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারে, এমন মূর্খ আজিও জন্ম গ্রহণ করে নাই। দু'চার জন ক্ষুদ্রচেতা স্বার্থান্ধ ইংরাজ ব্যতীত আর কেহই এ কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবে না। মালাবার কোষ্ট হইতে ভারতের শিল্প দ্রব্য সকল বিদেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক যে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িত, তাহা বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের শিল্প দ্রব্যের জন্য যে জগৎ এক সময়ে সোৎসুক নয়নে তাকাইয়া থাকিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুবিখ্যাত গিবন সাহেব, স্বীয় রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—

"The Indian commodities were sold at Rome at a hundred times their original price."

এই যে দেশ বিদেশে ভারতীয় পণ্যের আদর, উহা দ্রব্যের গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বীয় গুণে ভারতীয় পণ্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কাহারও অনুগ্রহ বলে নহে। ভারতীয় শিল্পী ও বণিক্‌কুলকে রাজশক্তির বলে অন্যায় অবিচারের সাহায্যে আপনাদের পণ্যদ্রব্য জগতের গ্রহণীয় করিতে হয় নাই। তাহা আপন মহিমাতেই জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সুযোগে জগতের ধনরাশি শতধারায় ভারত-সাগরে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। মুসলমান-রাজত্বে এ স্রোত বন্ধ হয় নাই। পলাসী যুদ্ধ পর্য্যন্তও ভারতের শিল্প-বাণিজ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। সে দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড কেন, সমগ্র ইউরোপের এমন কিছু ছিল না যে, ভারতের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিতে পারে। কিন্তু এ দিন রহিল না। ক্রমে ক্রমে ইংরাজ এ দেশে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, স্বার্থান্বেষী ফিরিঙ্গী বণিকদল রাজশক্তির সাহায্যে দেশীয় শিল্পের বিনাশ সাধন করিয়া ভারতের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ করিল। অপর দিকে পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধনের লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। কিরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচারে এ দেশের শিল্পের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে মৃৎ পাষাণেরও ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। ইংরাজ বণিকগণ আপনাদের দ্রব্য জোর করিয়া লোকের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল এবং এ দেশের শিল্পজাত দ্রব্য নাম মাত্র মূল্যে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিল। ফল স্বরূপ শিল্পিগণ স্বীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং অন্যরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইল। ইংরাজ বণিকেরা বলপূর্ব্বক কারিকরদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কাজ করাইতে লাগিল। অত্যাচার এতদূর পরাকাষ্ঠা লাভ করিল যে, কারিকরগণ আপন আপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া অকর্ম্মণ্যতার অজুহাত দেখাইয়া অত্যাচারী বণিকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হইল না। কি যাতনায়

মানুষ এরূপ কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারত-প্রজা যে আজ অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল, ভারতবাসী যে আজ সর্ব্ববিষয়ে জগতের নিকট হেয়, ভারত যে আজ লাঞ্ছিত, ইহা তাহার নিজকৃত পাপের ফল নহে। যত দিন ইংরাজ ভারতের রন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই, তত দিন ভারতের এ দুর্দ্দশা হয় নাই। স্বার্থপর ফিরিঙ্গী বণিকের আগমনেই ভারতের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন ভারতমাতা,—

"অপাত্রে বিশ্বাস করি দিলে খুলি দ্বার।
সেই হ'তে ভারতের দুঃখ দুর্ণিবার।"

কি কৌশলে, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রভাবে বিদেশীয় বণিক্ ভারতের শিল্প বাণিজ্য বিনাশ করিয়াছে, তাহা যাঁহারা অতি অনায়াসে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় প্রণীত "দেশের কথা" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র দুই চারিটী কথা অতি স্থূলভাবে বর্ণনা করিব।

বহির্ব্বাণিজ্যের পথ সমুদ্র, উপায় অর্ণবযান। বহির্ব্বাণিজ্য রাখিতে হইলে জাহাজ চাই। ভারতবাসীর কি জাহাজ ছিল? ছিল, এবং বাঙ্গালীই সে বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ে "নৌসাধনোদ্যতান্" বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাই। এখন তবে সে বিদ্যা গেল কোথায়? অজ্ঞলোক বলিবে, আমাদের অধঃপতন হইয়াছে, তাই ইংরাজ বিলাত হইতে জাহাজ আনিয়া আমাদের বাণিজ্য, ও হরিঃ, আমাদের নয়, তাদের বাণিজ্য চালাইতেছে। কেন যে অধঃপতন হইল, তাহার অনুসন্ধান কেহ করিবে না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন প্রথম এ দেশে আসে, তখন ভারতের পণ্য ভারতীয় জাহাজে ইংলণ্ডীয় বাজারে উপস্থিত হইয়া তথাকার ব্যবসাদারদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং—

"The ship-builders of the port of London took the lead in raising the cry of alarm, they declared that their business was on the point of ruin and that the families of all the shipwrights in England were certain to be reduced to starvation."

স্বদেশবাসীর এ ক্রন্দনে ভারতের বণিকরাজ আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না; এ দেশের নৌশিল্পের বিনাশ সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্তও কলিকাতা বন্দরে এমন সুন্দর সুন্দর অর্ণবপোত সকল শোভা পাইত, যাহা দেখিয়া বিদেশীর প্রাণে হিংসার উদ্রেক হইত। কেন না, তাহারা তখন এমন সুন্দর ও সুদৃঢ় জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিত না। তাহাদের জাহাজ ১২ বৎসরেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত। আর,—

"Many ships Bombay-built after running 14 to 15 years have been bought into the navy & considered as strong as ever." Lt. Col. A. Walker's Considerations on the affairs of India.

এতো গেল বাণিজ্য-পোতের কথা। যুদ্ধ জাহাজ সম্বন্ধে দেউস্কর মহাশয় তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, "বিজয়দুর্গ, কোলাবা, সিন্ধুদুর্গ, রত্নাগিরি, অঞ্জনবেল প্রভৃতি বন্দরে মহারাষ্ট্রীয়গণের সমরপোত নির্ম্মাণের "ডক" ছিল। মহারাষ্ট্র নৌসেনাপতি আঙ্গ্রের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত এক এক খানি জাহাজে চারি শত টন বা ৮০০০ হন্দর পর্য্যন্ত মাল বোঝাই হইত। তদ্ভিন্ন রণপোত সমূহে ১৬ হইতে ৭৪টী পর্য্যন্ত বড় বড় তোপ সুসজ্জিত থাকিত। প্রত্যেক জাহাজে ৩।৪ শত সৈনিক অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিত। সেকালের ইংরাজ ও পোর্ত্তুগিজদিগের রণতরী সমূহও উল্লিখিত রণপোত সমূহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট

বলিয়া বিবেচিত হইত।" বাঙ্গালীর জাহাজ-নির্ম্মাণ-কৃতিত্ব সম্বন্ধে লর্ড ওয়েলিস্‌লি বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে,—

"From the quality of private tonnage now at command in the port of Calcutta, from the state of perfection which the art of ship-building has already attained in Bengal (*promising still more rapid progress*...) it is certain that this port will always be able to furnish tonnage to whatever extent may be required."

হায়! হায়! যে শিল্প এত উন্নত হইয়াছিল এবং যাহার সম্মুখে আরও কত উন্নতির আশা ছিল, তাহা স্বার্থপর ফিরিঙ্গী বণিকের অর্থলালসা রূপ দুর্নিবার অনলে ভস্মীভূত হইয়া গেল! যে স্বার্থানুরোধে ইচ্ছা করিয়া আমাদের শিল্পের বিনাশ করিয়াছে, তাহারই কাছে শিল্পোন্নতির জন্য আমাদের আবেদন নিবেদন। ফল যা স্বাভাবিক, তাই—গুর্খার পদাঘাত আর রেগুলেশন লাঠীর গুঁতো।

আমাদের জাহাজ তো ফিরিঙ্গীর উদরে গেল, পোত পরিচালন বিদ্যার দশা কি হইল? কেন, যে পথে জাহাজ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা গিয়াছে, জাহাজ-পরিচালন-বিদ্যাও সেই পথেই গেল। কোম্পানি আইন করিয়া মুসলমান লস্করগণের বিলাত গমন নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। কেন না, তাহারা বিলাত যাইয়া ইংরাজ সমাজের যে চিত্র দেখিতে পায়, তাহাতে ইংরাজ-চরিত্রের উপর তাহাদের কিছুতেই সম্ভ্রম থাকিতে পারে না। আর, যদি এই prestigeই নষ্ট হয়, তবে রাজ্য চলিবে কিসের জোরে? সুতরাং শত শত প্রজার অন্ন মার। তাহাতে কি? স্বার্থ বড়, না রাজধর্ম্ম বড়? ইংরাজ আসিয়াছে স্বার্থের জন্য, ধর্ম্মের জন্য নহে। স্বার্থের যদি যায় সংঘর্ষণ, তাহার উচ্ছেদ করিতেই হইবে, ইহাতে ফিরিঙ্গীর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার নাই। কোম্পানির নিজের রিপোর্ট এই—

"The native sailors of India are, to the disgrace of our national morals, on their arrival here, led to scenes which soon divest them of the respect and awe they had entertained in India for the European character, ......the effects of it may prove extremely detrimental."

সুতরাং ভারতীয় লস্করের অন্ন উঠিল। কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া শক্তি আর কয় দিন থাকে? তাই জাহাজ পরিচালন-শক্তিও বিনাশ প্রাপ্ত হইল। বৈদেশিক স্বার্থপরতা ধীরে ধীরে কিরূপে আমাদের সকল শক্তি অপহরণ করিয়াছে, সে দুঃখের কাহিনীর অন্ত নাই।

"অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা।
মনসিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা॥"

যাঁহারা তর্ক তুলেন যে, ইংরাজ এ দেশে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অধঃপাতে লইয়া গিয়াছে, না আমরা অধঃপাতে গিয়াছিলাম বলিয়া ইংরাজ এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা একবার ইংরাজাধীনতায় ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ-রহস্য উদ্ঘাটন করুন, খাটি মীমাংসা প্রাপ্ত হইবেন। গৃহস্থ অতিথি সংকার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিল, অতিথি এই সুযোগে যদি তাহার বুকে ছুরী বসাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই গৃহস্থকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন না। গৃহস্থের যদি কিছু দোষ হইয়া থাকে, তাহা এই যে, সে তস্করকে সাধু মনে করিয়াছিল। অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া লগুড়াঘাতে তাহার প্রাণ বিনাশ করাটা ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে কি?

যে অকথ্য অত্যাচারের বলে ইংরাজবণিকগণ এ দেশের শিল্পের বিনাশ ও আপনাদের

স্বার্থ সাধন করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারেরা পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইলেন—

"We think vast fortunes acquired in the inland trade have been obtained by a scene of most tyrranic and oppressive conduct that was ever known in any age or country."

কোন দেশে, কোন কালে এরূপ অত্যাচার হয় নাই। এই অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই তো, বঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য রক্ষা করিতে যাইয়াই তো নবাব সিরাজ ইংরাজের বিষনয়নে পতিত হইলেন, এই জন্যই তো স্বাধীনচেতা নবাব মির-কাশিমকে ইংরাজের স্বার্থানলে স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিতে হইল। এই অত্যাচার নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াই তো মহারাজ নন্দকুমার কোম্পানির শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইলেন। কিরূপে যে অবিচারে, বৃথা ছলে এই ব্রাহ্মণ-তনয়কে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাঙ্গালীর যে রক্তের তর্পণ এখনও বাকী আছে, আজিও তাহার সে অশৌচ ঘুচে নাই। এই সব অত্যাচার বিষয়ে ইংলণ্ডে কি কোন কথাই উঠিত না। মাঝে মাঝে উঠিত বই কি? কিন্তু টাকায় মুখ বন্ধ করিতে পারে না, এমন লোক কয় জন পাওয়া যায়? যাহারা কোটী কোটী টাকা লুণ্ঠন করিতেছিল, তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া সকল গোল মিটাইয়া ফেলিত। একবার অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল,—

"But the house of Commons stifled enquiry. The recipients of bribes were amongst the highest classes, and the King himself was seen to have accepted a large sum." British India and England's Responsibilities, By G. Clarke. M. A.

ইহার উপর আর কথা নাই। যেখানে রক্ষকই ভক্ষক, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায়ের বিচার চলে না।

এত অত্যাচার উৎপীড়নে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও বঙ্গীয় শিল্পীগণ যে বস্ত্র বিলাতের বাজারে প্রেরণ করিত, তাহা বিলাতী কাপড় অপেক্ষা শত করা ৫০।৬০ টাকা কম দরে বিক্রীত হইত। সুতরাং বিলাতী কাপড় রক্ষার জন্য দেশীকাপড়ের উপর শতকরা ৭০।৮০ টাকা শুল্ক বসান হইল। Mill's History of British Indiaতে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—

"The Cotton & Silk goods of India up to this period (1813. A D.) could be sold for a profit in the British market at a price from 50 to 60 per cent lower than those fabricated in England. It consequently became neccessary to protect the latter by duties of 70 and 80 per cent on their value or by positive prohibition."

কোন কোন স্থলে এদেশী কাপড়ের আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এরূপ জুলুম না করিলে মাঞ্চেষ্টারের কলকারখানা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইত। বিদেশী ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বলিয়া এই সর্ব্বনাশ হইল। বিলাতী মাল কিন্তু অবাধে বিনাশুল্কে ভারতে আসিতে লাগিল। ভারত স্বাধীন হইলে বিলাতী দ্রব্যের উপর কর বসাইয়া ক্ষতিপূরণ করা যাইত, কিন্তু রাজশক্তি স্বার্থপর বণিকের হাতে, সে ভারতের শিল্পকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল। যাঁহারা মনে করেন, কল কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া গিয়া ভারতীয় শিল্প নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের ভ্রান্তি আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। ইতিহাসের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য এই যে, ভারতীয় শিল্প সকল প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্মুখ-সমরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায় নাই, কিন্তু ক্রূর-প্রকৃতি আততায়ী গুপ্তভাবে বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে।

কোম্পানি এ দেশে নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কেহ স্বাধীনভাবে পট্টবস্ত্র বয়ন করিতে পারিবে না; শিল্পিগণ কোম্পানীর ফ্যাকটরীতে যাইয়া কাজ করিবে। ফ্যাকটরীতে যাইয়া কাজ করার অর্থ একরূপ বিনা মাহিনায় আপ খোরাকী চাকুরী। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলে কঠোর রাজদণ্ড! ফল যা আশা করা যায়—বঙ্গের রেসম শিল্পের বিনাশ।

ভারতের ক্যালিকো ছিট্ এক সময়ে বিলাতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যখন বিলাতে ক্যালিকোর কারখানা স্থাপিত হইল, তখন ভারতীয় ক্যালিকোর উপর অন্যায় রকম শুল্ক স্থাপন করা হইল। কেবল তাহাই নহে, বিলাতী গবর্ণমেণ্ট আইন করিলেন, যে ভারতীয় ক্যালিকোর ব্যবসা করিবে, তাহাকে ২০০৲ টাকা, আর যে ব্যবহার করিবে তাহাকে ৫০৲ টাকা অর্থ দণ্ড দিতে হইবে। সব শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে একটী একটী করিয়া এইরূপ অবিচারের কথা প্রমাণ করা যাইতে পারে। বিলাতী গবর্ণমেণ্ট আইনের বলে স্বদেশীয় শিল্পের প্রসার ও ভারতীয় শিল্পের বিনাশ করিয়াছে, আর আমরা স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি করিব, নিজেরা এই সঙ্কল্প করিয়াছি বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কতই না লাঞ্ছিত করিতেছে! কিন্তু দেশে এমন মূর্খেরও অসদ্ভাব নাই, যাহারা ফাঁকা কথায় ভুলিয়া মনে করে যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদের শিল্পের উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করিতেছে! আহা, চেষ্টার বালাই নিয়ে মরি! আমাদের শিল্পোন্নতির জন্য সরকারের গলাবাজি দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, একজন লোককে মতলব করিয়া ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে উঠিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, সরকার তীর হইতে, "সাহায্য কর সাহায্য কর" বলিয়া কেবল চীৎকার করিতেছে, লোক দেখাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু নিজেও তাহার উদ্ধারের জন্য জলে নামিতেছে না এবং অন্য কেহ জলে নামিতে চাহিলেও পশ্চাৎ হইতে গোপনে রেগুলেশন লাঠির আঘাত করিতেছে, সে আঘাত হইতে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইন-সভার সদস্যের মস্তকও নিরাপদ নহে। এই তো আমাদের অবস্থা! "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" সরকার আমাদের কোনরূপ সাহায্য করিবে, সে আশা বাতুলতা মাত্র। তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি? রেগুলেশন লাঠীর সম্মুখে য়্যাণ্টি-রেগুলেশন লাঠী ধরিতে বলি না, যদিও আমার মত এই যে সকলেরই এক একখানা উক্ত লাঠী সংগ্রহ করিয়া রাখা ভাল। রেগুলেশন লাঠী সর্ব্বদাই ন্যায়-পথে চলে না, য়্যাণ্টি-রেগুলেশন চালাইয়া তাহাকে সোজা পথে আনিবার চেষ্টা করিলে ফল নিতান্ত মন্দ হইবে না। নতুবা কেবল দাঁড়াইয়া মার খাওয়াটা নিতান্তই একটা বেয়াড়া সঙ্কল্প। জেলে যাইবার পথ তো স্বদেশী আন্দোলন একেবারে মুক্ত করিয়াই দিয়াছে, তবে আর ভয় কি, তবে আর সঙ্কোচ কি? টালা ও বাগ্‌বাজারের ঘটনায় ইস্‌লাম কুল নির্ম্মূল হয় নাই, বরং তাঁহারা সরকারের সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে। তোমরা বরিশালে কেবল দাঁড়াইয়া মারই খাইলে কেন? তাহাতে কি লাভ?

"যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।"

হে চিত্তরঞ্জন, যোগেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশবাসিগণ, জীবনের প্রতি ঘৃণা ও মৃত্যুতে গৌরব অনুভব করিবার যথেষ্ট কারণ কি

উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে দেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন একটা বরণীয় সঙ্কল্পের মধ্যে গণ্য হইতে পারে? আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইতে বলিতেছি না। স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করিব, এই প্রতিজ্ঞাতেই যে জাতিকে নীরবে দাঁড়াইয়া পুলীসের লাঠীর গুঁতো সহ্য করিতে হয়, সে জাতির নিকট যুদ্ধ-ক্ষেত্র বহুদূরে। কিন্তু অস্ত্রই মানবের এক মাত্র শক্তি নহে, পশুবলই মানবের একমাত্র অস্ত্র নহে। তোমার হাতে যে অস্ত্র আছে, তাহার বলে তুমি এমন করিতে পার যে, ছয় মাসে ফিরিঙ্গী চোখে শরিষা ফুল দেখিবে। সে তোমার স্বদেশী প্রতিজ্ঞা, যাহা হইতে তুমি সময়ে সময়ে পিছাইয়া পড়িতেছ, এবং নিতান্ত পশুর ন্যায় চাবুকাঘাতে তোমাকে জাগাইয়া তুলিতে হইতেছে। এবার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আর অভিনয়ে কাজ নাই, কাজ আরম্ভ কর, যদি প্রতিশোধ লইতে চাও, তবে ভীষণ প্রতিজ্ঞা কর, ফিরিঙ্গী বণিককে এ দেশ হইতে না তাড়াইয়া বিশ্রাম করিবে না। ইহাতে থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ। এ প্রতি-হিংসা-বহ্নি যদি তোমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া না থাকে, তবে, হে বাঙ্গালি, তুমি মানুষ তো নওই, পশুও নও, কৃমিকীটও নও। জ্বালাও প্রতিহিংসা-বহ্নি, জাগাও প্রতিশোধ-পিপাসা, দেখি কি আছে জগতে যে পাঁচকোটী মানবের গতিরোধ করে।

আমাদের নষ্টপ্রায় শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ধার সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা বাহির হইতে সাহায্যের কোনই আশা করিতে পারি না। গবর্ণ-মেণ্টের নিকট তো একেবারেই নয়। আমা-দের নিজেদের প্রতিজ্ঞাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকিলেই হইবে না, সিদ্ধির জন্য সাধনা চাই। সিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় গোলামীর আকাঙ্ক্ষা ও গোলামের সম্মান। যেদেশে সরকারী গোলাম হেয় না হইয়া সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়, সে দেশে মনুষ্যত্ব লাভ সুদূরপরাহত। যাহারা বিদেশীর পদলেহন করিতে যাইয়া স্বদেশের মঙ্গ-লের বাধা জন্মায়, যাহারা বিদেশীর কথায় স্বদে-শীর মাথায় লাঠী মারে, তাহাদিগকে কুকুরের অপেক্ষা ঘৃণিত করিতে না পারিলে মনুষ্যত্বের সম্মান জাগিবে না, আর মনুষ্যত্ব না জাগিলে কোন কাজই হইবে না। বর্ত্তমান সময়ের গোলামী তো ফোড়ার উপর বিষফোড়া। সরকারী গোলামী জিনিষটাই তো মনুষ্যত্বের বিনাশক, তার উপর আবার স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদেশীর গোলামী। অনেক স্থলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দেশের অমঙ্গল কামনা করিতে হয়, ইহাতে দুই দিকে মনুষ্যত্ব বিনাশ পাইতেছে। ইহার পর যদি এই হেয় অপদার্থ লোক গুলিকেই সম্মানের চক্ষে দেখিতে হয়, তবে দেশে মনুষ্যত্ব থাকিবে কিসের জোরে। এই গোলামীর বিরুদ্ধে একটা অতি সবল public opinion গঠন করিতে না পারিলে আর নিস্তার নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন সংস্কারকে পুনরুদ্দীপিত করিতে হইবে। এক দিন জল বৃষ্টির মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে রাস্তায় জীব চলাচলের শব্দ শুনিয়া ঘরের মধ্য হইতে এক জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এমন দুর্য্যোগে কে ঘরের বাহির হইয়াছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, নিশ্চয়ই মানুষ এ সময়ে ঘরের বাহির হইবে না, হয়তো একটা কুকুর যাইতেছে। তখন প্রথম ব্যক্তি বলিল, কুকুর কেন এ সময়ে ঘরের বাহির হইবে, যার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, সে এ সময়ে বাহির হইবে না, নিশ্চয়ই

কোন রাজকীয় ভৃত্য যাইতেছে। রাজকীয় ভৃত্যকে কুকুরের অধম বলিয়া যতদিন বদ্ধমূল ধারণা না হইতেছে, ততদিন দেশের মঙ্গল নাই। এ পথে শিল্প-বাণিজ্যের শত দ্বার উন্মুক্ত করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। মানুষ যখন বুঝিবে যে, গোলামী ছাড়াও জীবিকার্জ্জনের উপায় আছে, তখনই গোলামীর প্রতি ঘৃণা জন্মিবে, তৎপূর্ব্বে নয়। কেন না, উদরের তলায় পড়িলে মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি সবই রসাতলে যায়। দেশের শিল্প-বাণিজ্য বিনাশ করিয়া বণিক-রাজ এই এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন যে, দেশের যাহারা মাথা, বিদ্যা বুদ্ধিতে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের গোলামী ছাড়া জীবিকার আর অন্য পথ নাই, সুতরাং তাহাদের হস্তপদ বাঁধা। তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি খাটাইবার অন্য পথ খোলা থাকিলে দেশের এই অনর্থ হইতে পারিত না। স্বাধীন জীবিকা ছাড়া মানুষের স্বাধীনতার প্রতি প্রাণের টান্ জন্মায় না। শিল্প-বাণিজ্যের দিকে দেশের বিদ্যা বুদ্ধি পরিচালিত হইলে একটী আশু উপকার এই হইবে যে, দেশের শিল্প দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। সব জিনিষের উন্নতিতেই বুদ্ধি চাই, নিরক্ষর লোকের হাতে শিল্প ফেলিয়া রাখিলে তাহার উন্নতি হইবে কেন? যাহার মাথায় কালীদাসের কাব্য, তাহার হাতে তুলি না থাকিলে চিত্র-বিদ্যা কালীঘাটের পটেই শেষ হয়। দেশের উদ্ধার, স্বাধীন জীবিকার প্রতি লোকের অনুরাগ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে।

কেবল দেশের উদ্ধার কেন, জীবন ধারণই স্বদেশীয় শিল্প দ্রব্য ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে। রাজশোষণ ও বাণিজ্য দ্বারে কোটী কোটী টাকা প্রতি বৎসর দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, যাহাঁর বিনিময়ে এক কপর্দ্দকও আমরা ফিরিয়া পাইতেছি না। ইহার কি ফল হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ। ইহার ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যে দিন দিন বাড়িতেছে, দুর্ভিক্ষের চির-সহচর মহামারী যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, অনাহার যে ভারতের বিশকোটী প্রজার সঙ্গ ছাড়িতেছে না, তাহাতো সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু মধ্যবিৎ শ্রেণীর অবস্থা একবার আলোচনা করা যাক্। যাহারা দু পয়সা রোজগার করিতেছে, তাহারা যদিও অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে না, তবুও বুঝিতেছে যে, কি যেন একটা বিষ ঢুকিয়াছে, যাহাতে সমস্ত সমাজ-শরীর জেরবার হইয়া পড়িতেছে। আয় যা হয়তো তাহাই রহিয়াছে, কিন্তু ব্যয় করিবার শক্তি যেন কমিয়া যাইতেছে। অজ্ঞলোকে মনে করে, দেশের লোক দিন দিন স্বার্থপর কৃপণ হইতেছে। গত বৎসর যে পার্ব্বণে হাজার টাকা ব্যয় করা গিয়াছিল, এ বৎসর আর তাহা পারা যাইতেছে না, তুমি মনে করিবে, ইহা কৃপণতার ফল। কিন্তু কথাটা একবার তলাইয়া দেখ দেখি? ঐ যে হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেকের বেশী হয়তো বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। সেই সেই টাকাটা কি দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতি নহে? সুতরাং এ বৎসর দেশের সেই পরিমাণ ব্যয় শক্তি কমিয়া গিয়াছে। আমি দেশেরই এক অঙ্গ, সুতরাং আমারও শক্তি কমিয়া গিয়াছে, তাই আমি আর কুলাইতে পারিতেছি না। যতদিন বিদেশী শোষণ আরম্ভ হয় নাই, ততদিন কৃষিশিল্পে যাহা উৎপন্ন হইতেছিল, তাহাতে দেশের ধনই বাড়িতেছিল, সুতরাং আমারও অবস্থা স্বচ্ছল হইতে-

ছিল। আমি যাহা ব্যয় করিতেছিলাম, দেশেই থাকিতেছিল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহা আবার আমার কাছেই আসিতেছিল। সমাজে দশ প্রকারের লোক পরস্পরের কার্য্যে ও সাহায্যে বাধ্য হইয়া এক সঙ্গে বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা স্বচ্ছল হইলে, আর দশ জনে তাহার অংশ পাইতেছে, পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে "পঞ্চবৃত্তি-ধারী" লাভবান হইতেছে। কিন্তু এখন পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে আমরা অধিকাংশ দ্রব্যই, এমন কি, লবন চিনি পর্য্যন্ত বিদেশীর নিকট হইতে ক্রয় করি, সুতরাং বার মাসে তের পার্ব্বণের দ্বারা সমাজের সকল অঙ্গে সমান ভাবে যে অর্থ সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহা আর হইতে পারিতেছে না। সব অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, সুতরাং আমরা সকলে সমান পরিমাণে নির্ধন হইয়া পড়িতেছি। ইহার একমাত্র প্রতিকার বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাই-তেছে। আমি একখানা বিলাতী কাপড় ১৲ টাকা দিয়া ক্রয় করিলাম, টাকাটা একে-বারে বিদেশে চলিয়া গেল, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনই সম্বন্ধ রহিল না। কিন্তু আমি যদি ১।০ পাঁচ শিকা দিয়া একখানা দেশী কাপড় কিনি, তাহা হইলে আপাততঃ আমার চারি আনা বেশী লাগিল বটে, কিন্তু পরিণামে আমার যথেষ্ট লাভ থাকিয়া যাইবে। কেননা, টাকাটা তো বস্ত্র-বিক্রেতার ঘরে আবদ্ধ থাকিবে না, সেখান হইতে তাঁতির বাড়ী, তারপর সূতার দোকানে, তারপর কার্পাস উৎপন্নকারী কৃষকের বাড়ীতে। তারপর কৃষকের বাড়ী হইতে জমিদার ও মহাজনের ঘরে ফিরিয়া আসিবে। আবার ইহারা সকলেই গৃহস্থ। সকলেরই পূজা পার্ব্বণ ক্রিয়াকাণ্ড আছে, কাহারও স্বচ্ছল অবস্থা হইলে "পঞ্চ-বৃত্তিধারী" তাহার ভাগ অবশ্যই পাইবে। আরও কিছু না হউক, আমার প্রতিবেশী "কাপুড়িয়া" ভ্রাতার অবস্থা ভাল হইলে, তাহার বাড়ীতে দুদিন নিমন্ত্রণ খাইয়াই আমারও চারি আনা ওয়াশীল হইয়া যাইবে। যাহা হউক, স্বদেশী দ্রব্য চারি আনা বেশী দিয়া কিনিলে পরিণামে দেখিতে পাইব যে, বার আনা আমার ঘরে পুনরায় ফিরিয়া আসি-য়াছে। কিন্তু বিদেশী দ্রব্য কিনিয়া আমরা ধনে প্রাণে সারা হইতেছি। এই কথাটা প্রমাণ করিতে বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না। যাঁহারা পল্লীগ্রামের তথ্য অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, পূর্ব্বে লোকে যে আয়ে ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে যে ঘটা করিত, এখন তাহার দশগুণ আয়েও তাহা করিতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বৈদেশিক পণ্য রূপ মহা রাক্ষস আমাদের অস্থি মজ্জা একেবারে চর্ব্বণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলি-য়াছে। এখনও উপায় আছে, এখনও রোগ অসাধ্য নহে, কিন্তু আর পঁচিশ বৎসর পরে একেবারে বিনাশ-গর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে। তাই বলি, ভাই বাঙ্গালি, যদি দু'মুঠা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে চাও, তবে ইষ্টদেবতার নামে শপথ কর, আর বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করিবে না।

এখানে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে। এ কথাটা বঙ্গের কৃষককুলের বিশেষ ভাবে ভাবিবার বিষয়। দেশের শিল্পের বিনাশে তাহাদের যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়াছে। শিল্পীকুল লাঙ্গল ধরিয়াছে, সুতরাং তাহাদের জীবন সংগ্রাম অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা যদি দেশীয় কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করে, তবে বহু লোক কৃষি ছাড়িয়া শিল্পে মনোনিবেশ

করিবে,তাহাদেরই অন্নের কষ্ট দূরীভূত হইবে। স্বার্থের জন্যও তাহাদের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে,তাহারা আর বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ইহাতে পরোপকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরই অবস্থার উন্নতি হইবে। দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক কল কারখানা স্থাপিত হইবে, তাহাতে একদিকে যেমন হাজার হাজার লোকের অন্ন জুটিবে, অন্যদিকে কৃষককুলও অনিয়মিত প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে। দেশের সব যাইয়া আছে কেবল মাটী, তাই এই মাটীর দিকেই সকলের ঝোঁক। কিন্তু ত্রিশ কোটী লোকের অন্ন কৃষি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং কৃষকগণ যদি শিল্পের সাহায্য করেন, তবে তাহাতে নিজেদেরই সাহায্য হইবে। কেননা, এখন কৃষকগণ ও শিল্পিগণ যে অন্ন ভাগাভাগি করিয়া খাইতেছেন, তখন তাহা কেবল কৃষকগণেরই থাকিয়া যাইবে। ফলতঃ এখন বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কৃষকগণ নিজেদের মুখের অন্ন বিদেশীকে তুলিয়া দিয়া নিজেরা অনাহারে থাকিতেছে। সুতরাং প্রতিকার হাতের কাছে পাইয়াও যদি তাহারা তাহা উপেক্ষা করে, তবে তাহাদিগকেই ইহার বিষময় ফলভোগ করিতে হইবে।

দয়ার দিক হইতে বিচার করিলেও ঐ একই কথা। নিরন্নকে অন্ন দেওয়ার তুল্য পুণ্য আর কি আছে? দেশীয় শিল্পের বিনাশে কত লোক যে অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা যদি এখন প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি, তবে এই সকল নিরন্ন লোককে অন্ন দেওয়া হইবে। ইহা যদি পুণ্য না হয়, তবে পুণ্য যে কি, তাহা জানি না। দুর্ভিক্ষের সময় অন্নছত্র খোলা অপেক্ষা দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার অধিকতর পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে দিক্ হইতেই বিচার করা যাক্ না কেন, বর্ত্তমান অবস্থায় বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের মত পুণ্যব্রত আর কিছুই নাই। যে এই মহাব্রত গ্রহণে অসমর্থ, সে নারকী, পতিত, সুতরাং তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই, তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে নাই। হে দেশের গুরু পুরোহিতগণ! আপনারা অগ্রবর্ত্তী হইয়া এই সকল পতিতদিগের প্রতি সামাজিক শাস্তির বিধান করুন,তাহাতে শিষ্য যজমানদিগের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও ইহ-পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে। সকলে মিলিয়া অগ্রসর হউন, ভগবান্ কখনও ত্রিশ কোটী লোকের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিবেন না। ভারতমাতা আবার সদর্পে জগতের সম্মুখে স্বীয় গৌরব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইয়া প্রজাকুলের কল্যাণ বিধান করিবেন। ওঁ শিবমস্তু।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

# উপনিষদের উপদেশ। (২২)

## যাজ্ঞবল্ক্য ও পণ্ডিতমণ্ডলী।

এইরূপে সমবেত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে আর কেহই যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। সকলেই, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য পণ্ডিতবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

"আপনাদিগকে আমি কয়েকটী কথা

জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনাদিগের মধ্যে যে কেহ হউন্, উত্তর প্রদান করুন। এই পুরুষ-দেহকে বনমধ্যস্থ প্রকাণ্ড মহীরুহের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই দেহ-বৃক্ষের, কেশরাজিই পত্র স্বরূপ; চর্ম্মকে, এই বৃক্ষের ত্বক্‌রূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৃক্ষের যেমন ত্বক্ ছেদন করিয়া দিলে রস নির্গত হয়, পুরুষচর্ম্ম হইতেও তদ্রূপ রুধির ক্ষরিত হইয়া থাকে। দেহের মাংস-গুলি, উহার ত্বকের স্তরের স্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৃক্ষের অন্তঃসারভূত কঠিন অংশকে অস্থিস্বরূপ ধরা যায়। অস্থির মধ্যস্থ মজ্জা ও বৃক্ষের অন্তর্ভূত মজ্জা প্রায় একই রূপ। বৃক্ষটীকে ছেদন করিয়া দিলে, উহা পুনরায় উহার শিকড় বা মূলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহা আমরা নিত্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন মৃত্যু জীবকে আক্রমণ করে এবং দেহ ঢলিয়া পড়ে, তখন কোন্ মূল হইতে জীব পুনরায় জন্মলাভ করে? শুক্র-ধাতুকে জীবোৎপত্তির মূলকারণ মনে করা যায় না;—কেন না, প্রাণীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ত শুক্র-ধাতু থাকিতে পারে না। বীজ হইতে বৃক্ষ উদ্ভূত হয়; বৃক্ষটীকে কাটিয়া দিলে, পুনরায় ঐ বীজ হইতেই আর একটী বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৃক্ষের বীজটী যদি বিনষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবে ত আর তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ, যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় ও দেহ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কোন্ মূলবীজকে অবলম্বন করিয়া, পুনরায় জীব জন্মগ্রহণ করে? আপনারা এ প্রশ্নের উত্তর অবগত আছেন কি?"

পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহই এ তত্ত্ব অন্তরে অনুভব করেন নাই। সুতরাং কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন, যাজ্ঞবল্ক্য সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন যে:—"হে মহাশয়গণ! ব্রহ্মকেই জীবের মূল কারণ বলিয়া অবগত হউন্। চেতনের উৎপত্তি, চেতন হইতেই হইয়া থাকে। মৃত্যুতে সে চেতনের একান্ত ধ্বংস হইতে পারে না। মৃত্যুতে চেতনের অবস্থান্তর হয় মাত্র। সেই মূল-চেতনকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। সেই ব্রহ্ম সৎস্বরূপ; চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। ইহা অবিনাশী। এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য।"

আমরা এত দূরে এই বৃহৎ উপাখ্যান শেষ করিলাম। এই উপাখ্যান হইতে আমরা ব্রহ্ম বিষয়ে বিবিধ তত্ত্বের উপদেশ লাভ করিয়াছি। এ স্থলে সেই উপদেশগুলির একটী সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দেওয়া আবশ্যক। এবং ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতবর্গের প্রশ্নগুলির মধ্যে একটা সম্বন্ধ প্রদর্শন করাও আবশ্যক। পাঠক! পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধাংশ গুলি একবার একত্র পাঠ করিয়া দেখিলেই, এই সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন।

১। উষস্ত এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত-বর্গের প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে:—

(ক) ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়বর্গ লইয়াই জীবের সংসার-ভোগ। জীব এই গুলির দ্বারা জড়িত হইয়াই সুখ দুঃখ ভোগ করে ও সাংসারিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারাই জীবের বন্ধন-রজ্জু। এই ইন্দ্রিয়-শক্তি ও বৈষয়িক সংস্কার প্রভাবে জীব জন্ম জন্মান্তর লাভ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা-দের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিলে, জীব মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। বিষয়-দর্শনের স্থলে, ব্রহ্মদর্শন প্রতিষ্ঠিত না

হইলে, জীবের সংসার বিমুক্তি ঘটিতে পারে না। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, ইন্দ্রিয়াদির অতীত। তিনি ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র। ধীরে ধীরে, এই স্বাতন্ত্র্যবোধের অভ্যাস দৃঢ় করিয়া লইতে হয়।

(খ) ইন্দ্রিয় সকল, আত্মশক্তি দ্বারাই চালিত। তিনিই চক্ষুর চক্ষু, বাক্যের বাক্য। সেই শক্তি নিত্য ও স্বতন্ত্র, সুতরাং অবিকারী। সেই এক নিত্য বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, বিবিধ ভাবে ও বিবিধ আকারে ক্রিয়া করিয়া বেড়াইতেছে।

২। পরবর্ত্তী প্রশ্ন ও উত্তর গুলি হইতে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেগুলির মর্ম্ম এইরূপ :—

(ক) ব্রহ্ম সমুদয় পদার্থের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাহাদের চালক ; অথচ তিনি, সে গুলি হইতে স্বতন্ত্র।

(খ) এই ব্রহ্মই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাংসারিক সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করিয়া, এই ব্রহ্ম প্রাপ্তির কামনাই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সর্ব্বত্র ব্রহ্মশক্তির অনুভব দৃঢ় হইলে, ক্রমে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতে থাকে।

(গ) ব্রহ্মই সকলের মূল কারণ। তিনি আকাশেরও কারণ রূপে অবস্থিত।

(ঘ) আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক—সমুদয় পদার্থের ভিতরে ও বাহিরে সেই ব্রহ্ম অবস্থিত।

(ঙ) তাঁহাকে জানিতে পারিলে, জীবের কিছুই অজ্ঞাত থাকে না।

(চ) বৈদিক দেবতাগুলি সেই এক ব্রহ্মশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। দেহে ব্রহ্মই, প্রাণশক্তিরূপে ক্রিয়া নির্ব্বাহক।

৩। ইহার পরের প্রশ্ন ও উত্তর হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছি :—

(ক) এক ব্রহ্মশক্তিই বাহিরে ও ভিতরে বর্ত্তমান। কিন্তু যাহা বাহিরে, তাহা জ্ঞানেরই বিবর্ত্ত মাত্র। আত্মার জ্ঞান (Consciousness) ব্যতীত বাহ্যবস্তুর অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি না। ভিতর ও বাহির কার্য্যকারণ সূত্রে বিধৃত।

(খ) যাহা বাহিরে শক্তিরূপে অবস্থিত, তাহা ভিতরে জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান। জ্ঞান ব্যতীত কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

(গ) মৃত্যুর পরেও আত্মা অবস্থিত থাকেন। আত্মা নিত্য। কোন অবস্থার ভেদে, আত্মার প্রকৃত ভেদ হইতে পারে না। কেন না, আত্মা নিঃসঙ্গ ও স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বলিয়াই, মৃত্যুর পরও আত্মার নিত্যতা অনিবার্য্য।

(ঘ) জীব-চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই সমুদ্ভূত। ব্রহ্মের চৈতন্য হইতেই, জীবের জ্ঞান আসিয়াছে এবং তাঁহার শক্তি হইতেই, জীবের ইন্দ্রিয় ও দেহ ও বিষয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

# সংশয়বাদ।

আজ কাল দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায়ই ঈশ্বরাস্তিত্বে আস্থাবান। চার্ব্বাকাদির সহিত মল্লযুদ্ধ এক প্রকার ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে বিশ্বাসের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, এমন বোধ হয় না। তবে সংশয়বাদটাও যে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুকি না মারে, এমত নহে।

জগতে সকলের সত্য এক ছাঁচে ঢালা

হয় না—হইতেও পারে না। পারে না বলিয়াই এত মত-বিভিন্নতা দেখা যায়। আজ আমার কাছে যে সত্য প্রস্ফুট, আমি তাহাকেই সংশয়বাদ নামে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কারণ যাহার যে ধারণা বা বিশ্বাস, তাহা রাজপ্রতিকূল না হইলে সে ব্যক্ত করিবেই।

মানব-জ্ঞান "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" উঠিতে পারে না। কেহ কেহ যাহাকে সহজ বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলেন, সে বিষয়ের বিচার এখন আমি করিতে প্রবৃত্ত নহি। বাহ্যপদার্থ-নিচয়ের জ্ঞান যথার্থ হইতে হইলে জ্ঞানকে কাহার উপর দাঁড় করান চাই; সেই জ্ঞান দ্বারা চরমতত্ত্ব কতদূর জানা যায়, সেইটী জানাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। জ্ঞানের উপায়কে প্রমাণ কহে। অর্থাৎ যদ্দ্বারা অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, দেখা যাউক, সে গুলি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কতদূর বিশ্বাস্য।

ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোন পরিবর্ত্তন দেখিলেই মানুষ তাহার কারণানুসন্ধান করিতে চেষ্টা করে। যেখানে জ্ঞান প্রতিরুদ্ধ হয়, অথচ বিষয়টীর সম্যক মীমাংসা জানিবার জন্য মন উৎসুক থাকে, সেখানে মানুষ অপার্থিব বিষয়ের কল্পনা করিয়া তাহাকে কারণের স্থানে দাঁড় করায়। দেখা যাউক, ঈশ্বর-কল্পনা এই প্রবৃত্তিমূলক কিনা।

প্রমাণকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। কেহ কেহ আরও কয়েক প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখিতে গেলে, সে গুলিও এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং প্রমাণকে তিন ভাগে বিভক্ত করাই যেন ন্যায়সঙ্গত। ঈশ্বর-সিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষের (sense-perceptionএর) উপযোগিতা নাই। ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব। যাহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, প্রত্যক্ষ বলিলে এই কয়েকটী অনুভূতিই আমরা বুঝিয়া থাকি। তদতিরিক্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ বিষয় কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ বর্ত্তমান।

যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় পদার্থ বলিয়াই বিশ্বাস করেন, কারণ যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহা দেশকালাবচ্ছিন্ন ( conditioned ), যাহা দেশকালের অতীত, তাহা প্রত্যক্ষ হয় না।

শাব্দ প্রমাণের প্রামাণ্যও অতি সামান্য। বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম শাব্দজ্ঞান। যে বাক্য সত্য, তাহাই প্রমাণ। মিথ্যা কথা অপ্রমাণ। অথবা যে বাক্যার্থ পরে অনুভব দ্বারা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, সেই বাক্যই প্রমাণ। অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে যে শব্দ প্রযুক্ত হয়, সে বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা পরীক্ষাধীন। তবে তাহা যে সন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহা প্রত্যক্ষ-গোচর করিবার সাধ্য নাই। মানুষ অভ্রান্ত নহে যে, যাহা মুখ দিয়া বাহির হইবে, তাহাই ধ্রুবসত্য হইয়া দাঁড়াইবে। প্রতিপদেই ভ্রম প্রমাদ মানুষের জ্ঞানকে জড়াইয়া ধরিতেছে, তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ কথা নহে, বরং সর্ব্বথা অসম্ভবই। এই খানেই

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, এই বাক্যের সার্থকতা দৃষ্ট হয়।

অনুমান প্রমাণ লইয়া ঈশ্বরাস্তিত্ব নিরুপণ চেষ্টা। সে বিষয়ে পরে কিছু বলা যাইবে। প্রথমতঃ আস্তিক-বৃন্দের যুক্তি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা যাউক। তাঁহাদের যুক্তিগুলি কি কি?

প্রধান যুক্তি কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ লইয়া। কার্য্যের কারণ থাকা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জগৎ একটা কার্য্য, সুতরাং তাহার কারণ থাকা চাই। কারণ আবার দুই প্রকার—উপাদান ও নিমিত্ত। এই দুই কারণের সমাবেশ না ঘটিলে কার্য্যোৎপত্তি হয় না। জগতের উপাদান কারণ ভূতনিচয়, নিমিত্ত কারণ চিৎপদার্থ—ঈশ্বর। ঘটাদির উৎপত্তি যেমন মৃত্তিকা ও কুম্ভকার সাপেক্ষ,জগতের উৎপত্তি ও তদ্বৎ ভূতনিচয় ও চিৎপদার্থ সাপেক্ষ। সেই চিৎপদার্থই আস্তিকের সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর।

২। ক্রিয়া দেখিয়া কর্ত্তার অনুমান করা আস্তিকের অন্য একটী যুক্তি। জগৎ কতকগুলি অবয়বের সংযোগ মাত্র। সংযোগ একটী গুণ বিশেষ ও চেষ্টা-সাপেক্ষ। জগদুৎপত্তির প্রারম্ভে যে চেষ্টা পূর্ব্বক এই ভূতগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়াছিল, সেই আদি চেষ্টাবান পুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না। সুতরাং জগৎ কোন চেতন পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

৩। জগৎ ভারী বস্তু। কেহ ধরিয়া না রাখিলে ভারী শূন্যে থাকিতে পারে না। জগৎটা যখন পড়িয়া যাইতেছে না, তখন অবশ্যই কেহ উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। পাখীর মুখে ধৃত হইয়া কাষ্ঠখণ্ড যেমন অবস্থান করে, জগৎও তেমনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শূন্যে অবস্থান করিতেছে। নতুবা জগৎ পড়িয়া যাইত।

৪। দ্ব্যণুক, একরেণু ক্রমে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্ব্যণুকের পরিমাণ অনুগত পরিমাণ জন্য নহে, উহা দ্বিত্ব সংখ্যা জন্য। সংখ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই অপেক্ষা বুদ্ধি যাঁহার ছিল, তিনিই ঈশ্বর।

৫। চেতন-প্রযত্ন ব্যতীত রচনার পারিপাট্য সম্ভবে না। জগৎ রচনায় পারিপাট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই কৌশল ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং জগৎকর্ত্তা একজন কুশলী পুরুষ, অবশ্য স্বীকার্য্য।

৬। বিভিন্ন জাতীয় উপাদানাবলীর একার্থে নিয়োগ চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত সম্ভবে না। লৌহ, কাচ, ও রৌপ্যের একত্র মিলন পূর্ব্বক একটী ঘড়ী প্রস্তুত করা কলে সম্ভব নহে, চেতনের প্রযত্ন আবশ্যক। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জগৎ ও বিভিন্ন জাতীয় উপাদানাবলীর সমষ্টি মাত্র, সুতরাং জগৎ-সৃষ্টিও চেতন-প্রযত্ন সাপেক্ষ।

৭। মনুষ্যত্বে তুল্য হইলেও, প্রজ্ঞা,মেধা, প্রভৃতি গুণ স্বতই কাহার কাহার উৎকর্ষসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ বা চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ প্রজ্ঞা, বা মেধা লাভ করিতে পারে না। বাস্তবিক প্রতিভা জিনিষটা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অদৃষ্ট ব্যতীত এই বৈচিত্র্য সম্ভবে না। কিন্তু অদৃষ্ট জড় চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত উহার কার্য্যকারিতা নাই। যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান বশতঃ অদৃষ্ট কার্য্যশীল হয় ও ভোগ উৎপাদনে সমর্থ, সেই চৈতন্যই ঈশ্বর। ইত্যাদি।

উল্লিখিত যুক্তিগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিলে আমরা দেখিতে পাই, উহারা দুইটী মাত্র স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। একটী ব্যক্তিগত

প্রত্যক্ষ, অপরটী তাহারই প্রসার মাত্র। এই প্রসারকে জাতি বলা যায়। এবং যখন এই প্রসারকে হেতু করিয়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়,তখন এই প্রসারই ব্যাপ্তি নামে অভিহিত হয়। এই ব্যাপ্তি আবার আর একটী সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা অংশ সম্বন্ধে সত্য, তাহা সমগ্র সম্বন্ধেও সত্য, ইহাই এই জাতি বা ব্যাপ্তির মূলসূত্র। এই ব্যাপ্তি হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে অনুমিতি (Deduction)। ব্যাপ্তি একপ্রকার অনুমিতি বটে, কিন্তু তাহার ইংরাজি নাম Induction. ব্যাপ্তি কথাটার মধ্যে অনেকগুলি ভাব নিহিত আছে। সার্ব্বত্রিকতা, নিত্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতা—এই তিনটী ভাব (idea) ব্যাপ্তির অবয়ব বিশেষ। ইহাদের একটীতে সন্দিহান হইলে ব্যাপ্তির অস্তিত্ব লোপ হয়। অন্ততঃ এই ভাবগুলি ব্যাপ্তি শব্দটার কল্পনা করিয়াও ব্যাপ্তির ব্যাপ্তিত্ব বজায় রাখা হইয়া থাকে।

জাতি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে—ব্যক্তিই প্রত্যক্ষের বিষয়। কল্পনার (abstraction) সাহায্যে আমরা জাতি (class or genus) গড়িয়া থাকি। ব্যক্তি হইতে জাতির কল্পনা করা আমাদের ক্ষমতা-ভুক্ত (within our authority) কি না, সে অনুসন্ধানে আমরা তৎপর নহি। বোধ হয়, আমাদের এমন কোন শক্তি (power) নাই, যাহার সাহায্যে আমরা ব্যক্তিরূপ ভূতল হইতে জাতিরূপ দ্বিতল ছাদে নির্ব্বিঘ্নে লম্ফ প্রদান করিতে পারি। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনা পরে করা যাইবে। এ বিষয়ে একজন দার্শনিক কি বলিয়াছে,তাহা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"All empirical perception on the other hand, and the great part of experience, proceeds conversely from the consequent to the reasons, and this kind of knowledge is not infallible, for necessity only attaches to the consequent on account of the reason being given, and no necessity attaches to the knowledge of the reason from the consequent, for the same consequent may follow from different reasons. The latter kind of knowledge (this kind) is simply Induction ; *i. e*,from many consequents which point to one reason. The reason is accepted as certain ; but as the cases can never be all before us, the truth here is not *unconditionally* certain. But all knowledge through sense-perception, and the greater bulk of experience has only this kind of truth. The affection of one of the senses induces the understanding to infer a cause of this effect, but as a conlusion from the consequent to the reason is never certain, illusion which is deception of the senses, is possible. ......... Only when several of the senses, or it may be all the five, receive impressions which point to the same cause, the possibility of illusion is reduced to a minimum, but yet it still exists, for there are cases, for example, the case of counterfeit money, in which all the senses are deceived."

যাহা হউক, ব্যক্তিগত কয়েকটা স্থল দেখিয়া একটা ব্যাপক সিদ্ধান্তে পৌঁছান ও একটী ব্যাপক সিদ্ধান্ত হইতে পুনরায় একটী ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে অবতরণ আন্বিক্ষিকী বিদ্যার (Logic) একটা নিয়ম বটে। উক্ত নিয়মানুসারে ব্যক্তি হইতে ব্যক্ত্যন্তরের অনুমিতি অসম্ভব। "রাম মরিল" "শ্যাম মরিল" ইত্যাদি কয়েকটী স্থল দেখিয়া "মাধবও মরিবে" এ প্রকার সিদ্ধান্ত করা আন্বিক্ষিকী বিদ্যা বিরুদ্ধ। ঐ ব্যক্তিগত কয়েকটী স্থল দেখিয়া যদি বলি "মানব মাত্রেই মৃত্যুশীল" তবেই মাধবের মৃত্যুশীলতা সিদ্ধ হইতে পারে, অন্যথা নহে।

পাকশালায় ধুম দেখিয়াছি। যখন ধুম দেখিয়াছি, তখন তৎসহ আগুনও দেখিয়াছি। এটী একটী ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ মাত্র, কিন্তু ঐ একটী স্থল দেখিয়াই ধুম ও অগ্নির অব্যভিচারী সাহচর্য্য সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে। যদি জানিতে পারি, ধুম অগ্নির অব্যভিচারী সহচর,

তাহা হইতে, পর্ব্বতে যখন ধূম দেখিতেছি, তখন তথায় আগুনও আছে, এ প্রকার মনে করিতে পারি, অন্যথা নহে। কিন্তু "ধূম মাত্রই আগুনের নিত্য সহচর" এ কথাটার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিনটী ভাব (idea) নিহিত রহিয়াছে। তৎকালে উক্তস্থলে ধূম ও আগুনের সহচারিত্ব দেখিয়াছিলাম। এখন পর্ব্বতে মাত্র ধূম দেখিতেছি, মনে করিব কি, তথায় এখন আগুনও বিদ্যমান ? যদি মনে করি, তবে কেন মনে করি, তাহার একটা হেতু চাই। এই হেতু কি, জানি না ; তবে মানুষের স্বাভাবিক কল্পনা প্রবৃত্তিও একটী হেতু হইতে পারে। বিপক্ষ বলিতে পারেন "বারেক যাইয়া পর্ব্বতের উপর দেখিয়া আইস, আগুন দেখিতে পাইবে।" কিন্তু এ উত্তর অতি হেয়। দেখিয়া আসিবার সুযোগ সকল সময়ে সকলের জুটিয়া উঠে না। বিশেষতঃ যদি দেখিয়াই আইসা যায়, তাহা হইলে ত প্রত্যক্ষ দ্বারাই তাহার সিদ্ধি হইল, অনুমান ত সন্দিগ্ধই রহিয়া গেল।

যাহা হউক, এই ব্যাপ্তিই অনুমানের মূল ভিত্তি। ব্যাপ্তির নিশ্চয়তা নির্দ্ধারিত হইলে অনুমিতিও ঠিক হইবে, এরূপ মনে করা যায়। বাস্তবিক ধরিতে গেলে এই ব্যাপ্তিই অনুমানের যথার্থ পরিণাম ফল। ইহার পরে আর অনুমান নাই, কেবল অন্তর্নিহিত ভাবের প্রকটন আছে মাত্র (only an exposition of involved ideas) দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। দেখিলাম ;—

১। মহানলে ধূমসহ আগুন আছে।

২। এঞ্জিনে ধূমসহ আগুন আছে।

৩। হাপরে ধূমসহ আগুন আছে।

অতএব সিদ্ধান্ত করিলাম—

৪। যেখানে ধূম আছে, সেখানেই আগুন আছে।

এই প্রকার সিদ্ধান্তকেই ব্যাপ্তি বলা যায়।

পুনশ্চ :—

১। যেখানে ধূম আছে, সেখানেই আগুন আছে।

২। পর্ব্বতে ধূম দেখিতেছি।

অতএব

৩। পর্ব্বতেও আগুন আছে।

ইহাকে বলে ব্যাপ্তি জন্য জ্ঞান বা (deduction)

পাঠক দেখিবেন, পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের ৪ নং ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ১ নং একই পদার্থ। যাহা প্রথমটীর নিগমন (conclusion) তাহাই আবার দ্বিতীয়টীর প্রতিজ্ঞা (Major premiss)। এই প্রতিজ্ঞার মূল উপাদান দুই একটী প্রত্যক্ষ স্থল মাত্র।

প্রদত্ত দৃষ্টান্তে পর্ব্বতের বহ্নিমত্ব পূর্ব্বে ব্যাপ্তি দ্বারা একবার সূচিত হইয়াছে। যখন বলিয়াছি "যেখানে ধূম সেখানেই আগুন" (১ম দৃষ্টান্তের ৪ নং দ্রষ্টব্য) তখনই ত পর্ব্বত প্রভৃতি স্থলকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, নতুবা উক্ত প্রকার নিগমনই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। স্থলান্তরে যদি ধূম বহ্নির ব্যভিচারিতা সম্ভাবিত মনে করিতাম, তাহা হইলে ১ম দৃষ্টান্তের ৪নং নিগমনই হইতে পারিত না। অতএব ব্যাপ্তি ব্যক্তিকে, সামান্য বিশেষকে যে অন্তর্ভুক্ত করে, এটা ধরিয়া লইতে হইবে।

এখন ব্যাপ্তিগ্রহ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক। ব্যাপ্তিগ্রহ কি প্রকারে হয় ? উত্তরে কেহ কেহ বলিতে চা'ন, সহচারের গ্রহ ও ব্যভিচারের অগ্রহ (observation of co-existence or concomitance and non-observation of exceptions) হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে থাকে। যে সকল স্থল পরীক্ষিত হইয়াছে, সে সকল

স্থলের একটীতেও সম্বন্ধ বিশেষের ব্যভিচার (exception) দৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং সর্ব্বস্থলেই উক্ত সম্বন্ধ অব্যভিচারী।

কেহ বা ব্যাপ্তিগ্রহ ভূয়োদর্শনের ফল বলিতে চান। তাঁহারা বলেন, বহুবার যদি উক্ত সম্বন্ধের সহচার প্রত্যক্ষ করা যায়, তবেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। কেহ কেহবা অন্বয় ব্যতিরেকী যুক্তি দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ নিশ্চয় করিয়া থাকেন। পাঠক দেখিবেন,জনষ্টুয়ার্ট মিলের method of agreement and differenceএর সহিত এই মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

বাস্তবিক যদি দুই চারিটী স্থলে আমরা একটী ঘটনার পরেই বা সঙ্গেই আর একটী ঘটনা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের মনে এক প্রকার, ভাবানুবন্ধিতা (association of ideas) জন্মিয়া যায়। ইহার ফলে ভবিষ্যতে উক্ত ঘটনার বা পদার্থের একটী ঘটিলেই বা একটীকে প্রত্যক্ষ করিলেই অপর সম্বন্ধ পদার্থটী আমাদের মনে জাগিয়া উঠে ও পূর্ব্বে কোথায়ও ব্যভিচার না দেখিয়া থাকিলে আমরা বিশ্বাস করি, অপর ঘটনাটীও ঘটিবে বা অপর পদার্থটীও প্রত্যক্ষ করা যাইবে। ধূমের সহিত দুই চারিটী স্থলে আগুন দেখিয়াছি। তাই এই ভাবানুবন্ধিতা গুণে ভবিষ্যতে ধূম দেখিলেই আগুনের সহচারিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকি। এই ভাবানুবন্ধিত্ব ব্যাপারটা মানসিক, ইহা কোন সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবী সহচারিত্বের বা পরভাবিত্বের পরিচায়ক কি না, তাহা জানিবার সাধ্য কি? জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে এই ভাবানুবন্ধিতার তারতম্য ঘটিতে দেখা যায়। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

## পুং-ভেদ। (৮)

উভচিহ্নিত[১] অবস্থাই পূর্ব্বের; তাহার পর ক্রমে এক ধর্ম্মের আধিক্য হেতু জীব দেহ, স্ত্রী অথবা পুং ধর্ম্ম বহুল হইয়াছে। ইহাতেই কেহ স্ত্রী জাতীয়, কেহবা পুং জাতীয় হইয়াছে। উভ-চিহ্নিত অবস্থার মধ্যেই নানা পরিবর্ত্তন হইতে হইতে অবশেষে এক ধর্ম্মের আধিক্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার নানাবিধ দৃষ্টান্ত জীবরাজ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা গতবারে Arum শ্রেণীস্থ[২] উদ্ভিদের নিম্নদেশে স্ত্রী-চিহ্নযুক্ত পুষ্পের এবং ঊর্দ্ধদেশে পুং-চিহ্নযুক্ত পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছি। উদ্ভিদগণের মধ্যে একই পুষ্পে স্ত্রী-চিহ্ন, এবং পুং চিহ্ন, অনেক স্থলেই দেখা যায়। আমরা সচরাচর যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে একই উদ্ভিদে স্ত্রী ও পুং উভয় প্রকার পুষ্প থাকা অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। গতবারে প্রজাপতি শ্রেণীর মধ্যেও একই দেহ, স্ত্রী-জাতীয় ও পুং-জাতীয় আনুষঙ্গিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকা দৃষ্ট করিয়াছি। এই শ্রেণী প্রায়ই এক চিহ্নিত (unisexual) কীট শ্রেণী, বিশেষতঃ পরপুষ্ট কীট তাহারা প্রায়ই উভ-চিহ্নিত। এই শ্রেণীর মধ্যে কৃমিগণের উভ-চিহ্নতার বিশেষ রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১ Hermaphrodite.
২ কচু এই শ্রেণীভুক্ত।

কেঁচোগণের স্ত্রী-পুং-ভেদ হইয়া থাকিলেও অনেক সময়ে উহাদিগকে উভ-চিহ্নিত দেখা যায়; কিন্তু ইহাদিগের সমুদ্রবাসী কুটুম্বগণ প্রায়ই এক-চিহ্নিত। গ্রন্থী-পদ(Arthropods) জীবগণের ৩ মধ্যেও উভ-চিহ্নিতগণের অভাব নাই। কিন্তু গ্রন্থীপদগণের মধ্যে কতিপয় জীবের অবস্থা অতি অদ্ভুত। ইহারা প্রথম বয়সে পুং ধর্ম্মযুক্ত, এবং বার্দ্ধক্যে স্ত্রী ধর্ম্মযুক্ত হয়। ৪ বহুপদ (myriopods) শ্রেণীযুক্ত জীবগণের মধ্যেও কদাচিৎ উভ-চিহ্নতা দৃষ্ট হয়। শম্বুক-শ্রেণী মধ্যে শুগ্‌লির (oysters) বংশ-রক্ষক কোষ দুই প্রকারই হইয়া থাকে। কোষাধার ৫ হইতে কখন বা পুং কোষ কখন বা স্ত্রীকোষ নির্গত হয়। অর্থাৎ এক আধার হইতেই সময় ভেদে পুংকীট ও স্ত্রী-ডিম্ব উৎপন্ন হয়। শম্বুক শ্রেণীর মধ্যে শঙ্খের
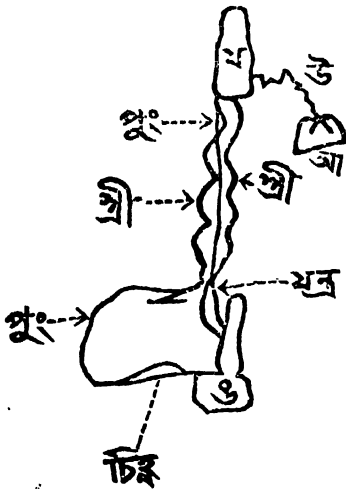
চক্রানুসারে কোন কোন শাখা সম্পূর্ণ রূপে উভ-চিহ্নিত; অপরে সম্পূর্ণ এক চিহ্নিত। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে তৃতীয় এক শ্রেণী দেখা যায়, তাহারা যুগপৎ উভ-চিহ্নিত এবং এক চিহ্নিত। একটীর জনন যন্ত্রের প্রতিকৃতি পার্শ্বে বর্দ্ধিত আকারে অঙ্কিত হইল। এই চিত্রের "য" = যকৃৎ; ৬ "উ" = উভলিঙ্গ প্রণালী, উহার নীচের "আ" আধারটীতে পুংকীট ও স্ত্রী-ডিম্ব উভয়ই উৎপন্ন হয়। আবার যে মোটা বাঁকা বাঁকা প্রণালীটীর গায়ে "স্ত্রী" লেখা আছে, উহা ক্রমে নীচের দিকে গিয়া যে স্থানে "যন্ত্র" শব্দ লেখা আছে, ঐ স্থানে স্ত্রী-যন্ত্র উৎপন্ন করিয়াছে। উহা "ঙ" পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর ঐ মোটা প্রণা-লীর পাশ দিয়া জড়াইয়া যে একটী সূক্ষ্ম রেখার গায়ে 'পুং' লেখা আছে, উহা বাম-দিকে বাঁকিয়া "ঙ" চিহ্নিত স্থানে আসিয়া উভয় প্রণালী এক হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম লাইনের এক স্থানে "চিহ্ন" লেখা আছে; ঐ স্থান কিঞ্চিৎ স্ফীত, এবং উহাই পুং চিহ্ন। স্ত্রী-চিহ্নিত প্রণালী হইতে স্ত্রী-ডিম্ব, এবং পুং চিহ্নিত সূক্ষ্ম নালী হইতে পুংকীট পৃথক পৃথক রূপে উৎপন্ন হইয়া "ঙ" স্থানে একে অন্যকে অনুপ্রাণিত করে। ৭ সুতরাং দেখা যাই-তেছে, এই শম্বুক "উ" এবং "আ" প্রদেশে উভ-চিহ্নিত, আর "স্ত্রী," "পুং" এবং "ঙ" প্রদেশে এক-চিহ্নিত। এইরূপ জটিল বিধানে এত বলক্ষয় হয় যে, উহা কোন মতেই স্থায়ী হইতে পারে না।

উভচর শ্রেণী মধ্যে কোন কোন ভেকের এক দিকে অণ্ড, অন্য দিকে ডিম্বাধার দেখা যায়; কাহারও বা অণ্ডের উপরে ডিম্বাধার,৮

৩ চিংড়ি মাছ এই শ্রেণীভুক্ত।

৪ The sexual organ of the young animal is male; of the old, female in function. Geddes and Thomsons Evolution of sex, P. 72.

৫ পুং স্থলে অণ্ড; স্ত্রীস্থলে ডিম্বাধার।

৬ ইহার বংশরক্ষক কোষ যকৃতের নিম্নে উৎপন্ন হইয়াছে, লক্ষ্য করুন।

৭ Davis Text Book of Biology P. 217.

৮ ovary.

অথবা ডিম্বাধারের উপরে অণ্ড সংলগ্ন থাকে। মৎস্য শ্রেণীতে, মাথার দিকে পুংকোষ যুক্ত এবং পুচ্ছের দিকে স্ত্রী-ডিম্ব যুক্ত—এরূপও কখন কখন দেখা যায়। এবং এক পার্শ্বে পুং-কোষ, অপর পার্শ্বে ডিম্ব-কোষ, এরূপ ত অনেকস্থলেই দেখা যায়।

আর এক শ্রেণীর উভ-চিহ্নতা দেখা যায়, তাহা বংশগত। উহা প্রধানতঃ ঋতু ভেদে উৎপন্ন হয়। মানুষের মাথার উকুন ও চর্ম্ম কীটের ন্যায়, গাছেও অনেক সময় এক প্রকার কীট দেখা যায় ৯ (Aphide) উহারা গ্রীষ্মকালে স্ত্রী জাতীয় ডিম্ব প্রসব করে, এবং হেমন্ত অথবা শীত ঋতুতে পুং জাতীয় কীট উৎপন্ন করে।১ এইরূপে জীবশ্রেণী মধ্যে উভ-চিহ্নিত জীব প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই দেখা যায়। মানুষ কি এ নিয়মের বহির্ভূত? অদ্যাপি কখন কখন এমন কোন কোন স্বভাবজাত খোজা দেখা যায়, যাহাদিগের স্ত্রী-চিহ্ন, এবং পুং-চিহ্ন কিছুই ভালরূপ বুঝা যায় না। যেন উহারা উভয় প্রকারই হইতেছিল। উহারা কেহ স্ত্রীলোকের ন্যায়, কেহ পুরুষের ন্যায় বেশভূষা করে। এই হেতুতে কোন কোন জীবতত্ত্ববিৎ মনে করেন যে, মানব এক সময়ে উভ-চিহ্নিত থাকিবার যে একটা প্রবাদ প্রায় সকল দেশেই আছে, তাহা একবারে ভিত্তি-হীন নাও হইতে পারে।২ আমরা দেখিলাম যে, জীবগণের মধ্যে উভ-চিহ্নিত জীবের সংখ্যা অনেক এখনও আছে। ইহারা কেহ বা এক দেহেই অণ্ড, এবং ডিম্বাধার-যুক্ত; কেহ বা এক দেহেই কতকাংশে স্ত্রী-লক্ষণ যুক্ত, কতকাংশে পুং-লক্ষণ-যুক্ত; আনুষঙ্গিক লক্ষণ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, বর্ণ, বিচিত্রতা ইত্যাদি দ্বারা এই প্রভেদ দেখা মাত্রই লক্ষিত হয়। কেহ বা বাল্যে এক লক্ষণযুক্ত, বার্দ্ধক্যে অন্য লক্ষণ-যুক্ত হয়। আবার, অপরে এক ঋতুতে এক লক্ষণ বিশিষ্ট, অন্য ঋতুতে অন্য লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এবং কোন কোন জীব এক ঋতুতে পুং-ধর্ম্ম যুক্ত অপত্য, এবং অন্য ঋতুতে স্ত্রী-ধর্ম্মযুক্ত অপত্য উৎপাদন করে।

তৎপরে এস্থলে আর এক কথা বিশেষ রূপে বিবেচ্য। জীবগণের মধ্যে এমন অনেক স্থলে দেখা যায় যে, প্রথম অবস্থায় উহারা স্ত্রী ও পুং এতদুভয় ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে; শেষে পূর্ণাবয়ব হইলে এক-চিহ্নিত হয়। ভ্রূণ-তত্ত্বের * আলোচনায় ইহা জানা যাইতেছে যে, উচ্চশ্রেণীস্থ জীবেরও ভ্রূণ অবস্থায় প্রথমে লিঙ্গভেদ উৎপন্ন হয় না; পরে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ উভয়ই উৎপন্ন হয়; অবশেষে এক-লক্ষণ লুপ্ত হইয়া অপর লক্ষণই স্থায়ী হয়; এবং তজ্জন্যই এক-চিহ্নিতা ( unisexualism ) উৎপন্ন হয়। † ভ্রূণের অবস্থা প্রথমে অচি-

৯ গোলাপ গাছে প্রায়ই থাকে।

১ During the summer months, the aphides * * produce generation after generation females. The * advent of autumn however * * brings about birth of males. Evolution of sex. P. 46,

২ The occasional appearance of a partial or apparent hermaphroditism in the human species might seem to give some shadow of colouring to the idea that man was once bi-sexual.

Stark Weather's Law of Sex. P. 55.

* Embriology.

† কুক্কুট ডিম্বের তিন অবস্থা বর্ণন করিতে পণ্ডিতপ্রবর Laulanic বলেন যে অনুপ্রাণিত বুর্দ্বের ( Ovum ) ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত লিঙ্গ ভেদ থাকে না। সপ্তম দিবস হইতে নবম দিবস পর্য্যন্ত উভলিঙ্গত্ব, তৎপর এক ধর্ম্মের প্রাবল্য।

The period of hermaphroditism begins with the seventh day. In the male, the male ovules * * appear in the central tissue; but at the same time female ovules may be persisting. Similarly, in the developing ovary of the female the medullary portion * * contains a large number of female ovules. This herma-

হ্নিত, পরে উভ-চিহ্নিত, অবশেষে এক-চিহ্নিত। ‡ ভেক পিপীলিকা ইত্যাদি প্রাণীগণের ডিম্বাবস্থায় আহারের তারতম্য ঘটাইলে পুংচিহ্ন অথবা স্ত্রীচিহ্নের বিলোপ সাধন করতঃ অচিহ্নতার অথবা উভচিহ্নতার মধ্য হইতেই একচিহ্নের স্থায়ীত্ব সাধন করা যায়। § এই তিন অবস্থাই যে আদিম সময় হইতে জীব রাজ্যের গতি সূচিত করিতেছে, তৎপ্রতি সন্দেহ করিবার কারণ নাই। প্রথমে অচিহ্নিত ¶ অবস্থা, পরে উভচিহ্নত্ব, এবং অবশেষে এক চিহ্নতা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি, এই এক চিহ্নতা এখনও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখনও আমাদিগের প্রত্যেকের দেহেই স্ত্রী ও পুংধর্ম্ম পুষ্ট ও অপুষ্ট রূপে যুগপৎ বিদ্যমান।

শ্রীশশধর রায়।

## চীনদেশের সন্তান চুরি। (১৩)

লি-হুংর যাওয়ার কিছু দিন পরে মা-পুর গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার গা ন্যাকার ন্যাকার করে, মাথা ঘোরে, মুখ দিয়া জল উঠে, আহারে অরুচি, সর্ব্বদা অলসতা বোধ, পোড়া মাটী, আঙ্গার প্রভৃতি খাইতে সাধ হয়। ক্রমে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। লি-শিড়ের গর্ভ হইয়াছে, রাষ্ট্র হইল। লি-হুংর নিকট পত্র পাঠান হইল। সকলেই লি-শিড়ের গর্ভের সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইল, কেবল লি-হুংর চীনা স্ত্রী সন্তুষ্ট হইল না, তাহার মনে ঈর্ষা ও দ্বেষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মা-পু ও মাবির ভালবাসা ক্রমে বাড়িতে বাগিল। উভয়েই উভয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিল। লি-শিড় এখন আর বেশী কার্য্যাদি করে না। সে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে বলিয়া তাহার শ্বশুর তাহাকে আহ্লাদটা বেশী মাত্রায় দেখাইতে লাগিল। সে এখন প্রায়ই মা-শিড়ের (মা-বির) বাটীতে বেড়াইতে গিয়া প্রায় দিন কাটাইতে লাগিল। দুইজনে একত্র বসিয়া বর্ম্মা ভাষায়, নানা যুক্তি পরামর্শ ইত্যাদি করে, অন্যে বুঝিতে পারে না। লাউমা বা মা-ছি-উন প্রায়ই বাড়ীতে থাকে না, কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর যায়। সুতরাং মা-শিড়ের ভয় করিবার বিশেষ লোক নাই। মা-শিড়ের বাটীর তিন চারি খানি বাড়ী ছাড়িয়া গেলে রাস্তার পার্শ্বে এক খানি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি সুন্দর বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বাড়ীতে সাউ-হো নামক একজন চীনা বাস করে। সাউ-হোর এক স্ত্রী আছে। স্ত্রীটীর বয়স প্রায় ২০।২২ বৎসর, দেখিতে অতি সুন্দরী এবং তাহার স্বভাব চরিত্রও অতি নম্র এবং সর্ব্বজন-প্রশংশিত। তাহার বাটীতে অন্য লোক নাই। সাউ-হো কার্য্যান্তরে গেলে তাহার স্ত্রী প্রায়ই একাকিনী থাকে। লি-শিড় ও মা-শিড় দুই জনে সময় সময় সাউ-হোর বাটীতে বেড়াইতে যাইতে লাগিল। ইহারা

phroditism is of short duration. The female ovules disappear * * on the eighth or ninth day, the males * * by the tenth day * *

Evolution of Sex, G & T. P. 66.

‡ Foster and Balfour. Embriology দ্রষ্টব্য।

§ For tadpoles vide. Ency. Brit. 9th Edition vol. 21. P. 722; For Ants Vide Ditto Vol. 2, P. 95.

¶ স্ত্রী পুং ভেদ বিরহিত।

উভয়েই এমন চীনা কথা অনেকটা শিখিয়াছে এবং চীনা ভাষায় মোটামোটি আলাপাদি করিতে পারে। সাউ-হোর স্ত্রীর সঙ্গে মা-বির বেশ হৃদ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহারা বেড়াইতে আসিলে সাউ-হোর স্ত্রী ইহাদিগকে প্রায়ই কিছু না কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়ে না। আবার ইহারাও মাঝে মাঝে কোন কোন খাদ্য দ্রব্য উহাকে উপহার দিতে লাগিল। এই প্রকারে ঘনিষ্ঠতা বদ্ধ-মূল হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। এই ভাবে কিছু দিন চলিল। সাউ-হোর স্ত্রীর অল্পদিন হইল একটী ছেলে হইয়াছে। সাউ-হো কয়েক দিন যাবত ব্রহ্মদেশের মো-গাঁও নামক স্থানে জেড্ পাথর খরিদ করিবার জন্য গিয়াছে। রাত্রি কালে সাউ-হোর শ্বশুর বাটী হইতে কোন দিন তাহার শাশুড়ী, কোন বা তাহার ছোট শ্যালী আসিয়া থাকিব।

মা-পু এখন নয় মাসের গর্ভবতী, পেট এত বড় হইয়াছে যে, সে চলিতে কষ্ট পায়। মাঝে মাঝে পেটে বেদনা বোধ করে, এবং শ্বশুরকে বলে যে ছেলে হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। এক দিন বৈকালে লি-শিড় মা-শিড়ের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে, আর আসে নাই—তাহার শ্বশুরকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়ীতে আসিবে না, মা-শিড়ের বাটীতেই থাকিবে। হঠাৎ রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় মা-পু আসিয়া বাটীর সদর দরজায় আঘাত করিয়া তাহার শ্বশুরকে ডাকিল, "বাবা, দরজা খুলুন, আমার এক ছেলে হইয়াছে।" বৃদ্ধ দরজা খুলিলে মা-পু রক্ত মাখা ন্যাকড়ায় জড়ান ছেলেটী দেখাইল। বৃদ্ধ ছেলে দেখিয়া বড় খুসী হইল। বড় বউকে ডাকিল, তাড়াতাড়ি বড় বউকে ডাকিয়া গরম জল করিতে বলিল এবং সদ্য প্রসূতির শুশ্রূষাতে কোন ত্রুটি না হয়, তাহার জন্য কড়া হুকুম দিল। বড় বউ আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বৃদ্ধের আদেশানুযায়ী সদ্য প্রসূতির জন্য যাহা যাহা করিতে হয়, তাহা করিল। বড় বউয়ের মনে মনে সন্দেহ ছিল, সে বৃদ্ধকে আনন্দিত দেখিয়া বলিল "বাবা! আপনি বড় আনন্দিত হইবেন না, এ যেন সদ্যজাত শিশু নহে, এ যেন দেড় কি দুই মাসের ছেলের মত দেখায়।"

বৃদ্ধ বড় বউয়ের কথায় চটিয়া বলিল, "বেশ তুমি চুপ কর, অমন কথা বলিওনা, হাঁ দেড় কি দুই মাসের ছেলে! এত বড় ছেলে ও কোথায় পাইল? তোমার সকল বিষয়েই উহার সঙ্গে দ্বেষ?" এই কথায় বড় বউ চুপ করিল, আর কেন কথা বলিল না। পর দিন রাষ্ট্র হইল, লি-হুংর এক ছেলে হইয়াছে। বাটীর নিকটবর্ত্তী লোক ভিন্ন দূরের লোকে একথা জানিতে পারে নাই।

## পৈচাশিক কাণ্ড—ভীষণ নরহত্যা!

সাউ-হোর বাটীর সদর দরজা বন্ধ। আজ তিন দিন হইল তাহার বাটীর দরজা খোলা হয় না। প্রতিবেশিগণ মনে করিয়াছিল যে, সাউহোর স্ত্রী বুঝি তাহার পিত্রালয়ে গিয়াছে, কারণ তাহার পিত্রালয় সা-ঈং-লঃ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। লোকের সন্দেহ হইতে লাগিল, তাহারা দরজা ধাক্কা দিয়া দেখে, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। তখন পাড়ার মোড়লকে সংবাদ দেওয়া হইল। মোড়ল ডাকাডাকি করিয়া ভিতরের কাহারো সাড়া শব্দ পাইল না। তখন প্রাচীরের উপর দিয়া একজন লোক গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া যাহা দেখিল, তাহা অতি ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য।

সাউহোর সরলাসুন্দরী যুবতী স্ত্রীর মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থানান্তরে পড়িয়া আছে। সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ, রক্তে মাখা, বিছানার পার্শ্বে একখানা চীনা দা। তাহার বিছানা ও বস্ত্রাদি শুষ্ক রক্তময়। লাশ ফুলিয়া এক বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ছিন্ন মুণ্ডের চক্ষুদ্বয় যেন সজোরে মেলিয়া দর্শকগণকে ভয় দেখাই-তেছে। দলে দলে মাছি সকল ভোন ভোন করিয়া ছিন্ন দেহের ক্ষতের উপর পড়িতেছে, আবার ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে। চীনাদের শয়ন গৃহগুলি অতি সংকীর্ণ ও অন্ধকারময়। মশা সকল ছিন্ন মাথায় কাণেস্ব ও গণ্ডদেশের উপর পড়িতেছে, আবার মহা আনন্দে ভোন ভোন করিয়া উড়িয়া যাই-তেছে। দুই একটা ইঁদুর ঠোকাইয়া ঠোকাইয়া মৃতদেহে ক্ষত উৎপন্ন করিতেছে। ইত্যাদি। লাশটী চিতভাবে, হাঁটু বক্র করিয়া শয়ন করিয়া আছে। মৃতদেহে এত গন্ধ হইয়াছে যে, গৃহে টেকা ভার হইয়াছে।

সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইল এবং অনেকে ভয়ে চমকিয়া উঠিল। সাউ-হোর স্ত্রীর মৃতদেহ দেখিল, কিন্তু ছেলে কোথায়, তাহা খোঁজ করিয়া কোথাও পাইল না। মোড়ল ভয়বিহ্বল চিত্তে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া টেঙ্গিয়ের জজ মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঘটনার রিপোর্ট দিল। মোড়লের ভয় হইবার কারণ, এই ঘটনার জন্য সে দায়ী। চীনদেশের আইন এই যে, কাহারো কোন ছেলে গুরুতর অপরাধ করিলে দেশের অপরা-ধের জন্য তাহার শাস্তি হইতে পারে। সেই মত গ্রামে কোন গুরুতর কাণ্ড হইলে মোড়-লের শাস্তি হইবে। মাজিষ্ট্রেটের এলাকায় কোন গুরুতর কাণ্ড হইলে মাজিষ্ট্রেটের মাথা পর্য্যন্ত কাটা যাইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, সে সাবধান হইলে তাহার অধীনে এই প্রকার কাণ্ড হইতে পারে না।

মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট পাইয়া অনুসন্ধানের হুকুম দিলেন। অধীনস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী সদলে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া কিছুই আস্কারা করিতে পারিল না। গ্রামের মোড়ল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপর কড়া হুকুম জারি হইল যে, এই ঘটনার কোন অনু-সন্ধান না হইলে মোড়ল সহ গ্রামের সকলের শাস্তি হইবে।

গ্রামের লোকে পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিল। কাহার সদ্য শিশু জন্মিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহারা জানিল যে, লি-হুং স্ত্রীর এক ছেলে হইয়াছে। সন্দেহটা তাহার উপরই পতিত হইল। লোকে গোপনে জানিতে পারিল যে, মা-পুর ছেলে সদ্যজাত শিশু নহে। মোড়ল জানিতে পারিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ দিল যে, লি-হুংর বর্ম্মা স্ত্রীর এক ছেলে হইয়াছে, শুনিতে পাই, তাহা বড় সন্দেহজনক।

মাজিষ্ট্রেটের আদেশে পুলিশ কতকগুলি বন্দুকধারী সেপাইসহ লি-হুংর বাটীতে আসিয়া তাহার বাটী ঘেরিয়া ফেলিল।

আজ মা-পুর ছেলের জন্মোৎসব উপলক্ষে দেব মন্দিরে পূজার আয়োজন হইয়াছে। একটা শূকর কাটা হইয়াছে, কতকগুলি মুরগী হত্যা করা হইয়াছে, ভাত ও নানা ব্যঞ্জন রাঁধা হইয়াছে। ধুপ দশাং প্রভৃতি জ্বালিয়া মন্দিরে পূজা দিবার জন্য যাইবে, এমন সময় পুলিশ আসিয়া বাড়ী ঘেরোয়া করিল। হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। লি হুং পিতা এই কাণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পুলিশ বাটীর বাহির হইতে আদেশ করিলে ছেলেটীকে বাহিরে আনিল এবং তাহাদের নিকট দিতে বলিল।

কিন্তু বাটীস্থ লোকে সে আদেশ পালন করিতেছে না, বাটীর সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

অপর দিকে মা-বিকে অনেকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহারা প্রত্যহ সাউ-হোর বাটী যাইত, এ ঘটনার কিছু জানে কি না। কেহ বা তাহার মুখের উপরই হয়ত বলিল, ইহারা অবশ্যই জানে, ইহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিলে আসল কথা প্রকাশ হইতে পারে ইত্যাদি। মা-বি কিছুই জানে না, সকলকেই বলিয়াছে। কিন্তু তাহার মনে দারুণ অশান্তি। গ্রামের মোড়ল তাহাকে ধমকাইয়াছে, কেননা মা-বি ও মা-পু দুই জনেই সাউ-হোর বাটীতে প্রত্যহ যাইত, সুতরাং তাহাদের উপর সন্দেহ গুরুতর। এই সকল কারণে তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। পুলিশে পাছে তাহাকে ধরিয়া লাঞ্ছনা দেয়, এইজন্য তাহার মহা আতঙ্ক হইয়াছে। যখনই দুই চারিজন লোক একত্র গোপনে কোন কথা বলে, তখনই তাহার মনে সন্দেহ হয়, বুঝি তাহারই কথা তাহারা বলিতেছে। আজ তিন রাত্রি হইতে তাহার নিদ্রা নাই, চক্ষু দুটী লাল হইয়াছে, সময় সময় অন্যমনস্ক থাকে, কখন কখন একাকী দুই চারি কথা বলে। মা-ছি-কান (লাউমা) তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সে ভাবে কি, এবং তাহার মন এত চঞ্চল দেখা যাইতেছে কেন? সে বলিল যে, তাহার মাথা ধরিয়াছে, শরীর অসুস্থ, তাই তাহার মন চঞ্চল। গ্রামের মধ্যে যখন পুলিশের হৈ হৈ রব পড়িয়াছে, সকলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই যখন ব্যস্ত, চঞ্চল, ও আতঙ্কিত, সকলে ঘটনা আবিষ্কারের জন্য উৎসুক, সেই সময়ে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে পাপের তাড়নায় স্থির থাকিতে না পারিয়া বেগে দৌড়াইতে লাগিল এবং দৌড়াইয়া একদমে লি-হুংর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। সকলে তাহাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। এযাবত কেহই তাহার উপর এমন গুরুতর সন্দেহ করে নাই, তাহা করিলে পূর্ব্বেই ইহাকে গ্রেপ্তার করিত। সে লি-হুংর বাটীতে উপস্থিত হইয়া পুলিসকে বলিল, "আমি ছেলে আনিয়া হাজির করিয়া দিতেছি।" পুলিশের যন্ত্রণায় থাকিতে না পারিয়া লি-হুংর পিতা দরজা খুলিল, অমনি মা-শিড় দৌড়িয়া ভিতরে গিয়া লি-শিড়কে বলিল, "দিদি, দেখি ছেলেটী কেমন আছে," এই বলিয়া তাহার কোল হইতে ছেলেটী লইয়া এক দৌড়ে পুলিশের হাতে আনিয়া দিল এবং বলিল যে, "ইহা লি-শিড়ের কার্য্য!" সব গ্রামের মোড়ল প্রভৃতি সেনাক্ত করিল যে, ঐ ছেলে সাউ-হোর। তখন পুলিশ মা-পুকে গ্রেপ্তার করিল। পুলিশ বলিল যে, "তুই সাউ-হোর স্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহার ছেলে চুরি করিয়া আনিয়াছিস্।" ইতিপূর্ব্বে পুলিশ দেখিয়াই মা-পুর চক্ষু স্থির হইয়াছিল, সে হতবুদ্ধি, আর কি জবাব দিবে? হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমি একাকিনী একার্য্য করি নাই, মা-শিড়ও আমার সঙ্গে ছিল, সেই ত আমাকে পরামর্শ দিয়া একার্য্য করাইয়াছে।" কিন্তু পুলিশ মা-শিড় (মা-বি) কে গ্রেপ্তার করিল না, তাহাকে সাক্ষী স্বরূপ কাছারী বাড়ীতে পাঠাইল। মা-বি বলিল, "সে কেন একাজ করিবে? লি-শিড় ছেলে পাইলে তাহার স্বার্থ কি?" ইত্যাদি স্বাভাবিক অজুহাত সকল দেখাইতে লাগিল। লি-শিড়কে পুলিশে

চালান দিল। গ্রাম্য মোড়লের অনুরোধে এবং গোপনে অর্থব্যয় করিয়া লি-হুংর পিতা আপাতত অব্যাহতি পাইল।

## মা-পু এবং মা-বির কারাগার।

টেঙ্গিয়ে নগর-প্রাচীরের ভিতর উত্তর পূর্ব কোণে গবর্ণমেণ্টের ইয়ামিন বা কাছারী বাড়ী। নগর-প্রাচীরের পশ্চিম দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই দক্ষিণ দিকে একটী মনুমেণ্ট। সেই মনুমেণ্টের নিম্নে দক্ষিণাভিমুখে এক প্রস্তরময় রাস্তা গিয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া গেলেই সম্মুখে একটী কাষ্ঠ-ময় দরজা। সেই দরজা পার হইলেই এক বিস্তৃত আঙ্গিনা। ঐ আঙ্গিনার দক্ষিণ দিকে আর এক দরজা। ঐ দরজা দিয়া সহরের মধ্যে যাওয়ার রাস্তা। আঙ্গিনার পূর্ব্বে চীন দেশী জাতীয় প্রথানুসারে এক অতি উচ্চ প্রাচীর। ঐ প্রাচীরের গাত্রে নানা রংয়ে রঞ্জিত এবং বহুবিধ চিত্রে উহা চিত্রিত। আঙ্গিনার মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে পথের দু ধারে দুইটী ক্ষুদ্র গৃহ। উহা এখন আর ব্যবহৃত হয় না। বোধ করি, উহা পাহারাওয়ালাগণের থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই দুই খানি গৃহের এখন ভগ্ন দশা। তাহার পরেই উত্তর-দক্ষিণ-লম্বা এক বৃহৎ গৃহ। ঐ গৃহের মধ্যস্থলে এক প্রশস্ত দরজা। উত্তর দরজা পার হইয়া গেলে একটী আঙ্গিনা। ঐ আঙ্গিনার দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের থাকিবার স্থান ও আস্তা-বল এবং বাম পার্শ্বে সরকারী লোন আফিস্। এই স্থানে জিনিষ বন্ধক রাখিয়া লোককে টাকা ধার দেওয়া হয়। উক্ত আঙ্গিনার সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিমে আর একখানি বৃহৎ ঘর। তাহার মধ্যস্থলে এক বিচারাসন, এক পার্শ্বে কতকগুলি আবর্জ্জনাপূর্ণ একটী কক্ষ। অপর পার্শ্বে একটী কামরায় হাজতের আসামী থাকে। এখানে আসামীগণ চণ্ডু পান করে এবং দিবা রাত্রি ঘুমায়। ইহার উপর কোন পাহারা নাই। এই বিচারাসন ও হাজতের কামরার মধ্য দিয়া এক ক্ষুদ্র পথ আছে, তাহা পার হইয়া গেলে আর এক আঙ্গিনা। সচরাচর লোকে এই পথ দিয়া ভিতরে যায়, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে বা অন্য কোন উচ্চ কর্ম্মচারী ভিতরে যাইতে বা ভিতর হইতে আসিতে বিচারাসনের পশ্চাতে খুব প্রশস্ত এক কাঠের দরজা, তাহা খুলিয়া দেওয়া হয় নচেৎ ঐ বৃহৎ দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে।

ভিতরে যে আঙ্গিনা, তাহার এক পার্শ্বে কতকগুলি সেপাই থাকে এবং অপর পার্শ্বে কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী থাকে। সম্মুখে আর এক বৃহৎ গৃহ। তাহার মধ্যস্থলে আর এক বিচারাসন, তাহার পার্শ্বে কতকগুলি আইন পুস্তক কাষ্ঠ-ফলকে রাখা হইয়াছে। এই ঘরের এক পার্শ্বে অভ্যাগত উচ্চ-কর্ম্মচারি-গণের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইবার স্থান, অপর পার্শ্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস। ইহার মধ্যে সুন্দর সুন্দর কয়েকখানি শিবিকা বা পাল্কী আছে। এই গৃহের সম্মুখে কাষ্ঠ-ফলকে আবদ্ধ চীনদেশী ধরণের কতকগুলি বল্লম, খড়গ, ত্রিশূল ইত্যাদি রক্ষিত হই-য়াছে।

এই গৃহের এক পার্শ্ব দিয়া উত্তরমুখে গেলে সরকারী নাট্যশালা, অপর পার্শ্ব বা দক্ষিণদিক্ দিয়া গেলে কাষ্টম আফিসের কমি-শনারের বাসস্থান। এইক্ষণ কমিশনার ঐ বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিচারাসনের এক পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র পথ দিয়া ভিতরে গেলে আর এক আঙ্গিনা অর্থাৎ চতুর্থ আঙ্গিনা। তাহার এক পার্শ্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের

বিশ্বস্থ এক কর্ম্মচারী থাকেন ও তথায় গোপনীয় অনেক কার্য্য হয়। এই আঙ্গিনার সম্মুখে মাজিষ্ট্রেটের নিজের বাসগৃহ।

দ্বিতীয় আঙ্গিনার সম্মুখে যে গৃহে বিচারাসনের কথা বলিয়াছি, তাহার পশ্চিম কোণে একটী ক্ষুদ্র দরজা-বিশিষ্ট একটী প্রাচীর দৃষ্ট হয়। ঐ প্রাচীরের উপর কতকগুলি কাঁটা দেওয়া আছে। ঐ প্রাচীর গাত্রের দরজাই টেঙ্গিয়ের জেল খানার দরজা। প্রাচীরটী কাঁচা ইঁটের গাঁথনি, উচ্চও বেশী নহে। দরজাটী সামান্য কাঠের পাতলা তক্তা দ্বারা নির্ম্মিত। বোধ করি, তেমন জোরে পদাঘাত করিলে, এক আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া কয়েদী সকল পালাইতে পারে বা একখানি সামান্য অস্ত্র দ্বারা কাঁচা ইঁটের দেওয়াল ছিদ্র করিয়া লোক পলাইতে পারে। ইহার মধ্য হইতে কয়েদিগণ কেন পলায় না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। দরজায় কোন পাহারা নাই। দরজার গাত্রে ৬ ইঞ্চ বর্গ বিশিষ্ট একটী ছিদ্র আছে। কয়েদীগণ ঐ ছিদ্র দ্বারা বাহির হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি আপন ইচ্ছা মত খরিদ করিয়া খাইয়া থাকে এবং আত্মীয় বন্ধুগণের সঙ্গে যথেচ্ছা আলাপ করিতে পারে। খাবার-ওয়ালাগণ প্রায়ই ঐ ছিদ্রের সম্মুখে খাবার লইয়া অপেক্ষা করে। জেল খানার ভিতরের সম্যক বর্ণনা করিতে লেখকের সাধ্য নাই, কেন না, তিনি ভিতরে গিয়া দেখিতে অনুমতি পান নাই। তবে লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই লিখিতেছেন।

পুলিশ মা-পুকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিল, তাহার আংশিক স্বীকারোক্তির কথাও উল্লেখ করিল এবং মা-বিকে সাক্ষী-স্বরূপ হাজির করিল। মাজিষ্ট্রেট ছেলেটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার নাভি শুষ্ক, এবং আকারে প্রায় দেড় মাস কি দুই মাসের ছেলের মত দেখায়। মা-পুর স্তন পরীক্ষায় আরো ধরা পড়িল, তাহার স্তনদ্বয় সদ্য-প্রসূতির স্তনের ন্যায় না হইয়া যুবতীর ন্যায় ছিল। মাজিষ্ট্রেট মা-পুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে এই কার্য্য করিয়াছে কিনা। মা-পু খোলাসা কিছুই বলিল না, কেবল বলিল, মা-বিই ইহার মূল। মা-বি কিন্তু একেবারেই অস্বীকার করিল যে, সে কিছুই জানে না! সে ছেলেও লয় নাই, তাহার ছেলের প্রয়োজনও নাই, তবে সে কেন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। মাজিষ্ট্রেট ইহাদের অসরল ভাব দেখিয়া দুই জনকেই জেল খানায় পূরিতে বলিয়া সেদিনকার মত কাছারী বন্ধ করিলেন। ছেলেটী তাহার মাতামহের জেম্বায় রাখিয়া দিলেন।

ইহার তিন দিন পরে মাজিষ্ট্রেট পুনরায় আসামীগণকে তলব করিলেন। তাহারা সম্মুখে আনীত হইলে, মাজিষ্ট্রেট লি-শিড় ও ও মা-শিড়কে বলিলেন, তাহারা যদি সত্য কথা না বলে এবং ঘটনা স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আসামীদ্বয় উভয়েই বলিল, তাহারা নির্দ্দোষী, এ ঘটনার কিছুই জানে না। তাহাদিগকে অন্যায় পূর্ব্বক গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তখন মাজিষ্ট্রেট ক্রোধে অধীর হইয়া আদেশ করিলেন যে, আসামীগণকে অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য যে যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বিত হউক। মাজিষ্ট্রেটের আদেশমতে আসামীদ্বয়কে পুনরায় জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইল।

চীনদেশের কোন আসামীকে অপরাধ স্বীকার করাইবার নানাপ্রকার জঘন্য ও যন্ত্রণাদায়ক উপায় আছে। ইহাদিগকে

অনাহারে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। তপ্ত লৌহের বলয় ইহাদের হস্তে ও পদে পরাইতে আরম্ভ করিল, আঙ্গুলে আঙ্গুলে পেরেক ঠুকিতে লাগিল, যন্ত্রণায় হতভাগিনীগণ অস্থির হইল, তবুও দোষ স্বীকার করে না, স্তনের বোঁটের মধ্যে শূকরের কুঁচি প্রবেশ করাইতে লাগিল, দিবারাত্রি হাত পা বাঁধিয়া মলমূত্রের মধ্যে রাখিয়া দিল। ইহার উপর কিল চড় লাথির ত কথাই নাই। যন্ত্রণা ও কষ্টে অধীর হইয়া শেষে মা-পু বলিল যে, অপরাধ স্বীকার করিতে রাজি আছে, অগত্যা মা-বিও স্বীকার করিতে সম্মত হইল।

## মা-পুর (লি-শিড়ের) স্বীকারোক্তি।

পরদিন আসামীগণকে পুনরায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। লি-শিড়কে ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য কথা বল এবং কি জন্য এবং কি প্রকারে এ ঘটনা হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র গোপন না করিয়া যথাযথ বর্ণন কর। মা-পু তখন বলিতে আরম্ভ করিল ;—

আমার ও আমার সপত্নীর কোন সন্তান না হওয়ায় আমরা সকলেই দুঃখিত থাকিতাম। আমার শ্বশুর মাঝে মাঝে আমার স্বামীকে আর এক বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করিতেন। ইহাতে আমার মনে বড় কষ্ট হইত, কারণ আমার কেহ নাই এবং আমি যে ভাবে চীনদেশে আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে কষ্ট বোধ হয়। এ অবস্থায় স্বামী যদি আর এক বিবাহ করেন, তাহা হইলে আরো মানসিক্ কষ্ট হইবে, কেন না, এক সপত্নীর ঘর করাই কষ্টদায়ক হইয়াছে। আমার যে সপত্নী আছে, তাহা জানিলে কখনও চীনদেশে আসিতাম না। আমাদিগের সন্তানাদি হইবে কি না, তাহা জানিবার জন্য শ্বশুর মহাশয় এক জন গণককে ডাকেন। গণক গণিয়া বলিল যে, সন্তান লেখা আছে, তবে ষষ্ঠীদেবীকে পূজা দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারিলে সন্তান হইবে। শ্বশুর তাহাই করিলেন। ইহার পরে আমার স্বামী ব্রহ্মদেশে চলিয়া যান। তাহার পরই তিনমাস যাবৎ আমার ঋতু হয় না। তাহাতে সকলেই মনে করিলেন যে, আমার সন্তানের লক্ষণ হইয়াছে। আমিও তাহাই মনে করিলাম। কথা রাষ্ট্র হইল। এই সংবাদ পত্র দ্বারা আমার শ্বশুর স্বামীকে জানাইলেন, শ্বশুর বড় আহ্লাদিত হইলেন। ইহার পরই আমার পুনরায় ঋতু হইল। আমি ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিতা হইলাম। এ কথা প্রকাশ করিয়া সকলকে হতাশ করিতে মনে বড় কষ্ট হইল। প্রকাশ করিতে লজ্জাও বোধ হইল। মনে মনে চিন্তা করিয়া গোপন করাই স্থির করিলাম এবং ক্রমে গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে লাগিলাম, সময়ে সময়ে কৃত্রিম ন্যাকার করা, আহারে অরুচি দেখান, অলসতা প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে ন্যাকড়া বাঁধিয়া পেটও ক্রমে বড় দেখাইতে লাগিলাম। যখন এই সকল কৃত্রিম লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলাম, তখন আমার মনে সর্ব্বদাই এই চিন্তার উদয় হইত, কোথা হইতে আমি ছেলে দেখাইব। শেষে সমস্ত চাতুরি প্রকাশিত হইয়া পড়িলে লজ্জা ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। শ্বশুরের স্নেহ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইব এবং স্বামীর অনুযোগের ভাজন হইত। দিবা রাত্রি এই চিন্তায় মন অস্থির হইব। মা-শিড়ের সঙ্গে আমার চীনদেশে আইসা অবধি বড় প্রণয়। যত গোপন কথা তাহাকে না বলিয়া থাকিতে পারি না। সেও পূর্ব্বে

জানিত না যে, আমার কৃত্রিম গর্ভ। একদা তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলে সেও এবিষয়ে চিন্তিত হইল। কিন্তু বলিল "ভয় করিস না। লজ্জা নিবারণের কোন ফিকির দেখিব।" মা-শিড় আমা অপেক্ষা বয়সে বড় এবং সংসারের অনেক ঘটনা তাহার জানা আছে। সে অনেক বিষয়ে আমা অপেক্ষা বহুদর্শী, তাই তাহার সাহায্য যাহাতে পাই, মনে সেই আকাঙ্ক্ষা হইল। সে তাহার স্বামীর সঙ্গে চণ্ডুপান করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বামীর অবস্থা ভাল নহে, সুতরাং সময় সময় চণ্ডু পানের পয়সা জুটে না, তাহাতে তাহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। আমি তাহার এই অভাব বুঝিয়া মাঝে মাঝে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতাম, তাহাতে সে আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়াছিল। সে আমাকে আপন ভগ্নী অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতে লাগিল। যখনই দুই জনে একত্র হই, তখনই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি যে, সে কোন যুক্তি পাইয়াছে কি না। এক দিন বলিল "বোন্, তোর লজ্জা আমার লাগে। আমরা উভয়েই এক দেশের লোক, সুতরাং আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, কাহারো কোন সদ্য-জাত শিশু চুরি করিয়া হস্তগত করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" এ কথায় আমি চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "সে কি! কাহারো সন্তান চুরি করিলে কি সে কথা চাপা থাকিবে? ধরা পড়িলে আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না।" তাহাতে সে বলিল "বোন্, তুমি ছেলে মানুষ, আমার কথায় প্রতিবাদ করিও না। আমি তোমা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি ও সাহস রাখি। সুতরাং যাহা করিতে হয়, তাহা আমি করিব, তুমি মাত্র সঙ্গে থাকিবে। এমন ভাবে কার্য্য উদ্ধার করিব যে, লোকে জানিতে না পারে।" আমি ব্যথিত অন্তঃকরণে তাহার কথায় মত দিলাম। কিন্তু মনে শান্তি পাইলাম না। মা-শিড় আমার নিকট ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিল যে সে আমার লজ্জা নিবারণ করিবে। আমি তাহার আফিংয়ের খরচ বাবদ এক যোগে ২৫১ লিয়াং দিলাম এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইলে আরো ২৫ লিয়াং দিব, এমন অঙ্গিকার করিলাম। সে ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল।

আমার কৃত্রিম-গর্ভ প্রায় নয় মাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি মাঝে মাঝে পেটে বেদনা হইয়াছে বলিয়া ভাণ করিতে লাগিলাম। তখন শ্বশুর ও অন্যান্য লোকে মনে করিতে লাগিল যে, প্রসব অতি নিকটবর্ত্তী। মা-শিড়ের পরামর্শ মতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ করিতাম।

যে দিন মা-বি ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিল এবং আমি তাহাকে টাকা দিলাম, তাহার পর দিন আমাকে সঙ্গে করিয়া সাউ-হো নামক প্রতিবেশীর বাটীতে বেড়াইতে গেল। আমি পূর্ব্বে কখনও তাহার বাটীতে যাই নাই, বা তাহাদের কাহাকেও চিনিতাম না। সাউ-হোর স্ত্রী মা-শিড়কে দিদি বলিয়া ডাকিত। সে আমাদিগকে খুব যত্ন করিত। চা পান করিতে দিত। তাহার সম্প্রতি একটী ছেলে হইয়াছে, বাটীতে অন্য কেহ নাই, তাহার স্বামী বর্ম্মায় গিয়াছে। আমরা মাঝে মাঝে তাহার বাটীতে বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে তাহার হৃদ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মা-শিড় বলিল, "এই ছেলেটী চুরি করিতে পারিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।" ছেলেটী অতি সুন্দর, দেখিলেই আমার মন

১ এক লিয়াং বা টেলে প্রায় দুই টাকা হয়।

যেন পাগল হইত। তাহাকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করিবার জন্য মন বড় ব্যাগ্র হইল। একবার পাপকার্য্য করিব বলিয়া মনে আতঙ্ক হইতে লাগিল, আবার মনে যেন দুষ্প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া সে ভাবকে দূরে ফেলিয়া মনকে কু-কার্য্য করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল।

সাউ-হোর স্ত্রী বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিল এবং আমাদিগকে খুব বিশ্বাস করিত। সেদিন আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছি। মা-শিড় বলিল, "বোন্ আজ আমাদিগকে ওঁফেন খাওয়াতেই হইবে।" ২ তখন সে হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, তোমরা বস, আমি ওঁফেন পাক করিয়া আনি। রন্ধন-গৃহে গিয়া ওঁফেন পাক্ করিয়া আনিল। আমরা গল্প করিতে করিতে আনন্দে আহার করিলাম। আজ লাউ-হোর স্ত্রী একাকিনী, তাহার পিত্রালয় হইতে কেহই আইসে নাই। রাত্রি প্রায় নয়টা হইল। ইতিমধ্যে সাউ-হোর স্ত্রী পায়খানায় গেল। মা-শিড় আমাকে বলিল যে, "তুই উহার খাটের নীচে সিন্ধুকের পার্শ্বে লুকাইয়া থাক্। সে আসিলে আমি বলিব, লি-শিড়ের বাটী দূরে, তাই সে বাটীতে গিয়াছে। আমি তাহার পর বাটীতে যাইব এবং দুই ঘন্টা পরে পুনরায় আসিব, তুই সদর দরজা খুলিয়া দিস। কারণ আমার স্বামী বাটীতে আছে, শোয়ার সময় বাটীতে যাওয়া দরকার। তোর স্বামী বাটীতে নাই, তবে শ্বশুরকে বলিয়া আসিয়াছিস কিনা?" আমি বলিলাম যে, শ্বশুরকে বলিয়া আসিয়াছি, যে, আজ আমি মা-শিড়ের বাটীতে থাকিব। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই।

আমি মা-শিড়ের কথামত তাহার খাটের নিম্নে লুকাইলাম। বউ পাইখানা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, লি-শিড় কোথায়? মা-শিড় বলিল, সে বাটীতে গিয়াছে। তাহার শ্বশুর রাগ করিবে বলিয়া ভয়েতে সে চলিয়া গিয়াছে। মা-শিড় এই কথা বলিল, বাটীতে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিল, বউ বলিল "দিদি, বসো না। আজ আমি একাকিনী থাকিব, আজ আমার বোনের আসার কথা ছিল, সেও আসিল না। তুমি গেলে আমার ভয় করিবে।" মা-শিড় বলিল "ভয় কি? দরজা বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ছেলে কোলে করিয়া শুইয়া থাক। কোন ভয় নাই।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, বউ তাহার পাছে পাছে গিয়া বাটীর সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এবং আসিয়া শয়ন করিল। কিন্তু তাহার মনে যেন ভয় দূর হয় নাই, তাই সুস্থ হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিল না। কতকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। রাত্রি বোধ করি তখন সাড়ে এগারটা। তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, তখন আমি আস্তে আস্তে বাহির হইলাম। প্রদীপটী নিবাইয়া সদর দরজার নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর লোকের পায়ের শব্দ শুনিলাম, ভয়েতে প্রাণটা চমকিয়া উঠিল। পায়ের শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল, এবং কে যেন দরজায় আঘাত করিল, তখন মনে হইল, বউয়ের কোন প্রণয়ের লোকই বা গোপনে আছে। ইহা ভাবিয়া মনে বড়ই ভয় হইল, তাহা হইলে যে আমি নিশ্চয়ই ধরা পড়িব। এইজন্য দরজায় আঘাত করিলেও চুপ

২ ময়দা দ্বারা চীনদেশী এক প্রকার মোহন-ভোগ প্রস্তুত করে।

করিয়া রহিলাম, দরজা খোল বলিয়া বাহির হইতে আবার আস্তে কথা বলিল, আমি তাহাতেও চুপ করিয়া রহিলাম। বাহির হইতে মা-পু বলিয়া ডাকিল, তখন আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে মা-বি নাকি ?" উত্তর হইল "হাঁ শীঘ্র দরজা খোল, দরজা খুলিতে এত বিলম্ব করিলে কেন, যদি রাস্তা দিয়া যাইতে আমাকে কেহ দেখিত, তাহা হইলে বিপদ ঘটাইত।" আমি বলিলাম, "যদি তুমি না হইয়া আর কেহ হইত, তাহা হইলে আমার উপায়টা কি হইত ?" মা-বি বলিল "হাঁ তা সত্য বটে।" আমি দরজা খুলিয়া দিলাম, মা-শিড় ভিতরে আসিল। আমি দরজা পুনরায় বন্ধ করিলাম।

আমরা দুই জনে পুনরায় ভিতরে গেলাম। আমি বলিলাম যে, চল ছেলেটাকে চুরি করিয়া লইয়া যাই। তখন মা-শিড় বলিল, "কাল যখন সে আমাদের নাম বলিয়া দিবে, তখন আমাদিগের উপায় কি হইবে ? উহা কোন কাজের কথা নয়। আমার মতে বউটার কার্য্য শেষ করাই ভাল, শত্রু রাখিয়া কেবল নিজে বিপদে পড়া।" আমি বলিলাম "সে কি প্রকার ?" মা-বি বলিল, ইহা বুঝলে না, বউটাকে খুন করিয়া ফেলি, পরে ছেলেটাকে লইয়া যাই, কেউ টের পাইবে না। আমাদের কথা প্রকাশ করিবার লোকও থাকিবে না।" তখন আমার গা শিহরিয়া উঠিল, প্রাণ কাঁপিতে লাগিল, মনে করিলাম, আচ্ছা এমন নির্দ্দোষী বেচারাকে কেমন করিয়া খুন করিব ? সে আমাদিগকে কত বিশ্বাস করিত। এই সকল কথা মনে মনে ভাবিলাম, কিন্তু স্পষ্ট বলিলাম না, কেন না, পাছে মা-বি বিরক্ত হয়, তাহা হইলে কার্য্য উদ্ধারে বিপদ। আমাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া মা-বি বলিল "ভাবিস্ কি, এখনও ভাবনার সময় ? আগে ভাবা উচিত ছিল, এখন হয় এদিক না হয় ওদিক। বিলম্ব হইলে লোকে টের পাইলে সর্ব্বনাশ হইবে, আমাদিগের মাথা থাকিবে না।" আমি বলিলাম, "আমার অন্য বন্ধু বা সহায় নাই, তুমি যাহা ভাল বোঝ, তাহাই কর। তুমি অগ্রগামী হও, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। তুমি যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব।" মা-বির কথার ভাবে বোধ হইল, তাহার মন খুব শক্ত, তাহার মনে কোন কষ্ট হইতেছে না। সে অগ্রে অগ্রে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে প্রবেশ করিলাম। মা-বি তৈলের প্রদীপটী জ্বালিয়া তাহার সাহায্যে রন্ধনশালা হইতে মাংস কাটা দা খানি আনিয়া, বাতিটা আড়ালে এমন ভাবে রাখিল যে খুব আলোও নহে, অন্ধকারও নহে। মূল কথা দেখা যায়। আমার প্রাণের মধ্যে ধড় ফড় করিতে লাগিল, আমার মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। মা-বি বউয়ের বিছানার নিকট দা হাতে করিয়া যাইবা মাত্র যেন তাহার হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে যেন চমকিয়া উঠিল, এবং বলিল "ওমা কে তুমি !" বউটা ভয়েতে বোবাধরার মত আঁও আঁও করিতে লাগিল, আমার প্রাণ আরো চমকিল। মা-বি বলিল "দেখিস্ কি, হাবা ওর চুল ধর, শক্ত করিয়া ধরিস যেন নড়িতে না পারে," এই বলিয়া সে তাহার বাম হস্ত দ্বারা বউটার হাতের মণিবন্ধ দুই খানি কসিয়া ধরিয়া গলা দা দ্বারা পোঁচাইয়া কাটিতে লাগিল, বউটা যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করিয়া ঠেলিয়া উঠিয়া বসিবার যোপাড় করিয়াছিল, আমি তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া বিছানায় সঙ্গে লাগাইয়া রাখিলাম। ইতি মধ্যে মা-বি তাহার গলাটী দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল। কাটা পাঁটা বা শূকরের মত বউটা দুই খানা [illegible]

হইতে লাগিল, শরীর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে ও ঝাঁকিতে লাগিল, ছিন্ন দেহ হইতে বেগে রক্ত ছুটিয়া আমাদের শরীর রক্তময় করিয়া দিল। অল্পক্ষণ পরেই দেহটা ঠাণ্ডা হইল। তখন মা-বি ছেলেটীকে রক্তময় ন্যাকড়ায় জড়িয়া আমাকে দিল এবং বলিল "এই নে, তোর মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া দিলাম। এখন চল্ শীঘ্র বাহির হই।" আমরা বউয়ের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া, একখানি ক্ষুদ্র মইয়ের সাহায্যে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাড়ী গেলাম। ভয়তে শরীর আড়ষ্ট হইতে লাগিল, পা যেন আর চলে না, আবার কেহ দেখিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিলাম। আমি এত রাত্রিতে একাকিনী কখনও কোথাও যাই নাই, তাই ভয়। ভূতের ভয় এবং যাহাকে মারিলাম, তাহার প্রেতাত্মার ভয়ে জড়সড় হইতে লাগিলাম। আমি আপন বাটীতে গেলাম। কিন্তু মা-বি যখন বাটীতে যায়, তখন যেন তাহারও মনে ভয় হইয়াছে, এমন বোধ হইল, আমি বাড়ী গিয়া শ্বশুরকে ডাকিলাম। শ্বশুরকে বলিলাম যে, আমি মা-বির বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তথায় আমার ছেলে হইয়াছে; এই দেখুন। শ্বশুর তখন রক্তাক্ত ন্যাকড়া জড়ান ছেলে দেখিয়া খুসি হইলেন এবং আমার সতীনকে বলিলেন, ইহার জন্য গরম জল কর এবং ছোট বউকে শুশ্রূষা কর। বড় বউর সন্দেহ আমার উপর বরাবরই ছিল, সে কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিল না। শ্বশুরকে বলিলে শ্বশুর তাহাকে ধমকাইলেন, সে নিরস্ত হইল। ছেলের জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু মনে দারুণ আতঙ্ক রহিল। পূর্ব্বরাত্রিতে স্বপন দেখিয়াছি যে বউ যেন আসিয়া বলিতেছে, "নির্দ্দোষে আমাকে মারিলি, প্রতিফল শীঘ্র পাইবি!"

ধর্ম্মাবতার, আমি নিতান্ত সহায়হীনা, পিতামাতা হীনা, আমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তাহার যথেষ্ট শাস্তি হওয়া উচিত, কিন্তু আমার প্রতি কতক দয়া প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়।

## মা-শিড়ের ( মা-বির ) উক্তি।

মা-শিড় বলিল, লি-শিড় যাহা বলিয়াছে, সকলই সত্য, কিন্তু কেবল দুইটী কথার সামান্য অনৈক্য আছে, সে বলিয়াছে যে, আমাকে ২৫ লিয়াং দিয়াছে, তাহা নহে, ২০ লিয়াং মাত্র আমি পাইয়াছি। অপর সে বলিয়াছে, আমি সাউহোর স্ত্রীর গলা পোঁচাইয়া কাটিয়াছি, তাহা ঠিক নহে। প্রথম জোরে তাহার গলায় এক কোপ মারি, তাহাতে হাড় পর্য্যন্ত কাটে, পরে অবশিষ্ট অংশ পোঁচাইয়া কাটি। (বিচারক এই কথায় একটু হাসিলেন।) আমার আফিংয়ের পয়সা না জোটায় অর্থের লোভে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি। ঐ কার্য্য করিবার সময় আমার মনোকষ্ট বা ভয় হয় নাই। কিন্তু কার্য্য শেষ করিয়া যখন বাটীতে যাই, তখন আমার মনে ভয় হইতে লাগিল। রক্তাক্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া যখন শয়ন করিলাম, নিদ্রা হইল না, যেন সাউহোর স্ত্রীর সেই গোঁ গো শব্দ ও গ্যাঙ্গানি, মুখভঙ্গি চক্ষে চক্ষে দেখিতে লাগিলাম, সময় সময় প্রাণ কাঁপিতে লাগিল, মনে আত্মগ্লানি হইতে লাগিল, মনের মধ্যে দারুণ যাতনা হইতে লাগিল যে, কেন এমন কুকর্ম্ম করিলাম। তাহাতে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি এই প্রকার যম-যন্ত্রণা ভোগ করিলাম। প্রাতঃকালে উহার বাটীর দিকে লোকের কথা শুনি আর প্রাণ যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে, বুঝি আমাদিগকে লোকে চিনিতে পারিয়াছে। সর্ব-

দাই এই আতঙ্ক। গ্রামের কোন ভদ্রলোক যদি আমার দিকে তাকায়, তখনই ভয় হয়, পাছে আমার বিরুদ্ধে ইহারা ষড়যন্ত্র করে। কোন পুলিশের লোককে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিলে আতঙ্ক আরো বৃদ্ধি হয়। এই সকল চিন্তায় সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকি। আমার স্বামী আমার এই ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "তোমাকে অমন দেখাইতেছে কেন, তোমার চক্ষু লাল হইয়াছে, তুমি ভাব কি? তোমার মনের কষ্ট কি, বল না।" আমি তাহাতে বলিলাম যে, "আমার মাথা ধরিয়াছে, রাত্রিতে ঘুমাইতে পারি নাই, তাই শরীর অসুস্থ।" সে তাহাই বিশ্বাস করিল। রাত্রি কালে অনেক যাতনার পর একটু তন্দ্রাবেশ হইলে যেন আমি বউটাকে যে অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহাই দেখিতেছি। সে যেন আসিয়া বলে যে "তুই আমাকে বিনা অপরাধে কাটিলি, তোর মুণ্ডপাত হইতেও বিলম্ব নাই। এই পৈশাচিক বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল সত্বরই পাইবি।" দুই রাত্রি এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছি। যখন লি-হুংর বাটী পুলিশে ঘেরে, তখন আমার মনে শঙ্কা হইল, লি-শিড়কে ধরিয়াই পুলিশ আমাকে ধরিতে আসিবে। তাই ভয়েতে অগ্রে গিয়া সাক্ষী স্বরূপ আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এখন ধৃত হইয়াছি, ধর্ম্মাবতার, আমি আগা গোড়া সমস্ত সত্য ঘটনা বলিলাম। ইহার এক তিলও মিথ্যা নহে। বিচারক দুইজনের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিলেন।

## মা-পু ও মা-বির কারাগার।

বিচারক পুনর্ব্বার আসামীদ্বয়কে জেলে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লেখক জেলখানার ভিতর কখনও যান নাই, সুতরাং লোকের মুখে শুনিয়া ভিতরকার যে সামান্য অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিতেছেন

জেলখানার প্রাচীরের উল্লিখিত দরজা পার হইয়া ক্ষুদ্র একটী গলি, তাহার দুই পার্শ্বেই প্রাচীর। সেই গলি দিয়া কতক দূর গেলে সম্মুখে আর একটী দরজা বা গেট। তাহা পার হইয়া গেলেই এক গৃহ, তাহার মধ্যে কয়েদীগণ থাকে। টেঙ্গিয়ের জেলখানায় স্ত্রী কয়েদী থাকিবার স্বতন্ত্র জেল নাই। এই একই গৃহ তক্তা দ্বারা বিভক্ত করিয়া, স্ত্রী ও পুরুষের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী কয়েদীগণের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটী স্ত্রীলোক পেয়াদা জেলের ভিতর নাকি থাকে। কি পুরুষ কি স্ত্রী পেয়াদা, কেহই রাত্রিকালে জেলের ভিতর থাকে না।

রাত্রিকালে সকল কয়েদীগণকে শিকলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, খুনী আসামী ও অন্য কোন গুরুতর অপরাধিদিগকে দিনের বেলায়ও হাতে হাত কড়া, পায়ে বেড়ী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখে। এবং রাত্রিকালে ইহাদিগকে আর এক অদ্ভুত যন্ত্রণাদায়ক প্রণালীতে রাখা হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকের গলায় এক লোহার হাঁসুলি থাকে। সেই হাঁসুলির সঙ্গে প্রায় সওয়া হাত লম্বা একখানি লৌহ দণ্ডের এক প্রান্ত তাহাতে আবদ্ধ রাখিয়া অপর প্রান্ত হাতের হাত কড়ার সঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এবং কয়েদীকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দুই পায়ের মধ্যে এক খণ্ড কাষ্ঠফলক এমন ভাবে স্থাপন করে যে, পা দুইখানি সংকোচন বা প্রসারণ করিবার যো নাই, তাদৃশ হস্তদ্বয়ও সংকোচন প্রসারণ করিবার [illegible]

নাই। হতভাগ্যগণ সমস্ত রাত্রি এই দুঃসহ যন্ত্রণায় কাটায়।

মা-পু ও মা-বির দুই জনেই খুনী আসামী, সুতরাং তাহাদের যন্ত্রণা ও নিগ্রহের কথা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করাই ভাল। আহারের জন্য মোটা, লাল কুড়া ও ধানমিশ্রিত চাউলের মাড়, তাহার সঙ্গে অন্য উপকরণ নাই। জেলখানাটী একটী নরক কুণ্ড বিশেষ। মলমূত্রের গন্ধে মানুষ দূরে থাকুক, পিশাচ পর্য্যন্ত দূরে পালায়। শুধু তক্তার উপর এই প্রকার হস্তপদ বন্ধন দশায় রাত্রি কাটাইতে হয়। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য নাই। এই যে সুখ, তাহার উপর আবার ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসিয়া রক্তটুকু শোষণ করিতে থাকে। সাধ্য নাই যে, মশা তাড়াইয়া দংশন-যন্ত্রণা নিবারণ করে। রাত্রে ঘুম ত দূরের কথা, চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারে কে? ভারতবর্ষীয় জেলখানায় কয়েদী সকল দিনের বেলায় হাড়-ভাঙ্গা খাটনী খাটে, কিন্তু রাত্রিকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে সুখে নিদ্রা যাইয়া দিনের বেলার কষ্টটা দূর করিতে পারে। কিন্তু চীনদেশে তাহার বিপরীত। এখানে দিনের বেলায় কোন কয়েদীর কাম জারি নাই। কিন্তু রাত্রিকালে শয়নকালে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

কয়েদীদিগকে দিনে দুইবার মলমূত্রত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু রাত্রে কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিতে চাহিলে তাহাকে ঐ বন্ধন দশায় শয্যার উপরেই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়, এই মলমূত্র পরিষ্কার করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। তবে যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা ঘুষ দিয়া অল্পকটা আরামে থাকিতে পারে বটে। মা-পুর শ্বশুর ভয়েতে কাছারী বাড়ী মুখে যায় না, পাছে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। লাউ-মাও সেই মত, তাহার আবার অর্থ নাই। এ অবস্থায় ইহাদের আরাম দিবার কেহই নাই বলিলেই যথেষ্ট হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাদের মোকর্দ্দমার কাগজ পত্র টালিফুর টাওটাই (Taotai) বা কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিলেন। এখান হইতে টালিফু যাইতে ১২ দিন, আসিতে ১২ দিন লাগে, সুতরাং দুই মাস পরে তথা হইতে হুকুম আসিল যে, আসামীদ্বয়কে টালিফু পাঠান হউক। টাওটাইর পদ কমিশনারের পদের সমকক্ষ। টালিফু যাওয়ার পথ অতি দুর্গম। সমস্ত পথই পাহাড়, নালা ও খানায় পরিপূর্ণ। টালিফু যাইতে রাস্তায় ইউনছানফু নামক সহর হইয়া যাইতে হয়। টেঙ্গিয়ে হইতে ঐ সহর ৫ দিনের পথ। টালিফু ৯০০০ ফুট উচ্চ, কিন্তু টেঙ্গিয়ে মাত্র ৫০০০ ফুট সমুদ্রতীর হইতে উচ্চ।

একজন পুলিশ কনষ্টবলের সঙ্গে এই দুইটী স্ত্রী আসামী প্রেরিত হইল। একে স্ত্রীলোক, তাহাতে পায়ে বেড়ী, অনাহারে ও যন্ত্রণায় কাতর, তাহাতে পাহাড়ময় এই ১২ দিনের পথ, যাইতে কত যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ইহারা বহু কষ্টে এক মাসে টালিফু পৌঁছে। পথিমধ্যে কোন আড্ডায় রাত্রিকালে শয়নকালে আসামীগণের হাতের সঙ্গে পুলিশের হাতে শিকল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইত, কারণ একজন মাত্র লোক একাকী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রত্যহ পাহারা দেওয়া সম্ভব নহে। সেই জন্যই এই সহজ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

টালিফু টেঙ্গিয়ে সহর হইতে প্রায় চতুর্গুণ

বড়। তথাকার জেলখানাও অত্যন্ত বড় এবং বন্দোবস্তও নাকি ভাল। এখানে টেঙ্গিয়ে অপেক্ষা আসামীগণের কিছু আরাম মিলিয়াছিল। কারণ মা-পুর শ্বশুরের কোন আত্মীয় দ্বারা টালিফুর জেলাধ্যক্ষকে উৎকোচ দেওয়ায় কিছুদিন এই হতভাগিনীগণ আরামে ছিল। তথায় পৌছিবার দুইমাস পরে টাও-টাই আসামীগণকে তলব করিলেন, বহু-লোকে ইহাদিগকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইল। কারণ নূতন ধরণের মোকর্দ্দমার আসামী এবং জাতিতে বর্ম্মিণী, তাই লোকের কৌতুহল হইয়াছিল। দর্শকগণ কেহ কেহ ইহাদের পৈশাচিক কাণ্ডের জন্য ধিক্কার দিতে লাগিল, কেহ বা এমন দুইটী সুন্দরী যুবতীর প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। দর্শকগণ আপনা আপনিই মোক-র্দ্দমার বিচার ও ডিক্রী ডিস্‌মিস্‌ করিতে লাগিল। কেহ কেহ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া বলিল যে, ইহাদের যেমন কার্য্য, তাহাদের নাক কাণ কাটিয়া ফেলিয়া পরে হত্যা করা উচিত, কেহ বলিল তা নয়, ইহাদের দুইটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া পরে হত্যা করা উচিত। আর একজন বলিল যে, না, ইহাদের পেটের নাড়ি ও গায়ের মাংস কাটিয়া হত্যা করা উচিত। মূল কথা দেশের রীতি ও আইন কানুন অনুসারে যেমন যেমন ব্যবস্থা হইয়া থাকে,তাহারই আভাস সকলে দিতে লাগিল।

টাওটাই সরকারী মাণ্ডারিণের mandarin পরিচ্ছদ পরিয়া বিচারাসনে উপবিষ্ট হই-লেন, আসামীদ্বয়কে তাঁহার সম্মুখে হাজির করা হইল। টাওটাই ইহাদের শপথ করাই-লেন, অক্ষর লিখিত কাগজ অগ্নিতে দগ্ধ করাইয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, লি-শিড় তাহার নাম। তাহাদের পরিচয় লইয়া লি-শিড় বা মা-পুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে অপরাধিনী কি না, সে অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল, টেঙ্গিয়ে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাহা যাহা বলিয়াছে,তাহা সমস্তই ঠিক।

মা-শিড় বা মা-বিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, সে নিরপরাধিনী, সে এ ঘটনার কিছুই জানেনা। তখন টাওটাই বলিলেন যে, তুই টেঙ্গিয়ের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়াছিস, এখন অস্বীকার করিস কেন? তাহাতে সে বলিল যে, "টেঙ্গিয়ের জেলে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, বাধ্য হইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলাম, বস্তুত আমি অপরাধ করি নাই, এমন গুরুতর কার্য্য করিয়া আমার স্বার্থ কি?" ইহাতে টাওটাই ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন, "ইহাকে লইয়া যাও, অপরাধ স্বীকার করাইবার যে যে উপায় আছে, তাহা করিয়া অপরাধ স্বীকার করাও।" মা-পু সত্য কথা বলিয়াছে, তাহার কথার সঙ্গে টেঙ্গিয়ের ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট ঐক্য হইল, তাহাকে আর যন্ত্রণা দেওয়া হইবে না। তাহাকে জেলের মধ্যে পুনরায় লইয়া যাওয়া হইল। মা-বির নূতন ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা হইল।

মা-বিকে চৌদ্দ পোয়া করিয়া দাঁড় করান হইল। কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে তাহার দুই হাত দুই দিকে এবং দুই পা কষিয়া বাঁধা হইল। তাহাকে জিহ্বা বাহির করিতে বলা হইল, তপ্ত লাল লোহার শলাকা দ্বারা তাহার জিহ্বা দাগান হইল, পিশাচিনী যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তবুও স্বীকার করিল না। চক্ষের পাতা দুইটী তপ্ত লোহার শলাকা দ্বারা পোড়াইয়া চামড়া উঠাইয়া ফেলা হইল। সূক্ষ্ম লোহার শলাকা

তাহার চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করান যখন হইল, তখন রক্ষা কর, রক্ষা কর অর্দ্ধভঙ্গ স্বরে বলিল, "আমি অপরাধ করিয়াছি, স্বীকার করিতেছি, ছাড়, ছাড়! "জিহ্বার যন্ত্রণায় কথা বলার সাধ্য রহিল না। তখন তাহাকে পুনরায় টাও-টাইয়ের নিকট লইয়া যাওয়া হইল, তথায় গিয়া অপরাধ স্বীকার করিল। তাহাকে পুনরায় জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু হতভাগিনীর বুদ্ধির দোষে বৃথা আপন কষ্ট বৃদ্ধি করিল। তাহার জিহ্বা ও চক্ষু দুইটী ফুলিয়া উঠিয়াছে, সে এখন দেখিতেও পারে না। কথাও ভালমত বলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা মা-পু অনেক আরামে রহিল।

টাওটাই আপন মন্তব্য লিখিয়া কাগজ পত্র ইউনানফুর গবর্ণরের নিকট পাঠাইলেন। গবর্ণর তাহা পাঠ করিয়া নিজের মন্তব্য লিখিয়া পেকিনের চোংলি-ইয়ামিনে বা প্রিভি-কাউনসিলে পাঠাইলেন।

টালিফু হইতে ইউনানফু ১২ দিনের পথ, তথা হইতে পেকিন প্রায় তিন মাসের পথ। মোকর্দ্দমার হুকুম আসিতে প্রায় দুই বৎসর কাল অতীত হইবে। এদিকে হতভাগিনীগণ নরককুণ্ডে পচিতে লাগিল।

ঈশ্বরের বিড়ম্বনা, যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। যে মা-পু একটী সন্তান কামনায় এমন একটী ভীষণ কাণ্ড করিয়া এত নিগৃহীত হইতেছিল, সে আজ জেলখানার ভিতর গর্ভিনী হইল। ইহার দ্বারা তাহার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ শতগুণে বৃদ্ধি হইল। গর্ভ ক্রমে পূর্ণ মাসে উপস্থিত হইল। একদিন রাত্রিকালে তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। কারণ স্বভাবের নিয়ম তোমার সুখ দুঃখ বুঝে না, তাহার নিয়ম ভঙ্গ হইতে পারে না; তাহা পারিলে, বোধ করি, মা-পুর ক্লেশ দেখিয়া সে অপেক্ষা করিত। এস্থলে স্বভাবকে নিগুণ বলা যাইতে পারে, তাই অনেকে দুঃখে পড়িয়া পরমেশ্বরকে নির্ব্বংশ করিয়া অভিসম্পাত করে। মা-পুর রাত্রিকালে নিজের গায়ের মশাটী মাছিটী তাড়াইবার সাধ্য নাই, তাহার উপর প্রসববেদনা যন্ত্রণায় চীৎকার ভিন্ন অন্য উপায় নাই। রাত্রি প্রায় তিন প্রহরের সময় হতভাগিনী মা-পু একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। কিন্তু কোথায় সে ধাই, কোথায় সে আত্মীয় যে মা-পুর সমবেদনা বুঝিয়া তাহাকে সুশ্রূষা করিবে। কেই বা ছেলেটীকে যত্ন করিবে। রক্তাক্ত কলেবরে ফুলটীসহ হতভাগ্য নির্দ্দোষী শিশু অনাবৃত দেশে তক্তার উপর পড়িয়া হোঙ্গা হোঙ্গা করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একেত ঠাণ্ডায়, তাহাতে মশার কামড়ে অস্থির হইয়া শিশুটী জোরে চীৎকার করিয়া জেলখানার শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল! বালকের রোদনই বল, সে যেন আরো জোরে ক্রোধভরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া সকলকে জব্দ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কান্না কে শুনে! এ দৃশ্য কে দেখে! কার সাধ্য এ নরককুণ্ডে গিয়া তাহার দুঃখের প্রতিকার করে! এস্থলে আবার স্বভাবকে নিষ্ঠুর বলি, কেন না যে মহিলা অনাহারে, রোগ শোকে এত কষ্ট পাইতেছে, তাহার জীবিত সন্তান না হইয়া কেন মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হইল না? তবে ত আর এমন হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে ও ভাবিতে হইত না। স্বভাব যে চিরকালই স্বভাব, সে কি কাহারো দুঃখে দুঃখিত হইয়া কার্য্য করিলে স্বভাবের স্বভাবত্ব রক্ষা পায়! তাহা হইলে তাহাকে স্বভাবই বা বলিবে কেন?

হতভাগিনী মা-পু সমস্ত রাত্রি কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কাটাইল, আর এক এক

বার ছেলেটার কাঁদার চোটে থাকিতে না পারিয়া মর! মর! করিতে লাগিল। ভাগ্যবতীর সন্তান একটু কাঁদিলে সকলে আহা করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লয়, এ হতভাগিনীর সন্তান ক্রোড় কাহাকে বলে, তাহা পাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরভাঙ্গা হইল। এইভাবে নিষ্ঠুর দীর্ঘ রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা প্রায় ৮টার সময় জেল-রক্ষয়িত্রী জেলে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিল, সে ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, মা-পুর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিল এবং ইহার উপর চাপড়টা, ঠোকনাটাও তাহার অদৃষ্টে হইল।

জেল রক্ষয়িত্রী নাক সিঁটকাইয়া থু থু ফেলিতে ফেলিতে একখানি বাঁশের ধারাল, পাতলা বাখারি দ্বারা ছেলেটার নাড়ি কাটিয়া জল দ্বারা শিশুটীকে ধোয়াইয়া খড়ের বিছানার উপর শোয়াইল এবং মা-পুর হাতকড়া খুলিয়া দিল। সে নিজে আপন শরীর ধুইয়া পরিষ্কার করিল। মা-পুর দ্বারা স্থানটীও পরিষ্কার করাইল।

টাওটাইয়ের নিকট সংবাদ গেল, তিনি এই সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কেন না, মা-পুর গর্ভের সংবাদ তিনি জানিতেন না। টাওটাই ক্রুদ্ধ হইয়া জেলের পুরুষ পেয়াদাগণকে বরখাস্ত করিয়া তাহাদের স্থানে নূতন লোক ভর্ত্তি করিলেন এবং এ সম্বন্ধে কড়া হুকুম জারি করিল। জেলের পুরাতন পেয়াদাগণকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারিলেন না কেন না, এ কার্য্য জেলের ভিতর হইয়াছে, কি আসিবার কালীন রাস্তায় হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইল।

শিশুটীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবার জন্য টাওটাই আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহার আহারের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। মা-পুর স্তনে দুধ নাই। তাহারা যে ভাতের মাড় খায়, তাহাই জল দ্বারা পাতলা করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল। এখানকার জেল-রক্ষয়িত্রী দুই জন, এক জনের বয়স ৬০ বৎসর, আর এক জনের বয়স ৩৫ বৎসর। শেষোক্তের স্তনে দুগ্ধ ছিল, সে দয়া করিয়া মাঝে মাঝে ছেলেটীকে আপন স্তনপান করাইল। কিন্তু ছেলেটী অধিক দিন জীবিত রহিল না, উপযুক্ত আহারাভাবে, দুর্গন্ধময় স্থানে থাকায় এবং নানা অবহেলায় জ্বর ও উদরাময় রোগে তাহার মৃত্যু হইল, সেও রক্ষা পাইল, মা-পুও রক্ষা পাইল।

দীর্ঘকাল পরে পেকিন হইতে হুকুম আসিল যে, এই দুই জনের মধ্যে মা-বির অপরাধ অধিক গুরুতর। সে নিজেই এই কার্য্যের পরামর্শদাতা, উদ্যোগী এবং নিজ হস্তে নির্দ্দোষী যুবতীকে হত্যা করিয়াছে, তাহার পরামর্শ ও প্ররোচনা ভিন্ন লি-শিড় একা কখনই এই কার্য্য করিতে পারিত না, সুতরাং তাহার প্রাণ দণ্ড টালিফুতেই হইবে।

মা-বির প্রাণদণ্ডের দিন ধার্য্য হইল। তাহাকে বধ্য স্থানে আনা হইল। তাহার হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয় বন্ধন করিয়া ভূমিশায়িনী করা হইল। ঘাতক তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা প্রথমত আসামীর কপালের বাম পার্শ্ব হইতে চামড়া ও মাংস কাটিয়া ভ্রূসহ বাম চক্ষের উপর আনিয়া উল্টাইয়া রাখিল। এবং কপালের দক্ষিণ পার্শ্বেরও সেই দশা করিল। চীৎকার করিতে না পারে, তজ্জন্য মুখ বাঁধিয়া রাখিল। এই কার্য্য শেষ হইলে মা-বির স্তন দ্বয় একে একে কাটিয়া নিম্নে রাখা হইল। পরে তাহার উদর চিরিয়া অন্ত্র সকল বাহির করা হইল। এই কার্য্য শেষ হইলে ছুরি দ্বারা সজোরে বক্ষস্থলে হৃদপিণ্ডের উপর তিন বার

আঘাত করিয়া হতভাগিনীর জীবন শেষ করা হইল। সুবিচার হইয়াছে বলিয়া দর্শকমণ্ডলী আনন্দ প্রকাশ করিল।

অপর পক্ষে মা-পুর কেবল মুণ্ডচ্ছেদ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার প্রাণদণ্ড টেঙ্গিয়ে সহরে হইবে, কারণ যে স্থানে সন্তান চুরি করিয়াছে, তথায় তাহার প্রাণ দণ্ড করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিচারের ফল ও অপরাধের শাস্তি জ্ঞাপন করান প্রধান উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য, মাঝির প্রাণ দণ্ড হইয়া গেলে মা-পুকে পুনরায় টেঙ্গিয়ে পাঠান হইল। মা-পু টেঙ্গিয়ে জেলখানায় গিয়া তথায় তাহার শ্বশুরকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। চক্ষে চক্ষে পড়িলে উভয়েই অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। বৃদ্ধ কেবল বলিল, তোমাকে এত ভালবাসিয়া ও বিশ্বাস করিয়া আমার শেষকালে এই শাস্তি হইল।

টালিফুর টাওটাইয়ের আদেশে মা-পুর শ্বশুরকে ধৃত করিয়া জেল দেওয়া হইয়াছে, লাউ-মা পলাইয়া ব্রহ্মদেশে গিয়াছে। বৃদ্ধ সতর্ক হইলে এবং মা-পুকে শাসনে রাখিলে সে এমন কার্য্য করিতে পারিত না, তাই বৃদ্ধের এই অপরাধ। চীনদেশের আইন এই রূপ যে স্কুলের ছাত্র অপরাধ করিলে শিক্ষকের পর্য্যন্ত শাস্তি হয়।

ঘটনার দিন হইতে প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, পরে মা-পুর প্রাণ দণ্ডের দিন ধার্য্য হইল। আমরা শুনিতে পাইলাম, ৬ই জানুয়ারি, বেলা ২টার সময় মা-পুর প্রাণ দণ্ড হইবে।

উক্ত দিবস টেঙ্গিয়ের হাট বা বড় বাজারে প্রায় ১২টার সময় কাছারী বাড়ীতে তিনবার তোপধ্বনি হইল। সকলে বুঝিল যে, এইবার আসামীকে বধ্যস্থানে আনা হইবে। সকলে তাড়াতাড়ি দেখিতে গেল। প্রথমতঃ বিগল বাজাইয়া কতকগুলি লোক বাহির হইল, তাহার পশ্চাতে বল্লম, খড়্গ ও নিশানধারী কতকগুলি লোক শ্রেণীবদ্ধ, তাহার পশ্চাতে শৃঙ্খলে আবদ্ধ আসামী আসিতেছে, তাহাদের পশ্চাতে বন্দুকধারী কতকগুলি সেপাই, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী কয়েক জন কর্ম্মচারী, তাহার পশ্চাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের পালকী, সকলে ধীরে ধীরে বিবাহের বরযাত্রীগণের মত আসিলেন। এই মিছিল নগরপ্রাচীরের দক্ষিণ দরজা পার হইয়া হাটের মধ্যের সদর রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে পোষ্টাফিসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। লোক সকল দ্রুত বেগে ছুটিল। সকলেই দেখিবার জন্য উৎসুক।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ ডাকঘরের নিকট এই সদর ভরা হাটের মধ্যে এই অপরাধিনীর প্রাণদণ্ড করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করান এবং তদ্বারা লোকের মনে ভক্তি সঞ্চার করানের জন্য এবম্বিধ আয়োজন করিয়াছেন। আসামী যথাস্থানে উপস্থিত হইলে তাহার হস্ত দুই খানি উল্টাইয়া পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল, আসামীকে জানু পাতিয়া বসিতে আদেশ করা হইল। আসামী জানু পাতিয়া মস্তক সম্মুখ দিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নত ভাবে অবস্থিতি করিল, অমনি ঘাতক সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা এক কোপে দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিল। হতভাগিনী মা-পুর কাটামুণ্ড ও দেহ ধরাশায়ী হইয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল। দর্শকগণ আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার শরীরে রক্তের লেশ মাত্র ছিল না, মাথায় জট, ছিন্ন বস্ত্র, পায়ে বেড়িযুক্ত দেহ লেখক দেখিয়াছেন। এখানকার মাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ বধ্যস্থান

হইতে দূরে ছিলেন, যাই সংবাদ গেল যে অপরাধীর মুণ্ডপাত হইয়াছে, অমনি পাল্কী বাহকগণ বেগে ইয়ামিন অভিমুখে ছুটিল, অশ্বারোহী কর্ম্মচারিগণ বেগে অশ্ব চালাইয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। তাড়াতাড়ি ইয়ামিনে পৌঁছিয়া ঘন ঘন তোপ ধ্বনি করিতে লাগিল। ইঁহাদের দৌড়ের কারণ এবং তোপ ধ্বনির হেতু জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল যে, পাছে হতব্যক্তির প্রেতাত্মা আসিয়া কর্ম্মচারিগণকে আক্রমণ করে, এই ভয়ে শীঘ্র পলাইয়া তোপধ্বনি দ্বারা ভূত তাড়াইতে লাগিল।

কু-লোক মা-বির সঙ্গে না মিশিলে মা-পুর এমন দশা হইত না। আজ তাহার সমস্ত যাতনা শেষ। তাহাদের পৈশাচিক কাণ্ডের পুরাতন কথা লোকে ঘরে আলোচনা করিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ।

# বিশ্বাস ও অবিশ্বাস

'মা' নাম মধুরাক্ষরা; মাতৃ-ক্রোড়ে শিশু এক অপরূপ দৃশ্য নিরঞ্জন, নয়নাভিরাম, স্নিগ্ধ-মধুর। প্রেম, বিশ্বাস এবং স্বার্থত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্ত আর জগতে নাই। মাতৃক্রোড় শিশুর নিরাপদ দুর্গ; মাতৃ-অঞ্চল তাহার এক-মাত্র আশ্রয় স্থল। ভীষণ শার্দ্দূল আক্রমণ করিতে আসিলেও শিশু মায়ের ক্রোড়েই আশ্রয় লইয়া থাকে; মা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত এবং প্রহৃত হইলেও পুনরায় মা বলিয়া কাঁদে। আবার জননী স্বয়ং আর্দ্র স্থানে থাকিয়াও, সন্তানকে অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখে। যদি নিজ প্রাণ বিনিময়ে সন্তানের প্রাণ রক্ষা হয়, জননী স্মিত মুখে তাহা দিতে প্রস্তুত। মা আদর করিয়া শিশু সন্তানকে চাঁদ ধরিয়া দিবেন বলেন; শিশুর তাহাতেই অটল বিশ্বাস; সে অমনি তাহার ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় চাঁদ ধরিতে প্রসারিত করে; কেন না 'মা'ই তাহার বেদ, গায়ত্রী, ভাগবৎ,গীতা, কোরাণ, বাইবল, জেন্দাবেস্তা; 'মা'ই তাহার সাক্ষাৎ ভগবতী। সরল বিশ্বাসের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দুর্লভ, তাই বোধ হয় যীশু বলিয়াছিলেন যাহার হৃদয় শিশুর ন্যায় সরল নহে, স্বর্গ রাজ্যে তাহার অধিকার নাই।

বর্ত্তমান সময়কে যুক্তি-তর্কের যুগ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সরল বিশ্বাসের দিন অবসান হইয়াছে; যুক্তি ও তর্কের দিন সমুপস্থিত। যাহারা সকল বিষয়ে যুক্তির পক্ষপাতী তাহাদের মতে যুক্তি ভিন্ন বিশ্বাস, অন্ধ-বিশ্বাস নামে অভি-হিত হওয়া উচিত; সুতরাং শিশুর পক্ষে তাহা ক্ষমার উপযোগী হইলেও, প্রবী-ণের পক্ষে তদ্রূপ নহে। বুদ্ধি বিকশিত হইলে, কেবল মাত্র অন্যের মতের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে; নিজ যুক্তির সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় কিনা তাহা যুক্তি বলে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন বা তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত। ভগবান যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিচার শক্তি দিয়াছেন, তখন তাহার যথাযথ অনুশীলন না করা গুরুতর পাপ, এবং তাঁহার অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আমরা অন্ধ-বিশ্বাসের

পক্ষপাতী নহি; কিন্তু যুক্তি বিচার ভিন্ন কিছুই বিশ্বাস করিব না ইহারও সার্থকতা স্বীকার করি না। যদি প্রত্যেক বিষয়ে যুক্তি বিচার করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে নাস্তিকতা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। ভগবানের বিপুল সৃষ্টির প্রত্যেক স্তর তন্ন তন্ন বিচার করিয়া দেখিব এবং বিশ্লেষণ করিব, নতুবা কিছুই বিশ্বাস করিব না—আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কিছুই প্রগল্‌ভতা হইতে পারে না। রে মূর্খ! এই অনন্ত সৃষ্টির প্রত্যেক স্তর তোমার যুক্তি এবং বিচার গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হইবে—এ দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করা যুক্তির আমরা বিরোধী নহি, কিন্তু যুক্তি কচ্‌কচির বিরোধী। অধিকাংশ সময় যাহা বিচার নামে অভিহিত হইয়া থাকে, মূলতত্ত্ব এবং বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে তদ্দ্বারা কিছুই জ্ঞান লাভ হয় না; পরন্তু, উহা কেবল বাগযুদ্ধ বা কথার মারপ্যাঁচে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িলে, দাঁড়াইবার আর স্থান কোথায়? তুমি ঈশ্বর বিশ্বাস কর; তুমি কি জনষ্টুয়ার্টমিল (John Stuart Mill) তাঁহার Three Essays on Religion নামক গ্রন্থে যে সকল নাস্তিকতার অনুকূল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াই তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়িয়া দিবে? তাহা হইলে, তোমার জীবনে যে কত প্রকার মত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাও, তবে বিশ্বাস যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াও। শিশু যখন জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবে যে চাঁদ ধরা যায় না, তখন তাহার জননী ও তাহাকে আর সেরূপ বলিবেনা; সেও তাহা বিশ্বাস করিবে না। তুমি যাহা নিজ বহুদর্শিতা এবং যুক্তি বলে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছ, তাহা বিশ্বাস কর। কিন্তু যে বিষয় তুমি কখন চিন্তা কর নাই, এবং যাহা বিশ্বাসের অনুকূল ঘটনাবলী তোমার জীবনে কখন সংঘটিত হয় নাই, তাহাই অবিশ্বাস্য এবং কুসংস্কার সম্ভূত, ইহা বলিবার তোমার কি অধিকার আছে? বরং চিন্তা করিয়া দেখ যে তদ্বিষয়ে কোন সত্য নিহিত আছে কি না। সকল বিষয়েই নিজের যুক্তি ও বিচার শক্তির উপর নির্ভর করিব, অপরের অপরের মত মানিব না এরূপ ভাব পরিত্যাগ করা উচিত। সৃষ্টি প্রবাহে অনন্ত বিষয় রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে আমরা জীবনে কোন রূপ তত্ত্ব অনুভব বা প্রত্যক্ষ করি নাই, যে তাহা অনুভব করিয়াছে তাহার নিকটে আমাদের তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য। শ্রেষ্ঠতর শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নেতৃত্ব স্বীকার করার প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহা যুক্তি বিরুদ্ধও নহে। যে দৃষ্টিশক্তিহীন সে অপরের সাহায্য ভিন্ন গমনাগমন করিতে অক্ষম। সে পরিচিত পথে যষ্টি সাহায্যে চলিলেও চলিতে পারে; কিন্তু অপরিচিত কণ্টকাকীর্ণ পথে তাহার অন্যের সাহায্য প্রার্থনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যে বিষয়টী জটিল বলিয়া তোমার বোধ হয়, এবং বহু চেষ্টা করিয়াও যাহার সমাধান করিতে তুমি অক্ষম, সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধি-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন তোমাকে হইতেই হইবে। এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রে গুরুবাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার বিধান রহিয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া থাকেন; কেন না শাস্ত্রবাক্য আপ্তবাক্য, তাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে না।

যোগ প্রভাবে শাস্ত্রকারেরা যে সকল তত্ত্ব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেবল তাহাই তাঁহারা জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। কোন বিষয় চিন্তা করিব না, শাস্ত্র বাক্যও বিশ্বাস করিব না, এরূপ যাহার মনের অবস্থা সে পাষণ্ড; তাহার পরিণাম নরক। কোন বিষয়ই বিশ্বাস না করাই ঘোর নাস্তিকতা। ইহাপেক্ষা অন্ধ-বিশ্বাস ও প্রশংসার্হ। বিজ্ঞ চিকিৎসক তোমার রোগ প্রশমনার্থে যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তুমি তাহার তত্ত্ব কিছু অবগত না হইলেও, তাহাতেই রোগ মুক্ত হইবে। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী; তিনি মন দেখেন; শিশুর সরল বিশ্বাস তাঁহার নিকট অধিকতর গ্রহনীয়; অবিশ্বাসীর নীরস শুষ্ক হৃদয়ে তাহা কখন স্থান পায় না; সুতরাং সেও তাঁহার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। সরল বিশ্বাসে তুমি ঈশ্বরকে ডাক, তিনি অমনি সাড়া দিবেন। বাগাড়ম্বরের আবশ্যক নাই। প্রাণের আবেগ চাই, অটল বিশ্বাস চাই। যাঁহার তাহা আছে ভগবান তাঁহার নিকট অতি সুলভ পদার্থ। তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

পৃথিবীতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তি ভিন্ন কোন বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। অপর শ্রেণীর লোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলেও, অনেক বিষয় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলি তাহা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় জ্ঞানে পর্য্যবসিত; কিন্তু ইন্দ্রিয় জ্ঞান ভিন্ন ও অনেক বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। সে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাধকের প্রত্যক্ষীভূত, সাধারণের জীবনে তাহা উপলব্ধি হয় না। তাই বলিয়া তৎপ্রত্যক্ষীভূত তত্ত্ব সমূহ অবিশ্বাস করিবার কারণ হইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তবে প্রশ্ন এই যে কয়টী বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়? অপর প্রশ্ন এই—যে আমরা কি বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে সকল বিষয়ে বিচার করিয়া থাকি? অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় বংশপরম্পরা যে ধর্ম্ম বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে, তাহার ঔচিত্যানুচিত্য বিচার না করিয়াই লোকে তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেহ কেহ উত্তরকালে স্বীয় বুদ্ধিবলে বা বুদ্ধি বিকৃতিবশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিয়া, বিচার এবং যুক্তির সাহায্যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের সংখ্যা অতীব অল্প। পিতা মাতার শরীর এবং মনের ধর্ম্ম সন্তানগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাতৃমুখ-বিনিসৃত বাক্যামৃত সন্তানগণের সঞ্জীবনী সুধা। যে বিশ্বাসের বীজ তিনি শিশুর কোমল হৃদয়ে বপন করেন, কালে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ধর্ম্মবিশ্বাস রূপে পরিণত হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যত্যয় দেখা যায়; কিন্তু তাহা প্রায়শঃই গৌণ বিষয় সম্বন্ধে। হিন্দুর সন্তান হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টানের সন্তান ধর্ম্ম, বৌদ্ধের সন্তান বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবের সন্তান বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশ্বাস করে। ইহারা বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে উহা সম্বন্ধে বিচার করে না বা তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এবং অকাট্য প্রমাণ চায় না। সময়ে কেহ কেহ পূর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে সে বিচার করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধেই উত্তরকালে মত পরিবর্ত্তিত হয়। উহার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। জগতের প্রায় লোকেই ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া থাকেন—এই বিশ্বাসকে সর্ব্ব-

জনীন বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না এরূপ লোক জগতে বিরল। যাহারা ব্যবহারে নাস্তিক, তাহারাও বিপদের সময় 'মধুসূদন' বলিয়া থাকে, নাস্তিকপ্রবর হিউমও (Hume) মৃত্যুর সময়ে আস্তিক-ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আজ শুষ্ক-যুক্তির সাহায্যে সংগ্রাম করার উহাই অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাম। ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রকৃতি নিরূপণ এবং অন্যান্য গৌণ তত্ত্ব বিচার—প্রভৃতি কার্য্য চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। উহা স্বাভাবিক; মাত্রা অতিক্রম না করিলে প্রশংসার্হও বটে।

প্রত্যেক বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ বা যুক্তি পাওয়া সম্ভব কি না? প্রায় লোকেই ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; কিন্তু ইহার প্রকার ভেদ আছে। ধর্ম্মভেদ ইহারই নামান্তর মাত্র। যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন তাঁহারা জন্মাবধিই তদ্রূপ বিশ্বাসে অভ্যস্ত। ঐ বিশ্বাসের অকাট্য প্রামাণ্যের জন্য তাঁহারা কখন বিচলিত হন নাই। যদি বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরাস্তিত্বের কি কিছু অকাট্য প্রমাণ আছে? বিশেষ সন্দেহের কথা। হিন্দুর পৌত্তলিকতায় খ্রীষ্টান নাসিকা কুঞ্চন করেন; খ্রীষ্টানের মধ্যস্থতাবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হিন্দু উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতভেদ নাই। মহামতি থিওডোর পার্কার তাঁহার Discourse of Religion নামক গ্রন্থে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ-প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণ বা যুক্তি প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি বলেন সম্মুখে যে প্রস্ফুটিত পুষ্প রহিয়াছে তাহাতে তিনি ঈশ্বরের জাজ্বল্যমান সত্ত্বা দেখিতেছেন। ইহা কি যুক্তি-প্রমাণ সাপেক্ষ, না বিশ্বাস? যাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি জগতের তাঁহার সত্ত্বা দর্শন করেন। তাঁহার নিকট উহা পরম সত্য। সাংখ্য-প্রণেতা কপিল নাস্তিক ছিলেন কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে; কারণ ঈশ্বর নাই তিনি এ কথা বলেন নাই। যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা তাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভব—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—ইহাই তিনি বলিয়াছেন। মহামতি জনষ্টুয়ার্ট-মিল তাঁহার Three Essays on Religion নামক গ্রন্থে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন—তাহার অধিকাংশই অবিশ্বাস-প্রসূত এবং তদ্ধেতু কোনটী ২ বালকের নিকটও উপহাস্য। বিশ্বাস না করিয়া সুধু যুক্তি এবং বিচারের সাহায্য গ্রহণ করিলে নাস্তিকতাই একমাত্র পরিণতি। জগতের প্রত্যেক স্তরে যে মঙ্গলময় বিধান বর্ত্তমান রহিয়াছে, মিল তাহা দেখিতে পান নাই; এবং সৎ সাধু লোকের জীবন ও বিপদাকীর্ণ দেখিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হইয়াছেন। যে বিশ্বাস দৃষ্টিতে জগতের প্রত্যেক বস্তু এক মাঙ্গলিক ইচ্ছাসূত্রে গ্রথিত, তাঁহার পিতার কুশিক্ষায়, তাঁহার সে দৃষ্টি চিরদিনই আবরিত ছিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ভিন্ন অন্যরূপ জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, নাস্তিকতাই তাহাদের অনিবার্য্য পরিণাম। অতীন্দ্রিয় পদার্থ যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদ্য নহে, সাধনার দ্বারা অনুভূত। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ এবং অনুমানবাদী নৈয়ায়িকের বিচারের কথা স্বতঃই মনে হয়। প্রত্যক্ষবাদী প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন কিছুই বিশ্বাস করেন না। তাহাকে অনুমানবাদী নৈয়ায়িক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন কিছুই

বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে তোমার যে চক্ষু আছে তাহার প্রমাণ কি? কারণ, যে তৈজসিক পদার্থের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি জন্মে, তাহাত তুমি দেখিতে পাইতেছ না?” তিনি আরও বলিয়াছিলেন “যখন তুমি বিদেশগামী হও, এবং তোমার পিতাকে দেখিতে পাও না, তখন তিনি জীবিত আছেন কি না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই। সুতরাং পিতৃ-বিয়োগ হইলে যে যে আচরণ করা বিধেয়, তাহা তোমার করা উচিত।” এইরূপ নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অনুমানবাদী নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদীকে নিরস্ত করিলেন। জগতে এরূপ অনেক তত্ত্ব আছে যাহার অনুভূতি সাধনা-সাপেক্ষ। যাহার সে সাধনা নাই, সে বিষয় কখনও চিন্তা করে নাই, সে অন্যের সাধনা-সঞ্চিত-জ্ঞানরাশীকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিলে তাহারই ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়। যদি তাহাতে বিশ্বাস না হয়, তদ্বিষয় অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ নাই। বরং তদ্বিষয়ে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখা তাহার কর্ত্তব্য। কোন বিষয় শোনা মাত্রই তাহাতে অবিশ্বাস করায় দুইটী প্রধান দোষ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দোষ এই, ইহা অত্যন্ত প্রগল্‌ভতা-ব্যঞ্জক অর্থাৎ আমি যাহা জানি না বা অনুভব করি না তাহা সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য নহে। দ্বিতীয় দোষ এই, উহা তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ সম্বন্ধে প্রধান অন্তরায়। কারণ আমার জ্ঞান বুদ্ধি-রূপ গণ্ডির মধ্যে যাহা পড়ে নাই তাহা চিন্তার ও অযোগ্য, এই ভাব জ্ঞান লাভের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক। বাসগৃহের গবাক্ষাদি বদ্ধ থাকিলে পবিত্র রস এবং আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। ঐরূপ গৃহে দীর্ঘকাল বাস করিলে নিজ নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা দূষিত বায়ু সেবন করিতে হয়, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেহ-পক্ষে মৃত্যু এবং আত্ম-পক্ষে অজ্ঞান বা অবিদ্যা।

বিশ্বাস না করিলে এক মুহূর্ত্ত ও সংসার চলেনা। সহস্র সহস্র বিষয়ে অন্যের উপর বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে হয়। পুত্রকন্যা, দাসদাসী, আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিশ্বাস করিতে হয়। স্বীকার করি, সময় সময় তাহাতে আমাদিগকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হইতে হয়; তথাপি বিশ্বাসকে অন্তর্হিত করা বিধেয় নহে। মহামতি সাক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন “পরকে প্রতারিত করা অপেক্ষা নিজে প্রতারিত হওয়া শ্রেয়।” আমি ক্ষতিগ্রস্থ হই তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু আমি যেন কাহারও ক্ষতি না করি। বিশ্বাস অমৃত, অবিশ্বাস হলাহল; বিশ্বাস সুখের উৎস, অবিশ্বাস দুঃখের প্রস্রবণ। পরম সাধ্বী ডেস্‌ডিমনাকে অবিশ্বাস-বিষ-জর্জ্জরিত অথেলো নিজহস্তে বধ করিলেন; অবশেষে নিজভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুতাপে জ্বলিতে লাগিলেন। মহামতি ফ্রেডরিক দি গ্রেট মণীষী ছিলেন, কিন্তু ঘোরতর অবিশ্বাসে তাহার চরিত্র-মাহাত্ম্য হীনপ্রভ হইয়াছিল। অবিশ্বাসহেতু মনের যে নারকীয় অবস্থা ঘটে তাহার দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে। এই অবিশ্বাসই সংসার সুখের মহাকণ্টক। “নিশ্বাসে যাবে গলে, পাবে বিশ্বাসী হলে, আশ্বাসে থাক চিরদিন”॥

মনোবিজ্ঞানের উন্নতিহেতু দিন দিন যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে অবিশ্বাস তিরোহিত হওয়া উচিত। শঙ্করাচার্য্য, ভাস্করানন্দ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি সাধকের পবিত্র জীবনের পবিত্র কাহিনী শ্রবণ করিলে নাস্তিকতা দূরে পলায়ন করে, অবিশ্বাস অন্তর্হিত

হয়, পাষাণে জল ঝরে, শুষ্ক মরুতে মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়। যুক্তি ও বিচারবাদী সে সকল ঘটনাও কল্পনা-প্রসূত বা কুসংস্কার-বিজড়িত বলিতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। যাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন, তাহারা ও সাধু। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন ইহা বলা কেবল নাস্তিক এবং অবিশ্বাসীর মুখেই শোভা পায়। শত যোজন দূরে যে ঘটনা হইতেছে তাহা অক্লেশে অনেকে বলিতে পারেন, এঁরা নিজ যোগ বলে আশ্চর্য্য ঘটনাবলী প্রদর্শন করাইতে পারেন। আধ্যাত্মিক জগতের কত তত্ত্ব আমাদিগের অনাদিগম্য তাহার ইয়ত্তা নাই। পরমহংস অগুরুগম্য প্রায় পাঁচ মিনিট কাল নিজ নাড়ীর চলাচলতি বন্ধ বলিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া লণ্ডনের অনেক ইংরেজ অবাক হইয়াছিলেন। ইহা সাধারনের পক্ষে অসম্ভব হইলেও যোগীর পক্ষে তদ্রূপ নহে। সংপ্রতি ডাক্তার ব্রাউন (Dr. Brown) একটী ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একটী সাধুকে শবাধারে পুরিয়া অষ্ট দিবস মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার পর তাহাকে তথা হইতে উঠাইলে সে ধীরে ধীরে তাহার ভজনালয়ের দিকে চলিয়া গেল। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল সারভিয়ার রাজ পরিবারে যে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, পাঠক তাহা সম্যক অবগত আছেন। উহার এক মাস পূর্ব্বে মহামতি ষ্টেড সাহেবের বাটীতে একটী মহিলা mesmeric অবস্থায় এ ভাবী ঘটনা সকল যথাযথ বিবৃত করিয়াছিলেন (Coming events cast their shadows before.) এ বিষয় মহামতি ষ্টেড স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়াছেন সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আপাততঃ দৃষ্টিতে এ সকল ঘটনা অবিশ্বাস বলিয়াই বোধ হয়; অন্তর্প্রবিষ্ট হইলে অবিশ্বাসের কোন কারণই তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল বিষয় ভারতবর্ষে পূর্ব্বাপর সত্য বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত, ইংরেজী পাঠে তদ্বিষয় চিন্তা না করিয়া তাহাতে অবিশ্বাস করিবার অভ্যাস আমাদিগের স্বাভাবিক এবং মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু গতি ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাহার ও কোন রোগ হইলে ঝাড়িয়া আরোগ্য করার প্রথা এদেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল; এখন সেই প্রথার বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। হস্তের দ্বারা pass করিলে সময় সময় সময় রোগ আরোগ্য হইতে এখন দেখা যায়। প্রেততত্ত্ব বিজ্ঞান আমাদের দেশে পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। সাধারণের মধ্যে উহার আলোচ্য বিষয় ভূত প্রেত নামে অভিহিত হইত। যাহারা প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারা সকলই উহা অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে যখন আমেরিকায় হাইডসবিল গ্রামে দুই ভগিনী এক অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইয়া তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিলেন যে আমরা যাহাদিগকে স্থূলদৃষ্টিতে দর্শন করি তাহা ভিন্ন ও পৃথিবীতে আর অন্যান্য জীব আছে, তখন প্রেততত্ত্ব বিজ্ঞানের আবার নূতন সূত্রপাত হইল। এখন অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কারণ এখন আমাদের শিক্ষাগুরু ইউরোপ ও আমেরিকা। কালে আর কত দেখিব। শিক্ষাদৃপ্ত অনেক যুবক এবং প্রবীণ ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাও লোকসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী

নহেন। পাছে কুসংস্কারী বলিয়া তাহার উপেক্ষিত হন এই ভয়। এইরূপ কপটতা অপেক্ষা কুসংস্কার থাকাও সহস্রাংশে বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্মমতের উৎকর্ষ প্রতিপাদন অপেক্ষা, কার্য্য-কলাপে সততা, সরলতা এবং কর্ত্তব্যপ্রিয়তা প্রদর্শন করা প্রশস্ত। কার্য্য এবং ধর্ম্মমত পরস্পর বিসংবাদী হওয়াই অত্যন্ত হেয় অবস্থা। বাক্যে পণ্ডিত, কিন্তু কার্য্যকালে অতি সাধারণ লোক অপেক্ষাও ঘৃণিত ব্যবহার—ইহাই গুরুতর অবিমর্ষ। কুসংস্কারী অথচ বিশ্বাসী লোকের জীবনে এরূপ প্রহসন পরি-দৃষ্ট হয় না। এ সকলই পাশ্চাত্য সভ্যতার অভেদ অনুকরণের বিষময় ফল। ইহার প্রভাবে আমরা কলের পুতুলের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি। অন্তরের ভাব গোপন করিয়া সমগ্র জীবন কপটতা প্রব-ঞ্চনার সেবা করিয়া যাওয়াই অনেকের জীব-নের ঘৃণিত পরিণাম। আধুনিক সংজ্ঞানু-যায়ী তাহারাই সভ্য, কারণ বেশভূষা এবং বাহ্যিক পারিপাট্যই আধুনিক সভ্যতার প্রধান উপকরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইংলণ্ড এবং ইয়ু-রোপের অন্যান্য প্রদেশে যে নাস্তিকতা এবং অবিশ্বাসের খরতর স্রোত প্রবাহিত হয়, আর কখন বোধ হয় সেইরূপ হয় নাই। বিশেষরূপ বিচার না করিয়া কোন বিষয়ই বিশ্বাস করিব না, অকাট্য প্রমাণ না পাইয়া কোন বিষয়ই আস্থা স্থাপন করিব না—ইহাই তখন জীবনের মহামন্ত্র হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অবিশ্বাস ও নাস্তি-কতা। যে সকল মনীষীগণ বুদ্ধি বলে যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অবিশ্বাস এবং নাস্তি-কতার বশবর্ত্তী হইয়া লোক-সমাজের অহিত-কর সকল মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের মহারথীদিগের মধ্যে হবস, হিউম, লক, গিবন, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও, ডেকা-র্টের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কেহ নীতি বিষয়ে, কেহ প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন তাহা দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তি বিশেষরূপে বিলোড়িত হইয়াছিল, এবং মানব-চরিত্র উচ্ছৃঙ্খলতার চরমসীমায় উপ-স্থিত হইয়াছিল। এই সময় ইংলণ্ডের যে নারকীয় অবস্থা হইয়াছিল, আর কখন সেরূপ হয় নাই। অবিশ্বাসের সহিত চরিত্র-হীনতা ওতপ্রোত ভাবে মিশাইয়া আছে।

নিম্নে কয়েকটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি, ইহা যাঁহারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, একটী ভিন্ন, সকল ঘটনাই তাঁহাদিগের নিকট হইতে অবগত হইয়াছি।

১। আমাদিগের জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু কার্য্যোপলক্ষে দেরাদুনে বাস করিতেন। এক সময় তাঁহার হাঁটুতে একটী বৃহৎ স্ফোটক হয়। ইহাতে তিনি কয়েক দিন অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। এক দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একটী অল্প-বয়স্কা কন্যা আসিয়া "ভ হইয়াছিল, তোমার ফোঁড়া সারিয়া গিয়াছে।" তিনি উহা বালিকার চাঞ্চল্য ভাবিয়া প্রথমে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই; বালিকা পুনরায় ঐরূপ বলিলে তিনি দেখিলেন ফোঁড়াটীর সামান্য চিহ্নমাত্র আছে আর বেদনা প্রভৃতি কোন উপসর্গই নাই। তিনি অবাক হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি ঐ ঘটনা বিবৃত করি-লেন। তাঁহারা ফোঁড়ার স্থানটী দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কিন্তু ইহা জানা গেল যে ঐ বালিকাটী সেই সময়

তাহার মাতার নিকট ছিল, তাহার পিতার নিকট আদৌ আসে নাই, এবং বালিকাও তাহাই বলিল! রামপ্রসাদ যে "কন্যারূপে দিচ্ছ বেড়া" বলিয়া গান করিয়াছিলেন তাহা অসম্ভব মনে করিবার হেতু নাই। কেহ হয়ত শুনিয়া উপহাস করিবেন, তাই বলিয়া সত্য গোপন করিবার আবশ্যক নাই। যিনি এই ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন তিনি ব্রাহ্ম, সুতরাং কুসংস্কারী নহেন ইহা বলা যাইতে পারে।

২। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই-নিবাসী এক ব্যক্তি অন্ধ ছিল। জন্মান্ধ কিনা জানি না। সে বিজয় গোস্বামী মহাশয়ের পরম ভক্ত ছিল। সর্ব্বদা 'গোপাল' 'গোপাল' বলিত; এবং গোপালের মন্দিরে পড়িয়া থাকিত। এক দিন হঠাৎ তাহার দিব্যদৃষ্টি জন্মিল, এবং সেই দৃষ্টি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

৩। এক ব্যক্তির কনিষ্ঠ পুত্রটী এক সময় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল। তাহাকে লইয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়ার তাহার ইচ্ছা। যে স্থানে যাওয়া হইবে সেটী তীর্থ স্থান। তথায় ঐ বালকের পূজা মানসিক ছিল। এদিকে বালককে লইয়া যাওয়া একরূপ অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল; তাহার শরীর অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কঠিন রোগ হইতে সদ্যমুক্ত হইয়াছে। তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রায়, দ্বিতীয় প্রহর নিশি। সেই ব্যক্তি ভাবিতেছেন "ইহাকে লইয়া কিরূপে সেই স্থানে যাওয়া যায়।" ইহাকে লইয়া যাওয়া যাইবে কিনা যখন এই কথা বলিলেন, তখন গভীর নিদ্রাভিভূত তিন বৎসরের বালক সজোরে বলিয়া উঠিল "আমি যাইব।" পিতামাতা আশ্বাসিত হইলেন, এবং তাহাকে লইয়া যথাসময় ঐ তীর্থস্থানে গমন করিলেন। কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাহাকে লইয়া রেলগাড়ীতে উঠিলেন। সেই স্থান পর্য্যন্ত তাহার প্রাণ থাকে কিনা সময় সময় সে ভয় ও হইয়াছিল। ভয়হারী সকল ভয় নিবারণ করিলেন।

৪। এক যুবক পুস্তক বক্ষে করিয়া পড়িতে পড়িতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সময় সময় বোবাধরা (Nightmare) রোগ হইত! রাত্রি অনেক হইয়াছে; গৃহস্থ সকলেই নিদ্রাভিভূত। হঠাৎ কে যেন তাঁহার হাত বক্ষের উপর হইতে সরাইয়া বলিল "বুকের উপর হাত রাখিস কেন?" যুবক দেখিল যেন তাহার ভৃত্য সরিয়া গেল। ভৃত্য তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন। ভৃত্য যেখানে নিদ্রিত এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সেখানে যাওয়াও অসম্ভব।

এরূপ শত শত ঘটনা বিশ্বাসীর জীবনে সর্ব্বদা সংঘটিত হইতেছে।

আমরা উপরিউক্ত সকল ঘটনাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া মানি। কখনও কন্যা রূপে কখন পুত্ররূপে, কখন বা ভৃত্যরূপে তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে কৃপা করেন। যাহারা ইহাতে সহজে বিশ্বাস না করিয়া ইহার শিরা অনুশিরায় অনুসন্ধান করিবেন, তাহাদের নিকট আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তাহারা কৃপার পাত্র। যে সত্যকে আপাততঃ দৃষ্টিতে কুসংস্কার বলিয়া মনে হয়, কালে তাহাই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। যাহাকে দূর হইতে বন্য জন্তু মনে কর, নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিবে যে সে মানুষ; আরও নিকট-বর্ত্তী হইলে দেখিবে সে তোমার ভ্রাতা। যদি প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ

করিতে, তাহা হইলে তোমার ভ্রাতৃহত্যার চেষ্টা হইত। পরিণামদর্শিতা গুণে এবং পুণ্যফলে তাহা হইতে তুমি রক্ষা পাইলে। যাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হইলে। বিশ্বাস জগতের ঘটনাবলীও এইরূপ। তাই সাধক বলিয়াছেন 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু 'তর্কে বহুদূর।' তর্কে যুক্তিতে সকল বস্তু পাওয়া যায় না। বিচার করিও, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা অবোধ্য, তাহারই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না এরূপ সিদ্ধান্ত করিওনা। যে বিষয় তুমি কখন চিন্তা কর নাই শুনিয়াই তাহা অবিশ্বাস করিওনা। এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে কোথায় কি তত্ত্ব আছে বলা যায় না। বহিরাবণ ভেদ করিয়া যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি তত্ত্বজগতের সূক্ষ্মতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন "There are more things in earth than are dreamt of in our Philosophy."

শ্রীকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

# জাপানের অভ্যুদয়। (২)

জাপানে তখনও চারিদিকে বৈদেশিক বিদ্বেষ প্রধূমিত হইতেছিল এবং এখানে সেখানে দুএক জন নিহত হইতে লাগিলেন। জাপান গবর্ণমেণ্ট আর একবার দৌত্য পাঠাইতে সংকল্প করিলেন, উদ্দেশ্য যদি বৈদেশিকগণের প্রবেশাধিকার একটু সঙ্কুচিত করা যায় নতুবা তাঁহাদের রক্ষা-সাধন গবর্ণমেণ্টের আরও শক্তি বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। এ দৌত্য নিষ্ফল হইল। কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রতীচ্য রাজন্যবৃন্দের প্রতিনিধিবর্গ শোগুণের সহিত সাক্ষাৎ ও প্রস্তাব করেন যেন তাঁহাদের সন্ধিপত্রে সম্রাটেরও স্বাক্ষর লওয়া হয়। শোগুণ এই প্রস্তাব গ্রহণার্থ সম্রাটকে অনুরোধ করিলে, তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাতে স্বাক্ষর দিলেন। ইহাতে দুটি ফল ফলিল। শোগুণ দ্বিতীয়বার প্রকারান্তরে সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিলেন এবং বৈদেশিকগণের সহিত আচরণ সম্বন্ধে জাপানে দুই পক্ষ রহিল না। পরবর্ষে (১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে) সম্রাট্ ও শোগুণ উভয়েরই পরলোক প্রাপ্তি হইলে, ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে ইয়ুশিনোবো নূতন শোগুণ এবং বর্ত্তমান সম্রাট্ মৎসুহিতো রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই বর্ষেরই অবসান সময়ে টোজার অধিপতি নূতন শোগুণকে দেশের কল্যাণার্থ রাজহস্তে সমদয় শক্তি অর্পণ জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে এক পত্র লিখেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শোগুণ উহাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন এবং স্বীয় অনুচরবর্গকে এ বিষয় পত্র লিখিয়া জানাইলেন।

দেশের কল্যাণার্থ এরূপ আত্মত্যাগ ইতিহাসে অতীব বিরল। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে শোগুণ পদটি উঠাইয়া দেওয়া হইল। রাজকার্য্য নানা বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি বিভাগে এক এক জন সুদক্ষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল।

শোগুণের বন্ধুবর্গ কিন্তু তাঁহার পতনে দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, শোগুণের এই অসামান্য ত্যাগ-স্বীকার জন্য সম্রাট্ কোনরূপ কৃতজ্ঞতা, বা সম্মান প্রদর্শন না করিয়া অবিচার করিতেছেন। শোগুণ যাঁহাদিগকে বিদ্রোহীজ্ঞানে রাজসভা হইতে

বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুনরাহ্বান করায় তাঁহার নিতান্ত অপমান করা হইয়াছে। ইত্যাকার নানারূপ অসন্তোষের কারণ বাহির করিয়া তাঁহারা নানা চেষ্টায় শোগুণকে দলে টানিয়া বিদ্রোহী হইলেন। রাজসৈন্য সহ যুদ্ধে কিন্তু বিদ্রোহীদেরই পরাজয় ঘটিল। শোগুণ নির্জ্জনবাসে থাকিতে সম্মত হইয়া বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ মধ্যে কেহ কেহ রাজতন্ত্র একেবারে উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটা সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা জন্য আরও কিছুদিন প্রয়াস পাইয়া অবশেষে নিরস্ত হইলেন ( ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে। )

শাসন-শক্তি এইরূপে রাজহস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে বৈদেশিক রাজগণকে সংবাদ প্রদত্ত হইল এবং সম্রাট্ একটী দরবারে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। দরবারে প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনায় উল্লেখযোগ্য কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। যাহা হউক, এই দরবারে সম্রাট্ ঘোষণা করিলেন বৈদেশিকগণের উপর তদবধি আর কেহ কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না, করিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। অতঃপর বৈদেশিকগণ সম্রাটের আশ্রয়ে রক্ষিত হইবেন। অনেকগুলি বন্দর বিদেশীয়দের জন্য মুক্ত হইল। বিদেশীয়গণসহ সম্পর্ক নির্ণয় ব্যতীত, প্রজাকুল সম্বন্ধেও গুরুতর পরিবর্ত্তন বিঘোষিত হইল। নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল।

১। প্রতিনিধি সভায় প্রকাশিত সাধারণের মতানুসারে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে।

২। ব্যক্তি-বিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের পরিবর্ত্তে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণই শাসন কার্য্যের লক্ষ্য হইবে।

৩। রাজ-কর্ম্মচারীই হউন বা সাধারণ প্রজাই হউন, কাহারও বিধিসঙ্গত কার্য্যে বাধা দেওয়া যাইবে না।

৪। প্রাচীন কু-রীতি সমূহের পরিবর্জ্জন করিয়া জাপানের শাসন-পদ্ধতি অতঃপর জ্ঞান ও সভ্যতামার্গে বিচরণ করিবে।

৫। দেশের গৌরব ও সম্মান বর্দ্ধনার্থ জগন্ময় জ্ঞান সংগ্রহ করিতে অর্থাৎ যাহারই যেটুকু ভাল বোধ হইবে, শিখিয়া লইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সময় কি এক মহামন্ত্রে জাপানবাসী অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বুঝিয়া উঠাই দুষ্কর। শোগুণের কর্ম্মত্যাগের পরই জাপানের অধিকাংশ ভূস্বামিবৃন্দ মিলিত হইয়া সম্রাট্ সমীপে এক আবেদন প্রেরণ করিলেন। তাহার স্থূল-মর্ম্ম এই :—

"আমাদের ধনজন সমস্তই সম্রাটের, সম্রাট্‌কে তাহা প্রত্যর্পিত হইল। অতঃপর সম্রাট্‌ই আমাদের সকলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাগ্য বিধাতা হউন।"

১৮৭১ খ্রীঃঅব্দে এই রূপে বহুদিনের প্রাচীন প্রথা সমূলে বিপর্য্যস্ত হইল। কুল-ক্রমাগত-অধিকার ঘুচিয়া অতঃপর যোগ্যতানুসারে রাজপদ প্রদত্ত হইতে লাগিল। প্রাচীনতম কাল হইতে যে সামুরাইগণ আপনাদিগকে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ-অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীরূপে গণনা করিয়া আসিতেছিলেন, এই সময় হইতে তাঁহারা তাঁহাদের অভিজাত্য গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেন। প্রায় চারিলক্ষ সামুরাই ইহা সানন্দে সহ্য করিলেন। অন্যদিকে কৃষক, বৈশ্য আদি শ্রেণী নিচয়, যাঁহারা শূদ্রবৎ নীচ জাতিরূপে এ যাবৎ পরিগণিত হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সে অপমান ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এখন হইতে আই-

নের চক্ষে সকলেই সমান। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দেই কতকগুলি জাপানীকে প্রতীচ্য খণ্ডে পাঠান হইল। উদ্দেশ্য ইয়ুরোপীয় রাজগণসহ যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার যেন কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়, কারণ তাহাতে অন্যান্য শক্তি-নিচয়ের তুলনায় জাপানকে একটু হীন পরিগণিত হইতে হইয়াছিল। য়ুরোপের রাজ্য শাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও, এই বিদেশ যাত্রার অন্যতর উদ্দেশ্য।

১৮৭৩ খ্রীঃঅব্দে জাপানের ঐ সমস্ত সুসন্তান স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্ব সন্ধির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধনে ইহাঁদের চেষ্টা সফলা হয় নাই। কিন্তু অনেক নূতন বিষয়ে উঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রজামাত্রকেই সৈনিক বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এই বর্ষেই ইয়াকোহামা এবং টোকিওর মধ্যে প্রথম রেল লাইন খোলা হয়।

১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্ব-সাধারণের মত লইয়া রাজ্য শাসনের যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, প্রথম তিন চারি বৎসর তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা পাইয়া সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নাই। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে কাউণ্ট ইটাগাকি পূর্ব্বোক্ত ঘোষণামত স্বায়ত্তশাসনের বিস্তৃতি জন্য এক আবেদন করেন, কিন্তু সম্রাট্ কর্ত্তৃক তাহা পরিত্যক্ত হয়। যাহা হউক, সম্রাট্ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পূর্ব্বেই স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণকে টোকিও নগরীতে সমবেত করিয়া তাঁহাদের মন্ত্রণানুসারে রাজ্য শাসনে সংকল্প করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমবায়ে "জেনরো"নামে একটী সিনেট-সভা গঠিত হয়। ইহাঁদের সহায়তা লইয়া দু একটী উল্লেখ যোগ্য কার্য্যও সম্পন্ন হইল। লুচুদ্বীপ জাপানের অধীন, ফরমোসাদ্বীপ চীনের। সমুদ্রে বিপন্ন হইয়া লুচুদ্বীপবাসী কয়েকজন, ফরমোসাদ্বীপে আশ্রয় লন, কিন্তু ফরমোসাবাসীগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। জাপানী গবর্ণমেণ্ট কালব্যয় না করিয়া, উহাদের শাসনজন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন, ইহার ফলে ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে, চীনাদের নিকট হইতে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ অর্থ আদায় হইল। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে, সাগালিয়েন দ্বীপের অধিকার সীমা লইয়া রুশের সহিত বিবাদ সম্ভাবনা হয়। জাপানী সিনেট কুরাইল দ্বীপ লইয়া সাগালিয়েন দ্বীপ ছাড়িয়া দেন। সে দিনকার এই রুশ জাপান যুদ্ধের পরিণামে উঁহারা সাগালিয়েন দ্বীপের অর্দ্ধাংশে আপনাদের অধিকার স্থাপনে পুনরায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। একখানি জাপানী জাহাজ কয়লা ও খাদ্য সংগ্রহার্থ কোরিয়া উপদ্বীপে উপস্থিত হইলে, সহসা কোরিয়া বাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। অমনই জাপানী সিনেট, সৈন্য পাঠাইয়া কোরিয়া গবর্ণমেণ্টকে সন্ধি করিতে ও বাণিজ্যাধিকার দিতে বাধ্য করিলেন।

১৮৭৪ হইতে ১৮৭৭ খ্রীঃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ কতক গুলি অন্তর্বিপ্লব ঘটে। ইহাদের মধ্যে সামুরাই "সেই গো তাকামোরি" প্রবর্ত্তিত বিদ্রোহই সর্ব্ব প্রধান। বড় গোছের কোন একটা পরিবর্ত্তনে দলাদলির সৃষ্টি হয়ই। তাকামোরি ও তাঁহার দলভুক্তগণ প্রাচীন জাপানকে হারাইয়া সুখী হন নাই। কোন দেশের লোকেরই নব্য-তন্ত্রের সমস্তই ভালর চক্ষে দেখেন না। তাকামোরি ও তাঁহার অনুচর বীরগণ বিদ্রোহী হইয়া নব্যজাপানের ভিত্তি অবধি কাঁপাইয়া দেন, কিন্তু প্রাচীন জাপান পুনঃ স্থাপিত হয় নাই।

রাজ-সৈন্যসহ অনেক গুলি প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আর জয়ের আশা নাই বুঝিলে, তাকামোরি তাঁহার বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করিলেন, শত্রু-হস্তে পতন অপেক্ষা তাঁহারা যেন তাঁহার মাথাটা স্কন্ধ হইতে উড়াইয়া দেন। বন্ধুবর্গ কাঁদিতে কাঁদিতে এই আদেশ পালন করিল, এবং পরবর্ষে "অকুবো টশিসিবি" নামক এক জন প্রসিদ্ধ নব্য জাপানীর হত্যা সাধন করিয়া করিয়া উহার প্রতিশোধ লইল। ইহাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে জাপানে স্বায়ত্ত-শাসনের পথ ক্রমেই সুগম হইয়া আসিতেছিল। যাহা হউক, উহাঁকে হারাইয়াও নব্য জাপান লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ ঘোষণা করিলেন, নয় বর্ষ পরে অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রথম পালিয়ামেণ্টের ন্যায় প্রজা সভা গঠিত করিবেন। তদর্থ প্রস্তুত হইতে জাপানবাসী আহার নিদ্রা ভুলিল। জাপানের কৃতীপুরুষ ইটো এইজন্য পুনরায় য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। দেখা যাইতেছে, রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় সর্ববিষয়েই কর্ত্তব্য নিরূপণ প্রয়োজন হইলে জাপানীরা আগে পশ্চিমের রীতি নীতি বুঝিতে যান, তাহার পর স্বদেশের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন।

১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে জাপান য়ুরোপের আর একটা নকল করিল। উহার সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অতঃপর প্রিন্স, মার্কুইস, কাউণ্ট, ভাইকাউণ্ট ও ব্যারণ উপাধিতে ভূষিত হইলেন। য়ুরোপের সহিত মিল রাখা ব্যতীত এরূপ উপাধি পরিবর্ত্তনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাটের প্রতিশ্রুতি মত জাপানী ডায়েট বা পালিয়ামেণ্ট খোলা হইল। প্রজাতন্ত্র-মূলক শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত হইলেও, এখনও উহার অঙ্কুর মাত্র। প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই রাজহস্তে বর্ত্তমান। তৃতীয় অধিবেশনে, রাজমন্ত্রী মার্কুইস ইটো সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে তাঁহার পক্ষের পরাজয় হয়, কিন্তু সম্রাট্ মিষ্টভাষায় সকলকে তুষ্ট করিয়া ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর পর ৬ সাম্রাজ্যের রণ-পোত বৃদ্ধি জন্য যথেষ্ট অংরাদ প্রয়োজন। সম্রাট্ ছয় বৎসরকাল নিজ সংসারের ব্যয়ভার কমাইয়া বার্ষিক তিন লক্ষ ইয়েন এজন্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হন; রাজ-কর্ম্মচারিগণের বেতনের এক দশমাংশও ঐ উদ্দেশ্যে কাটা যাইবে স্থির করেন। নিজে এইরূপে পথ দেখাইয়া অন্য সকলকে যোগ দিতে আহ্বান করেন। আমরা সকলেই বিদিত আছি জাপানী প্রজা তাহাদের রাজার কথায় সম্মতি দেওয়ায় জাপানের আজ কি অদ্ভূত পূর্ব্ব নৌবল বৃদ্ধি হইয়াছে। কিছুকাল পরে চীনের সহিত সমরে বিজয়ী হইয়া জাপান ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে প্রভূত অর্থ লাভ করেন তাহার প্রায় সমস্তই নৌবল বৃদ্ধি জন্য ব্যয়িত হয়। এবারকার রুশ জাপান যুদ্ধের অবসানে, রুষ এই কারণেই বোধ হয় ক্ষতি পূরণ দিতে এত আপত্তি করেন। চীনে বক্সার বিপ্লব ঘটিলে, প্রতীচ্য শক্তিগণের পাশে থাকিয়া, জাপান আপনার সামরিক শক্তির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ তুলনায় বুঝিয়া লইয়াছে। আমরা যতদূর জানি এ বিষয়ে উহাঁদিগকে হীন প্রতিপন্ন হইতে হয় নাই। তারপর, এই রুশ-জাপান যুদ্ধ বাধিয়া উহা আরও ভালরূপ প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

নানা জাতির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া অবশেষে জাপান, পোতবিদ্যায় ইংলণ্ডকে, যুদ্ধ এবং চিকিৎসা বিদ্যায় জার্ম্মাণিকে, সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় ফ্রান্স ও ইটালিকে এবং রাজবিধি প্রণয়ন ও বিদ্যা বিস্তারে নানা দেশকে

আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম নির্ণয় জন্যও একটী কমিশন বাহির হইয়াছিল। নানা দেশ ঘুরিয়া কমিশন জাপানের ধর্ম্মসংস্কার-সাধন নি... ন মনে করিয়াছেন।

বিলাতি ...উস-অব্-লর্ডস্ হাউস অব্ কমন্সের ন্যায় জাপানী পালিয়ামেণ্টও দুই ভাগে বিভক্ত। হাউস্ অব্ লর্ডসের সভ্য শ্রেণী নিম্নলিখিত রূপে গঠিত হয়। (১) রাজপরিবার; (২) প্রিন্স ও মার্কুইসগণ; (৩) কাউণ্ট, ভাইকাউণ্ট ও ব্যারণগণের সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মাত্র প্রতিধিরূপে নির্ব্বাচিত (৪) বিশিষ্টরূপ দক্ষতা, বা গুণ প্রকাশ জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পুরুষগণ; ইহাঁরা আজীবন সভ্য শ্রেণীভুক্ত থাকিতে পাইবেন। (৫) রাজ্য মধ্যে যে পনর জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করদান করেন, তাঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে কয়েক জনকে বাছিয়াছেন, তার পর সম্রাট্ আবার তাঁহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া লন। ইঁহারা একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকিবার অধিকারী। ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচনকালে এইটুকু সাবধান থাকা হয়, যেন উহাদের সংখ্যা, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর সভ্যবৃন্দের সংখ্যার অধিক না হয়।

হাউস্-অব্-কমন্সের সভ্যগণ সর্ব্বসাধারণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচকের বয়স পঁচিশ এবং নির্ব্বাচিতের বিশের ন্যূন হইলে হইবে না, এবং যে স্থানের তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন তৎপ্রদেশের জন্য অন্ততঃ বার্ষিক এক পাউণ্ড কর না দিলে তিনি অনধিকারী। পুরোহিত সম্প্রদায়, রাজকর্ম্মচারিগণের অধিকাংশই এবং কোন কোন অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিগণও অনধিকারী। পূর্ব্বোহিতগণ অনধিকারী হইলেন কেন বুঝা গেল না।

জুলাই মাসের প্রথম দিবস নির্ব্বাচনের দিন। ব্যালট প্রক্রিয়ায় গুপ্তভাবে নির্ব্বাচন নিয়ম। প্রতিবৎসর সাধারণতঃ তিনমাস ব্যাপিয়া পার্লিমেণ্টের অধিবেশন হয়। নূতন করস্থাপনে বা, পুরাতনের পরিবর্ত্তন অথবা জাতীয় ঋণ গ্রহণে ডায়েটের মত লওয়া হয় বটে, কিন্তু অর্থ সংগ্রহ জন্য রাজাকে প্রায়ই ভাবিতে হয় না। অন্যদেশে রাজকোষে অর্থের অভাব হইলে, প্রায়ই প্রজার একটু স্বাধীনতা বাড়াইয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। জাপানী গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া এজন্য আইনের অনেক ফাঁক রাখিয়াছেন। ফলতঃ জাপানে এখনও পার্লামেণ্ট বড় নহে, রাজাই বড়। তাঁহার অনুমোদন বিনা রাজবিধি প্রণীত হয় না। তাঁহারই আহ্বানে পার্লামেণ্ট গঠিত হয়, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। রাজকর্ম্মচারিগণের নিয়োগ বা পদচ্যুতি ব্যাপারে অথবা কাহারও আভিজাত্য গৌরব বাড়াইতে সম্রাটেরই অধিকার, পার্লামেণ্টের নহে! জলে স্থলে সেনাগণের তিনিই প্রভু। তাঁহারই ইচ্ছায় যুদ্ধ বা শান্তি হয়। সর্ব্বোপরি, সম্রাট্ সকলের দণ্ডদাতা হইলেও, নিজে দণ্ডের অতীত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বৈদেশিকগণ সহ বিবাদ উপস্থিত হইলে, জাপানী যদি আসামী হয়, বৈদেশিক কন্সল বিচার করিবেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে নূতন সন্ধি হইয়া এ বাঁধনও খসিল। অতঃপর জাপানী গবর্ণমেণ্টই তাঁহার রাজ্যের সমুদয় বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। এই একটুকু

বৈদেশিক নিগড় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জাপানের সম্রাট হইতে প্রজাসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং যাহাতে বৈদেশিকগণের উপর সহজে পুনরায় কোন অত্যাচার না হয়, তদর্থ সকলে পূর্ব্বাপেক্ষা সাবধান থাকিবেন স্থির করিলেন।

জাপানের রাজনৈতিক অভ্যুদয় আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি উহার উপনিবেশ-স্থাপন-শক্তি সম্বন্ধে কোন কথা না বলা হয়। জাপান এখনও দিগ্বিজয়ী জাতিরূপে বহির্গত হয় নাই, শক্তিবৃদ্ধি সহকারে উহার এ প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে কিনা বলা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, শক্তিবৃদ্ধি সহকারে এসিয়া ভূমির উদ্ধার সাধন করিয়া জাপান তাহার মহাব্রতের উদ্যাপন করিবে। প্রথমে চীনভূমি, তারপর হয় ত অস্ত্র-আইন-পীড়িত ভারতবর্ষ অথবা অন্যান্য দেশের সামরিক বলবর্দ্ধনে সহায়তা করিয়া জাপান ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। ইহাই "পীতাতঙ্ক" নামে অভিহিত। এসব কল্পনার খেলা ছাড়িয়া দিয়া, সত্যই যদি জাপান এখনই কোন দেশের শাসনভার স্বহস্তে পায়, কিরূপে তাহা শাসন করে, জানিবার আমাদের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। জাপানের বর্ত্তমান পররাষ্ট্র-নীতি অবশ্য ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানই আমাদের আলোচ্য।

১৮৯৪—৯৫ খ্রীঃ অব্দে চীন জাপান-যুদ্ধের অবসানে ফর্ম্মোসা দ্বীপ জাপানের অধিকার-ভুক্ত হয়। ফর্ম্মোসা তখন দস্যু ও উগ্রপ্রকৃতি অসভ্যগণের বাসভূমি। চীন ফর্ম্মোসা লইয়া বিব্রত ছিল; জাপানকে প্রদানকালে লাই-হুংচং হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, দেখা যাউক, ফর্ম্মোসা পাইয়া জাপান সুবিধা বোধ করে কিনা। সন্ধিসূত্রে ফর্ম্মোসার অধিকারী হইয়া দস্যু ও উগ্রপ্রকৃতি দেশবাসিগণের দমনে জাপানের এক বৎসর সময় গেল। তারপর জাপান দেশ শাসনে মন দিলেন। পাঠক, ইংরাজের ভারত অধিকার ও ভারত-শাসন-নীতির সহিত ইহা মিলাইয়া দেখুন, দেখিবেন জাপান ইংরাজের কিরূপ সুযোগ্য অনুকরণ-কারী।

দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া জাপানীরা দেশবাসিগণের ধর্ম্ম ও আচারে হস্তার্পণ করেন নাই। দেশে যাহাতে শান্তি বিরাজ করে এবং অধিবাসিগণ দস্যু তস্করাদির হস্তে উপদ্রুত না হয়, নিয়ত সে দিকে দৃষ্টি আছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন জন্য পরিস্কৃত জলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নানাস্থানে হাঁসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহ, একটী মেডিক্যাল স্কুল, একটী জাপানী ভাষা শিক্ষার স্কুল, এবং একটি শিক্ষকতা শিখাইবার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জাপানী ও দেশবাসিগণের শিক্ষার্থ প্রায় ১৩০টী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কুড়ি হাজারেরও অধিক ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে এবং প্রায় ছয়শত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে নানা স্থানে প্রায় সহস্র মাইল দীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। রেল খুলিবারও কথা হইতেছে এবং ইহার জন্য জাপান গবর্ণমেণ্ট প্রায় সাড়ে চারি কোটি টাকা ব্যয়ের সংকল্প করিয়াছেন। দেশের যে সব ঐশ্বর্য্য লোকে জানিত না, বা, ভোগ করিতে পাইত না, জাপানীর হাতে আসিয়া সে সব নিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে। জাপানী গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় বনভূমি ও বনজাত পদার্থ সমূহের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। তথায় এখন লক্ষ

লক্ষ কর্পূর বৃক্ষ রোপিত হইয়া ভবিষ্যৎ ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। নানাস্থানে কুঠি স্থাপিত হইয়া, শর্করা, কাচ, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। এ সমস্ত পাঠে কিন্তু আমাদের তেমন আনন্দ হয় না। ফর্ম্মোসাবাসিগণ উঁহাদের সংসর্গে আসিয়া কোন কালে যদি ঐ সব নিজেরা করিতে পারে, তবেই জাপানকে প্রাচ্য আদর্শানুযায়ী সভ্য বলিয়া স্বীকার করিব। ফর্ম্মোসার দেখিতেছি কতকটা ভারতের দশা—"পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"।

ইয়ুরোপীয়গণ তাঁহাদের অধ্যুষিত দেশ (অর্থাৎ জগতের প্রায় সর্ব্বত্র) এসিয়াবাসিগণকে আর প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। জাপান সম্বন্ধে এবাধা বোধ হয় থাকিবে না। যাহা হউক, বিদেশে ভিন্ন জাতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জাপানবাসী যে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৯ খ্রীঃ বিদেশবাসী জাপানীর সংখ্যা ১৮৬৮৮; ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে উহাদের সংখ্যা ১২৩৯৭১। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স, ইংলণ্ড ও উহাদের উপনিবেশ সমূহ, কোরিয়া ও রুশিয়া এই কয় স্থানেই প্রবাসী জাপানীর সংখ্যা অধিক। জাপানীর ন্যায় অল্পসংখ্যক ভারতবাসীও আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে বাস করিতেছেন, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ স্বদেশী আফ্রিকাভূমে কুলি বা দাস রূপে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্যবসা বাণিজ্যাদি সূত্রে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কম এবং সংবাদ পত্রে পাঠ করা যায়, তথায় তাঁহাদিগকে নানাবিধ অত্যাচার সহিতে হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় অনেকে শাল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দুপয়সা পাইত, তথায়, বোধ হয়, আমাদের প্রবেশাধিকার এত দিনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। চীনাদের প্রতিও ঐরূপ নানা অসদ্ব্যবহার করায় তাহারাও "বয়কট" বা ধর্ম্মঘটের আশ্রয় লইয়া ইহার পালটা জবাব দিতেছে। আমার দেশে দুপয়সা রোজগারের আশায় কাহাকেও আসিতে দিব না, ইহা একরূপ "বয়কট"; আবার তোমার দেশের জিনিষ আমি ব্যবহার করিয়া ঘরের পয়সা তোমায় দিবনা, ইহাও একরূপ "বয়কট"। চীনাগণ এই শেষোক্ত বয়কটের আশ্রয় লইয়াছে, কারণ পরকে ঘরে ঢুকিতে বারণ করার তাহার শক্তি নাই, আমরা জানি, জাপানও এরূপ চেষ্টায় সক্ষম হয় নাই। প্রাচীন জাপান আত্মরক্ষার্থ "বয়কট" নীতিই শরণ্য মনে করিয়াছিল, নব্য জাপান দেখাইল, উহা একান্ত আবশ্যক নহে। বাস্তবিক পলাইয়া যে আত্মরক্ষা, তাহা আত্মরক্ষা নামেরই যোগ্য নহে। ঘরে অর্গল দিয়া বীরত্বের বড়াই করিলে, বীরপুরুষ হওয়া যায় না। জগতের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভে সমর্থ হইলেই তুমি বীর। কথা সত্য,কিন্তু যুদ্ধ যেমন শত্রুকে আক্রমণ করিয়া এবং শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া এই দুই ভাবে চালান যায়, প্রতিযোগিতা ব্যাপারেও সেইরূপ অবস্থা বুঝিয়া "রুদ্ধদার" ও "মুক্তদ্বার" নীতি অবলম্বন করিতে হয়। আমাদের মধ্যে—অন্ততঃ ঐ চীনাদের, বোধ হয়, এমন কিছু আছে, যাহাতে প্রতিযোগিতায় জয়লাভে আশা করা যায়, নতুবা আমাদের সম্বন্ধে অন্যদেশে "রুদ্ধদ্বার" নীতি অবলম্বিত হইবে কেন? যাহা হউক, এক অবস্থার যে "বয়কট" ধর্ম্মঘট বা রুদ্ধদ্বারনীতি অবশ্য অবলম্বনীয়, তদ্বিষয়ে মত দ্বৈধ নাই। দুর্ব্বল ও অসহায়

অবস্থায়, বল সঞ্চয়ের পূর্ব্বে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে নাই। জগতের সহিত সংস্রব বিচ্ছিন্ন না করিয়াও, যদি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারা যায়, তাহাই পুরুষকার। জাপান তাহা পারিয়াছে। উন্নতি অর্থই, জগতের যেখানে যাহা কিছু নূতনতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, সে সমস্ত শিখিয়া লওয়া, তাহা না পারিলেই পিছনে পড়িয়া রহিলে। নানা কারণে ওরূপে পুরুষকার প্রদর্শনের সুযোগাভাব ঘটিলে, বলসঞ্চয় জন্য বয়কটের আশ্রয় গ্রহণে দোষ নাই। এই কারণে, আমরা ভারতে আজকাল যে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন চলিয়াছে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সাফল্য কামনা করি।

জাপানের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের ইতিহাস একরূপ আলোচিত হইল। সূত্রাকারে বলিতে হইলে বলিতে হয়, প্রতীচ্য বিভীষিকার ফলে উহার উৎপত্তি এবং ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ চেষ্টাতেই উহার পুষ্টি। পুষ্টিমাত্র বলিলাম—পরিসমাপ্তি [illegible] না। [illegible]রণ, একদিকে প্রতীচ্য অজগরের গ্রাস হইতে মুক্তি লাভার্থ ভুক্তাবশিষ্ট জগৎটুকু যেমন থর থর কাঁপিতেছে এবং জাপানের ন্যায় কৃতী জাতিনিচয় যথাসাধ্য পুরুষকার প্রয়োগে চেষ্টা পাইতেছে, তেমনই অন্যদিকে প্রতীচ্যগণ পীতাতঙ্ক নামে আর এক বিভীষিকা খাড়া করিয়া অবশিষ্ট জগতের ঐ চেষ্টাটা ব্যর্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন। ইহার পরিসমাপ্তি কোথায়, তাহা আমরা এখনও কেহ ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। গচ্ছতীতি জগৎ, সৃষ্টবস্তুমাত্রই পরিবর্ত্তনশীল; অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বারকা প্রভৃতির সমৃদ্ধি যদি পৌরাণিক কাহিনী মাত্র হয়, মগধের সমৃদ্ধি কাহিনী ত ঐতিহাসিক। প্রাচীন আশিরিয়া, ঈজিপ্ট, পারস্য, গ্রীস, রোম কোথায় গেল? আরবের মরুভূমে বিকশিত ও পুষ্ট হইয়া যে মুসলমান-শক্তি প্রতীচ্য হস্ত হইতে প্রাচ্যকে রক্ষা করিয়াছিল এবং প্রতীচ্যের ছায়া দর্শনে প্রাচ্য যেমন আজকাল ভয়ে কাঁপে, এক সময় প্রতীচ্যকেও প্রায় তদ্রূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছিল, সে শক্তি আজ নিদ্রিত কেন? তাই বলিতেছি, জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ঐ যে বিপুল বলশালী প্রতীচ্য অজগর, উহার ধ্বংসের বীজ উহারই মধ্যে নিহিত আছে। কালে তাহা বিকশিত হইয়া অজগরের ধ্বংস সাধন করিবে! কিন্তু উহা কিরূপে বা কবে মরিবে এবং মরিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে মারিয়া মরিবে কিনা নিশ্চয়তা নাই। জন্মই মৃত্যু, মৃত্যুই জন্ম; ও দুটার প্রকৃত নাম নবদেহ ধারণ বা রূপান্তর গ্রহণ। কাহারও মরণ কামনা বিকৃত রুচির পরিচায়ক। অতএব বলা যাউক, প্রতীচ্য সমাজ মরিবে না, তবে কালসহকারে উহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইবে মাত্র। কিরূপে এই রূপান্তর ঘটিতে পারে, ভাবিতে বসিলে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিনা। কখন মনে হয় এই যে, প্রতীচ্যের স্বাধীনতাপ্রিয়তা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রভুত্বলালসা বা স্বাধীনতা-হরণ প্রবৃত্তিতে পরিণত হইতেছে,আর অন্যদিকে প্রাচ্যগণ স্বাধীনতার আদর শিখিতেছে, সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় ইহাই ভাবী পরিবর্ত্তনযুগের সূচনা করিতেছে। কখন মনে হয়, ভূমিকম্প জলকম্প প্রভৃতির ন্যায় ফরাসি বিদ্রোহের দিনে. সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীর মহামন্ত্র বিঘোষিত হইয়া একটা সমাজ-কম্পের যেমন সৃষ্টি করিয়াছিল, সেইরূপ সামাজিক ওলট পালট আবার ঘটিবে। সোশিয়ালিষ্ট, আনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট ধর্ম্মঘট

প্রভৃতিতে তাহারই সূচনা দেখাইতেছে মাত্র। এবারকার সমাজকম্পে শুধু প্রতীচ্য সমাজ নহে, হয়ত অন্য বহু সামাজিক প্রাসাদও বিধ্বংস ও ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে এবং উহার অন্তে, যাহা কেহ কখনও ভাবে নাই, হয়ত,সেই বৈরাগ্যমূলক জ্ঞানচর্চ্চারত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে। যাহা হউক, দিবাস্বপ্ন একটা ব্যসন মধ্যে পরিগণিত, আমরা এইখানেই উহা হইতে বিরত হইলাম।

## জাপানের সামাজিক অভ্যুদয়।

জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, ইংরাজ জাপানের সন্ধি-বন্ধন। কোন এক প্রতীচ্য শক্তিসহ একজনের সমর বাঁধিলে, অপরে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন প্রতীচ্য বিভীষিকার হাত এড়াইবার জন্য জাপান এই শেষ চাল চালিয়াছেন। এখন ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই হইল।

রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের পরই সামাজিক অভ্যুদয়। প্রকৃত পক্ষে ও দুটা ঘনিষ্ঠসূত্রে বিজড়িত, একই বিষয়ের দুটা দিক মাত্র। রাজা, অন্য রাজসহ সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ হইয়া বা আইন করিয়া দেশের উন্নতি করিতে পারেন না, সমাজ উন্নত হইলেই দেশ উন্নত হয়। আমরা দেখিয়াছি,জাপানের অভ্যুদয়ার্থ জাপানের রাজা কত চেষ্টা করিতেছেন। অন্য শক্তি সহ সমাসনে পরিগণিত হইবার জন্য কত না সন্ধি বন্ধনে বদ্ধ হইতেছেন। প্রজাগণের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রীতি জাগরূক করিবার জন্য দেশে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সামরিক বলবৃদ্ধ্যর্থ কেবল সামুরাই বা ক্ষত্রিয়বর্ণ মধ্যে সমর শিক্ষা আবদ্ধ না রাখিয়া, দেশের সমুদয় প্রজাশক্তির এজন্য নিয়োগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। জাপানী প্রজা মাত্রই এখনও সমরপটু সৈনিক নহে সত্য, এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীর পত্রে আমরা অবগত হই, ভারতে শিখ ও কুলির মধ্যে যত প্রভেদ, রুশের বিরুদ্ধে প্রেরিত জাপানী সৈনিক ও অবশিষ্ট জাপানী প্রজার মধ্যে তাহারও অধিক পার্থক্য বিদ্যমান,তথাপি ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি জাপান ইহারই মধ্যে রণাঙ্গনে পাঁচ ছয় লক্ষ সমরপটু সৈন্য প্রেরণে সমর্থ। জাপানের জিউজিৎসু ব্যায়াম প্রথা, যে সব জাতির ভিতর স্যাণ্ডোর ন্যায় কলির ভীমের জন্ম হয়, তাঁহাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই ব্যায়াম বিদ্যার অনুশীলন ফলে গত বক্সার বিপ্লবকালে দেখা গিয়াছিল, ক্ষুদ্রকায় হইলেও কষ্টসহিষ্ণু জাপানীসেনা ভীমকায় আমেরিকগণকে পথহাঁটা বিষয়ে পরাস্ত করিয়াছিল। জাপানের সামরিক বল বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু শুধু য়ুরোপের নিকট সমর-কৌশল শিখিয়া এবং য়ুরোপীয় ... শস্ত্রাদি লাভ করিয়াই নহে। জাপানী প্রজার রাজভক্তি এবং স্বদেশপ্রীতি ... অপূর্ব্ব ব্যাপার যে, অন্য জাতিকে তাহা বুঝিতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। শুনা যায়, জনৈক জাপানী এদেশের কোন স্কুল পরিদর্শন কালে জনৈক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন "এদেশ কাহার?" এবং উত্তরে "ইংরাজের," শুনিয়া একটু বিস্ময় প্রকাশ করেন। জাপান হইলে, ছাত্র সম্ভবতঃ নিজের বুকে হাত দিয়া বলিত "আমার"। দেশের জন্য, রাজার জন্য,জাপানীর আত্মোৎসর্গ ইতিহাসে অতুলনীয়। জাপানের যে আজ এত শ্রীবৃদ্ধি, তাহা প্রধানতঃ জাপানী সমাজের অভ্যুদয় জন্য। অতঃপর আমরা জাপানের এই সামাজিক অভ্যুদয় বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে আরম্ভ করা যাউক। সমাজ কতকগুলি পরিজন বা

গৃহ-সমষ্টি মাত্র, আবার "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। অতএব জাপানী মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানী সমাজের সহিত পরিচিত হইতে প্রয়াস পাওয়া যাউক।

প্রতীচ্যগণ প্রাচ্য সমাজের একটা বিশেষত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হন। প্রাচ্যদেশ সমূহে প্রায় সর্ব্বত্র, বয়োবৃদ্ধ হইলে তাহার সেই বয়োজ্যেষ্ঠতা জন্যই 'অল্প বয়স্কের' নিকট একটা সম্মান প্রাপ্য থাকে। জাপানেও এ নিয়মের ব্যত্যয় নাই। জাপানী পরিবারে বধূর স্থান এজন্য সাধারণতঃ অনেক নিম্নে। অনেকের আদেশই তাঁহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে ও অবনত মস্তকে পালন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত রন্ধন, পরিবেশন, ঘর ধোয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি অনেক কার্য্য বধূকে স্বহস্তে করিতে হয়। দাস দাসীর উপর বরাত দিলে, সে বধূকে নিন্দা কুড়াইতে হয়। হিন্দু পাঠক নিজ পারিবারিক প্রথার সহিত এই সমস্ত সাদৃশ্য দেখিয়া পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এক বিষয়ে জাপান আমাদিগকেও ছাড়াইয়া যান। কাপড় চোপড় ধোপার বাড়ী পাঠান বাবুয়ানি বিবেচিত হয়। কাপড় কাচিতে সাবান দেওয়া হয় না। (আমরাও নিত্য কাচিবার কালে ধোপার শরণ লই না বা সাবান ব্যবহার করি না)। জাপানী সংসারে, কাপড় প্রথমে ঠাণ্ডা জলে কাচিয়া, তারপর মসৃণ কাষ্ঠফলকদ্বয়ের ভিতর রাখিয়া চাপ দিয়া "ইস্ত্রী" করার মত করা হয়। আমাদের মত জাপানীবধূকেও নিদ্রান্তে শয্যা ত্যাগের পর, মশারি তুলিতে ও মাদুর গুটাইয়া রাখিতে হয়, বিছানা করা বা বিছানা তোলা দাস দাসীর কার্য্য নহে। পুরুষের মন ভুলাইবার জন্য জাপানী বালিকাকে নানা কলা-কৌশল শিখান হয় না—সে সব "গেইসা" বা নটীর কার্য্য। ষোড়শবর্ষে * উপনীতা হইলে, বালিকার পিতাই যেখান থেকে পান "বর" খুঁজিয়া আনেন ও আপনাদের মনোমত পাত্রের সহিতই কন্যার বিবাহ দেন। পছন্দ, অপছন্দ বা কোর্টসিপের চলন নাই; ব্রাহ্ম বিবাহই জাপানের আদর্শ বিবাহ। বিবাহে গমনকালে, বর তাঁহার মাতার জন্য "দাসী" আনিতে যান। আমাদের ন্যায় সত্য সত্যই এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া যান কি না ঠিক বলিতে পারিলাম না, কিন্তু বিবাহান্তে নববধূর শ্বশুর শাশুড়ীর সেবাই পতি সেবারও ঊর্দ্ধে স্থান পায়। শ্বশুর শাশুড়ীর অবর্ত্তমানে পত্নী আপনাকে পতির সমান বিবেচনা করেন না। তিনি "গৃহিণী" মাত্র, অন্য গুরুজনের অভাবে তিনিই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তথাপি পতির দাসী। জাপানে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর মধ্যে অবধি এই সম্পর্ক। জাপানে পতি পত্নীর একত্র বায়ুসেবনে বহির্গত হওয়া নিয়ম নাই। দুজনে যদি কখন বাহিরে যাইতে হয়, পত্নী দাসীর ন্যায় স্বামীর অনুগমন করেন।

অতি প্রত্যূষে সকলের আগে পত্নীকে শয্যাত্যাগ করিতে হয়। উঠিয়াই আগে শয়ন গৃহের প্রদীপটা "জুড়াইয়া" (নিবাইয়া) দেন। সমস্ত রাত্রি প্রদীপটা আলো দিয়াছে, অনর্থক যেন আর তৈল নষ্ট না হয়। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া, দাসদাসীগণকে উঠাইয়া রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্তা হন। প্রাতরাশ

---

* ভূপ্রদক্ষিণ লেখক পরিব্রাজক শ্রীচন্দ্রশেখর সেন বলেন "১৬ বৎসরের বালক ও তের বৎসরের বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে; কন্যা-পক্ষীয়কে বিলক্ষণ ব্যয় করিতে হয়। আমাদের মত ঘটকেরাই উভয় পক্ষের মধ্যে থাকিয়া বিবাহের কথা বার্ত্তা ঠিক করেন।"

প্রস্তুত হইলে, স্বামীকে জাগাইতে যান। কার্য্য-ক্ষেত্রে গমন কালে, পতির জন্য ছত্র, পাদুকা, পুস্তক প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক হয়, গুছাইয়া ও আগাইয়া দিতে হয়।

কথাতে বলে, বাঙ্গালী মেয়ে কুড়ির পার হইলেই বুড়ী হন। মহিলাগণ ক্ষমা করিবেন, আমরা জানি, উহা নিতান্ত অসার কথা। প্রতীচ্যগণের চক্ষে কিন্তু প্রাচ্য-মহিলারা সাধারণতঃ অল্প বয়সেই যৌবনশ্রী হারান। পঁয়ত্রিশ পার হইতে না হইতে, জাপানী মহিলা তাঁহার কিশোর বয়সের সেই সর্ব্বলোচন তৃপ্তিকর নিটোল সৌন্দর্য্যটুকু হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি চিন্তিতা বা বিষণ্ণা হন না। বয়স লুকাইবার চেষ্টায় তাঁহার প্রয়োজন কি? বরং তিনি ইচ্ছা করিয়া বর্ষীয়সী সাজিতে বসেন ও তাঁহার বেশ ভূষার এবং খোঁপা বাঁধিবার নিয়মের অল্পে অল্পে এরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করেন যে, জাপানী সমাজসহ যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা দেখিবামাত্রই সে সব সঙ্কেত বুঝিতে পারেন। আমাদের বালিকা বধূরাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবরী নাসিকা কর্ণ ও চরণাভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্রেরও বিস্তর পরিবর্ত্তন সাধন করেন। (মাথার ফুল, নোলক, মাকড়ি, মল, পাছা পেড়ে শাড়ি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত)। ভীতা বা বিষণ্ণা হইবার পরিবর্ত্তে জাপানী মহিলা সাধ করিয়া প্রাচীনা বা "গিন্নি" সাজিতে যান, কারণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে অল্প বয়স্কাদের নিকট ক্রমশঃ তাঁহারা কর্ত্রীর সম্মান লাভ করিতে থাকিবেন।

ফলতঃ, বাঙ্গালীর বা হিন্দুর পারিবারিক প্রথার সহিত জাপানী পারিবারিক জীবনের এত অধিক সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও পুলকিত হই এবং অন্যান্য প্রাচ্য জাতির পারিবারিক জীবন সহ পরিচিত হইতে ইচ্ছা হয়। সর্ব্বত্রই যদি এই একইরূপ প্রথা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য জীবনের প্রভেদ বুঝা কতকটা সহজ হয়।

এখানে আমরা বাঙ্গালী ও জাপানীর পারিবারিক জীবনের সাদৃশ্যসূচক আরও কয়েকটী প্রথা, পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের ভূপ্রদক্ষিণ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিব।

"বাঙ্গালীর ন্যায় জাপানীরাও কোনরূপ মস্তকাবরণ ব্যবহার করেন না, কেবল পুলি-শের মাথায় টুপি দেখা যায়। রমণীগণ সুদীর্ঘ কেশরাশিতে তৈল ব্যবহার করেন। বয়স্থ ব্যক্তিগণের মাথার তিন জায়গা কামান, তথায় দ্বীপের মত তিনটী ঝুঁটি শোভমান। (বোধ হয় ইহা আমাদেরই শিখার জাপানী সংস্করণ; নব্যজৈনগণ বেণী রাখিবেন কিনা ভাবিতেছেন, বাঙ্গালীরা শিখাহীন হইয়াছেন বলিলেও চলে, নব্যজাপান এবিষয়ে যে পশ্চাতে পড়িয়া আছে, বিশ্বাস হয় না, কিন্তু পরিব্রাজক সে কথা খুলিয়া বলেন নাই)। আজকাল অনেক স্ত্রীপুরুষ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেছেন; রাজ সর-কারের কর্ম্মচারিগণ ইউরোপীয় পোষাক পরিতে বাধ্য। বিবাহের পর এখনও পল্লী-গ্রামের স্ত্রীলোকেরা দাঁতে মিসি পরেন কিন্তু সম্রাট-মহিষীর অনুকরণে নাগরিক ভদ্র মহি-লারা উহা ছাড়িয়াছেন। মহিলাগণ মুখে পাউডার ও অধরে লাল রং দিয়া থাকেন, কিন্তু বিবাহের পর ভ্রূ কামাইবার প্রবৃত্তি ইঁহাদের কোথা হইতে আসিল, বুঝা যায়না।"

"জাপানীরা আমাদের মত মাছ ভাত খাইয়া জীবন যাপন করেন, কিন্তু দুগ্ধ ঘৃতের ব্যবহার জানেন না। উঁহারা ভোজনকে

আমাদের মত "ভাত খাওয়া" বলেন ও "ধূম-পান" শব্দ ব্যবহার করেন। আগন্তুকের অভ্যর্থনায় তামাক ব্যবহৃত হয়। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ গ্রীষ্মকালে কেবল কটিদেশ টুকু আচ্ছাদন করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগকে "গৃহ-লক্ষ্মী" আখ্যা দেওয়া হয়। ছয় বৎসর ছয়মাস ছয় দিনে শিশুর বিদ্যারম্ভ হয়। দুই জানুতে দুই হাত রাখিয়া নমস্কার ও ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম জাপানে প্রচলিত। শিশুগণ গৃহ-ত্যাগের সময় অনুমতি গ্রহণান্তর মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া থাকে। গৃহিণী গৃহে প্রত্যাগমন করিলে চাকর বাকর ও সন্তানগণ দরজায় গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। জন্মের পর সপ্তমদিবসে শিশুর নামকরণ হয়; এক মাসের পর শিরমুণ্ডনান্তে স্নান করাইয়া সুন্দর বেশভূষা করতঃ মাতা শিশুকে স্থানীয় মন্দিরে লইয়া গিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করেন। (আমাদের ষষ্ঠী ও ষেটেরা পূজার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে) তিনবৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের মস্তক মুণ্ডিত থাকে এবং পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তনপান করিতে দেওয়া হয়।"

জাপানে এখন পরিবর্ত্তনের যুগ চলিতেছে, পরিণাম কোথায়, কেহ জানে না। জাপানী বড়লোক গুলির অনেকের পত্নী ইউরোপীয় সভ্যতা সহ সুপরিচিতা। রুষ-জাপান-যুদ্ধ-জয়ী ফিল্ডমার্শাল মার্কুইস ওয়ামার সহধর্ম্মিণী আমাদের তরুদত্তের ন্যায় বালিকা বয়সেই ফ্রান্সে এবং দ্বাদশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম কালে আমেরিকায় প্রেরিতা হন। বলা বাহুল্য, ইনি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিতা এবং বিলাতী আদব কায়দায় অভিজ্ঞা। ইনি এবং ইঁহার একজন সঙ্গিনী জাপানী বালিকা তিন বৎসর জাপানী ভাষায় কথোপকথন প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বলিতেন, উহা বড় ক্লেশকর। একবার কোন বাইবেল পাঠার্থিনীর দলে নাম লিখাইতে সম্মতা আছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে, কোন সঙ্গিনীকে তিনি বলিয়াছিলেন, উহারা হয়ত আমাদিগকে হিদেন্ চাইনিজ মনে করে, তাই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। এই সমস্ত নব্যা জাপানী রমণীকুলকে বিবাহ বিভ্রাটের বিলাসিনী 'কারফরমার' সহিত সর্ব্বাংশে অভিন্না মনে করিলে কিন্তু আমাদের বিষম ভ্রম করা হইবে। যাহা হউক, অনেকটা যে সাদৃশ্য আছে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এইখানে এক শ্রেণীর জাপানী রমণীর উল্লেখ আবশ্যক। আমাদের যেমন ক্ষত্রিয় সমাজ, জাপানের সেইরূপ সামুরাই শ্রেণী। বিস্ময়ের বিষয় এই, রাজপুত রমণীগণের সহিত সামুরাই রমণীরও অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রাচীনকালে সামুরাই রমণীগণও তাঁহাদের পতির ন্যায় যুদ্ধ-নিপুণা ছিলেন। ভারতের চাঁদবিবি, লক্ষ্মীবাই ও বহু বহু রাজপুত রমণী শত্রুসহ যুদ্ধে একাধিকবার অবতীর্ণা হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে সামুরাইগণ এক এক জন ডাইমিয়ো বা সামন্তের ভৃত্য বা অনুচর মাত্র ছিলেন। ইঁহাদের পত্নীগণও প্রভু পত্নীদের দাসীবৃত্তি করা শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেন। সামুরাই জাতি ডাইমিয়ো প্রভুসহ যুদ্ধে যাইলে, প্রভুপত্নীর রক্ষাভার এই সব বীর-নারীর উপর পতিত হইত। ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে যে কালুডোমের পত্নী "লখ্যা" কে এইরূপ প্রভু লাউসেনের অনুপস্থিতি-কালে তাঁহার সংসার রক্ষা জন্য শত্রুসহ সমরে অবতীর্ণা হইতে হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থেই রাজকন্যা কানাড়ার দাসী "ধুমসি" কেও রণনিপুণা রূপে চিত্রিত করা হই-

য়াছে। শুনা যায়, ডাকাত পড়িলে অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে খাঁড়া হাতে করিয়া ভবানীর ন্যায় দস্যুদলনীরূপে দণ্ডায়মানা হইতেন এবং অনেকস্থলে ডাকাতের কাছে পূজাও পাইয়াছেন। এই সব বীরনারী স্বভাবতঃ একটু স্বাধীন প্রকৃতি বিশিষ্টা। উঁহাদের সংসর্গে আসিয়া এবং প্রতীচ্য আদর্শের প্রভাবে কালে হয়ত জাপানী মহিলাকুল জাপানী পুরুষের এত অধিক পদানত থাকিবে না।

পূর্ব্ব লিখিত কথা হইতে সহজেই মনে হইবে, জাপানী কুলনারী অসূর্য্যম্পশ্যা না হইলে অন্তঃপুরচারিণী বটেন। সর্ব্বসমাজেই পুরুষ ও রমণী একত্র আমোদ প্রমোদ জন্য ব্যগ্র এবং কলা বিদ্যার চর্চ্চায় কাহারই বা মন আসক্ত না হয়। দেব-মন্দিরের অপ্সরা-কুলের ন্যায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের "গেহী" শ্রেণীর নটীকুলের ন্যায়, জাপানী "গেইসা" নৃত্যগীতাদির চর্চ্চায় জীবন-যাপন করে। পুরুষের মন ভুলান কুলনারীর ব্যবসা নহে, কিন্তু উহাই গেইসার বৃত্তি এবং এবিষয়ে ইঁহারা সিদ্ধহস্তা। শৈশব হইতেই ইঁহাদিগকে সুরসিকা, উত্তর-প্রত্যুত্তর-নিপুণা এবং সাহিত্য কাব্যাদির পাঠনা দ্বারা ইঁহাদের রুচি মার্জ্জিত করা হয়। অল্প বয়স হইতেই ইহাদিগকে প্রযত্ন সহকারে নৃত্য গীত ও অন্য নানাবিধ কলা নিপুণা করা হয়। এই সকল জাপানী নটী প্রায়ই নীচকুলোদ্ভবা। তথাপি বহু সম্ভ্রান্ত জাপানী পুরুষ ইহাদের সঙ্গলাভ জন্য লালায়িত। প্রধানতঃ মার্জ্জিত রুচি ও প্রকৃতি এবং সরস কথা বার্ত্তার গুণেই ইঁহারা ঐ সমস্ত ভদ্র জাপানীগণের মনোহরণে সমর্থা হন। রূপ কিছু চির কাল থাকে না। আমাদের "বাইজি" গণের ন্যায় ভাল গাইসার সহিত আলাপ সুখভোগ ধনী ব্যক্তিদেরই অদৃষ্টে ঘটে। ভ্রমণকারিগণ যে সব গাইসার উল্লেখ করেন, তাহারা প্রায়ই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। "গেইসা" চিরকাল স্বাধীনা, অর্থ দিলেই কাহারও ক্রীতদাসী হয় না। ভারতে কামরূপের মহিলাগণ যেমন যাদুমন্ত্র বলে পুরুষকে ভেড়া করিতে পারেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে বা এক সময় ছিল, জাপানী গেইসাও সেইরূপ পুরুষকে নাকে দড়ি দিয়া চালাইতে চিরনিপুণা। রূপ এজন্য তাহার প্রধান সম্বল নহে; হৃদয়ে তুষানল জ্বলিলেও বাহিরে সহাস্যমুখে ও প্রফুল্লভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা সরস কথোপকথনাদির সাহায্যে অপরের মনোহরণ চেষ্টায় অভ্যস্থা বলিয়াই সে সাধারণতঃ এরূপ করিতে সমর্থা হয়। গাইসা হইলেই যে হীনচরিত্রা হইবে, এমন কোন কথা নাই। অনেক গেইসা শেষে বড় বড় বংশে বিবাহিতা হইয়াছে। এ বিষয়ে মৃচ্ছকটিক যুগের বসন্তসেনা ভারতীয় গেইসার একটা নমুনারূপে উল্লিখিত হইতে পারে।

পুস্তকাদিতে লিখিত না থাকিলেও জাপানী চরিত্রের এই এক দুর্ব্বলতা আমরা বুঝিতে পারি। এই দুর্ব্বলতার অতি বৃদ্ধি ফলে নবাব বাদসাহের দল উৎসন্নে গিয়াছে। ইয়ুরোপমধ্যে ফ্রান্সের এ বিষয়ে একটু দুর্নাম শুনা যায়। এক সময়,—নিধু বাবু প্রভৃতির টপ্পা রচনার যুগে—এ দেশেই ধনী ব্যক্তিগণ সন্তানগণকে অম্লানবদনে শিক্ষা সমাপ্তি জন্য ঐ সব রাক্ষসী যাদুকরীর হাতে সপিঁয়া দিতেন, শুনা যায়। এখন আমাদের এ ভাব প্রায় কাটিয়াছে। ইয়ুরোপীয় সংসর্গে আসিয়া জাপানের এ সম্বন্ধে উন্নতি হয় নাই। "গেইসা" ত আবহমানকাল হইতেই আছে, অধিকন্তু হোটেল প্রভৃতি এখন সেবিকা

কুলেই প্রায় পূর্ণ থাকে; সেবকের তেমন আদর নাই। ইহার জন্য প্রতীচ্য সভ্যতা দায়ী কিনা বলা কঠিন। ব্রহ্মদেশে যেমন স্ত্রীস্বাধীনতা দৃষ্ট হয়, জগতে কোথাও তেমন নাই। উহা কিন্তু প্রতীচ্য সংসর্গের ফল নহে। পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন বলেন "ইয়াকোহমা" নগরে বিস্তর "চায়া" বা চা পানের আড্ডা আছে, ঐ সকল দোকান স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা রক্ষিত; সে গুলির নীতি বড় বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না। এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিৎ ব্যাপার "জন্‌কিনো"নৃত্য। একটী স্ত্রীলোক বসিয়া সেতারের ন্যায় যন্ত্র বাজান, তিন জন নৃত্য করেন; নটীগণ নৃত্য কালে ক্রমে বস্ত্রাদি বিরহিত হইয়া সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় উপস্থিত হন।" ইয়ুরোপীয় সার্কাস বা থিয়েটারের অভিনেত্রীকুলেরও ইহার এক পরদা উপরে যায়।

জাপানরাজ প্রকৃতিপুঞ্জের নৈতিক উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। রাজধানী টোকিওতে "বারাঙ্গনাগণের জন্য গাক্কিরো নামক একটী স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট; উহাদের নিকট রাজকর আদায় করিয়া অনুমতি পত্র (উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা লিখিত "ফণ্ডা" বা টিকিট) প্রদত্ত হইয়া থাকে। উক্ত চতুষ্কোণ পল্লী পরিখা দ্বারা বেষ্টিত, তাহার এ পারে ব্যবসা চালাইলে রাজদ্বারে কঠিন দণ্ডভোগ করিতে হয়।" (ভূপ্রদক্ষিণ. ৭৪২ পৃষ্ঠা)। গেইসাগণও এ নিয়মের অধীন কিনা, চন্দ্রশেখর বাবু বলেন নাই।

জাপানী রমণী, পুত্র না হইলে, অনেক সময়, বংশের নামরক্ষার্থ জেদ করিয়া পতিকে অন্যা স্ত্রী গ্রহণে প্রণোদিত করিয়াছে। এ প্রথা আজ কাল পরিত্যক্ত হইতেছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ কারণে অনেকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং পত্নীও পতিকে সেরূপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, শুনা যায়। যাহা হউক, জাপানে বোধ হয় ঐ শেষোক্ত রমণী অবিবাহিতাবস্থাতেই থাকিতেন। ভারতে সুপ্রাচীন কালে যেমন দেবযানীর সহিত শর্ম্মিষ্ঠাও যযাতীর ঘর করিতে আসিয়াছিলেন, তদ্রূপ, শুনিয়াছি, এখনও পশ্চিমে অনেকে সখী সমভিব্যাহারে পতিগৃহে যান। বহুবিবাহ অপেক্ষাও অনেক স্থলে এ প্রথার বিষময় ফল ফলে। যাহা হউক, সম্প্রতি জাপানে আইন হইয়া গিয়াছে, দাসীপুত্র অর্থাৎ বিবাহিতা রমণীর গর্ভসম্ভূত বিনা অন্য পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। আশা করা যাউক, জাপানে কালে এ নিন্দনীয় প্রথার তিরোভাব ঘটিবে।

আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা ক্রমে বাড়িতেছে। জাপানে ইহা আরও দ্রুতভাবে হইতেছে। ভূপ্রদক্ষিণ-লেখক দেখিয়া আসিয়াছেন তথায় বালক বালিকা বিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন করিতেছে। জনৈক সাহেব ভ্রমণকারী বলেন ('Round the world on wheels" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য) তথায় কোন স্কুলে বালিকাদের সম্মুখে তাঁহাকে একবার বক্তৃতা অবধি দিতে হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশটী জাপানী বালিকা, বয়স বার হইতে কুড়ির ভিতর, মেঝের উপর অর্দ্ধ বৃত্তাকারে উপবেশন করিল এবং তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিল। সাহেব বলেন, ইহারা চঞ্চলা ইংরাজ বালিকার মত একটুতেই হাসে না, ছোট ছোট হাতগুলি কোলের উপর রাখিয়া বেশ স্থির ভাবে বসিয়াছিল; সাহেবের পাশে একজন কৃশাঙ্গী জাপানী সুন্দরী দাঁড়াইয়াছিলেন। ইনি বেশ ইংরাজীতে ব্যুৎপন্না। সাহেব যাহা বলিলেন,

স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রোত্রীবর্গকে শুনাইলেন।

শিক্ষা ফলে বহুবিধ ভাব ও সংস্কার গ্রহণে চিত্তের একটা সামর্থ্য জন্মে। শিক্ষিতের অনেক আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ, এমন কি কথা অবধি, অশিক্ষিত অনেক সময় বুঝিতে পারে না। সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ভারতবাসীর দুর্ব্বলতা এই জন্য। যাহা হউক, লেখা পড়ার শরণ না লইয়াও, অন্যের উপদেশ শুনিয়া ও দৃষ্টান্ত দেখিয়া অশিক্ষিত অনেক সময় শিক্ষার ফলভোগ করে। বর্ত্তমান কালের স্বদেশী আন্দোলন তাহার প্রমাণ। অশিক্ষিতা প্রাচীনা রমণী ও গাড়ীর গাড়োয়ান অবধি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারকারীকে তিরস্কার করিয়াছে ও বিলাতী আওতায় আমাদের যে সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছেন, তাহা যে অল্পে অল্পে অনুভব করিতেছে। প্রাচীন যুগে যে সমস্ত রাজপুত বা স্পার্টান রমণী যুদ্ধে পাঠাইবার পূর্ব্বে, সন্তানগণকে হয় যুদ্ধে বিজয়ী হইতে, নতুবা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিতে উপদেশ দিতেন, তাঁহারা যে খুব লেখা পড়া জানিতেন, প্রমাণ নাই। ফলতঃ লেখা পড়ায়, শিক্ষার বা চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা হয় মাত্র, কিন্তু লেখা পড়া বিনাও তাহা অসম্ভব নহে। একজন পড়িলে যদি দশজন শুনে ও অর্থ বোধ করে, তাহা হইলে দশ জনেরই পড়িবার কাজ হয়। আমাদের রমণীগণ অনেকেই লেখা পড়া জানেন না বটে, কিন্তু তজ্জন্য যে তাঁহারা অশিক্ষিতা, ভাবিলে একটু ভুল করা হইবে। জাপানী মহিলা সম্বন্ধেও কেহ কেহ এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করিতে পারেন। উহারা সকলেই অন্তঃসারহীনা, ও পুরুষের একটা চিত্ত বিনোদনের সামগ্রী মাত্র নহেন। জাপানী গেইসা জাপানী রমণীর নমুনা নহে। এই রুষযুদ্ধে দেখা গিয়াছে, জাপানী সতী, পতির মৃত্যু-সংবাদ পাইলে বুকে ছুরি মারিয়া সহমরণে যাইতে সক্ষম। প্রাচীন কালে রাজপুত রমণী যেমন জহরব্রত পালন আবশ্যক হইলে, জ্বলন্ত চিতায় দেহত্যাগ করিয়া পতিকে নিরুদ্বেগে যুদ্ধে যাইতে সাহায্য করিতেন, আজ জাপানেও সেইরূপ অনেক সতী পূর্ব্বাহ্নে আত্মহত্যা করিয়া পতিকে সংসারের মায়া কাটাইতে সাহায্য করিয়াছেন। জাপানী জননী পুত্রের মৃতুসংবাদ শুনিয়াও বলিতে পারিয়াছে, তাহার গর্ভের সন্তান তবু দেশের একটা কাজে লাগিল। লেখা পড়া জানা থাকুক বা না থাকুক, সমাজের উপর এই সব রমণীর প্রভাব কিছুতেই নগণ্য নহে।

জাপানী মহিলা সম্বন্ধে একরূপ বলা হইল। অতঃপর যাঁহাদের নামের সহিত জাপানের বর্ত্তমান অভ্যুদয় একান্ত বিজড়িত, তাঁহাদের বিষয়ে কিছু বলা যাউক।

জাপানের উন্নতির প্রধান কারণ জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট। দেশোন্নতিকর প্রায় যাবতীয় অনুষ্ঠান রাজকীয় সাহায্যেই পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত। এবিষয়ে জাপান এখনও প্রতীচ্য দেশ সমূহের সমকক্ষ হয় নাই। সমবেত প্রজাশক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতির দিকে এখনও আমাদিগকে তাকাইতে হয়। দৃষ্টান্ত চারিদিকে; একদল ইংরাজ সওদাগর ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইল। আমাদের দেশের এই যে রেল ট্রাম বৈদ্যুতিক ও গ্যাসের আলো, কলের জল প্রভৃতি, এ সমস্তই উন্নত প্রজাশক্তির কীর্ত্তি পরিচয় (অবশ্য ভারতবাসীর নহে)। জাপানেও অনুরূপ উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু সে সমস্তই প্রধানতঃ

রাজকীয় সাহায্যের গুণে। যাঁহার গুণে জাপানের আজ এত অভ্যুদয়, জাপানীরা তাঁহাদের সেই সম্রাট্‌কে নররূপধারী দেবতা বোধে ভয় ভক্তি করেন। প্রতি বিদ্যালয়ে বালকগণকে নিরূপিত কালে যেমন কোন পর্ব্ব দিনে, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর চিত্র সম্মুখে প্রণাম বা অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। সম্রাটের নিন্দা কাহারও মুখে শ্রুত হয় না। তিনজন বা চারিজন ব্যতীত এমন জাপানী নাই, সম্রাটের সহিত কথোপকথন কালে, যাঁহার স্বর কম্পিত হয় না। প্রতি বৎসর ৩রা নভেম্বর তারিখে সম্রাট কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করেন। যেখানে তাঁহার চেয়ার বা আসন স্থাপিত হয়, নিমন্ত্রিতবর্গ মধ্যে যাঁহারা সেকেলে ধরণের লোক, তাঁহারা তথাকার মৃত্তিকা সমাদরে গৃহে লইয়া যান, এবং বিশ্বাস করেন, সমুদয় ব্যাধি তাহাতে প্রশমিত হয়। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ পদরজঃ, গঙ্গা বা বৃন্দাবনের মাটীর ঐরূপ মান। ঘোষপাড়ার মেলায় দেখিয়াছি, একটা নির্দ্দিষ্ট স্থল হইতে মাটী লইয়া লইয়া উপাসকগণ প্রায় খানা খুড়িয়া ফেলিয়াছে। একাধিক অতিথি সম্রাটপ্রদত্ত ভোজ্যাদি আহার না করিয়া পরম পবিত্র জ্ঞানে গৃহে আনিয়া রক্ষা করেন। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে; আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ ঐরূপে রক্ষা করি। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দ অবধি এবং ইহার পরেও, কোন প্রজাই সম্রাটের মুখাবলোকনে সাহসী হইত না এবং সম্রাটও প্রাসাদ মধ্যে লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার সেবকগণও তাঁহার পৃষ্ঠদেশ মাত্র দর্শন করিয়া থাকেন। এখনও রাজ পথ দিয়া সম্রাটের অশ্বযান যাইবার সময়, তাঁহার মুখ দর্শন করা সাধারণ লোকে অনুচিত মনে করে। সৈন্যগণের তাঁহার উপর অনুরাগ ও ভক্তি অপরিসীম। মৃত্যুকালেও তাহারা সম্রাটের দীর্ঘায়ু কামনা করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

সিংহাসনাধিরোহণের পূর্ব্বেই সম্রাট, যে সমস্ত জাপানী বিদেশ বেড়াইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরেই, জাপানের উন্নতি সাধন জন্য শাসন ব্যাপারের কিরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, নিরূপণার্থ অনেক গুলি জাপানীকে বিদেশে পাঠাইয়া দেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত। দেশে প্রত্যাগত হইলে উহাঁদিগকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ইনি প্রায় উঁহাদের অর্জ্জিত সমস্ত জ্ঞানেই বিশারদ হইয়াছেন।

জাপান সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী প্রায়ই ইয়ুরোপীয় পরিচ্ছদেই সজ্জিত থাকেন। কখন কখন জাতীয় পরিচ্ছদেও অঙ্গ আবৃত করেন।

ফলতঃ যে সব শক্তি জাপানী সমাজকে দ্রুত বেগে উন্নতি মার্গে লইয়া যাইতেছে, উহাঁদের অনন্যসাধারণ রাজভক্তি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আমরা মনে মনে জিজ্ঞাসা করি, প্রতীচ্য সংসর্গে আসিবার পরও এ ভাবটা কি বিদ্যমান থাকিবে? তখন বোধ হয় দেশভক্তি, রাজভক্তির স্থল অধিকার করিবে। কাহারও কাহারও মতে, রাজভক্তিই বর্ত্তমানকালে জাপানীদের জাগ্রত ধর্ম্ম বিশ্বাসের স্থল অধিকার করিয়াছে।

মিকাডো সর্ব্বসমেত ষোলটী বিবাহে অধিকারী। (বহু বিবাহ বোধ করি প্রাচ্য প্রকৃতির একটা লক্ষণ; আমাদের দেশী রাজা, কুলীনদের সম্মান দেখাইবার অন্যান্য মধ্যে

একটা পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন; যাহা হউক; এরূপ সমাজেও শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় একপত্নীক আদর্শ পুরুষের অভাব ছিল না)। উচ্চবংশীয় সামন্ত মণ্ডলীর মধ্য হইতেই কন্যা নির্ব্বাচন প্রচলিত প্রথা। প্রধানা মহিষী, পাটরাণী বা সম্রাজ্ঞীরূপে সম্মানিতা হন। সম্রাজ্ঞীর পুত্র না হইলে অন্য পত্নীর গর্ভজাত তনয়ও উত্তরাধিকারী হইতে পারে। বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞীর অপত্যলাভ সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায়, মিকাডোর অন্য পত্নী-গর্ভজাত তনয়কেই যুবরাজরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে এবং সম্রাজ্ঞী ইহাঁর বিমাতা হইলেও, ইহাঁকে স্বগর্ভজাত তনয়ের ন্যায় স্নেহ করেন।

মার্কুইস ইটো।

মার্কুইস ইটো জাপানকে ইয়ুরোপীয় সভ্যতায় সভ্য করিতে অভিলাষী। যথা, জাতিভেদ ঘুচাইয়া, প্রজাতন্ত্র শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া, দেশে ইয়ুরোপীয় রাজবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান ও ইয়ুরোপীয় শিক্ষা বিস্তার করিয়া, জাপানকে উন্নত করা ইহাঁর অভিলাষ।

মার্কুইস ইয়ামাগাটা।

মার্কুইস ইয়ামাগাটা এত পরিবর্ত্তনের বিরোধী। তাঁহার প্রাণ শুধু জাপানের সামরিক শক্তির উন্নতি সাধনে। তাঁহার বিবেচনায়, ইহাই জাপানের একমাত্র অভাব। এজন্য তিনি ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির বড় বড় রণ পণ্ডিতের যথেষ্ট সাহায্য লাভে সক্ষম হইয়াছেন। ফিল্ড-মার্শাল ওয়ানা ইহাঁর প্রিয় শিষ্য। রুষ জাপান যুদ্ধে শিষ্যের কৃতিত্ব হইতে গুরুর পরিচয় অনেকটা পাইতে পারি। রুশিয়ার বর্ত্তমান জার ২য় নিকোলাসের অভিষেক কালে ইনি উপস্থিত ছিলেন। তখন অনেকে ইহাঁকে সমরশাস্ত্রে সুপণ্ডিতরূপে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। "ইটো"ও জাপানের নৌবল বৃদ্ধি জন্য চেষ্ট পাইয়া ইয়ামাগাটার উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করিয়াছেন।

কাউণ্ট মাৎসুকাটা।

কাউণ্ট মাৎসুকাটা জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থ-নীতি-বিৎ। এই বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন জন্যই তাঁহার বিদেশ ভ্রমণ। ইহাঁর যত্ন কৃষি শিল্পাদির উন্নতি সাধনে। দেশের ভূমিকরের সংস্কার সাধন, স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন প্রভৃতি কয়েকটী কার্য্যে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কাউণ্ট ইনুই।

কাউণ্ট ইনুই প্রকৃতিতে কতকটা কাউণ্ট মাৎসুকাটার ন্যায়। জাপানের আর্থিক উন্নতিসাধন ইহাঁর লক্ষ্য। জাপানের অবস্থা যে আর্থিক হিসাবে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণাদি সংগ্রহে ইনি এখন রত।

কাউণ্ট ওকুমা।

জাপানীরা প্রায় সকলেই সদ্বক্তা। কাউণ্ট ওকুমা আবার ইহাঁদের মধ্যে বাগ্মিতা জন্য প্রসিদ্ধ। রুশিয়ার ন্যায় জাপানেও বোধ হয় নিহিলিষ্ট ঢুকিয়াছে। ওকুমা যে নীতির সমর্থক, তাহার বিপক্ষ পক্ষীয় একজন একদা তাঁহার অশ্বযানের নীচে বোমা ফেলিয়া দেয়। তৎফলে তাঁহার অনুচর ও অশ্ব নিহত হয় এবং নিজেরও পা দুখানি নানা স্থানে ভগ্ন হয়। তাঁহার একটী পা এখন কাঠের। দেশে শিক্ষার বিস্তার ইহাঁর জীবন-ব্রত। নিজে প্রাচ্যভাব-পূর্ণ হইলেও, প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারের ইনি বিষম পক্ষপাতী। ইয়ামাগাটা জাপানিগণের সামরিক বল বর্দ্ধনে যাহা করিয়াছেন, ইটো তাঁহাদিগকে প্রতীচ্য শাসন নীতি সহ পরিচিত

করিতে যাহা করিয়াছেন, ও কুমা উঁহাদিগকে শিক্ষিত করিবার সেইরূপ ভার লইয়াছেন। তিনি নিজে অনেকগুলি বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন এবং গবর্ণমেণ্টকেও এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ মনোযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারই গুণে আজ জাপানে নিরক্ষর বালক নাই বলিলে হয়। জাপানের ভবিষ্যতের উপর ইঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ইনি এতদূর বলেন যে, শুধু শিক্ষার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই জাপানিগণ জগতে ইংরাজ ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান, অথবা যে কোন জাতির সমকক্ষ অথবা তাঁহাদের অপেক্ষাও উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হইবে। ইনি কখনও বিদেশ যান নাই। ইঁহার বিশ্বাস, রাজ্যের কল্যাণ সাধন ইচ্ছা থাকিলে, রাজকার্য্যে দোষ দেখিবারও একদল লোকের প্রয়োজন। ইনি সেই দলের নেতা। যাহারা জানে না, তাহারা উঁহাকে সহসা শত্রু মনে করিতে পারে, কারণ জাপান এখনও রাজকার্য্যের সমালোচনা শ্রবণে অভ্যস্ত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিপক্ষের কোপে পড়িয়া উঁহাকে একখানি পা হারাইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রাজকার্য্য নির্দ্দোষ করিবার চেষ্টা হইতেই, দোষ বাহির করিবার চেষ্টা, অন্যথা রাজার প্রতিকূলাচরণ মাত্র লক্ষ্য নহে। কাউণ্ট ওকুমা সরস্বতী দেবীর উপাসনা অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারই জীবনের সার ভাবিলেও, দেবী কমলার কৃপায়ও বঞ্চিত নহেন। ইঁহার অগাধ সম্পত্তি, নিজে কিন্তু নির্লোভ পুরুষ। সংবাদ পত্রের পরিচালনে, এবং বিদ্যালয় সমূহের প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ সাধনেই ইঁহার অর্থ প্রধানতঃ ব্যয়িত হয়। লোকে ইঁহাকে জাপানের "আণ্ড্, কার্ণেজি নামে অভিহিত করেন। আণ্ড্, কার্ণেজি স্কটলণ্ডবাসী। আমেরিকায় থাকিয়া ৭৫ কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি পরিজনবর্গকে এই অর্থের উত্তরাধিকারী না করিয়া মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার ঐ বিপুল বিভব সমস্তই মানব জাতির হিতার্থ ব্যয় করিয়া হাতের সুখ করিয়া যাইবেন সংকল্প করিয়াছেন। যাঁহাদের সমাজে হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, বলী প্রভৃতির ইতিহাস সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহারা ঐ সব মহানুভব ব্যক্তির জন্ম শ্রবণে মনে করিতে পারেন, জগতে আবার বুঝি সেই পৌরাণিক যুগ ফিরিয়া আসিতেছে।

### ব্যারণ শিবুসাওয়া।

ব্যারণ শিবুসাওয়া, কাউণ্ট মাৎসুকাটার ন্যায় অর্থনীতিবিৎ রাজপুরুষ না হইলেও, অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রগাঢ় অভিজ্ঞ জাপানী পুরুষ বটে। জাপানের বাণিজ্যের ও ব্যাঙ্কগুলির ইনি মেরুদণ্ডরূপে তুলিত হন। প্রায় পঞ্চাশটী ব্যবসায়ী সমিতির ইনি ডিরেক্টার এবং প্রায় ১৫০টী ব্যবসায়ে স্বয়ং লিপ্ত। প্রথম বয়সে রাজ কর্ম্মচারীরূপে ইনি দেশের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহে ক্রমশঃ উচ্চতর পদলাভ করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা সে সমস্ত ছাড়িয়া ব্যবসায়াদিতে মন দিলেন। জাপানে বৈশ্যবর্ণ নীচ জাতি মধ্যে পরিগণিত। ব্যারণের বিশ্বাস, হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর দারিদ্র্য মোচনের নামই দেশোন্নতি। তাই ইনি ব্যক্তিগত মান অপমান তুচ্ছ করিয়া দেশের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধনে মন দিলেন। এই শক্তিশালী পুরুষ ব্যবসায়ীর দলে মিশিয়া ঘৃণিত হইবার পরিবর্ত্তে স্বীয় প্রতিভা বলে ব্যবসায়ী কুলকে সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। জাপানের রেলওয়ে ও অর্ণবপোতের শ্রীবৃদ্ধির ইনিই মূল। আমরাও সম্প্রতি দেশের দারিদ্র্য মোচনই প্রথম ও

প্রধান কর্ত্তব্য ভাবিতে শিখিয়াছি। যে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের উপর লক্ষ্মীর কৃপা অচলা, বা যে পার্শি সম্প্রদায়ে তাতার ন্যায় ব্যক্তি জন্মাইতে পারেন, তাঁহাদের মাঝ হইতে ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে ব্যারণ শিবুসাওয়ার ন্যায় কেহ কি বাহির হইবেন না? অন্যথা আমাদিগকে সকলে মিলিয়া সুচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া সমবেত আরাধনা ফলে আমাদের মাঝে একজন সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষের আবির্ভাব করাইতে হইবে।

ব্যারণ সুয়েমাৎসু।

ব্যারণ সুয়েমাৎসু আজ কাল য়ুরোপে থাকিয়া সংবাদ পত্রাদিতে লিখিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে জাপান সহ পরিচিত করিতেছেন। পীতাতঙ্কের প্রশমন উদ্দেশ্যে ইনি বলেন, জাপান ও চীনে সদ্ভাব কোন কালে সম্ভবপর নহে। উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য তাহার কারণ। ইয়ুরোপের নিকট হইতে জাপানীরা পার্থিব উন্নতির মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে, উহারা পুনরায় অসভ্য হইবে না। বিজ্ঞানানুশীলন ফলে উঁহারা এখন উঁহাদের গুরুস্থলীয় ইয়ুরোপীয়দের অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইবেন, পিছাইয়া আর পড়িবেন না। একবার বৈদ্যুতিক আলোকের সন্ধান পাইবার পর, বাতি কিম্বা তেলের আলোতে মন মজা সম্ভবপর নহে। রেলওয়ে যোগে ভ্রমণের পর পদব্রজে বা পুরাতন যানাদিতে ভ্রমণের দিন পুনরায় আসিতে পারে না। টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া সংবাদাদি প্রেরণ জন্য জাপানে আর বার্ত্তাবহ নিযুক্ত হইবে না। মনোরাজ্যেও এইরূপ ইয়ুরোপীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর জাপান আর পুরাতন মন্ত্রে দীক্ষা লইতে পারে না। ইনি যেন একটু অতি মাত্রায় ইউরোপ-ভক্ত।

ভাইকাউণ্ট হায়াসি।

ভাই কাউণ্ট হায়াসি জাপানের রাজদূত রূপে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন। কোন কোন ভারত-সন্তানের ন্যায় আচার ব্যবহারে ইনি পূর্ণ ইংরাজ। ইংলণ্ডে ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। বহু সভাতেই সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। হেগ নগরীর শান্তি সভায় ইনি জাপানের প্রধান প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং রুষজারের ইনি একজন বন্ধুরূপে গণ্য। ইংলণ্ডে ইঁহার আবাস বাটী বিলাতি প্রথায় সজ্জিত হইলেও, সপ্তাহে একরাত্রি এবং প্রতি মাসে এক দিন প্রবাসী জাপানী বন্ধু বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া জাপানী প্রথায় চা পান ও আহারাদি করেন।

দেশের কথা বিদেশে বলিবার জন্য, বা বিদেশের তত্ত্ব দেশবাসীকে জানাইতে কতকগুলি লোক থাকায় অলাভ নাই, কিন্তু কতকগুলা মাত্র হইলেই কাজ চলে, বহু লোকের আবশ্যক নাই। আর যদিই এ বিষয়টায় সর্ব্ব সাধারণের মনোযোগ অত্যাবশ্যক হয়, বাঙ্গালী এ সম্বন্ধে বড় পিছাইয়া নাই, কিন্তু মনোযোগ দিলেও এঅধীন জাতি যে বিশেষ কোন ফললাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ।

জেনারেল ভাইকাউণ্টকাটসুরা

জেনারেল ভাইকাউণ্ট কাটসুরা সম্রাট কর্ত্তৃক জাপানের সামরিক সংস্কার সাধনার্থ জার্ম্মানিতে প্রেরিত হন। তখন তিনি একজন নিম্নশ্রেণীর অফিসার মাত্র। ইঁহার ন্যায় মহাপুরুষদের প্রতিভা গুণেই জাপানী সামরিক বিভাগ জগতে আজ এত উন্নত। গত চীন জাপান যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইবার পর ইনি বর্ত্তমান ভাইকাউণ্ট ও জেনারেল পদবী লাভ করেন।

ফিল্ড মার্শাল মার্কুস ওয়ামা।

রুশ জাপান যুদ্ধে ওয়ামার যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইঁহাকে সেকেলে ধরণের একজন রণবৃদ্ধ সেনাপতিরূপে প্রতীয়মান হয়। ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ সমালোচকগণের মতে, এই যুদ্ধে নূতন ব্যুহাদির উদ্ভাবন বা নূতন কৌশলে যুদ্ধ করিয়া কোনরূপ প্রতিভার পরিচয় ইনি কিছু দেখান নাই। যাহা হউক, পুরাতন চালে চলিয়াই বিশাল সৈন্য বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনে এবং জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত সমরে জয়লাভে ইনি একাধিকবার সমর্থ হইয়াছেন। ৬২ বৎসরের বৃদ্ধ ওয়ামা এবং ততোধিক বৃদ্ধ ফিল্ড মার্শাল ইয়ামাগাটা সম্রাটের দক্ষিণ ও বাম হস্ত রূপে কল্পিত এবং উঁহার বন্ধু শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত।

ওয়ামা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় বাল্য হইতে বিদেশে শিক্ষিত। ইনি একটু ফরাসি ভক্ত। ফ্রাঙ্কো জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইনি পারিসে ছিলেন এবং উহার পরিণাম দেখিয়া দুঃখিত হন। জাপানে ফিরিয়া আসিয়াই সৈন্য বিভাগে একটা অফিসারের পদ পান এবং ১৮৭৭ সালের গৃহ বিবাদের সময় দু একটা কঠিন যুদ্ধে নৈপুণ্য দেখাইতে হয়। গৃহ বিবাদের অবসান হইবা মাত্র ইয়ামাগাটার সংকল্পিত সামরিক সংস্কারের সাহায্যার্থ পুনরায় ইউরোপে প্রেরিত হন। ইয়ামাগাটা ইঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। চীন জাপান যুদ্ধ কালে ইনি যুদ্ধ-মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় সৈন্যদলের অধিনায়করূপে মাঞ্চুরিয়া গমন করেন এবং পোর্ট আর্থার জয় করেন। এবারকার রুশ যুদ্ধেও উঁহারই একজন সেনাপতি নোগী, পুনরায় পোর্ট আর্থার জয়ে সক্ষম হইয়াছেন।

ওয়ামা, কোডামা এবং ফুকুশিমা এই তিন জন জেনারেল মিলিয়া বর্ত্তমান রুশ জাপান যুদ্ধ চালাইয়াছেন। ফুকুশিমা এবং কোডামার গুণেই সৈন্যবিভাগে এত সুশৃঙ্খলা। পরিবেশকের দোষের ন্যায় আয়োজন এবং সুশৃঙ্খলার অভাবেও অনেক বড় বড় যজ্ঞ পণ্ড হয়।

স্থলে পূর্ব্বোক্ত মহারথিগণ ব্যতীত নোগী, নোজু, কুরোকি, ওকু প্রভৃতি এবং জলে টোগো, কামিমুরা, উরিও, ইটো, ইনুই, ইয়ামোমোটো প্রভৃতি সমর-বিশারদ সেনাপতি নিচয় লাভ করিয়া জাপান-গবর্ণমেণ্ট আজ গৌরবান্বিত। জাপানী সমাজের উন্নতি আলোচনা কালে উহার উপর ইঁহাদের ব্যক্তিগত প্রভাব অবশ্য আলোচ্য। সর্ব্ব সমাজেই সাধারণ জনসমূহ, বড় লোকদের অনুকরণ করিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করে।

জাপানী সংবাদ পত্র

সংবাদপত্র পাঠ ফলে সমাজের মতি গতি যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়। জগতের কোথায় কি হইতেছে, জানিবার জন্য, কূপ-মণ্ডুক-ভাব কাটাইবার পক্ষে সংবাদপত্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠ উপায় দ্বিতীয় নাই। জাপানী সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সুতরাং জাপানী সংবাদ পত্রের ইতিহাস একটু আধটু পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে একখানিও সংবাদপত্র ছিলনা। জাপানের প্রথম সংবাদ পত্র, "বাটাভিয়া নিউস" নামক বৈদেশিক সংবাদপত্রের অনুবাদ মাত্র। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরই ইহার তিরোভাব হয়। তারপর প্রায় ৩৮ বৎসর হইল, কাঠের ব্লকে মুদ্রিত হইয়া একখানি জাপানী পত্রিকা আত্মপ্রকাশে চেষ্টা পায়। ইহার দুই জন

সম্পাদক ছিলেন। একজন কালিফোর্ণিয়ায় থাকিয়া একখানি আমেরিক কাগজ হইতে সংবাদাদি প্রেরণ করিতেন, অপর সম্পাদক সেই সব সংবাদ জাপানী ভাষায় অনূদিত করিয়া জাপানী পাঠকবর্গের গোচরে আনিতেন। এইরূপ ক্ষুদ্র সূত্রপাতের পর ক্রমশঃ জাপানে সংবাদ পত্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ছয় সাত বৎসর পূর্ব্ব অবধি সম্পাদক মহাশয়ের প্রবন্ধ ও মন্তব্য ব্যতীত সংবাদ-পত্রে আর কিছু থাকিত না। সংবাদ-দাতার প্রথা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সম্পাদকেরই আদেশ মত নির্দ্দিষ্ট পুলিশ ষ্টেশন বা নির্দ্দিষ্ট সমিতিতে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাঠাইতেন মাত্র, স্বাধীনভাবে কিছু করিতেন না। বর্ত্তমানে এক টোকিও সহরেই ২৫ * খানি সংবাদ পত্র আছে, অধিকাংশ পত্রই সচিত্র এবং প্রতীচ্য খণ্ডের দেখাদেখি স্ত্রীলোকগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। নারীমণ্ডলী মাঝ হইতে সংবাদ সংগ্রহ ব্যাপারে এবং রমণীকুলের মতামত প্রকাশে এইরূপে সহায়তা হইতেছে। হয় ত এই প্রথা ফলে ভবিষ্যতে জাপানী রমণীকুলের প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে। জাপানী সংবাদ পত্র সমূহের আর একটী বিশেষত্বঃ এই, জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হইলেও, উহার কতকাংশ ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। জাপানে প্রায় প্রতি বিদ্যালয়ে ইংরাজি অধীত হয়। ইংরাজি পাঠার্থীর সুবিধা জন্য এই ব্যবস্থা। ইহা যে শুধু প্রতীচ্য প্রীতির পরিচায়ক, কেহ যেন তাহা মনে না করেন। অন্যদেশ সম্বন্ধে তথ্যাদি অবগত হইতে, এখনও ইংরাজিই আমাদের প্রধান সম্বল। জাপান সম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধই তাহার প্রমাণ। ইংরাজগণ কিন্তু কোন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে, কোন্ ভাষার শরণ লয়? কোন একটা পুস্তকে—বোধ করি, গিরীশ বাবুরই কোন পুস্তকে ইংরাজের আত্ম নির্ভরতার পরিচায়ক একটী সুন্দর গল্প পাঠ করা গিয়াছিল। উষ্ট্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে, একদা ইংরাজ, ফরাসী ও জার্ম্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হন। ফরাসী তাঁহার পুস্তকাগারে আশ্রয় লইয়া উষ্ট্র সম্বন্ধে যাবতীয় ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা গুছাইয়া লিখিতে বসিলেন; জার্ম্মান অপরের চর্ব্বিত চর্ব্বণে বীতরাগ হইয়া, স্থানীয় পশুশালায় দিন রাত থাকিয়া উষ্ট্রের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; আর ইংরাজ একেবারেই উষ্ট্রের জন্মস্থান আফ্রিকা

১ "নব্য-জাপান" লেখক জাপানী সংবাদপত্রের ইতিহাস এইরূপ দিয়াছেন:—"১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে সংবাদ-পত্রের সংখ্যা ২০০। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে ৮১৪ এবং আজি কালি ১৩০০ খানিরও অধিক হইয়াছে। টোকিও হইতে প্রত্যহ ২০০ খানি পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক।"

"জাপানের মুদ্রাযন্ত্র বিধি অতীব কঠোর। রাজ্য সম্পর্কীয় কোন গুপ্তকথা প্রকাশ করিলেই সম্পাদক মহাশয়কে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই জন্য প্রত্যেক সংবাদপত্রের একজন করিয়া "কারা-সম্পাদক" থাকেন। তিনি প্রকৃত সম্পাদকের ভৃত্যরূপে অবস্থিতি করেন এবং প্রয়োজন হইলে অম্লান বদনে কারাগৃহে গমন করিয়া থাকেন। প্রতীচ্যখণ্ডে শুনা যায়, এক একজন "পালোয়ান সম্পাদকও রাখিতে হয়। তথায় সংবাদপত্রে কাহারও অপ্রিয় কিছু লিখিত হইলে পাঠক, সম্পাদককে ঠেঙ্গাইতে আসেন, তজ্জন্য এই ব্যবস্থা। আমেরিকায় একবার দুইজন উগ্র প্রকৃতির পাঠক, সম্পাদককে ঐরূপ শিক্ষা দিতে আসিয়া, পরস্পরকে সম্পাদক ভ্রমে মারামারিতে প্রবৃত্ত হন এবং নিজেরাই উত্তমরূপ শিক্ষিত হন। কৌশলী সম্পাদক উঁহাদের ঐ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া আগেই গা ঢাকা দিয়াছিলেন।"

বা আরব যাত্রা করিলেন। তথা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া উষ্ট্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবেন। আমাদের দেশে অতি ধীরে, সাহিত্যে এই আত্ম-নির্ভরতার ভাব প্রবেশ করিতেছে। এবিষয়ে পূর্ণমনোরথ হইতে এখনও বহু বিলম্ব। জাপানেরও বোধ হয় এ সম্বন্ধে অসহায়ভাব এখনও ঘুচে নাই, তাই অন্য উপায়াভাবে ইংরাজির শরণ লইয়াছে।

জাপানী সাহিত্য।

জাপানিগণ ৪০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে চৈন সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হইতে আরম্ভ করেন। অনুমান ৬০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম জাপানে প্রবেশলাভ করিয়া স্বীয় প্রভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকটা ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার করিতে থাকে। "কোজিকি" জাপানের প্রাচীনতম পুস্তক। জাপানের শিন্তো-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কাহিনী সমুদয় উহাতে লিখিত আছে। ৬৭০ খ্রীঃ অব্দের কিছু পরেই জাপানে বহু বিদ্যালয় এবং একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক ছাত্র ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে, গণিত, ইতিহাস, আইন ও চৈন সাহিত্য শিক্ষা করিত। সপ্তম শতাব্দী হইতেই জাপানী-কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নাটক লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু কাব্য বা নাটক কোনটারই উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি হয় নাই। আমাদের উদ্ভট শ্লোকসমূহের ধরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা মালাই উঁহাদের কাব্য। কাব্যের বিষয় প্রণয়, মদ্য, বিষাদ, পক্ষীর কলধ্বনি, পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ শুভ্র তুষার, ক্ষুদ্রকায়া তটিনীর অবিরাম মৃদু-সঙ্গীত, পুষ্প, জ্যোৎস্না, অনিল, বৃষ্টি ইত্যাদি। জাপানী কবিগণ প্রায় সকলেই উচ্চবংশ সম্ভূত। বিস্তর স্ত্রীলোক কাব্য লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। এখনও নববর্ষের দিন জাপানী-সম্রাট্ কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার সভাসদ্বর্গকে কাব্য লিখিতে আদেশ বা অনুরোধ করেন। একটা বিচিত্র প্রথা এই, কবি তাঁহার কাব্য মুদ্রিত করেন না। সম্রাট্ একটা নির্দ্দিষ্ট কালান্তে, সেই সময় মধ্যে লিখিত যাবতীয় কাব্য সমূহের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া উৎকৃষ্টগুলি সংগৃহীত করেন। নবম শতাব্দী হইতে এইরূপে সংগৃহীত কাব্যের সংখ্যা প্রায় চারি সহস্র হইবে।

উপমা কালিদাসস্য। জাপানীরা কিন্তু সকল উপমা পছন্দ করেন না। অচেতন পদার্থ-নিচয়ের চেতনবৎ চিত্রণ উঁহাদের চক্ষে বালকত্বেরই পরিচায়ক। বঙ্কিম বাবুর সুমতি ও কুমতির মধ্যে কথোপকথন উঁহাদের হয়ত অসহ্য বোধ হয়।

ইউরোপীয় সাহিত্য আমাদের ন্যায় জাপানীদের সম্মুখেও নূতন আদর্শ ধরিয়াছে। জনৈক জাপানী লেখক "হুদো নান্সুই" তাঁহার একটী নায়িকাকে গোয়ালিনীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার আভাস অনুসারে টোকিওর নব্যা নারী ভবিষ্যতে কতকটা ঐরূপ হইবেন। বর্ত্তমান কালে কিন্তু গোদুগ্ধ জাপানিগণের অস্পৃশ্য! জাপানীদের ন্যায় আরও অনেক জাতি গো-দুগ্ধের আদর জানে না।

জাপানে এখন সহস্রাধিক সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। টোকিও সহরের রাজকীয় পুস্তকাগারে প্রায় ৫ লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে; উহাদের মধ্যে প্রায় এক সহস্র নানা য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত। জাপানিগণ সর্ব্বভাষার সাহিত্য হইতে নিজভাষার পুষ্টি-সাধনে উঠিয়া

পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমরা প্রধানতঃ ইংরাজি ভাষারই মুখাপেক্ষী; জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর ন্যায় দু একজন যাঁহারা ফরাসী, এমন কি ব্রহ্ম ভাষা হইতেও রত্ন আহরণ করিয়া আমাদের দেশভাষাকে সাজাইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। জাপানীরা কিন্তু অন্য ভাষা সমূহ হইতে রত্ন আহরণ কালে, একটু বিচিত্র পদ্ধতির অনুসরণ করেন এবং তাহা ভাল হউক, মন্দ হউক, মৌলিক বটে।

অনুবাদকালে ভাবানুবাদেই ইঁহাদের লক্ষ্য থাকে। সেক্সপীয়র, কার্লাইল, এমার্সন প্রভৃতির গ্রন্থাবলী জাপানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, কিন্তু মূল ও অনুবাদে সাদৃশ্য বাহির করা কিছু কঠিন ব্যাপার। অনুবাদক অনেকস্থলে নূতন ভাব নূতন কথা বসাইয়া মূলাপেক্ষাও তাঁহার অনুবাদটীকে উৎকৃষ্টতর করিতে প্রয়াস পান এবং অম্লানবদনে তাহা প্রকাশ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। ফলতঃ বুঝা যায়, জাপানীভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনই লেখকের লক্ষ্য থাকে, অনুবাদে মূল অবিকৃত রহিল কিনা, সাবধান থাকা অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। অনেক নাম, চরিত্র এবং যে সব স্থল নিতান্তই বৈদেশিক ছাঁচে ঢালা, সে সমুদয় জাপানী ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হয়। আরও এক অদ্ভুত প্রথা এই, পুস্তকাদি প্রণয়নকালে, অন্য সু-লেখকগণের ভাষা ভাব প্রভৃতি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। তাহা চৌর্য্য বা নিন্দনীয় কার্য্য নহে, প্রত্যুত পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক। বিনয় বা সৌজন্য প্রকাশার্থ, সেই সমুদয় স্থল যে অন্য বিরচিত, এইটী বুঝাইবার জন্য, যদি তুমি কোটেশন বা অন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার কর, তাহা হইলেই আর রক্ষা নাই। সমালোচক-কুল উল্টা বুঝিয়া তীব্র সমালোচনা করিতে বসিবে, তুমি যে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা জানাইবার জন্য, অসভ্যের ন্যায় ঐ সব স্থলের উপর সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণার্থ, ঐরূপ কৌশলময় বিজ্ঞাপন দিয়াছ। ছিঃ ভদ্রলোকের এরূপ নীচতা শোভা পায় না। আমাদের দেশে এক সময় বোধ হয় জাপানী ধরণে সাহিত্য চর্চ্চা খুব প্রচলিত হইয়াছিল এবং হয়ত তাহা অপেক্ষাও আরও একটু অধিকরূপ হইয়াছিল। ভারতীতে ক্রমশঃ প্রকাশ্য "মহানাটকের" অনুবাদে দেখিলাম, নানা কবির ভাষা ও ভাব একত্র করিয়া ঐ নাটকখানি বিরচিত হইয়াছে। অনেক কবি নিষ্কাম ভাবে আপনাদের লেখা অপরের নামে চালাইতেন। পাঠক যদি বড় কবির নামে আকৃষ্ট হইয়া সেই লেখা মন দিয়া পাঠ করেন ও তাহা হইতে মধুকরের ন্যায় অথবা হংসের ন্যায় কিছু মধু বা ক্ষীর বাহির করিতে পারেন, মন্দ কি? চিনি বাহির করিবার চেষ্টা থাকিলে, বীটপালং বা আল্‌কাতরা হইতেও যথেষ্ট চিনি পাওয়া যায়, নতুবা আখের ক্ষেত করিয়াও ফেল হইতে হয়।

জাপানীদের অনুবাদ প্রথা প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় হউক, জাপানীপাঠককুল কিন্তু দু একখানি পুস্তক পড়িয়াই বহু লেখকের বহু পুস্তকের উৎকৃষ্ট অংশের সহিত পরিচিত হইতেছেন।

টোকিও সহরের কোন এক নামজাদা প্রকাশক কোন্ কোন্ পুস্তক বা লেখক কিরূপ লোকপ্রিয়, জানিবার জন্য দেশময় কতকগুলি পত্র বিলাইয়াছিলেন। দেশের লোকের মতিগতি জানিবার পক্ষে এবং ব্যবসায়ের পক্ষেও ইহা এক সদুপায় বটে। ইহা

হইতে আমরাও জাপানীযুবকগণের মতিগতি কতকটা বুঝিতে পারিব।

ডারউইনের অদৃষ্টেই ভোট সংখ্যা সর্ব্বাধিক। (সূত্রাকারে ইঁহার মত হইতেছে, "বাড়িবার চেষ্টা পাও, প্রবল পুষ্ট হউক, দুর্ব্বল চলিয়া যাক।" এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার আদরও বড় কম নহে। পল্লব-গ্রাহিতার আশঙ্কা থাকিলেও, সর্ব্ববিষয়েই সংবাদ লাভ জন্য জাপানী হৃদয় কিরূপ ব্যগ্র, ইহা তাহারই পরিচায়ক। কার্লাইল, এমার্সন, রসায়নবিৎ রেমসেন, জ্যোতিষী নিউকোম ও হোলডেন প্রভৃতির শিষ্য সংখ্যাও অনেক অধিক। স্মাইল্‌স সাহেবের "সেল্‌ফ হেল্প," আর্ভিংএর "স্কেচবুক," গ্রে সাহেবের "এলিজি" গোল্ডস্মিথের "ডেজার্টেড ভিলেজ", মিল সাহেবের "লিবার্টি", রাইডার হাগার্ডের "কিং-সলোমনের মাইন" প্রভৃতিও প্রিয়পুস্তক। বঙ্গীয় পাঠক এই সমস্ত ইংরাজি পুস্তকের প্রায় সকলগুলির সহিতই সুপরিচিত।

শিক্ষা-বিস্তার।

জীবনে যে যে বৃত্তিই গ্রহণ করুক, শিক্ষা ফলে তাহার উন্নতিসাধন করা যায়। জাপানী গবর্ণমেণ্ট এইজন্য দেশে যাহাতে একজনও নিরক্ষর না থাকে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দেই শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকের সংখ্যা শতকরা ৮২·৪৯ হইয়াছিল। এত দিনে এই অনুপাত আরও উঠিয়াছে।

প্রথম প্রথম বিদেশে শিক্ষা লাভার্থ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বহু ছাত্র প্রেরিত হইত। দেশে শিক্ষিত জাপানীর সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে, গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিদেশে ছাত্রপ্রেরণও ক্রমশঃ কমিতেছে। ১৮৭৩ সালে ২৫০ জন ছাত্র বিদেশে শিক্ষালাভ করে, ১৮৯৫ সালে ১১ জন মাত্র সরকারি ব্যয়ে প্রেরিত হয়। বৈদেশিক শিক্ষক নিয়োগ সম্বন্ধেও এই ভাব।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

# স্বদেশী উচ্ছ্বাস ও জাতীয় শিক্ষা-সমিতি।

এত দিন পরে যে আমাদিগের দেশের লোকের জাতীয় শিক্ষার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা সৌভাগ্যের বিষয়। পূর্ব্বে আমাদিরের সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধনার ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অন্য জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন; চোর ডাকাত হইতে রক্ষা করুন; পত্রাদি প্রেরণ করিবার জন্য ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিন; গবর্ণমেণ্ট রেলপথ প্রস্তুত করিয়া দিন; বাপী দীর্ঘিকা খনন করিয়া আমাদিগের পেয় জলের সংস্থান করিয়া দিন; হাসপাতাল করিয়া দিন; নগর ও গ্রাম পরিষ্কার রাখিয়া, বা অন্য যে কোন উপায়ে হউক, স্বাস্থ্যজনক করিয়া দিন; গবর্ণমেণ্ট রাস্তা বাঁধিয়া দিন; গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া চাকর রাখিয়া আমাদিগের আহারের সংস্থান করিয়া দিন—ইত্যাদি সমুদয় বিষয় গবর্ণমেণ্ট করিয়া দিবেন, আমরা এ সব বিষয় কিছু পারি না; পারিলে কিছু করিব না, এতাবৎকাল আমাদিগের মনের ভাব এইরূপ ছিল। এক্ষণে যে কারণেই হউক, একটা নবভাবের উন্মেষ

হইয়াছে। আমরা এক্ষণ বুঝিতেছি, আত্ম নির্ভর ব্যতীত, আত্মচেষ্টা ভিন্ন, কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না। তবে, শিশু যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাত ধরিয়া "পায় পায় হাটি হাটি" চলে, তেমনি ইংরাজের হাত ধরিয়া পায় পায় হাটি হাটি চলিতাম। এক্ষণে হাত ছাড়িয়া দিয়া, দুই এক পা চলিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রথম প্রথম আছাড় খাওয়া আশ্চর্য্য নহে, বরঞ্চ প্রত্যাশিত। শিশু আছাড় খাইয়া পরে হাটিতে শিখে। আমরাও প্রথমে আছাড় খাইয়া পরে হাটিতে শিখিব। বর্ত্তমান সময়ে এই আত্মচেষ্টার উচ্ছ্বাস, একদিকে স্বদেশী শিল্পের "মরা গাঙ্গে" প্রবাহিত হইয়াছে, আর এক দিকে জাতীয় শিক্ষার শুষ্ক ক্ষেত্রের দিকে বিসর্পিত হইতেছে। এই উচ্ছ্বাসে শিক্ষাক্ষেত্র উর্ব্বর হইতে পারে। এই সময়ের শ্রমী কৃষক জুটিলে দিব্য ফসল ফলিতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রের কৃষককুল যেন সমবেত হইয়াছেন, বোধ হইতেছে। আরামের উত্তম ভবন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা কি যথার্থই বৈশাখের রৌদ্র, শ্রাবণের ধারায়, কৃষিক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিবেন? যাহা হউক, জাতীয় শিক্ষা-সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। তাই আশা হয়, তাই দুই একটা কথা বলিব।

ইংরাজ আমাদিগকে যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তাহাতে অনেক বিষয়ে আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের অবনতি হইয়াছে। কুশিক্ষায় লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপর হইয়াছে, বিলাসী হইয়াছে। এমন আড়ম্বরপ্রিয় হইয়াছে যে, বৃদ্ধ জনক জননী ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যয় না দিয়াও গাড়ী ঘোড়া রাখিতেছে। ধর্ম্মভাব ক্রমেই লোপ পাইতেছে, অর্থের জন্য সমাজের সম্রান্ত লোকও চাতুরী প্রবঞ্চনা করিতেছে এবং নিতান্ত ঘৃণার্হ হইয়াও অর্থবলে সমাজে সম্মানিত হইতেছে। সাত্ত্বিক ভাবের দান ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। যাঁহারা অর্থরাশি উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা পূর্ব্বের মত সাধারণের উপকারের জন্য পুষ্করিণী খনন অথবা অতিথিশালা, বা ধর্ম্মশালা বা দেবালয় স্থাপন করেন না। শিক্ষার দোষে শিরঃপীড়া, বহুমূত্র, চক্ষুরোগ, ক্ষুধামান্দ্য শিক্ষিত সমাজকে অধিকার করিতেছে। শিক্ষার দোষে বরপক্ষ রুধির লোলুপ রাক্ষসবৎ, করাল-কবল ব্যাদান করিয়া কন্যাপক্ষের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেছেন না। শিক্ষার দোষে মামলা মোকদ্দমা দিন দিন বাড়িতেছে, ক্রমে একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বে লোকে অন্যের উপকার করিয়া, অন্যকে দান করিয়া মহৎ হইবার চেষ্টা করিত, এখন লোকে অন্যের অপকার করিয়া অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া মহৎ ও মহিমান্বিত হইবার চেষ্টা করে। সংক্ষেপে শিক্ষার দোষে সমাজ ক্রমেই নরক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও দুঃখের বিষয়, নরক বা পুরীষকুণ্ডের কীট যেমন নরক বা পুরীষে থাকিতে ভালবাসে, সমাজের যে সকল লোক নরকগামী হইয়াছে, তাহারা নরকে থাকিতে ভাল বাসিতেছে। প্রাচীন সমাজ যে আধুনিক সমাজের তুলনায় স্বর্গ ছিল, এ কথা তাহারা স্বীকার করে না। এক্ষণে দেশে এমন শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা পতিত সমাজকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে; এমন শিক্ষা, যাহাতে সমাজের ব্যাধিগ্রস্ত দেহে স্বাস্থ্য সংস্কার করিতে পারে; এমন শিক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে সয়তানকে তাড়াইয়া সমাজে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। এমন শিক্ষা আবশ্যক, যাহাতে লোকে

সুস্থ, সাহসী, সত্যবাদী, পরোপকারী, ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে। এমন শিক্ষা আবশ্যক, যাহাতে লোকে, সৎপথে থাকিয়া, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও নীচতার ঘৃণিত পঙ্কে নিমগ্ন না হইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় শিক্ষা করিতে পারে। এমন শিক্ষা আবশ্যক, যাহাতে ছাত্রগণ জ্ঞান ধর্ম্ম বিষয়ে দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া, সংসারে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোকে চলিতে পারে, ধর্ম্মপথে থাকিয়া সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আপনাদিগের মনুষ্যত্ব বিকশিত করিতে পারে। এক কথায়, এমন শিক্ষা আবশ্যক, যাহাতে মানুষ মানুষ হয়, পশু না হয়; যাহাতে মানুষ দেবতা হয়, সয়তান না হয়।

মানুষকে মানুষ করিবার জন্য, সুসভ্য জগতে এ পর্য্যন্ত নানাবিধ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে। আমাদিগের দেশে আমরা দুই প্রকার শিক্ষা দান দেখিতেছি। প্রাচীন হিন্দুর চতুষ্পাঠী এবং ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত স্কুল কালেজ। চতুষ্পাঠীর শিক্ষা দানের ভিত্তি ধর্ম্মশাস্ত্র। কালেজের শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। চতুষ্পাঠীর শিক্ষক ছাত্রের পূজ্যপাদ গুরু। কালেজের শিক্ষক বেতনভোগী ভৃত্য, ছাত্রগণের বা গবর্ণমেণ্টের। চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাদান হয়। কালেজে বিদ্যা বিক্রয় হয়। চতুষ্পাঠীতে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্বন্ধ ভক্তি ও স্নেহ। কালেজের ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্বন্ধ অর্থ, এমন কি, শিক্ষক সকল ছাত্রকে চেনেন না। চতুষ্পাঠীর ছাত্র ব্রহ্মচারী; কালেজের ছাত্র বিলাসী। চতুষ্পাঠীর ছাত্র গুরু পরিবারের পবিত্র ছায়াতলে আশ্রিত। কালেজের ছাত্র বারাঙ্গনা-সন্নিধানে গুরুজন-পরিত্যক্ত-পাপীয়সীদিগের বাসনালোল-নেত্রে নিমন্ত্রিত।

ইউরোপের ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে। এই সকল গুলির সার সংগ্রহ হইলে আমাদিগের দেশে নূতন উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা বিষয়ে সাহায্য হয়। এতদ্বিষয়ক যে সকল ভাল ভাল গ্রন্থ ও বিবরণী লিখিত হইয়াছে, তাহা অধ্যয়ন করিয়া তাহার একটী সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই সার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিবার ভার দিন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের যে সকল সুশিক্ষিত লোক ইউরোপে ও আমেরিকাতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক এক দেশের এক এক জন যোগ্য ব্যক্তিকে সেই সেই দেশের শিক্ষা প্রণালীতে কিরূপ ফল হইতেছে, এবং প্রত্যেক শিক্ষা প্রণালী জাতীয় ধর্ম্ম, রাজনীতি, বাণিজ্য, শিল্প ও সামাজিক অবস্থার সহিত কিরূপে সংশ্লিষ্ট, তদ্বিষয় এক একটী মন্তব্য লিখিয়া জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির নিকট প্রেরণ করুন। উক্ত সার সংগ্রহ ও বিবরণগুলি সমিতির হস্তগত হইলে, তাহা অবহিত চিত্তে আলোচনা পূর্ব্বক, বর্ত্তমান সময় এদেশে কিরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা উচিত, তাহা নিরূপণ করিয়া মন্তব্য লিখিবার জন্য, তিন জন দক্ষ ব্যক্তিকে, জাতীয়-শিক্ষক-সমিতি নির্ব্বাচন করিবেন। ঐ মন্তব্য লিখিত হইলে তাহা জাতীয় শিক্ষা সমিতির এবং সাধারণের বিচার জন্য অর্পিত হইবে। বিচার মতে উক্ত মন্তব্য সংশোধিত হইলে তদনুসারে জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত বা সংশোধিত হইবে।

আমি যেরূপ সার সংগ্রহ ও মন্তব্য লেখাইবার প্রস্তাব করিতেছি, সভ্যদেশে য়ুরোপ ও মার্কিনে ঐরূপ সার সংগ্রহ ও মন্তব্য আছে।

করিয়া স্বদেশের শিক্ষা-প্রণালীর উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। ১৮৬৭ ও ১৮৬৮ সালে বিলাতে ইংলিশ স্কুলস ইন্‌কয়ারি কমিশন (English Schools Inquiry Commission) নামক সমিতি কতকগুলি পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ম্যাথু আর্ণল্ড ফরাসি, জর্ম্মানি, সুইজারল্যাণ্ড ও ইত্যালির শিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা পার্লিমেণ্টের কাগজাতের সামিল হইয়াছে। তাহার পরে বিলাতে ঐরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিয়া আসিতেছে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ঐ বিষয় মন্তব্য লিখিয়াছেন। ভরসা করি, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির শিরোমণিগণ এই সকল মন্তব্য অধ্যয়ন করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, এবং শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদিগের অধ্যয়নের ফল কি,তাহা অচিরাৎ জানিতে পারিবে।

ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রণালীর দোষ গুণ বুঝিতে হইলে শিক্ষা প্রণালীর ইতিহাসও অধ্যয়ন করা উচিত। জর্ম্মানি দেশে শিক্ষা প্রণালীর ইতিহাস সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রমার (Raumer) প্রণীত ইতিহাস ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তৎপরে কার্লস্মিডট (Karl Schmidt) একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তাহা শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদৃত। ইংরাজিতে "সাইক্লোপিডিয়া অব এডুকেশন" নামক গ্রন্থ আছে। লী (Leitch) প্রণীত প্র্যাক্‌টিকাল এডুকেশন (Practical Education) নামক একখানি গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায়। দি গ্রেট এডুকেটার্স (The great Educators.) ধারাবাহিক গ্রন্থে জগতের প্রধান প্রধান শিক্ষকগণের জীবনী ও শিক্ষা প্রণালী সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।* সম্প্রতি মন্‌রো-রচিত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে A text Book in the history of education by P. Monroe, 1906.

জাতীয় শিক্ষা একটা গুরুতর ব্যাপার, হৈ চৈ ব্যাপার নহে। আমাদিগের দেশে শিক্ষা-প্রণালী-তত্ত্ব গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জ্ঞানালোক আনিয়া সেই অন্ধকার দূর করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যতগুলি সভা হইয়াছে, তাহাতে এই অন্ধকার যে কিছু মাত্র দূর হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। আমাদিগের মত হতভাগ্য মূর্খগণের জন্য জাতীয় শিক্ষা-সমিতির নেতৃগণ, কৃপা পূর্ব্বক একটু জ্ঞানরশ্মি ছড়াইলে আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইব। একটা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে, শুনা যাইতেছে। কিন্তু যাজক ও যজমান কাহাকেও দেখিতেছি না। এই মহাযজ্ঞের মন্ত্র কি, তাহাও অদ্যাপি স্থির হইয়াছে কিনা, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। মধ্যে মধ্যে কোলাহল শুনা যাইতেছে। যতদূর অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে এই অনুভব হয় যে, প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর যে যে দোষ আছে,তাহা নূতন প্রস্তাবিত প্রণালীতে আছে; কেবল প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীতে যে সুবিধা আছে, তাহা নূতন জাতীয় প্রণালীতে দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালী জাতির মনুষ্যত্ব

* Aristotle and the Ancient Educational Ideals.
Loydla, and the education system of the Jesuits.
Abelard, and the origin and Early History of Universities.
Alcuin, and the rise of the Christian Schools.
Rousseau; or Education according to Nature.
Herbart; or modern German Education.
Pestalozzi, or, the Friend and Student of children.
Froebel.
Horace Maun and Public Education in the United states.
Bell, Lnacaster and Arnold; or the English Education of to-day.

বিকাশ করিতে হইলে, নব-শিক্ষা প্রণালীতে যে যে ব্যবস্থা করা উচিত, তাহার প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির যে পরিষ্কার ধারণা আছে, তাহাও এখনও প্রকাশ পায় নাই। সংশোধিত শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিবার পূর্ব্বেই, শিক্ষাদানের পূর্ব্বেই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। এতগুলি বিদ্বান ও স্বদেশ-সেবকের সম্মিলিত বুদ্ধি ও চেষ্টা হইতে যাহা আশা করা যায়, তাহার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যেন আমরা লাভ করিতে পারিতেছি না। সবই যেন কাগজ কলমের ব্যাপার, ফাঁকা হাওয়ার কাজ। যেন ইহাতে প্রাণ নাই, জীবন উৎসর্গ নাই।

জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, যে মহাত্মাগণ শিক্ষা-ক্ষেত্রে কোন স্মরণীয় কার্য্য করিয়াছেন, ঐ কার্য্যই তাহাদিগের তপ জপ হইয়াছিল। তাঁহারা নিজেই শিক্ষক, যোগী, দার্শনিক, স্বদেশপ্রেমিক গুরু,—শিষ্যগতপ্রাণ, স্নেহবাৎসল্যে পরিপ্লুত, ধন-সম্পদের, মান সম্ভ্রমের জন্য লালায়িত নহেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী প্রেম—মস্তকের উপর ভগবান—একমাত্র লক্ষ্য ছাত্রগণের মনুষ্যত্ব-বিকাশ। তাঁহাদিগের হৃদয়ে নিয়ত একটা পবিত্র অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। সেই অগ্নিতে স্বার্থপরতা দগ্ধ করিত। সেই অগ্নি কোন কোন মহারাষ্ট্রীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। তাই সেখানে মহাপণ্ডিতগণ বিপুল ধনমানের আশা বিসর্জ্জন করিয়া, সাংসারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষাকে পদাঘাত করিয়া, মুষ্টিমেয় অন্নে জীবন রক্ষা পূর্ব্বক, উন্নতশিরে, ত্যাগস্বীকারের মহিমায় কার্য্যক্ষেত্র উদ্ভাসিত করিয়া, শিক্ষা-দান-ব্রত উদ্যাপন করিতেছেন। ঐরূপ পবিত্রপাবক বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রবেশ না করিলে, কেবল জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি দ্বারা, স্বদেশের কোন মঙ্গলই সাধিত হইবে না।

একদিন মধ্যযুগের শেষভাগে নর্দার্ণ নেদার্লাণ্ডসে (Northern Netherlands) এই পবিত্র অগ্নি জ্বলিয়াছিল। গ্রূট (Groote)-প্রমুখ "ব্রীদ্রেন অব দি কমন লাইফ" (Brethren of the common Life) নামক বিনীত ও স্বার্থত্যাগী সম্প্রদায় তথায় এক শত বৎসর শিক্ষাদানের জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন স্নেহগঠিত পেষ্টালজি (Pestalozzi) শিষ্য-বাৎসল্য অমৃত পান করিয়া শিষ্যবৃন্দসহ অনাহারে থাকিয়াও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। একদিন জর্ম্মানিতে শিশুসখা ফ্রীবেল (Froebel) নবপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া সুকুমার শিশু-নিগ্রহ-পুতনা-রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন, এবং সানন্দ জ্ঞানার্জ্জনের সহজ পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষক-প্রবর আর্ণল্ড ছাত্রস্নেহে পরিচালিত হইয়া ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। একদিন এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে ডেভিড হেয়ার (David Hare) বাৎসল্যে উন্নত হইয়া বঙ্গীয় কৃষকের বালককে ক্রোড়ে লইয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। আর সে দিন ঋষিতুল্য রামতনু শিক্ষাদান যে একটী পূজা, তাহা অনুভব করিয়া, সাত্ত্বিক ভাবে তাহার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গে সে স্নেহ বা সে পবিত্রভাব কোথায়? এই জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কোলাহলের মধ্যে শুষ্ক মুন্সীয়ানার ভিতরে এ পর্য্যন্ত আশাপ্রদ বড় কিছু দেখিতে পাই নাই।

এক্ষণে জাতীয় ভাবের একটা উচ্ছ্বাস হইয়াছে। এই শুভক্ষণে কোন মহাত্মা যদি শিক্ষাদান-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে

তাঁহার কার্য্যে ও দৃষ্টান্তে, মহৎ অনুষ্ঠানের আরম্ভ হইতে পারে। মরা গাঙ্গে বান আসিয়াছে। কে নৌকা ছাড়িবে? সময় ও বান বহিয়া যাইতেছে। এমন সুযোগ বুঝি আর হইবে না। কর্ণধার হাল ধর। মাঝিরা দাঁড়ে ব'স। খর সমীরণ ঘন গর্জ্জনের ভয় না করিয়া একবার শিক্ষাদানের সাধের তরণী গাঙ্গে ভাসাইয়া দেও। একজন কি বঙ্গদেশে নাই, যিনি এই মহীয়ান্ ব্রতে প্রাণ সঁপিয়া দিতে পারেন, যিনি শিক্ষক-সন্ন্যাসী হইয়া বঙ্গগুরু হইতে পারেন?—একজন লোক, যাঁহার স্বার্থত্যাগের ও মহজ্জীবনের দৃষ্টান্তে অন্যলোকে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া, শিক্ষাদান কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন? যতদিন এই পরাধীন দেশে সন্ন্যাসী-শিক্ষকের আবির্ভাব না হইতেছে, ততদিন বড় আশা হয় না। যখনই শিক্ষক-সন্ন্যাসীদল গঠিত হইবে,তখনই দেখিবেন, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে জ্ঞান-মন্দির, জ্ঞান-মসজিদ মাথা তুলিবে। সেখানে নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী-শিক্ষকগণ জ্ঞান-দান-পূজা দ্বারা ভগবানকে অর্চ্চনা করিবেন।

এমন দিন কবে আসিবে, যখন সন্ন্যাসী-শিক্ষক সম্প্রদায়ের কৃপায়, প্রতিদিন বঙ্গে ঊষাগমে প্রভাত-বিহঙ্গমঝঙ্কার সহ, বালক বালিকাবৃন্দ কোমল-কলকণ্ঠে ভক্তি গদগদ স্বরে বিশ্বপতির বন্দনা করিবে, এবং বালার্ক-কনককিরণে আলোকিত হইয়া, সুশীতল সুবাসিত প্রভাত-সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া, জ্ঞান ও ধর্ম্ম সুকুমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে? এমন দিন কবে আসিবে, যবে বঙ্গীয় যুবা, সন্ন্যাসী অধ্যাপকের নিকট, সন্ন্যাসীর ন্যায় সংযত হইয়া, জ্ঞান ও ধর্ম্ম অনুশীলন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহক্ষম, সাহসী, সত্যবাদী ধার্ম্মিক, পরোপকারী পণ্ডিত হইবে, এবং স্বদেশকে জননীর ন্যায় ভালবাসিতে শিখিবে?

ভরসা করি, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির আদর্শ উচ্চ, এবং সেই আদর্শ অনুসারে কার্য্য হইবে। ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত জগতে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় নাই। জাতীয় শিক্ষা-সমিতির মধ্যে যদি কেহ ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তাহা হইলে এই সমিতি দ্বারা আর যাহাই হউক, দেশের কোন মঙ্গল হইবে বড় ভরসা হয় না। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

# মহানুভব শ্রীলোচনদাস ঠাকুর

অমিয়-মাখা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা যাঁহারা প্রথমে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া কলি-কলুষিত মানবকুলকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ভক্তকবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা মহানুভব শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের নামই বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। চৈতন্যভাগবত, চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, প্রভুর লীলা-রসাত্মক এই আদি-কাব্য তিন খানি সর্ব্বাংশেই অতুলনীয়। পাঠে মনে হয় যে,—যেন পতিতপাবনী সুরধুনীর ত্রিধারা জীবকুলের শান্তিধামে যাইবার তিনটী প্রশস্তবর্ত্মরূপে এই গ্রন্থত্রয় বিরাজমান। যতকাল বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততকাল গ্রন্থত্রয়ের সঙ্গে গ্রন্থকারগণও সাহিত্য-জগতে

অমর হইয়া থাকিবেন। আর বঙ্গসাহিত্যের শিক্ষাগুরু বলিয়া সাহিত্যসেবী মাত্রেই ইহাদের শ্রীচরণে ষাষ্টাঙ্গে কোটী কোটী প্রণিপাত করিবেন। আজ আমরা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা ভক্তিরসের বিমল মধু-মুগ্ধ বিখ্যাত কবি মহানুভব শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের মধুর জীবনী প্রসঙ্গ * আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তর গোস্কুরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কো-গ্রামে, বৈদ্যকুলে লোচনদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী, মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহীর নাম অভয়া দাসী। পিতা, মাতামহ প্রভৃতি সকলই বৈষ্ণব ও পরম গৌরভক্ত ছিলেন। লোচন তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র। অতি আদরে তিনি বাল্যকালে এত দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, লেখা পড়ায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ করিতেন না। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের বহু যত্নে ও শাসনে তাঁহার লেখা পড়া শিক্ষা হয়। ক্রমে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষাতে পরম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের পরিসমাপ্তি স্থলে লোচন আত্মপরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

চারি খণ্ড পুথি সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর, কো গ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ কাম॥
কমলাকর দাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গোরা গুণগাথা॥
সংসারেতে জন্ম দিল সেই পিতা মাতা।
মাতামহ কুলের কহিয়ে কিছু কথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্যা মাতামহী সে অভয়া দাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থ পূত দেহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি, মাতামহের সে সূত্র॥
যথা তথা যাই সে দুল্লিল করে মোরে।
দুল্লিল লাগিয়া কেহ পঢ়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তমে গুপ্ত চরিত্র তাহার॥
তাঁহার চরণে মুঞি করো নমস্কার।
চৈতন্য চরিত্র লিখি প্রসাদে তাঁহার॥

বয়ঃপ্রাপ্তে লোচন তাঁহার কুলগুরু শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট ইষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, জীবনের অধিকাংশ সময় গুরুগৃহেই অতিবাহিত করেন। অধিকাংশ সময় গুরুগৃহে বাসের জন্যই, বোধ হয়, তখন তাঁহাকে অনেকে শ্রীখণ্ডবাসী বলিয়া জানিতেন। এজন্য কোন কোন গ্রন্থকার তাঁহাকে শ্রীখণ্ডবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সরকার ঠাকুরের তিরোভাব হইলে পরও লোচন তাঁহার গুরুগৃহ পরিত্যাগ করেন নাই। সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আশ্রয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম পারিষদ ঠাকুর শ্রীনরহরির মনে একান্তই আগ্রহ ছিল যে, প্রভুর লীলা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আর তাহা পাঠ করিয়া আপামর সকলে কৃতার্থ হয়। চৈতন্যভাগবত, চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় সরকার ঠাকুরের এই

---

* ইতিপূর্ব্বে মহানুভব শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে কয়েকটী ভুল ছিল। সম্প্রতি এ সমস্ত ভ্রম সংশোধনান্তর বিশেষরূপ বিস্তৃত করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। ইতি। প্রবন্ধ লেখক।

আগ্রহও একটী প্রধান কারণ। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের গ্রন্থ নরহরির প্রকট সময়েই প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু লোচন যখন চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন, সরকার ঠাকুর তখন নিত্যধামে। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর সে সময় গৃহকর্ত্তা। তাই গ্রন্থ মধ্যে লোচন তাঁহাকে "ঘরের ঠাকুর" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন—

বন্দনা গাইতে মোর হইব অনুক্ষণ।
ঘরের ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন॥
শ্রীমূর্ত্তিরে যেবা জন লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁহারে মনুষ্য বুদ্ধি কোন জন কৈল॥
তাঁর পিতা বন্দোঁ শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্ম্মল বিশ্বাস।

লোচন ১৫৩৭ শকাব্দার কিছু কাল পরে, শ্রীমুরারি গুপ্ত কৃত সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত-কাব্যের নানা রাগ রাগিণী যুক্ত করিয়া সরল ও সুললিত পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। এই তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ। পিতা, মাতা, মাতামহ, ইষ্টদেবতা ও অন্যান্য মহান্তগণের নিকট প্রভুর লীলা সম্বন্ধে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই অনুবাদ মধ্যে সেই সব বৃত্তান্ত স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থের পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু চরিতামৃত-কাব্যই যে তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল, গ্রন্থ মধ্যে তাহারই পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীমুরারি গুপ্ত বেজা ধন্য তিন লোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুঁছিল তাঁহাকে॥
কহিল মুরারী গুপ্ত শ্লোক পরবন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে॥
শুনিয়া মাধুরী তবে চিত্তে উভরোল।
নিজ দোষ না দেখিয়া মন ভেল ভোর॥
যে কিছু কহিল নিজ বুদ্ধি অনুরূপ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ মোছার মূরুখ॥
জন্ম হইতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্তে যেইরূপে প্রেম প্রচারিল॥
দামোদর পণ্ডিত সর্ব্ব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকবন্ধে হৈল পুথি "গৌরাঙ্গচরিত"।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ চরিত॥

কেহ কেহ বলেন যে, বৃন্দাবন দাস যে সময় চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন, লোচন দাসও ঠিক সেই সময় চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় বৃন্দাবন দাস তাঁহার মাতা নারায়ণী দেবীর আজ্ঞানুসারে গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, "শ্রীচৈতন্যভাগবত" নাম রাখেন। এ সম্বন্ধে বহুলোকের নিকট বিস্তর কিম্বদন্তীর উল্লেখ শুনা যায়। কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থ না থাকায় ও অন্য নানা কারণে আমাদের নিকট ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করিলে, তাঁহার গ্রন্থ কি গৌড়দেশ, কি শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বত্রই বিশেষরূপ সমাদৃত হয়। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পাঠ ও ব্যাখ্যা বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলেন। চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষ লীলার বিস্তৃত বর্ণনা না থাকায়, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৩৭ শকাব্দাতে চরিতামৃত সমাপ্ত হয়। ইহাতে জানা যায় যে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের

গ্রন্থ সে পর্য্যন্ত চৈতন্যমঙ্গল নামেই সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। ইহার কিছু পরে বৃন্দাবনবাসী মহান্তগণ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "শ্রীচৈতন্যভাগবত" নাম রাখেন। এই নাম পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে পর যে লোচন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই বন্দনাটী পাঠ করিলেই তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না—

শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥

লোচনের চৈতন্য-মঙ্গল এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে মহাপ্রভুর লীলা মাধুরী অতি কবিত্বপূর্ণ বিশদ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রশংসা আমরা আর অধিক কি করিব। যদি এই মরজগতে প্রেমের ভাষা কোথাও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে এই চৈতন্য-মঙ্গলে হইয়াছে। ইহা মানব কৃত প্রশংসার সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মানব-ভাণ্ডারে এমন কোন শব্দ নাই যদ্দারা এই গ্রন্থের সম্যক প্রশংসা হইতে পারে। পূর্ব্বে গায়কগণ মন্দিরা চামরাদি যোগে চৈতন্যমঙ্গল গান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামাধুরী প্রস্রবনে সহস্র সহস্র শ্রোতার মন প্রাণ শীতল করিতেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যহই এই গীত হইত। প্রক্ষিপ্তাংশ পরিপূর্ণ প্রেম-বিলাস গ্রন্থের সকল বিষয় বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও নিম্নলিখিত কথাটীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না—

বৈদ্যকুলোদ্ভব কবি শ্রীলোচন দাস।
শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
চৈতন্যমঙ্গল গীত তাঁহার রচিত।
সদা গীত হয় নরোত্তমের বাটীত॥

পাশ্চাত্য সভ্যতায় বঙ্গদেশ এখন উৎসন্ন প্রায়। তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গানের প্রথা এ পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয় নাই।

চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন লোচন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা সম্বন্ধীয় অনেকগুলি মধুর পদ রচনা করেন। এ সমস্ত পদ পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের তৃপ্ত্যর্থ আমরা দুইটী পদ এখানে উদ্ধৃত

(১)

এমন সুন্দর গোরা কোথায় আছিল গো
কে আনিল নদিয়া নগরে।
নিরখিতে গোরা রূপ পরাণে পশিল গো
তনু কাঁপে পুলকের ভরে॥
ভাবের আবেশে অঙ্গ এলায়ে পরেছে গো
প্রেমে ছল্ ছল্ দুটী আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মনে এমনি হয়েছে গো
পরাণ পুতলি করি রাখি॥
বিধি, কি আনন্দ নিধি মথি নিরামল গো
কিবা সে পড়িল কারিকরে।
পীরিতি কুঁদেতে কিবা উহারে কুঁদিল গো
কুটিল নয়ন কামশরে॥
গোকুলে নন্দের কানু বঙ্কিম আছিল গো
কালিয়া কুটিল তার হিয়া।
রাধার পীরিতি তারে সরল করিল গো
সেই এই বিহরে নদিয়া॥
ভাবিতে রাধার রূপ গোরা তনু হৈল গো
সরল হইল প্রেম দানে।
উহার পীরিতে যার মন না ডুবিল গো
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবনে॥
সখি! মনের মরম কথা মনে সে রহিল গো
চিত্ত চুরি কৈল সেই চোরে।
লোচন দাসেতে বলে মন না ডুবিল গো
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে॥

( ২ )

শুন প্রাণ সই আরো কিছু কই
গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
ভুবন মাঝারে সচীর কুমারে
উপমা কিসে বা হয়॥
ছাড়িতে না পারি যে অবধি হেরি
গৌরাঙ্গ বদন চাঁদ।
সেরূপ সায়রে নয়ন ডুবিল
লাগিল পীরিতি ফাঁদ॥
ঘাটে মাঠে যাই হেরি গো সদাই
কনক কিশোর গোরা।
কুলের বিচার ধরম আচার
সকলি করিল ছাড়া॥
থাকি গুরু মাঝে সদাই নয়নে
বয়ান পড়িছে মনে।
নিবারিতে চাই নহে নিবারণ
বিকল করিল প্রাণে॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের নিছনি লইয়া
সকলি ছাড়িয়া দিব।
লোচনের মনে হয় রাতি দিনে
হিয়ার মাঝারে থোব॥

এরূপ কথিত আছে যে—তাঁহার এই পদ-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া সরকার ঠাকুর চৈতন্য-মঙ্গল রচনার জন্য তাহাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ পত্রে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থ সম্পাদনে সরকার ঠাকুরের যে কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাহাই পুনঃ পুনঃ দেখা যায়—

তাঁর পদ পরসাদে এ পথের প্রতি আশ।
গৌর:গুণ কহিবারে করেঁা অভিলাষ॥
* * * * * *
তাঁহার প্রসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচন দাস॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদ রচনা ভিন্ন তিনি সংস্কৃত শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের একটী সুল-লিত পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। লোচনদাসের রচিত বলিয়া কেহ কেহ "দুর্লভসার" নামক একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করেন। কিন্তু দুর্লভ-সারের রচনা ও প্রতিপাদ্য বিষয় দেখিলে, তাহা লোচনদাসের কৃত বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ সহজিয়া সম্প্রদায়ীর কোন ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থ লিখিয়া, লোচনের নাম ও পরিচয় দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন্ শকাব্দার কোন্ সময় লোচনদাস জন্ম গ্রহণ করেন, আর কোন সময়েইবা তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা, ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা কোন প্রামাণিক গ্রন্থপত্রে কিছুই পাই নাই। সুতরাং মাত্র জনশ্রুতি ও প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে লিখিতে সাহসী হইলাম না। তবে অনুমান হয়, শকাব্দীয় পঞ্চদশ শকাব্দীর শেষ ভাগে, কোনও এক পৌষী সংক্রান্তি দিবস তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। পৌষীসংক্রান্তি তাঁহার আবি-র্ভাব দিবস বলিয়া, অদ্যাপি প্রতি বৎসর কো-গ্রামে একটী মেলা ও মহোৎসব হইয়া থাকে।

অধুনা কোন কোন নব্য লেখক ও সমা-লোচক ভক্তিরত্নাকর কি অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থ পত্রে চৈতন্যমঙ্গলের নাম উল্লেখ নাই বলিয়া, গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহাদের নিজেদেরই বিষমভ্রম। গ্রন্থের যথার্থ অভি প্রায় বুঝিতে তাঁহারা সক্ষম হন না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, চৈতন্য-মঙ্গল মূল গ্রন্থ নহে,—সংস্কৃত চৈতন্যচরিতা-মৃত কাব্যের অনুবাদ মাত্র। শ্রীঘনশ্যাম দাস

ঠাকুর ভক্তিরত্নাকরে মূল চরিতামৃত-কাব্যের শ্লোক প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় চৈতন্যমঙ্গলের কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই।

অনুরাগবল্লী এক খানা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ; শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যানুশিষ্য মনোহর দাস কর্ত্তৃক ১৬১৮ শকাব্দায় বিরচিত। ভক্তিরত্নাকরে অনুরাগবল্লীর বিষয় উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে, চৈতন্যমঙ্গলের নাম যে কোন প্রাচীন গ্রন্থ পত্রে নাই, এ কথা কোন ক্রমে বলা যাইতে পারে না। যথা—

তাঁহার অনন্তলীলা দাস বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে করিলা বর্ণন॥
তাঁর সূত্রধৃত যে রহিল অবশেষ।
ঠাকুর লোচন তাহা কহিলা বিশেষ॥
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রসময়।
গীতরূপে ব্যক্ত করে আপন আশয়॥
এ দোঁহে যে ভাগ যাহা না কৈল বিস্তার।
বিশেষ করিয়া তাহা করিল প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাশয়।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর গ্রন্থ হয়॥
এই সকল গ্রন্থ পৃথিবীতে হৈল খ্যাত।
মূঢ়েও জানিল গূঢ় চৈতন্য সিদ্ধান্ত॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভুর আদি ও মধ্য এবং চরিতামৃত অন্ত্যলীলা বর্ণনপ্রধান গ্রন্থ। চৈতন্য-মঙ্গল, চরিতামৃতের পরে রচিত হইলেও এস্থলে প্রভুর লীলানুক্রমিক চৈতন্যমঙ্গলের নাম অগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম পারিষদ সরকার ঠাকুরের শিষ্য মহানুভব শ্রীলোচনদাস কৃত প্রভুর চরিতাখ্যায়কআদি গ্রন্থের অনুবাদ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ, আজ তিন শত বৎসর যাবত শ্রেষ্ঠতায় ও প্রামাণিকতায় যাহা সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছে, সে গ্রন্থ সম্বন্ধে বোধ হয় পাঠকবর্গের নিকট আমাদের আর অধিক বলিতে হইবে না।

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

# "খিচুড়ী"—সমালোচনা (১)

বঙ্কিম বাবুর "বঙ্গদর্শনে"র পর বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীন এবং সরস সমালোচনা বড়ই বিরল হইয়াছে। এখন "mutual admiration society"র অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। যাঁহার কোষ্ঠীতে কোনকালে পাণ্ডিত্য লেখে না, তিনি স্বগুণানুরূপ বন্ধুর কৃপায় পরম-পণ্ডিত। যাঁহার বিদ্যা ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত, যিনি ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত কিছুই জানেন না, ব্যাকরণের ধার ধারেন না, অলঙ্কারের সম্পর্ক রাখেন না, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখক। এইরূপ লেখকেরাই পরস্পর পরস্পরের সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা কখন কখন প্রকৃত প্রতিভাশালী লোকদিগকে অযথা গালি দিয়া স্বাধীন সমালোচনার পরিচয় দিয়া থাকেন। স্বার্থপরতা অধুনাতন বাঙ্গালাসাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে স্বার্থপরতা নাই, সেখানে চক্ষুঃলজ্জা আসিয়া তুল্যরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। বঙ্কিম বাবুর "বঙ্গদর্শনের" আমলের কোন কোন শ্রেষ্ঠ লেখক

(১) শ্রীবণোয়ারীলাল গোস্বামী প্রণীত। মূল্য ৸৹। মজুমদার লাইব্রেরী, কলিকাতা প্রাপ্তব্য। গুরুদাস বাবু এবং জি, এন্ হালদারের নিকটও প্রাপ্তব্য।

আজিও জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া প্রাচীন নীতি অনুসারে শোভনমৌন অবলম্বন করিয়াছেন। এহেন দিনে যিনি কোনরূপে স্বার্থ প্রণোদিত না হইয়া সাহিত্য কিম্বা men and manners সম্বন্ধে দু চারিটা সরস মধুর কোমল সত্য কথা বলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন যথার্থ হিতকারী, এবং আমাদের একটা প্রকৃত অভাব মোচনে সমর্থ। আমাদের আলোচ্যমান পুস্তিকা "খিচুড়ী"র লেখক বহুল পরিমাণে এই অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র "খিচুড়ী" নানা বিষয়ে সরস এবং সত্য সমালোচনার অবতারণা করিয়া দেশের একটু উপকার করিয়াছে, মনে হইতেছে।

"খিচুড়ী"র লেখক কবি। মধ্যে মধ্যে 'নব্যভারত' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেন, তাহার অনেকগুলি সুমিষ্ট ও সুন্দর, তাই কবিতায় এই পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ব্যঙ্গের সুর একটু সুন্দর করিবার জন্য মাঝে মাঝে বেশ ইংরাজী কথা সংমিশ্রিত করিয়াছেন। এই হিসাবে কবির ভাষা কিয়ৎপরিমাণে খিচুড়ী জাতীয়। বর্ণনীয় বিষয়ও "খিচুড়ী"—নানাজাতীয়। আলোচ্যমান গ্রন্থে দেশের বিবিধ লোকের চরিত্র চিত্র ও সমাজচিত্রের বর্ণনা আছে। এই সকল চিত্র কোন বিশেষ নিয়মে সংলগ্ন নহে। লেখকের যখন যাহাকে মনে পড়িয়াছে, তখনই তাঁহার ছবি আঁকিয়াছেন। অধিকাংশ ছবিই বর্ত্তমান জীবিত লেখকদের। গ্রন্থের সুর ব্যঙ্গপ্রধান হইলেও কবি মাঝে মাঝে খুব serious হইয়াছেন। তাঁহার ব্যঙ্গের মধ্যে কোথাও অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা অযথা আক্রমণ নাই। বায়রণের মত personalও নহে। সেরূপ কারণও নাই, কাজে কাজে সেরূপ কার্য্যও নাই। কবি কোনরূপ স্বার্থপরতা বশীভূত হইয়া এই গ্রন্থ লিখেন নাই। এইজন্য গ্রন্থ মধ্যে serious এবং satiric এর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আছে। গ্রন্থখানি serio-satiric বলিয়া ইহার "খিচুড়ী" নাম সার্থক হইয়াছে।

লেখকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি অপরিসীম এবং সূক্ষ্ম, তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশের এক অজ্ঞাতনামা প্রান্তভাগে জীবন কাটাইতেছেন; কিন্তু চারিদিক্ বেশ করিয়া দেখিতেছেন, অবস্থা বেশ বুঝিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া যাহা দোষের মনে করিয়াছেন, তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; এবং যাহা ভাল মনে করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত সুখ্যাতি করিয়াছেন। ব্যঙ্গের স্বরে কবির ভাষায় বর্ত্তমান সমাজের এবং বিশেষভাবে কোন কোন লেখকদের ও সমাজপরিচালকদের দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহার যেটুকু সুন্দর, তাহাও সরল প্রাণে সরল ভাষায় বলিয়াছেন। এক কথায় তিনি বাঙ্গালাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "survey of mankind" লিখিয়াছেন। কবি এক জায়গায় কোন লেখককে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,

"মিষ্ট করে স্পষ্ট বল্‌বে
চাইবে না কারো মুখপানে।
রং দেখে ভাই ভুলনাকো
চল্‌ছে মেকি সবখানে॥"

কবি নিজে এই উপদেশ বাক্য বরাবর স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি কাহারো মুখ পানে না তাকাইয়া মিষ্ট করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন। তবে তাঁহার সকল স্পষ্ট কথার সহিত আমরা সব সময়ে একমত হইতে পারি না। ভুল এবং মতভেদ সকলেরই আছে।

আমাদের লেখক দু চার জন প্রাতঃস্মরণীয় মহৎ লোকের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় ভাল করিয়া পান নাই। পক্ষান্তরে দু এক জন নিতান্ত অজ্ঞাতনামা কুলেখককেও নিজ পরিচিত বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিয়া বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। আবার অনেকগুলি ক্ষমতাশালী লেখকের লেখার সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকাতে তিনি আদৌ তাহাদের উল্লেখ করেন নাই।

যাহা হউক, মোটের উপর আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি, গ্রন্থখানি বেশ সরল ও সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সুললিত। তিনি কাহারো অনুকরণ করেন নাই। ব্যঙ্গের সময় তিনি ভাষার একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। ভাবগুলি যেন আপনা আপনি আসিয়া দেখা দেয়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত মতগুলি অধিকাংশস্থলে বিজ্ঞজন অনুমোদিত হইবে। মাঝে মাঝে আমরা নমুনা দেখাইতেছি।

বাঙ্গালায় প্রেমের বন্যার পর কেহ কেহ বীররসের আমদানী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের কবি তাহার চিত্র দিয়া জনান্তিকে বলিতেছেন—

"স্বার্থের ভাঁড় বাঁধা আছে
গলে আমাদের,
ধারে পেলে ঐ রসটা
কিনি দুচার সের।
অকাতরে দেশের তরে
প্রাণটা দিতে ঢেলে।
সূর্য্যিপক্ক কোন্ দেশেতে
এমন মানুষ মেলে?"

তার পর দেশের ভণ্ডামিতে বিরক্ত হইয়া কবি বলিতেছেন,

"বস্তা বস্তা ভণ্ডামি বল
কোথা হতে এল দেশে,
বালিকা ভণ্ড বালক ভণ্ড
ভণ্ড, পক্ককেশে।"

Joint Familyর "দ্বন্দ্বরাগ" কবিতাময় ব্যঙ্গের ভাষায় বড় সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে,

"শান্তি ঢালা এমন বিবাদ
অলঙ্কারের শিঞ্জন,
কত যুগ ধরি' বহিছে অমৃত
করিছে শ্রবণ রঞ্জন।"

এইরূপে আমাদের লেখক, সাহেবিয়ানা, sentimentality, anti-sentimentality, উপাধিব্যাধি, মৌখিক নিষ্কামধর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক দোষের সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। অনেকে এই ব্যঙ্গ-দর্পণে নিজ মুখচ্ছবি দেখিয়া লজ্জিত হইবেন এবং নিজ নিজ দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হইবেন। কবিও একবার একটু furious হইয়া serious ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছেন ;—

"শকুন্তলার ত্রুটি ধরা
দুর্ব্বাসা কি নাইকো আর?
একবার এসে অভিশাপে
ভস্ম করে ম্লেচ্ছাচার।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের "mutual admiration society" সম্বন্ধে লেখক বলেন,

"এদের গুণটা ওরা গায়গো
ওঁদের গুণটা এঁরা।
এরাই বলে সুসাহিত্যে
চিঁড়ের বাইশ ফেরা।"

অন্য জায়গায় বলিয়াছেন,—

"বাংলা মুলুকে সেই বড় হয়,
যাহারা কেবল ঢাক পিটোয়,
সাপ্তাহিকেতে আত্মগরিমা
জাহির করিয়া সাধ মিটোয়।"

এটা অবশ্য বিলাতী আমদানী। সেখানেও খুব মেকী চলিতেছে। তবে সেখানে ধরা পড়ে শীঘ্র। এখানে struggle for existence বড় বেশী। কে কার খবর রাখে? তবে সময়ে মেকী ধরা পড়িবে। চমৎকার অন্নচিন্তা হইতে একটু অবসর পাইলেই বাঙ্গালী আসল চিনিবে, মেকী ফেলিয়া দিবে। তবে কিছুদিন লম্ব কর্ণের প্রশ্রয় বাড়িবে। ততদিন,—

"বিদ্যালয়ের গুরু ছাড়া
সবাই বুদ্ধিমান্
তিনিও sharp তিনিও shrewd
যাঁর লম্ব কাণ।"

"খিচুড়ী" লেখক রুই কাতলা হইতে চুণো পুঁটি পর্য্যন্ত সকল প্রকার লোকেরই ছবি আঁকিয়াছেন। বড়দের ছবি সংক্ষিপ্ত এবং অস্ফুটস্ত, কিন্তু ভাবার গুণে বড় সুন্দর হইয়াছে। একটা নমুনা এই:—

"Primed muzzle রাসবিহারী
Law গননের triform,
ধর্ম্মভীরু Justice বন্দ্যো
Duty করেন Perfrom.

গ্রন্থকার, Justice Ghose, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত W. C. Banerji, সুরেন্দ্র বাবু, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকেরই এইরূপ সুকবিসঙ্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি আঁকিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখকদিগের প্রতিই একটু বেশী সমাদর দেখাইয়াছেন। সকলেরই দোষ গুণ উভয়ই দেখাইয়াছেন। কাহারো মুখপানে তাকান নাই। নিজের স্বাধীন মত স্পষ্ট ও সুন্দর করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাঙ্গালার সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ভালরূপ পড়াশুনা আছে। আমরা ক্রমে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। বর্ত্তমান বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিকে বলিয়াছেন,

নামে রবি, "ভাষায় যেন
চাঁদের সুধা ঢালা,
ময়ূখ অঙ্গে মধুর গন্ধে
নিখিল্ বঙ্গ আলা!!"

আবার একটু ব্যঙ্গভাবে রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন,

"শুনান তাহারে পিরীতির কথা
বলেন 'আমবনে নিতি আসিও,"
"আমি নিশিদিন তোমা ভাল বাসিব,
তুমি অবসর মত বাসিও।"

কবি দ্বিজেন বাবুকে ভালোয় মন্দয় কিঞ্চিৎ বলিয়া আমাদের গ্রন্থকার অন্যত্র বলিয়াছেন,

আমরা বলি দ্বিজেন ভায়া
খলের কথায় হও কালা।
তুমি মন্দ তারাই বলে
ধরে যাদের গা'র জ্বালা।

শ্রীশবাবুর মার্জ্জিতরুচির কথা বলিয়া, কবি তাঁহার সম্বন্ধে রবিবাবুর ভাষায় বলিয়াছেন,—

লেখার মাঝে প্রসাদ গুণটি
ছত্রে ছত্রে জানে,
ভাষা যেন তাকিয়ে থাকে
ভাবের অনুরাগে।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে গ্রন্থে আছে,

"দেবী বাবু ব্রাহ্ম-সাপের
ফণা দেন মুচড়ে।"

আমাদের বিদুষী রমণীদের যেটুকু প্রশংসা করিবার, কবি তাহা করিয়াছেন। সবদেশেই পুরুষ লেখকেরা রমণী লেখিকাদের আপোষে একটু নিন্দা করিয়া থাকেন। স্বয়ং কমলাকান্তও মালার আধখানা বই বেশী দেখেন

নাই। এটা একটা রঙ্গমাত্র। কাজের কথা নয়। তাই আমাদের কবি বলিয়াছেন,—

নীল মোজাতে ননীর ভাষায়
খেলে নবীন গাথা
পড়তে বড়, মিষ্ট লাগে
অর্থে ঘোরে মাথা।

দু একজন উদীয়মান পুরুষ-কবি সম্বন্ধেও একথা বেশ খাটে। কবি পরক্ষণেই যশের জনকতক বিদুষী লেখিকার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেনঃ—

ভাষা-সরিতে উদ্যমশীলা
সরলা বরলারূপিণী
আর অশ্রুকণার কলাবতী সতী
কোবিদ হৃদয়মোহিনী।

দেবী প্রিয়ম্বদা—

বীণার স্বননে স্তব্ধ নিশায়
বরষে মাধুরী ধারা,
সে মধু মুরলী মরমে পশিলে
হয়ে পড়ি নিজ হারা।

"আলো ও ছায়ার" কথা গ্রন্থ মধ্যে কোথাও দেখিলাম না। তাহা থাকিলে চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে প্রশংসা প্রাপ্য, সেখানে উপযুক্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং যেখানে দোষ আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যেখানে একটু অতিরিক্ত বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার ছন্দের বাঁধুনী এবং শব্দ যোজনার সৌন্দর্য্য সমালোচ্যমান দোষকে মোলায়েম করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রদর্পণে অনেক লেখক যথার্থ স্বস্ব মূর্ত্তি চিনিয়া লইতে পারিবেন; কিন্তু এই কবিতাময় মধুর বাণ-বর্ষণে কেহই তীব্রতা অনুভব করিতে পারিবেন না এবং হাসিতে হাসিতে নিজের দোষ শোধরাইতে পারিবেন।

জনকতক so-called উদীয়মান লেখককে কবি সুন্দর কবিতাময় ভাষায় তাঁহাদের যাহা প্রাপ্য, তাহা দিয়াছেন। একখানি সম্বন্ধে আমাদের কবি বলেন,

ইথে Bathos আছে, Pathos আছে—
কমা, সেমি—রেখা।

আর একখানি কেতাব সম্বন্ধে,

ইথে "saffron" আছে মস্‌লা আছে—
আছে কাশ্মীরি চাল,
ঘের্‌তো টুকু জুটলে পরে
কেউ দিতনা গা'ল।

আর একজন লেখক সম্বন্ধে আমাদের কবি বলেন,—

"যশের পথটি বক্র হলেও
ইঁহার কাছে ঠিক সোজা।"

অন্যত্র আর একখানি তথা-কথিত গবেষণাপূর্ণ কেতাব সম্বন্ধে,—

"অন্ধকারে ডুবদিয়ে ভাই
Fact তুলেছ যত
দেড়বুড়ি তার imaginary
এক বুড়ি তার হত।"

আজ কাল এক শ্রেণীর লেখকেরা ইংরাজীর একটা বিট্‌কেল্‌ তরজমা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি করিতে চান। তাহার একটা নমুনা এইরূপ "তিনি আমার খরচে খুব হাসিয়া লইলেন।" এইরূপ শ্রেণীর লেখক সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন;—

ভাবগুলি পড়ে, শুধু মনে হয়
সাহেব পরিয়া ধুতি চাদর,
ভাষার বনেতে করিছে ভ্রমণ
সেজে গুজে যেন দেশী বাঁদর।

Pseudo-critic এর জ্বালায় অনেক বড় বড় প্রতিভাশালী লেখক জ্বালাতন। তাই হঠাৎ সমালোচক সম্বন্ধে কবি বলেন,—

সে দিন দেখেছি যেমন তেমন
হঠাৎ কোথায় যাদু,
এমন মধুর পাইলে বিদ্যা
অমৃত সদৃশ স্বাদু;
বস্তাখানিক কিন্তু কিনেছ
শিখেছ তীব্র বাণী,
ইহারি বলেতে টানিছ মিত্র,
সমালোচনের খানি।

কবি ইঁহাকে একটু তীব্র ভাবেই বলিয়াছেন,—

তোমার ওই,
হরিৎ বরণ cheese টুকুনি
দেখিয়ে দিলেই হবে
যত্ন করে ঘাড় বাঁকিয়ে
রোমন্থিবে সবে।

একজন প্রতিভাশালী লেখকের ক্ষুদ্র সমালোচককে বলিয়াছেন,—

Maggot critic sweet brain এর
Genius পানে বেঁচে রয়।"

অন্য কবি সম্বন্ধে বলেন,

ভাইকে ভাবে পরের মত,
পরকে ভাবে আপন ভাই।
* * *
উঠিয়ে দিচ্ছে মাতৃ ভক্তি
শুধু শিখচে শক্তি পূজা।

আমাদের Pseudo-historian মহাশয়েরাও বাদ যান নাই। সাহেবের কেতাব হইতে চুরী করিয়া আবার সেই সাহেবকে গালি না দিলে গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস হয় না। উদাহরণ যথা,—

"সাহেবগুলোর কালির দোষে
সিরাজ ছিল ঢাকা,
ঘ'সে মেজে ক'রে তারে
কোজাগরের রাকা।"

যাঁহারা রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লিখেন, তাঁহাদের অনেকেরই বেশ নাটকীয় ক্ষমতা আছে; কিন্তু দর্শকমণ্ডলীকে খুসী করিতে গিয়া অনেক সময়ে তাঁহারা অনেক নাটক বিকৃত করিয়া ফেলিতেছেন। তাই আক্ষেপ করিয়া দু এক জনকে উপলক্ষ করিয়া কবি বলিতেছেন,—

রথের মত তোমায় টানে
দর্শকের দল।
* * *
বনের পাখী, খাঁচার মাঝে
চিরদিনই র'লে,
হাততালিতে চিরদিনই
গেলেরে ভাই গ'লে!
প্রতিভা তোমার নে'চে নে'চে চলে
গ্যাসালোকে শুনি হাততালি,
দারিদের ধন, বাঙ্গলা ভাষাটা
করতেছ কেন মিস্‌কালি?

আমাদের গ্রন্থকারের দোষও আছে। তিনি ২।৪ জন প্রতিভাশালী লোকের ঠিক estimate করিতে পারেন নাই। রমেশ বাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে ইনি বলেন,

"শতবর্ষে Grub Street
হইয়াছে কানা।

আরো একটা অন্যায় কথাই বলিয়াছেন,

"দত্ত সাহেব বলেন ধীরে
লাগাও ওরে গুলি,—
লাগাও গুলি আমায় খালি
M. P. কর ভাই।"

সুরেন্দ্র বাবুকেও কবি ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশীয় C. S. দেরও estimate ঠিক হয় নাই। দু একজন বেয়াড়া হইলেও মোটের উপর সকলেই ভাল। দু একজন খুব ভাল। কবির,—

"C. S.,—C. S.,— C. S.—করিয়া
তোমরা মর মাথা কুটি,
আমরা বলি C. S. হতেও
আমাদের ভাল রামঘটি।"

ঠিক হয় নাই। C. S. দের নম্বর গুণিয়া লওয়া যায়। উপরটা সকলের চক্‌চকে না হলেও ভিতরটা খাঁটি। চাকরীর আবরণে থাকে বলিয়া ভিতরকার রংটা হঠাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। C. Sত্ব ফুরাইলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেক C. S. তাই ভাবিয়াই গোড়া থেকে সাবধান হইয়া চলেন।

আমার পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে। সেই জন্য এইখানেই ইতি করিব মনে করিতেছি। তবে দু চারটা কথা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। আমার একজন বন্ধু এই খিচুড়ী গ্রন্থখানি পড়িয়া বলিয়াছিলেন, লেখক যেন দুর্ব্বাসা মুনি, সর্ব্বদাই যেন গঙ্গাজল ও পৈতা হাতে করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে অভিশাপ দিতে প্রস্তুত। উপর উপর পড়িলে প্রথমতঃ কতকটা এইরূপই বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। এক হিসাবে কবি দুর্ব্বাসা মুনি হইতে পারেন। পৌরাণিক দুর্ব্বাসা মুনি কখন বিনা প্রয়োজনে লোকসমাজে দেখা দেন নাই। কেবল যেখানে প্রয়োজন, সেখানে যেন ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। খিচুড়ী গ্রন্থকারও যেখানে উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছেন, সেইখানেই দুর্ব্বাসার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই একজায়গায় দেখাইয়াছি, কবি একস্থানে নিজেই "শকুন্তলার ক্রটিধরা দুর্ব্বাসার" আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন। পৌরাণিক-মুনির আশীর্ব্বাদ ও উপদেশের কথা শিষ্য-মণ্ডলীর বাহিরে বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার কবিজনোচিত ভাষায় কোন কোন লেখককে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন এবং বিজ্ঞজনোচিত উপদেশও দিয়াছেন। একজন নবীন কবিকে আমাদের কবি বলিতেছেন,—

কল্যাণবর —কবি
আশীষে কল্যাণ ছানিয়া
মস্তকে তোমার এই দীন কবি
যতনে দিতেছে ঢালিয়া।

* * *

ধন্যয়া বঙ্গ করিয়া অঙ্গ
জননী অঙ্ক যাচিয়া,
শিশুর সমান বিপুল হরষে
উঠ উঠ কবি নাচিয়া।
সঙ্কুচিত হ'য়! থাকুক দর্প
বিলয় হউক ফুল্ল,
কবি হে কর হে মিনতি আমার
হৃদয় শিশুর তুল্য।

ব্রাহ্মণ-কবির এই সুমিষ্ট কবিতাময় আশীর্ব্বাদ প্রত্যেক নবীন-কবি ও সু-লেখকের মস্তকে বর্ষিত হউক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

## [বিদেশ]ী-বর্জ্জন ও স্বদেশী-গ্রহণ।

[illegible]র অন্নের অভাব [illegible] [illegible]লাক হাহাকার করে [illegible] [illegible] সতর্ক হয় না। [illegible] চতুর্দ্দিকে হাহা-[illegible]র-ভারে পীড়িত ভারতের [illegible] টাকার ক্রমে [illegible] দিনের [illegible] প্রতিদিন [illegible] যাইতেছে। না

সম্প্রতি আমরা দক্ষিণ ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতস্থান সমূহ পরিদর্শন ও অবস্থা বিশেষে কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করিতে মফঃস্বলে

গিয়াছিলাম, যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মফঃস্বলের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আসিয়া, অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে, ঘরের পার্শ্বে, কলিকাতার শিবাজি উৎসবের আনন্দময় দৃশ্য দেখিতেছি, গান বাজনার ধ্বনি শুনিতেছি, আর মনে প্রশ্ন হইতেছে, যে দেশের স্বদেশপ্রেমিক হিতৈষী-দল স্বদেশী নিম্নশ্রেণীকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করেন ও ভুলিয়া থাকেন, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? ম্যাটসিনি দেশের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া বাল্যকাল হইতে শোক-বস্ত্র পরিধান করিতেন, আর আমাদের দেশের যাঁহারা দিগ্বিজয়ী হিতৈষী, (ছাত্রেরা গাড়ী টানিলেও যাঁহারা লজ্জিত হন না!) তাঁহারাও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মুমূর্ষু ব্যক্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই বিলাস-ভূষণে ও আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা!! এদেশের উন্নতি সম্বন্ধে আশা করিবার সময় কত নিদারুণ চিন্তা প্রাণে জাগিয়া উঠে! কবির বিবাদ-মাখা কথা মনে হয়—

'পর দীপ মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে'

দেশে চাউল দিন দিন এত দুর্ম্মূল্য হইতেছে কেন? আমাদের মনে হয়, পাট-চাষই তাহার অন্যতর প্রধান কারণ। সমস্ত জমীতে ধানচাষ হইলে, বিদেশে রপ্তানি হইলেও, খোরাকী চাউলের এত অভাব হইত না। কিন্তু আজ কাল বাঙ্গালার অধিকাংশ জমীতেই পাট-চাষ হইতেছে। পাট-চাষে অধিক টাকা পাওয়া যায় বলিয়া প্রায় সকল কৃষকই এদিকে মন দিতেছে। সকলেই যদি পাট-চাষ করে, তবে ধান কি আকাশ হইতে পড়িবে? গত বৎসর, ধরিতে গেলে কেবল বরিশালে ধান জন্মে নাই, অন্যান্য জেলার সর্ব্বত্রই, যাহারা ধান বুনিয়াছিল, তাহারা কতক না কতক ফসল পাইয়াছিল, কিন্তু লিখিতে হৃদয়-বিদীর্ণ হয়, অনেকেই ধানের বদলে পাটের চাষ করিতে আরম্ভ করায়, এবং রপ্তানি সমান ভাবে চলায়—ধান ও চাউলের দর এত বাড়িয়া গিয়াছে। সকলেই যদি পাট-চাষ করে, তবে ধান কি আকাশ হইতে পড়িবে? বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে হইলে পাট-চাষকে বন্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু একথা কৃষকদিগকে কে বুঝাইবে? স্বদেশীবস্ত্র গ্রহণের দিনও স্বদেশী নিম্নশ্রেণীর লোক সকল উপেক্ষিত!

বিদেশী-বর্জ্জন-নীতিকে অবলম্বন করিতে হইলে বিদেশ সম্বন্ধীয় সমস্ত, এমন কি, বিদেশে মাল রপ্তানি করাও বন্ধ করিতে হইবে। অবাধ-বাণিজ্য (Free-trade) ভারত রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যে কারণে বিলাতের চেম্বারলেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ অবাধ-বাণিজ্যের স্থলে সবাধ-বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিতে চাহেন, সেই কারণেই, ভারতকে বাণিজ্যে আত্ম-রক্ষা-নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। মহা পালোয়ানের সহিত দুর্ব্বল ক্ষুদ্রশিশুর যেমন যুদ্ধ করা সাজে না, আমাদের পক্ষে, তেমনি, অবাধ-বাণিজ্যের নীতি অবলম্বনে দুর্জ্জয় জাতি সকলের সহিত বাণিজ্য-যুদ্ধ করিতে যাওয়া সাজে না। আত্মরক্ষা ভিন্ন এদেশ রক্ষার আর উপায় নাই।

পাট-চাষে অবাধ-বাণিজ্য প্রশ্রয় পায়—আমা[illegible]বুকেও কবি ঠিক কা[illegible]ন্ট। সোণা বাঙ্গা[illegible] নাই। আমাদের দেশীয় ঐ. S. তবু estimate ঠিক হয় নাই। দু এক-[illegible]য়াড়া হইলেও মোটের উপর সকলেই কা[illegible]। দু একজন খুব ভাল। কবির,—

করিতে হয়। দরিদ্র ধান উৎপন্ন করিয়া যদি অন্ততঃ খোরাকী ধান ঘরে রাখিত, প্রতি বৎসর এরূপ অনাহারে লোক মরিত না। দুর্দ্দৈবে স্থান বিশেষে শস্য উৎপন্ন না হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশের সর্ব্বত্র হাহাকারের কারণ কেবল অজন্মা নয়। এক কারণ গবর্ণমেণ্টের লুণ্ঠন, দ্বিতীয় কারণ অবাধ-বাণিজ্য, তৃতীয় কারণ মূল ধনের জন্য মহাজনের অযথা অধিক সুদ-গ্রহণ, চতুর্থ কারণ, শিল্পের বিনাশ। কিরূপে অবাধ বাণিজ্য —আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা কে না জানে? বিলাতি সস্তা কাপড়ের আমদানিতে দেশের তাঁতি, কারিকর মারা গিয়াছে, বিদেশী সস্তা চিনির আমদানীতে খর্জ্জুর ও ইক্ষুর চাষ লোপ পাইতেছে, চিনির কারখানা সকল উঠিয়া গিয়াছে, বিলাতি লবণের আমদানিতে বহু স্থানের লবণের কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদেশী সিগারেটের আমদানিতে এদেশের তামাকের চাষ ও কারখানা উঠিয়া যাইতেছে!!

কেহ কেহ বলিতে পারেন, সস্তায় জিনিষ পাইলে কি দরিদ্রের উপকার হয় না? "সস্তা জিনিসের অর্থ [illegible] প্যারিচাঁদ মিত্রের লিখিত গরু-কেটে-জু[illegible]নের ব্যবস্থার ন্যায়। উপকার হয় [illegible] ঘরে ঘরে অন্ন থাকে। দেশের লোক [illegible] যদি অনাহারে মরে, তবে সস্তার জিনিস [illegible] করিবে কে? উদরের অন্ন, ঐ কাপড়, [illegible] চিনি, মদ, তামাক, নানা বিলা[illegible]সংখ্যায় প্র[illegible] খেলনা ইত্যাদি দিয়া যে তাহা[illegible] তাহা [illegible] কাড়িয়া লইতেছে, তা[illegible] এই—এদে[illegible]বেন না? অবাধ-বাণিজ্য [illegible] বাঁচিয়া থাকুক, [illegible]ন করিয়াছে। এখন [illegible] ভাবে চলিতে [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] ইচ্ছা [illegible] এই [illegible], সঙ্কীর্ণতা ও হিংসা বিদ্বেষ-মূলক বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা জগতের নরনারীর পরিচর্য্যা না করিয়া আপন পরিবার প্রতিপালন করেন কেন? "তোমরা বঙ্গ-বিভাগ করিয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাদের জিনিষ কিনিব না।"—এইরূপ কথা বলা যে ঠিক নয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। পরন্তু বিভক্ত বঙ্গকে আবার সংযুক্ত করা হইলেই কি বিদেশী বর্জ্জন-নীতি পরিত্যক্ত হইবে? যদি তাহা হয়, এদেশের সর্ব্বনাশের আর অবধি থাকিবে না। বরং পার্টিসন চির তরে থাকুক, তবুও এদেশের পক্ষে বিদেশী-বর্জ্জন-নীতি যেন পরিত্যক্ত না হয়, ইহাই আমাদের ব্যাকুল কামনা। লবণ ও চিনিতে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম লোপ হয়, একথা তুমি মান, বা না মান, ইহা তোমাকে মানিতেই হইবে, এদেশে লবণ ও চিনি প্রস্তুত করার ও বস্ত্র বয়ন করার জন্য সকলকে বদ্ধপরিকর হইতেই হইবে, নচেৎ দেশ রক্ষার আর উপায় নাই। স্বাধীন-বাণিজ্যে দেশের কত কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। "বয়কটের" বিরোধী ব্যক্তিরা বলেন, —"স্বদেশী গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছি না, তাহা কর না কেন?" একথার উত্তরে আমরা বলি—বিদেশী সস্তা জিনিস বাজারে থাকিতে স্বদেশী অধিক মূল্যের জিনিস বিকাইবে না। এবারের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে অনেক স্থলে নূতন চিনির কারখানা খুলিয়াছিল, কিন্তু আমরা যতদূর অবগত আছি, বিদেশী চিনির বাজার অত্যন্ত সুলভ করিয়া দেওয়ায়, দেশী চিনি বিক্রয় হইতেছে না। সুতরাং নূতন কার-

খানা সকল নিশ্চয় বন্ধ হইবে। বিদেশী লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া ভারতের চিনির কারবার মাটী করিতে বদ্ধপরিকর। এরূপস্থলে, আত্ম-রক্ষার জন্য বিদেশী বর্জ্জন কি সর্ব্বতোভাবে বিধেয় নহে? একবার দেশের কারবার বন্ধ করিতে পারিলে তাহারা শেষে মূল্য বাড়াইয়া সুদে আসলে আদায় করিবে। সব বিষয়েই এইরূপ করিয়াছে। পার্টিসন উঠিলেই বিদেশী-বর্জ্জন বন্ধ করিতে হইবে, ইহা যাঁহাদের মত, আমরা তাঁহাদের দলভুক্ত নই। পার্টিসন উপলক্ষে স্বদেশী-আন্দোলন সর্ব্বত্র উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা আমাদের চিরন্তন-নীতি—স্বদেশী-গ্রহণ ভিন্ন এদেশের আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। হিংসা, বিদ্বেষের জন্য নয়—"পার্টিসন করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের ক্ষতি করিব,"—এইরূপ কলুষিত ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াও নয়। আমরা চিরকাল স্বদেশ-রক্ষার জন্যই স্বদেশী-গ্রহণের পক্ষপাতী। স্বদেশী-গ্রহণের অর্থ স্বদেশী-বস্ত্র-গ্রহণ ও জাতি নির্ব্বিশেষে স্বদেশী ভ্রাতাদিগকে গ্রহণ, উভয়ই। আমরা এই উভয়েরই চির-পক্ষপাতী। আমরা জানি, কিছুতেই পার্টিসন উঠিবে না। মহামতি গোখলেই বিলাতে যাউন, দত্তই যাউন, কিছুতেই পার্টিসন উঠিবে না। পার্টিসন বঙ্গরক্ষার, তৎসহ ভারত-রক্ষার একমাত্র বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট একমাত্র উপায়। ইহা উঠিলে বিধাতার বিধানকে অস্বীকার করিতে হয়। তুমিও নও, আমিও নই, আমরা এ আন্দোলন তুলিতে পারি নাই, স্বয়ং বিধাতা আজ আন্দোলন-রূপে অবতীর্ণ। যাঁহারা তাহা না বুঝেন, তাঁহারা এখনও পরপদলেহনের জন্য বৃথা অর্থ ব্যয় করিতে লালায়িত, আমাদের এদুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। হায়!

এই দুর্ভিক্ষের দিনে, এই চতুর্দ্দিকের অন্ন-কষ্টের দিনে, এই টাকাগুলি যদি দরিদ্রের জীবন-রক্ষার জন্য ব্যয় হইত, না জানি, কত দীনদুঃখী জীবন পাইত!! কিন্তু সে কথা ভাবিবে কে? কংগ্রেস গরীব দুঃখীর কথা ভাবেন নাই, জমীদার সভা, ভারত সভা—কোন সভাই দরিদ্রের জন্য কখনও ভাবেন নাই। স্বদেশী-আন্দোলন-কারীরাও যদি দরিদ্রদের কথা ভাবিতেন, এই হাহাকারের দিনে শিবাজি উৎসবে পুতুল নাচ, যাত্রা ও বাজনায় বৃথা অর্থ নষ্ট করিয়া হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ জন্মাইতেন (কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্ট কোন কোন নেতাকে প্রলুব্ধ করিয়া এই কাজ করিতেছেন) না—এবং বরিশালের নির্য্যাতনের পরও আবার মর্লির পদলেহনের জন্য টাকা ব্যয় করিয়া বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইতেন না। বড় বড় লোকের বড় বড় মাথা—আমাদের ন্যায় দরিদ্রের রোদন কেবল অরণ্যেরই যোগ্য। হায়রে দেশ!!

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি,—এদেশের দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতে হইলে, সুদখোর মহাজনের নির্ম্মম হস্ত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। টাকায় টাকা সুদ—ইহাদে-ব মজীবীকুল উৎসন্ন যাইতেছে। বিলা স ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া, ধনীরা যদি কৃষিওয়া ক স্থাপন করিয়া সেই সব ব্যাঙ্কে টাকা রাখি রক্ষা ন, তবে দরিদ্রেরা রক্ষা পাইত, বিদেশেও বাবদে জলের ন্যায় অনেক টাকা চলি ণিজ্য প্রশ্রয়, ধনীরা ও লাভ পাইতেন কি কা ন্ট। নিবে, তাহার উপর পরাধীদের দেশীয় কোন হাত নাই—কিন্তু হয় নাই। স্ব ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদেশে পা ঘোটের উপর সকলেই রা করিতেছি, তাহাই খুব ভাল। কবির,—

কংগ্রেস কি সহরে সহরে, উপসহরে উপসহরে, থানায় থানায় কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দেশের নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা ও বিদেশী ব্যাঙ্কের হাত দিয়া বিদেশী টাকা পাঠান বন্ধ করিতে পারিতেন না? এ দেশের লোন আফিস সকলে কত আয় হইতেছে, কেহ কি তাহা জানেন না? কৃষি-ব্যাঙ্ক করিলে তাহার আয়ে কত লক্ষ্মী-মিল স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু সে কথা দীর্ঘকাল পরেও কাহারও মাথায় প্রবেশ করিতেছে না। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কারণ কেবল এই, দরিদ্র-দিগকে উত্তোলিত করিলে অনেকের স্বার্থে বজ্রপাৎ হয়। তাই, বোধ হয়, দরিদ্রদিগকে বাদ দিয়া স্বদেশী-গ্রহণ-নীতি সাধনে সকলে বদ্ধপরিকর। মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিতেন, "তাহাদিগকে ত আমরা মানুষ মনে করি না, তাহারা যে পশু, আর আমরা যে শিক্ষিত মনুষ্য! পশুর উপকার কি মানুষে করে?" হায়, দুঃখের বোঝা চিরদিন মস্তকে বহিয়া কত দুঃখী প্রজা আজ মৃত্যু-মুখে পতিত!! কেহ তাহাদের জন্য এক বিন্দু চক্ষের জলও ফেলিলেন না!!

গবর্ণমেণ্টের লুণ্ঠন-কার্য্য বহু-কর-ভার-পীড়িত ভারতে কিরূপ অবাধে চলিতেছে, অনেক প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এ প্রবন্ধে আর তাহা লিখিলাম না।

এই দেশের শিল্পের বিনাশ সাধনের জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট কত জঘন্য কার্য্য করিয়াছিল, এই সংখ্যায় প্রকাশিত ধীরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধেপাঠক তাহা পাঠ করিবেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই—এদেশের লোক দুর্ব্বল হইয়া মৃতবৎ বাঁচিয়া থাকুক, হাত পা নাড়িতে বা মনুষ্যের ন্যায় চলিতে ফিরিতে না পারে!—গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই—ভারতের লোক কেবল ভিস্তি ও কাঠুরে (drewers of water & hewers of wood) হইয়া থাকুক। ইচ্ছা এই—অনাহারে মরিবার সময় আর উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া গবর্ণমেণ্টের গোলামীতে অথবা পদলেহনে সকলে প্রাণ মন ঢালিয়া সর্ব্বসুখ লাভ করুক। এই ইচ্ছা সাধনের জন্য, কখনও কখনও প্রলুব্ধ করিয়াও, দুই চারিটা বড় বড় কাজও দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমেই জাল গুটাইয়া আনিতেছেন—আর বেশী দিন ঐ ইচ্ছা-সাধনার জন্য আর তাহাকে অযথা ব্যয়-বাহুল্য করিতে হইবে না। আমরাও, ঐ দৃষ্টান্ত অনুকরণে, নিম্নশ্রেণীকে উপেক্ষা করিয়া বরাবর চলিয়াছি। যেমন গবর্ণমেণ্ট, আমরাও তেমনি। কেমন জগজ্জয়ী উদারতা দেখত! এইরূপ অবস্থায় একতা কেমনে আসিবে, বল ত?

বুঝিয়া শুনিয়া এখন সংযত না হইলে আর এই দেশের উদ্ধারের উপায় নাই।

কিন্তু এ দেশের বড়লোকেরা, শিক্ষিত লোকেরা সে কথা বুঝিবেন না—দরিদ্র-দিগকেও তাঁহারা ডাকিবেন না;—ডাকিয়া তাহাদিগকে এ সব কথা বুঝাইবেন না। এই যে বিদেশী-বর্জ্জনের কথা উঠিয়াছে, সে কথায়,—শুনিতেছি, নিম্নশ্রেণী বলিতেছে, "আমরা তোমাদের কথা শুনিব কেন? তোমরা, আমাদের শিক্ষার জন্য, নানা অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছ? তোমরা আমাদের কে যে, আমরা সস্তার জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দুর্ম্মূল্য জিনিস কিনিব?" তাহাদিগকে শুধু কথায় বুঝাইলেও তাহারা বুঝে না দৃষ্টান্ত চায় মৌলবী লইয়া মফঃস্বলে যাও, তবুও তাহারা বুঝিবে না। যে [illegible] বিদেশী-বর্জ্জনের মহা আড়ম্বরে

দেশবিখ্যাত হইয়াছে, সেই বরিশালের মুসলমান নিম্নশ্রেণীও বিদেশী বর্জ্জন করিতেছে না। তাহারা জানে, এদেশের "জমীদার বাবুরা তাহাদের রক্তশোষণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চায় না।" যদি জমীদারদের হৃদয় থাকিত, এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে, পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধের জন্য, বা পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য বা গুরু পুরোহিতের পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য, বা পাকা ইমারতের জন্য যত খাজনা, তত আবওয়াব আদায় করিতে পারিত না। তোমরা হৃদয়বান শিক্ষিতশ্রেণী, তোমরা নেতা, তোমরা কত বক্তৃতা করিতেছ কোন্‌দিন ছাত্রেরা তোমাদের গাড়ী টানিবে, সেই আশার নেশায় মাতিতেছ, একদিনও কি কোন দরিদ্রকে দুমুষ্টি খাইতে দিয়াছ? একদিনও কি তাহাদের জন্য দু ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়াছ! বিদেশী কত লোক গারো পাহাড়ে, নাগা পাহাড়ে দরিদ্রের উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতেছে, তোমরা স্বদেশী হইয়াও স্বদেশীর জন্য কিছুই করিলে না! স্বদেশীকে বাদ দিয়া তোমরা স্বদেশী-গ্রহণ-ব্রত উদযাপন করিবে? ধিক, শত ধিক!!

বুঝিতেছি, সর্ব্ব প্রকারে বিদেশী-বর্জ্জন ও সর্ব্বপ্রকারে স্বদেশী-গ্রহণ ভিন্ন এদেশ রক্ষার আর উপায় নাই; কিন্তু তাহা সাধনের উপায় কি? নিম্নশ্রেণী তোমাদের সহিত যোগ না দিলে, নিশ্চয় জানিও, কিছুতেই কিছু হইবেনা। তাহার সুযোগ উপস্থিত! এই দুর্ভিক্ষের হাহাকারের দিনে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতে যাও, তাহারা তোমাদের গোলাম হইয়া যাইবে।

তাঁহারা লাঠী খেলার আয়োজন করিতেছেন কেন? পুতুলনাচের এ রঙ্গ কেন? লাঠী খেলিয়া বল বিধান হইবে এবং তাহাতে দেশোদ্ধার হইবে? দেশোদ্ধারের মূল মন্ত্র লাঠী বা অস্ত্র সাধন নয়, প্রেম-সাধন ও একতা-সাধন, নিশ্চয় জানিও।

একতা-সাধন ভিন্ন কোন দেশ জাগে নাই, কোন দেশ জাগিবে না। একতা-সাধন হইলে জগতের সকল অসাধ্য সাধিত হয়, কিছুই অসাধ্য থাকে না। অস্ত্রে যাহা সিদ্ধ হয় না, শুধু একতায় তাহা সিদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে যদি প্রকৃত একতা থাকিত, অস্ত্র আইন কি ক্ষতি করিতে পারিত? উহাদের বারুদ, গুলি, গোলা, টাকা, কড়ি, সব কি আমাদের নয়? কিন্তু হায়—সে একতা কতদূর! আমরা ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই; আমরা ভায়ের রক্ত পান করি। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধাই, দরিদ্র বধ করিতে সদা প্রস্তুত, অথবা দরিদ্রেরা অনাহারে মরিলে ফিরিয়াও তাকাই না! হায়, সে একতা কতদূর? হায়রে হায়, আমাদের দ্বারা ও নাকি দেশোদ্ধার হইবে!

আমরা নাচ তামাসায়, যাত্রা গানে, বিবাহ পার্ব্বণে কত কোটী কোটী টাকা উড়াইয়া দেই—কিন্তু দরিদ্রকে দুবেলা খাইতে দেই না! তাঁহারা দেন না, তুমি হিতৈষী, তুমিও দেও না, আমিও না! আমরা দিগ্বিজয়ী আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থ লইয়া জগতে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া ফিরিতেছি। শত ধিক্ আমাদিগকে?

একদিন মহাত্মা রামতনু বলিয়াছিলেন—"আমার রসিক কৃষ্ণ, (রসিক ত মানুষ ছিল না, সে যে দেবতা ছিল), একদিন দুর্ভিক্ষের সাহায্যের খাতা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিল, "আপনি কিছু দিন।" আমি কি দিব, ইতস্তত করিয়া ভাবিতেছিলাম। বিলম্ব দেখিয়া রসিক অধীর হইল, চাহিয়া দেখি, তাঁহার দুনয়ন দিয়া জলধারা পড়িতেছে,—চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে।

রসিক বলিল—"আপনি হয়ত ৵০ স্বাক্ষর করিবেন, তাহা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, কিন্তু জানেন না কি যে, ঐ ৵০ আনায় এক জনের জীবন রক্ষা হইতে পারে? ৫।৬ দিন অনাহারের পর একদিন খাইলেও লোক আর ৭ দিন বাঁচিতে পারে। তখন হয়ত অন্য উপায় হইতে পারে। সামান্যে কত উপকার হয়, জানেন না কি?" এই কথা বলিবার সময় দেখিলাম, রামতনুর নয়ন হইতেও জল পড়িতেছে। ইঁহারাই ছিলেন, মানবদেহে দেবতা;—আর আমরা, কেবল বাক্যবাগীশের দল!

সামান্যকে যে উপেক্ষা করে, সে কখনও মহৎ হইতে পারে না। অণু অণু জমিয়া পরমাণু; পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিয়া মহাপর্ব্বত সৃষ্টি করে। এক পয়সার হিসাব যে করিতে পারে না, লক্ষ কি বস্তু, সে বুঝিতে পারিবে না। আমরা যখন অপব্যয় করি, তখন এই কথাটী স্মরণ রাখা একান্ত উচিত। সান্তে আরম্ভ, অনন্তে পরিণতি। একটু একটু উপকার করিতে করিতে উপকার-সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যায়। একটু একটু ভালবাসিতে বাসিতে অনন্ত মানব-পরিবারকে ভালবাসা যায়। প্রেম-সাধনার পথ ধর, কখনও নিরন্ন, দরিদ্রদিগকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না; তাহাদের দুঃখে তোমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে। যখন প্রেম-সাধনার পথ পাইবে—তখন কোটী লোকের কোটী কোটী অভাব তোমাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিবে, তুমি কিছুতেই নিজের সুখের চিন্তায় বিভোর থাকিতে পারিবে না—অন্যের অভাব থাকিতে নিজে খাইতে বা পরিতে পারিবে না;—তাহাদের দুঃখ শোক, তোমার দুঃখ শোকে পরিণত হইবে; তখন তুমি ও সে—একাত্মক হইয়া যাইবে। তখন ম্যাটসিনির ন্যায় তাহাদের ন্যায় মলিন বা শতগ্রন্থী-বস্ত্র পরিধানে তোমার ইচ্ছা হইবে। এইরূপ প্রেম-সাধনের পথে যখন সব একাকার হইবে, তখন তোমার সাদর বাক্যে সকলে মাতিবে—এক সুরে সকলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে। তখন আর পাশব-বলসাধনের প্রয়োজন হইবে না—আত্মিক বলে অসাধ্য সাধিত হইবে; এক হুঙ্কারে বিশ্ব বিজিত হইবে, স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপিয়া যাইবে; অসুর দল প্রকম্পিত ও ভয়ে জড়সড় হইবে। তুমি প্রেম সাধন করিবে না, অথচ একতা আসিবে;—দরিদ্রের জন্য ভাবিবে না, অথচ একতা আসিবে? তাহা কখনও হইবে না, নিশ্চয় জানিও। স্বদেশী দরিদ্রকে বাদ দিলে কখনও পূর্ণাঙ্গে স্বদেশী-গ্রহণ হইবে না, নিশ্চয় জানিও। ভাবিতে শেখ, জীবন বলি দিতে শেখ, আপনাকে বিতরণ করিতে শেখ, সব অসাধ্য সাধিত হইবে; তুমি অগণ্য জনগণের হৃদয়-সিংহাসনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনভিষিক্ত রাজা হইবে। না হইলে, সহস্র রবীন্দ্রনাথও তোমাকে নেতৃত্বের সিংহাসনে বসাইয়া দিতে পারিবেন না।

বিদেশী-বর্জ্জন ও স্বদেশী-গ্রহণ ব্রত এক সূত্রে, এক মূলে গ্রথিত—তাহা দেশ রক্ষার দুর্লঙ্ঘ্য সোপান। যদি ইহা সাধন করিতে চাও, প্রেম-সাধনের পথ ধরিয়া অসংখ্য স্বদেশী দরিদ্র কাঙ্গালের পর্ণকুটীরের দিকে ধাবিত হও! হায়, তাঁহারা যে মরিয়া গেল!! কেবল স্বদেশী-দ্রব্য-গ্রহণ করিবে, কিন্তু স্বদেশী লোক গ্রহণ করিবে না? তাহারাই যে চৌদ্দ আনা। বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, সকল স্বার্থ তাহাদের জন্য একবার ঢালিয়া দেও ত, দেখি, পুণ্যময় স্বদেশী-গ্রহণ-ব্রত সফল হয় কি না?

# আমাদের গলদ কোথায়

"Our past becomes the mightiest teacher to our future; looking back over the tombs of departed errors, we behold, by the side of each, the face of a warning angel."

—*Lord Lytton.*

"Let us make one education, brave and preventive. Politics is an after-work, a poor patching...... what we call our root-and-branch reforms of slavery, war, gambling, intemperance, is only medicating the symptoms. We must begin higher up—namely in Education."

—*Emerson.*

আমরা ঝড়ের ঢেউ। আমরা বাতাসের জোরে, বাতাস যেদিকে আমাদিগকে লইয়া যায়, আমরাও সেই দিকেই প্রতিনিয়ত ভাসিয়া চলি। বাতাস উঠে বলিয়া, আমরা নড়িতে আরম্ভ করি, আবার বাতাস যেমনি যেখানে বন্ধ হইয়া যায়, আমরাও ঠিক সেই-খানে তেমনি থামিয়া যাই। আমাদের এই বহু পুরাতন, সুবিস্তীর্ণ সুনীল আকাশে অনেকবার অনেক বড় বড় তুফান উঠিয়াছে। এই সেদিন রামমোহনের তুফানে, দেশের প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলির টিকি সকল একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবার উপ-ক্রম হইয়াছিল। তারপর বিদ্যাসাগর এক-দিকে, ও অন্যদিকে মহাদেও গোবিন্দ রাণাড়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই মরিয়া গেলেন! রাজ-নৈতিক তুফানও তো আজ প্রায় ২২ বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রক-ম্পিত করিতেছে। কিন্তু, কই, আমরা যে তিমিরে, আমরা কি সেই তিমিরে নই?

আমাদের গভীর মাটি, এই সকল তুফানে একটুকুও কি কোনও যায়গায় ধসিয়া গিয়াছে? আমাদের আজন্ম প্রসিদ্ধ রক্ষণ-শীলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া—ধর্ম্মজীবনের রক্ষণ-শীলতা, সামাজিক জীবনের রক্ষণশীলতা, ও রাজনৈতিক জীবনের রক্ষণশীলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া,—এই সকল উত্তালতরঙ্গমালা কি আমাদের আবর্জ্জনার কোনও একটা গতি নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছে? পারিলে, আজো আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়, কেবল পিটিশনের উপর পিটিশন পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় গৃহে নিদ্রা-নিমগ্ন হইতে পারিতেন না। আজ তাহা হইলে আমাদের দেশের নেতাগণ নিশ্চয়ই বুঝিতেন যে, আমাদের রাজনৈতিক এভোলিউশনের পূর্ব্বে কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক এভোলিউশন হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে আজ আমা-দের ধর্ম্মবীরগণও নিশ্চয়ই বুঝিতেন যে, আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে একটা মীমাংসা না হইলে, আমাদের আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু এ সকল আজো এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের নিকট খুববেশী কেবল খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিবার বিষয় মাত্র! ইহাতেই আবার আমরা জাগিতেছি!!

সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আমাদের গলদ কোথায়? গলদ আমাদের সর্ব্বত্রে, আমাদের এই জাতিটাই একটা বিষম গলদের প্রকাণ্ড বলদ। আমাদের এমনি অদৃষ্ট যে, আমাদের কি চাওয়া উচিত, তাহাই আজ পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই! আমরা কি চাই তাহার আলোচনায় এখনি প্রবৃত্ত হইলে, এই প্রবন্ধ এবারে শেষ করা কষ্টকর সেইজন্য সে কথা বাদ দিয়া, আমাদের কি

চাওয়া উচিত, একেবারে সেই কথারই এখানে উত্থাপনা করিতেছি। আমাদের কি চাওয়া উচিত, তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারিত হইলে, কিরূপে তাহা আমাদের আয়ত্বাধীন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য। মানুষকে এজগতে কোনও কাজ করিতে হইলে, সে সর্ব্বাগ্রে সেই কাজ করিবে কিনা, তাহা মনে মনে ঠিক করে। মানুষের ইচ্ছা, তাহার সকল কার্য্যেরই পূর্ব্বগামী। সেইরূপ আমাদের কি চাওয়া উচিত, তাহা ঠিক করিয়া সেই ইচ্ছাকে হৃদয়ে বলবতী করিলে, আমাদের উপাস্য দেবতা আপনা হইতেই, একদিন না একদিন, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।

কাজেই এখন দেখা যাউক, আমাদের কি চাওয়া উচিত। আমরা জগতের সকলে, মুখে যে যাহা বলি না কেন, আমরা প্রত্যেকেই, হিন্দু ও মুসলমান ও খ্রীষ্টান, সকলেই আদর্শ-বাদী। আমি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করি, কারণ, তাহা আমার আদর্শের উপযোগী; তাহাতে আমি এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহা আমার আদর্শের নিকট ম্লান হইয়া যায়। সে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করে, কারণ—সেই এক কথা। তুমি মহম্মদের ধর্ম্মে বিশ্বাস কর, কারণ অন্য কিছুই নহে। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের আদর্শই আমাদের ধর্ম্ম। কিন্তু মনুষ্যের এই আদর্শ বা আদর্শজ্ঞান, চিরদিনই এ পৃথিবীতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, গ্রীক ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন অঙ্গহীন সন্তানকে পিতামাতাগণ মরিয়া যাইবার জন্য রাত্রিকালে শীতের কোলে ফেলিয়া দিত। তাহারা বড় হইলে, স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতে পারিবে না, তবে তাহাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিবার আবশ্যক কি? ইহাই সে সময়ে গ্রীকদিগের আদর্শ ছিল, এবং সেই জন্যই, আজ তাহারা নিজেরাই যাহাকে বর্ব্বরতা বলিয়া গালাগালি দিতেছে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাহা কত যত্নের সহিত প্রতিপালন করিত!

আমাদের এই ভারতবর্ষেও যে কোনও আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এমন নহে। সতীদাহ প্রথা এক সময়ে ভারতবাসীর কত গৌরবের জিনিষ ছিল। সতীত্বের জন্য ভারতরমণী যেমন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তেমন আর এ পৃথিবীর কোথায় দেখিয়াছ? কিন্তু এ আস্ফালন আর নাই; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন যে, আমাদের মাতা, মাতামহীগণ অন্যায় কার্য্য করিতেন। গঙ্গাসাগরে ধর্ম্মের নামে যে আর এক বিভৎস ব্যাপার সংসাধিত হইত, তাহাও আজ ভগবানের কৃপায় আমাদের ইতিহাসের কেবল এক অতীত কাহিনী মাত্র। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমাদের আদর্শ পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের আদর্শ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই, আমরা যদি আমাদের আদর্শ অনুসারে কাজ করিয়া যাই, এবং পরে আমাদের বংশধরগণ আসিয়া আমাদের দোষ ধরেন, আমরা সেজন্য একটুকুও দায়ী নহি। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ; আমরা যখন যেমন বুঝি, আমাদের নিকট ভগবান ততটুকুই আশা করেন। তাহার অধিক আশা করা তাঁহার অন্যায়, এবং আমরা সত্যই তাহার বেশী এ জগতে এতটুকু কিছুই করিতে পারি না!

গ্রীকগণ বুঝিয়াছিল যে, অঙ্গহীন সন্তানকে মারিয়া ফেলা উচিত; এবং সেই জন্যই তাহারা অঙ্গহীন সন্তানকে মারিয়া ফেলিত। কিন্তু কে এখন একথা জোর করিয়া বলিতে

পারে যে, সেইজন্য গ্রীকগণ স্বর্গরাজ্যে স্থান পায় নাই? পুরাকালে হিন্দু রমণীগণ, স্বামীর সহিত জীবন লীলা সম্বরণ করাকে, তাঁহাদের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, এবং সেইজন্যই তাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় স্বামীর চিতানলে আপনাদিগকে পুড়াইয়া ফেলিতেন। কিন্তু কে এখন বলিতে সাহসী হইবে যে, তাঁহাদের এই প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন জন্য তাঁহারা চির-নিরয়গামী হইয়াছেন? না, একথা কেহই বলিতে সাহসী হইবে না। মানুষ যখন যে জিনিষকে তাহার প্রকৃত আদর্শ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন যদি সে তাহা কার্য্যে সুসম্পন্ন করিয়া যায়, তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সে সমাধান করিয়া গেল। তাহাকে এ জগতের কাহারো, কোন কালে, কিছুই বলিবার ক্ষমতা নাই।

ইহা যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে সকল খ্রীষ্টানগণই বলিত যে, যাহারা এ জগতে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা খ্রীষ্টান ছিল না বলিয়া, তাহারা সকলেই নরকে গিয়াছে। যিনি এখন ব্রাহ্ম, তিনি বলিতেন, রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বের সকলেই কেবল অন্ধকারের জীব তাহাদের নাম করিও না। বৌদ্ধগণ বলিত, বুদ্ধের পূর্ব্বে যাহারা এ পৃথিবীতে আসিয়াছিল, তাহারা নির্ব্বাণ কাহাকে বলে জানিত না, এবং কাজেই তাহাদের মুক্তি হয় নাই। কিন্তু আমাদের কেহ কি এখন এ কথা কাহাকেও বলিয়া থাকি? ধর্ম্মরাজ্যের সামান্য অপোগণ্ড শিশুও, এ কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবে! এই কারণেই এইমাত্র বলিয়াছি, মানুষ যখন যে জিনিষকে তাহার প্রকৃত আদর্শ বলিয়া সে বুঝিতে পারে, তখন যদি সে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া যায়, তবে এ জগতে তাহার যাহা করিবার, তাহার সকলি সে এ জগতে করিয়া গেল। স্বর্গ বলিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যদি কোনও স্থান থাকে, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই স্বর্গরাজ্যের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত।

আমরাও যদি আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর আদর্শ কি, তাহা বুঝিয়া, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া বা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, মরিয়া যাই, তবে এ জগতে আমাদের যাহা করা উচিত, তাহা সকলি আমরা করিয়া যাইব। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কখনো যদি স্বর্গে গিয়া থাকে, তবে সেইজন্য স্বর্গ আমাদিগেরও বাসস্থান হইবে ইহা ধ্রুব সত্য কথা। সুতরাং, আমাদের এখন দেখা আবশ্যক, এই বিংশ শতাব্দীর আদর্শ কি, এবং তাহা আমাদের বর্ত্তমান আদর্শ কি না। আমি কিন্তু এ সম্বন্ধে এখানে বেশী কিছু লিখিতে চাহি না; যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহারা ইহার সকলি অবগত আছেন। আমি কেবল ইহাই এইখানে বলিতে চাহি যে, এই বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোচ্চ আদর্শের নাম রাজনৈতিক-স্বাধীনতা। ইহার মূলভিত্তি, যে দিন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই দিন এ জগতে মাত্র অঙ্কুরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিকাশ, যে দিন ১৯০৫ সালে রুষের সহিত জাপানের সন্ধি সংস্থাপন হইয়াছে, সেই দিন আমরা স্বচক্ষে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর এই রাজনৈতিক-স্বাধীনতা, আমাদের বর্ত্তমান আদর্শ নহে। কিন্তু এই রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বর্ত্তমানে এ পৃথিবীর একমাত্র জিনিষ; তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদের একান্ত মনে প্রার্থনা করা উচিত।

আমাদের দেশে এখনো বোধ হয় অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, রাজনীতি অর্থেই পাপ—ভ্রাতৃবধ! কার্য্যগতিকে কথাটা সত্য হইয়া দাঁড়াইতেছে বটে। যাঁহারা ভূতকালে, দৈবযোগে, সামান্য চেষ্টায়, অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে না বধ করিলে তাঁহারা যে আর তাঁহাদের আধিপত্যের একটুকুও কিছু কাহাকেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন? কিন্তু সে যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম যে, বর্ত্তমান সময়ে কেবল আমাদের কেন, সমস্ত বিভিন্ন জাতিরই, রাজনৈতিক-স্বাধীনতাই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হওয়া বিধেয়। রাজনৈতিক-স্বাধীনতা না হইলে, বর্ত্তমান সময়ে ও পৃথিবীতে কোনও জাতিই ধনবান হইতে পারে না। আবার বর্ত্তমান সময়ে, ধনবান না হইলে, কোনও জাতিরই দৈনিক জীবনে সুখলাভ অসম্ভব। এবং দৈনিক জীবনে যাহাদের সুখ নাই ও শান্তি নাই, তাহারা কি কখনো, কোনও কালে, ধর্ম্মজীবনে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছিল? আমাদের অতীতের সহিত, আমাদের বর্ত্তমানের তুলনা হইতে পারে না। আমরা এই কথাটা যদি একবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম, তবে আমাদের সকল জ্বালাই ঘুচিত!

কেবল যে উল্লিখিত কারণের জন্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আমাদের সকলের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত, তাহা নহে। তাহার আবার একটী বিশেষ কারণ রহিয়াছে। আমরা আমাদের এই ধার্ম্মিক ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী হইতে শুনিয়া আসিতেছি, পৃথিবীতে একদিন আসিবে, যে দিন আমরা এ জগতের নরনারী সকলেই আপনাদিগের সকল কুব্জপৃষ্ঠ ও সুব্জদেহগুলি ঘসিয়া মাজিয়া, আমরা সকলে এক হইয়া যাইব। আমার বিশ্বাস, যে দিন এ জগতের প্রত্যেক বিভিন্ন জাতি তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক ও স্বাধীন-রাজ্যে তাহারা বসবাস করিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিন—কেবল সেই দিনই—এ কথা কখনো এখানে সম্ভবপর হইতে পারে; তাহার একদিনও পূর্ব্বে নহে। কারণ এই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র মানবমণ্ডলীর ভিতর একরূপ কোন কিছু সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, মানবমণ্ডলীর প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সেইরূপ কোন কিছুর সম্যক উৎকর্ষসাধন হওয়া একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ universality-র পূর্ব্বে individuality। কথাটা আরো একটু খুলিয়া বলিতেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও এক ধর্ম্মবন্ধুর সহিত তর্ক বিতর্ক হইতে হইতে, প্রশ্ন উঠিয়াছিল—জাতীয়তার অর্থ কি? জাতীয়তা কথাটা কি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে? জাতীয়তার পৃষ্ঠপোষক হইলে, brotherhood of man থাকে কোথায়? আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম মানুষ সর্ব্বাগ্রে আপনাকে প্রকৃতরূপে ভাল না বাসিলে, সে এ জগতের অন্য কাহাকেও কখনো এতটুকু পরিমাণেও ভালবাসিতে পারে না। ব্যক্তিত্ব সকল জিনিষেরই অগ্রগামী, ব্যক্তিত্ব জাতীয়তারও অগ্রগামী। ব্যক্তিত্ব জাতীয়তার অগ্রগামী না হইলে, জাতীয়তা বিশ্বগ্রাসীন্ হইবে। সে তাহার নিজের যাহা প্রাপ্য, তাহা পাইয়াও, সে কিছুতে নিশ্চিন্ত রহিতে পারিবে না। তাহাই এতদিন এ জগতে হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু, ব্যক্তিত্ব যদি জাতীয়তার অগ্রগামী হয়, তবে জাতীয়তা-লাভের পর কোনও জাতি, অন্যের জাতীয়তা-হরণ করিতে যাইবে না। কারণ,

সে জাতি এই কিছুদিন পূর্ব্বে জাতীয়তা-বিহীন ছিল; এবং জাতীয়তা-বিহীন হইয়া এজগতে বর্ত্তমান থাকা কতদূর কষ্টকর, তাহা তাহাদের অবিদিত নাই। সেই সকল কথা জ্ঞাত থাকা সত্বেও, যদি কোনও জাতি, অন্যের জাতীয়তা হরণ করিতে যায়, তবে তাহাদের জাতীয়তা-লাভ এ জগতের পক্ষে মঙ্গলকর ঘটনা নহে।

এইরূপ রাজনৈতিক-স্বাধীনতাই এই বিংশশতাব্দীর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, এবং যুক্ত-রাজ্যের মার্কিণজাতি ফিলিপিনোদিগের সহিত কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে যাইতেছে, তাহা ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। এইরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদিগেরও সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। ইহাতে আমাদের কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সকল প্রকারেরই পরিত্রাণ লাভ হইবে। কিন্তু আমাদের প্রথম গলদ এই যে, আমরা কেহই ইহাকে এখনো আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করি না। আমাদের দেশের নেতাগণ, ক্যানেডা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় যেরূপ স্বায়ত্বশাসন প্রচলিত রহিয়াছে, সেইরূপ স্বায়ত্বশাসনের জন্য ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু হায়, তাহারা যে আর কিছুদিন পরে কি হইবে, তাহার সংবাদ কে রাখিতেছেন? তারপর, স্বায়ত্বশাসনের অর্থ স্বাধীনতা নহে। আমরা জন্মিয়াছিলাম এজগতে পবিত্র ও স্বাধীন, আমরা সেইরূপ পবিত্র ও স্বাধীন ভাবে মরিতে পাইব না কেন?

আমাদের দ্বিতীয় গলদ, এবং তৎপরবর্ত্তী গলদটিও, আমাদের এই প্রথম গলদের অবশ্যম্ভাবী ফল! আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে যেমন আমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত, তেমনি আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের প্রধানতম অঙ্গে—আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানেও,— আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার। আমরা আজো আমাদের জীবনের খাতায় আমাদের জীবনের ধর্ম্ম-অঙ্ক সকল, অতিযত্নের সহিত গোঁজামিল দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি! কিন্তু ধর্ম্ম ও আদর্শকে প্রিন্সিপিলে এক করিতে হইবে। আদর্শ যদি সংসার-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এবং ধর্ম্ম যদি বৈরাগ্যেরই উপাসক হয়, তবে এ জগতে এই দুই জিনিযের সামঞ্জস্য কোথায়? আমরা এখনো এ জগতের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে, আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তাহার অদ্বিতীয় কারণ তাহা আমাদের বহুকাল প্রচলিত আত্মোচ্ছেদী-ধর্ম্মের সহিত এক সমতলক্ষেত্রে কিছুতেই পদস্থাপন করিতে পারিতেছে না। ঢেউর উপর ঢেউ আসিয়া আমাদের ধর্ম্ম-অট্টালিকার সিংহদরজায়, সিংহ-রবে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে, কিন্তু আমাদের দুর্গ—অচল, অটল, অক্ষয়!

আমাদের যাবতীয় যত কিছু উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহাদের সারাংশটুকু ইংরাজী একটী কথায় প্রকাশিত হয়। সে কথাটী Self-effacement। আমরা আমাদের অস্তিত্বকে এ জগতের চক্ষে একেবারে মুছিয়া ফেলি, ভগবান-প্রদত্ত আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহকে আমরা নগ্ন ও পুঙ্গ হইয়া যাইতে দিই, আমরা আমাদের প্রবৃত্তি গুলিকে অসাড় কাষ্ঠবৎ করিতে চেষ্টা করি, ইহাই আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোচ্চ আদর্শের প্রধানতম অঙ্গ যে ধর্ম্ম, তাহার মূলভিত্তি হইতেছে—Self-fulfilment. Self-effacement এর সহিত কি কখনো Self-fulfilment এর মিল হইতে পারে?

এই জন্যই আমরা এতদিন জাগিয়াও জাগিতেছি না, উঠিয়াও উঠিতে পারিতেছি না। হায়রে, কে কবে আমাদের কোমরের ভিতর, এই আত্মোচ্ছেদের কঠিন বীজ, সজোরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। আর কি আমরা কোমর তুলিয়া, কখনো এই বসুন্ধরার উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিব ?

আমাদের মধ্যে যাহারা মূর্খ, তাহাদের কথা আর কি বলিব ? কিন্তু আমাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত বলিয়া, দেশের নেতা বলিয়া, সমাজের অগ্রণী বলিয়া, ধর্ম্মজীবনে কর্ম্মবীর বলিয়া লোকের নিকট বড়াই করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেককেও সময় সময় বলিতে শুনিয়াছি—আমাদের দেশে ধর্ম্মের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাতে আমাদের কোনও উন্নতি-কামনা করা কেবল কল্পনার বস্তু। সর্ব্বাগ্রে ভারতে একটা খুব বৃহৎরকমের ধর্ম্মমণ্ডলী চাই, তৎপরে অন্য কথা। কিন্তু সুইজারলণ্ডে, জার্ম্মেনিতেও আমেরিকায় কি হইতেছে, তাহার সংবাদ কি তাঁহারা রাখেন না ? যুক্তরাজ্যে ধর্ম্মের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে যত অধিক, শুনিয়াছি এ পৃথিবীর আর কোনও দেশে ধর্ম্মের সংখ্যা তত নহে। তবুও যুক্তরাজ্য আজ উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সমগ্র জগতকে উন্নতির পথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। না, ধর্ম্মের সংখ্যা (quantity) আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক নহে এবং কখনো ছিল না; আমাদের ধর্ম্মের গুণই (quality) এতদিন আমাদের উন্নতির পথে, তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, আমাদের দেশের জন্য সাধারণের বোধগম্য হইবার পূর্ব্বে বা সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের এই আত্মোচ্ছেদী ধর্ম্মের এক মূলচ্ছেদী চেষ্টার আবশ্যক। এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এখন কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে, তাঁহাদের মনের সম্মুখে চিরদিন বর্ত্তমান রাখিয়া, তাঁহাদের এই আত্মবিধ্বংসী ধর্ম্মকে যেন তাঁহারা সর্ব্বদা ধ্বংসবিধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন। ইহার জন্য এতদিন কোনও স্থায়ী ও বিস্তৃত চেষ্টা হয় নাই। সেই-ই আমাদের গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। আমাদের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, আমরা এখনো তাহাই জানি না। ইহাই আমাদের প্রথম গলদ, এবং আমাদের ধর্ম্ম-সমস্যা আমাদের দ্বিতীয় গলদ।

আমাদের তৃতীয় গলদ, আমাদের সমাজ। আমাদের আদর্শ ঠিক হয় নাই বলিয়া, আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান এখনো বর্ত্তমান শতাব্দীর উপযুক্ত হয় নাই। এবং আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান এখনো এই নবযুগের অনুযায়ী নহে বলিয়া, আমাদের সমাজকেও আমরা তদনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টাও করিতেছি না। কিন্তু আমাদের সামাজিক এভোলিউশন না হইলে, আমাদের রাজনৈতিক এভোলিউশন অসম্ভব। বন্যার উপর বন্যা আসিয়া, আমাদিগের এই শুষ্ক মরুভূমিতে অনেক নব দুর্ব্বাদলের আশা দেখাইবে বটে, কিন্তু এ কথা আমি সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করি, যতদিন না আমাদের সামাজিক এভোলিউশন হইয়াছে, ততদিন আমাদের দেশে কোনও রকমের এভোলিউশন কেবল কবির সৃষ্টি। এই যে আজ এই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগতে, এত বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে, ইহা কি একদিনের

কাজ? তাহারা কি আমাদের মত শত শতাব্দী ধরিয়া ঘুমাইতেছিল, আর হঠাৎ এক দিন ভোর বেলা উঠিয়া একেবারেই ইংলণ্ড ইংলণ্ড হইয়া গিয়াছে, জার্ম্মেনী জার্ম্মেনী হইয়া গিয়াছে, ফ্রান্স ফ্রান্স হইয়া গিয়াছে এবং আমেরিকা আমেরিকা হইয়া গিয়াছে? না, ঐতিহাসিকগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, প্রায় ছয় শত বৎসরের অন্তর্বিপ্লবের ফলে, আজ পাশ্চাত্য জগত এত বড় হইতে পারিয়াছে।

আমাদিগকেও যে সেইরূপে, ঠিক সেইরূপ হইবার জন্য, ছয় শত বৎসর ধরিয়া, ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। তাহারা যাহা একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাল বলিয়া ঠিক করিয়াছে, আমরা তাহাকে যদি সেইরূপে স্বীকার করিয়া লই, আমাদের তবে পঞ্চাশ বৎসরও না লাগিতে পারে। আমরা কিন্তু যদি সেটা ভাল কি না, ঠিক করিবার জন্য, সেটাকে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিতে বসি, তবে তাহাদের সমতুল্য হইতে আমাদের ছয় শত বৎসরেরও অধিক কাল লাগিবে না কে বলিবে? তাহারা বলে যে, তাহাদের সমাজ ভাল, এবং আমরা দেখিতেছি, তাহাদের সমাজ, তাহাদিগকে তাহাদের আদর্শের উৎকৃষ্ট সাধনে, প্রতিনিয়ত সাহায্য করিতেছে। তবে আর বৃথা বাক্য ব্যয়ের আবশ্যক কি? দেশ ও পাত্র ভেদে আমাদিগের যাহা যাহা অনাবশ্যক, সেইগুলি বাদ দিয়া, বাকীগুলি আমরা আমাদের নিজ নিজ পরিবারে প্রণয়ন করাই না কেন? করাই না এইজন্য যে, এখনো আমাদের আদর্শ ঠিক হয় নাই। সেই পুরাতন কথায় আবার আসিয়া পৌঁছিয়াছি! হে ভগবান! আমাদের আদর্শ কি কোনও কালে কেহ ঠিক করিবে না?

আমাদের চতুর্থ গলদের নাম, আমাদের শিক্ষা-বিভ্রাট। ইহাই আমাদের সর্ব্ববৃহৎ গলদ। এই গলদের জন্যই, এতদিন আমাদের আদর্শ ঠিক হয় নাই; আদর্শ ঠিক হয় নাই বলিয়া, এতদিন আমরা আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে ও সামাজিক ব্যাপারে, 'সেই যে তিমিরে সেই সে তিমিরে' রহিয়াছি। আমাদের দেশে শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যেন তাহা দ্বারা আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণ, এই বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কি, তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারে। ইংরাজ রাজ আমাদিগকে এ শিক্ষা কথনই প্রদান করিবে না, তাহার জন্য আর মাথা ব্যথা কেন? শুনিয়াছি আমাদের দেশে, জাতীয়-বিশ্ব-বিদ্যালয় নামে, কি একটা ভয়ানক জিনিষ সে মাসে কলিকাতায় সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে? তাহাতে কি জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার পবিত্র অর্থ কি, তাহা ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে? তাহার কি এমন কোনও ক্ষমতা আছে যে, তাহা দেশের সকল বালককে শিক্ষা-গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে? সে বিশ্ব-বিদ্যালয় কি এত ধনী যে, দেশের প্রত্যেক ছাত্রকে বিনামূল্যে শিক্ষা বিতরণ করিতে পারা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর? এই কাজগুলির মধ্যে যদি একটী কাজও জাতীয়-বিশ্ব-বিদ্যালয় বাদ দিয়া থাকেন, অথবা আমাদের জাতীয়-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের করিবার শক্তি নাই, এইরূপ প্রতিপন্ন হয়, তবে এইরূপ বাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের কোনই কল্যাণ হইবে না।

আমরা এমনি অকর্ম্মণ্য যে,বঙ্গচ্ছেদ লইয়া আমরা এত লাফালাফি করিতেছি, কিন্তু তাহার মধ্যে যে একজন সিভিলিয়ান আসিয়া, আমাদের গভর্ণমেণ্টের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জুড়িয়া বসিল, আমরা তাহার সংবাদই লইলাম না। কেহ কেহ হয়তো ইহার উত্তরে বলিবেন—আমরা কি করিতে পারি? তাহারা যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিল, তাহাই করিয়াছে। কথাটা সত্য বটে; কিন্তু এই যে ২২ বৎসর ধরিয়া, কংগ্রেস এত জিনিসের জন্য ব্রিটিশরাজের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া আসিতেছে, তাহার কোন্‌টী গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা না হইলে আমরা পাইতে পারি? তবুও আমরা সে সকলের জন্য এতদিন কাকুতি মিনতি করিয়া আসিতেছি কেন? বাজে কথার জন্য এতদিন অনুরোধ ও উপরোধ না করিয়া, আমরা যদি এতদিন কেবল আমাদের দেশের শিক্ষা বিভাগটাকে, আমাদের হাতে লইবার জন্য চেষ্টা পাইয়া আসিতাম, তবে জগতের নিকট মুখ দেখাইবার জন্য আমাদের কিছু থাকিত। স্বয়ং দাদাভাই নোরজীর সহিত বিলাতে এই সম্বন্ধে তর্ক করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার মত লোকও এই কথা বলেন—"আমরা স্বায়ত্বশাসন পাইলে, আমাদের সকলি হইবে।"

কিন্তু, হায়, ইংরাজ যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে স্বায়ত্বশাসন না দেয়, তবে স্বায়ত্ব শাসন পাইবারও আমাদের কোনও আশা দেখি না! স্বায়ত্বশাসন পাইতে হইলে, আমাদের যে শিক্ষা আবশ্যক, আমাদের সে শিক্ষা কই? এখনো আমাদের এক উপায় আছে। যদি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই উপায়ের বশবর্ত্তী হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তবে ফল হয়তো ভালই হইবে। কংগ্রেস এই ২২ বৎসরে ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। এই বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা। এই কংগ্রেসে যদি আমরা, অন্য সকল কথা ছাড়িয়া, কেবল এই প্রতিজ্ঞা করি যে, যতদিন পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষা free এবং compulsory করেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিব না, তবে আমার বিশ্বাস, এই সুযোগে আমাদের কপাল ফিরিলেও ফিরিতে পারে। কেবল যে এই বৎসর আমরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিব, তাহা নহে; যতদিন পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট আমাদের কথামত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা যেন আমাদের প্রতিজ্ঞার একটী কথাও বিস্মরণ না হই। সুশিক্ষা আমাদের একমাত্র অমোঘ ঔষধ। আমরা এতদিন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, সেই জন্য আমাদের এই দুর্দ্দশা। সুশিক্ষা পাইলেই—আমাদের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, সেই কথা মনে রাখিয়া, তদনুরূপ শিক্ষা আমাদিগকে প্রদান করিলেই—আমরা আমাদের আদর্শ নিজে নিজেই ঠিক করিয়া লইব। আদর্শ ঠিক হইলেই, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় আমাদের যত কিছু প্রতিবন্ধক, তাহা আমরা আপনা হইতেই বুঝিতে পারিব। আশা করি, কংগ্রেসের নেতাগণ এবং দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়, আমার উল্লিখিত প্রস্তাবটী একবার দয়া করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

# প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (১৫)

আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষেরই এক অংশ। অতএব প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে যথামতি কিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, চন্দ্রবংশীয় বলি নামক কোন রাজার বঙ্গ নামে একটী পুত্র ছিল। তিনিই বঙ্গদেশের আদিম রাজা। তাঁহারই নামে ঐ দেশ বঙ্গ নামে খ্যাত।*

শাস্ত্রানুসারে এই দেশের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে পশ্চিমে অঙ্গ, দক্ষিণে উড্র, পূর্ব্বে সুমা, ম্লেচ্ছ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ সকল এবং উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বত। পরন্তু শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের ৭ম পটলে উক্ত আছে যে, দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ভূভাগ, তাহা বঙ্গ নামে অভিহিত। (১) ইদানীন্তন কালে যাহাকে "পূর্ব্ববঙ্গ" বা "বাঙ্গালদেশ" বলে, তাহাই উক্ত তন্ত্রে বঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে; কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত আছে যে, অঙ্গদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগেই বঙ্গ নামক দেশ অবস্থিত। বৈদ্যনাথ হইতে সরযূসঙ্গমস্থিত ভুবনেশ পর্য্যন্ত অঙ্গ নামক দেশ বিস্তৃত; (২) সুতরাং অঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমাস্থিত বৈদ্যনাথ প্রদেশটী বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। এতদ্দ্বারা জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্র-বচনোক্ত উপবঙ্গ প্রদেশটী শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গদেশ নামে যে অভিহিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। (৩)

অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাভারতীয় কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বহুকাল পরে বৌদ্ধদিগের সময়ে উহার সীমা পূর্ব্ব হইতে বহুবিস্তৃতি লাভ করে।

সেনবংশের রাজত্বকালে মিথিলা প্রদেশ (বর্ত্তমান ত্রিহুত) বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল।

---

* "বঙ্গশ্চন্দ্রবংশীয়ো বলিরাজ পুত্রঃ"।

"বলেঃ সুতপসোবজ্ঞে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গকাঃ। সুহ্মা পৌণ্ড্রাশ্চ বালেয়া জনপান স্তথাঙ্গতঃ"। গরুড় পুরাণ ১৪৪ অধ্যায়।

"এচবঙ্গদীর্ঘ তমস ঔরসোঃ বলেঃ ক্ষেত্রজশ্চ"।

"ততঃ প্রসাদয়াস পুনস্তমৃষি সত্তমং। বলিঃ সুদেষ্ণাং ভার্য্যাং স্বাং তস্মৈতাং প্রাহিণোৎপুনঃ।

তাং সদীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্টা দেবী মথাব্রবীৎ। ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্য বর্চ্চসঃ।

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মাশ্চতে সুতাঃ। তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতাভুবিঃ।

—মহাভারতং।

(১) "রত্নাকরং সমাসাদ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগংশিবে। বঙ্গদেশোময়াপ্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ"। শক্তি সঙ্গমতন্ত্র, ৭ম পটল।

(২) "বৈদ্যনাথং সমাসাদ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। তাবদঙ্গাভিধোদেশোযাত্রায়াং নহি দুষ্যতে"।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ৭ম পটল।

"অঙ্গঞ্চ দেশঃ সরয্বা সঙ্গমে অবস্থিতঃ"।

(৩) "আগ্নেষ্যা মঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গত্রিপুর কোশলাঃ কলিঙ্গোড্রান্ধ্র কিষ্কিন্ধ্যাবিদর্ভশবরাদয়ঃ"।

ইতি জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্রবচনং।

"অঙ্গবঙ্গমদ্গুরকা অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ। শাখা-মগধগোনর্দ্দা প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্মৃতাঃ"। মৎস্যপুরাণং।

ইদানীন্তনকালেও মিথিলায় লক্ষ্মণ সেনাব্দ প্রচলিত রহিয়াছে।

যবনাধিকারকালে আসামদেশ (প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ) বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়, এইক্ষণ আবার উহা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে।

বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায় না। অথর্ব্ববেদে ভারতের পূর্ব্বসীমায় কেবলমাত্র মগধ (কীকট) দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিককালে ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে মগধদেশ (বর্ত্তমান বিহার) পর্য্যন্তই আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত বা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে বঙ্গদেশের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ রহিয়াছে। মহাভারতে বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্ত ও মলদমৎস্য নামক দুইটী প্রদেশের উল্লেখ আছে। তাম্রলিপ্তের (বর্ত্তমান তমলুক্) অধীশ্বর মহারাজ সমুদ্রসেন এবং মলদমৎস্যের (গৌড়দেশ) অধিপতি মহারাজ চন্দ্রসেন কুরুপাণ্ডবীয় মহা সমর-ক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় প্রভূত শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মহাবংশ গ্রন্থে বর্ণিত বঙ্গদেশীয় মহাবীর রাজা বিজয়, সিংহল পর্য্যন্ত জয় করিয়া তথা উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ সিংহলে কতিপয় লোক আপনাদিগকে সেই মহারাজ বিজয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কতিপয় বৎসর গত হইল সিংহলবাসী একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক বক্তা পাবনায় আসিয়া আপনাকে রাজা বিজয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

রামায়ণ ও মহাভারতাদিকালে দক্ষিণ বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরাদি প্রদেশই সমধিক প্রসিদ্ধ। মধ্যবঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের কতিপয় প্রদেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীনকালে ঐগুলি জলমগ্ন এবং স্থানে স্থানে মহারণ্য সঙ্কুল ছিল বলিয়া প্রতীত হয়। ইদানীন্তনকালেও (১) ঐ সকল প্রদেশ সুবৃহৎ বিল ও ঝিলে পরিপূর্ণ। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে ঐ মধ্য বঙ্গাদির মৃত্তিকাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীন কালে দক্ষিণ বঙ্গের তাম্রলিপ্ত নগরে মহাবল পরাক্রান্ত রাজগণের রাজধানী ছিল। কালক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের যশোহর প্রদেশের অধিকাংশই মহারণ্যে পরিণত হইয়া যায়। অধুনা সেই মহারণ্য সুন্দরবন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মহাভারতীয় কালের পরে দক্ষিণবঙ্গ অপেক্ষা উত্তর বঙ্গই সমধিক পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠে। মহাভারতীয় কালে মলদমৎস্য (গৌড়) দেশে মাৎসী নাম্নী অতি প্রাচীন নগরী হিন্দু রাজগণের রাজধানী ছিল (১)। মহাবীর ভীমসেন রাজসূয় মহাযজ্ঞ কালে এই মলদমৎস্য দেশ জয় করিয়াছিলেন (২)। কেহ কেহ এই দেশে বিরাট রাজের রাজধানী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাহার নিদর্শনাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কুরু পাণ্ডবীয় যুদ্ধের পরে পাণ্ডবেরা গৌড়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে জরাসন্ধ বংশীয় মগধদেশীয় ভূপালেরা অধিকার করিয়া উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন (৩)।

১ আসীদ্ গৌড়ে রাজধানী মাৎসীনাম্নী পুরাতনী। তত্রৈবানেক ভূপানাং নরমানন্দবর্দ্ধিনী"। লঘুভারত।

২ পূর্ব্বস্যাং মলদান্ মৎস্যান্ ভীমো দিগবিজয়েহজয়ৎ। মহাভারত, সভা পর্ব্ব।

(৩) "গৌড়ং ভারতযুদ্ধান্তে পাণ্ডবা অধিচক্রিরে। পরে মাগধ ভূপালাশ্চক্রিরেগৌড়মূর্জ্জম্।

লঘুভারত।

পরবর্ত্তী কালে এই মলদমৎস্ত দেশের নাম গৌড় হইয়াছিল; কারণ, পাণ্ডববংশীয় রাজগণের রাজ্যকালে ভোজদেশীয় গৌড় নামক এক রাজা প্রবল প্রতাপ হইয়াছিলেন।

যৎকালে পুরঞ্জয় নামে এক বৌদ্ধ নরপতি মগধদেশ অধিকার করিয়া শাসন করেন, তৎকালে পূর্ব্বোক্ত গৌড়নামধেয় নৃপতির বংশধর ভোজপুরাধিপ ভোজগৌড় মগধেশ্বরের আদেশানুসারে মলদমৎস্তদেশের শাসনকর্ত্তা (Governor) রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলে। পরে যখন শুনকবর্ম্মা পুরঞ্জয়কে বধ করিয়া প্রদ্যোতন নৃপতিকে মগধ সাম্রাজ্য প্রদান করেন, তখন মলদমৎস্তের শাসনকর্ত্তা রাজা ভোজ গৌড় স্বেচ্ছাক্রমে স্বাধীন হইয়াছিলেন। ইনি স্বনামে গৌড়ী নাম্নী এক মহা নগরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই ভোজ গৌড়ের নামানুসারেই মলদমৎস্ত দেশ গৌড় নামে প্রসিদ্ধ হয়। রাজা ভোজ গৌড়ের পূর্ব্বে গৌড়দেশ অন্য কোন রাজার অধীনে ছিল না, উহা কেবল পাণ্ডববংশীয় নরপতি বর্গের অধিকারে ছিল। পরে মহাবল মগধপতি প্রদ্যোতন সংগ্রামে ভোজগৌড়ের গ্রীবাদেশ ছেদন করেন। যে স্থানে ভোজ গৌড়ের গ্রীবাদেশ ছিন্ন হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি "গৌড়গ্রীবা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গৌড়গ্রাবা গঙ্গা নদীর তীরে মালদহের পশ্চিমে স্থিত পাহাড়পুরের নিকট অবস্থিত আছে (২)।

এক সময় সমস্ত বঙ্গদেশ গৌড় নামে অভিহিত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে পূতসলিলা সুবিস্তৃতা করতোয়া নদী দ্বারা এই দেশ গৌড় ও বঙ্গ নামক ভাগ দ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছিল (১) অর্থাৎ করতোয়ার পশ্চিম স্থিত সুবিস্তৃত ভূভাগ গৌড় নামে এবং ঐ নদীর পূর্ব্বস্থিত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ বঙ্গ (পূর্ব্বোক্ত উপবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ) নামে অভিহিত হইত।

ভোজগৌড় হইতে বঙ্গের হিন্দুরাজগণ এবং বৌদ্ধ নরপতিবর্গ যবনাধিকারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ভোজগৌড় হইতে আট জন নরপতি যথাক্রমে ৪৫৭ বর্ষকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগত হয়েন। ইঁহারা সকলেই শৈব ধর্ম্মপরায়ণ এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন। লক্ষ্মণ ভোজ বা মাণিক্য লক্ষ্মণ অষ্টম নরপতি ছিলেন। ইহাঁর অসামান্য রূপবতী, ধন্যা,

---

(২) পুরাসীদ ভোজদেশীয়োগৌড়নামামহীপতিঃ।
কালেপাণ্ডববংশানাং বভূব প্রবলোমহান্॥
পুরঞ্জয়নৃপেবৌদ্ধে রাজ্যংশাসতি মাগধে।
ক্রমাদ ভোজপুরাধীশোঃ মাগধাধীনতাংগতঃ॥
তত্রৈব ভোজ গৌড়স্থ পুরঞ্জয়ম্‌পাজ্ঞয়া।
বভূবমলদেমৎস্তে দেশশাসন কারকঃ॥
যদাশুনকবর্ম্মাচ নিহত্যতংপুরঞ্জয়ম্।
দদৌ মগধ সাম্রাজ্যং প্রদ্যোতন মহীভুজে॥
তদাশাসনকর্ত্তা সভোজ গৌড়োমহীপতিঃ।
স্বেচ্ছয়া মলদেমৎস্তে স্বাধীনত্ব মুপাগতঃ॥
মহতী নগরী গৌড়ী ভোজগৌড়েন নির্ম্মিতা।
পালিতা বহুভূপালৈঃকালেসাপি নিপাতিতা॥
ভোজবংশস্থ গৌড়স্থ নৃপস্থ নামচিহ্নিতঃ।
গৌড়দেশোঽভবত্তস্থ বিস্তারোবক্ষ্যতে পরে॥
ভোজগৌড়নৃপাৎ পূর্ব্বে নাসীদ্ গৌড়ে পৃথক্ নৃপঃ।
সম্রাট্ পাণ্ডববংশানাং সাম্রাজ্যমধ্যগোঽভবৎ॥
পুনঃ প্রদ্যোতমরণে গ্রীবাতস্থ নিপাতিতা।
তেনৈব সমরস্থানং গৌড়গ্রীবেত্যুদীরিতম্॥
অদ্যাপিবর্ত্ততে গৌড়গ্রীবা গঙ্গাসরিত্তটে।
মলদস্তৈব পাশ্চাত্যে পাহাড়পুর সন্নিধৌ॥

—Ibid.

(১) "বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী।
সীমানিদর্শনং মধ্যদেশয়োঃ গৌড়বঙ্গয়োঃ॥
লঘুভারত।

মান্তা, বিন্ধ্যাবতী, রত্নাবতী নাম্নী কন্যাকে সরস্বতীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট্ অশোক, সমরে মাণিক্য লক্ষ্মণকে হত করিলে তৎপুত্র আনন্দভোজ সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় মহাকবি কালিদাস গৌড়ী নগরী পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২)

এই সময়ে গৌড় দেশে গৌড়ী ও বরেন্দ্রী নাম্নী দুইটী নগরী সুবিখ্যাত ছিল। করতোয়া নদীর পশ্চিম তটস্থিত বরেন্দ্র নগরীতে রাজা মাণিক্য লক্ষ্মণের রাজধানী ছিল। (৩)

বাঙ্গালাদেশে গৌড় ভোজ প্রভৃতি হিন্দু রাজগণের রাজ্যকালে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বিশেষতঃ, মাণিক্য লক্ষ্মণ ভোজের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের উভয়বিধ বাণিজ্যেরই যৎপরোনাস্তি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এইকালে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ধনী বৈশ্যগণ বরেন্দ্রী-নগরীতে আসিয়া বসতি করিয়াছিল। এই নগরীতে আবার বহুসংখ্যক হিন্দুরাজাও বাস করিয়াছিল। রাজা শ্যামল বর্ম্মা হিন্দুরাজগণের আদি পুরুষ ছিলেন। বরেন্দ্রীনগরীবাসী বণিক্‌গণ ও গুজ্জরাটের সওদাগরগণের মধ্যে বিলক্ষণ বাণিজ্য ব্যবসায় চলিয়াছিল। এই বৈশ্যগণ পোতারোহণ করিয়া বাণিজ্যার্থ গতায়াত করিত। এই রাজা শ্যামল বর্ম্মা সারস্বত বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে যাগার্থ বরেন্দ্রী নগরীতে আনয়ন করিয়া বাস করাইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের বংশধরেরা বঙ্গের সপ্তশতীবিপ্রগণের আদিপুরুষ ছিলেন। পরে রাজা শ্যামল বর্ম্মার বংশধরগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। (৪)

অগ্নিপুরাণে উক্ত আছে যে, বাঙ্গালাদেশে ভোজ-রাজগণের রাজত্বের পরে শূদ্রজাতীয় আদিত্য শূর প্রভৃতি একাদশ জন রাজা ৭১৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বঙ্গে শূদ্র রাজগণের শাসনকালে মহানগরী গৌড়ী তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি সেই স্থানে রাজা দেবহূতি নির্ম্মিত দেবকোট

(২) "আসীৎ স্বাধীনম্ পতির্গৌড়ে মাণিক্য লক্ষ্মণঃ।
মূর্দ্ধাভিষিক্তবংশশ্চ শৈবধর্ম্ম পরায়ণঃ॥
যস্যরত্নাবতী কন্যা ধন্যামান্যাচ বিদ্যয়া।
যস্যাঃ স্বামী সুবিখ্যাতঃ কালিদাসো মহাকবিঃ।
তদৈবাশোক ভূপালঃ প্রবলো মাগধাঞ্চলে।
মাণিক্যলক্ষণং ভূপং হতবান্ সমরাঙ্গণে॥
অশোক সন্ধিনানন্দভোজোবৌদ্ধোবভূবহঃ।
কালিদাস কবিস্তেন বিক্রমাদিত্যমাশ্রিতঃ॥"

—Ibid.

(৩) "পুরাগৌড়ীবরেন্দ্রীচ মনোহরপুরী-দ্বয়ম্।
নির্দ্দিষ্টং কূর্ম্মচক্রেপি জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥
বিক্রমাদিত্য সময়ে বরেন্দ্রীনগরেন্‌পঃ।
করতোয়ানদীতীরে আসীম্মাণিক্য লক্ষ্মণঃ॥

—Ibid.

(৪) কালে বরেন্দ্রীনগরে বাণিজ্যব্যবসায়িনঃ।
বসতিঞ্চক্রিরে বৈশ্যজাতয়ো ধনিনাশ্বরাঃ॥
পশ্চিমে করতোয়ায়াবরেন্দ্রীনগরেবরে।
আসন্‌ক্ষত্রিয়ভূপালাবহবোবণিজাশ্বরাঃ॥
রাজা শ্যামলবর্ম্মাচতেষামেবাদি পুরুষঃ।
বাসুদেববণিক্‌কশ্চিদ্বণিজামাদিপুরুষঃ॥
গুজরাট-বরেন্দ্র্যোশ্চধনিনোবণিজাশ্বরাঃ।
সদাগরা গতায়াতঞ্চক্রুর্বাণিজ্য-হেতবে॥
তে বৈশ্যজাতয়ঃসর্ব্বে বাণিজ্যব্যবসায়িনঃ।
চক্রিরেপোতমারুহ্য বাণিজ্যার্থং গতাগতম্॥
পরে শ্যামলবর্ম্মৈকো রাজসীদ বঙ্গমণ্ডলে।
নিন্সেসারস্বতান্‌বিপ্রান্‌যাগসাধনহেতবে॥
বরেন্দ্রীনগরেতেষাং বংশা আসন্ দ্বিজোত্তমাঃ।
তে সপ্তশতীবিপ্রবংশানাং পূর্ব্বপুরুষকাঃ॥

—লঘুভারত।

নামক দুর্গের নিদর্শন রহিয়াছে। (৫) এই শূদ্র জাতীয় নৃপতিবর্গের শাসনকালে বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

ইহা কথিত আছে যে, শূদ্রজাতীয় শেষ রাজা জয়ধর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ না করায় বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াও অভিমানবশতঃ সস্ত্রীক নৌকারোহণে যাত্রা করিয়া আবার সেই নৌকা জলমগ্ন করাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ফলতঃ, মহারাজ গৌড়ভোজ হইতে বাঙ্গালায় যবনগণের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ গৌড়ভূপতি নামে অভিহিত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর হিন্দুনরপতিবর্গের রাজত্বকালে গৌড়ী ও বরেন্দ্রী এই দুইটী মহানগরীই জনগণের সমধিক চিত্তহারিণী ছিল। মহানন্দা ও করতোয়া এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ ভূভাগে হিন্দুরাজগণের রাজধানী সকলের ভগ্নাবশেষ সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। (৬)

পাল বংশীয়রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের রাজ্যকালে বঙ্গদেশে হিন্দুশাস্ত্র ও বেদানুমোদিত কর্ম্মকাণ্ডের বিলোপ সংঘটিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, তৎকালে বাঙ্গালাদেশে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত গমন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। (৭)

সভৃত্য পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হওয়ায় তাঁহারা আর কান্যকুব্জীয় সমাজে পরিগৃহীত হন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশেই বাস করিতে হইয়াছিল।

মহারাজ অশোকের সময়ে বঙ্গদেশের বহু সংখ্যক হিন্দু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। (৮)

রাজা মহীপালের শাসনকালে দিনাজপুর অঞ্চলে তিনি একটী স্বনামখ্যাতা মহতী দীর্ঘিকা খনন করান। পাল রাজাদিগের রাজ্য শাসনকালে বঙ্গদেশের বাণিজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহাদের সময়ে শিল্প বাণিজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হয়। বরেন্দ্রীর পশ্চিমে বগুড়া জিলাস্থিত জয়পুর পরগণার অন্তঃপাতী মঙ্গলবাড়ী-নামে একটী অতি পুরাতন গ্রাম আছে। সেই গ্রামের এক প্রান্তে একটী স্তম্ভ আছে, তদ্গাত্রে দেবনাগরাক্ষরে পালবংশীয় রাজগণের কীর্ত্তি-কলাপ এবং তাঁহাদিগের নামগুলি খোদিত রহিয়াছে।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভবিষ্যন্নৃপতিবর্গ প্রকরণে বঙ্গের সেন রাজবংশ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রবংশীয় বীরসেন নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার বংশধর বিক্রমসেন নামে এক নৃপতি দাক্ষিণাত্য-নর-

(৫) "এতে কায়স্থ জাতীয়াঃ শূদ্রাশ্চবর্ণসঙ্করাঃ।
চতুর্দ্দশাধিক সপ্তশতাব্দাম্বুভুজুঃ ক্ষিতৌ।
Ibid

(৬) "এবাং শেষোজয়ধরোবৌদ্ধাক্রমণ পীড়িতঃ।
বেদশাস্ত্রানুগংশাস্ত্রং ন তত্যাজাভিমানতঃ।
আসীত্তাভ্যুচ্চং গৌড়ী বরেন্দ্রীচ পুরীদ্বয়ং।
গৌড়েন্দ্রহিন্দু ভূপানাং সময়ে প্রাচ্যমণ্ডলে।
আরভ্যচ মহানন্দাং নদীং যাবৎ করোতোয়াম্।
হিন্দূনাং রাজধানীনাং চিহ্নমদ্যাপিবর্ত্ততে।
—Ibid

৭। সময়ে পাল বংশনাং বৌদ্ধানাং শাসনেন চ।
বভুব বিপ্লবঃ শাস্ত্রবেদ বোধিত কর্ম্মাণাম্।
অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি।
—স্মৃতিঃ।

৮। অশোক রাজ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারঃ।
বভুবুর্হবৌদ্ধাঃ প্রাচ্যদেশস্য হিন্দবঃ।
—লঘু ভারত।

পতি-বর্গের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে নিজ নামে বিক্রমপুর নামক এক রাজ-ধানী স্থাপন করত সমস্ত বঙ্গের একাধিপতিত্ব লাভ করেন (১)।

ইঁহার পুত্র নিভুজ নামক নৃপতি মহারাজ আদিশূরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পাল-বংশীয় রাজাকে জয় করিয়া সমস্ত বঙ্গের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ে মহানন্দা নদীর পূর্ব্বতটে আদিনা নাম্নী এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। পরে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে রামপালে এক বৃহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাজধানী স্থাপন করত বাস করিয়া-ছিলেন (২)।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরেরা বরেন্দ্রী নগরে বাস করিত (৩)।

রাজা নিভুজের প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র নামক দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্ন শিষ্ট, মিষ্টভাষী, বিচক্ষণ কিন্তু দুর্ব্বল ছিলেন। মহা-বল পরাক্রান্ত বরেন্দ্র, আদিশূরের মৃত্যুর পর পৈতৃক রাজ্য ও মাতামহীর গৌড়দেশ লাভ করিয়া সমস্ত বঙ্গের একচ্ছত্র নৃপতি হইয়া-ছিলেন (৪)।

মহারাজ বরেন্দ্র কামরূপেশ্বরকে পরাজিত করিয়া, তাহার রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের পিতা মহাবল বিজয়সেন গৌড়ে মহানন্দা নদী তীরস্থিত প্রদ্যুম্নের পুরী জয় করেন। পরে তিনি প্রদ্যুম্নের সহায় হইয়া রণে মহারাজ বরেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্ন কাল-কবলে নিপতিত হইলে মহারাজ বিজয়সেন সমস্ত বঙ্গের এক-চ্ছত্র মহীপতি হইলেন। তিনি বঙ্গদেশ ব্যতীত নৌ-সৈন্যবলে পশ্চিমদেশ সকলও জয় করিয়া-ছিলেন (৫)।

মহারাজ বিজয়সেন রাজা বরেন্দ্রের সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া আদিনাপুরীর দক্ষিণে বৈজয়ী-নাম্নী এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন (৬)।

বিজয়পুত্র মহারাজ বল্লালসেন পূর্ব্ববঙ্গে রামপালের রাজধানীতে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন গৌড়ে লক্ষ্মণাবতী-নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে বক্তিয়ার খিলাজি কর্ত্তৃক এই লক্ষ্মণাবতী বিধ্বংসিত হইয়াছিল। এইক্ষণ ইহার ভগ্নাব-শেষ মহারণ্যে আবৃত রহিয়াছে। উহারই দক্ষিণে গৌড়ের যবন নৃপতিবর্গের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

১। বীরসেনস্য বংশৈকো বিক্রমোনামভূপতিঃ
দাক্ষিণাত্যান্ নৃপৈঃসার্দ্ধং চকার সন্ধিমুত্তমম্।
সএব বিক্রমপুরং কৃতবান্ নিজকাময়া।
সএব বঙ্গাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বভূবহ।"
—লঘুভারত।

২। "তৎপরে বৈদ্যবংশীয় আদিশূরো মহীপতিঃ।
নাম্নাদিনা পুরীকক্রে মহানন্দা নদীতটে।

৩। "আদিশূর নৃপানীতা ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চগোত্রকাঃ।
তেষাং বংশা অপি বিপ্রা বরেন্দ্রী নগরে বসন্।
—Ibid

৪। প্রদ্যুম্নোদুর্ব্বলঃ শিষ্টোমিষ্টভাষী বিচক্ষণঃ।
বরেন্দ্রোগৌড়দেশেন্দ্রো বভূব নিজকাময়া।
বরেন্দ্র আদিশূরস্য ভাগিন্যা শাসিতাংক্ষিতিম্।
পৈতৃকীং বঙ্গভূমিঞ্চ লব্ধারাজ্যাধিপোহভবৎ।
—Ibid

৫। "বিজয়সেন পরে গঙ্গাপ্রবাহ মনুধাবতা।
মহতাবৌ বিতানেন পাশ্চাত্যচক্র মাহরৎ।
—Ibid

৬। ততো বিজয় সেনোপি তস্যঃদেশান্ বিনির্জিত।
বৈজয়ী নগরী চক্রে আদিনা প্রান্ত দক্ষিণে।
—লঘুভারত।

লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপেও রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কখন লক্ষ্মণাবতীতে কখন বা নবদ্বীপে বাস করিতেন। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন রামপালেই বাস করিতেন। পরে পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটিলে লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপেই বাস করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা নবদ্বীপের রাজধানীতে বাস করিয়া সমস্ত বঙ্গের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বহুকাল পরে বক্তিয়ার খিলাজি নবদ্বীপের রাজধানী জয় করিয়া গৌড়ে লক্ষ্মণাবতী জয় করে। বক্তিয়ার বরেন্দ্রী নগরীতে যাইয়া হিন্দু রাজগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। বক্তিয়ার বগুড়ার নিকট-স্থিত যোগিভবন নামক স্থানে যাইয়া বণিক্‌গণের ও করতোয়া তটবাসী সেন-গণের ধন-লুণ্ঠন করিয়াছিল (৭)। খিলাজি একবর্ষ মধ্যে সেনরাজ্য ধ্বংস করিয়া সমস্ত বঙ্গের আধিপত্য লাভ করে, কেবল ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

বৌদ্ধ-রাজগণ অতিশয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রিয় ছিল; সুতরাং পাল রাজাদিগের রাজ্যকালে বঙ্গদেশে অন্তর্বহির্বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। এইরূপে সেন-বংশীয় রাজগণের রাজ্যকালেও সমস্ত বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। বঙ্গদেশ নদী-মাতৃক। ইহার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। ইহা সুজলা সুফলা ও নানাবিধ শস্যশালিনী ছিল। প্রকৃতিদেবী চিরকালই বঙ্গমাতার প্রতি সুপ্রসন্না ও মুক্তহস্তা; সুতরাং অধিবাসিগণ মহাসুখে বাস করিত। (৮)

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা দেশে গঙ্গা, করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রই বৃহৎনদী ও নদ। এতদ্ব্যতীত যে সকল ক্ষুদ্র নদ ও নদী ছিল, তন্মধ্যে গৌড়ে ভাগীরথী, মহানন্দা, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, ঘর্ঘরা, বার, নাগর, নারদ, এই নদী ও নদ সকল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে ধবলেশ্বরী, বৃদ্ধগঙ্গা, শীতলাক্ষী ও দগ্ধগঙ্গা প্রভৃতি নদী সমূহ বেগবতী ছিল। এই সমস্ত মহা ও ক্ষুদ্র নদ নদী দিয়া বঙ্গদেশের অন্তর্বহির্বাণিজ্যাদি কার্য্য সকল নির্ব্বাহিত হইত।

প্রাচীনকালে বাঙ্গালা দেশের অন্তর্বাণিজ্যের অধিকাংশই নৌকাযোগে সম্পাদিত হইত। তমলুক, বর্দ্ধমান, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, কটক ও গৌড়, এই কয়টী প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল। এই সকল স্থান হইতে ভারতের নানা প্রদেশে নৌকাযোগে বাণিজ্যদ্রব্য সকল প্রেরিত হইত। বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্য বিস্তৃতরূপে সম্পাদিত হইত। সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুর ও বালেশ্বরে তুলার বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইত। সুবর্ণগ্রাম নগর হইতে কার্পাসবস্ত্র লইয়া বঙ্গদেশীয় বণিক্‌গণ খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে মিশর (ইজিপ্ট) দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। বহুকাল হইতেই রোমদেশীয় বণিক্‌দিগের স্থলপথে যাতায়াত ছিল। রোমকেরা গুপ্তভাবে চীনদেশ হইতে গুটীপোকা সকল লইয়া যাওয়ায়, তদবধি ইটালীর রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রাচীন কালে চট্টগ্রাম, তমলুক ও কটক, এই তিনটী মাত্র বন্দর ছিল। তৎকালে বিদেশীয় লোকের

৭। বরেন্দ্রী নগরে গত্বাঽগ্রেহিন্দুজনাধিপান্।
দেবী দেবালয়ান্ ভক্ত্বা ব্রাহ্মণা নপ্যাপাত্রবৎ।
স যোগিভবনে গত্বা নিনায় বণিজাং ধনম্।
করতোয়াতটে গত্বা সেনানাং ধন মাহরৎ।
—Ibid

৮। প্রসিদ্ধাউর্ব্বরা ভূম্যো মহশস্যাবহপ্রদাঃ।
নদী মাতৃকদেশোং য়ংলোকানাং সুখদায়কঃ।
—Ibid

মধ্যে, চীন, মিশর ও আরবদেশীয় বণিকেরাই প্রধানতঃ সমুদ্রপথে যাতায়াত করিত। উক্ত বন্দরগুলিতে সর্ব্বদাই স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্য-পোত সকল আসা যাওয়া করিত। ভিন্ন দেশীয় সাংযাত্রিকেরা ঐ সকল বন্দরে আসিয়া স্বদেশীয় বস্ত্র-জাতের বিনিময়ে রেশম, চর্ম্ম, উর্ণা, হস্তিদন্ত, কার্পাস ও প্রসিদ্ধ ঢাকাই বস্ত্র (মস্‌লিন্) লইয়া যাইত।

খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় পনর শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা দেশ হইতে হস্তি-দন্ত, চর্ম্ম, তুলা-বস্ত্র, উর্ণা ও রেশম ইয়োরোপ-খণ্ডে প্রেরিত হইত। খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্ব প্রায় আট শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়ী নির্ম্মিত হইলে, তৎকালে উত্তর-বঙ্গের বাণিজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। মুসলমানদিগের অধিকারের কিছুকাল পূর্ব্বে চাঁদ সওদাগর ও শ্রীমন্ত সওদাগর প্রভৃতি কতিপয় রাঢ়দেশীয় বণিক্ সমুদ্রপোত আরোহণ করিয়া সিংহল, মলদ্বীপ, লক্ষদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, শ্যাম ও ফিলিপাইন্ দ্বীপ-পুঞ্জ সকলে যাতায়াত করিত।

চন্দ্র সওদাগর ও শ্রীমন্তের পর হিন্দুবণিক্-গণের আর অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে, এখনও চট্টগ্রাম ও কটক প্রদেশীয় অতি অল্প সংখ্যক পোত-বণিক্ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। তমলুক, চট্টগ্রাম ও কটক অঞ্চলের অতি হীনবর্ণস্থ হিন্দুরাই সমুদ্রপথে বাণিজ্য-কার্য্য করিয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতেই বঙ্গদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য, হীন-জাতীয় লোকদিগের হস্তগত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্ত-মাশা অন্তরীপ প্রকাশিত হইলে পর্টুগীজ নাবিকেরা ঐ অন্তরীপ ঘুরিয়া বঙ্গদেশে আসিত। এই সময় গৌড়, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণ-গ্রাম নগর প্রভৃতির পূর্ব্ব-বাণিজ্যাদি, ঐশ্বর্য্য ও শোভা-সমৃদ্ধির কিছুই ছিল না; ঐ গুলির নাম মাত্র অবশিষ্ট ছিল। এই কালে ঢাকা নগরী বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানী। মুরশিদা-বাদ, কালনা, কাটোয়া ও হুগলী প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে যৎসামান্যরূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

এই সময় বাঙ্গালীরা অকর্ম্মণ্য, দুর্ব্বল, ভীরু ও নানাবিধ কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়াছিল। ক্রমে বাঙ্গালাদেশে পর্টুগীজ, ওলন্দাজ, দিনে-মার, ও ফরাসি প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বণিক্-গণ বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিতেছিল। পর্টু-গীজেরা চট্টগ্রামে, ওলন্দাজেরা চুঁচুঁড়ায়, দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে, ও ফরাসিরা চন্দন-নগরে বাণিজ্য জন্য কুঠী সকল প্রস্তুত করিয়াছিল। পরিশেষে, ইংলণ্ডে একদল সম-বেত বণিক্, তৎকালীয় মহারাণী এলিজা-বেথের নিকট হইতে এক সনন্দ লইয়া "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী" এই নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বাঙ্গালা দেশে আসিয়া প্রথমতঃ হুগলীতে, তদনন্তর হুগলী নদীতীরস্থিত গোবিন্দপুর নামক স্থানে এক ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক লবণ ও রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করে। এইক্ষণ ঐ গোবিন্দপুর কলিকাতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়াছে। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ-জাত যে সকল দ্রব্য, বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরিত হইত, সেইগুলি ক্রমে লিখিত হই-তেছে :—

সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুর, সুবর্ণগ্রাম নগর, চট্টগ্রাম, তমলুক হইতে কার্পাস বস্ত্র, রেশম, চর্ম্ম, উর্ণা, হস্তি-দন্ত-সকল বিদেশে বাণিজ্যার্থ

প্রেরিত হইত। খনিজ-দ্রব্যজাতের মধ্যে বীরভূম হইতে অভ্র ও শ্লেট্; রাণীগঞ্জ হইতে মৃদাঙ্গার, শ্রীহট্ট হইতে চূর্ণ; রাজমহল, বীরভূম, রাণীগঞ্জ হইতে লৌহ সকল স্বদেশে ও বিদেশে প্রেরিত হইত। চট্টগ্রাম, বরিশাল, চব্বিশ পরগণা, তমলুক, হিজলী, জলেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে সামুদ্রিক লবণ স্বদেশ-মধ্যে ও বিদেশে প্রেরিত হইত।

কলিকাতা ও ঢাকার নিকটবর্ত্তী স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত। ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নসিরাবাদ প্রভৃতি স্থানের কার্পাস দ্বারা ঢাকাই বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বকালে বালেশ্বর, মেদিনীপুর, ও অম্বিকা প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট তুল বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এইক্ষণে সিমলা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, চন্দ্রকোণা ও কটক প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে বীজ লইয়া পারস্য অখাতস্থ দ্বীপবাসীরা স্বদেশে কার্পাসের চাষ করে। পরে, তথা হইতে মিশর-দেশে ইহার বীজ নীত হইয়াছিল।

যে ভারতীয় কার্পাস বীজ এক সময় অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া, মিশরদেশে নীত হইত, আজি আবার সেই আফ্রিকাদেশীয় কার্পাস-বীজ উৎকৃষ্ট বলিয়া ভারতে আনীত হইতেছে! কালের কি বিপর্য্যয়! জাতীয় পতনের সহিত কৃষিকার্য্যের কি শোচনীয় পরিণাম! কৃষ্ণনগর ও যশোহর হইতে ইক্ষু-গুড় এবং কৃষ্ণনগর, যশোহর, বরিশাল ও ফরিদপুর হইতে খর্জ্জুর-গুড় বিদেশে রপ্তানি হইত। নসিরাবাদ, ঢাকা, ত্রিপুরা, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে শণ ও পাট; দার্জিলিং, আসাম ও শ্রীহট্ট হইতে চা এবং চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আসাম হইতে গর্জ্জন তৈল ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত।

কথিত আছে যে, খ্রীঃ পূঃ প্রায় পঞ্চদশ-শতবর্ষ পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশীয় বণিকেরা ঢাকাই বস্ত্র ও কার্পাস লইয়া রোম নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিত।

স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালাদেশ শৌর্য্য,বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। বঙ্গদেশ প্রকৃতির শস্যাগার বলিলে অত্যুক্তি হইত না। আইন্ আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ আকবরের সময়ে, সমস্ত বঙ্গদেশ দ্বাদশ ভূম্যধিকারী "বারভূঁইয়ার" অধিকার ছিল। তখনও সেই সকল ভূম্যধিকারী মহাবল পরাক্রান্ত এবং এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন। নৌ-বল তাহাদিগের প্রধান বল ছিল। ফলতঃ, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যকালের পূর্ব্বে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ প্রায়ই স্বাধীন ছিল। ঐ সময় সেনাপতি রাজা মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে বঙ্গের স্বাধীনতা-রত্ন অপহরণ করে। যে বঙ্গদেশ প্রাচীনকাল হইতে শৌর্য্য ও বীর্য্যে প্রসিদ্ধ, যাহার অধিপতিগণ এককালে বীরেন্দ্র-সমাজে পূজিত হইত, যাহার অধিবাসিগণ এক সময় নৌ-যুদ্ধে সুদক্ষ, বলীয়ান্ ও দুর্দ্দমনীয় ছিল, হায়, সেই বঙ্গবাসীগণ আজি নির্বীর্য্য, ভীরু ও কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত, একতা-বিহীন এবং মসীজীবী হইয়া পরপদ-ধূলি-লেহনে নিরত রহিয়াছে!

বাণিজ্যপ্রিয়, উদ্যমশীল ইংরাজেরা এতদ্দেশে আসিয়া কিছুদিন বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইঁহাদিগের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাকে

সমর-বিজয়ী ইংরাজেরা বঙ্গদেশ করতলগত করিয়াছিলেন। অনন্তর, ক্রমশঃ তাঁহারা প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের একাধিপত্য লাভ করেন। সিপাহি-বিদ্রোহের পর স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্য কোম্পানির হস্ত হইতে লইয়া নিজ শাসনাধীন করিয়াছিলেন। এইক্ষণ তৎপুত্র মহামতি ভারত-সম্রাট রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড ভারতাদি রাজ্য শাসন করিতেছেন।

প্রথমতঃ ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে বণিক্-রূপে আগমন করিয়াছিলেন। বাণিজ্য-জনিত ধন বলে বলীয়ান্ ও তদুপলক্ষে তাৎকালিক ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থাভিজ্ঞ হইয়া ক্রমে ইংরাজেরা ছলে বলে ও কৌশলে ভারত-বর্ষ অধিকার করিয়া তদ্দেশবাসিগণের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন। এদেশে কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ইংরাজ-দিগের রাজত্ব ও প্রবল প্রতাপ অপ্রতিহত ভাবে বিরাজমান রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এমন্ দেশ নাই, যাহাতে ইং-রাজের অবাধ বাণিজ্য প্রবেশ না করিয়াছে; এমন সমুদ্র নাই, যাহাতে ইংরাজ-সাংযাত্রি-কের পোতোপরিস্থ পতাকা পত পত শব্দে প্রোড্ডীয়মান না হইতেছে।

ইংরাজ রাজত্বের উপরে সূর্য্যদেব অস্ত-মিত হন্ না।

ইংরাজের এরূপ বিভব, এরূপ বল, এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের নিদান যে একমাত্র বাণিজ্য, তাহাতে মত-দ্বৈধ নাই।

বাণিজ্যে যে প্রকার ধন বৃদ্ধি হয়, অন্য কোন বিষয়ে তাদৃশ ধনাগম হয় না। অমুক ব্যক্তি যে এত ধন ও এত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল বাণিজ্য বই আর কিছুই নহে।

যখন চিন্তা করা যায় যে, বঙ্গদেশীয় বণিক্-গণ পণ্যদ্রব্য লইয়া আফ্রিকায় মিশরদেশে এবং ইয়োরোপে রোম নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিত, তখন হৃদয় মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে! হায়, "তেহিনো দিবসাগতাঃ"!—বঙ্গে আর কি সে সৌভাগ্য-রবির উদয় হইবে, আর কি বঙ্গবাসী "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মূল-মন্ত্রের সাধনায় সতত অভিনিবিষ্ট হইবে!

বাণিজ্য-তরুর মূল কৃষি, ইহার পুষ্প শিল্প, এবং ফল ধনৈশ্বর্য্য। ভারতবর্ষ চির-কালই কৃষি-প্রধানদেশ, প্রকৃতির আদরের ধন, ভারত পৃথিবীতে স্বর্গ। যে স্থানে ছয় ঋতু বিরাজমান, তথাকার উৎপাদিকা শক্তি অতুলনীয়া। ভারতের কৃষকই একমাত্র উৎপাদক, অন্যে তদীয় শ্রমজাত ফল-ভোগী মাত্র।

কোন দেশের বাণিজ্যাবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেই তন্মূলক কৃষির অবস্থা অতি সহজে জানা যাইতে পারে, সুতরাং প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যাবস্থা বর্ণনা করিয়া তন্মূলক কৃষির অবস্থা পৃথক্ রূপে বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় নহে।

কিন্তু ভারতীয় শিল্প-সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অঙ্গ ভঙ্গ হইবে বলিয়া তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিল্প বলিলে সামান্যত স্থাপত্য (Archi-tecture), ভাস্কর্য্য (Sculpture) এবং চিত্র (Painting) বুঝাইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতের অধিবাসিগণ স্থপতি-বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা ইষ্টক ও প্রস্তরাদি দ্বারা যে সকল সুরম্য হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও সুকৌশলময় দুর্ভেদ্য দুর্গ

সকল নির্ম্মাণ করিতেন, তৎসমুদায় আলোচনা করিলে তাঁহাদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎকালে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রদেশ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হয় নাই, তৎকালে ভারতে আর্য্যগণ বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে ভারতীয় আর্য্যগণের মহিমা সকল ঘোষণা করিতেছেন।

আমরা যতই তাঁহাদিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্ম-দক্ষতা, এবং অবদান-পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া জন্মভূমির অতীত গৌরব সকল স্মরণ করিব, ততই আমাদিগের জাতীয় জীবনের জড়তা ও দুর্ব্বলতাদি অপনীত হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে জাতীয় জীবনে দুর্দ্দমনীয় শক্তির সঞ্চার হইতে থাকিবে। আমাদিগের কর্ম্ম-দোষে যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, জাতীয় বল সঞ্চারিত হইলে তাহা বিদূরিত হইবে।

প্রথম স্থাপত্য। বৈদিক ব্রাহ্মণভাগের সময়ে অনুষ্ঠিত যাগ সমূহে চিতি ও কুণ্ডাদির নির্ম্মাণ নিতান্ত আবশ্যকীয় ছিল। ঐ সকল চিতি ও কুণ্ড প্রভৃতি খিলান দ্বারা নির্ম্মিত হইত। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, স্থাপত্যের অতি কঠিন ও প্রধান অঙ্গ, খিলান করাটী পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বৈদিককালে ভারতে বর্ত্তমান ছিল। একজন আধুনিক পাশ্চত্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, প্রথমে ভারতবর্ষেই খিলান করা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, পরে মিশর ও গ্রীসদেশবাসী স্থপতিবর্গ উহার আভাস প্রাপ্ত হয়। বেদে শম্বরাসুরের নব নবতি সংখ্যক পাষাণ-নির্ম্মিত অট্টালিকার কথা বারংবার উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের অযোধ্যা, মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনা, দ্বারকা এবং ময়দানব-নির্ম্মিত রাজসূয় যজ্ঞের সভাগৃহ প্রভৃতির কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণ-কৌশলাদির বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্তম্ভ বা স্তূপ সকল বিশেষতঃ অনুরাজপুরস্থিত স্তূপটী বিশাল, মনোহর এবং বিচিত্র কারু-কার্য্য-সমন্বিত। লঙ্কাদ্বীপস্থিত এবং ভীলসা নগরীস্থ বৌদ্ধমন্দিরগুলি জনগণের হৃদয়হারী হইয়া অবস্থিত আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী ও মহারাজ হস্তি-নির্ম্মিত কৌরব-রাজধানী হস্তিনাপুরী জলমগ্ন হইয়াছিল।

বৌদ্ধসাম্রাজ্যকালে নালন্দার বিশ্ব-বিদ্যা-গৃহ অতীব বিশাল ও মনোহর ছিল। আর্য্যা-বর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে যে সকল দেব ও দেবীর মন্দির সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঐগুলি বৌদ্ধ-মন্দিরাদির অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। ফলতঃ, বৌদ্ধকালের পূর্ব্বকালীন হিন্দুদেব ও দেবীর মন্দির কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উৎকলদেশে ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত ভুবনে-শ্বরের এবং ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত জগন্নাথ-দেবের মন্দির দর্শক-বৃন্দের চিত্তহারী হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীপুর, শৃঙ্গপত্তন, ও চিলামব্রুমের মন্দির সকল এবং করমণ্ডল উপকূলস্থ মহাবলিপুরস্থিত মন্দির দর্শকগণের চিত্ত-চমৎকার-জনক হইয়া রহিয়াছে।

মুসলমানের অধিকার সময়ে সোমনাথের চিত্তহারী মন্দিরের ন্যায় কত শত সহস্র দেব-মন্দির, কত শত সহস্র দেবালয় ও রাজপ্রাসাদ

যে বিধ্বস্ত এবং তদীয় উপকরণ দ্বারা মসজিদ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করিতে কে সমর্থ হইবে?

উপর্য্যুপরি বৈদেশিক জাতি-নিচয়ের আক্রমণে প্রাচীন ভারতের দেব-মন্দির, প্রাসাদ ও দুর্গাদি অবরুদ্ধ ও কিঞ্চিৎ বিধ্বস্ত হইলেও মুসলমান অধিকার কালে যেরূপ ঐ সকল বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এরূপ কোন কালেও হয় নাই। ক্রমশঃ

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

# ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

## ওদের শিশুর রক্ত চাই।

১

ওদের শিশুর রক্ত চাই গো, ওদের শিশুর রক্ত চাই!
দিস্‌না বলি বৃদ্ধ হাজার,
ঘুচেনা তার মুখের বেজার,
কিশোর যুবার হয়না তুষ্টি—এম্‌নি বেজায় খাই!
কচি ছেলের মুণ্ড ছিঁড়ে
খণ্ড খাবে—ভীষণ কিরে—
রক্ত-মেলা জিভ্ লক্ লক্, ঘুর্‌ছে সকল ঠাঁই!
ওদের শিশুর রক্ত চাই গো, ওদের শিশুর রক্ত চাই!!

২

ওদের শিশুর রক্ত চাই গো, ওদের শিশুর রক্ত চাই!
দাতাকর্ণের এ দাক্ষিণ্য—
বৃষকেতুর মুণ্ড ভিন্ন
অতিথ্ সেবা হয়না পূর্ণ—আয়োজনটা তাই।
বহুদিন পর ফির্‌ছে বরাত,
নে তুলে আজ্ লোহার করাত,
আপন হাতে ছেলের মুণ্ড কাট্‌তে হবে, ভাই!
ওদের শিশুর রক্ত চাই গো, ওদের শিশুর রক্ত চাই!!

৩

ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়!
পরীক্ষা আজ্ বিষম অতি,—
ও মোর দেশের পদ্মাবতি,
ছেলে বলির সমারোহে আয়, মা, ছুটে আয়!
কান্নাকাটি রাখ্, মা, দূরে,—
ও সব হবে অন্তঃপুরে,—
রণাঙ্গনের মাতঙ্গিনীর বেশ তুলে দে গায়!
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়!!

৪

ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়!
একটা ছেলে দিবি বলি,
উঠ্‌বে শত রক্তা ঠেলি',
দেখ্‌ব এবার কত খেয়ে তৃপ্তি ওরা পায়!
জানিস্ ত, মা, আগা গোড়া,
রক্ত বীজের বংশ মোরা,
রক্ত ফুটে লক্ষ হ'ব ধ্বংস-সাধনায়!
ওরা কত রক্ত চায় গো—দেখ্‌ব কত রক্ত চায়!!

## কিসের খোসামোদ?

আবার কিসের খোসামোদ?
পায় ধরিলে কয়না কথা, তাহার মনে আত্মীয়তা?
পিত্ত-খেকো চিত্তে কি আর নাইক আত্ম-বোধ?
সেই সাতান্ন * হ'তে সুরু—ব্রক্ষণে পা কর্‌লি পুরু,
মর্‌লি-গুরু অতঃপরে দিচ্ছেনা বেশ শোধ?
অতদিন ত দেখ্‌লি সাঁচা—ওসব আশা বাঁদর-নাচা,
"রক্ষণে" কি "লক্ষণে" নাই তক্ষণে বিরোধ।
কাহার্ পদে কপাল-ঠুকা, কিসের খোসামোদ?

২

আবার কিসের নিবেদন?
আমার বাড়ী, আমার দেশ, আর্জ্জী আমার কর্‌বে পেশ
তুঙ্গদ্বীপের ইঙ্গ বেণে?—ছি! ছি! কি মরণ!
কার্য্য যাহার ইষ্টি যোমা, পন্থা কিসে ধরে সোজা?
একটা কথায়—লক্ষ্য যাহার "শাসন ও শোষণ,"
তাহার দ্বারে পাত্তিস্ হাত?—এতই গেলি অধঃপাত—
রাজার ছেলে শক্তি, সাহস ভুল্‌লি কি আপন?
কাহার পদে কপাল-ঠুকা, কিসের নিবেদন?

৩

আবার কাহার মুখ চাওয়া?
কাজ নাই আর বোকা পরা, রুদ্র হ'য়ে ক্ষুদ্র মড়া,
থাক্‌ব কিরে লক্ষ্মী ছাড়া—পরের বোঝা বওয়া?
ভিক্ষা হের পায়ে দলি, আপনাতে রইব বলী,
রামার্জ্জুনের বংশ মোরা—কাহার আখি চাওয়া?

---

* ১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ—পলাশীর যুদ্ধ।

মরে-গায়ে এবার লাগা—হয়বা মরণ, নৈলে জাগা,
জাগা স'য়ে চাইয়া জীবন—পরের লাথি খাওয়া!
কাহার পদে কপাল-ঠুকা, কাহার মুখ চাওয়া?

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

---

## আবাহন।

কে কোথায় আছ, এস সবে মিলি,
জীবন্ত পরাণ * লয়ে;
উঠ উঠ আজ;— ডাকিছে জননী,
নিরাশায় আশা পেয়ে।
আর কত কাল, থাকিবে সকলে,
পর-মুখ পানে চেয়ে;
আর কত কাল, পর পদ-তলে
বিকাবে আপন হিয়ে?
পরের নিকটে করিও না আশা,
মুছ গো নয়ন লোর;
এত অপমান!— তবুও কি ভাই,
কাটিবে না মোহ-ঘোর?
ঠেকিয়া শিখিলে, কেন তবে আর,
রহিলে অলস ভাবে?
নিজ পদ-ভরে, হও অগ্রসর,—
সাধ মহাব্রত সবে।
কেন তবে আর, থাকিবে চাহিয়া
রাজার দুয়ার পানে?
হও অগ্রসর, জীবন-সংগ্রামে,
জ্বলন্ত আহুতি দানে।
যে অনল এবে, উঠেছে জ্বলিয়া
বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে;
দেও ঝাঁপ সবে, সে মহা অনলে,
মায়ের মঙ্গল তরে!
দেখাও সবারে, জননীর তরে
সন্তান জীবন ধরে;
নাচিয়া উঠুক, ধমনীতে স্রোত,
জন্মভূমি নাম স্মরে।
এসিয়া পূরবে, প্রশান্ত সাগরে,
উঠেছে জাপান জেগে;
ভারতের মাঝে, পূর্ব্ব-বঙ্গ-দেশ
আদর্শ জাগাও জেগে।
শত ধন্য তাঁরা দেশ ব্রতে যাঁরা
সঁপিয়া পরাণ মন,—
জননীর তরে, লাঞ্ছিত হইয়া
করিলা জীবন-পণ।
তাই বলি ভাই, ভুলি ভেদাভেদ,
লও এই মহাব্রত;
ভুলি অভিমান, হও একমনে,
আপন কর্ত্তব্য রত।
হিন্দু ও মোসেল্‌ম, হও একপ্রাণ,
মায়ের নামেতে সবে;
উড়াও মায়ের, বিজয় নিশান,
মাতৃ-জয় গাও ভবে।
জগৎ মাঝারে, দাঁড়াবার তরে,
করহ যতন সবে;
এক দিন যদি, এ নশ্বর প্রাণ,
ছাড়িতেই ভবে হবে।
আপন জাতির সাধহ কল্যাণ,
মাতাও, আপনি মাতি;
এ মর-জগতে জ্ঞান গরিমায়
উঠুক উজল-ভাতি।
জ্বলন্ত উদ্যম বহুক অন্তরে;
দেখুক জগৎ-জন,—
পারে কিনা পারে, 'অধম-বাঙ্গালী,'
রাখিতে আপন পণ!
শেষ কথা মোর, রাখিও স্মরণ,
হে বঙ্গ-সন্তানগণ!
'আত্মদান' বিনা, হবে না, হবে না,
'মহাজাতি' সংগঠন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন রায়।

* "পরাণ, প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তি"—নব্যভারত, চৈত্র সংখ্যা।

## পাষাণী ।

শরতের শশধর হাস,
চিত বসায়ন তার ভাষ,
প্রেমের চকোর রবে বধির সেজন !
আঁখি দিয়ে দেহ দিয়ে,
রূপ তার পিয়ে পিয়ে,
নাহি আর আপনি আপন ।
দেখেছিনু দূর হ'তে যবে,
কুসুমের মৃদুতায় ভরা,
জেনেছিনু মদির স্বপনে
ওই রূপে আলোকিত ধরা ।
প্রথম উষার হাসি হ'তে
ভেবেছিনু ও রূপ নির্মল,
কাছে গিয়া দেখিলাম হায় !
রূপ নহে দারুণ গরল ।

নয়নের মোহ আছে নয়নেতে লাগি,
পরাণ বিরোধী তবু আঁখি অনুরাগী ।
দাঁড়ালেম হাসি দেখে নিকটে যখন,
কোথা হ'তে কাল রাত্রি আসি,
আলোকের জীবন বিনাশি,
দুর্ভিক্ষের দামামা বাজায়ে,
ভীমরবে পরাণ কাঁপায়ে,
ঘেরিয়ে আমার চারি পাশ,
বদনে প্রকাশি অট্টহাস

দেখাতে লাগিল তার ভীষণ আনন ।
শকুনি গৃধিনী আদি যত,
আনন্দেতে উঠিল গাহিয়া,
হৃদয়ের রক্ত পান তরে,
পিশাচীরা উঠিল নাচিয়া,
রূপের মদিরা পানে মাতাল নয়ন
এ সকল কিছুই করেনি দরশন ।
উপেক্ষার দারুণ দংশনে,
হৃদয়েতে হয়েছিল ক্ষত,
সেই ক্ষত দিব্য চক্ষু লভি,
আপনার দৃষ্টি করি নত
কাতরে বলিল "তুই কোথা এসেছিস ?"
পালা পালা দূরে যা,
দূরে যারে ফিরে যা,
এ নহেরে অমৃত আলয়,
এ নহেরে কুসুম হৃদয়,

এ নহে প্রেমের তপোবন,
নহে ইহা কমল কানন,
ভালবাসা নাহিক হেথায়,
হেথা এলে মমতা শুকায়,
কাঠিন্যে গঠিত কোমলতা,
সাহারার তৃষ্ণা ভরা বুক,
যার প্রতি চাহে দুনয়নে,
শুকাইয়ে যায় তার মুখ !
এ নহে অমৃতরাশি,—প্রাণনাশি বিষ ।
পালা পালা দূরে যা—
দূরে যারে ফিরে যা,
স্নেহ নিয়ে জগতেতে পীরিতি গঠিস্ ?
রূপ নাহি চাহেক প্রণয়,
প্রেম চায় কোমল হৃদয়,
কোমলতা আপনার হাতে,
রূপ দেহ করে বিনির্ম্মাণ
স্ফীত হয়ে উঠেরে পরাণ ।
ভাদরের রৌদ্র পারা রূপ,
প্রাণের শুকায়ে দেয় দেহ,
কোমলতা নাহিক সেথায়,
নাহিক জনমে সেথা স্নেহ,
পালা পালা দূরে যা—
দূরে যারে ফিরে যা

হৃদয়ের কাছে গিয়ে হৃদয়ে মিশিস্ ।
সীমাবদ্ধ হাসিটুকু তার,
সীমাবদ্ধ আদরের ভাস,
তাহাতেই বিমোহিয়া মোরে
ঘটাইল হেন সর্ব্বনাশ ।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহের মতন
অনন্তের পথে ভালবাসা,
প্রণয়ীরে লইয়া হরষে
বুকে ধরি শত শত আশা
না পাইল যদ্যপি ছুটিতে,
প্রণয়ের সংগীত গাহিয়া
বুকে ধরি ভেকের প্রণয়
কূপ মাঝে কি হ'বে বসিয়া ?
লোহার শৃঙ্খল পরা ভাল,
কারার মাঝারে থাকা শ্রেয়,
তবু তবু ক্ষুদ্রের প্রণয়
সে প্রেম যে নরকের হেয় ।
এক রতি অপরাধ যদি

উদার প্রণয়ী কভু করে,
অশ্রু উৎস উথলি তাহার
দিনরাত অবিরল ঝরে ;
অবিরল বৃষ্টিধারা সম
মরুভূমি করে সে উর্ব্বর,
প্রভাতের হাসির সমান,
তাহে ফুটে প্রেমের অধর।
না করিল প্রেমে যদি উদার মহান্
তবে সে প্রণয় ধ্রুব নরক সমান।
অতি ক্ষুদ্র প্রেমের আলয়ে
মুক্ত বায়ু আসে না ছুটিয়া,
নাহি সেথা পাখির সঙ্গীত
নাহি উঠে জীবন মাতিয়া,
সবি যেন কিনিতে সে চায়
দানের ক্ষমতা কেড়ে লয়,
তনু মনে ক্রীতদাস করি
তবে সেই পুলকিত হয়।
স্নেহগীত শুনিতে না চায়,
চাহে না সে কুসুমের বাস
ধূলিময় ধূলিগত প্রাণ
ধূলির তরেতে অভিলাষ,
সেই প্রেম প্রেম যদি হয়
নরক স্বরগ কেন নয় ?
সেই পাষাণীর কাছে, সত্য বটে—রূপ আছে
সেইরূপ নির্দ্দয়তাময়,
উদার সিন্ধুর মত, সেইরূপে একটীও
তরঙ্গ নাহিক উথলয়।
সিন্ধুর অসীম ভাব, নাহি সেথা এক রতি
সিন্ধুজাত হাঙ্গর কুমীর,
ক্ষুদ্রতা পঙ্কিল জলে, অবিরত ফিরিতেছে
পান শুধু করিতে রুধির।
পান তারা করে অবিরত
তারি হৃদয়ের রক্তধারা
তাদের পুষিয়া সেইজন
হয়েছে এমত বজ্রপারা।
কঠোরতা রূপের অনল
অশ্রু উৎস লয়েছে শুকায়ে,
শ্রবণের শক্তি নাশিয়াছে,
কাঁদে না সে কাহারে কাঁদায়ে।
পাষাণী সে বুঝেছি মরমে
তবু তারে ঘৃণা করিবারে
একবারও স্পৃহা নাহি হয়।
শক্তি যদি থাকিত আমার
চাহি আকাশের মুখ পানে,
স্নেহ-শূন্য হাসিতে তাহার
একটু ফুলের পরিমল,
স্বার্থহীন লাবণ্যের ধারা,
দিয়ে করিতাম নিরমল,
এমন করিয়া তারে গঠিতাম শ্রুতিদ্বার
বুঝিত সে নিশ্বাসের ভাষা,
নয়ন যুগলে তার স্থাপিতাম হেন ঘৃণা,
থাকিত না স্বার্থ ভালবাসা।
সে যদি এমন হ'ত হায়,
জন্মিত না হৃদয়ের রোগ,
তার সনে গলাগলি করি
করিতাম স্বর্গ উপভোগ।
প্রণয় তো নির্ব্বাক্ কবিতা
রমণীই সুর তান লয়,
তার কণ্ঠে কবিতা আমার
আলাপিত হইলে নিশ্চয়
নবসুরা হইত প্রচার !
প্রেমিকেরা বিজনে বসিয়া
সেই সুর আলাপন করি,
গেত গান আনন্দে ভাসিয়া।
কবিতায় প্রফুল্লতা নাই,
কণ্ঠ হইয়াছে সুর হীন,
চির তৃষা রহিল আমার,
এ তৃষা না হইবে বিলীন,
প্রণয়িরে প্রণয়িনী সনে,
গাও গান বসিয়া বিজনে,
তোমাদের রম্য উপবনে,
বসিবারে স্থান দিও ভাই।
গেতে যেন নাহি পারিলাম
প্রেমগান শুনিবারে চাই ;
ঈর্ষানল উঠিবে না জ্বলি
সখা বলি ভাবিও আমায়,
ওই গান শুনিতে শুনিতে
মুদিব নয়ন দুটী হায়।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

# জাপানের অভ্যুদয়। (৩)

সাহিত্য ব্যতীত আইন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প শিখিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্ম-শিক্ষাদানের আপাততঃ বন্দোবস্ত নাই, হয়ত ভবিষ্যতে হইবে। অনেক নব্য জাপানী প্রচলিত ধর্ম্মমত সমূহ কুসংস্কার-বর্দ্ধক মাত্র মনে করেন এবং বিজ্ঞান চর্চ্চাকে ধর্ম্ম চর্চ্চার ও উর্দ্ধে স্থান দেন। আমাদের বিশ্বাস এ ভাব কাটিয়া যাইবে, প্রাচ্যমন ধর্ম্ম হারাইয়া বহুকাল থাকিতে পারে না। টেক্‌নিকাল স্কুল গুলিতে বস্ত্রবয়ন, রঞ্জন এবং তাড়িত সাহায্যে যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ ও রাসায়নিক পদার্থ সমূহ সংগ্রহ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত অনেকে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং বিদ্যালয়ের ও দেশের গৌরব বাড়াইয়াছেন। সিমোজ বারুদের আবিষ্কার একটা দৃষ্টান্ত।

সাহিত্যের মধ্যে, ইংরাজি সাহিত্যের মান সর্ব্বোচ্চে, তন্নিম্নে চৈন ও জাপানী সাহিত্যের স্থান। আইন শিক্ষাকালে, দেশের আইন ব্যতীত, রোমান্ ইংরাজ ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মান আইন ও পঠিত হয়।

নব্য জাপানের অনুকরণে স্বদেশের উন্নতি সাধনে, আমাদের হৃদয়েও বলবতী বাসনা হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্য এখনও যেন স্থির হয় নাই। স্বাধীন জাপান ও অধীন ভারতের অবস্থা সমান নহে। জাপান সম্রাট্, যাহাতে জাপান জগতের যে কোন দেশের তুলনায় কাহাপেক্ষাও হীনরূপে প্রতীত না হয়, তজ্জন্য সদা সমুৎসুক। প্রজা কুলের মতামত লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনই যখন উঁহার লক্ষ্য প্রজাগণকে তদর্থ প্রস্তুত করাও উঁহার একতর উদ্দেশ্য। এজন্য প্রজাবর্গ মাঝে শিক্ষা বিস্তারের নিয়ত চেষ্টা হইতেছে। অন্যান্য জাতি-নিচয়ের সহিত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দণ্ডায়মান হইতেও এই শিক্ষার প্রয়োজন। জাপানী গবর্ণমেণ্ট ত্রিশ বৎসরের ও অধিক কাল ব্যাপিয়া প্রজাবর্গকে রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সর্ব্ব বিষয়েই সুশিক্ষিত করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইতেছেন। আমাদের দেশের অবস্থা ও কি তাহাই? এই যে ইংরাজ অর্থ দিয়া সিপাহী পুষিতেছেন, তাহা কি ভারতবাসীকে জাপানীর ন্যায় রণ-দুর্ম্মদ করিবার জন্য! সিপাহী সেনাপতি আর সিপাহীর বন্দুকই তাহার প্রমাণ। রেল, ষ্টিমার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতির বিস্তারে কি ভারতবাসীর বিজ্ঞানোন্নতিই লক্ষ্য? যুদ্ধনীতি বা অন্য কাহারও স্বার্থ চিন্তার সহিত উহার কি কোন সম্পর্ক নাই? এই যে চারিদিকে ইংরাজের শত শত কারবার কারখানা মাথা তুলিতেছে, সে সব কি দু দিন বাদে ভারতবাসীর হাতে তুলিয়া দিবার জন্য? দেশে ক্রমশঃ প্রজাতন্ত্র-মূলক শাসন নীতির প্রবর্ত্তনই কি উহাঁদের লক্ষ্য? সেই জন্যই কি আমাদিগকে দাস জাতি রূপে প্রতিপন্ন করিতে এবং কথায় কথায় প্রেষ্টিজ অক্ষুণ্ণ রাখিতে দিন দিন উহাঁদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে? সত্য কথা বলিতে হইলে, বলিতে হয়, ইংরাজ আমাদিগকে যদি চিরকাল পদলেহক কুক্কুরের ন্যায় রাখিতে অভিলাষী হন, উঁহারা বিজেতা আমরা বিজিত, উঁহারা চালক আমরা চালিত,

উঁহারা প্রভু আমরা দাস, আমাদের সহিত এই সম্বন্ধ মাত্র স্থাপনই উঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, শীঘ্রই হউক, বা বিলম্বেই হউক, এদেশবাসী উঁহাদিগকে আপনাদের পথের কন্টক স্বরূপ বিবেচনা করিবে, উঁহাদের আওতা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ভগবান্‌কে ডাকিবে এবং যে কেহ নিস্তারের লোভ দেখাইবে হয় ত তাহার শরণ লইবে। কিন্তু আত্মচেষ্টায় জাপানের ন্যায় সামরিক শক্তি অর্জ্জনে, ভারতবাসীর এখন শক্তি ত নাই-ই, প্রবৃত্তিও নাই। ভবিষ্যতের গর্ভ তিমিরাবৃত হইলেও আইরিশ ফেনিয়ান বা রুশিয়ান্ নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের এদেশে যে শীঘ্র প্রতিপত্তি হইবে বোধ হয় না, কারণ, এখনও আমরা অরাজকতার ভীতি ও শান্তি সুখের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই, তা ছাড়া পশুবলের আশ্রয় গ্রহণে সাধারণতঃ ভারতবাসী অত্যন্ত বীতরাগ। হয়ত ইহা তাহার প্রকৃতির দুর্ব্বলতা, বা শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক, কিন্তু "গুণ্ডামি" সে নিজেও ভাল বাসে না, অন্যের আচরণেও দেখিতে ইচ্ছা করে না।

জাপানের অনুকরণে কোন্ বিষয়ে তাহা হইলে আমরা উন্নতি সাধনে প্রয়াস পাইতে পারি?

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অত্যন্ত বিস্তার জন্য আমরা অনায়াসে চেষ্টা পাইতে পারি। দেশে যেন কেহ নিরক্ষর না থাকে। রীতিমত প্রচারক ও পাঠক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়া সকলকেই যেন জ্ঞান চর্চ্চা-জনিত সুখের আস্বাদ দেয়। জগতের কোথায় কি হইতেছে, এবং কোথায় কোন্ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, সকলেই যেন তাহার সংবাদ পায় এবং সুবিধা হইলে চোখের সামনে ও সে গুলি যেন দেখিতে পায়—তৎসমুদয়ের নির্ম্মাণ কৌশল অবগত হইলে, বা নির্ম্মাণ-শক্তি জন্মিলে ত কথাই নাই। কলিকাতাবাসী, রেলগাড়ী, বৈদ্যুতিক ট্রাম, দ্বিচক্রযান, মোটরকার, বেলুন, বায়স্কোপ, কলের গান, ফটোগ্রাফ, বৈদ্যুতিক ও গ্যাসের আলোক, কলের জল, তাড়িতবলে যন্ত্র পরিচালন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতি দেখিয়াছেন। এমন পাড়াগাঁ অনেক আছে, যেখানকার লোক এসব হয়ত কিছু দেখে নাই। আমরা যেমন এয়ার শিপ, ডুবুরি জাহাজ, প্রভৃতি এখনও চক্ষে দেখি নাই। যাহা হউক, নিত্য আবিষ্কৃত নব নব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গুলি আয়ত্ত করিতে পারার নামই প্রকৃত উন্নতি হইলেও,রাম নামে যেমন ভূত পালায় সেইরূপ উহাদের যথাযথ সংবাদ শুনিলেও, কূপ মণ্ডুক ভাব কাটিয়া যায়। কিউবা দ্বীপে অনেকে চুরুট প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। প্রথম প্রথম ইহাদের শ্রমাপনোদন মানসে, কারখানার কর্ত্তারা মাহিনা দিয়া পাঠক নিযুক্ত করেন। পাঠক মহাশয় সংবাদ পত্র হইতে প্রথমে জ্ঞাতব্য সংবাদাদি শুনাইয়া,অবশিষ্টকাল মনোরম উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া উহাদের চিত্ত বিনোদন করেন। এই ব্যাপারে উহাদের এতই চিত্তাকৃষ্ট হইয়াছে যে এখন উহারা নিজ হইতে অর্থ দিয়া পাঠকগণকে উৎসাহিত করে। এই স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে আমরা দেখিয়াছি, মেলা, বারয়ারি, সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা ব্যতীতও প্রচারকের মুখে বক্তৃতা শুনিতেও লোকের কেমন আগ্রহ হয়। শিক্ষা বিস্তার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ন্যায় এইরূপ প্রথার বিস্তারেরও আমরা পক্ষপাতী।

শক্তি-সমবায় অভ্যাস, জাপানের ন্যায় উন্নতি-সাধনের আর একটা উপায়। আমরা দেখিয়াছি, জাপানীরা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব সম্রাট্

হস্তে দিয়া সম্রাটের আজ্ঞাধীনে চলিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রকারান্তরে ইহা শক্তি সমবায়ই হইল। পাঁচ জনে মিলিয়া কার্য্য করিতে এদেশের লোক অনভ্যস্ত বটেই, অধিকন্তু যেন অনভিলাষী। ইহার ভালমন্দ দুই দিকই আছে। যাহা হউক শক্তি-সমবায়ের গুণ দোষ সমালোচনা আমার অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শক্তিহীন অবস্থায়, শুধু আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিলে অতি সামান্য অন্তরালেই যে প্রতিহত হইতে হয়, তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব। স্বদেশী আন্দোলন ফলে দেশী দেশলাই ক্রয়ে ইচ্ছা যায়। বহুপূর্ব্বেই মিউজিয়মে দেশী দেশলাইয়ের সন্ধান পাই; হাতের কাছে না পাওয়ার নির্ম্মাতার ঘাড়ে দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, এখন আবার আন্দোলন ফলে গুজরাটি বা বা অন্য কোন দেশী দেশলাই কিনিতে প্রবল আগ্রহ হইল কিন্তু এইবার অসুবিধা বুঝুন। আমি ব্যবসায়ী নহি, ডাক বা রেল ভাড়া দিয়া দু এক বাক্স, বা, দু এক ডজন দেশলাই আনয়ন কি সম্ভবপর? যাহা হউক আমার ন্যায় দেশী দেশলাই ক্রয়ে সমুৎসুক পাঁচ জনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে করিতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে শীঘ্রই বাজারে দেশী দেশলাইয়ের আমদানী হইবে।*

বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজনীতিই আমাদের রাজনীতি-স্থলীয়। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিই। প্রভাতে উঠিয়াই আমরা ঘর-ঝাঁট দিই, মিউনিসিপালিটি দেখি গ্রাম ঝাঁট দিতেছে। সন্ধ্যার পর সান্ধ্যদীপ জ্বলি, মিউনিসিপালিটি দেখ পথে পথে গ্যাস জ্বালিতেছে। ঘরে যেমন পয়ঃনালী, গ্রামে তেমন ড্রেণ। এক কথায় একটি সংসার সুশৃঙ্খল ভাবে চালাইতে যাহা যাহা প্রয়োজন, বহু সংসারের সমষ্টি-জনপদেও তাহাই। খুব বড় বড় অট্টালিকার উপর নীচে যাওয়া আসার জন্য কলের বন্দোবস্ত আছে, লোক জনকে ডাকিবার জন্য টেলিফোঁ থাকে, রোগাদির চিকিৎসা জন্য ডাক্তার নিযুক্ত থাকে, তদ্রূপ জনপদে রাস্তা যান, চিকিৎসালয় বিদ্যালয়, গোচারণ ও বায়ুসেবন স্থল প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিতে হয়। হাট বা বাজারে যেমন তরি তরকারির মাছের, কাপড় চোপড়ের ও অন্যান্য পণ্যজাতি সমূহের বিভিন্নস্থল নির্দ্দিষ্ট থাকে তদ্রূপ জনপদ গুলিতে সেকেলে ধরণের কামারপাড়া, কুমারপাড়া, মুচিপাড়া, ধোপাপাড়া, বামুনপাড়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পল্লী নির্দ্দিষ্ট করিলে ভাল হয়। ইহাতে অনেক সময় টেক্‌নিকাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপনের আবশ্যকতা থাকে না। আমরা যদি যথাশক্তি সুশৃঙ্খল ভাবে এই সব গ্রাম্য অভাব মোচন জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, ক্রমশঃ দেশ শাসনের উপযুক্ত হইব। রাজা তখন আমাদের নিকট করগ্রাহীমাত্র রূপে বিদ্যমান থাকিবেন। কিন্তু এখানেও কতকগুলি বিষম অন্তরাল আছে, যথা রাজাকে আমরা জলকর, পথকর, চৌকিদারি টেক্স প্রভৃতি বহুবিধ কর দিই। রাজা যদি ঐ সব কর হইতে আমাদিগকে রেহাই দেন তবেই ঐ সব গ্রাম্য অভাব আমাদের আত্মচেষ্টার মোচন শোভা পায়। দেশ-বাসিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজকরের সদ্ব্যবহার এবং রাজবিধি সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিবার অনেক কথা আছে। প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের উহাই প্রাণ। এ বিষয়ে জাপানেরও এখনও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ...

* এখন আর এতদঞ্চলে দেশী দেশলাইয়ের অভাব নাই।

জাপানী সোশিয়া লিষ্ট

জগতে শূদ্রবর্ণ বা দরিদ্র শ্রমজীবী কুলের উত্থানযুগ আসিতেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দিন বহু পূর্ব্বেই গিয়াছে; সর্ব্ব-সমাজেই এক সময় পুরোহিত ও যোদ্ধৃবর্গের অখণ্ড প্রতাপ ছিল। বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দিনও যায় যায় হইয়াছে,; আধুনিক ধর্ম্ম ঘটাদিতে তাহারই সূচনা মাত্র। এইবার শূদ্রের জাগিবার দিন, কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ হইবে না। উদরান্ন সংস্থাপন জন্য সকলেই পরিশ্রম করে, কিন্তু সকলে সমান ফলভোগী হয় না, ইহাই হইল সমস্যা। সুখ ভোগ ও দুঃখ দূর করিতে মানব মাত্রেরই সমান অধিকার। ঈশ্বরের চক্ষে সবাই সমান। তোমার দক্ষতা অধিক থাকে, সাধারণের সুখ বৃদ্ধির উপায় কর, তুমি সকলের পূজা হইবে। আত্মসুখ সাধন মাত্র উদ্দেশ্য হইলে, সাপের মাথায় মণির ন্যায়, তোমার ঐ দক্ষতা জন্যই তুমি সমাজের আরও ভয়ানক শত্রু হইলে। দশজনের ঘর খালি না হইলে, কিছু একজনের ঘরে অর্থ সঞ্চিত হয় না; দক্ষ তুমি ডাকাতি না করিয়া কৌশলে ঐ অর্থ অপহরণ কর মাত্র। একজন কুলির এক ঘণ্টার পরিশ্রমের মূল্য কথায় ধর চারি পয়সা, আর একজন ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়রের এক ঘণ্টার পারিশ্রমিক কত? কে বাপু এমন হয়? ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়রও মানুষ, কুলিও মানুষ, সুখ দুঃখ ভোগে সকলের সমান অধিকাব, তবে এ বৈষম্য কেন? তুমি হয় ত বলিবে, ডাক্তর এঞ্জিনীয়রের উর্ব্বর মস্তিষ্ক বা জ্ঞানের জন্যই তাঁহাদের পারিশ্রমিকের মূল্য বেশী। ছিঃ বিদ্যা বা জ্ঞানের আবার মূল্য? উহা ত অমূল্য। কৈ ব্রাহ্মণ সভ্যতার দিনে উহাত বিক্রীত হইত না, বরং যাচিয়া বিতরিত হইত। ইহার পরিবর্ত্তে উহাঁরা একটু আদর, একটু সম্মান মাত্র মূল্য স্বরূপ চাহিতেন, অন্যের সুখ ভোগের হন্তারক হইবার জন্য ত অর্থ সঞ্চয়ে মন দিতেন না। গ্রীস দেশে একবার লোকের ধন লোভ কমাইবার জন্য লৌহ মুদ্রার প্রচলন চেষ্টা হইয়াছিল, যেন অধিক অর্থ দিতে যাইলে, গ্রহীতা প্রাণ খুলিয়া পরিত্রাহি ডাকে। আমাদের সমাজেরও কতকতা অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। উদর পূরিয়া অন্ন দেও, “পেট ভরিলে মোণ্ডা লাগিবে তিত”। সিধা দিয়া ভাণ্ডার, গোলা বা মরাই বোঝাই করিয়া ফেল। গৃহ পূর্ণ হইলে, সে আপনিই “আর নহে” বলিবে। আবার ঐ সমস্ত কিছু চিরকাল সঞ্চিত থাকে না—খারাপ হইয়া যায়। সেই জন্য সে নিজে ব্যবহার করিয়া অতিরিক্ত যাহা বাঁচিবে, দুই হাতে প্রাণ খুলিয়া অপরকে দান করিবে। কিন্তু খবরদার অর্থ দানে কাহারও সন্তোষ সাধনে চেষ্টা পাইও না। এ পর্য্যন্ত অর্থ দিয়া কেহ কাহারও আশা মিটাইতে পারে নাই এবং অর্থ পাইয়াও কাহারও আশা মিটে নাই। অবশ্য অর্থের অল্প স্বল্প প্রচলন প্রয়োজন, কারণ বিনিময় প্রথা সর্ব্বত্র সুবিধাকর বা সহজ সাধ্য নহে। বিনিময় প্রথা এক দম উঠিয়া গিয়া কেবল অর্থের প্রচলন হইয়াই যত অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। শ্রমজীবী তাহার পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হইতেছে না। কত ঝগড়া ঝাঁটি করিয়া যদি কিছু মূল্য বাড়িল দেখে, তাহার আয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিনিসেরও দর চড়িতেছে। লক্ষ লক্ষ নর শোণিতে তর্পণ করিয়া সেই যে ফরাসি বিদ্রোহ জগতে “সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রীর মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছে, তদবধি জগতে এক অভিনব যুগ আরব্ধ হই-

য়াছে। ঠিক হউক, ভুল হউক, জগতের দরিদ্র সম্প্রদায় সর্ব্বত্র ভাবিতে বসিয়াছে, সমাজে জন্মিয়া সবাই সমান অধিকারী হইয়াও স্বাধীনতা ও সুখ ভোগে এত তারতম্য কেন? বর্ত্তমানে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ই দরিদ্র ও অধীন সম্প্রদায়ের আদর্শ। পৃথিবীতে জন্মিয়া পৃথিবী কেমন সে দেখিতে পায় না। প্রভুর নিকটে শিকলি বাঁধা থাকা ব্যতীত তাহার গতি নাই! প্রভুর করুণা ব্যতীত তাহার উদারান্ন সংস্থাপনের উপায় নাই। এবিষয়ে বনের পশুও তাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক দিকে সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রীর অবিরাম উদ্দীপনা, অন্য দিকে পদে পদে দাসত্ব ভোগ, কাযেই জগতের দরিদ্র সম্প্রদায় ক্রমশঃ উত্তেজিত হইতেছে, বর্ত্তমান সমুদয় সামাজিক বিধি ব্যবস্থার ওলট পালট করিতে উহারা এখন উদ্যত। সম্ভবতঃ এমন দিন আসিতেছে যে দিন প্রত্যেকের আবরণে প্রত্যেকে সন্দিহান হইয়া আর কেহ কাহারও জন্য খাটিবেনা। যাহার যাহা অভাব নিজে গতর খাটাইয়া তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। যদি কখন সেদিন আসে, তখন বহুদিনের অভ্যাসযোগে বলীয়ান্ শ্রমজীবী সম্প্রদায়েরই জয় লাভ হইবে। ইহাদের সহিত সন্ধি করিয়া সামাজিকগণকে আবার নূতন বিধির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কে বলিতে পারে ভারতের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মাঝ হইতেই এ নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইবে না।

জাপানেও সোশিয়ালিষ্ট মতের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। ইহারই মধ্যে জাপানী গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন, যদি কোন শ্রমজীবী, পরিশ্রমের সময় সংক্ষেপ বা পারিশ্রমিকের মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে; পুলিশ তাহাদের শাস্তি দিবে। সম্ভবতঃ এ বিধি প্রত্যাহৃত হইয়াছে, কারণ জাপানে এখন, এখানে সেখানে সোশিয়ালিষ্টিক সভা সমিতি হইতেছে। ১৯০৩ সালে "সোশিয়ালিষ্টিক কংগ্রেসের" অধিবেশন হয়। তাহাতে জগতের সমস্ত সোশিয়ালিষ্টিক সম্প্রদায় সহ একযোগে কার্য্য করা অবধারিত হইয়াছে। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে শ্রীযুক্ত কাটায়ামা আমেরিকায় শিক্ষিত হইয়া তথা হইতে স্বদেশে সোশিয়ালিষ্টিক মতের বীজ ছড়াইয়া দিয়াছেন। এখন উহা হইতে কিরূপ বৃথা বাহির হয়, ভবিতব্যই বলিতে পারেন। সোশিয়ালিষ্ট হইলেও, জাপানী প্রজার সম্রাটের উপর অচলা ভক্তি, সুতরাং অন্য দেশের নরপতিবৃন্দের ন্যায় জাপানী সম্রাটের এজন্য উদ্বেগের কারণ নাই।

অনেকেই সংবাদ রাখেন না সোশিয়ালিষ্টিক মতবাদে ভারতের সর্ব্বস্তর চিরকাল কিরূপ অনুপ্রাণিত। বর্ষ কত পূর্ব্বে বঙ্গবাসী পত্রে একজন ইংরাজের মুখে শুনা গিয়াছিল, এ দেশের নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে যে সন্ন্যাসী যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, সম্প্রদায়ের নামে তাহা সঞ্চিত হয় এবং উঁহাদেরই নির্ব্বাচিত কেহ, ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া তাহা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান। আমাদেরই দেশের কথা হইলেও, এ সম্বন্ধে ইহার অধিক কোন সংবাদ আমরা দিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমাদের মঠ ও দেবোত্তর সম্পত্তি সমূহ হইতে আমরা ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাইতে পারি। প্রতীচ্য সমাজে যে সব সাধারণ ভোগ্য অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সে সব নামে মাত্র, আমাদের তুলনায় কিছুই নহে। আমাদের নিমন্ত্রণ ব্যাপারে যেরূপ দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ কাণ্ডের ছড়াছড়ি হয়, উঁহাদের দেশে তাহা বোধ

হয় অজ্ঞাত। আমাদের দেশে জলাশয় উৎসর্গ করি, সাধারণের ভোগার্থ আর ইংরাজের মিউনিসিপালিটি দেখিবে নোটিশবোর্ড আঁটিয়া দিয়াছে, এই জলাশয়ে কেহ যদি স্নান করে বা কাপড় কাচে পুলিশ কর্ত্তৃক সে ধৃত হইবে। মহীপাল দীঘির প্রতিষ্ঠাতা এ বিজ্ঞাপন দেখিলে কি বলিতেন? কেন বাপু স্নান বা কাপড় কাচাটা কি নর্দ্দমায় করিতে হইবে? জলাশয় স্থাপন কি শুধু পানীয় জলের জন্যই? বিশুদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় হইলে, গঙ্গার জলে মল রাশি ফেলিবার জন্য অত জেদ কেন? অথবা একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার জন্য একাধিক জলাশয় উৎসৃষ্ট হয় না কেন? কলিকাতার গোলদীঘি, লালদীঘি গুলিরই বা সার্থকতা কি? শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেন, উঁহাদের পার্কগুলা যেন স্বর্গের নন্দন কানন, শোভায় অতুলনীয়, কিন্তু ঐ খানেই শেষ, একটি ফুল তুলিবার বা পাতা ছিঁড়িবার অধিকার নাই। ইহার সহিত আমাদের শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরের পথে যাত্রিগণের ব্যবহার জন্য লক্ষ আম্র বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার তুলনা করিতে পার। আমরা অসভ্য, তাই পাড়াগাঁয়ে, অন্যের গাছের ডুমুর, কাঁচকলা লইয়া, বা পুকুরের কলমি, শুশুনি তুলিয়া নিঃসম্বল অনেকে কোনরূপে জীবন যাপন করে, উহাদিগকে বাধা দিতে অনেকে লজ্জা বোধ করে। সভ্য সমাজে আসিলে উহাদিগকে ঐ সব কার্য্য জন্য হয় ত চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইতে হইত। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতি হইতে মুক্তিলাভার্থ গৃহী মাত্রের নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ যজ্ঞ ব্যাপারটা কি, আমরা অনেকে আজ কাল ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এখনও আমাদের বহুকার্য্যে সাধারণের স্বত্ব অজ্ঞাতসারে স্বীকৃত হয়। আহার কালে আমরা 'শতান্ন' রাখিতে ভুলি না এবং মুষ্টি ভিক্ষাটাও অনেক গৃহে কর্ত্তব্যরূপে স্বীকৃত হয়। শ্রাদ্ধকালে নদীতীর এখনও অস্বাত্বিক সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। বস্তুতঃ রৌদ্র বায়ু প্রভৃতির ন্যায় সমুদ্র, নদী, অরণ্য প্রভৃতিতে কাহারও অধিকার স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এ দেশের রিজার্ভ ফরেষ্ট সমূহ হইতে সাধু সন্ন্যাসীরাও যদি কিছু কাঠ লয়েন, ইংরাজের আদালতে দণ্ডিত হন। এ প্রথা এ দেশবাসীর প্রবৃত্তির একান্ত বিরোধী। আবহমান কাল হইতে অরণ্যই এ দেশের নিঃসম্বলগণের শরণ্য। ভারতের অরণ্যই শ্রীরামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরকে দুর্দ্দিনে বহুবর্ষ আশ্রয় দেয়। ভারত তপোবনে চারিটা আশ্রমের মধ্যে কতগুলা অরণ্যে পুষ্ট ও বিকশিত ভাবিয়া দেখ। বননাশের আশঙ্কা দূরে থাকুক, উৎসাহ পাইলে বহু নূতন বনের হয়ত প্রতিষ্ঠা হয়। এ আম্র কাননের কথা স্মরণ কর। যাহা হউক বর্ত্তমান কালে সামাজিক বিধি ব্যবস্থাগুলি ব্যক্তিগত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত অধিকার ঘুচাইয়া, সর্ব্ব বিষয়েই সাধারণের স্বত্ব সাব্যস্ত করিলে, প্রচলিত সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, আবার সেইরূপ চারিদিকে ব্যক্তিগত অধিকারের অতি বৃদ্ধি ফলেও সমাজ পীড়িত হয়। এই পৃথিবীতে কেহ কিছু সঙ্গে লইয়া আসে না এবং সঙ্গে লইয়াও যাইবে না। এমত স্থলে ব্যক্তিগত অধিকারটা যে নিতান্ত অমূলক সহজেই বুঝা যায়। এজন্য সমাজের অন্ততঃ অনেকগুলি বিষয়ে, সাধারণের অধিকার স্বীকৃত না হইলে, ও সাধারণ ভোগ্য বিষয় সমূহের কোন ব্যবস্থা না থাকিলে, সে সমাজকে পূর্ণাঙ্গ ও উন্নত বলা সাজে না। সাধারণের জন্য কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা থাকিলে, তাহা ত্যাগ ও সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়া

করিতে হয়; নিজকেও সেই সাধারণের এক জন হইতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দেখিতে পাই, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও কিছু এই তিনটী আশ্রম সোশিয়ালিষ্ট ভাবে অনুপ্রাণিত; গার্হস্থ্যাশ্রমে ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত। দেবপ্রকৃতি নিবৃত্তি মার্গাবলম্বিগণের পক্ষেই প্রথমোক্তটি উপযোগী। প্রতীচ্য সোশিয়ালিষ্টগণ, গৃহী সন্ন্যাসী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী সকলকে এক নিগড়ে বাঁধিবার চেষ্টা না পাইয়া, ভারতের অনুকরণে সমাজ গঠনে যদি চেষ্টা পান, মৃত্যুই জীবনের পরিণতি বুঝিয়া মন হইতে বিষয় ভোগ স্পৃহাটা যদি একটু কমাইতে পারেন, হয়ত কৃতকার্য্য হন। কে বলিতে পারে, আমাদের ভারতই জগৎবাসীকে এ বিষয়ে পথ দেখাইবে না। সেই জন্যই ভগবান্ বুঝি উহাকে দুঃখের আগুণে এত পোড়াইতেছেন। কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। গল্প আছে, কোন বিচারক একবার কোন অপরাধীর এক হাত কাটিয়া দিতে আদেশ দেন। হাতকাটা হইল, অপরাধী একটুও কাতরতা দেখাইল না। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বিচারক উহার পিছনে লোক লাগাইলেন। পথে একজন দুহাত কাটা আসিতেছিল, যাই দুজনের সাক্ষাৎ অমনই দুজনে কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইল। বিচারক হাত কাটাকে নিকটে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপুহে আমার কাছে ত একটুও কাতরতা দেখাও নাই, উহাকে দেখিয়া ওরূপ করিলে কেন? হাতকাটা উত্তর দিল প্রাণহীন পাষাণের কাছে কেহ মর্ম্মবেদনা জানায় না, হাতকাটার মর্ম্ম যদি আপনি জানিতেন, তাহা হইলে ওরূপ আদেশ কখনই দিতে পারিতেন না। ও ব্যক্তি আমাপেক্ষাও হতভাগা এবং সেও বুঝিল সংসারে আর একজন হতভাগ্যের বৃদ্ধি হইল, তাই আমরা দু'জনেই কাঁদিয়াছিলাম। সংসার-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত দেহ আমরা—'কোধর্ম্মো—ভূতদয়া' নীতির আশ্রয়ে পরিচালিত আমরা, survival of the fittest theoryর মাহাত্ম্য কত এবং উহাতে জগৎবাসীর কিরূপ উন্নতি ও সুখবৃদ্ধি হয়, হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

### সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান

দেশের দারিদ্র্য সমস্যার মীমাংসা জন্য জাপান গবর্ণমেণ্ট য়ুরোপের অনুকরণে অনেক গুলি ওয়ার্কশপ স্থাপিত করিয়াছেন। বৃত্তিহীন সক্ষম পুরুষগণ ঐ সব স্থলে খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে। ইহা ব্যতীত অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ প্রভৃতির পালন জন্য ও সরকারি খরচে আশ্রম খোলা হইয়াছে। অঙ্গহীন বা পীড়িতগণের জন্য আশ্রম খোলা অত্যন্ত প্রশংসার কথা এদেশে ঐরূপ আশ্রম সমূহের যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয় এবং ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য সম্প্রদায়ের ও অন্য কাহারও কাহারও এতদ্বিষয়ক যত্ন ও অধ্যবসায় জন্য আমাদের সকলের কৃতজ্ঞ থাকা লচিত, কিন্তু অন্যবিধ ওয়ার্কশপগুলির আমরা তেমন পক্ষপাতী নহি। দূর হইতে ও সমস্ত যেরূপ স্বর্গবোধ হয়, ওগুলি প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নহে। ডিকেন্স মহোদয়ের দু এক খানা উপন্যাস পড়িলে এ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রম কাটিয়া যাইতে পারে। দুর্ভিক্ষকালে যে সব রিলিফ ওয়ার্কস খোলা হয়, তাহাদের সহিত আমাদের প্রাচীন অন্নসত্রের তুলনা কর। বৃত্তিহীন সক্ষম পুরুষগণকে স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের পথ দেখান ভাল, কিন্তু তাহাদিগকে নানা বাঁধনে বাঁধিয়া কয়েদী বা পুলিশের দাগী আসামীর মত নজরে নজরে

রাখাও অনেকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। দারিদ্র্য, আমাদের দেশের কবির ভাষার ষষ্ঠ-মহাতকরূপে বিবেচিত, কিন্তু প্রতীচ্য আদর্শ সম্মুখে উহা অপরাধরূপে পরিগণিত এবং পুরু-ষের হীনতা বা অক্ষমতারই পরিচায়ক। বালকগণকে তাহাদের অভিভাবকদের শাসনাধীনে রাখা যেমন কর্ত্তব্যরূপে স্বীকৃত হয়, প্রতীচ্য-সমাজ সেইরূপ দরিদ্রগণকে যথেচ্ছ শাসনাধীনে রাখিতে চাহেন। এইজন্য ইউ-রোপে কেহ সহজে ওয়ার্কশপ সমূহে নাম লিখাইতে চাহেন না। এতদিনের সাধনা নিষ্ফল করিয়া ভারতীয় সমাজে কাঞ্চন প্রাধান্য স্থাপিত হয় দেখিতে ইচ্ছা যায় না। আমাদের বিবেচনায়, যদি গঙ্গাতীর ও অন্য তীর্থাদিস্থলে গয়াযাত্রীর ঘরের ন্যায় ধর্ম্মশালা সমূহ নির্ম্মাণ করা যায়, শ্রীক্ষেত্র যাইবার পথে লক্ষ আম্রবৃক্ষ প্রতিষ্ঠার ন্যায়, পথ পার্শ্বে দরি-দ্রের ভোগার্থ ফলবৃক্ষ সমূহ যদি রোপিত হয়, নিকটে কোন দেবমন্দির থাকে এবং দেশের লোকের মুষ্টি ভিক্ষা না কমে, সঙ্গে সঙ্গে দানটা প্রশংসনীয় কিন্তু প্রতিগ্রাহী হইবেন, যাহার দান লওয়া যায়, তাহার পাপ পুণ্যে-রও অংশী হইতে হয়, অথবা, তাহাকে নিজ পুণ্যেরও অংশ দিতে হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ ভাব এদেশে এখনও লোপ পায় নাই। ভূমিকম্প প্রভাবে গৃহহীন কাঙ্গড়া বাসিগণ অমন বিপৎকালেও অন্যের দান গ্রহণে অনিচ্ছা দেখাইয়া ছিলেন। এই ধারণা বৃদ্ধি পাইলে দেশের দারিদ্র্য সমস্যার সুমীমাংসা হয়।

### জ্ঞাতব্য বিবিধ সামাজিক তত্ত্ব

**স্নান—জাপানীরা দিনে অন্ততঃ একবার প্রায় ১১০ ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণ জলে স্নান বা** আপনাদিগকে সিদ্ধ করে। স্নান কালে এত দূর গরম জল, বোধ করি, অন্য কোন জাতি ব্যবহার করে না। এই নিত্য স্নান অভ্যাস হেতু উঁহারা সকলেই অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং ভ্রমণকারীরা শতমুখে উঁহাদের এই গুণের প্রশংসা করেন। স্নান সম্বন্ধে ভারতবাসীরাও বড় ফেলা যান না, কিন্তু আমাদের দেশে দু একটা অদ্ভুত প্রথা দৃষ্ট হয়, যাহার কারণ অনুমান তেমন সহজ নহে। সন্ন্যাসীরা যে ভস্ম মাখিয়া বসিয়া থাকেন আমাদের শাস্ত্র-মতে তাহাও একরূপ স্নান; সন্ধ্যাহ্নিকের মাঝে মন্ত্র পড়িয়া গায়ে একটু জল ছিটাইয়া দিতে হয়, তাহাও স্নান হিসাবে গণনীয়।

"মাজা ঘসার কাজ উহারা গরম জলে সারিয়া, শেষে ঠাণ্ডা জলে শরীর ধুইয়া ফেলে। শীতকালে ঘরের ভিতর গরম জলে স্নান করিয়া, চোঁচা দৌড় মারিয়া বাহিরে আসিয়া বরফের উপর গড়াগড়ি দেয়; শেষে ঘরে ঢুকিয়া খুব সজোরে গা মুছিয়া কাপড় চোপড় পরে।" (প্রবাসী মাঘ ১৩১১)

এই প্রথা বিজ্ঞানানুমোদিত কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু জাপানীরা রস-বাস, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে প্রায় আক্রান্ত হয় না। অভ্যাস যোগের ফল প্রকৃ-তই অতীব রহস্যময়।

### আহার

জাপানীরা আকাঁড়া চাউল ব্যবহার করেন। য়ুরোপীয়গণ বলেন তাই উহাদের এত বল। পিকিন্ যাত্রাকালে, রুষ, ফরাসী, জর্ম্মান্ আমেরিকান্ সর্ব্ব জাতির সৈন্যকে পিছাইয়া ফেলিয়া আগে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। আমাদের দেশের ছোট লোকেরা ও বলে, বালাম চাউল খৈএর মত, অতি শীঘ্র

জীর্ণ হয়; অত লঘুপাক খাদ্য তাহাদের পোষায় না। অদৃষ্ট দোষে অনেক বাঙ্গালীর এখন বালাম ফেলিয়া দাউদখানি ধরিলেই ভাল হয়। বল বৃদ্ধির অনুরোধে মোটা মোটা আকাঁড়া চাউল ফেণ না গালিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইবে ত? আসাম দেশে একরূপ চাউল জন্মে, তাহা জলে ভিজাইলেই ভাত হয়। আমাদের চিপিটক বা চিঁড়ার কতকটা এইরূপ গুণ। জাপানীরা ঐরূপ চাউল বা চিঁড়া ব্যবহার করেন কি না ঠিক জানা নাই, কিন্তু সংবাদপত্রে পড়া গিয়াছে, উঁহারা ভাত শুকাইয়া রাখেন। যুদ্ধ স্থলে এই শুষ্ক অন্ন গরম জলে ফেলিলেই স্বল্পায়াসে সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হইল। এই বর্ণনার ভিতর কতটা আজগুবি কতটা সত্য বলা দুষ্কর। কিন্তু, এক সময় শুধু অভ্যাস গুণে এদেশের লোক পথে বা বিদেশে, চিঁড়া, মুড়কি, মুড়ি, খৈ আর একটুখানি দুধ, দধি বা কদলি প্রভৃতির সাহায্যে ঐরূপ স্বল্পায়াসে ফলাহারের আয়োজন করিয়া লইতেন ও তাহাতে তৃপ্তিও পাইতেন।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও প্রচলিত থাকিলেও, জৈবাহার উহাঁদের নিষিদ্ধ বোধ হয় না। উহাঁরা আমাদেরই ন্যায় মাছ ভক্ত, কিন্তু আমাদের ন্যায় দুগ্ধ ঘৃতাদির আদর জানেন না। জাপানী রসনা পিঁয়াজ ও টোম্যাটো বা বিলাতি বেগুণের কিছু অনুরাগী। প্রবাসী পত্রে (আশ্বিন ১৩১২) পড়িতেছিলাম উহাঁরা রন্ধন কার্য্যে তৈলের ব্যবহারও জানেন না, অন্যত্র কিন্তু লিখিত হইয়াছে (প্রবাসী চৈত্র ১৩১১), জাপানীমতে ক্ষীণ ব্যক্তিরা বেশী করিয়া স্নেহময় পদার্থ ও তৈল খাইবে। এক একবার প্রায় আধ ছটাক করিয়া দিনের মধ্যে তিন চারিবার, মার্কিণ দেশীয় কার্পাসবীজের তৈল অথবা জলপাইয়ের তৈল খাইবার ব্যবস্থা। শরীরের ওজন বাড়াইতে হইলে খুব ডিম ও বাদাম আখরোট প্রভৃতি খাওয়া উচিত এবং দুধের যোগাড় করিতে পারিলে, দুধই ভাল। শুধু দুধ খাইয়া প্রাচীন সামুরাই পরিবারের এক ব্যক্তির শরীরের ওজন সাড়ে তিন সপ্তাহে প্রায় তিন সের বাড়িয়াছিল। জাপানীরা তাহা হইলে দুধের আদর জানেন, কেবল পান না বলিয়া বিকল্পের ব্যবস্থা। জলপান বিষয়ে জাপানীরা অগস্ত্য বা জহ্নুমুনির শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। সমস্ত দিনে পীত জলের পরিমাণ প্রায় পাঁচ সের। খালি মাথায় বা খালি পায়ে বেড়াইলে ইহাঁরা স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা করেন না প্রত্যুত জিউজিৎসু ব্যায়াম শিক্ষার ইহা একটা পূর্ব্বাঙ্গ।

প্রবাসী (মাঘ ১৩১১) পত্রে জাপানী আহার বিহারের নিম্নোক্তরূপ কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

"এমন সপ্তাহ বাদ যায় না, যাহার ভিতর তাহারা (জাপানীরা) দুই তিন পাত্র খণ্ডীকৃত অপক্ক পলাণ্ডু উদরসাৎ না করে। তাহাদের মতে সিদ্ধ পিঁয়াজ তত উপকারী নহে। শসা, কাঁকুড় প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া গরম গরম খায়। কাঁচা বাঁধা কপি শালগম কাঁচা মাছ শুট্‌কিমাছ (সিদ্ধ বা অসিদ্ধ) পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে। কাঁচামাছ মৃদু লবণ জলে ভিজাইয়া অথবা শুকাইয়া পরে লবণের সহিত সিদ্ধ করিয়াও ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ ব্যবহৃত না হইলেও মাখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা টিনে করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্য বা অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনা হয়।"

"খুব শীতের সময়ও ঘরের ভিতর হাওয়া চলাচল করিতে পায়। বেশী শীত বোধ

হইলে, বেশী শীতবস্ত্র ব্যবহৃত হয়; হাওয়া রোধের কোন চেষ্টাই হয় না।"

মাদক দ্রব্যের মধ্যে চা এবং সাকে নামক ধেনো মদের চলন পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখন বিয়ার, ব্রাণ্ডি প্রভৃতিরও শুভাগমন হইয়াছে। তামাক-খোরের সংখ্যা অনেক অধিক, কিন্তু অহিফেনকে ইঁহারা ঘেঁস দেন না এমন কি ঔষধার্থেও ব্যবহার করিতে বড় চাহেন না।

জাপানীরা প্রায়ই অত্যন্ত অল্পাহারী। কুলি মজুরেরাও যাহা খাইয়া পরিশ্রম করে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাতে হয় ত এক বাটি ভাত ও কয়েক ফালি শুঁটকি মাছ, মধ্যাহ্নে একটী আপেল, একটী বিলাতি বেগুণ ও একটী পিঁয়াজ এবং রাত্রে হয় ত কিছু টাটকা সিদ্ধ মাছ, শাক, বিলাতি বেগুণ, পেঁয়াজ, কাঁকুড় বা মূলা খাইয়া দিন কাটায়। শ্রীযুক্ত ইন্দু মাধব মল্লিকের মুখে শুনা যায় চীনারাও ঐরূপ অল্পাহারী। 'উন পেটে দুন বল'—প্রবাদটি ইঁহাদের মাঝেই সার্থক হইয়াছে। এরূপ পরিশ্রমী অথচ অল্পাহারী জাতি জগতে বিরল। আমাদের দরিদ্ররাও অত্যন্ত অল্পাহারী বটে, কিন্তু সেটা স্বভাবে নহে—অভাবে। আহার জুটেনা বলিয়াই হয় ত এক মুঠা ছোলা, বা মকাই খাইয়া দিন কাটাইতে হয়। বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট এমনও শুনিয়াছি, একজন লোটায় গঙ্গামৃত্তিকা গুলিয়া তাহাই পান করিয়া উদরজ্বালা জুড়াইতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সন্ন্যাসীর ন্যায় চেহারা একজন, এক আঁটি শুষ্ক ঘাস খাইতে খাইতে চলিয়াছেন। শাস্ত্রমতে ব্রত উপবাসাদি অভ্যাস করিলে, আমাদের সকলকেই আহারের মায়া কাটাইতে হয় বটে, কিন্তু ক্ষুধা সংযমে চেষ্টা না পাইলে, আমাদেরই মাঝে "আধমণে (আধমণ আহার সমর্থ) কৈলাস" ও দেখা দেয় তথাপি সাধারণতঃ আমরা প্রতীচ্যগণের তুলনায় অল্পাহারী। তিন জন ইংরাজ জাপান বেড়াইতে গিয়া এই জন্য বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। জাপানীদের চক্ষে আমরাই হয় ত রাক্ষসের মত খাই, ইংরাজদের ত কথাই নাই। ইংরাজ তিন জন লিখিয়াছেন, (Round the World on Wheels পুস্তক দ্রষ্টব্য) আহার কালে প্রায়ই তাঁহাদিগকে বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। তিন জনের জন্য আহার্য্য আনিলে, একজন সমস্তই কাড়িয়া লইয়া ইঙ্গিতে অপর দুই জনের খাদ্যের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতেন। পরিচারিকারা উঁহাদের ক্ষুধার পরিমাণ দেখিয়া কষ্টে হাসি চাপিবার চেষ্টা পাইত। গ্রামখানির সমুদয় আহার্য্য উঁহারা বোধ হয় শেষ করিয়া দিতেন, কারণ দলে দলে লোক আসিয়া উঁহাদের আহার দেখিতে জমায়েৎ হইত।

### বেশভূষা

কোন কোন স্থলে ইয়ুরোপীয় বেশে সজ্জিত হওয়াই নিয়ম, নতুবা জাপানীরা তাঁহাদের দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করেন নাই। উঁহারা সাধারণতঃ রেশমি পরিচ্ছদই ব্যবহার করেন। শোভায় কার্পাস বস্ত্র রেশমের নিকট পরাজিত হইলেও, বিলাতি বিলাসিনীরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার কার্পাসের পক্ষপাতিনী হইতেছেন। পুনঃ পুনঃ কাচিলে, রেশমী বস্ত্র ক্রমশঃ শ্রীহীন হয় কিন্তু কার্পাস তাহার বিপরীত, যত বয়স হয় তত রূপ বাড়ে। অধিকন্তু ইহা ইতর ভদ্র সকলের আয়ত্তাধীন। নিপুণ শিল্পীর হস্তে পড়িলে ইহা সর্ব্ববিধ বস্ত্রকে পরাজিত করে,—প্রমাণ, ঢাকাই মসলিন—রেশমে সে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদানের সুযোগ কোথায়?

যাহা হউক আমরা যখন কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করি, তখন আমাদের মুখে কার্পাসের ওকালতি মানায় না।

### জিউজিৎসু ব্যায়াম

জিউজিৎসু বা জাপানী ব্যায়াম সহসা সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সংক্ষেপতঃ,ইহা অভ্যাস যোগের নামান্তর। হিতকর ও মিত আহার বিহারে অভ্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেহের এমন সব অংশ খুজিয়া বাহির করিতে হয়, যে গুলি সামান্য কারণেই, যেমন একটু জোরে চাপিয়া ধরিলেই অবশ হয়। ঐ স্থানগুলি ক্রমশঃ কষ্ট সহিষ্ণু করিয়া লওয়া হয়। দেখা গিয়াছে, আমাদের অনেকের গলার হাড় যে একটু উঁচু থাকে, সেইখানে আঘাত লাগিলে অনেক শূরবীরও কাবু হইয়া পড়েন। শুনা যায়, কালু পালোয়ান সুচেৎ সিংকে ঐখানে আঘাত করিয়াই ভূমিশায়ী করেন। আরও দেখা গিয়াছে, মারিতে পারিলে, আমাদের এই হাতের হাড়ের আঘাতই এমন গুরুতর হয় যে অন্যের হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। জিউজিৎসু ব্যায়ামে ঐ দুটা এবং আরও নানা 'কসরৎ' শিখান হয়। প্রবাসী পত্রে এ বিষয়ে বিস্তৃততর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। জাপানীরা ডম্বেল, মুদ্গর প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ের পরিবর্ত্তে, দুই জন লোকে ক্রমাগত চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা আপনাদের বলের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াস পান। যাহাতে অল্প পরিশ্রমে হাঁফাইয়া না পড়িতে হয় তৎপ্রতিও বিশেষরূপ দৃষ্টি থাকে। অন্য দেশের প্রচলিত প্রথা সমূহ হইতে জাপানী ব্যায়াম শ্রেষ্ঠ কি না, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ব্যায়ামপ্রিয় ইংরাজ ও আমেরিকগণ বলেন দেহের অনুপাতে জাপানিগণ উঁহাদের অপেক্ষাও বলশালী। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে ধনুকই কৌশল ও বল পরীক্ষার আদর্শ ছিল। হরধনুর্ভঙ্গ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রভৃতি প্রমাণ। বাঙ্গালী কিন্তু কিছু পূর্ব্বে অবধি লাঠিরই অধিক ভক্ত ছিল। লাঠির সাহায্যে অশ্বের ন্যায় দ্রুত পথ অতিক্রম, লাঠিতে ভর দিয়া লাফাইয়া ছাদে উঠা বা ছাদ হইতে অবতরণ, লাঠির আঘাতে বাঘকেও তাড়াইয়া দিতে পারা অথবা হাতীরও মাথার খুলি ভাঙ্গা (রাজলক্ষ্মী উপন্যাস পাঠ করুন), এমন কৌশলে লাঠি ঘুরান যে ইট ছুড়িলেও গায়ে না লাগা ইত্যাদি, ইত্যাদি বহুতর লগুড়-কীর্ত্তির কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। জাপানী ব্যায়ামে কিন্তু নিজের শরীর ব্যতীত অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। মুষ্টিযুদ্ধ কৌশল অবগত হইলে কতকটা অনুরূপ ফল লাভ হয়। দেহাতিরিক্ত অস্ত্রের শরণ যদি লইতেই হয়, আগ্নেয়াস্ত্রের সহিত কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে কিন্তু আক্রান্তের প্রাণনাশ সম্ভাবনা অত্যধিক থাকে। সভ্যসমাজে এজন্য ইহার আদর হওয়া উচিত নহে। এমন কোন তাড়িতীয় যষ্টি বা অস্ত্র যদি আবিষ্কৃত করা যায়, যে স্পর্শমাত্র আক্রান্ত অভিভূত হইবে কিন্তু প্রাণে মরিবে না বা কোনরূপ অঙ্গহানি হইবে না, আর প্রয়োজন হইলে আগ্নেয়াস্ত্রের ন্যায় দূর হইতেও প্রহার করা যায়, তাহা হইলেই সভ্যজনোচিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। আমাদের জগদীশ বাবু এ সম্বন্ধে কোন আশা দিতে পারেন না কি ?

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

# প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (১৬)

কত কত অদ্ভুতকীর্ত্তি সূচক জয়-স্তম্ভ যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে নির্ণয় করিতে শক্ত হইবে?

প্রাচীন ভারতে প্রযত্ন বিনির্মিত অট্টালিকা, দেব মন্দির ও কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল মুসলমানদিগের রাজত্বকালে বিধ্বস্ত, বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ নির্ম্মিত অগ্রভেদী স্তম্ভ,কুতুব-মিনার নামে বিকৃত এবং ভগবান্ ভবানীপতি বিশ্বেশ্বরের মন্দির মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দিল্লীশ্বর ফিরোজসাহ বিন্ধ্য মাধবের মঠ ও দিল্লী নগরের মান-মন্দির নিজ নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য কার্য্যের এতই সৌন্দর্য্য ছিল যে, জগদ্বিখ্যাত, দেবালয় দেব-মন্দির দেবদেবী মূর্ত্তি বিনাশকারী গজনী পতি সুলতান মামুদ, যখন মথুরাপুরী আক্রমণ করেন, তখন তিনি তত্রত্য প্রাসাদ, দেবমন্দির ও হর্ম্ম্যাবলীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ সকল ধ্বংস করিতে সৈন্যগণকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এইক্ষণ সেকেন্দ্রা, মতিমজিদ্ ও জুম্মা মজিদ্ এবং পৃথিবীতে আশ্চর্য্যজনক সপ্ত পদার্থের একতম তাজমহল পুরাতন ভারতের স্থাপত্য-নিষ্ঠ শিল্প-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গুজরাটের অন্তর্গত আবু নামক পর্ব্বতের শিখর দেশে একটী জৈন মন্দির বিদ্যমান আছে। ঐ মন্দিরটী খ্রীষ্টীয় ১০৩২ সনে বিমলাসাহ নামক কোন জৈন ধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই মন্দির সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ফারগুসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, "এরূপ বহ্বায়াস-সম্পাদিত এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি কার্য্য বোধ হয় আর কোথায় নাই।" তিনি এই অট্টালিকার চাঁদনি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, "স্যর ক্রীষ্টফর রেনের লণ্ডন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দির সকল এই জৈন চাঁদনির সহিত সাদৃশ্য লাভ করিলে আরও উৎকৃষ্ট হইত।"

কথিত আছে, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অষ্টাদশ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল এবং চতুর্দ্দশবর্ষ কাল লাগিয়াছিল।

লিপি আছে যে, ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যানুসারে প্রথমে মিশরদেশে ও বহুকাল পরে গ্রীসদেশে অনেক দেব-দেবী মন্দির এবং অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন—প্রাচীন ভারতেও গ্রীসদেশীয় নূতন ধরণের স্থাপত্য কারুকার্য্য সকল অনুকৃত ও অনুসৃত হইত।

মান্দ্রাজ বিভাগ নিবাসী স্থাপত্য বিদ্বিৎ মহাত্মা রামরাজ বলিয়াছিলেন যে,"মানসার," কশ্যপ-প্রণীত "কাশ্যপ" এবং "মনুষ্যালয় চন্দ্রিকা" এই কয়েক খানি গ্রন্থে বিমান ও প্রাসাদাদির নির্ম্মাণ কৌশল—সকল লিখিত আছে।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, অর্থশাস্ত্রে সাংগ্রামিক স্থাপত্যের অর্থাৎ দুর্গ ও ব্যূহ প্রভৃতির রচনা চাতুর্য্যের নিয়মাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অমরকোষ অভিধানে আছে যে, "হর্ম্ম্যঞ্চ ধনিনাং বসং প্রাসাদো দেব-ভূভুজাম্"—ধনিজনের বাস গৃহকে হর্ম্ম্য বলে

এবং দেবালয় ও রাজালয়কে প্রাসাদ কহে। অট্টালিকা শব্দটী সকলেতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। অত্যুচ্চ সপ্ততল প্রভৃতি অট্টালিকাকে বিমান কহে।

অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে স্থপতি (Architect), সূত্রগ্রাহী (Measurer), বর্দ্ধকী (Joiner) এবং তক্ষক (Carpenter) প্রধান।

২য়, ভাস্কর্য্য—দক্ষিণ সাগরোপকূলবর্ত্তী হস্তি-দ্বীপস্থ ও সল্‌সেটি দ্বীপস্থিত গুহা সকল ভাস্কর কার্য্য সম্বন্ধে দর্শনীয় হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণা পথস্থিত ইলোরা নামক পর্ব্বত-গুহাটী ভাস্কর কার্য্যের অতীব সুন্দর নিদর্শন। পূর্ব্বোক্ত গুহা সমূহে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের খোদিত দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল, দর্শক-বৃন্দের চিত্তকে বিমোহিত করিতেছে।

একটী অর্দ্ধ চন্দ্রকার রক্তবর্ণ গ্র্যানিট্ প্রস্তরময় পর্ব্বতাভ্যন্তর অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া খোদিত হইয়া ইলোরার গুহাটী প্রস্তুত হইয়াছে! ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস প্রায় আড়াই ক্রোশ হইবে! বোধ হয়, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ সুবিস্তীর্ণ ভাস্কর কার্য্য আর কোথাও নাই। এই সুপ্রসিদ্ধ গুহার মধ্যে "কৈলাস" নামে স্থানটী ৩৬৭ হাত দীর্ঘ এক সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে খোদিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে! এই গুহাভ্যন্তরে ইন্দ্রসভা, ব্রহ্মসভা এবং দেবসভা প্রভৃতি খোদিত হইয়া নির্ম্মিত আছে!

মধ্য ভারতবর্ষেও অনেকগুলি গুহা আছে, তন্মধ্যে ঔরাঙ্গবাদের নিকটস্থিত অজণ্ডা নগরীর গুহাই ভাস্কর কার্য্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। উৎকলদেশে কণরবা পর্ব্বতের গুহা ও ভাস্কর কার্য্য জন্য সুবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল দেব ও দেবী মন্দিরের উল্লেখ করা গিয়াছে, ঐ সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব ও দেবীর মূর্ত্তি সকল ও বিচিত্র ভাস্কর্য্য-জনিত সৌন্দর্য্য সমন্বিত।

ভারতীয় দেব দেবীর ভগ্ন ও অভগ্ন মন্দির সমূহের ও প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও দুর্গ নিচয়ের গাত্রে কত প্রকার মনোহর মূর্ত্তি সকল যে খোদিত আছে ও ছিল তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

মান্দ্রাজ-বিভাগ-নিবাসী স্থাপত্যাদি বিদ্যাবিৎ মহাত্মা রামরাজ বলিয়াছিলেন যে, "অগস্ত্যমুনি প্রণীত "সকলাধিকার" নামক গ্রন্থে পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় উপদেশ সকল লিখিত আছে।"

এই গ্রন্থ মহাভারত বর্ণিত পাণ্ড্য ও চোল বংশীয় রাজাদিগের রাজ্য শাসনকালে রচিত হইয়াছিল।

৩য়, চিত্র—চিত্র ও কবিত্ব প্রায় একই বস্তু। প্রকৃতিকে রঙ্গাদি দ্বারা প্রকাশিত করিলে চিত্র এবং প্রকৃতিকে বাক্য দ্বারা প্রকাশিত করিলে কবিত্ব বা কাব্য হইয়া থাকে। যেমন প্রকৃতির স্বরূপাঙ্কনের তারতম্যানুসারে চিত্রকরের গুণগত তারতম্য হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃতির স্বরূপাখ্যানের তারতম্যানুসারে কবিরও গুণগত তারতম্য হয়। ফলত, যিনি যে পরিমাণে স্বভাবের স্বরূপাঙ্কনে বা স্বরূপ কথনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

যেমন রত্যাদি স্থায়ীভাব বিভবাদি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া শৃঙ্গারাদি রস রূপে পরিণত হইলে কাব্য হয়, তেমনি আবার প্রাকৃত শোভানুভাবকতারূপ মানসিক ভাব প্রথম বা কৃতিত্বানুগুণে রঙ্গাদি দ্বারা আকারিত হই-

লেই চিত্র হইয়া থাকে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য কহে। (১) যে ব্যক্তির হৃদয় কাব্যরস বিহীন, সে ব্যক্তি পশু তুল্য। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন— "সঙ্গীতসাহিত্যেরসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃ শৃঙ্গ বিষাণ হীনঃ। চরত্যসৌ কিন্তু তৃণং ন ভুঙ্‌ক্তে পরং পশূনামুপকার হেতোঃ।" সঙ্গীত ও সাহিত্য রসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, শৃঙ্গ, পুচ্ছ হীন পশু বলিয়া খ্যাত। এ ব্যক্তিও চরণ করে, কিন্তু পশুদিগের উপকারার্থই তৃণ ভক্ষণ করে না।

চিত্রও কাব্য স্থানীয়, সুতরাং চিত্ররসাস্বাদ-বিহীন হৃদয়, পশু হৃদয়ের সদৃশ বলিয়া অতীব হেয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যেমন সঙ্গীত ও সাহিত্য বিদ্যায়, তেমনি চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিয়া সহৃয়তার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

নাটক, নাটিকা, উপাখ্যান, আখ্যায়িকাদি ব্যতীত, পুরাণ ও দর্শনাদি শাস্ত্রেও চিত্রাদির বর্ণনা রহিয়াছে। পুরাণে কথিত আছে যে, বাণতনয়া ঊষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনুরুদ্ধের চিলফলকগত মূর্ত্তি দেখিয়া কাম-মোহিতা ও তদাসক্তচিত্তা হইয়াছিলেন।

বেদান্তদর্শনান্তর্গত পঞ্চদশী নামক গ্রন্থে চিত্র বিষয়ে সুন্দর উল্লেখ রহিয়াছে। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন যে, যেমন চিত্রপটে যথাক্রমে ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত এবং রঞ্জিতএই চারিটী অবস্থা দৃষ্ট হয়, তেমনি পরমাত্মাতে (ঈশ্বরে) ও চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট্ এই চারিটী অবস্থা বিবেচিত হইয়া থাকে। যেমন স্বতঃ শুক্লীকৃত বর্ণের নাম ধৌতাবস্থা, অন্নমণ্ড লেপ সহ প্রস্তরাদি দ্বারা সমভাবে বিস্তার করণের নাম ঘট্টিতাবস্থা, রেখাপাত দ্বারা কোন আকার অঙ্কিত করার নাম লাঞ্ছিতাবস্থা এবং বর্ণ পূরণ দ্বারা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্নকরাকে রঞ্জিতাবস্থা বলা যায়, তেমনি স্বয়ং অনুপস্থিত পরব্রহ্ম চৈতন্য-চিৎ অবস্থা, মায়োপহিত ঈশ্বর চৈতন্য—অন্তর্যামী অবস্থা, সূক্ষ্ম সৃষ্টি হেতু হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা অবস্থা এবং স্থূল সৃষ্টিতে হেতু সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড—বিরাট্ অবস্থা রূপে বিবেচিত হয়েন। (২)

সংস্কৃত নাটক ও নাটিকাদিতে কবিগণ যে সকল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলিতে সহৃদয় জনানুমোদিত স্বাভাবিক ভাবেরই প্রাধান্য উপলক্ষিত হইয়া থাকে।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে মহারাজ দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক চিত্রফলকে শকুন্তলার যে একটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হওয়ার কথা আছে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, সুন্দর ও চমৎকারজনক।

আমরা উহা হইতে সহৃদয় পাঠকের বিবেচনার্থ কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম:—

শকুন্তলা—ষষ্ঠ অঙ্ক।

(১) বিদূষক—বলিহারি বয়স্য! মধুর অবস্থানভঙ্গি দ্বারা চিত্রটীর অন্তর্নিহিত ভাব দেখিবার উপযুক্ত হইয়াছে। উহার নিম্নোন্নত প্রদেশ সমূহে যেন আমার দৃষ্টি স্খলিত হইতেছে!

(১) "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্"—সাহিত্য দর্পণ।

(২) "যথাচিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থা চতুষ্টয়ম্।
যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্য্যামি সূত্রাণি বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে।
স্বতঃশুভ্রোঽত্রধৌতঃস্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃস্যাৎ রঞ্জিতোবর্ণ পূরণাৎ।
স্বতশ্চিদন্তর্যামীতু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্টৈ্যব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ।"
—পঞ্চদশী।

(১) বিদূষকঃ—সাধু বয়স্য! মধুরাবস্থান দর্শ-

এস্থলে বক্তব্য এই যে, ছায়া ও আলোকের তারতম্য বশতঃ চিত্রের নিম্নোন্নত অংশ গুলি পরিস্ফুট হইয়া চিত্তকর্ষক হইয়া থাকে, ইহা যে, মহাকবি কালিদাসের সময়ে এদেশে বিশেষরূপে জানা ছিল, এতদ্দ্বারা তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(২) সানুমতী—ওমা! রাজর্ষির কি নিপুণতা! বোধ হ'চ্চে সখী যেন ঠিক্ আমার সম্মুখে রয়েছে।

(৩) রাজা—চিত্রে যে যে স্থান সুন্দর দেখাইবে না, তাহা অন্যরূপ করা হইয়াছে। তথাপি তাঁহার সেই লাবণ্য রেখাদ্বারা কিঞ্চিৎ অঙ্কিত করা হইয়াছে।

(৪) বিদূষক—মহারাজ! ইঁহারা তিন জন দেখিতেছি, সকলেই দেখিবার উপযুক্ত, ইঁহাদের মধ্যে শকুন্তলা কোন্‌টী?

রাজা—তুমি কাকে মনে ক'চ্চ?

বিদূষক—আমি মনে কচ্চি, শিথিল কেশ বন্ধন হইতে পুষ্প সকল স্খলিত হইতেছে, বদনে স্বেদবিন্দু সকল দেখা দিয়াছে, বাহু যুগল বিশেষ অবসন্ন ভাবে নিপতিত রহিয়াছে, এইরূপে যিনি জল-সেক-স্নিগ্ধ নব পল্লব বিশিষ্ট আম্রবৃক্ষের পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, ইঁনিই শকুন্তলা এবং এ দুইজনে ইঁহার সখী।

(৫) রাজা—শোন, স্রোতস্বিনী মালিনী নদী ও তাহার সৈকতপ্রদেশে লীন হংস-মিথুন, হিমালয়ের পবিত্র পাদপর্ব্বত সকল, সেই গুলির চতুর্দ্দিকে হরিণগণ নিষণ্ণ আছে, এরূপ লিখিতে হইবে। আর যাহার শাখা হইতে বল্কল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এরূপ তরুর নিম্ন-প্রদেশে কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে মৃগী আপন বাম নয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে, এরূপ ভাবে অঙ্কন করিতে ইচ্ছা করি।

চিত্র বিজ্ঞানের ন্যায় আর্য্যগণের শিল্প-চাতুর্য্য বিজ্ঞাপক সূক্ষ্ম শিল্প গুলিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতে মুসলমান অধিকারের সময়ে চিত্রবিদ্যার বিলোপ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। কারণ, চিত্র রচনা করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে সমকক্ষতা করা হয়, এই বোধে, মুসলমানেরা চিত্রকার্য্যকে বিষম স্পর্দ্ধাসূচক মনে করেন, সুতরাং উহা পাপ-জনক বলিয়া বিশ্বাস করেন। এইক্ষণে জয়পুরে চিত্র বিদ্যার কিঞ্চিৎ চর্চ্চা আছে। দাক্ষিণাত্যের রাজা রবিবর্ম্মা আর্য্যচিত্র বিদ্যার পুনরুদ্ধার করণে যত্নবান্ হইয়াছেন। তদঙ্কিত চিত্র সকল বড় লোকের গৃহে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

নীয়ো ভাবানুপ্রবেশঃ স্খলিতইব মে দৃষ্টি র্নিম্নোন্নত প্রদেশেষু।

(২) সানুমতী—অহো এষা রাজর্ষে নিপুণতা। জানে সখী অগ্রতোমে বর্ত্তত ইতি।

(৩) রাজা—যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রেস্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।

তথাপিতস্যালাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্।

(৪) বিদূষকঃ—ভোঃ! ইদানীং তিস্রস্তত্রভবত্যো দৃশ্যন্তে। সর্ব্বাশ্চ দর্শনীয়াঃ। কতমা অত্র তত্রভবতী শকুন্তলা।

রাজা—ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি?

বিদূষকঃ—তর্কয়ামি যা এষা শিথিলকেশবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশান্তেন উদ্ভিন্নস্বেদবিন্দুনা বদনেন বিশেষতোঽপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাং অবসেকস্নিগ্ধ-তরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎপরিশ্রান্তাইব আলিখিতা এষা শকুন্তলা। ইতরে সখ্যাবিতি।

(৫) কার্য্যা সৈকত লীন হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ। শাখালম্বিত বল্কলস্যচ তরো র্নির্ম্মাতু মিচ্ছাম্যধঃ শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্।

প্রাচীনকালে সুশিক্ষিত ভদ্র লোকেরাও শিল্পকার্য্য করিতেন। এমন কি, রাজপুত্রগণকে শিল্প শিক্ষা করিতে হইত।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিল্প বিষয়ক অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প গ্রন্থগুলিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ কেবল বিশ্বকর্ম্মা প্রণীত 'শিল্প সংহিতা' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই গ্রন্থে ঘটিকা যন্ত্র, বাস্পীয় যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণের কৌশল সকল লিখিত আছে। এই সংহিতার বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

অন্যান্য দেশে স্ত্রীলোকগণ বিধবা হইলে তাহারা পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে পারেন। এদেশে বিধবা হইলেই স্ত্রীলোকেরা পিতৃকুল ও শ্বশুর কুলের গলগ্রহ হইয়া উঠেন। অপরাপর দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ইঁহারা যদি শিল্পকার্য্য, অধ্যাপনা ও ধাত্রীর কার্য্য করেন, তবে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনাদিগকে ও নিজ নিজ ও পুত্র কন্যাদিগকে অনায়াসে ও যদৃচ্ছাক্রমে ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। বঙ্গদেশে নবশাখ শ্রেণীয় স্ত্রীলোকেরা সামান্য শিল্পকার্য্য দ্বারা যৎসামান্য ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় ভদ্র মহিলারা বিধবা হইলে আর তাঁহাদিগের দুঃখের সীমা থাকে না। তখন তাঁহারা আত্মীয় কুটুম্বগণের গলগ্রহ হইয়া যাবজ্জীবন অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন এবং আত্মীয় কুটুম্বগণেরও নানাবিধ কষ্টের কারণ হইয়া উঠেন।

হায়, কবে হিন্দু মহিলাগণ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মাবলম্বন করিতে শিক্ষা করিবেন; কবে তাঁহারা আপন আপন দুর্দ্দশা দূরীকরণ মানসে বদ্ধ পরিকর হইবেন; কবে তাঁহারা নিজ নিজ সন্তানগণকে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা প্রদান করিবেন; কবে আবার ভারতে প্রাতঃস্মরণীয়া আত্রেয়ী, গার্গী, বাৎসী, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী, রোমশা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, সীতা, সাবিত্রী, সত্যবতী, দ্রৌপদী, খনা, লীলাবতী, চন্দ্রমুখী, তারিণী, কর্ণাট-রাজমহিষী এবং রত্নাবতী প্রাদুর্ভূত হইবেন; কবে ভারত-ললনাগণ বিলাসিতা ও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রতাবলম্বন করিবেন; কবে তাঁহারা আপন আপন সন্তানগণকে কঠোর জীবন সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সুশিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান করিবেন।

মাতা প্রস্তুত না হইলে সন্তান প্রস্তুত হয় না। মাতৃদোষে, রাবণ রাক্ষস—মাতৃগুণে, সেকেন্দরসাহ পৃথ্বীবিজয়ী।

ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

# সংশয়বাদ। (২)

কাক প্রায়ই কাল বর্ণের। যেখানে যেখানে কাক দেখিয়াছি কালবর্ণ বিশিষ্টই দেখিয়াছি। কাকের কথা শুনিলেই আমরা মনে করি কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট এক প্রকার পাখী। কেন করি? এ ভাবানুবন্ধিতা নিবন্ধন। কিন্তু কাক মাত্রই যে কৃষ্ণবর্ণের হইবে এমন নিয়ম কি আছে? তুমি আমি কখন ইহার বিরোধীস্থল দেখি নাই বলিয়াই কি মনে

করিতে হইবে কাক কখনও কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন "পারে না" তবে তাঁহাকে বলিতে হইবে "কেন পারে না।" মানব জ্ঞান অপূর্ণ, সসীম—পরিবর্ত্তনশীল। মানব যত জ্ঞানীই হউক না কেন, অসীম অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে কি? তাহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে বহুদূর যাইতে হইবে না। দেশের ষড়দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পড়িয়া দেখ, দেখিবে পরস্পর মতের কত অনৈক্য—কত বিরোধ। ইহার কারণ কি? উত্তরে একমাত্র এই বলা যায় যে, কেবল জ্ঞানের আধিক্য বা পরিপক্কতার তারতম্যই এই মত-বৈপরিত্যের বা মত-বিরোধিতার হেতু। যাহার যেমন জ্ঞান, যেমন বুদ্ধি, তাহার সিদ্ধান্তও তদনুরূপ। সংসারে মত-বিরোধিতা যেখানেই দেখা যায়—প্রনিধান করিলে এই জ্ঞান, বুদ্ধির তারতম্য তাহার মূলদেশে অবশ্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ব্যপ্তিকে উপাধি-বিরহিত—অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, তদ্দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব-সিদ্ধি সুকর বলিয়া বোধ হয় না। পরস্পর বিরোধি যুক্তির অবতারণা বশতঃ কোন বিষয়ই শঙ্কা-বিরহিত হইয়া মীমাংসিত হইয়া উঠে না। তাহা ক্রমশ দেখা যাইতেছে।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া যাঁহারা ঈশ্বরাস্তিত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা জগৎটাকে কার্য্য মনে করিয়া, তাহার নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। সে বিষয়ে আপাততঃ একটু আলোচনা করা যাউক। কার্য্য কাহাকে বলে? এ কথার উত্তরে কেহ বলেন, অবয়ব সংযোগিত্বকে কার্য্য বলে, অর্থাৎ যাহা অবয়ব সংযুক্ত তাহাই কার্য্য। এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইলে—আকাশ, কাল ও তাঁহাদের স্বীকৃত ঈশ্বরও কার্য্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন। কারণ ইহারা সকলেই অবয়বসংযোগী। কেহ বলেন, অবয়ব সমবায়িত্বই কার্য্যত্ব অর্থাৎ যাহা অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহাকে কার্য্য বলে। এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইলে জাতি (Genus) ও তাঁহাদের স্বীকৃত ঈশ্বরও কার্য্য-শব্দের বাচ্য হইয়া পড়েন। কারণ তাঁহাদের মতে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। কেহ বলেন, সমবেত দ্রব্যকেই কার্য্য বলে। তাঁহাদের মতও বিশুদ্ধ নহে, কারণ সে হিসাবে, ইচ্ছা, যত্ন, জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্মগুলি অকার্য্য বা নিত্য হইয়া পড়ে। এ আশঙ্কা পরিহার ইচ্ছায়, কেহ কেহ অভাবের প্রতিযোগিত্বকেই কার্য্যত্ব বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহা "ছিলনা পরে হইল"—এই বুদ্ধির বিষয় তাহাই কার্য্য, এই প্রকার বলেন। এই অভাব কার্য্যত্ববাদ সম্বন্ধে পরে বিশেষমত আলোচনা করা যাইবে।

কেহ কেহ বলেন, পরিচ্ছিন্ন পরিমান বত্বকেই কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যাহা দেশকালাবচ্ছিন্ন তাহাই কার্য্য। এই লক্ষণ নির্দ্দেশে পরমাণুর জীবনের আশঙ্কা আছে, সুতরাং পরমাণুবাদ পক্ষপাতী, কেহ কেহ একটু ঘুরাইয়া লক্ষণটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, পরম অণু ও পরম মহৎ পরিমাণ ভিন্ন পরিমাণবিশিষ্টত্বই কার্য্যত্ব। অর্থাৎ পরমাণুর ও আকাশের পরিমাণ ব্যতীত যাবতীয় পরিমাণ বিশিষ্ট পদার্থই কার্য্য। এ লক্ষণে পরমাণুর জীবন রক্ষা পায় বটে, কিন্তু লক্ষণটী নির্দ্দোষ নহে। বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া মানসিক জগতে এ লক্ষণের প্রবেশ নিষেধ, এমন কি, বাহ্যজগতেও সর্ব্বত্র এ লক্ষণ খাটে না। রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি জড়ীয় ধর্ম্মগুলি এ হিসাবে

অকার্য্য হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

**তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাদ্ ঘটবাদিতি তদস্ত সমীচীনং কার্য্যত্বস্যৈবাসিদ্ধের। ন চ সাবয়বত্বেন তৎসাধ্যমিত্যভিধাতব্যং যস্মাদিদং বিকল্পজালমবতরতি। সাবয়বত্বং কিমবয়বসংযোগিত্বং, অবয়বসমবায়িত্বং, অবয়বজন্যত্বং, সমবেতদ্রব্যত্বং, সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্বং বা। ন প্রথমঃ আকাশাদাবনৈকান্ত্যাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ সামাণ্যাদৌ ব্যভিচারাৎ। ন তৃতীয়ঃ সাধ্যাবিশিষ্টত্বাৎ। ন চতুর্থঃ বিকল্পযুগলার্গলগ্রহগলত্বাৎ সমবায় সম্বন্ধমাত্রবন্ধ্ব্যত্বং সমবেত দ্রব্যত্বং অন্যত্র সমবেত দ্রব্যত্বং বা বিবক্ষিতং হেতুক্রিয়তে। আদ্যে গগনাদৌ ব্যভিচার, তস্যাপি গুণাদিসমবায় বত্ত দ্রব্যত্বয়োঃ সম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে সাধ্যাবিশিষ্টতয়া অন্যশব্দার্থেষু সমবায় কারণ ভূতেষবয়বেষু সমবায়স্য সাধনীয়ত্বাৎ। অভ্যুপগম্যোতদভানি বত্ত্বতত্ত্বসমবায় এব ন সমস্তি প্রমানাভাবাৎ।**

**নাপি পঞ্চমঃ আত্মাদিনানৈকান্ত্যাৎ তস্য পাবয়বত্ব বুদ্ধি বিষয়ত্বেপি কার্য্যত্বাভাবাৎ। ন চ নিরবয়বত্বেহপ্যস্য সাবয়বার্থসম্বন্ধেন, সাবয়বত্ববুদ্ধি বিষয়ত্বমৌপচারিকমিত্যেষ্টব্য নিরবয়বত্বে ব্যাপিত্ববিরোধাৎ পরমাণুবৎ ইতি। —সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে আর্হত দর্শন।**

বাস্তবিক কার্য্য ব্যাপারটা একটা মহা সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ, কার্য্য মাত্রেই যে সকর্ত্তৃক তাহা কে বলিল? হয় ত এমনও হইতে পারে যে কতকগুলি কার্য্য সকর্ত্তৃক ও আর কতকগুলি কার্য্য স্বশক্তি সমুৎপন্ন। যেখানে চেতনের সাহায্য ব্যতীত কোন পদার্থের আবির্ভাব লক্ষিত হয়, সেখানে সে পদার্থের সকর্ত্তৃকতা নাও থাকিতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মেও তাহার আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। চেতনজীব কতকগুলি কার্য্য উৎপাদন করে বলিয়া, কার্য্যজাতিকে সকর্ত্তৃক বলা সাহসিকের কর্ম্ম। এক জাতীয় কার্য্য সকর্ত্তৃক, কার্য্য মাত্রেই সকর্ত্তৃক কে বলিল। দুই শ্রেণীর কার্য্য থাকা কি অসম্ভব? অতএব 'যৎকার্য্যং তৎ সকর্ত্তৃকং'—এ বাক্যের পোষকতা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

এই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই John Stuart Mill এক স্থানে বলিয়াছেন—

"The phenomena or changes in the universe have indeed each of them a beginning and a cause, but their cause is always a prior change; ...and we are no nearer to the first cause than before."

অন্য স্থানে তিনি বলিতেছেন, এই কার্য্য-কারণ-রূপ ব্যাপারের একটা মূলশক্তি স্বীকার করিলেও তাহাকে অনন্ত অসীম বলা যায় না।

"It needs no showing that the power, if not the intelligence, must be so far superior to that of man as to surpass all human estimate. But from this to Omnipotence & Omniscience, there is a wide interval."

একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, জগৎ-কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধি করিতে গেলে ঈশ্বরকে মানুষের ন্যায় গড়িয়া তোলা হয়। তিনি বলেন—

"The humanisation of God or the idea that the "Supreme Being" feels, thinks, and acts like man (though in a higher degree) has played a most important part in the anthropomorphic monotheism, in the history of civitisation."

বস্তুতঃ, এবম্প্রকার যুক্তিবলে ঈশ্বরাস্তিত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। কারণ, তুল্য যুক্তিবলে (by parity of reasoning), ঈশ্বরের দেহাদিসত্ব অতি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কোথায় দেখিয়াছ ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হইয়াছে? এমন কি চিন্তা-কার্য্যেও মস্তিষ্কের পরিচালনা আবশ্যক। যদি বল, অনন্ত-শক্তি-সম্পন্নে সকলই সম্ভব, তাহাও ঠিক নহে; কারণ, তাহা হইলে উপাদান সংগ্রহাদির প্রয়োজনটা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রাসাদাদি কার্য্যে যেমন ইষ্টক প্রস্তরাদি

উপাদানের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, জগৎ কার্য্যেও তেমনি ক্ষিত্যপ্তেজ প্রভৃতি উপাদানের আবশ্যকতা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের পক্ষে যেমন প্রাসাদাদি, ঈশ্বরের পক্ষে তেমনি জগৎটা। বিশেষতঃ সান্ত কার্য্য দ্বারা অনন্ত কারণের অনুমিতি অযৌক্তিক। সুতরাং, কার্য্যকারণ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরানুমান সুকর হইতে পারে না।

২। জগদুৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে দুটী পরমাণু মিলিয়া একটী দ্বাণুক জন্মায়। দ্বাণুক একটী ত্রাসরেণু জন্মায় এই প্রকারে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। অণু জড়। জড়ের চেষ্টা, চেতন-প্রযত্ন সাপেক্ষ। অণুদ্বয়ের এই মিলন ব্যাপারটা একটী চৈতন্যের যত্ন ব্যতীত হয় নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে চৈতন্য বিদ্যমান থাকিয়া অণুদ্বয় সংযুক্ত করিয়াছে, সেই চৈতন্যই ঈশ্বর, এ যুক্তিও অশ্রদ্ধেয়। ইহার উত্তরে বলা যায়, চেষ্টা ইন্দ্রিয়-নিষ্পন্ন সুতরাং জগৎ-কর্ত্তা ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট। ইহার অপর উত্তর--আণবিক সংযোগে অসিদ্ধ। যাহার অংশ নাই, তাহার সংযোগ হইতে পারে না। সংযোগ (contact) গুণটাই ঐকদেশিক। সর্ব্বাত্মক সংযোগ কথায় কথা মাত্র। যে সংযোগে দ্বিত্ব বোধ থাকে না, সে সংযোগে পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ এমন সংযোগই সিদ্ধ নহে। আমরা মনে ধারণাও করিতে পারি না, সর্ব্বাত্মক সংযোগ জিনিসটা কি। অতএব সংযোগ স্বীকার করিলে, ঐকদেশিক সংযোগ স্বীকার করিতে হইবে। অণুর অংশ নাই, তাহার সংযোগেও ঘটিতে পারে না। যে বস্তুর ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোভাগ নাই তাহার সংযোগ বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক। অণুর দেশ ভাগ অণুত্ব বিঘাতক। সুতরাং অণুদ্বয়ের সংযোগও অসিদ্ধ। যদি বল—"সংযোগ ঐকদেশিকও নহে, সর্ব্বাত্মকও নহে, কিন্তু নিত্য—তাহাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। কারণ, নিত্য সংযোগও ঐ দুইটীর মধ্যে একটীর অন্তর্গত, তদ্ব্যতীত আর কোন সংযোগ স্বীকার্য্য নহে।

বিশেষতঃ অণুদ্বয় সংযোগ নিত্য হইতে পারে না। কারণ—যাহা নিত্য, তাহার কারণ ব্যাপারের আবশ্যকতা নাই। অণুদ্বয়ের সংযোগ নিত্য বলিলে দ্বাণুককে প্রকারান্তরে নিত্য বলিতে হয়, সুতরাং অণুই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ অণুপরমাণুর সংযোগ (actual contact) বিজ্ঞান-বিরুদ্ধও বটে। জড়ের অন্তর্নিহিত আকর্ষণ বলে জড়ীয় পরমাণুগুলি পরস্পর আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু আবার অন্তর্নিহিত বিক্ষেপ শক্তি বশতঃ দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। প্রায় সংযুক্ত হইলেও আত্যান্তিক সংযোগ উহাদের অসিদ্ধ। জড় সংকোচন-ধর্ম্মী, চাপ দিলে সঙ্কুচিত হয়, ইহা দ্বারাও অণুমধ্যগত আকাশ সূচিত হয়। পরস্পর ফাঁক না থাকিলে, চাপে কখনও পদার্থ সঙ্কুচিত হয় না—যাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এ তত্ত্ব নূতন নহে।

৩। জগৎ ভারি বস্তু। ভারি বস্তুকে কেহ ধরিয়া না রাখিলে শূন্যে অবস্থান করিতে পারে না। জগৎ যখন শূন্যে অবস্থান করিতেছে, তখন অবশ্যই উহাকে কেহ ধরিয়া রাখিয়াছে। যে ধরিয়াছে, সে-ই ঈশ্বর—এ কথাও নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকে এবম্বিধ যুক্তির অবতারণা করিতে বোধ করি কুণ্ঠিত হইতেন।

জগৎ পড়েনা কেন? জিজ্ঞাসা করি, পড়িবে কোথায়? পতনের অর্থ কি? পৃথিবীর দিকে আগমনের নামই পতন। পৃথিবী জগতের একটা অংশ মাত্র। জগৎটা

শূন্যে স্থির না থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে।

৪। যাঁহারা সংখ্যাদ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। সংখ্যা দ্ব্যণুকের পরিমাণ। কিন্তু সংখ্যার জন্য পদার্থ। যাহা জন্য,তাহা বিনাশী। সুতরাং সংখ্যার বিনাশ আছে। কারণ-বিনাশ ব্যতীত সংখ্যার বিনাশ সংঘটিত হইতে পারে না। অর্থাৎ অপেক্ষা-বুদ্ধির নাশ ব্যতীত সংখ্যার নাশ হয় না। সুতরাং অপেক্ষা বুদ্ধিও বিনাশী। যদি বল, ঈশ্বরের অপেক্ষা বুদ্ধি নিত্য, অবিনাশী—তাহাও ঠিক নহে। কারণ,তাহা হইলে দ্ব্যণুকের পরিমাণকেও নিত্য ও অবিনাশী বলিতে হয়। তাহা বলিতে পার না। সুতরাং, দ্ব্যণুকের পরিমাণ ঈশ্বরাপেক্ষাবুদ্ধি জন্য নহে। আরও একটী বিষয় এখানে দ্রষ্টব্য। সংখ্যাকে বহির্ব্বিষয়বৃত্তি স্বীকার না করিলে সংখ্যা দ্ব্যণুকের পরিমাণ-কারণ হইতে পারে না। কারণ, পরিমাণ বহির্বিষয়বৃত্তি গুণ বিশেষ। কিন্তু, সংখ্যার উপাদান-কারণ অপেক্ষা-বুদ্ধি একটী ভাব (idea) বিশেষ। বুদ্ধি আত্মধর্ম্ম ( property of the mind ), কিন্তু সংখ্যা (number) প্রকৃতির ধর্ম্ম (property of matter)। এখানে ন্যায় ভ্রমবশতঃ বেদান্তের বিজ্ঞান মার্গে পদার্পণ করিয়াছেন। যদি আত্মধর্ম্ম হইতে একটা বহির্বিষয় সৃষ্টি উৎপন্ন হইতে পারে, তবে তাহা হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেরও উৎপত্তি হইতে বাধা কি ?

৫। রচনার পারিপাট্য দেখিয়া রচয়িতার কৌশল ও বুদ্ধি-মত্তায় অনুমান করা যায়—কেহ কেহ এপ্রকারও বলিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি বুঝিয়া উঠা দুরূহ। রচনায় একদিকে যেমন কৌশল ও পারিপাট্য লক্ষিত হয়, অপর দিকে তেমনি অকৌশল ও অবুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। দেখ বৃক্ষে যত ফল ধরে—সমস্ত গুলির কার্য্যকারিতা—দেখিতে পাওয়া যায় না। কতকগুলি পূর্ণতা-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কতকগুলির সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন। সৃষ্টির পূর্ব্বে, কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা থাকিলে অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারিতেন। তবে নিরর্থক সৃষ্টি করিলেন কেন ? উষ্ট্রপক্ষীয় (ostrich এর) পক্ষ উড্ডয়ন ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে অক্ষম। চক্ষুর পাতার ন্যায় নাসাপথ রোধের সহজ-সিদ্ধ কোন আবরণ আমাদের নাই। দুর্গন্ধ এড়াইতে হইলে, হস্ত-বস্ত্রাদিদ্বারা নাসারোধ করিতে হয়। সকল সময়ে হয় ত তাহাও ঘটিয়া উঠে না, দুর্গন্ধে অস্বাস্থ্যের সৃজন করে। মধুমক্ষিকার হুল, একবার একজনকে বিদ্ধ করিলে, সেই দংষ্ট্রস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। মক্ষিকা তখন অপর কোন আততায়ীকে শাস্তি দিতে পারে না—কি আশ্চর্য্য আত্মরক্ষার কৌশল! মৃগ-শৃঙ্গ কোন কোন সময় বহুশাখ হইয়া থাকে। উহাতে আত্মরক্ষা দূরের কথা—বরং আপনার বিপদ টানিয়া আনে। ব্যাঘ্র-ভয়ে ভীত মৃগ পলাইতে চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু কি করিবে শৃঙ্গ তাহার পথ রুদ্ধ করিতেছে। লতায় জড়াইয়া শৃঙ্গ যেন মৃগকে বাঁধিয়া ব্যাঘ্রের কবলে সমর্পণ করিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তার কি দূরদর্শিতা। পূর্ণ-সময়ে গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। হয় ত, কোন অঙ্গই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। কি কৌশলের পরিচয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত সকল দেখিয়া ঈশ্বরকে কুশলী বলা সঙ্গত নহে। আর কুশলী বলিলেই বা কি ? কৌশল শক্তিহীনতার পরিচয়। উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ে উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন ও তাহার যথোপযুক্ত অবলম্বনই

কৌশল। কিন্তু উপায় অবলম্বনই আবার শক্তি-সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। মিল সাহেব নিম্নলিখিত কথায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই। তিনি বলেন ——

"It is not too much to say that every indication of Design in the kosmos is so much evidence against the omnipotence of the Designer. For what is meant by Design ?—contrivance ; the adaptation of means to an end. But the necessity for contrivance—the need of employing means—is a consequence of the termination of power,..... But if the employment of contrivance is in itself a sign of limited power, how much more so is the *careful* & *skilful* choice of contrivance.

৬। বিভিন্ন উপাদানাবলীর একত্র এক অর্থে নিয়োগ চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত অসম্ভব। জগৎ বিভিন্ন উপাদানে রচিত। সুতরাং জগতের একজন রচয়িতা অবশ্যই আছেন—কাহারও কাহারও এই মত। এ মত নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ, কারণ ইহাতে জগৎ-স্রষ্টার সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু কুম্ভকারের ন্যায়, জগৎ-কর্ত্তার পরিচ্ছিন্নত্ব ও কার্য্য-বহির্ভূতত্ব ও সিদ্ধ হইয়া থাকে ; সুতরাং উহাতে ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধি অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে।

৭। জগতে নিয়ম ( harmony ) দৃষ্ট হয়। নিয়ম নিয়ন্তার অনুমাপক। সুতরাং জগৎকর্ত্তা একজন স্বীকার্য্য—কেহ কেহ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। এ যুক্তিও তুচ্ছ। কারণ ভূমি-কম্পনাদি জাগতিক নিয়ম-বহির্ভূত ও অসামঞ্জস্য-জ্ঞাপক। যদি নিয়ম অর্থে কার্য্য-কারন-সম্বন্ধ বুঝিতে হয়, তবে তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে।

৮। কেহ কেহ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন অদৃষ্ট ব্যতীত বৈচিত্র ও বৈষম্য (diversity and inequality) সম্ভবে না। কেহ জন্মমাত্রই সুখী,কেহ জন্মমাত্রই দুঃখী—ইহার কারণ অদৃষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ কথারও কোন প্রমাণ নাই। কারণ, অদৃষ্ট অর্থে 'অজ্ঞাত'। বিশেষ্য হইলে অদৃষ্ট অর্থে অজ্ঞান বুঝায়। লোকে যাহাকে কার্য্য-কারণ বলে, সেটাকে বিচার করিলে দেখা যায়, তাহার কতকটা অংশ দৃষ্ট ও কতকটা অংশ অদৃষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞাত। সুতরাং, অদৃষ্ট শব্দটার প্রয়োগে বিশেষ বাহাদুরী আছে, বলিয়া বোধ হয় না। অদৃষ্ট দ্বারা বিষয়ের যেমন মীমাংসা করা যায়, অজ্ঞান দ্বারাও তদ্রূপ। তবে অদৃষ্ট কথাটা কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য-সূচক।

কার্য্য-কারণের একটা প্রবাহ কল্পনা করা যায়। বাস্তবিক যেখানে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, সেখানেই প্রবাহের কল্পনা। আবার যেখানে প্রবাহের কল্পনা সেখানেই অনবস্থা-দোষ (regressus ad infinitum)। সুতরাং প্রবাহ-কল্পনা গৌরবের বিষয় নহে, বরং মীমাংসার প্রতিবন্ধক। কেহ কেহ অদৃষ্টকে আত্মার গুণ বিশেষ মনে করিয়া থাকেন। এ প্রকার মনে করিবার ও কোন হেতু দেখিতে পাইনা। কর্ম্ম দ্বারা লৌকিক সুখ দুঃখের উৎপত্তি অনুভব সিদ্ধ। আহার কর, তৃপ্তিলাভ হইবে। ইষ্টনাশে শোকের অনুভূতি হইবে। এ গুলির সাধারণ নাম অনুভূতি (feeling)। ইহা ছাড়া ইচ্ছা, যত্ন, দ্বেষ প্রভৃতি আত্ম-গুণগুলি সমস্তই আত্ম-জ্ঞান-গম্য। এ গুলি ভিন্ন অলৌকিক কোন গুণ আত্মায় উদ্ভূত হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

# ইংরাজ-রাজ ও আমরা

মিঃ হারবার্ট রবার্টস্ এবং স্যার হেন্‌রি কটন প্রভৃতির বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী-আন্দোলন-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচীব মর্লি সাহেব সময় সময় পার্লামেণ্টে যে সকল কথা কহিতেছেন, তাহা ইংরেজের চিরানুষ্ঠিত ভারত-শাসন-নীতিরই সমর্থন করিতেছে। জন মর্লি কখনও কখনও দুই চারিটী মিষ্ট কথায় আমাদিগকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেও, সে গুলি তাঁহার স্বকীয় অভিমত মাত্র। ফলতঃ, ইংরেজের এদেশ-সম্বন্ধিনী মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহাকে রাজ্যশাসন করিতে হইতেছে। সেই মূলনীতির আলোচনাই অত্র-প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

শিক্ষিত ইংরেজগণ সকলেই জানেন, যে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে আজ কাল ভিন্ন ভিন্ন নামে, সাম্য-ভাবের (Socialistic ideas) প্রবল প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। সকলেই এখন নিজ নিজ সত্ব বুঝিয়া লইতে বদ্ধপরিকর।

ইংরেজি মহাসভার বিগত নির্ব্বাচনে তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রমজীবী সম্প্রদায় (Labour Party) প্রকৃত পক্ষে সোসিয়ালিষ্ট-তন্ত্র হইতে বড় তফাত নহে। ইউরোপের যে সমস্ত দেশে রাজতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত, তথায়ও কার্য্যতঃ প্রজাতন্ত্র প্রথাই অবলম্বিত হইয়া থাকে। বস্তুত, ঐ সকল দেশের রাজা নামে মাত্র। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন না, বা করিতে সাহস করেন না। অধুনা পৃথিবীময় এই ভাব পরিব্যাপ্ত। অচিরে ভারতেও যে ইহার অভ্যুদয় হইবে, তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। কূটবুদ্ধি লর্ড কর্জ্জন দেখিলেন, ভারতে অবাধে এই ভাবের প্রচার হইতে দিলে, ইংরেজ-রাজ-কর্ম্মচারীর, তথা ভবিষ্যতে ইংরেজ জাতির, মহা অনিষ্টের আশঙ্কা। অতএব তিনি অঙ্কুরেই ইহাকে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদেশের লোকশিক্ষার বহুল প্রচার যাহাতে বন্ধ হয় এবং ভারতসন্তানের উচ্চশিক্ষার পথ যাহাতে রুদ্ধ হয়, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহারই ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহারই ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-আইন প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হইল। কর্জ্জন বিলক্ষণ জানিতেন লোকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিবে, ততক্ষণ অল্পে সন্তুষ্ট হইবে এবং স্বীয় অবস্থার শোচনীয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না,—তাহার প্রতীকার করা ত দূরের কথা।

লর্ড কর্জ্জন ছুটী লইয়া যখন বিলাতে ছিলেন, তখন, একটা বক্তৃতাচ্ছলে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, ভারতবাসী যাহাতে অনন্তকাল ইংরেজের শাসন-সুখ অনুভব করিতে পারে, প্রত্যেক ইংরাজরই তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য; এবং ইহাই ভারতশাসন প্রণালীর মূলসূত্র বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। ইংরেজ রাজ-মুকুটের মধ্যমণি ভারতের অনায়াস-লভ্য অর্থ ব্যতীত যে তাহার সুখ-সমৃদ্ধি স্থায়ী নহে, তাহা প্রত্যেক ব্রিটিশারই বিলক্ষণ অবগত আছে। বণিকবৃত্তি-পরায়ণ, বাণিজ্যৈক-সম্বল ইংরেজ, বাণিজ্য-লব্ধ-অর্থ ব্যতিরেকে কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অপরাপর দেশে, ইউরোপীয় এবং

আমেরিকান জাতি-সমূহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়লাভ করা, তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চীনে অবাধ-বাণিজ্য-নীতি প্রচলন হওয়ায়, ইংরেজ অর্থাগমের পথ অপেক্ষাকৃত সরল ও সুগম হইলেও, তথাকার বাণিজ্যে ইংরেজের লভ্যাংশ ভারতবর্ষের ন্যায় নহে। আর সে দিন নাই। এখন অহিফেন-সেবী চীন-সন্তানেরও চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। হান্‌কাউ রেলওয়ে যাহাতে চীনাদের হস্তগত না হয়, তজ্জন্য বেলজিয়ম-রাজ স্বয়ং বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তথায় এ অবাধ-বাণিজ্য-প্রথা আর কতদিন তিষ্ঠিবে, কে বলিতে পারে? নবীভূত চীনের উদীয়মান-শক্তি দৃঢ়ীকৃত হইলে চীনদেশে বৈদেশীক দিগের (Foreign Devils) এই অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার যে অধিককাল স্থায়ী হইবে না, পরিণামদর্শী ইংরেজের আর তাহা বুঝিতে বাকি নাই। এদিকে পারস্যে রুষীয় প্রভাব দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। ইংরেজ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও, তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। লর্ড কর্জ্জনের পারস্যোপসাগর ভ্রমণ প্রহসনের কাহিনী সকলেরই মনে আছে। টাইম্‌স্‌ পত্রে Anglo-Russian Ententeর কথা যতই আলোচিত হউক না কেন, তাহা কোনও কালেই কার্য্যে পরিণত হইবে না।

এ দিকে, উপনিবেশ গুলির মনের অবস্থাও ইংরেজের পক্ষে বড় আরাম-জনক নহে। তাহারা কোন দিন বলিয়া বসিবে,—"তোরে চাই নে।"—চিন্তাশীল ইংরেজ তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। চেম্বার্লেনের বাণিজ্য বিধির সংস্কার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে, উপনিবেশ গুলির সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ করা। বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া, বাণিজ্য-গত-প্রাণ বিলাতবাসীকে বিষম ভীত হইতে হইয়াছে। জলপথে এখনও ইংরেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ আছে সত্য এবং ইংরেজের নৌবিভাগের শ্রেষ্ঠতাও সর্ব্ববাদী-সম্মত; কিন্তু এই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আর কতদিন তাহার স্বীয় করায়ত্ব রাখিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। বাণিজ্য ব্যবসায় যে ইংরেজের সৌভাগ্য গৌরবের মূল এবং প্রবল পোতবল তৎপক্ষে প্রধান সহায়, তাহা এখন কাহারও অবিদিত নাই। সকল জাতিই আজ কাল, অল্পাধিক পরিমাণে, পোতবলের প্রতি মনোযোগী হইয়াছে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জার্ম্মেনিতে রীতিমত নৌ-সমর বিভাগ ছিল না। ঐ সালেই তথায় প্রথম সমর পোত বিভাগীয় আইন পাশ হয়। ১৯০৪ খ্রীঃ মধ্যে নবজাত নৌবিভাগের যাবতীয় পোতের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে,—পুনরায় ঐ সকল পোতের সংখ্যা দ্বিগুণিত করিয়া, দ্বিতীয় এক আইন প্রণীত হয়। বস্তুতঃ, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—সকল জাতিই এক্ষণে এই মন্ত্রের উপাসক। সুতরাং ইংরেজ সর্ব্বত্র আপনার বাণিজ্য-প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় ইংরেজ ভারতবর্ষে স্বীয় প্রভুশক্তির অসীমতা অব্যাহত রাখিতে যত্নশীল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি এবং প্রজাশক্তিকে ভারতে মস্তকোত্তলন করিতে দেখিলেই যে রাজপুরুষগণ, বিষম বিচলিত হইয়া, তাহার মস্তকে ভীষণ লগুড়াঘাত করিবে, তাহাতেও বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। স্বার্থের জন্য—উদরান্নের জন্য—ভারতে ইংরেজকে স্বীয় শক্তি অপ্রতিহত

রাখিতে হইবে। স্বায়ত্বশাসন বলিয়া অনুদিন চীৎকার করিলেও, ইংরেজ তাহা আমাদিগকে দিবে না—দিতে পারেও না। কেন না, আমাদিগকে স্বায়ত্ব-শাসন দিলে, এদেশে ইংরেজের ইচ্ছাময়ত্ব ঘুচিয়া যাইবে এবং অবিরাম শোষণ-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইবে। এই যে প্রতিবৎসর কোটী কোটী মুদ্রা ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতেছে, যাহার বিনিময়ে আমরা একটী কাণা কড়িও পাইতে পাইতেছি না, (Home-charges) তাহা আর অবাধে যাইতে পাইবে না। ইংরেজ এ ব্যবস্থায় কখনও সম্মত হইতে পারে না। তাহাকে সদাশয়ই বল, আর যাহাই বল, জন বুল মানুষমাত্র, এরূপ সদাশয়তা মানুষে সম্ভবে না। ইংরেজ নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা কখনও করিবে না। পরন্তু, জন বুলের ধর্ম্ম বুদ্ধিটাও বড় তীক্ষ্ণ নহে। তাহার কাছে—

"Conscience is a marketable thing, which he sells to the highest bidder."

ইতিহাসও ঠিক এই কথাই বলে। হেষ্টিংস এদেশে অকথ্য অত্যাচার করিল, দেওয়ানী মকর্দ্দমার একটা তুচ্ছ অছিলায় ব্রহ্মহত্যা করিল, তাহার দুষ্কার্য্যের অনুরূপ শাস্তি হইয়াছিল কি? * এখন আর হেষ্টিংসের নৃশংসতা ইংরেজের কাছে নিন্দনীয় নহে, কেন না সে Empire-Builder—সাম্রাজ্য-সংস্থাপক। কিন্তু,ঐ অপ্রশস্ত ডোভার প্রণালীর পরপারে, আসিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে ফরাসীজাতি দোষ পাইলে জগদ্বিখ্যাত M. de Lesseps বা প্রথিতযশা Eifel-কেও কারাগারে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত নহে। পক্ষান্তরে, মাধির কবর উৎখাত করিয়া লর্ড কিচেনার যে বাহবা পাইয়াছিলেন, কোন ফরাসী সেনাপতি ঐরূপ বর্ব্বরোচিত কার্য্য করিলে, তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।

পরার্থপরতা ইংরেজ বুঝে না। সে সর্ব্বদা স্বার্থগত-প্রাণ। জন্মভূমিতে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা অনুভব করিয়াই, তাহাকে স্বার্থপর হইতে হইয়াছে। সুতরাং, তাহার প্রতি কার্য্যে দুরন্ত স্বার্থনীতি-প্রতিভাত। ইংরেজ মুখে নিরন্তর আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে কিন্তু কখনও সেরূপ মনে করে না। নতুবা Arms Act এদেশে কখনই প্রবর্ত্তিত হইত না। Arms Act রাজকর্ম্মচারীদিগেরই ভীরুতার ফল, আমাদের নহে। ভারত-প্রবাসী ইংরেজ লেখক, বক্তা সকলেই আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া আসিতেছে। তাহাদের কাব্যে,—সাহিত্যে, ইতিহাসে আমরা ঘোর কাপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। এটাও এদেশ সম্বন্ধিনী-নীতি—policyর—বিষয়ীভূত। বহুদিন হইতে শুনিতে শুনিতে, এখন আমরাও আপনাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি। ইহাতে আমাদের ক্ষতি হইলেও, ইংরেজের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, আমাদিগের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। এই অবিশ্বাস যাহাতে স্থায়ী হয়, ইংরেজ নানাবিধ প্রকারে তাহার চেষ্টা করিতেছে এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছে। এদেশের শাসন ব্যাপারে যাহাতে আমাদের কিছু কিছু হাত থাকে, কংগ্রেস-পক্ষ তাহার চেষ্টা করিতেছেন এবং তজ্জন্য আবেদন,নিবেদনও যথেষ্ট হইতেছে। কিন্তু সে সকলই অরণ্যে রোদন; যাঁহারা এইরূপ নিবেদন আবেদনের পক্ষ-

* পাঠক জানেন Algernon Sydneyর এইরূপ Judicial murder হয়। তৎকালে Jeffreys এর বিরুদ্ধে একজ বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই।

পাতী, তাঁহাদিগকে একটা কথা এই বলিতে চাই, যে ইংরেজ শুদ্ধ বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, কখনও কোন কাজই করে নাই, এখনও করিবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঠিক ন্যায়ানুগত ভাবে চলিলে আজকাল-কার দিনে জন বুলকে আর প্রথম শ্রেণীর রাজশক্তি থাকিতে হয় না।

লোক-বহুল ইংলণ্ড উদরান্নের জন্য নিরন্তর পরমুখাপেক্ষী। যদি ছ'মাসের জন্য তাহার সামুদ্রিক প্রাধান্য হস্তান্তরিত হয়, তাহা হইলে বিনা যুদ্ধে ইংরেজকে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ইংরেজ-গণ একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই জন বুলকে সর্ব্বদা সশঙ্ক, সন্দিগ্ধ-চিত্ত এবং সতর্ক থাকিতে হইয়াছে। ন্যায় অন্যায়ের অত সূক্ষ্ম-বিচার করিলে তাহার চলে না। ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারী হউক, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হউক, বা সংবাদ পত্র লেখকই হউক, সকলেরই মনে সর্ব্বদা এই তত্ত্ব জাগরূক আছে। ডেলি নিউস, পায়োনিয়র প্রভৃতি সংবাদ পত্রে আমাদিগকে অসভ্য ভাষায় যে গালাগালি করা হয়, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে; তাহার একমাত্র অর্থ এই যে উহাদের আশঙ্কা পাছে বা আমরা উহাদের উদরান্ন সংগ্রহে বাধা জন্মাই। Secrets বিলের উদ্দেশ্য, এ দেশ শাসন-নীতির সকল কথা জন-সাধা-রণকে বুঝিতে না দেওয়া। সে লজ্জার কাহিনী প্রকাশ হইলে, রাজজাতির মুখ হেঁট হয়। ভারত-শাসনের পূতিগন্ধময় স্থানগুলির উপরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেই, আর কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। উত্তম ব্যবস্থা!

বঙ্গ-বিভাগের কোন গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি নাই—মর্লি সাহেবের এ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে কার্জ্জনী কাগজ পত্রে সে সকল ব্যক্ত হয় নাই, এবং ব্যক্ত হয় নাই বলি-য়াই, এরূপ উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছে। কিন্তু গুপ্ত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি-য়াই,—অবিচার করা হইয়াছে জানিয়াও,—তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। মর্লি বিলাতবাসীর পক্ষে 'ধার্ম্মিক জন' হইতে পারেন, কিন্তু এদেশ বাসীর পক্ষে তিনি—

"A Liberal in power is a Conservative in reality."

মর্লি মহোদয়ের উত্তরে, অনেকের আশা-ভঙ্গের কারণ হইয়াছে। আমরা কিন্তু উহাতে মনস্তাপের কোনই কারণ দেখি না। মর্লি যেরূপ উত্তর দিয়াছেন, ঐরূপ উত্তর দেওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। যেহেতু তিনি জানেন, সমগ্র বঙ্গবাসী একতাবদ্ধ হইলে, বিলাতগামী অর্থ-স্রোতের অবিরাম গতিতে বাধা পড়িবে। আর সুশাসনের নামে স্বেচ্ছা-চার করা চলিবে না।

ইংরেজের এদেশে রাজত্ব একটা ধর্ম্মানু-ষ্ঠান ব্যাপার নহে—জঠর-জ্বালা নিবারণই তাহার মুখ্য-কল্প। আমরাও ত এতদিন বড় একটা উচ্চ-বাচ্য করি নাই। এখন জঠর-অগ্নি আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই,—দিন দিন জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে বলিয়াই,—দুই একটী কথা বলিতে সাহস করিতেছি। এ দেশের ধন-রত্নে ইংরেজেরও যেরূপ প্রয়োজন, আমাদেরও সেইরূপ। ইংরেজ নিজ প্রয়ো-জন উপেক্ষা করিয়া আমাদের প্রয়োজন-সাধন করিতে কখনও পারে না। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে আমরা মুষ্টি-ভিক্ষার অধিক আশা করিতে পারি না। তাহাতে আমা-দের উদর পূরণ না হয়, ইংরেজ নাচার।

দাতার শক্তি অনুসারে—ইচ্ছা অনুসারে—দান। ভিক্ষার ঝুলি বড় করিলে কি হইবে।

দুই একজন উদার হৃদয় পরদুঃখ-কাতর ইংরেজ আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিলেও, তাহা ব্যক্তিগত মাত্র; অতএব নিষ্ফল। ফলতঃ ইংরেজ স্বীয় উদর অপূর্ণ রাখিয়া আমাদের ক্ষুন্নিবারণ করিতে পারে না। সুতরাং আবেদন, নিবেদন, চীৎকার, ক্রন্দন, কিছুই তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে না। বরিশালের কু-কাণ্ডের কথা অবশ্যই ধার্ম্মিকজনের কর্ণগোচর হইয়াছে—কিন্তু তিনি তাহার কি প্রতিবিধান করিয়াছেন? ইমার্সনকে দোষী করিও না। আসামের সেই ইংরেজ কুল-তিলক শাসনকর্ত্তারও দোষ নাই। এই সকল বর্ব্বরোচিত কার্য্য যদি ইংরেজ জাতির মনোমত না হইবে, তবে ইহাদের সাধের চাকরী এতদিন থাকিত কি? তাহা হইলে এদেশের শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি পাশব অত্যাচার করিয়াও, উহারা নির্ব্বিঘ্নে নবাবী করিতে পারিত কি? এই সব সাহেব-সন্তানেরা জানে, এদেশে তাহারা যতই অত্যাচার করুক না কেন, তাহার প্রতিবিধান নাই। আপনাদের ইচ্ছা ব্যতীত, স্বতন্ত্র আইন কানুনের অস্তিত্ব রাজপুরুষেরা স্বীকার করে না। আউট্‌-ল্যাণ্ডারদের যুক্তি অখণ্ডনীয়, ক্রুগারকে এই কথা বলায়, ক্রুগার উত্তর দিয়াছিল—

"Yes, they have arguments on their side, but I have the guns."

আমরা সভা-সমিতি করি, মন্তব্য পাশ করি, স্তুতি প্রার্থনা করি, তখন ইংরেজরাজপুরুষের মনে ঐরূপ একটা ভাবেরই উদয় হয়। তখন তাহার ওষ্ঠাধরে কৌতুক-জনক বিদ্রূপাত্মক হাস্যই প্রকটিত হয়।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? ইংরেজের চক্ষে যে আমরা শৃগাল-কুক্কুর অপেক্ষাও ঘৃণিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন ধীরে ধীরে আমাদের স্বদেশের প্রতি,—স্বজাতির প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। আজ কাল আমরা অনেকেই বিদেশ-জাত দ্রব্য-ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছি। এই সঙ্কল্পের উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। যাহাতে আমরা সঙ্কল্প-চ্যুত না হই, কায়মনে সে বিষয়ে সকলেরই যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আর মর্লি মিণ্টোতে কাজ নাই—পরের খোঁজ যথেষ্ট করিয়াছি,—এখন ঘরের প্রতি মন দিতে হইবে। ইংলণ্ড একটা প্রকাণ্ড বিপণি মাত্র। যখন তাহার পণ্য-সম্ভার গুদামজাত হইয়া থাকিবে—কাটিবে না,—কেবল তখনই তাহার চৈতন্য হইবে। আর মর্লির কাছে যাইয়া কাজ নাই—তাহাতে শক্তির অপব্যয় হয় মাত্র। দুঃখের বিষয়, দেশের যাঁহারা নেতা বলিয়া পরিচিত তাঁহারা এ তত্ত্ব বুঝিতেছেন না;—মনে হয় ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতেছেন না। আমাদের বিশ্বাস সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রতি অত্যাচারের প্রতীকার-প্রার্থী না হইলেই, তাঁহার সম্ভ্রম যথার্থরূপে রক্ষিত হইত। মান ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত অপমান-কারীর দ্বারে ধন্না দেওয়াতে বুঝায় যে আমাদের সম্ভ্রমটাকে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিয়া আমরা মনে করি। মা'র খাওয়ায় অপমান নাই। কিন্তু, যে মারিল তাহারই নিকট যাইয়া মারের কাঁদা কাঁদা, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। অত্যাচারিত মহাত্মাগণ, আদালতে প্রতীকার-প্রার্থী হইবার পূর্ব্বে, এ কথাটা ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহাদের নিজের ও দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত। যেখানে আইন-কানুনের একান্ত অভাব, সেখানে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া, উহার শরণাপন্ন হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

# ভারতবর্ষের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি।*

অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে চিরদিন একটা পার্থক্য রহিয়াছে এবং থাকিবে। ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলেও, এতদুভয় মধ্যে একটী বিস্ময়জনক আমূল পরিবর্ত্তন অতি সহজেই দৃষ্ট হয়। সময় কেমন করিয়া ধীরে ধীরে, বিনা আড়ম্বরে, লোক চক্ষুর অগোচরে, কি বৃহৎ—কি বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

জ্ঞান-চর্চ্চার সৃষ্টি হইতে ইংরেজী শিক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের যে পথ এ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহাকেই আমি ভারতের প্রাচীন-শিক্ষা-পদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করিতেছি। অন্যপক্ষে, বৃটিশ-ভারতে ইংরেজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পত্তন হইতে আজ পর্য্যন্ত যেরূপ ভাবে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তাহাকেই ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছি।

আমি যাহাকে প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করিলাম, এদেশে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে। আজ ঘটনাচক্রে তাহার প্রচলন বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। নদী ঢেউ তুলিয়া—কূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইয়া—দেশের শ্যামল-শোভার পূর্ণবিকাশে সহায়তা করিতেছে না সত্য,—উহা নিষ্ক্রিয় হইয়াছে, এ কথা আরো সত্য,—কিন্তু উহা বিনষ্ট হইয়াছে, এ কথা মিথ্যা। ক্ষীণ হইয়া সে স্রোতস্বিনী আজ শুধু রেখা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে—তাহা বাহিরের উত্তাপে সুধু অন্তঃসলিল-বাহিনী। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি অতীতের গর্ভে লীন হইয়া কেবল মাত্র স্মৃতিময়ী হইয়া রহে নাই,—প্রতিকূল-আঘাতে কেবল দেশের অস্থি-মজ্জার ভিতরে২ নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কার্য্য করিতেছে—মরে নাই। কত সহস্র বৎসর না চলিয়া গেল? কত রাজ্যবিপ্লব—ধর্ম্ম বিপ্লব—সমাজ বিপ্লব—দেশে যুগের পর যুগ আনিয়া উপস্থিত করিল,—সমগ্র জগতে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন লীলা ঘটিল! তথাপি ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি জীবিত—এই খানেই তাহার বিশেষত্ব। যাহা সত্য ও ধ্রুব পথে চালিত তাহার ধ্বংস নাই,—আঘাত ও অপমান, উপেক্ষা বা অনাদর তাহাকে আহত বা নিষ্ক্রিয় করিতে পারে,—কিন্তু প্রাণে মারিতে পারে না। এই প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি সুদীর্ঘ কালের কুটিল আবর্ত্তনে সময় ও স্থান বিশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত হইয়াছে—তথাপি মূলে চিরদিন অবিকৃত রহিয়াছে। সুতরাং, কেবল মাত্র ইহার বাঁচিয়া থাকাই বিশেষত্ব নহে; পরন্তু, স্থূলপ্রকৃতিতে এমন অটল ও দৃঢ়ভাবে টিকিয়া থাকা, ইহার অপর উজ্জ্বল গৌরব। ইহা যে এখনো বাঁচিয়া আছে, তাহা ক্রমে আমি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব। তৎপূর্ব্বে এই প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রকৃতি ও ইহার যুগ-যুগান্তর ব্যাপি দীর্ঘজীবনের অবিকৃতাবস্থাতেও যে সামান্য ২ পরি-

* প্রেসিডেন্সি কলেজের অবকাশ-সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত। স্থানে স্থানে অনুরোধে ভাষা-গত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। মতামত সমস্তই কিন্তু লেখকের নিজস্ব।—স, স।

বর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ—ইহার জন্ম ও শৈশব; দ্বিতীয় ভাগ—ইহার বাল্য ও কৈশোর; তৃতীয় ভাগ—ইহার পূর্ণ-যৌবন; চতুর্থ ভাগ—ইহার জরা ও বৃদ্ধত্ব। বৈদিক যুগে যে সময় আরণ্যক ঋষিগণ প্রকৃতির ও ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি-সমূহ ললিত সুছন্দে গাথিয়া মেধাবী বালকদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন ও তাঁহাদিগের দ্বারা পুনরাবৃত্তি করাইতেন, সেই সময়ে এই প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির জন্ম। তাহার কিছুদিন পরে, ঋষিদের তপোবনে ও গুরুর আশ্রমে ইহার বাল্য ও কৈশোরাবস্থা অতিবাহিত হয়। সেইসময় অত্যন্ত মধুর।

শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবালকগণ পিতৃগৃহ ছাড়িয়া, অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে আশ্রয় লাভ করিতেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তথায় ব্রহ্মচর্য্য-পালন রীতি ছিল। এই ব্রহ্মচর্য্য পালনই ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির মূলমন্ত্র। এই সময় শিক্ষার্থীরা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাতেই ( দেহ, মন ও আত্মার ) পারদর্শী হইতেন। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, প্রাতে ভ্রমণ, হিত ও পরিমিত ভোজন প্রভৃতি দৈহিক স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য তাঁহারা অনেক সুন্দর সুন্দর নিয়ম প্রতিপালন করিতেন। দূর বন হইতে যজ্ঞের কাষ্ঠাদি সংগ্রহ ব্যাপারে কষ্টসহিষ্ণু হইতেন। বিলাস-ভোগে বিরক্ত থাকিয়া, গভীর আত্মসংযম লাভ করিতেন। সর্ব্বদা নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিতেন এবং কঠোর পরিশ্রমের সহিত—কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন ঈপ্সিত শাস্ত্রে জ্ঞান লাভও করিতেন। তদ্ভিন্ন, গুরুর সহিত একত্রাবস্থানে, তাঁহারা স্ব স্ব বৃত্তি-নিচয়ের অনুশীলনার্থে সম্মুখে সতত একটী জীবন্ত আদর্শের সাহায্য পাইতেন।

এই দীর্ঘকাল ব্যাপি শিক্ষাকালে, গুরু শিষ্যদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষার অন্যান্য সমস্ত ব্যয় নিজে বহণ করিতেন। শিক্ষাসমাপ্ত হইলে গুরুগৃহ ছাড়িবার সময় গুরুকে দক্ষিণা দিতে হইত। সে সময়ে, শিষ্যগণ কোন দয়ালু রাজার সাহায্যে সে ঋণ হইতে মুক্তি পাইতেন। তখন ব্যয়-বাহুল্যের ভয়ে কোন জ্ঞানলিপ্সু ছাত্রকেই বিফল-মনোরথ হইতে হয় নাই। ছাত্র জীবনে সংযমাভ্যাস হেতু, শিক্ষার্থীর অভাবও তখন অত্যন্ত অল্প ছিল। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য এই দুইটি আশ্রম সম্পূর্ণ সতন্ত্র থাকাতে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের দুশ্চিন্তা কোন শিক্ষার্থীকেই বিদ্যা-মন্দির হইতে অকালে রুগ্নদেহে ও ভগ্নমনে বহিষ্কৃত করিতে পারে নাই। বাস্তবিক তখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ-শিক্ষা লাভ হইত। সেই শিক্ষা, দেশে একদল প্রকৃত বিদ্বান-ব্যাক্তি সৃষ্টি করিত। সমাজ সেই সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেদের নিকট আবার পর্য্যায়ক্রমে দেশে জ্ঞান বিস্তারে আশা রাখিত, পরিবার কখন সেই সমস্ত জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের নিকট, বৈশ্যজন-সুলভ অর্থ-প্রাচুর্য্য আশা করিত না। সুতরাং, বাল্যে যাঁহারা অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে আশ্রয় লইতেন, তাঁহারা জানিতেন, তাহাদিকে জীবন ভরিয়া নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞানই দান করিতে হইবে এবং সেই হেতু মহাজ্ঞানই তাঁহারা প্রাণপণে একাগ্রচিত্তে অর্জ্জন করিতেন। বস্তুতঃ, ধনাগমের হেতুস্বরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন তখন ছিল না। দেশ

ও সমাজ তাঁহাদের নিকটে এমন কিছু চাহিতেন বা তা'র দাবী রাখিতেন যে, তদকালীন শিক্ষাপদ্ধতি তাঁহাদিগকে নিস্বার্থ-জ্ঞানে সিদ্ধ করিয়া দিতে ন্যায়তঃ বাধ্য ছিল। সে শিক্ষা, সংযম, প্রীতি ও ত্যাগের সমবায়—এক কথায়, প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তখন শিক্ষার পরিচয় কার্য্যে হইত; সুতরাং, সে শিক্ষায় শুধু যে জ্ঞান লাভ হইত তাহা নয়—তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতাও জন্মিত। কিছু জানিলেই শিক্ষা হয় না, তাহার অনুপাতে কার্য্য করাতেই শিক্ষার পূর্ণতা। যিনি বলেন, "জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি" - তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। জীবনের পুণ্য-প্রভাতে যে দিন শিক্ষার্থীর ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি জন্মাইয়া, শিক্ষা তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবার বল ও শক্তি প্রদান করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই শিক্ষার পূর্ণতা-লাভ। ঋষিদের তপোবনে এই প্রকার পূর্ণশিক্ষা লাভ হইত। যোগপদ্ধতি ত এক প্রকার শারীরিক ও অধ্যাত্মিক ব্যায়াম বিশেষ। তদ্বারা দেহ, মন বা আত্মার সূক্ষ্মতম অংশ পর্য্যন্ত অনুশীলন হইত। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি নীতি ও ধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ইহাও তাহার অন্যতম মহত্ব। তৎকালে যে স্ত্রী-শিক্ষাও অল্লাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল,—পরিবার মধ্যে বালিকাদিগকে যে সুগৃহিণী ও সুমাতা হইবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইত,—শাস্ত্রে ও ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

জগতে কিছুই নিখুত মিলে না। কালক্রমে, এই শিক্ষায় দেশে কতকগুলি দুর্নীতি ও কুসংস্কার প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। দ্বিজেতর-বর্ণের ... ব্রাহ্মণগণ, শাস্ত্রোক্ত আইনানুসারে জ্ঞানানুশীলন—যথা, বেদ পাঠাদির অধিকার—হইতে বঞ্চিত হইলেন। বিশাল জন-সাধারণ ক্রমে অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিতে লাগিল। পৌরহিত্য-শক্তি (priestly domination) যথেচ্ছাচারী হইল। উচ্চশিক্ষা একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়া গেল।

ঠিক সেইসময়েই, মানব-গুরু-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ভগবান্ বুদ্ধদেব ভারতাকাশ উজ্জ্বল করিয়া স্বীয় গৌরব-মণ্ডিত মস্তক উত্তোলন করিলেন—জগৎ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল। ব্রাহ্মণযুগে যে শিক্ষার বাল্য বা কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে, বৌদ্ধযুগে তাহার পূর্ণ-যৌবন আরম্ভ হইল। শাক্যমুনি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের জন-সাধারণকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের মন্দিরে আহ্বান করিলেন—গিরি প্রান্তর কাঁপাইয়া গম্ভীর সে মন্ত্রের আহ্বানে সকলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। দিগদিগন্ত হইতে দলে দলে শিক্ষার্থীগণ তাঁহার চরণপ্রান্তে সমবেত হইতে লাগিল। অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানের আলোকে মণ্ডিত হইয়া সেই বিরাট সঙ্ঘ দেশকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের মধ্যে একদল কেবল অধ্যাপনাব্রতেই জীবন উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বিভিন্ন জাতীয় সহস্র সহস্র যুবকবৃন্দ বৌদ্ধ-মঠে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন।

এই মঠে ও গুরুর আশ্রমে অনেক পার্থক্য। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিলে পর, এই শিক্ষাকার্য্য আরো বিস্তৃত হইল। বৌদ্ধমঠে বহু সহস্র ছাত্র ও বহু বৌদ্ধ আচার্য্যগণ একত্রাবস্থান পূর্ব্বক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে লাগিলেন। এক নালন্দার মঠেই দশসহস্রাধিক

ছাত্র ও অধ্যাপকের থাকিবার সুবন্দোবস্ত ছিল। গুরুর আশ্রমে কেবল দ্বিজাতীয় বালকগণ শিক্ষালাভ করিতেন, কিন্তু বৌদ্ধ মঠে সমস্ত জাতির বালকগণের প্রবেশাধিকার ছিল।

এই বিরাট মঠের বিরাট শিক্ষা ব্যাপারের ব্যয়, দেশের রাজা বহন করিতেন। দেশ ও ইহাতে সহানুভূতি ও সাহায্য-দানে উদাসীন ছিল না। জনসাধারণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া মঠের সন্ন্যাসী ও ছাত্রদিগকে অযাচিতভাবে চীবর ( কার্পাস নির্ম্মিত পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ ) পিণ্ড ( খাদ্য বস্তু ) প্রভৃতি দিয়া আসিতেন। যে সময় কলিঙ্গ ও অশোকের মত রাজা রাজত্ব করিতেন, তখন পীপিলিকার মত ক্ষুদ্র প্রাণীও রাজ সরকারের উপেক্ষিত ছিল না। ভারতের সেই উজ্জ্বল গৌরব-যুগেও শিক্ষাকার্য্য সাহায্য অভাবে সংকুচিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণ যুগাপেক্ষা বৌদ্ধযুগে যে কেবল শিক্ষা-ব্যাপার অত্যন্ত বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছিল—সমগ্র দেশব্যাপি হইয়াছিল, তাহা নহে—এই দুই মহা যুগের শিক্ষা-প্রণালীতেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। গুরুর আশ্রমে শিক্ষার একটী শেষ বা সীমা ছিল,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট। বৌদ্ধ-মঠে কিন্তু ছাত্র-জীবনের শেষ ছিল না। জ্ঞানলিপ্সু ছাত্রগণ জ্ঞানান্বেষণে সমগ্র জীবন পর্য্যন্ত পাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না; গার্হস্থ্যাশ্রম তখনকার শিক্ষার্থীদের নিকট নিতান্তই উপেক্ষিত হইত। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মন-যুগের পর বৌদ্ধযুগে জ্ঞানরাজ্যেও একটী অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব, পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সংঘটিত হইয়াছিল। জ্ঞানরাজ্যের সীমাও বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ-মঠের ছাত্রগণ কেবল গুরুর আশ্রমে-লব্ধ জ্ঞান-প্রাপ্তিতে তৃপ্ত ছিলেন না। অনেক নবাবিষ্কৃত মহাসত্য ও জ্ঞানের অনুশীলন হইতে লাগিল। বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ নির্ব্বাণ মানবের জ্ঞান, চিন্তা ও ধারণা শক্তিকে এক অভিনব উন্নতস্তরে লইয়া গেল। তৎকালীয় ভারতীয় ছাত্রগণ সেই মহাজ্ঞান ও মহাসত্যের দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া, ভাব ও অভাব, অস্তি ও নাস্তির অতীত এক চিরস্থির স্খলনহীন জ্যোতির্ম্ময় বেলাভূমি নির্ভর করিয়া সগৌরবে সমুন্নত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এই খানে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির যৌবনের পূর্ণ-বিকাশ। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রতি একটী গভীর আকাঙ্ক্ষা ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিল। ইংরেজীতে যাহাকে Mass-Education বলে, ভারতীয় শিক্ষার যৌবনাবস্থায়, তাহা চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-যুগে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্ষুদ্র২ বাঁধ ছিল, বৌদ্ধযুগে জ্ঞানের প্রবল বণ্যা আসিয়া সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গেল!

ব্রাহ্মণ-যুগে যে শিক্ষা ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, বৌদ্ধ-যুগে তাহা নীতি ও ধর্ম্মের সহিত আরো গভীরভাবে আবদ্ধ হইল। জীবনের দৈনিক কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষার সেই পূর্ণ-বিকাশ দীপ্তি পাইতে লাগিল। কর্ম্মই শিক্ষার পরিচয়—এই কথার সার্থকতা ব্রাহ্মণ-যুগে আরম্ভ হইয়া, বৌদ্ধযুগে বদ্ধমূল মহাসত্যে-রূপে ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষত্বে পরিণত হইল। বৌদ্ধ-যুগের শিক্ষা, ব্রাহ্মণ যুগের ধর্ম্ম-কর্ম্মে নানা কুসংস্কার সকল ধ্বংস করিল। বৌদ্ধ-যুগের শিক্ষা-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান মহত্ব—স্ত্রী-শিক্ষার বহু-প্রচলন ও বিস্তার। স্থানে স্থানে মেয়ো

যায়—স্ত্রী-পুরুষ একত্রাবস্থান পূর্ব্বক শিক্ষালাভ করিতেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার বিমাতা মহা প্রজাবতী, পত্নী গোপা ও রাজা বিম্বিসারের সহধার্ম্মিণী ক্ষেমা-দেবীকে অগ্রগণ্যা করিয়া একটী বিশাল ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া যান। ত্যাগ ও সংযমাভ্যাস নিবৃত্তিমূলক, বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ;—মিতাচারী, মিতভুক্, বিলাস-বর্জ্জিত কষ্টসহিষ্ণু হওয়া—বৌদ্ধযুগে শিক্ষার্থীদের এ সকল গুণাবলী জীবনে প্রতিপালন অবশ্য-কর্ত্তব্য ছিল।

গুরুর আশ্রমে অধ্যয়ন কালে গুরু সাধারণতঃ বৃক্ষতলে উচ্চাসনে কিংবা বেদীর উপর বসিয়া শিক্ষা দিতেন, শিষ্যেরা নিম্নে কুশ বা চর্ম্মাসন প্রভৃতিতে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। বৌদ্ধ-আচার্য্যদের পদ্ধতি ছিল, অন্য প্রকার। দুই ধারে লম্বিত ভাবে ছাত্রদিগকে সারি২ দাঁড়করাইয়া, তাঁহারা মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে বক্তব্য-বিষয় জ্ঞাপন করিতেন। বৌদ্ধ-যুগে ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই।

যৌবনের পর প্রৌঢ়ত্ব বা বৃদ্ধত্ব যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ বৌদ্ধ-শিক্ষার প্রচণ্ড তেজ ম্লান হইয়া আসিল। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধভাব সঙ্কুচিত হইল; দেশব্যাপি শিক্ষার গতিও মন্দ হইতে লাগিল। গুরুর আশ্রমের অনুকরণে টোল প্রভৃতির পুনর্প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল। সেই সমস্ত টোলে শুধু ব্রাহ্মণ-বালকগণ সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধযুগের সেই উচ্চতম ব্রহ্মচর্য্য একটু অবনমিত হইল। এই যুগেই কিন্তু,—বিদ্যোৎসাহী মুসলমান সম্রাটদিগের সময়,—আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে অনেক সদ্‌গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদিত হইয়া ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অধীত হইয়াছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস, চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। রাজা কলিঙ্গের সময় প্রস্তরশিল্পের যে পূর্ণতা লাভ হইয়াছিল, ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র জগতেও তাহা বিরল। যাহা হউক, যৌবন ও বৃদ্ধত্বে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি থাকিয়া গেল।

মুসলমান রাজত্বের প্রায় অবসানকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিন পর্য্যন্ত, সুদূর শ্যামল পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপে, পাঠশালা গৃহে, সংকীর্ণভাবে যে শিক্ষাকার্য্য চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতেও সেই গুরুর আশ্রম ও টোলপদ্ধতির আভাষ পাওয়া যায়। পাঠশালাতে গুরুমহাশয় অধিকাংশ স্থলে ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে পড়ান। গুরু ও শিষ্যে একটী মধুর পিতা পুত্র ভাব চিরদিন জড়িত। ভারতে বিনাব্যয়ে অধ্যাপনা, প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষ গৌরব। বিদ্যা-দান করাই এদেশের রীতি ছিল—বিক্রয় করা নহে। গুরু শিষ্যের একত্রাবস্থান প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির অন্যতর লক্ষণ বিশেষ!

ইংরেজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে পল্লীগ্রামে আজো যে শত শত টোল ও সংস্কৃত দাতব্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, অনেক টোলের পুনঃ সংস্কার হইতেছে, তদ্বারা প্রমাণ হয় যে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য, তপোবন, ও আশ্রম প্রভৃতির উপর ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতেছে। দেশের প্রকৃতিগত সেই প্রাচীন-শিক্ষা-পদ্ধতির অস্তিত্বের তাহাই প্রমাণ।

প্রাচীন-শিক্ষা-পদ্ধতি শত পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত হইলেও কতকগুলি বিশেষ গুণ চিরদিন

ইহার সহিত জড়িত ছিল। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সহিত তাহার কোন ঐক্যতা নাই, কেননা ইহা বিদেশীয় বিজাতীয় পদার্থ। এই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি যে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিকে আংশিক-ভাবে সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা নহে,—ইহা একটী সম্পূর্ণ পৃথকবস্তু—ভারত-জননীর কণ্ঠে ভিন্ন দেশীয় পুষ্পে গ্রথিত পরপ্রদত্ত একটি মালা। ইহার গন্ধ এদেশে অপরিচিত; ইহাতে আমরা অনভ্যস্ত। সেই জন্যই দেশে সম্যক্ স্বাস্থ্য ও সুখ বিধান করিতে ইহা অক্ষম।

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা স্কুল ও কলেজে যে প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি, তাহাই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি। ইহা প্রথমেই গুরু শিষ্যের একত্রাবস্থানে অন্তরায় ঘটাইয়াছে। পরে বেতন দিয়া ও বহু ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদিগকে অধ্যয়ণ করিতে হইতেছে। ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ এ অভিনব বন্দোবস্তে চির-অনভ্যস্ত। শিক্ষার বিষয়ও দেশ কালভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার আবশ্যকতা ছিল ও এখনো আছে। ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা প্রভৃতি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছে ও করিবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু, ইহাতে যে এক মহা কুফল প্রসব করিতেছে, তাহা উপেক্ষণীয় নয়। বিদেশীয় শাস্ত্র যতই বেশী জানিতেছি, স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির চর্চ্চা ততই হ্রাস পাইতেছে; অজ্ঞাতসারে আমরা সে সমস্ত বিস্মৃত হইতেছি—সততই দূরে পড়িতেছি।

বিদেশকে যতই উত্তমরূপে জানিতেছি, স্বদেশকে ততই ধীরে ধীরে হারাইতেছি। আমাদের পাঠ্য-সকল অনেক সময়ে সুনির্ব্বাচিত ও সুরচিত হয় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নাম করিয়া আমরা যাহা পড়ি, তাহা কেবল মোগল রাজত্বের আত্মবিরোধ ও যুদ্ধ বৈচিত্রেই পূর্ণ। এই ইতিহাসের এক ছত্রেও আমাদের সেই তপোনিষ্ঠ অতীত অমর-ভারতবর্ষকে কুত্রাপি খুজিয়া পাই না। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় কিছু আছে কি না, জানি না। দেশের প্রকৃতি-অজ্ঞ বিদেশী শিক্ষাযন্ত্রে ভারতবর্ষে যে নূতন জীবন সৃষ্টি করিতেছে, আমাদের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। Politics ছাড়াও যে history হয়, তাহা আর কেহ না জানিলেও, ভারতবাসী জানে।

প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের সহিত এই শিক্ষার কোন সংশ্রবই নাই। নীতি ও ধর্ম্মের সহিতও ইহার সম্বন্ধ নামমাত্র। আধুনিক শিক্ষা আমাদিগকে জ্ঞানী বা পণ্ডিত করিবার ইচ্ছা রাখে না, কেবল কতকগুলি কর্ম্মসাধনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে মাত্র। শিক্ষায় দেহ মন ও আত্মা সবল হইতেছে না। এতগুলি বিষয় একত্রে এত অল্প সময়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তাহার একটীতেও পারদর্শী হওয়া একেবারে অসম্ভব। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করিতে হইলে, তাহার বিনিময়ে, দৈহিক স্বাস্থ্য জলাঞ্জলি দিতে হয়, ইহা ধ্রুব সত্য।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে বটে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সুনির্ব্বাচিত হয় নাই। মহিলা ও পুরুষের সর্ব্বথা পরিপুষ্টি বা বিকাশের জন্য একই প্রণালীতে শিক্ষা-বিধান অযৌক্তিক। বালক ও বালিকা এক জিনিষ নয়,—উহাদের শরীর ও মনের উপাদানের বিভিন্নতাই একমাত্র পার্থক্য নয়,—কর্ম্মক্ষেত্রও পরস্পরের সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

শিক্ষা কর্ম্মজীবনের জন্য অভিপ্রেত হইলে, এতদুভয়ের মধ্যে ভিন্ন প্রণালীর শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়।

দেশের অবস্থা শিক্ষার পরিচায়ক। অধুনাতন কালে কেহই শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের কর্ম্মে শিক্ষার উৎকর্ষ প্রতিফলিত দেখিতে চায়না; কাজে কাজেই যে শিক্ষায় শরীর মন উন্নত হয়, তাহা উত্তরোত্তর দুর্লভ হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি কর্ম্মজীবনে শিক্ষার পরিচয় দিবার সামর্থ্য জন্মাইতেছে না। ইহা শিক্ষাপ্রণালীর দোষ।

শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করিয়া দেয়, শিক্ষাই মানুষকে পশু করিয়া তোলে,—শিক্ষাই মানুষকে দেবতা করে, শিক্ষাই মানুষকে দৈত্যে পরিণত করে। এই দেশের ছাত্রইত একদিন শিক্ষাগুণে জ্ঞানমন্দিরে উজ্জ্বল অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সে শিক্ষার সৌরভ আজও শিক্ষিত জগতকে পুলকিত করিতেছে। সেই দেশের ছাত্র আমরা আজ কি হইতে বসিয়াছি! সমস্তই শিক্ষার ফল। যাহা যথার্থ নয়, যাহা সত্যপথে চালিত নয়, তাহার দুর্ব্বলতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশ পায়।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া যে কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিতেছেন, তাহাই এই শিক্ষার অঙ্গহীনতার পরিচায়ক।

আজ ইহারা Residential collegeএর কথা উত্থাপন করিতেছে—গুরু-শিষ্যের একত্রাবস্থান আবশ্যক মনে করিতেছে। কিন্তু এই অধঃপতিত দেশে, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিরাট অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

দেশ কাল ও পাত্র-ভেদে শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রণালী, প্রকৃতি ও বিষয় পৃথক হইয়া পড়ে—তাহা বাঞ্ছনীয়ও বটে। ভারতে যখন রাজনৈতিক শান্তি বিরাজ করিত,—জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কঠোর সংগ্রামে নিষ্পেষিত হইতে হইত না—তখন জ্ঞান ও ধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল পবিত্র চর্চ্চা শোভা পাইত। পরিবর্ত্তন তখন দোষের হইত না।

কাল-ভেদে আজ আমরা এমন এক শিক্ষার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছি, যাহা আমাদিগের সমস্ত জড়তা, দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা দূর করিয়া শুভদিনে আমাদিগকে মনুষ্যত্বের অধিকারী করিবে। জাতীয় আহ্বান আমাদিগকে, ব্যক্তিগত স্বার্থ, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে ডাকিবে, তখন যেন আমরা শিক্ষাবলে অম্লানচিত্তে অবলীলাক্রমে সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি। যে শিক্ষার বলে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাই আমাদের অভীপ্সিত।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

# উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

## গর্ভোপনিষৎ

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।

গুরু। পঞ্চভূতাত্মক　　মানব শরীর,　　ষড়-বিধ রস,　　ষড়বিধ গুণ
পঞ্চবৃত্তি দেহমাঝে,　　নিজ নিজ ভাবে রাজে।

সপ্ত ধাতুময়, ত্রিমল (১) আধার,
পিতৃ মাতৃ দেহোদ্ভব (২) ;
চতুর্ব্বিধাহার, (৩) পরিণাম তা'র
দেহে কর অনুভব ॥ ১ ॥

শিষ্য। দেহে পঞ্চভূত কোথা আছে, পিতঃ,
পৃথ্বী আপঃ তেজঃ কোথা ?
বায়ু ও আকাশ, কোথায় প্রকাশ ?
কহ মোরে সেই কথা।

গুরু। পঞ্চাত্মক দেহে কঠিন যে ভাগ,
তাহাই ত ক্ষিতি-ময়,
দ্রব যেই ভাগ আপঃ ত তাহাই,
উষ্ণ ভাগ তেজঃ হয়।
এই দেহ মাঝে সঞ্চরিছে যাহা,
বায়ু বলি' বুঝ তা'রে ;
রন্ধ্র ভাগ যত তা' সবে ব্যাপিয়া
আকাশ বিরাজ করে।
পৃথ্বীভাগ দেহ করিছে ধারণ,
জলভাগ গড়ে পিণ্ড।
তেজোভাগ যাহা, তাহাই প্রকাশ
করিছে এ দেহ-ভাণ্ড।
দৈহিক পদার্থ করিছে মিলিত,
বায়ুর কার্য্য তা'ই,
দেহের বিস্তারে, দেহছিদ্র মাঝে
আকাশ ;—অন্য নাই।
কর্ণে শব্দ বোধ, স্পর্শ বোধ ত্বকে,
চক্ষুতে রূপের জ্ঞান,
জিহ্বা গ্রহে রস, ঘ্রাণ নাসিকায়,
শিশ্ন করে সুখ দান।

মল মূত্র ত্যাগ অপানের(৪) ক্রিয়া,
বুদ্ধি হ'তে বোধ হয় ;
মনেতে সংকল্প, বাক্য বাগিন্দ্রিয়ে,
এ ভাবে দেহেতে রয় (৫)।

শিষ্য। ষড়াশ্রয় দেহ হইল কেমনে,
ষড় রস, গুণ কোথা ?

গুরু। কহি, বৎস, তুমি শুন মন দিয়া
সরল মধুর কথা।
মিষ্ট, লবণাক্ত, অম্ল, কটু, তিক্ত,
কসায়,—এ ছয় রস ;
ষ ঋ গা ম প ধ নি,—এ সপ্ত স্বর,
ষড় গুণ-জ সরস।
বৃত্তি পঞ্চবিধ, ইষ্টানিষ্ট এই
দুই ভাবে দশ হয় ;
ইষ্ট ও অনিষ্ট হইতে জনমে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বয় ॥ ২ ॥

শিষ্য।
এই দেহে (৬) সপ্তধাতু, কহে কি কারণ ?

গুরু।
কহি, বৎস, মর্ম্ম তা'র, করহ শ্রবণ।
শুক্র, রক্ত, কৃষ্ণ, ধূম্র, পীতবর্ণ আর
কপিল, পাণ্ডুর,—সপ্ত বরণ আহার।
সপ্ত বর্ণ খাদ্য হ'তে জনমে শরীরে
ষড়বিধ রস, সত্য বুঝহ অন্তরে।
রস সর্ব্বধাতু-মূল, কিন্তু ধাতু নহে ;
রসেরে কারণ রূপে সপ্ত ধাতু কহে (৭)।
রস হ'তে রক্তজাত, মাংস রক্ত হ'তে,
মাংস হ'তে জাত মেদ, দেহের মধ্যেতে।

(১) মূত্র, পুরীষাদি দেহের মল নহে। উহা আহার্য্য বস্তুর বিকৃতি, সুতরাং তাহারই মল। দেহের তিনটী মল আছে। যথা—নখ, লোম, কেশ। ইহারা দেহ হইতেই জাত।

(২) অর্থাৎ দেহ।

(৩) চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়,—এই চারি প্রকার আহারের পরিণতিতে দেহ।

(৪) অপান বায়ুর।

(৫) রহে।

(৬) এই দেহকে।

(৭) রস হইতে যথাক্রমে রক্ত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, শুক্র—এই সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হয়। রসই ইহাদিগের কারণ। সেইজন্য রসকে কারণ-রূপে সপ্ত ধাতু বলা যায়।

মেদ হ'তে হয় স্নায়ু, তাহে অস্থি হয়,
অস্থি হ'তে মজ্জা জাত, বুঝহ নিশ্চয়।
মজ্জা হ'তে হয় শুক্র। শুক্র ও শোণিত
মিশ্রিত হইয়া হয় গর্ভ উপস্থিত।
এই সপ্ত ধাতু আছে হৃদয় মাঝারে,
হৃদয়েই অন্তরাগ্নি সদা বাস করে।
অগ্নি মাঝে রহে পিত্ত, বায়ু, কফ রহে,
বায়ু বিনা অগ্নি কভু কার্য্যকর নহে।

প্রজাপতি যথা বিভক্ত হইয়া
দুই ভাগ হ'য়েছিলা,
একভাগে পতি, অপর ভাগেতে
পত্নিরূপে জনমিলা;
বায়ু সেই মত, বিভক্ত হইয়া,
হৃদয় গড়িয়া লয়,
বায়ু, পিত্ত, কফ ত্রিমল এ দেহে
এইরূপে জাত হয়॥ ৩॥

শ্রীশশধর রায়

# কবিওয়ালা। (৭)

## মহেশ কাণা।

কবিওয়ালাগণের মধ্যে মহেশ নামধেয় দুইজন কবিওয়ালা ছিলেন। একজন জাতিতে কায়স্থ,—উপাধি ঘোষ। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন, তজ্জন্য মহেশ কাণা নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন। অপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উপাধি চক্রবর্ত্তী ছিল। তিনি সাধারণতঃ মহেশ ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। প্রথমতঃ মহেশ কাণা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা-মাহাত্ম্যে কত অপরূপ ঘটনা যে সংঘটিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার কৃপা হইলে, মূক ব্যক্তিও অত্যাশ্চর্য্য বাক্যজাল বিস্তার করিতে পারে, পঙ্গু অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণে সক্ষম হয়। মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুতর জন্মান্ধ ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়া ভূমিষ্ট হইয়াছেন,—স্বীয় অপরাজিত কবিত্ব-প্রভায় জগৎবাসীকে বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপের জগদ্বিখ্যাত মহাকবি মিল্টনের নাম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপরিচিত নহে। তিনি অন্ধ হইয়াও কি অপূর্ব্ব কবিত্ব-প্রভা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ফসেট অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পলিটিকাল ইকনমী আজিও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। অন্ধ প্রেস্কট—ঐতিহাসিকাগ্রগণ্য রূপে আজিও শিক্ষিত সমাজের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। এইরূপ বহুতর নামোল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে, জন্মান্ধ হইয়াও লোকে নানারূপ অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন! সুতরাং মহেশ কাণা জন্মান্ধ হইয়াও বিস্তর কবি-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কারণ কি?

অনুমান ১২১০ সালে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাশত মহকুমার অধীন ও তন্নিকটবর্ত্তী মহেশপুর নামক গ্রামে কবিওয়ালা মহেশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। বলিয়াছি ত তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। সুতরাং বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। অপিচ তাঁহার পিতার অবস্থাও তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না যে, অন্ধ পুত্রকে গৃহে রাখিয়া শিক্ষা দান করিতে পারেন। মহেশের পিতা সামান্য অবস্থার একজন গৃহস্থ,—যৎসামান্য জোত জমার আয় ও চাকুরী-

বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এই সময়ে মহেশপুরে এক ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের সংস্কৃত টোল ছিল। তাহাতে অনেকগুলি ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। মহেশ চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রত্যহ এই টোলে যাইয়া ছাত্রগণের বিদ্যাধ্যয়ন শ্রবণ করিতেন। এই ভাবে তাহাদের মুখ-নিঃসৃত উচ্চ আবৃত্তি শ্রবণ করিতে করিতে,মহেশ কাণা অচিরকাল মধ্যে অমরকোষ ব্যকরণ কণ্ঠস্থ এবং রামায়ণ, মহাভারত এবং কতিপয় পুরাণের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন। প্রায়শঃই দেখা যায়, ভগবানের কৃপায় বিকলাঙ্গগণ এইরূপ কোন না কোন একটী বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়া থাকে। মহেশকাণা তদ্রূপ অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ও প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেশ কাণা যে ভাবে টোলের ছাত্রগণের আবৃত্তি শ্রবণ করিতে করিতে পুরাণাদি ও ব্যাকরণ শিক্ষা করেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর, তথাপি তাহা অসত্য নহে। বঙ্গীয় প্রাচীন কবিকুলের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, তাহাদের অধিকাংশই বর্ণজ্ঞান বিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যরাজি প্রকৃত শিক্ষিতের আদরের বস্তু। তাঁহারা নিতান্ত অশিক্ষিত হইয়াও মুখে মুখে অতি সুন্দর সংগীত রচনা করিতে পারিতেন।

এই ভাবে মহেশকাণার ব্যাকরণ ও পুরাণাদি আয়ত্ব করার সংবাদ প্রকাশ হইলে, টোলের অধ্যাপক ও গ্রামস্থ অপরাপর ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহার প্রতি বিশেষ আনুকুল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সাহায্যে মহেশকাণা নানা পুরাণ ও শাস্ত্রাদির মর্ম্ম অবগত হন।

এই সময় হইতেই তাহার কল্পনা শক্তির উন্মেষ দৃষ্টিগোচর হয়। টোলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার সময় হইতেই তিনি নানাবিধ সংগীত রচনা করিয়া গ্রামবাসীগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার যশঃসৌরভ কবিওয়ালা-সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, নানা স্থান হইতে কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারগণ তাঁহাকে সাদর-আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহেশের অমানিশার অবসান হইল ;—কলিকাতার ভদ্র ও ধনাঢ্য সমাজে তিনি পরিচিত হইলেন।

তৎকালে কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অনেকেই সংগীতানুরাগী ছিলেন। অনেকের ভবনেই বহুতর সংগীত-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন। বঙ্গীয় সংগীত ও কাব্যশাস্ত্রের এরূপ অতুলনীয় গৌরবের মূল কারণই, বঙ্গীয় জমীদার বৃন্দ। তাঁহাদের আশ্রয়মূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই, আজ আমরা প্রাচীন কবিকুলের অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্ব-সুধার রসাস্বাদন করিতে পারিতেছি। অনেকানেক মহানুভবের মধ্যে ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর নাম আমাদের উল্লেখযোগ্য, কারণ তাঁহাদের সহিতই মহেশকাণার সংস্রব ছিল। লাটুবাবু ও ছাতুবাবু স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের পুত্র। ইঁহাদের আসল নাম,—আশুতোষ ও প্রমথনাথ দেব। আশুবাবু ওরফে ছাতুবাবু জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তৎকালীন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন গণ্য মান্য 'সমজদার' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শুনা যায়, ১০৮ জন ওস্তাদ, কবিওয়ালা ও পাঁচালীকার তাঁহাদের দ্বারা প্রতিপালিত

হইত। তন্মধ্যে বিখ্যাত কবিওয়ালা ছাতু-রায়, মহেশকাণা, দুর্গামঙ্গল-রচয়িতা প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থান হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ কালোয়াৎ আনাইয়া সংগীত-চর্চ্চা করিতেন। হিন্দুধর্ম্মেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল।

ছাতুবাবু সবিশেষ গুণজ্ঞ এবং স্বয়ং সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজেও অনেকগুলি সংগীত রচনা করিয়াছেন। কতিপয় সংগীত এমনি করুণ রসাত্মক ও মর্ম্মস্পর্শী যে শুনিতে শুনিতে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে :—

তার কথা কার কাছে কই ?
এমন দুঃখের দুঃখী মিলে কই ?
প্রকাশিলে পরে, পাছে শুনে পরে
সদা ভাবি ঐ। ইত্যাদি।

এ গীতটী কি মর্ম্মভেদী!

যাহা হোক্, মহেশ-কাণা কলিকাতায় আসিয়া ছাতু বাবুরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কোনও দলে মাসিক বেতনে বাঁধনদারের কার্য্য-গ্রহণ করেন নাই। অধিকাংশ সময় আশ্রয়দাতার আলয়েই অবস্থান করতঃ, বিভিন্ন কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারকে সংগীত যোগাইতেন। ছাতুবাবু কবিকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি সময় সময় বিভিন্ন কবিওয়ালার সহিত মহেশের লড়াই বাধাইয়া দিয়া বন্ধু-বান্ধবসহ তাহার কবিত্ব-সুধা-পানে তন্ময় হইতেন।

রাম বসুর প্রসঙ্গে আমরা নিম্ন-লিখিত সংগীতটী রাম বসুর রচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলাম,—

বালিকা ছিলাম, ভাল ছিলাম তো
ছিল না সুখে অভিলাষ।
পতি চিনিতাম না, সে রস জানিতাম না
হৃদ-পদ্ম ছিল অপ্রকাশ। ইত্যাদি।

এখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, এ সংগীতটী রাম বসুর রচিত নহে, ইহা কবি মহেশকাণার খেউড়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহার শেষাংশ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ৩য় বর্ষের 'সমীরণ' পত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় এই সংগীতটী মহেশ-কাণার রচিত বলিয়া প্রচার করেন; কিন্তু 'বঙ্গবাসীর" প্রকাশিত পুরাতন 'জন্মভূমি' পত্রিকায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া অপর একজন লেখক রাম বসুর রচিত বলিয়া জ্ঞাপন করেন। উভয় লেখকই প্রবন্ধে কোনরূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন নাই। এই দুই প্রকার বিভিন্নমত হইতে আমি শেষোক্ত মতটীই তৎকালে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু 'নব্যভারতে' আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, রমেশ বাবু আমায় একখানি পত্র লিখেন,—"আমি মদীয় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রমুখাৎ ঐ গানটী মহেশ-কাণার বলিয়া অবগত হই। এ কারণ প্রবন্ধে কোনরূপ যুক্তির অবতারণা করি নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেব, কবি মহেশ-কাণার সমবয়স্ক না হউন, সমসাময়িক এবং আমাদের গ্রামের অতি নিকট গ্রামে কবির বাড়ী। মহেশ কাণার সহিত প্রাতস্মরণীয় রামদুলাল সরকারের পুত্র ছাতুবাবুর সৌহৃদ্য ছিল এবং তজ্জন্য তাঁহার বাড়ীতে মহেশ-কাণার যাতায়াত ছিল। পিতৃদেবের পিতৃস্বসা পুত্র (পিস্‌তুতো ভাই) উক্ত বাবুর দেওয়ান ছিলেন, এ কারণ তিনি সর্ব্বদা তথায় যাইতেন। সম্ভবতঃ, পিতৃদেব কবির মুখে ঐ গান শুনিয়া থাকিবেন এবং তজ্জন্য ঐ গান হয়ত তাঁহারই রচিত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।" 'গুপ্ত-রত্নোদ্ধার' গ্রন্থে উক্ত গানটী রাম বসুর রচিত বলিয়া এবং 'কবি-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে মহেশকাণার রচিত বলিয়া উল্লিখিত

হইয়াছে। দুই গ্রন্থের দুই প্রকার মত দেখিয়া, এক্ষণে রমেশ বাবুর উক্তি মানিয়া লইতে আমি ইচ্ছুক। পাঠকগণের মধ্যে এ বিষয়ে কেহ অনুসন্ধান করিয়া কিছু জানাইলে বাধিত হইব। রমেশ বাবু শেষে লিখিয়াছেন,—"পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি বলিয়া যে এখনও আমি ঐ গানটী মহেশ-কাণার বলিয়া বুঝিব, এমন কথা কখনই নয়, কেন না আপনারা যাহা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা কেবল পিতৃ-ভক্তির নজীরে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে রমেশ বাবুর এবিষয়ে কিছুমাত্র গোঁড়ামী নাই। প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে এবং তাহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত না টিকিলেও তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হইবেন না। সত্য প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বড়ই দুঃখের বিষয়, মহেশ-কাণার গান যাহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা বেশি নহে। আবার যে গুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও সব সম্পূর্ণ নহে। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের সুলভ প্রচলন না থাকায়, এই সকল গান লোকের মুখে মুখেই থাকিয়া যাইত। এক্ষণে তৎসমুদয়ের চর্চ্চা না থাকায় এবং ঐ সকল লোকের অভাব বশতঃ, তাহা একরূপ চির-বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

মহেশের বাৎসল্য-রসে বিমণ্ডিত একটী গীতের কিয়দংশ শ্রবণ করুন;—

**পুত্র প্রসবিয়ে যশোদের চিত্তভালস, অবশ,**
**তায় কৃষ্ণের মায়া, নন্দজায়া, তথ্য না জানেন বিষ্যস**
**কোন সখি প্রভাত সময়—**
**বলে ওঠ মা নন্দরাণী, পোহায়েছে রজনী—**
**কোলে তোমার কালো চাঁদের উদয়।**
**হর-পূজি বিল্বদলে, পেয়েছ গোপালে,**
**সে ছেলে এখন উচ্চস্বরে করিছে রোদন;**
**নন্দরাণী এ আনন্দে, কেন হ'লে অচেতন,**
**একবার কর শুভ দরশন।**

যেটুক্ উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই পাঠক কবির গুণপণা দেখিতে পাইবেন।

মহেশ-কাণার খেউড় গানগুলির অধিকাংশই অতিরিক্ত অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তাহার যে কয়টী খেউড় পাওয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা সাধু-সমাজের মনঃপুত হইবে না বোধে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম।

গুণী-সমাজে মহেশ-কাণার কিরূপ আদর ছিল, তাহার একটী উদাহরণ এস্থলে লিখিত হইল। শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"কোন সময় ছাতু বাবুর বাড়ীতে মহা-সমারোহের সহিত সংগীত সংগ্রাম (কবি) হইয়াছিল। সেই আসরে একপক্ষে মহেশচন্দ্র বাঁধনদার ছিলেন। সংগীত-সংগ্রামের সু-সময় উপস্থিত হইলে, মহেশচন্দ্রের অনুপস্থিতি জানিতে পারিয়া ছাতুবাবু তাঁহাকে আনাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু, তাহাতেও কবি মহেশচন্দ্র আসিতেছেন না কেন,জানিবার জন্য ছাতুবাবু স্বয়ং স্বদলবলে মহেশচন্দ্রের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, মহেশচন্দ্র উত্তর করিলেন,—'যাইব কি করিয়া, বাবু! পেটের পীড়ার জন্য সদাই অস্থির! অন্যত্র শৌচ করিতে বড় অসুবিধা বোধ করি, এ কারণ—।' তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ছাতুবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তার জন্য ভাবনা কি, ঘোষজা? আসরে যদি পেটের পীড়া উপস্থিত হয়, আমি তখন স্বয়ং চাদর পাতিয়া ধরিব।' পূর্ব্বে রসজ্ঞ ও গুণজ্ঞ ব্যক্তির কাছে, গুণী বা ওস্তাদদিগের এমনি আদর ছিল।"

মহেশ-কাণা—মধুসিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালার সম-সাময়িক ছিলেন। অনুমান ১২৬৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার অমর-আত্মা অমরধামে প্রস্থান করে।*

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

# ইয়ুরোপ ও এসিয়া

## (ম্যাথু আর্ণল্ডের কবিতা পাঠে।)

"স্বর্গের সীমায় যবে দাঁড়াইয়ে নর
তখনো ধরেণি লক্ষ্য ধরণীর পানে,
সব ক'টী বর্ণ দিয়ে হাতের উপর
কহিলেন প্রভু "লিখ যাহা ইচ্ছা মনে।"
ফিরায়ে ঘুরায়ে নর লিখিলেক "গ্রীশ
রোম ইংলণ্ড ফ্রান্স"—কত গুণপনা
কত নীতি অনুসারে, নাহি যার শেষ ;
মিলিল অক্ষর হ'ল অসংখ্য রচনা!
কিন্তু হায় অনির্ব্বাণ প্রাণের বাসনা
নিরন্তর বলিতেছে "হ'ল না হ'ল না!"
লিখিতে পারেনি তাহা—স্থির নহে মন,—
প্রভুর হৃদয়ে যাহা রয়েছে গোপন।
পর পর কত রাজ্য ঐশ্বর্য্য-শিখর
আরোহিয়া বুঝিয়াছে জীবনান্তকর
এই অনির্বৃতি বহ্নি ; সুবিপুল কায়
চূর্ণ হয়ে মিশিয়াছে ধরার ধূলায়!"

ম্যাথু আর্নল্ড।

নিজের অজ্ঞাতে তুমি করেছ উত্থান
পুরাতন ঋষিদের পথে,
মনীষী বিদেশী কবি, রিক্তভার মেঘের সমান
ঐশ্বর্য্য-বিলাস-মদ রাখিয়া পশ্চাতে
উঠেছে হৃদয় তব স্বাতন্ত্র্যে মহান্
মহতের সনাতন পথে।
চারিদিকে দেশে তব পড়িয়াছে সাড়া।
বন্দুকে কামানে ভল্লে জেগেছে তাহারা ;
তাই দিয়ে করিতেছে সুখ অন্বেষণ
এসিয়ার আফ্রিকার ধূলি-মুষ্টি মাঝে!
বাষ্পীয় খজোতে চড়ি, নভঃ পাতি পাতি করি
দূরবীণ ধরি তারা করিছে দর্শন
জগতের স্রষ্টা কোথা লুকাইয়া আছে! (১)
সমুদ্র পরিখা তব ব্রীটন জননী
বিজ্ঞানের বীরত্বের ঐশ্বর্য্যের খনি।
ক্ষুদ্র যদি, তবু এই জগৎ জুড়িয়া
আপন স্বার্থের জাল রয়েছে পাতিয়া!
ধরায় বসিয়া এই ধরণী বৃহৎ
করিয়াছে করধৃত আমলকীবৎ
এত রূপ এত তেজ ঐশ্বর্য্য গরিমা
তবু যেন কোথা আছে কালান্ত কালিমা!
জানি তাঁর প্রিয়তম সন্তানেরা যত
মনুষ্যত্বে করিয়াছে পরিচ্ছদ মত।
হিম-সমাকুল ওই ক্ষুদ্র দ্বীপ মাঝে
সেই পরিচ্ছদ শুধু তাহাদেরে সাজে!
আছে যেথা মানবের বিপুল নিশ্বাস,
যেথা সমতল-ক্ষেত্র, উদার আকাশ,
অবাধ গগন-তলে সূর্য্য বিরাজিত,
ব্রীটন-সন্তান তথা বড়ই নির্য্যিত!

* মহেশ-কাণার জীবনী সংকলন ব্যপদেশে আমি সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সবিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবি-সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিয়া আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। লেখক।

(১) লাপ্লাস পণ্ডিত ঈশ্বর-বিশ্বাসিগণের প্রতি শ্লেস করিয়া বলিয়াছেন "আমি সর্ব্বোচ্চ শক্তিশীল দূরবীক্ষণের দ্বারা নভোদেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি, কোথাও ঈশ্বরটাকে দেখিতে পাইলাম না।"

তার মাঝে, দাঁড়াইলে কিসে তুলি শির
দেব-যানে হৃদয়েরে তুলিলে সুধীর?
নিঃসঙ্গ একাকী স্থির তারার মতন
অকলঙ্ক রেখে গেলে প্রাণের কিরণ!

কবি, অব মর্ম্মগাঁথা করি অনুধ্যান
হৃদয় ছেয়েছে মর্ত্ত আনন্দ আখ্যান,
স্মরি পূর্ব্ব গুরুদের বিস্মৃত কাহিনী
কতকাল ভ্রমে যাহা ফিরেও চাহি'নি।

মনে পড়ে—আমাদেরি শাস্ত্রে আছে লেখা
তখনো ভবের বিশ্ব দেয় নাই দেখা,
ওইরূপে জিজ্ঞাসিত আদি পুত্রগণ
সমভাবে এক বাক্যে লিখিলা "ব্রহ্মণ"
তুচ্ছ করি ভবখেলা তপোযোগ বলে
পরম কারণ ক্রোড়ে মিশিলা সকলে।

পরে পরে, তাঁহাদেরি পন্থা অনুসারি
লিখিলেন ঋষিগণ শুধু নাম তাঁরি—
জগতের সর্ব্বশাস্ত্রে; লক্ষ্যে থাকি স্থির
সু-কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে—বৈরাগ্যে গভীর
সংসারের সর্ব্বকার্য্যে আত্ম-ত্যাগ যোগে,
লোকহিতে ঐশ্বর্য্যের অনাসক্ত ভোগে,
ক্ষত্রিয়ের রক্তপাতে বৈশ্যের অর্জ্জনে,
দিবা-ভীত শূদ্রদের আঁধার গহনে,
পুণ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে মহা মহীয়ান্
একাগ্রে রাখিয়াছিলা তাঁহারি সন্ধান।

সেই পুণ্যধর্ম্ম, যার বিশ্বোজ্জ্বল জ্যোতি
দেখায়েছে মানবের মহতী নিয়তি;
দেখায়েছে দেব-লোকে উঠিবার পথ;
স্মরণ অতীত কাল সমাজের রথ
ছুটেছিল যার বলে; কুতূহল মন
দেশান্তর হতে আসি পর্য্যটকগণ
সবিস্ময়ে অকুণ্ঠিতে করেছে প্রচার—
ভারতে অজ্ঞাত মিথ্যা চুরী ব্যভিচার!

আজি মোরা হতগর্ব্ব অবনত-শির
অবহেলি ঋষিবাক্য অহঙ্কার বশে;
হারায়েছি সংসারের রাজত্ব মহান্,
হারায়েছি অসীমের সে সূক্ষ্ম সন্ধান
ব্যক্তিগত জীবনেতে; জীর্ণ দেশাচার,
বিকল সমাজগ্লানি শত শত আর
মানুষেরে সমাহিত করিয়া সমূলে
ঢাকিয়াছে পুণ্য-ভূমি বিশ্বের জঙ্গলে!

দয়াময় ঋষিগণ চেয়েছেন কত,
শাস্ত্র-বাক্যে তিরস্কারে, যবে আর নাহি পারে
নব নব মন্ত্রৌষধী করেন প্রেরিত!
শক হুন বলবান বীরদাপী মুসলমান
ধর্ম্ম-মন্ত্রে মলাবলী দিগ্বিজয়ী একতাবন্ধনে
পাঠাইলা ভারত-প্রাঙ্গণে।
সপ্তশতবর্ষ ধরি অর্দ্ধচন্দ্র সার করি
সামে দণ্ডে বীরমাঝে করিলা পেষণ;
তবু ছাড়িল না মহা বিষ সম্মোহন!
জীবনের শেষ চিহ্ন হয়ে অপগত—
দ্বিগুণ আঁধারে গেল ছাড়িয়া ভারত।
তার পরে জাতীয়তা শ্মশান আগারে
সূর্য্যাস্তের দেশ হতে অচিন্ত্য ঘটনাস্রোতে
বণিকের বেশে হল রাজা প্রত্যাগত
ভারতে; অপূর্ব্ব শিক্ষা দীক্ষা লোকাচার
ধর্ম্ম-নীতি রাজ-নীতি করিলা প্রচার!
মহা মোহবিষে যার বক্ষে মহাব্যাধি
ঋষিরা কহেন বিষ তারি মহৌষধী!

ধীরে ধীরে বাহিরিল পেটিকা হইতে
যেই অঘটন কেহ দেখিনি ভারতে
বণিকের পণ্যসহ সাহিত্য মহান্;
দার্শনিক তত্ত্ব সহ বন্দুক কামান;
বিষম সাহস সহ বিলাস ব্যসন
বিশ্ব-সেবাব্রত সহ স্বার্থ অন্বেষণ।

মহা মূঢ়ে, ঋষিবাক্য বিস্মৃত যাহার
বিমোহিল মদিরায় জড় সভ্যতার!
চালায়ে বাষ্পীয় গাড়ী সারা দেশ ভরি
পায়ে চলিবার চেষ্টা দিল বন্ধ করি।

বিচিত্র কৌশল কল করি প্রবর্ত্তন
হাতের সমস্ত ব্যথা করিলা হরণ!
অস্ত্র নিয়ে খেলা ফেলা সব নিবারিয়ে
নিবিড়ে বেড়াতে দিল শান্ত ছেলে হয়ে!
অগ্রাহ্য করিয়ে যত পূর্ব্ব-ইতিহাস
নব-ইতিবৃত্ত কথা করিল প্রকাশ;
পূর্ব্ব ঋষিগণ ভালে অস্থানে অকালে
বিলাতী কালীতে কত কালিমা আঁকিলে!
শিখাইল ঘৃণা যত পিতৃগণ পরে
রাজ-ভক্তি রেখে দিলে শুধু নিজতরে!
ওই ইয়ুরোপ, ধাত্রী জড়-সভ্যতার—
শতছিদ্র পথে যার, বিষ জনমিয়া
চূর্ণ চূর্ণ করেছিল পাষাণ-প্রকার
ঐশ্বর্য্য বীরত্ব ধাত্রী রোম আসিরিয়া
গিরীশ কার্থেজ আদি; কত শত আর
যুগে যুগে কল্পে কল্পে! ধরণী যাহার
ইতিহাস নাহি রাখে ঘৃণায় পুছিয়া!
ধূলিপানে লক্ষ্য ছিল পরামর্শ যার
ধূলিতে মিশায়ে গেছে ফুটিয়া টুটিয়া!
তার রক্ত-বীর্য্য হতে লভিয়া জনম
ইয়ুরোপে যত রাজ্য উঠেছে কাঁপিয়া!
অনির্ব্বাণ বহ্নিখনি ওই ইয়ুরোপ—
বন্দুক আগুনে, তার চিরসঙ্গী ধূমে
বিকট আলোক পূর্ণ—কিংবা অন্ধকারে!
রেলপথ টেলিগ্রাফ কামান অমিত দাপ—
আছে বটে তাহাদের ক্ষমতা নিশ্চয়
তাই দিয়ে আমাদেরে করেছে বিজয়—
ক্ষণিক বুদ্বুদ এই কালাসিন্ধু নীরে
হৃদয় উহার শূন্য আত্ম-দ্রোহী বায়ু পূর্ণ
ওরিমত গেছে কত কাটিয়া আঁধারে!
ইয়ুরোপ এসিয়ার বিষ-রসায়ন,
ততোধিক ভারতের; তারি পদতলে
শিখিতেছি অভিনব জাতীয়-জীবন,
নাহি জানি হবে শিক্ষা সাঙ্গ কতকালে।

বিষম ব্যয়িনী শিক্ষা—শিক্ষা প্রাণপণে
সঙ্গীনের ঘায়ে আর বুটের দলনে
ঘৃণা তাচ্ছিল্যের মাঝে তীব্র-তিরস্কারে,
অনশনে, বিবসনে কঙ্কাল শরীরে!
তবু সে, অনিচ্ছাকৃত পুণ্যকর্ম্ম লাগি
ভারতের অন্তরঙ্গ সাধুবাদ ভাগী।
দিব সেই সাধুবাদ; রাখিব ধারণা
—ইউরোপ তব মন্ত্রে আর ভুলিব না!
আমাদের ঋষিগণ চেয়েছেন ফিরে
তাঁদের মঙ্গল ইচ্ছা ছুটেছে জাগিয়া
এ ভারতে; দিকে দিকে পূর্ব্বাসার দ্বারে
নবীন ঊষার আলো উঠেছে ভাসিয়া!
জয় জয় নব-রশ্মি, আশা এসিয়ার
সু-কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জনম যাহার!
আত্মত্যাগ ক্ষাত্র-মন্ত্র যাহার ইন্ধন
দীপিছে—অর্দ্ধেক বিশ্ব-জ্যোতি সুমোহন!
ওই জ্যোতি ধরেছিলা পূর্ব্ব পিতৃগণ
বৈদিক ঊষার মন্ত্রে করি উদ্বোধন
হৃদয়-বেদীর পরে, রিপু দিয়ে বলি,
সাত্বিক ঋষিরা তাহা রেখেছিল জ্বালি,
সেই জ্যোতি প্রসারিয়া জাতীয় শরীর
করেছিল পূত দীপ্ত অধৃষ্ঠ সুস্থির!
আপনাতে জাগিতেছে ভারত-সন্তান
দেখিতেছে শক্তি কোথা; কোথা হতে স্ফুরে
মানবের আদি-অন্ত করি অনুধ্যান!
সূর্য্যাস্ত দেশের জ্ঞান গেছে কত দূরে?
কি শিখাবে ইউরোপ! জড়ের বিজ্ঞান!
কি কৌশলে লক্ষ নর বধিবে নিমেষে
পাঁচ বৎসরের শিক্ষা—তুচ্ছ সমাধাণ;
শতাব্দী কাটালে যার অর্জ্জন উল্লাসে।
এত করি, হইলে না তিল অগ্রসর
মনুষ্যত্ব পথে,—যার সাম্রাজ্য অক্ষর।
প্রতিপলে করি তারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর
নির্ম্মম পাষাণে হর্ম্ম্য রচিলে বিস্তর!

কতক্ষণ আয়ু! নাহি জাগে যতক্ষণ
ঘূর্ণীবায়ু; তলদেশে নহে ভূকম্পন;
ব্যোমকেশ নেত্রে নাহি ছুটে বজ্রানল;
সমুদ্র না মেলে তার রসনা চঞ্চল!
কি শিখাবে! এতকাল শিখেছি বিস্তর
বুঝিয়াছে আমাদের বুকের পঞ্জর;
বুঝিয়াছি ইয়ুরোপ, সভ্যতা বিজ্ঞান
করে দেয় মনে সুখে কত ব্যবধান;
বুঝিয়াছি ধর্ম্ম শুধু তোমাদের মুখে
স্থাপিয়াছ এত গীর্জ্জা ভারতের বুকে
কেন বৃথা? ধর্ম্ম নহে—ঐশ্বর্য্য বাখান;
কথায় ভোলে না যারা ঋষির সন্তান!
দেখিতেছি পুনরায় এই পুণ্য-ভূমি
জ্ঞান বীর্য্য মহত্বের হবে ধাতৃভূমি!

লোকান্তর হতে নিয়ে প্রতিভার ভার
আসিছে উন্নত জীব ভারতে আবার!
জাগিছে ভারত! যেই সকলের আগে
এ ধরার ধরেছিল উষালোক রাগে!
জাগিছে ভারত, ধীরে কাটিছে আঁধার;
আলোকের দূতগণ করিছে সঞ্চার
পূর্ব্বগগণ বরণীয় উষার আলোক
কবি-কণ্ঠে বাহিরিছে অমৃতের শ্লোক!
কোন্ জাতি পড়ে আছে পর-পদতলে
মনের দাসত্ব যার দূরে গেছে চলে!
ইচ্ছায় পলকে ছিঁড়ে বন্ধন শৃঙ্খল;
সৃষ্টিময় বিকশিত এ নীতি কেবল।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

# উপনিষদের উপদেশ। (২৩)

## জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

বিদেহ-রাজ জনক একদিন সিংহাসনে সমুপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তৎকালে ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহারাজ জনকও, ধন-জন-রাজ্য-সমৃদ্ধি-পরিবৃত হইয়াও, একজন নির্লিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া তৎকালে ভারতবর্ষে প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহারাজ জনকের, যাজ্ঞবল্ক্যই প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ইঁহারই সাহচর্য্য ও উপদেশ-বলে, রাজা জনক তাদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যকে সমুপস্থিত দেখিয়া, মহারাজ জনক সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উঠিয়া অতি আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে উভয়ের মধ্যে ব্রহ্ম-বিষয়ক কথোপকথন হইতে লাগিল।

যাজ্ঞবল্ক্য সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজন্! কোন আচার্য্যের নিকট হইতে আপনি অবশ্যই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ পাইয়া থাকিবেন। কিরূপ উপদেশ লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।"

জনক বলিতে লাগিলেন:—"শিলিন-পুত্র মহাত্মা জিত্বা নামক মদীয় উপদেষ্টা, আমায় একদিন বলিয়া দিয়াছিলেন যে,—বাক্যই ব্রহ্ম। যে পুরুষ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, সে পুরুষ ত পশু-তুল্য। বাক্যই আত্মার একটী প্রকৃষ্ট চিহ্ন; সুতরাং বাক্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! জিত্বা যে বাক্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে আপনায় উপদেশ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই বাক্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ আশ্রয়ের বিষয়েও উপদেশ দিয়া থাকিবেন। বলুন ত,

এই বাক্যের স্থূল আশ্রয়ই বা কি, এবং সূক্ষ্ম আশ্রয়ই বা কিরূপ ?" মহারাজা জনক বলিলেন যে তিনি আশ্রয় বিষয়ে কোনরূপ উপদেশ পান নাই। এবং যাজ্ঞবল্ক্যকেই তিনি এই আশ্রয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"মহারাজ! গুণ বা উপাধিভেদে—বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মের ভেদ হইলেও, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই; ইনি নিয়ত একরূপ। বাক্যের দেবতা, অগ্নি। আধ্যাত্মিক-রাজ্যে, ব্যষ্টিভাবে, যাহাকে বাক্‌শক্তি বলা যায়; আধিদৈবিক-রাজ্যে, সমষ্টিভাবে তাহাই অগ্নি-শক্তি নামে অভিহিত। বাগিন্দ্রিয়ই এই বাক্যের আশ্রয়; আকাশ এই বাক্যের (অগ্নির) প্রতিষ্ঠা। এই বাক্‌শক্তিকে "প্রজ্ঞা"রূপে, অর্থাৎ এক জ্ঞানেরই অবস্থাভেদরূপে, উপাসনা করা কর্ত্তব্য।" রাজা জনক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! আপনি কাহাকে "প্রজ্ঞা" বলেন ? এবং বাক্য কিরূপে প্রজ্ঞা হইতে পারে ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মহারাজ! এই বাক্যই প্রজ্ঞা। মহারাজ! বাক্য-দ্বারাই আমরা বন্ধুকে জানিতে পারি। ঋগ্বেদাদি বেদ-গ্রন্থনিচয়, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র এই বাক্য দ্বারাই জানিতে পারা যায়। যজ্ঞ, হোম, অন্নদান ও পানীয় প্রদানাদি-জনিত ধর্ম্মসকল, এই বাক্যদ্বারাই লাভ করিতে পারা যায়। অতএব, এই বাক্যই জ্ঞানস্বরূপ, এই বাক্যই ব্রহ্ম। যিনি এই বাক্যকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনি দেহত্যাগের পর, দেবলোকে দেবপদবী লাভ করিতে সমর্থ হন।" জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া অতীব প্রীত হইয়া, তাঁহাকে বড় বড় এক হাজার গাভী দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ না দিয়া, আমি কিছুই গ্রহণ করিব না।"

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আর কোন্ আচার্য্য আপনাকে কিরূপ উপদেশ দিয়াছেন ?" রাজা বলিলেন,—"শূল্ব-পুত্র মহাত্মা উদঙ্ক, আমায় বলিয়াছিলেন যে,—প্রাণই ব্রহ্ম; কেননা, প্রাণ-শূন্য পুরুষ, পুরুষই নহে। প্রাণ বা ক্রিয়া-শক্তিই আত্মার একটী প্রকৃষ্ট চিহ্ন বা পরিচায়ক; সুতরাং প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! এই প্রাণ-ব্রহ্মের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত আছেন কি ?" জনক বলিলেন,—আশ্রয় বিষয়ে তিনি কোন উপদেশ পান নাই; এবং রাজা, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটেই প্রাণের আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেনঃ—"মহারাজ! গুণ বা উপাধিভেদে—বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মের ভেদ হইলেও, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই; ইনি নিয়ত একরূপ। প্রাণের দেবতা, বায়ু। আধ্যাত্মিকরাজ্যে, ব্যষ্টিভাবে যাহাকে প্রাণ-শক্তি বলা যায়, আধিদৈবিক-রাজ্যে, সমষ্টিভাবে, তাহাই বায়ু-শক্তি নামে অভিহিত। প্রাণেন্দ্রিয়ই এই প্রাণের আশ্রয়; আকাশ এই প্রাণের (বায়ুর) প্রতিষ্ঠা। এই প্রাণশক্তিকে "প্রিয়" বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ, দেহের ক্রিয়াশক্তির নামই প্রাণ। প্রিয় না হইলে, সুখ না পাইলে, কেহই কোন ক্রিয়া করিত না। মহারাজ! প্রাণ সকলেরই অতি প্রিয়-বস্তু। এই প্রাণেরই প্রয়োজনার্থ, লোকে ক্রিয়া করিয়া

থাকে। এই প্রাণের উদ্দেশ্যেই, লোকে কত অকার্য্যও সাধন করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র চৌরাদির ভয় থাকিলেও, এই প্রাণের সুখার্থই, লোকে তাদৃশ প্রদেশেও গমনাদি করিয়া থাকে। অতএব, প্রাণকে প্রিয় বলিয়া জানিবেন; এবং প্রিয় বলিয়া ইহার উপাসনা করিবেন। এই প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি এই প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি দেহ-ত্যাগের পর, দেবলোকে, দেবপদবী লাভ করিতে সমর্থ হন।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে সহস্র গো দান করিতে চাহিলেন; কিন্তু, ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ না দিয়া, তিনি দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ আর কোন্ আচার্য্যের নিকট হইতে আপনি কিরূপ উপদেশ পাইয়াছেন?" রাজা বলিলেন,—"বৃষ্ণ-পুত্র মহাত্মা বর্কু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, চক্ষুই ব্রহ্ম। দর্শন-শক্তি আত্মার একটী প্রধান পরিচায়ক-চিহ্ন; সুতরাং, চক্ষুকেই ব্রহ্মশক্তি বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! এই চক্ষুর আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠার কথা জানেন কি?" রাজা বলিলেন, "আপনিই আমাকে আশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করুন, আমি তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ কাহারও নিকটে শুনি নাই।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! গুণ বা উপাধিভেদে—বিকাশের তারতম্য অনুসারে—ব্রহ্মের ভেদ স্বীকৃত হইলেও, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। ইনি নিয়ত একরূপ। চক্ষুর দেবতা, সূর্য্য। আধ্যাত্মিকরাজ্যে, ব্যষ্টিভাবে, যাহা চক্ষু-রূপে অবস্থিত, তাহাই আধিদৈবিকরাজ্যে, সমষ্টি-ভাবে, সূর্য্য-রূপে অভিহিত। শরীরের চক্ষুরিন্দ্রিয়ই, এই চক্ষুর আশ্রয়; আকাশ এই চক্ষুর (সূর্য্যের) প্রতিষ্ঠা। "সত্য" বলিয়া, এই চক্ষুঃশক্তির উপাসনা করা কর্ত্তব্য।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! আপনি কাহাকে "সত্য" বলেন? এবং চক্ষুই বা কিরূপে সত্য হইতে পারে?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—"মহারাজ! কোন ব্যক্তি যখন চক্ষু দ্বারা কোন পদার্থ দর্শন করে, তখন সে পদার্থকে সে সত্য বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং, চক্ষুকেই সত্য বলা যাইতে পারে। এই চক্ষুই ব্রহ্ম। যিনি এই চক্ষুকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি দেহান্তে, দেবলোকে দেবপদবী লাভ করিতে সক্ষম হন।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে জনক সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সহস্র গো দান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু, ব্রহ্ম-বিদ্যার সম্যক্ উপদেশ না দিয়া, তিনি দান-গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! আর কোন আচার্য্য কি এ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন নাই?" রাজা বলিলেন,—"ভরদ্বাজ-বংশোৎপন্ন, গর্দ্দভীবিপীত নামক মহাত্মা একদিন আমায় বলিয়াছিলেন যে, শ্রবণ-শক্তিই ব্রহ্ম-পদার্থ। শ্রবণশক্তি আত্মার একটী বিশেষ পরিচায়ক শক্তি, সুতরাং শ্রবণ-শক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি বোধ হয় এই শ্রবণ-শক্তির আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা কে, তদ্বিষয়ে উপদেশ পান নাই। মহারাজ! গুণ বা উপাধির ভেদেই ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ নাই; তিনি নিয়ত একরূপ। দিক্‌ই, এই শ্রোত্রের দেবতা। আধ্যাত্মিক ভাবে, ব্যষ্টিরূপে, যাহাকে শ্রবণ-

শক্তি বলা যায়, তাহাই আধিদৈবিকরূপে, সমষ্টিভাবে, দিক্ (space) নামে অভিহিত। আধ্যাত্মিক শ্রোত্রের শ্রবণেন্দ্রিয়ই আশ্রয়স্থল এবং আধিদৈবিক শ্রোত্রের (দিক্ সকলের) আকাশই প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র। এই শ্রোত্র-শক্তিকে "অনন্ত" বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যে দিকেই গমন করুন্ না কেন, তাহার সীমা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। অতএব, এই দিক্ই শ্রোত্র-শক্তি; এবং এই শ্রোত্র-শক্তিই ব্রহ্মপদার্থ। যে সাধক ইহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি দেহত্যাগের পর, দেবলোকে নীত হন ও দেবপদবী লাভ করিয়া থাকেন।" মহারাজ জনক এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া প্রীত হইলেন ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সহস্র গো দিতে চাহিলেন; কিন্তু, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্ম-বিদ্যার সম্যক্ উপদেশ না দিয়া, তাহা লইলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনি আর কাহার নিকটে কোন উপদেশ পাইয়া থাকিলে, তাহা আমাকে বলুন্।" রাজা বলিলেন,—"জবালার পুত্র সত্যকাম আমাকে বলিয়াছিলেন যে মনই ব্রহ্ম। কেন না, মন-শূন্য পুরুষ, পুরুষই নহে। মনঃশক্তি আত্মার একটী প্রধান ও মুখ্য পরিচায়ক।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"আচ্ছা, মহারাজ! এই মনঃশক্তির আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা কে, তাহা জানেন ত?" রাজা জনক তাহা জানিতেন না বুঝিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! ব্রহ্ম-পদার্থ স্বরূপতঃ ভেদ-শূন্য। কেবল গুণ বা উপাধির ভেদ—বিকাশের তারতম্যানুসারে—ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত হয়। বস্তুতঃ, ব্রহ্ম নিয়ত একরূপ। চন্দ্রমাই সেই মনের দেবতা। যাহা আধ্যাত্মিক ভাবে, ব্যষ্টিরূপে, মন বলিয়া কথিত, তাহাই, আধিদৈবিক ভাবে, সমষ্টিরূপে, চন্দ্রমা-নামে পরিচিত। অন্তঃকরণই মনের আশ্রয় এবং আকাশ চন্দ্রের আশ্রয়। এই মনঃশক্তিকে "আনন্দ" বলিয়া উপাসনা করা বিধেয়। কেননা, মনের দ্বারাই লোকে সুন্দরী ও সৎশীলা পত্নী-লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং আত্মানুরূপ প্রিয় পুত্র-লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। অতএব, এই আনন্দময় মনঃশক্তিই ব্রহ্ম। যিনি এই মনকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনি দেহান্তে, দেবলোকে দেবপদবী লাভ করিতে সমর্থ হন।" বিদেহ রাজ, যাজ্ঞবল্ক্যকে সহস্র গো পুরস্কার দিতে চাহিলেন; কিন্তু, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার সম্যক্ উপদেশ না দিয়া তাহা লইলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য, রাজাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কে আপনাকে উপদেশ দিয়াছেন? আমি সেই উপদেশের মর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি।" রাজা বলিলেন যে, একদিন, শাকল্যবংশোৎপন্ন মাহাত্মা বিদগ্ধ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হৃদয় বা বুদ্ধিই ব্রহ্ম; কেননা বুদ্ধিশক্তিবিহীন পুরুষ পশুতুল্য। যাজ্ঞবল্ক্য রাজাকে এই বুদ্ধির আশ্রয় কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন যে, রাজা তৎসম্বন্ধে কিছুই জানেন না, কাজেই তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন যে,—"মহারাজ! উপাধির ভেদবশতঃ—বিকাশের তারতম্য অনুসারেই—ব্রহ্মে ভেদ কল্পিত হয়; স্বরূপতঃ তিনি নিয়ত একরূপ; তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই। হৃদয়ই এই বুদ্ধির আশ্রয়-স্থল। এই বুদ্ধিকে "স্থিতি" বা "আয়তন" বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কেননা, হৃদয়ই সকল ভূতের আশ্রয়স্থল,—হৃদয়ই নাম-রূপ-কর্ম্মের আশ্রয়-ক্ষেত্র। সকলের আধার-ভূত এই হৃদয়-শক্তি, মুখ্য-ব্রহ্ম। যিনি এই হৃদয়-

ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি মরণান্তে দেব-পদবী লাভ করেন। জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে এই এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে, সাধক ক্রমে উপাধির অতীত ব্রহ্ম-পদার্থের ধারণার যোগ্য হন।" মহারাজ জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ গুলি হৃদয়ে অনুভব করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। সহস্র গো দান করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতেছেন দেখিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

"মহারাজ! এখনও ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে উপদেশ সম্পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং, এখনও আমি আপনার দানগ্রহণ করিতে পারিনা। যে সকল কথার উপদেশ পাইলেন, এখন তাহাই বিশেষরূপে চিন্তা ও অনুধাবন করুন্। পুনরায় প্রদোষ-সময়ে আমি আপনাকে এই ব্রহ্ম-বিষয়ে অন্যান্য তত্ত্ব বলিয়া দিব।"— ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্-এ।

# ভণ্ডামী।

১। আদুরে কুকুর যেমন, সোহাগের ঝোঁকে, আদরের গরবে, মুনিবের পা বহিয়া, একেবারে বুকে ঝাঁপিয়া উঠিতে চায়, আবার ধমক্ খাইয়া, ধরাতলে, ধূলিতলে, প্রভুর পদতলে, মনের সাধে গড়াগড়ি দিয়া, কৌক্কুরিক প্রেমের পরিতৃপ্তি করিয়া লয়, আমরা তেমনি, আমাদের যৎসামান্য প্রেমের গরবে, সম্পূর্ণ প্রেমিক স্বয়ং ভগবানকে বক্ষে ধরিবার আকাঙ্ক্ষায় একেবারে আকাশে উঠিতে উদ্যত হই, একেবারে অত্যুচ্চ ভক্তির, অত্যুচ্চ ভাবের, বাহ্যজ্ঞানশূন্য অত্যুচ্চদশা সমাধির অনুকরণ মাত্র করিতে যাই; পরে, প্রেম-পরীক্ষায় বারম্বার পরাজিত, ধূলিতলপাতিত, ধরাতলশায়ী হইয়া, সংসার-পঙ্ক-প্রলিপ্ত কলেবরে, করি কেবল কুক্কুর কোলাহল, গর্ব্ব ক্রোধ কর্কশিত—করি কেবল কুক্কুর কোলাহল; হায়! কোথায় রামকৃষ্ণের অকলঙ্ক দেহ-দ্যুতি, কোথায় সেই হর্ষোজ্জ্বল জীবন-জ্যোতিঃ, আর কোথায় আমার কামিনী-কাঞ্চন-পঙ্ক-প্রলেপ প্রলিপ্তাঙ্গপ্রত্যঙ্গ! দেখ কুকুর, ভালবেসে মুনিব তোমায় সাবান্ মাখাইয়া, পবিত্র সলিলে বলপূর্ব্বক স্নান করাইয়া, সাধু সজ্জনের মধ্যে রাখিয়া দিলেও, তোমার ধূলি কর্দ্দম মাখিবার প্রবৃত্তি যাবে কোথায়? জানতো কুকুর! ও ঝোঁক্ তোমার কিছুতেই যাবার নয়, তুমি কেবল প্রহার, তিরস্কার, তাড়নায় মাত্র ঠিক থাক; স্বেচ্ছায় নয়। স্বেচ্ছায় তুমি ম্লেচ্ছ, মলমালিন্যকলঙ্কাসক্ত। সুবিধা পাইলেই তোমার বিষ্ঠা-ভক্ষণ, ধূলায় লুণ্ঠন, ধূলায় স্নান, ধূলায় অবগাহন।

শুন কুকুর! শ্রীমতীর নারায়ণ লিপ্সা-লালসা সামান্য লোভ নহে; উহা সাধারণের দুর্ল্লভ অসামান্য আকাঙ্ক্ষা। উহা শত সহস্র জন্মজন্মার্জ্জিত চিরসঞ্চিত সাত্বিকতার ফল, সতী সীতার উপভোগ্য অমেয় আনন্দ; অন্যের উহা অত্যদ্ভুত দুরকাঙ্ক্ষা। তাই বলি, ওহে ভাই ভক্তপিটেল! দণ্ডে দণ্ডে তুমি যে দশায় নেশায় ভূমি-শয্যায় অজ্ঞান হইয়া পড়, "জগদেব হরিঃ, হরিরেব জগৎ" বলিয়া চীৎকার কর, উহা তোমার ভণ্ডামী মাত্র। সংসারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দুরাকাঙ্ক্ষার প্রাদুর্ভাবেই ভণ্ডামীর প্রাদুর্ভাব, এবং ভণ্ডামীই সকল অনর্থের মূল।

যাহা কিছু তোমার সরলতা, সরসতা,

মধুরতা বা দৌগ্ধমাধুর্য্য স্বাভাবিক, তাহাও উহার টকে টকিয়া, পচিয়া, জঘন্য দুর্গন্ধে পরিণত হইয়া, নর্দ্দমার নরকে ফেলিবার উপযুক্ত হইয়া পড়ে!!

২। সাংসারিক বিষয়ে সন্তোষ যেমন সর্ব্বসুখদ, ধর্ম্মেও সন্তোষ ঠিক তাই। আমি অমন সাধু, আমি অমন ত্যাগী, আমি অমন যোগী কেন না হইতে পারিব, হবোই হবো,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা উপকারী এবং উপাদেয় বটে। কিন্তু, যথাসাধ্য চেষ্টায় ঐরূপ কোন কিছুই না হইতে পারিয়া, শুদ্ধ বড়-মানুষীর-ভড়ং করা যে অত্যন্ত অপকারী; উহা করিয়াইতো লোকে দেউলিয়ায় পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। আজীবন চেষ্টায়, আম্‌ড়া কি কখন ডালিম্—ডালিম্ ও কি কখন বেদানা হইয়া উঠিতে পারে? তা হয় না। না হোক্, নেই, নেই। আমি আমড়া, সংসারে আমারও তো কিছু প্রয়োজন দেখিতে পাই। আমিও তো তোমাদের সেই সৃষ্টি-কর্ত্তার অভ্রান্ত-বুদ্ধির আর এক প্রকার সৃষ্টি; তবে বেদানা নই বলিয়া আমি এত কুণ্ঠিত, লজ্জিত হই কেন? স্বধর্ম্ম পালন করিতে—আমড়ার জীবন স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে,—আমড়ার লীলা সোল্লাসে সম্ভোগ করিয়া যাইতে, আমার এত লজ্জা কেন?—ভড়ং ভণ্ডামী কপটতা যে আমার না করিলেই নয়, এবং ভড়ং ভণ্ডামী—মিথ্যা বড়-মানুষী, করিয়া সর্ব্বস্বান্ত না হইলেই নয়?

কোন সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী না হইতে পারিলাম, নেই, নেই; আমার তাতে দোষ কি, ভাই! লজ্জা কি ভাই যে ভড়ং-ভণ্ডামী-কপটতায় অভাব-গোপন করা চাইই, চাই? যাহা আমার মধ্যেই নাই, যাহা আমার ইহজন্মের অসম্ভব সুখ, বহুজন্মেরও অসাধ্য-সাধন, তাহার অভাবে অপমান বোধ করাইতো নিতান্ত অপকারিণী ভ্রান্তি।

৩। সাধু সন্ন্যাসীর স্থানতো অত্যুচ্চ হইতেও অত্যুচ্চতর পদ। ঐ পদারূঢ় হইতে না পারায় লজ্জাবোধ অনেকেরই না হইতে পারে। কিন্তু, কোন বন্ধু বা প্রতিবেশীর,—কোন ভাই বা ভগ্নীর অপেক্ষা কোন আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ক্ষুদ্র বা অধম হইয়া রহিতে প্রায় অনেকেরই মন যে কোন ক্রমেই সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। অতএব, যথাসাধ্য চেষ্টায় ভাই বন্ধু প্রতিবেশীর ন্যায় উন্নত হইতে না পারিয়াই, ভড়ং ভণ্ডামীর এত প্রকার প্রয়োজন। প্রয়োজনটা কিন্তু সুবোধ বিনীতাত্মার নয়,—প্রয়োজন, নির্ব্বোধ গর্ব্বিতের। যথেষ্ট চেষ্টায় পরীক্ষায় অদ্বিতীয় হইতে না পারিলাম, নাই, নাই। ক্ষমতার অপ্রতুলতায়, কি প্রকৃতির ক্ষুদ্রতায়, ক্ষুদ্রভাবে দিন যাপন করিতে লজ্জা কি আমার যে, লজ্জায়, অভাব-গোপন করিবার জন্য, ভড়ং ভণ্ডামীর আশ্রয় লওয়াই আমার এতই শ্রেয়ঃ? এই মিছা লজ্জাইতো যত অনর্থের মূল। ইহারই কুশিক্ষায় জগতে এত ভণ্ড-বিদ্বান, ভণ্ড-পণ্ডিত, ভণ্ড-বীর, ভণ্ড সাহসী, ভণ্ড-দয়ালু, ভণ্ড-দেশহিতৈষীর আবির্ভাব—সংসারে এত মৌখিক মিত্র, মৌখিক ভাই, মৌখিক ভগ্নী, মৌখিক আত্মীয়ের উৎপত্তি ও উৎপাত। প্রকৃতির দোষে, যদি ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা ঠিক খাঁটি অর্থাৎ একেবারে দ্বেষ হিংসাশূন্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া বুঝ,—ভগ্নীর প্রতি ভগ্নীর অসূয়া অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ কর,—মৌখিক স্নেহ, মৌখিক আত্মীয়তার অপেক্ষা,—জঘন্য অসরলতার অপেক্ষা,—স্পষ্টরূপে, শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে, গুপ্ত-ঈর্ষা ব্যক্ত করাই ভাল। উহাতে আত্মার অমঙ্গল নাই।

স্বভাবের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়া পারিবারিক সম্ভ্রম কিছু নষ্ট হয় মাত্র; কিন্তু, স্বভাব সঙ্গোপনের অপেক্ষা, স্বভাব ব্যক্ত করায় অনেক উপকার। ইহাতে এক কালেই সরলতার সমাদর, প্রবঞ্চনার অনাদর, আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্রে বিশ্বাস, আস্থা, আশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে। এই বিশ্বাস, এই আস্থা এই আশ্বাসের ক্ষুণ্ণতা হইতেই অসন্তোষ; অসন্তোষ হইতেই স্বভাব সঙ্গোপনের ইচ্ছা বা ভণ্ডামীর উৎপত্তি, এবং ভণ্ডামীই বিধাতার সৃষ্টি-কৌশল ও সৃষ্টি-সজ্জার অপ্রকাশ্য নিন্দা। নিন্দা এই যে, অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টি মধ্যে, আমড়া কোন কর্ম্মেরই নয়; উহা অনাবশ্যক সৃষ্টি; অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, যাহার বিলোপে সৃষ্টি-পারিপাট্যের কিছুই অভাব বোধ হওয়া উচিত নয়।

৪। একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভুল ধরে কে, কার সাধ্য? আকাশের উপর আকাশ, তাহার উপর আকাশ, এইরূপ সপ্ত আকাশের অপেক্ষা উচ্চ দেবতারাও যাঁহার কাছে বামন, বালকের ন্যায় নির্ব্বোধ, তাঁদেরও কর্ম্ম নয়; কীটানুকীট মানুষেরতো নয়ই। মানুষের কাজ তাঁর বিলীব্যবস্থানুযায়ী জীবন যাপন, স্বধর্ম্মপালন, সন্তুষ্ট মনে, আমড়া হইয়া, আমড়ার ন্যায়, আমড়ায় জীবন সমুত্থাপন। আবার, এই স্বধর্ম্মপালনের স্থূল-সূক্ষ্মাদি কয়েকটী প্রকার-ভেদও আছে, স্বদেশ সম্বন্ধীয় স্বধর্ম্ম অনেকটা স্থূল বা বহুজন ব্যাপ্ত স্বধর্ম্ম; স্বজাতিগত স্বধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ; স্ববংশগত স্বধর্ম্ম আরো সূক্ষ্ম এবং আরো সঙ্কীর্ণ; ব্যক্তিগত বা স্বপ্রকৃতিগত স্বধর্ম্ম সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ও দুষ্পালনীয়—এতই সূক্ষ্ম যে কোন কিছু স্বধর্ম্ম কাহাতে আছে, কিন্তু নাই বলিয়া তাঁর নিজেরই সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং কোন কিছু স্বধর্ম্ম কাহাতে নাই, কিন্তু আছে বলিয়া তাঁর নিজেরই ভ্রম হইয়া যায়। আর এই দুষ্পালনীয়ের যে শুদ্ধ স্বদেশী, স্বজাতি, স্ববংশীয়েরা নন্, পিতা ভ্রাতা, পরমাত্মীয়েরা পর্য্যন্ত এইরূপ স্বধর্ম্মীর শত্রু হইয়া উঠেন। সাধারণলোকের স্বধর্ম্ম জাতি-কুলগত স্বধর্ম্ম, কেবল এক আধ জনের স্বধর্ম্ম জাতিকুল ছাড়া। নিজ প্রকৃত্যনুযায়ী স্বধর্ম্ম, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের। জাত্যনুযায়ী স্বধর্ম্ম, রাক্ষসের সধর্ম্ম। কৌলিক সধর্ম্ম আত্মপূজক, আত্মোপাসক বা আত্মশ্লাঘীর স্বধর্ম্ম। তাই প্রহ্লাদ, স্বপ্রকৃত্যনুরূপ স্বধর্ম্মপালনার্থ, পিতাকে পর্য্যন্ত ঘোর বিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছিলেন, জাতি, কুটুম্ব অপর অনেকের বৈরিতাতো অবশ্যম্ভাবী ও স্বভাবিক। কিন্তু, প্রহ্লাদ কোন্ দেশ কয়জন। আর কয়জনই বা এমন সানন্দে, সাহ্লাদে, বিপদকে বাহন করিয়া, বিপদের পৃষ্ঠে চড়িয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছেন? সেই কয়লার খনির সমুজ্জ্বল সুদুর্লভ মণি, সেই অসংখ্যের মধ্যে মাত্র এক; অনন্য ও অদ্বিতীয়, সেই আপন্নের আশ্বাস, যেন আপদেরও সম্পদ। সেই অসামান্য প্রহ্লাদের যৎসামান্য অনুকরণও অনেকের দুঃসাধ্য। বহু বিস্তর চেষ্টায় বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়াও যদি কেহ ঐরূপ বা অন্য কোন প্রকার অসম্ভব অনুকরণে বা অসাধ্য সাধনে, শুদ্ধ রাজার সম্ভ্রমের জন্য, লাগিয়া থাকিতে চান্, তাহা হইলেই তাঁর নিরন্তর ভণ্ডামীর নিতান্ত প্রয়োজন।

৫। ভণ্ডামী, জুয়াচুরী দুইই একজাতীয় দোষ হইলেও, সমাজে এটার যতটা নিন্দা, ওটার ততটা নয়। কারণ, এটার অতি নীচ লক্ষ্য,—ঠকাইয়া টাকা কড়ি সংগ্রহ; ওটার অপেক্ষাকৃত উচ্চ লক্ষ্য,—ঠকাইয়া শুদ্ধ মান

সম্ভ্রম সংগ্রহ। তথাপি, সাধু-সজ্জনের চক্ষে দুইই সমান হেয়। ভণ্ডামী দ্বিবিধ,—ধর্ম্মীয় ও সাংসারিকভণ্ডামী; সাংসারিক ভণ্ডামী আবারত্রিবিধ —রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক; বঙ্গীয় রাজনীতিই রাজনৈতিক ভণ্ডামীর আদর্শ; স্বদেশী বিদেশী উভয় ভাবাপন্ন বিকৃত-বঙ্গীয় সমাজই সামাজিক ভণ্ডামীর নিদর্শন—ঘরে ঘরে টাঙ্গান ইহার ছবি, স্বল্প লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর পরিবার মধ্যে খাঁটি দয়া স্নেহের অভাবে, উহার ভাণই পারিবারিক ভণ্ডামী। পরিবারের ভিতরেই ইহার অবস্থান, এবং পরিবার ছাড়া অপর কাহাকে ইহার উৎপাত সহ্য করিতে হয় না বলিয়া, ইহার নিন্দা পরিবার মধ্যেই আলোচিত হইয়া থাকে, বাড়ীর বাহিরে বড় জাহির হইয়া পড়িতে পায় না। দৈবাৎ কখন বিধবা ননদিনীর বেশে, বিধবার গাম্ভীর্য্যে, আধ-ঘোমটা টানিয়া, গভীর গম্ভীর মধ্যাহ্নে, পল্লীর পরিচিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। দয়া, প্রেম, প্রণয় ঘটিত পারিবারিক সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য, পারিবারিক ভণ্ডামীর প্রয়োজন; ইহারই বলে, আমরা বাড়ীর লোকের কাছে কতকটা স্বার্থত্যাগী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকি,—ইহারই চতুরতায় আমরা নিঃস্বার্থ শ্বশুর, নির্লোভ জামাতা, নিষ্কামা পত্নী, নিরসূয়া ভগ্নী, নির্দ্বেষ ভ্রাতা, নির্ব্বাক নিরীহ ভৃত্য, নির্ধন নির্জ্জীব নির্ব্বিরোধ দায়াদ, নির্ব্বোধ বালক-ধনীর নিঃস্পৃহ নিরামিষাশী গৈরিকবেশী ভগিনী পতি-অভিভাবক, নিত্য নিরন্তরস্থায়ী নিতান্ত অনুগত সহচর বা মো-সাহেব সাজিয়া, সুযোগ সুবিধা, সুক্ষণের অপেক্ষায়, কপট সন্তোষে দিনযাপন করিতে পারি।

৬। কি সর্ব্বনাশ! তাহলেতো দেখ্‌ছি এই ভণ্ড-জীবনের ভণ্ডামীসব বাদ দিলে, বাকী থাকে শুদ্ধ শুষ্কমনের শুকাইয়া মরণ,—বাকী থাকে মাত্র আস্বাদহীন নীরস জীবন! হায়, অন্যের দুঃখে মৌখিক দুঃখ জানাইয়া, আর্‌তো সভ্যতার আদর্শ হইতে পারিব না! হায়, আপন সম্পদের সহিত বন্ধুর বিপদের তুলনা করিয়া, লুক্কায়িত তৃপ্তির লুক্কায়িত স্ফূর্ত্তি আর্‌তো অন্তরে লুক্কায়িত রাখিতে পারিব না! হায়, পরের সৌভাগ্যে দুঃখিত হইয়া, সেই কষায়-মধুর দুঃখের স্বাদ, খাঁটি মধু অপেক্ষা,—অর্থাৎ পরের সুখে সুখী হওয়ার অপেক্ষা—স্বাদুতর জ্ঞান করিতে,আর্‌তো প্রবৃত্তি,লুক্কায়িত ভাবে,প্রবৃত্ত থাকিতে পারিবে না! হায়, লুক্কায়িত ঈর্ষার লুক্কায়িত সুস্বাদ আর্‌তো গোপনে অনুভব করিতে চাহিব না! হায়, লুক্কায়িত দদ্রু আরোগ্য করিয়া, দদ্রু কণ্ডূয়নের অনন্ত-আরাম আর্‌তো উপভোগ করিতে পাইব না! হায়, চক্ষু মুদিয়া তন্ময় হইয়া চিরদিনের দাদ্‌গুলি চুলকাইবার এত প্রচুর আরাম আর্‌তো সম্ভোগ করিতে পারিব না! হা গূঢ়সুখ! হা গুপ্ত সম্ভোগ! হা লুক্কায়িত আরাম! তোমাতে এত আসক্তি,তোমার সঙ্গে এত প্রণয়ের পর, তোমায় ছেড়ে আর বাঁচিব কিরূপে? মরিয়াও তুমি পাইবার নও। তুমি মর্ত্ত্যের সামগ্রী—মৃত্যুর পর আর পাইব কোথায়? তুমি মনুষ্যের প্রিয়তম,দেবতারতো কেউ নও—তুমি দেহীর দদ্রু, কণ্ডূয়ন সুখ, বিদেহীরতো কিছুই নও। ওহে কবিরাজ! দদ্রু-রোগ মারাত্মক নয়, এবং লুক্কায়িত দদ্রুর লজ্জা,কদর্য্যতা,দুইই লুক্কায়িত,অতএব আমার এত কালের গা-সহা দাদগুলি এ যাত্রা রাখিয়া দাও। যদি কোন জন্মজন্মান্তরে দদ্রুহীন দেহের চির বিস্মৃত সুখ-স্বচ্ছন্দতা কখন অনুমানেও অনুভব করিতে পারি, তখন তোমার

চিকিৎসার অধীন হইতে চাহিব, এ যাত্রা আমায় ছাড়িয়া দাও। ভিষক্ ঠাকুর! আমার এমন নির্দ্দোষী সুখদ-রোগ আরোগ্য করিয়া, চিকিৎসার অত্যাচারের আবশ্যক কি এত? দেখ চিকিৎসক! দাদ্ চুল্‌কাইবার এই আরাম কৃত্রিম হইলেও, ইহাতেই আমার প্রকৃত প্রত্যক্ষ সুখ। আর, ভণ্ডামীবিহীন ঐ অকপটতা, অকৃত্রিম হইলেও, আমার আপাততঃ আনুমানিক-স্বচ্ছন্দতা। তাইতো আমি উহাকে বালকের সরলতা বা বাল্যকালের সুখ স্বচ্ছন্দতা এবার, এ যাত্রা, এতকাল বলিতে পারিলাম না। জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলনাবধি বরাবর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, আজও তাহাই বলিব ও বলিতে চাই যে, উহা বালকের প্রগাঢ় বোকামী, অবাধ অনভিজ্ঞতা; নহিলে, গুণের বা শক্তির অভাব, অকারণ বাহিরে ব্যক্ত করিয়া, কোন বুদ্ধিমান সংসারে অপহৃত-সম্ভ্রম হইয়া থাকিতে চায়—কোন জ্ঞানবান আপনার বাজার-গৌরব আপনি বিনষ্ট করিতে,—আপনার অনিষ্ট আপনি সৃজন করিতে চায়? আমিতো কখন চাহি নাই, চাহি না, এ জন্মে একবার চাহিতে পারিবও না। ওহে রামকৃষ্ণ! ওহে বালক মহাপ্রভো! ওহে শিশু শ্রীচৈতন্য! ওহে জননী-সর্ব্বস্ব শিশো! তোমার বালকত্বের গভীর প্রবীণতা, তোমার সরলতার অকৃত্রিম চাতুর্য্য, তোমার মূঢ়ত্বের প্রখর বুদ্ধিমত্তা, তোমার লঘুত্বের অমেয় গুরুত্ব, তোমার অভাবের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য, এবার আমি বুঝিতে অক্ষম,—এবার আমার বুদ্ধি, বিদ্যা, কল্পনা অনুমানেরও অগম্য। এবার আমি উহাকে বালকের বোকামী বলিতেই চাই,—এ যাত্রা আমি উহাকে বালকের বোকামী বলিয়াই যাই,—বারান্তরে, উহার ধ্যানে, উহার জ্ঞানে, উহারই অনুপ্রাণনে জীবন উদ্যাপন করিবার উদ্দেশ্য রহিল।

৭। রামকৃষ্ণ কহেন্—ওহে বিচক্ষণ! জীবন-উদ্যাপন শুধু নয়—জীবন জুড়ানও যে অনেকে বলিয়া থাকে গো। গরীব হওয়ায় যে অপমান বোধ কর, তাহা মিথ্যা অপমান। অম্ল-রোগ-রুগ্নের কাছে, আমড়া, তেঁতুল, দৈ, গুড়, লঙ্কা, টোপাকুলের অপমান; গরীব হইয়া বড়মানুষীর ভাণের আসল অপমান, জ্ঞানীর কাছে। জহুরীর কাছে ঝুটো মেকীর অপমান। তোমার গর্ব্ব দ্বেষ যদি যথার্থই অপরিহার্য্য বোধ কর, মুক্তকণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে, অবগণ্ডের ন্যায়, তাহা ব্যক্ত করিয়া, সগর্ব্বে, স্বচ্ছন্দে, মনের মত আনন্দে দিন যাপন করিয়া যাইতে পার, তথাপি গর্ব্বিত হইয়া, গর্ব্বগোপন করিবার জন্য, নম্রতার ভাণ কখন কস্মিনকালে করিও না,—তথাপি হিংস্রক হইয়া, হিংসা গোপন করিবার জন্য প্রেমিকের ভাণ কখন কস্মিনকালে করিও না। কারণ, ভাণই সত্যের অতি ধূর্ত্ত শত্রু,—সদাই তার, লুকাচুরী করিয়া, অনিষ্টের চেষ্টা। অনিষ্ট যার তার নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের—সত্য-স্বরূপ সত্যরূপী প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের অনিষ্ট। বালকের সরল গর্ব্বে, সরল হিংসায় সত্য নষ্ট হয়, কখন কুত্রাপি,—নষ্ট হয় মাত্র মিথ্যা মনে। তুমি যাহাকে স্থায়ী ভাব, উহা আজন্ম অস্থায়ী; যাহা তুমি ভাব বিশ্বাসী, তাহা সুবিধা পাইলেই অবিশ্বাসী। ধূর্ত্ত চাকর-নফরের ন্যায়, প্রত্যক্ষে ঠিক তোমার আপনার,—যেন তোমার জন্যই তাহার অস্তিত্ব; পরোক্ষে ঠিক তাহার আপনার—যেন তাহার জন্যই তোমার অস্তিত্ব,—তুমি যেন তাহার,—তুমি মিথ্যার,—আলম্বন বৃক্ষ, তাহার অসংখ্য দড়িদাড়ার, লতার পাতার

স্বয়ং অষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ, আগাগোড়া আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, যথার্থই আধমরা হইয়া, তাহারই ফলে ফুলে, ফেঁকড়ি-ফ্যাঁকড়ায় তাহারই অতি বৃদ্ধি-সাধনই তোমার ইহজন্মের জঘন্য উদ্দেশ্য। আপনাকে মিথ্যায় ঢাকা রাখিয়া, মিথ্যার শ্রীবৃদ্ধি করাইয়া দেওয়ার নামই—মিথ্যা-মান; এমন মিথ্যা-মান নষ্ট হওয়াই ইষ্ট, নষ্ট না হওয়াই অনিষ্ট, ঘোর অমঙ্গল,—ছদ্মবেশী মিত্ররূপী বিষম অমঙ্গল।

৮। এই ছদ্মবেশে, এই মিত্ররূপে, জগন্মিত্রযোগী-রূপ ধারণ করিয়া, জগন্মাতা সীতামা'কে হরণ করিয়াছিল জগচ্ছত্রু রাক্ষস, মূর্খ, মূঢ়, নির্ব্বোধ অনার্য্য, যাহার স্বধর্ম্ম—ছলা, মায়া, কপটতা,—যাহার প্রজ্ঞা প্রবীণতা বুদ্ধি-প্রাচুর্য্য—ভাণ ভণ্ডামী ভড়ং। আর্য্যের এসব কিছুই নয়, আর্য্যের ইহা ভ্রম, ভ্রান্তি, ঘোর মূর্খতা! সেই আর্য্য কেন আজ সেই ভণ্ডামীর, সেই কপটতার এত পক্ষপাতী? এই আর্য্য কি সেই আর্য্যের কেহই নন্? মাত্র জাতি-চোর বর্ব্বর। এই ব্রাহ্মণ কি সেই ব্রাহ্মণের বিকার? কৈ, কোথায় তাঁর সেই সরলতার ঐশ্বর্য্য, কপটতায় দরিদ্র্য, বৈষয়িক-চাতুর্য্যে বাল্যকালের বোকামী? কৈ, কোথায়,—কেন গেল ব্রাহ্মণের সেই সেকেলে স্বধর্ম্ম,—কেন তাঁর এত একেলে ভড়ং, ভণ্ডামী, মিথ্যা মহত্ব, মিথ্যা মানরক্ষা? কালের দোষে? না—কৃষ্ণ-প্রেমের অভাবে? না—বিশ্বাসের স্বল্পতায়? না—বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে? বিদেশী কেতাবী-শিক্ষা তো মন্দ নয়—তবে কি যাঁহাদের অল-চলন, ধরণ-ধারণ অনুকরণ করিয়া, যাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃত পূজা করিয়া থাকি, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত,—তাঁহাদের ধন-জন-জ্ঞান-গর্ব্বে কলুষিত দৃষ্টান্ত—কি আমাদিগকে এমন করিয়া তুলিয়াছে?

৯। প্রায় সকল পাপের মূলেই গর্ব্ব,—পাপের নামান্তর গর্ব্ব বলিলেও বলা যায়। ভণ্ডামীর গোড়ায়ও গর্ব্ব, অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। গর্ব্ব যার যত বেশী, তার তত ঈশ্বরে স্বল্প-বিশ্বাস—মুখে না হউক্, অন্তরে বটে। তাই গর্ব্বের আর এক কঠিন, কর্কশ নাম অহঙ্কার বা ঈশ্বর-পূজার বিরোধী অহং-পূজা। অহঙ্কার, লঘু-আহার নহে,—অত্যন্ত গুরুপাক পদার্থ—একেবারে রাক্ষসের উপভোগ্য, শূদ্রের লোভনীয়—অৰ্দ্ধ-পক্ক (under-done) লাল টক্‌টকে গোমাংসের কাবাব বা কোলাব্যাঙের কট্‌লেট্,—ব্রাহ্মণের উহা অত্যন্ত হেয়। যাঁহার উহা হাল্‌কা আহার, উপাদেয় খাদ্য, তিনি বাহিরে ব্রাহ্মণ হইলেও, অন্তরে শূদ্র, শার্দ্দুল। ধনে মানে, কলে বলে, সাংসারিক চতুরতায়, বহুক্ষণ আপনাকে বড় জানিয়া, মাত্র বিপদ-কালে, সময়ে, ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান করাই একেলে অহঙ্কার, শূদ্রত্ব; সেকেলে শূদ্রত্ব—কংস, হিরণ্যকশিপুর শূদ্রত্ব। সদাসর্ব্বদা নিরন্তর কৃষ্ণকে নিকৃষ্ট বোধ করাই সেকেলে শূদ্রত্ব। খুব খাঁটি আসুরিক অহঙ্কার—এত খাঁটি অখাদ্য—এখন আর সহজে কাহারও হজম হইবার নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস কবিরাজ।

# জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা।

Nothing is to be gained, but much loss suffered by
self-imposed blindness—G. Watt.

এতদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, দেখিতেছিলাম শ্রাদ্ধটা কত ধূর গড়ায়। অবশ্য এমন মনে করি নাই যে সমস্তই পণ্ড হইবে, আশা ছাড়ি নাই। যখন এতগুলি হোম্‌রা-চোম্‌রা লোক একত্র হইয়া মাথা খাটাইয়া একটা কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমাদের মত ক্ষুদ্রব্যক্তির হঠাৎ আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই। এই অবস্থায় মনে সংশয় হইলেও প্রকাশ করিতে সাহসে কুলায় নাই; বিশেষ "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" নীতিবাক্য বাঙ্গালীর পক্ষে সহজে ভুলিবার জিনিস নয়। এখন যখন দেখিতেছি, দাদা জ্ঞানেন্দ্রলাল, বহুদিন অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, হঠাৎ তাঁহার স্বভাব-সুলভ নির্ভীকতা সহকারে স্পষ্ট-বক্তা হইয়া আসরে নামিয়াছেন, তখন ছোট ভাইয়ের প্রাণে যে বল সঞ্চার হইবে, তাহাতে বৈচিত্র কি? জাতীয় শিক্ষাসমিতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে উক্ত বহুদর্শী মাহাত্মা যে গুটিকতক কথা গত আষাঢ় মাসের 'নব্য-ভারতে' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত পুড়াইয়া ফেলিবার যোগ্য নহে। কেহ মুখ ফুটিয়া বলুন,—আর নাই বলুন, সহৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে ঐ কথা কয়টী, এই দুর্দ্দিনে, বারম্বার তোলাপড়া হইতেছে—অত্র সন্দেহ নাস্তি। আমরা দুই একবার প্রকাশ করিয়া বলিব মনে করিয়াও বলি নাই, পাছে সাধারণের উৎসাহ ভঙ্গ হয়। যাহা হউক, একটা কাণ্ড হইতেছে—ভাল উদ্দেশে; ক্রমে আপনিই দুরন্ত হইয়া আসিবে; একদিনে ত আর সব হয় না, ভাবিয়াও নিরস্ত ছিলাম। কিন্তু বিস্‌মোল্লায় গলদ্ হইলে, পরে বড় বেগ পাইতে হয়। জগা-খিচুড়ি পরিপাক করা বড় সহজ নয়।

পূজ্যপাদ দাদা মহাশয় যে প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন, কতকটা সেই ভাবের কথা আমরা দশ বৎসর হইল, কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করি; পাঠকবর্গের গোচরার্থ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"দেশ ত অধঃপাতে গিয়াছে, এবং প্রতিদিন মন্দাৎ মন্দতর অবস্থায় পতিত হইতেছে। হুজুকপ্রিয়-দেশের হুজুকী লোকেরা এই দুর্দ্দিনকে একটা মোটা হুজুক মনে করিয়া চারিদিক হইতে নানা প্রকার চীৎকার করিতেছে। অবশ্য দুই একজন চিন্তাশীল-ব্যক্তিও মধ্যে মধ্যে দুটা সদুপদেশ দ্বারা পরামর্শ না দিতেছেন, এমন নহে; কিন্তু, অধিকাংশ লোক অসার কথা, অন্যায় যুক্তিতর্কের সহিত নানারূপ প্রলাপ বকিতেছেন মাত্র। এবম্বিধ অবস্থায়, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি আমরা কিছু বলিতে চাই, যদি সহৃদয় পাঠক-বর্গ এবং দেশের সম্ভ্রান্ত ধনকুবেরগণ আমাদের কথায় কাণ দেন! এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অধঃপতিত দেশের উদ্ধারের জন্য আত্মত্যাগী মহাপুরুষের আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। সাধারণ জীবগণের লক্ষ চেষ্টাতেও যাহা না হয়, এরূপ একজন ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেকেই জানেন, দেশের দারুণ হীনাবস্থাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া শ্রীশ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী, শান্তিপুরের ঘাটে গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, উর্দ্ধ-নেত্রে নিয়ত বিধাতার সাহায্য প্রার্থনা করিবার পর, দেশোদ্ধার-হেতু শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। বর্ত্তমান সময়ে তদ্রূপ একজন অদ্বৈতের বিশেষ দরকার হইয়াছে। এখন কি উপায়ে তাহা

হইতে পারে, দেখা যাউক। দেশ যখন মহৎ ছিল, তখন এমন কি একটা বিশেষ জিনিস ছিল, যাহা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইব। আর ত সবই আছে, দেখিতেছি, বরং সেকাল অপেক্ষা এখন আমরা অনেক বিষয়ে "উন্নত?"—কেবল নাই আসল বস্তুটী; সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী এখন আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মানবসেবায় জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। * বিলাতী গর্ডন, লিবিংষ্টোনের মত লোকের নিতান্তই অভাব। বিলাতী উদাহরণ দিলাম এই জন্য যে,উহা কাল-সম্বন্ধে নিকট, এবং লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে; দধীচীমুণি,রন্তিদেব রাজা, শাক্য, বা অশোক প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিলে, হয়ত, অনেকে পৌরাণিক-গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। পুরাকালে ঋষিগণ আশ্রম রাখিতেন, তথায় জ্ঞানের সহিত নিঃস্বার্থ-প্রেম শিক্ষা দেওয়া হইত; ঠিক সেরূপ এখন পাওয়া দুর্ঘট, কিন্তু কতকটা সেই প্রকারের কিছু না হইলেও আর উপায় দেখি না। জীবের প্রধান উদ্দেশ্যই ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া, অর্থাৎ ভগবান যেরূপ উদাসীন বৈরাগী হইয়াও, এই বিশাল সংসার পাতিয়া জগতের প্রতিপালন-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, আমাদিগকেও চরমে তদ্রূপ হইতে হইবে। ইউরোপ-খণ্ডে জলবায়ু প্রকৃতি ভিন্নরূপ, সে দেশে "কৌপীণবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্ত" হওয়া এক প্রকার অসম্ভব, সুতরাং তথায় লোকে অন্যান্য পন্থায় ভগবদভিমুখী হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিতেছে। আমাদের দেশে উদরান্ন ও জলবায়ুর দরুণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হয় না; এখানে, প্রকৃতির কৃপায়, আমরা অনায়াসে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বর-পূজা ও মানব-সেবাতে নিযুক্ত হইতে পারি। চারিদিকের কাণ্ড-কারখানা, প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকিয়াই, জীবের অস্তিত্ব রক্ষা পায়, সুতরাং ইউরোপীয় হিসাবের বৈরাগীর এদেশে দরকার দেখা যায় না,—এখানে যুগ-যুগান্তর হইতে যে শ্রেণীর উদাসীন-সেবক দেখা দিয়াছেন, তাহাই ভারতের ব্যবস্থা। বর্ত্তমান শতাব্দীতে, ব্রাহ্ম-সমাজ দেশোদ্ধারের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু প্রাচ্য-রাজ্যের চির-পরিচিতভাবের একজনও বৈরাগী দেখাইতে পারিলেন না,—উঁহারা যাহা প্রদর্শন করিলেন, তাহা বুদ্ধ-শঙ্করের দেশে গ্রাহ্য হইল না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমাদের মনে হয়, পাঁচ জনের চেষ্টায় এরূপ একটী আশ্রম খাড়া করা উচিত,যেখানে নিতান্তপক্ষে দুই চারিজন সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রস্তুত হন, যাঁহারা সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া, কেবলমাত্র লোক-শিক্ষা ও লোক-সেবার জন্য দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন। এই প্রকারে, মানব-সেবকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আশ্রমের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে, এবং দেশমধ্যে তাঁহাদের জীবন্ত-দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধারণ জীবের উন্নতি হইয়া, অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হইবে। শুধু কলিকাতার ধনীরা যে টাকাটা শরীর মনের নাশকল্পে—বিলাসবোধে—প্রতিনিয়ত ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার সহিত তুলনায় এরূপ একটী আশ্রমের ব্যয় কিছুই নয়। একজন মাত্র মধ্য-শ্রেণীর অর্থশালী ব্যক্তি এ বিষয়ে মনোযোগ করিলেই যথেষ্ট হয়। যদি এরূপ কোন মহাত্মা থাকেন, তিনি উপস্থিত হউন, আমরা তাঁহার সহিত সম্যক চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি। মাসিক একশত মুদ্রা ব্যয়ে, উক্ত প্রকারের একটী আশ্রম আপাততঃ খোলা যাইতে পারে; দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের সেটুকুও ক্ষমতা নাই। দেখি যদি কেহ অগ্রসর হন, নচেৎ জানিব এখনও সময় আসে নাই।" *

* রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা অনেকে এইরূপ আরম্ভ করিয়াছেন সুখের বিষয়, আশার কথা।

* প্রায় দুই বৎসর হইল 'বঙ্গবাসী' কাগজের মালিক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বঙ্গভাষার লেখক"নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুরের উৎকট ধর্ম্মপ্রাণতা ও বিবেক বৈরাগ্যের অজস্রপূর্ব্ব প্রশংসা দেখিয়া,এ বিষয়ে তাঁহার নিকট বিস্তারিত ভাবে আবেদন করা হয়; দুর্ভাগ্যবশত, তাহার কোনই উত্তর পাওয়া গেল না। এই ত দেশের দশা,

ভূতপূর্ব্ব বঙ্গের লাট ৺ মেকেঞ্জি সাহেব ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-সভায় একবার বলিয়াছিলেন,—

"It is perfectly true that the great majority of our students are not really educated at all."

সে কথায় অনেক ইংরাজী-নবিশ যুবক হয়ত রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু, প্রকৃত অবস্থা উহা দ্বারাই বর্ণিত। অনেকে খেয়াল করেন না, কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবনার বিষয়, যে নীতিহীন, ঈশ্বরহীন শিক্ষা আমাদের দেশে চলিতেছে তাহাতে অচিরে সর্ব্বনাশ হইবার কথা। সর্ব্বনাশ যে এখনই হয় নাই, তাহাও নিশ্চয় বলা কঠিন। ইউরোপীয় হিসাবে, বিজ্ঞানী নাস্তিক হইলে, সমাজের তত ক্ষতি হয় না ; তাঁহারা ঈশ্বর, পরকাল না মানিলেও দয়া, প্রেম, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা অস্বীকার করেন না। সে সকল মনীষীব্যক্তি মানব-সমাজের সেবা-সাহায্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত। পরন্তু, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসূত নাস্তিকেরা স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর হইয়া,সংসারের শ্রীবৃদ্ধির পথে কণ্টক-স্বরূপ হয়েন। এ কথা কি আজও আমরা বুঝি নাই যে, কতকগুলো বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই,মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করা যায় না ? উহা দ্বারা কেবল মাত্র এক প্রকার উদ্ধত কিম্ভূত-কিমাকার জীবের সৃষ্টি হয়, যাহাদের ধর্ম্ম নাই, নীতি নাই,—আছে শুধু বাক্যের পুঁটুলি। এমন উদাহরণ বিরল নয়,—বিশ্ববিদ্যালয়ের মহোচ্চ উপাধি খুব যশের সহিত লাভ করিয়া, হয়ত, শিক্ষা-বিভাগের কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, অথচ মনুষ্যত্বহীন একটা অদ্ভুত জীব—এক্কা-বাহাদুর, অহঙ্কার ও নীচ স্বার্থপরতায় পূর্ণ, কথার ঠিক নাই, দয়া-মায়া-বিবর্জ্জিত, লোভ বিলক্ষণ, হীনতার অবতার, হ্রস্বদীর্ঘবোধ নাই, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-রহিত,লঘু-গুরু-জ্ঞান-বিহীন, ভূত-ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিশূন্য। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি মহাত্মাগণের কথা উঠিলে ইঁহারা অনায়াসে বলেন,—"ও সব বই ছেলে বেলা পড়া হইয়াছে," কিন্তু, ঐ সকল মহা-মহোপাধ্যায় জগৎপূজ্য ব্যক্তিদিগের একটা কথাও যে তাঁহাদের পেটে ঢুকিয়াছে, এমন ত বোধ হয় না। গ্রন্থপাঠ কেবল মাত্র চিন্তার দ্বার উদ্‌ঘাটনজন্য, পরের কথার রোমন্থন উদ্দেশ্য নহে ; চিরকাল শুধু পণ্ডিতগণের কথা উদ্গীরণ করিয়া চলিলে আর কি হইল ? সংসার-পরিদর্শন-শক্তির বিকাশ না হইলে, লেখা পড়ায় ফল কি ? দেশের অনেক ছাত্রই "ব্লাকির সেল্‌ফ্‌ কাল্‌চার"পাঠ করিয়া থাকেন, অথচ, কয়জন উক্ত মহাত্মার উপদেশসমূহ জীবনে অনুসরণ করিয়া চলেন ? তোতা-পাখীর মত নোট্‌ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই লাভ। খাদ্য দ্রব্য হাজার পুষ্টিকর হইলেও, তাহা জীর্ণ করিয়া রসরক্তে পরিণত করিতে না পারিলে, শুধু নষ্ট হয় না, মহাবিষের কাজ করে। আমাদের ঠিক তাই হইতেছে, ভাল ভাল গ্রন্থ গলাধঃকরণ করি মাত্র, পরিপাক করিয়া চরিত্রগত করিবার শক্তি নাই, কাজেই পেট ফুলিয়া মরি। ঘোর দুঃখের কথা এই যে, উক্ত প্রকারের রোগ-জনিত উদর-স্ফীতিকে ব্যাধি না ভাবিয়া, মনে করি মোটা হইয়াছি ; শেষে "স্ফীত ভেকের ন্যায় যে শীঘ্রই ফাটিয়া মরিব, সে জ্ঞান নাই।

এতই শোচনীয় আমাদের ধনকুবেরদিগের অবস্থা। সহানুভূতি বলিয়া যে একটা মহাশক্তিশালী সামগ্রী সুন্দর জগতে বিরত কার্য্য করিতেছে—যাহার বলে মানুষ নিরয় নরক হইতে স্বর্গের দিকে ধাবিত—তাহা আজো আমরা বুঝি না, বুঝিতে চাহিও না।

এবম্প্রকার কুশিক্ষার ফলে, দেশ ডুবিবে না ত কি? "To live nobly is to live for others"—অপরের জন্য-জীবন-ধারণই প্রকৃত মহৎ জীবন। এই মহাবাক্য পূর্ব্বকালে ভারতেও অনেকে মানিয়া চলিতেন, দুঃখের বিষয় আজ কাল একেবারেই বিস্মৃত। যাহাতে আমরা পুনরায় পরার্থপরতাকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া চলিতে পারি, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব—ক্রমে দেবত্ব—লাভ করিয়া কৃতার্থ হই, সেইরূপ শিক্ষাই প্রকৃত-শিক্ষা, এবং তাহাই এখন নিতান্ত দরকার। শিক্ষার বলে, যদি পরের জন্য, স্বদেশের জন্য, সংসারের জন্য, হাসিতে হাসিতে প্রাণ না দিতে পারা যায়, তবে সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, কুশিক্ষা।

যদি আমাদের নেতৃগণ উক্ত প্রকারের প্রকৃত উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তবেই স্বদেশের প্রকৃত সেবা করা হইবে, নচেৎ পাশ্‌ওয়ালা ভুয়ো শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা ত কোন সুফলের আশা দেখা যায় না। আমাদের মধ্যে যদি এমন কেহ এখনও থাকেন, যাঁহার মতে ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম্মনীতি বাদ দিয়া, অন্য নানা উপায়ে শিক্ষা দিলে ক্ষতি নাই, বুক ঠুকিয়া তাঁহাকে বলিব তাঁহার বিশ্বাস ভ্রান্ত! ভ্রান্ত! ভ্রান্ত! "দেশোদ্ধারের মূলমন্ত্র, প্রেম-সাধন ও একতা-সাধন"। অপরাবিদ্যার অনুশীলনে দেশোদ্ধার কখনই হয় না। "বলং বলং, ব্রহ্ম বলং," ব্রহ্মবলের দ্বারা অসাধ্য-সাধন হয়, এবং তাহা চিরস্থায়ী, অন্যান্য বলে যাহা হয়, তাহা সাময়িক—অস্থায়ী; কেবল মাত্র ছেঁড়া কাঁথায় তালি-তুলি দিয়া কাজ সারা।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

# প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

**ময়মনসিংহের ইতিহাস**—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। সান্যাল এণ্ড কোম্পানি (২৫ নং রায় বাগান ষ্ট্রীট) দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডঃ ক্রাউন ষোল পেজী, উত্তম কাগজ, পরিপাটী মুদ্রাঙ্কন,—২৩৪ পৃষ্ঠা—মূল্য দেড় টাকা। পুস্তকের প্রারম্ভেই তদকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেলের, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত ময়মনসিংহের একখানি দুর্ল্লভ মানচিত্রের সুরম্য প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, ময়মনসিংহের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত, মজুমদার মহাশয় এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, ভূরি ভূরি প্রামাণ্য-লিপি সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পরিশিষ্টে, ১৭৮৭ খ্রীঃ হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট মহকুমাগুলির পদস্থ কর্ম্মচারীবর্গের নাম, ১৮৫৮ খ্রীঃ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর তালিকা ও ময়মনসিংহে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রার বিষয়ে, এসিয়াটিক সোসায়িটির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত টি, ব্লক সাহেবের বিবরণ পুনর্মুদ্রিত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনাই জাতীয়-উন্নতির মূল। ইহাতে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ সম্যক পরিস্ফুট হয়, জাতীয়-অবসাদ দূরীভূত হয় এবং স্বীয় সামর্থের উপর চির-অনাস্থা ও তজ্জনিত অপরের বিপুল শক্তির অস্তিত্বের অনুমানে, আমাদের মজ্জাগত ভীরুতা তিরোহিত হয়। আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, যাইতেছি কোথায়?—এই প্রশ্নত্রয়ের মীমাংসা প্রত্যেকে নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দেশকে তুলিয়া ধরিবে। আমি বলিতে—আমার পিতৃকুল, মাতৃকুল, আমার পরিবার, আমার বংশমর্য্যাদা, আমার গোত্রগৌরব, আমার কৌলিন্য সবই একে একে আসিয়া উপস্থিত হয়। "আমি কে"-জ্ঞান হইলেই, মহা এক দায়িত্বের

গুরুত্ব অনুভব করি। পরম পরিতোষে নিদ্রা যাইতেছিলাম—অবসাদে পড়িয়া, প্রকৃতির অনায়াসলব্ধ অজস্র সুখ-সমৃদ্ধি অবলীলাক্রমে সম্ভোগ করিতেছিলাম। জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষে দেখিলাম, সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র—কঠোর কর্ত্তব্যরাজি আমার অনুকম্পা ভিক্ষা করিতেছে। বুঝিলাম,—প্রাচীন-গৌরব-সংরক্ষণার্থেই আমার সংসারে আগমন। অতীতের স্মৃতিময়ী জ্ঞান-গরিমা, বিষয়-বিভব, সুখ সচ্ছন্দতা অনুশীলন করিয়া, সেইগুলিকে স্বীয় জীবনে অক্ষুন্ন রাখিয়া, মৃত্যুরপূর্ব্বে, সমাগত, আশায় উৎফুল্ল ঐ ভবিষ্যত-শিশুর কোমলকরে, প্রতি কপর্দ্দক পর্য্যন্ত হিসাব-নিকাশ করিয়া অর্পণ করিয়া যাইবার ভার, আমারই উপর। আমার আয়াস করিবার আর অবসর নাই। অতীতগৌরব-মণ্ডিত ঘটণা-স্মৃঙ্খল অটুট রাখিয়া, ভবিষ্যতের আগত-প্রায় মনোরম স্মৃঙ্খলের সহিত সম্মিলিত করিতে হইবে—আমাকেই। ব্যক্তিগত এই দায়িত্ববোধ যখন সমগ্র দেশময় জাগরিত হইবে—দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

অতীত কাহিনী অধ্যয়নে কেবল যে, এই দায়িত্ববোধ জাগরিত হয়,তাহা নয়, আমাদের শক্তি কত,তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। যাহা আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই বংশধর হইয়া, আমরা কেন সেই সাধনায় সিদ্ধ হইব না। পরন্তু, পুরাবৃত্ত অধ্যয়নে অতীত-অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ জাতি, সর্ব্বকর্ম্মেই সতর্ক হইতে শিক্ষালাভ করে। যে পথ অবলম্বনে, একবার জাতীয়-পতন সম্ভব হইয়াছে, সহসা, পুনঃ সেই পথে সে জাতি যাইতে নারাজ। মুণ্ডিত মস্তক কয়বার শ্রীফল আহরণে গমন করিয়া থাকে---যে গাভী অগ্নিদাহের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, সায়াহ্নের আরক্তিম বারিদরাশি সন্দর্শনে, পশু সে, তাহারও প্রাণ শঙ্কিত এবং সতর্ক হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জাতীয় ইতিহাস যত পর্য্যালোচনা হইবে, ততই আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সহানুভূতি-বিবর্জ্জিত বিদেশী-রাজার অধীনে, রাজনৈতিক কারণবশতঃ, দেশে মিথ্যাবিবর্জ্জিত ইতিহাসের কি প্রকার অভাব ছিল, জ্ঞানানুসন্ধনোৎসু বিজ্ঞজন মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ স্বদেশ-হিতৈষী স্বনামখ্যাত বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে,ইংরাজ-ঘোষিত মিথ্যা ঘটনাবলীর কয়েকটীর প্রকৃত ঘটনা জনসাধারণ অবগত হইয়াছেন। এখনও অনেকানেক কথা রহিয়াছে, যাহার অন্বেষণে প্রকৃত-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া, কোন কোন পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখকের সত্যের-নামে-মিথ্যা-প্রচার-রূপ অভূতপূর্ব্ব নীচতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থখানি পাইয়া, এই সকল কারণে, আমরা অতীব প্রীত হইয়াছিলাম। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ও মাজিষ্ট্রেট কলেক্টার প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকর সাহায্য ও অনুকম্পার জন্য তিনি যদি লালায়িত না হইতেন, বুঝিবা মজুমদার মহাশয় আরও স্বাধীনভাবে তাঁহার মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন। এই সমস্ত লেখক যাহাতে জাতীয়-সাহায্য পান, শীঘ্রই তাহার সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত। তবে, মজুমদার মহাশয় গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে কোন প্রকার ক্রুটী করেন নাই। তাঁহার শ্রমসার্থক হইয়াছে। ময়মনসিংহের প্রতিলোক এই ইতিহাস সানন্দে পাঠ করিবেন, আমাদের বিশ্বাস। বঙ্গের সকল বিজ্ঞজনকে এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে আমরা অনুরোধ করি। বাঙ্গলা-সাহিত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসের যুগে, এই প্রকার পুস্তকের আদর দেখিলে আমরা সুখী হইব। আমাদের একমাত্র কামনা,—দুর্ভাগ্য ভারতের দেশে দেশে, জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় স্বদেশ-বৎসল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভারত-মাতার সু-সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করুন। দেশের মুখ উজ্জ্বল হউক। মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দশার অবসানের এই প্রশস্ত পথ।

ক্রমশঃ।

# রাজভক্তি।

"রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ”—রাজা-শব্দের অর্থ, যিনি প্রজাকে রঞ্জন করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যিনি প্রজার মনোরঞ্জনে নিযুক্ত, কেবল তিনিই রাজা-শব্দ-বাচ্য, অন্যে নহে। তবেই প্রজার অসন্তোষের কারণ হইলে, তাঁহার কোটী সৈন্য, লক্ষ মাক্সিম-কামান সত্ত্বেও, তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা বলা যায় না—ইহাই হইল আমাদের আভিধানিক মহাত্মাগণের মত। ধর্ম্মের ঘরেও সেইকথা। বিধাতা যাঁহার উপর যাহাদের ভার দিয়াছেন, তিনি যদি বাস্তবিক তাহাদের সন্তোষ অসন্তোষের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবলমাত্র নিজের বা নিজের লোকদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় থাকেন, তাহা হইলে তিনি আলেকজাণ্ডার, সিজার যে কেহ হউন না, ধর্ম্মের আদালতে দণ্ডার্হ।

শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রাজা ছিলেন, যথার্থ রাজা, কারণ, সামান্য একজন রজক-প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য, তিনি সীতা হেন স্ত্রীকে বনবাস দিতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন নাই। ঐরূপ রাজাকে ঈশ্বরের অংশাবতার বলিতে কোন মূঢ়ও কি আপত্তি করিতেপারে? ওরূপ রাজাকে ভক্তি করা, প্রজামাত্রের ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ। "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা” মহামতি আকবরও একজন প্রকৃত ভক্তি-ভাজন রাজা ছিলেন। আজও হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর প্রজা, বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত,তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে। আপাততঃ এই দুইজনের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। পৌরাণিক যুগে,বিস্তর রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগকে নররূপী-নারায়ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইউরোপখণ্ডে আলফ্রেড্ দি গ্রেট, পিটার দি গ্রেট প্রভৃতি দুই চারি জন প্রজারঞ্জক নৃপতি হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু, আমেরিকায় প্রথম প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিণ্টন্‌কে ওসম্বন্ধে কম উচ্চস্থান দিতে পারা যায় না; লিঙ্কন, গ্রাণ্ট, গার্‌ফিল্ড লোকপালত্রয়ও সম্যক পূজার্হ ছিলেন, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টও একজন খাটো নরপতি নহেন।

এখন আমাদের বর্ত্তমান রাজা ও ভারত-বাসীর রাজভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ভারতসাম্রাজ্যের বর্ত্তমান রাজা, অর্থাৎ লাট মিণ্টো, তাঁহার সভাসদ্‌গণ, বা সেক্রেটারীবর্গ যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে ধরা যায়, অধুনা হুকুমজারি করিয়াছেন:—যেহেতু ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের মধ্যে আজ কাল "লয়াল্টি” বা রাজভক্তির মাত্রাটা যেন কম দেখা যাইতেছে, অতএব "এম্পায়ার ডে” বা সাম্রাজ্য-দিবসে (যাহা পূর্ব্বে "কুইন্‌স্-বার্থ-ডে” বা ৺ ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন ছিল) দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগকে রাজভক্তি-সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইবে। সেই ২৪মে তারিখে, গ্রীষ্মাবকাশজন্য বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ থাকায়,আদেশ হইয়াছে যে, যেদিন ছুটিরপর স্কুল খুলিবে, সেইদিন উক্ত হুকুম যেন তামিল করা হয়। এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচারিত হওয়ায়, এই বৎসর সমস্ত বিদ্যালয়ে রাজভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের বর্ত্তমান রাজা কে, যাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে? সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড, মর্লে সাহেব, আর্ল্ মিণ্টো, ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বর-গণ, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি-

গণ, ইঁহাদের মধ্যে কে আমাদের রাজা? কাহার হুকুমে আমরা মরি বাঁচি, পাঠক মহোদয়,ঠিক করুন, আমাদের ত সাধ্য নাই। কতক লোকে বলে, লাঙ্কাশীয়ারের বণিকগণ আমাদের রাজা, কারণ, তাহাদের কথাতেই আমাদের জীবন-মরণ। কথাটা নিতান্ত ফেলিবার যোগ্য নয়। কোন কোন সারগ্রাহী লোক বলেন, সমগ্র বৃটিশ-প্রজা আমাদের রাজা। এ কথাটাও অসঙ্গত নয়, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাদের গঠিত পার্লামেণ্ট কেন আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না? তবেই যেন দেখা যাইতেছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, আমাদের রাজা কোন এক বা বহুব্যক্তি নাই। না,—তাই বা বলি কি প্রকারে? প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ চলে না। যখন দেখিতেছি বর্ত্তমান সময়ে, একমাত্র মর্লে সাহেবের কথায় আমাদের পৌষমাস-সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তখন তাঁহাকে, তাঁহার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, আমাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা,দীন-দুনিয়ার-মালিক,রাজা, বাদশাহ, শাহনশাহ বলিব না কেন? আমাদের বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তই ঠিক। অতএব যদি তাঁহার মূর্ত্তি ঘরে ঘরে, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, স্কুল-আদালতে,আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নিত্য ফুল-বিল্বপত্র দ্বারা পূজিত হয়, তাহা হইলে বোধ হয় রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল হইবার কথা। তার পর, যদি মর্লের উপরে লাঙ্কাশীয়ারের বণিক-রাজগণের আধিপত্য থাকে সাব্যস্ত হয়, তাহাতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, তাঁহারা আমাদের পক্ষে নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থানীয় হইয়া থাকুন, মর্লে সাহেব নিশ্চয় সগুণ-ব্রহ্ম; আমরা সগুণেরই পূজা করিবার অধিকারী, নির্গুণের নয়।

এই ত গেল রাজপক্ষ হইতে রাজ-ভক্তি আদায়-উসুলের পর্ব্ব; অতঃপর অন্যদিকে যাওয়া যাউক। এই তুমুল আন্দোলনের মধ্যে ভারতবর্ষীয় জনসমাজের কোন ক্ষুদ্রাৎ-ক্ষুদ্রতর অংশের এক নিভৃত-কোণ হইতে ক্ষীণস্বরে রাজ-ভক্তির জন্য আব্দার শুনা যাইতেছে। ইঁহারা বলেন;—

"রাজভক্তি আমাদের ধর্ম্মের মূল, আমরা রাজা বা রাজপ্রতিনিধির অবজ্ঞা ও অবমাননা-সূচক কোন কথা, আমাদের কাগজে প্রকাশ করিতে একান্ত কুণ্ঠিত! অন্যায়াচারী দুশ্চরিত্র পিতা যেমন পুত্রকন্যার পিতৃভক্তি-লাভে বঞ্চিত হইতে পারেন না,তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশ, তাঁহার নিন্দা-রটনা করা পুত্রকন্যার পক্ষে যেমন পাপ, রাজা বা রাজপ্রতিনিধিগণ দস্যু তস্কর ও অত্যাচারী লোক হইতে, প্রজাবর্গের ধনমান জীবনরক্ষা করে, তাহাদের শিক্ষাদান এবং নানা প্রকার কুশল কল্যাণসাধন করেন বলিয়া, তাঁহারা পিতৃস্থানীয় এবং প্রজাবর্গ পুত্রকন্যা তুল্য। *

* যদি বাস্তবিক "India for the Indians" ভাবে আমরা শাসিত হইতাম, এ কথা খুব খাটিত; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কোথায়? লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন "স্বার্থের জন্য দেশজয় ও রাজত্ব। * * * * ইংরাজেরা নিস্বার্থ দেবতা নন।" তবেই ত গোলের কথা। ভাল,—স্বার্থের জন্যই হউক,—কিন্তু সে স্বার্থটার দৌড় যেরূপ চলিতেছে, তাহা কি ধর্ম্মানুমোদিত? পনর আনা সাড়ে তিন পাই, রাজজাতির স্বার্থই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতেছে। এবম্প্রকার অবস্থায়, অন্নাভাবে কঙ্কালসার ভারত কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা বা ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া, লেখকের গলা ধরিয়া নাচে? বর্ত্তমান রাজশক্তি প্রথমদিন হইতে রাজ্যশাসনের জন্য যে কিছু ব্যবস্থা করিতেছেন, মুখে যাহাই বলুন, আসলে কি তাহা নিজেদের ষোলআনা স্বার্থ-বজায় রাখিবার উদ্দেশ্য নয়? তাহা হইলে আর বাঁচি কৈ?

রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ অন্যায়াচরণ করিলেও, পুত্রকন্যা-স্থানীয় প্রজাগণ তাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট ও অসঙ্গত ব্যবহার করিতে পারে না। অবিশ্বাসিগণ স্বীকার করুন বা না করুন, আমরা বিশ্বাস করি, পিতা যেমন আমাদের প্রতিপালনের জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়োজিত, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ তদ্রূপ আমাদিগের শাসন-সংরক্ষণের জন্য ভগবানকর্ত্তৃক

এই লেখককে জিজ্ঞাসা করি যে, রাজভক্তি কি কখন কোন ধর্ম্মের "মূল" হইতে পারে? মূল মানে, ভিত্তি—যাহা না থাকিলে পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব,—যাহা হইতে সমস্ত আরব্ধ,—যাহা প্রথম, পরে আর সব। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ত কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কথা শুনা যায় নাই, রাজভক্তি যাহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান মত। সনাতনধর্ম্মে যে রাজভক্তির উল্লেখ আছে, সে রাজভক্তি প্রজারপক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কেননা, আর্য্য-শাসনকালে যে সকল নরপতি ছিলেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অংশবোধে পূজা করা যাইত, এবং তাঁহারাও, বাস্তবিক পিতৃস্থানীয় হইয়া, প্রাণপণে প্রত্যেক প্রজার কল্যাণসাধনে যত্নবান থাকিতেন। ধর্ম্মের অনুশাসনবাক্যই হউক, আর রাজ্যের আইনই হউক, অক্ষরের অনুসরণ করা কোথাও উচিত নয়—ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করাই উপদেষ্টার উদ্দেশ্য এবং উপদিষ্টের একমাত্র কর্ত্তব্য। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপ্রকাশ যে মানুষ না করে, সে প্রকৃতই ইহ-পরলোকে দণ্ডার্হ। এইজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রে রাজার ন্যায় রক্ষক, পালক, মহোপকারী ব্যক্তিকে ভক্তি করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। লেখককে আর একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে যে, ভারতবর্ষের এই ঘোর অবনতির কালেও, মানুষ কৃতজ্ঞতা হারায় নাই; রাজার নিকট সামান্য কিছু উপকার বা দুটা মিষ্টকথা শুনিলে, আপামর সাধারণ একেবারে গলিয়া যায়; সে ক্ষেত্রে, তাহাদের প্রতি রাজভক্তির অভাব আরোপ করা নিতান্ত অবিচার। জোর করিয়া কাহাকেও ভক্তি শিখান যায় না, ভারতবাসীকে ওবিষয়ে উপদেশ দেওয়া বাহুল্য, অনাবশ্যক। উক্তলেখক রাজপ্রতিনিধি শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, জানি না; আমাদের মতে ত বর্ত্তমান অবস্থায় বড়লাট হইতে কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সকলকেই রাজপ্রতিনিধি বলিয়া বোধ হয়; কারণ, সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, প্রজারপ্রতি রাজপুরুষগণ যে সকল আইন জারি করিয়াছেন, তাহার তামিল পক্ষে তদারকের সম্পূর্ণ ভার, সামান্য পুলিসের লোকের উপর দেওয়া হইয়াছে; প্রজার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তাহারা যেরূপ সংবাদ দিয়া থাকে, বড়লাট পর্য্যন্ত তাহাই গ্রাহ্য করেন; তদ্বিরুদ্ধে অতি সম্ভ্রান্ত প্রজারও কথায় কর্ণপাত করা হয় না। আমরা "পেয়াদা বাবার" রাজত্বে বাস করিতেছি, বলিতে হইবে—বুঝিতে হইবে; এই পেয়াদা হইতে বড়লাট পর্য্যন্ত অসংখ্য রাজপ্রতিনিধির হুকুম বেদবাক্যরূপে মানিয়া চলিতে, লেখক মহোদয় আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন কি? যে পারে সে পারুক, আমরা ত পারিব না, ইহাতে যদি প্রাণ যায় কি করিব, প্রাণটা ত যাইতেই বসিয়াছে; যে পথ দিয়া, যে ভাবে বাহির হউক না কেন, ফল একই। "পিতা যেমন ঈশ্বর নিয়োজিত, রাজাও তেমনি ঈশ্বর নিয়োজিত,"—লেখকের এই যুক্তিটী বড়ই সুন্দর! আমরা যতদূর বুঝি এই বিশ্বে যেখানে যাহা

হইতেছে, সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হইতেছে, কারণ সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই ঘটিতে পারে না। যদি কাহারও সন্দেহ হয়,—তাহা হইলে সংসারের অন্যায়, অত্যাচার, পাপ, ব্যভিচার প্রভৃতিও কি ঈশ্বরেচ্ছার অন্তর্গত?—উত্তরে বলিতে বাধ্য, নিশ্চয়। ঐ সকল আপাত-দৃষ্টিতে বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া ঈশ্বর সকলকে আপনার কোলের দিকে টানিতেছেন। এ সকল দার্শনিক বিচারের এখানে প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, সংসারে যাহা ঘটিতেছে সব ঠিক। ব্যষ্টিভাবে যত কেন অসঙ্গত বোধ হউক না, সমষ্টির সমগ্রস্রোত মঙ্গলের দিকেই ছুটিতেছে—মঙ্গলময়ের রাজ্যে এ কথা অস্বীকার করে, কাহার সাধ্য!

ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়, দেখা যাউক। বর্ত্তমানে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ইংলণ্ডের ইতিহাস কি বলে? ইংলণ্ড যদি বরাবর লেখকের মতে চলিত, আজ ইংলণ্ড এত উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত না। অতএব, অত্যাচারী নরপতি প্রথম চার্ল্‌সের প্রজাশক্তি দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া, পরে, ক্রম্‌ওয়েলের প্রোটেক্টরীর অধীনে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় রাজা গ্রহণ করা, সমস্তই ঠিক হইয়াছিল, সমস্তই বিধাতার অভিপ্রেত। নতুবা, ঐ সকল কর্ম্মের ফলস্বরূপ ইংরাজ-জাতির উচ্চশ্রেণীর স্বাধীন-ভাব দেখিয়া, সমগ্র সভ্যজগৎ কি প্রকারে শিক্ষালাভ করিত? ফরাসী-বিপ্লবের দিকে তাকাইলে, ঐ লোমহর্ষণ ব্যাপারকে কি পৃথিবীর পক্ষে মহা-শুভ-ফল-প্রদ বলিয়া বুঝা যায় না? অতএব লেখক কেন এরূপ বিভীষিকা দেখিতেছেন, জানি না। বীজাঙ্কুরবৎ প্রত্যেক কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। সিপাহী-যুদ্ধের পর এ যাবৎকাল ত কোনরূপ বিশেষ গোলযোগ হয় নাই; আজ হঠাৎ কেন এই তুমুল আন্দোলন? ইহা কি অনর্থক? ইহার কি কোনই উদ্দেশ্য নাই? ইহাতে কি বিধাতার অঙ্গুলি দেখা যাইতেছে না?

উপসংহারে, একটী মাত্র কথা বলিব। উক্তলেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধ নয়, আমরা তাঁহার কথার উত্তরে যাহা যাহা লিখিলাম, তাহাও বিধাতারই প্রেরণায়। আমরা যে উদ্দেশ্যে যে যাহা করি না কেন, ভগবান সে সকলকে লইয়া তাঁহার মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইবেন। এইসকল বর্ত্তমান কাণ্ডকারখানার দ্বারা প্রকৃত রাজা বাহির হইয়া, আমাদের নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে। এবং আমরা তখন হৃদয়ের প্রকৃত রাজভক্তি দ্বারা,ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।

ধ্রুবসত্য, এ দুর্দিন কখনই থাকিবে না,—এই বিপ্লবকারী তুফানের পর আমরা সুখময় শান্তি ভোগ করিবই, করিব। তখন লেখকভায়ার সহিত কোলাকুলি করিয়া দেখাইব যে, তাঁহার উদ্বেগের কোনই কারণ ছিল না। সর্ব্বমঙ্গলা আমাদিগকে শীঘ্র সেইদিন দিউন, ইহাই তাঁহার চরণে একান্ত প্রার্থনা।

শ্রী[illegible]

# জাপানের অভ্যুদয়। (৪)

চিকিৎসা

অনেকেরই ধারণা, যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ম্মপ্রাপ্তির সুযোগাভাবে,আমাদের দেশে অস্ত্র-চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে। জাপানে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিসাধনে এ অসুবিধা নাই। রুষ-জাপান যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া, জাপানী চিকিৎসক আজ সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছেন। শস্ত্রহত ব্যতীত, একটি সৈনিকও যাহাতে অন্যরোগে মারা না যায়, তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া, শত্রুর প্রভূতবল বিনাশে সাহসী হওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে, যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে যাহারা প্রাণ দেয়, রোগে প্রায় তাহার চতুর্গুণ মারা যায়। সৈন্যগণের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিতে পারিলে, সুতরাং,৫ লক্ষ সৈন্য লইয়া ২০ লক্ষের সম্মুখীন হওয়া যায়।

জাপানী চিকিৎসকের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে, আহত প্রায়ই সারিয়া উঠে। ইহাতেই তাঁহার কিন্তু কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। কোন স্থানে সৈন্যগণের উপস্থিতির পূর্ব্বেই, তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি লইয়া উপস্থিত হন। কোন্ কূপের জল পেয়, কোন্ জল অপেয়, টিকিট মারিয়া লিখিয়া দেন। সংগৃহীত-খাদ্যাদি সম্বন্ধেও এই পরীক্ষা চলে। কোন স্থানের স্বাস্থ্য একান্ত অনুপযোগী হইলে, সৈন্যগণকে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। রোগ হইলেই, রক্তবিন্দু লইয়া অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়, সংক্রামক-রোগ-বীজ দৃষ্ট হয় কি না এবং সেইমত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ইহা ব্যতীত, শিবিরে প্রত্যহ সৈন্যগণ সমক্ষে কিরূপে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখি[illegible] হয়, রন্ধন, ভোজন ও নিশাযাপন বিষয়ে কি প্রথা বিহিত,ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা বা উপদেশ-দান আছে। অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যতীত, রোগ-চিকিৎসাতেও জাপানী চিকিৎসকের কৃতিত্ব কম নহে। শুনা যায়,জনৈক জাপানী,রক্তআমাশয় রোগের বিজ্ঞানানুমোদিত কি এক উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন।

জাপানী শিষ্টাচার

আমাদের ন্যায়"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"-ই জাপানীদেরও নীতি। কথাবার্ত্তায়, কাহারও মনঃক্লেশের কারণ হওয়া, অত্যন্ত অসভ্যতার পরিচায়ক। মহর্ষি মনু কিন্তু সনাতনধর্ম্মের এই লক্ষণটার সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন,—

"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ,
মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চনানৃতং ব্রূয়াৎ, এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"॥

সত্য বলিও, প্রিয় বলিও, অপ্রিয়-সত্য বলিও না, আর প্রিয়কথার খাতিরে অনৃত বা মিথ্যা-কথা যেন বলিও না। জাপানীরা কিন্তু এতই ভদ্র, যে ভদ্রতা-রক্ষার্থ, উঁহারা অনৃতবাদিত্বও বরং বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ভদ্রতার গৌরব সকলেই বুঝেন, কিন্তু—সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। শুনা যায়, মুসলমান আমলে, এদেশের আদব কায়দা ও ভদ্রতার কিছু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। "আপ্ আগাড়ি উঠিয়ে"—করিতে করিতে দুজনেরই ট্রেন ফেল হওয়ার গল্প অনেকেই অবগত আছেন। জাপানী আদব কায়দা ঐ প্রকৃতির কি না,ঠিক বলিতে পারিলাম না। জাপানী এটিকেট মতে, 'তুমি তোমার সমবয়স্ককেও, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের ন্যায় সম্বোধন করিবে ও তাহার সহিত তদ্রূপ

ব্যবহারে প্রয়াস পাইবে। বালকের সহিত কথোপকথন কালেও,মাথা হইতে টুপি খুলিবে। আজ কাল জাপানীরা টুপির ব্যবহার শিখিতেছেন। পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর সেন দেখিয়া আসিয়াছিলেন,তাঁহাদের অনেকেরই মাথা খোলা। একাধিক ব্যক্তিসহ গৃহ প্রবেশকালে, নিজে সর্ব্বপশ্চাৎ যাইতে ভুলিবে না,—ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুনাযায়,লক্ষ্ণৌ সহরের মেছুনীরাও যেমন সংযতভাষা ব্যবহার করিতে পারে, সমগ্র জাপানে তদ্রূপ, গালাগালির সময়েও, কেহ অশ্লীল অপভাষা-প্রয়োগে কলঙ্কার্জ্জন করে না। 'প্রবাসী' পত্রে, স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় জাপান হইতে লিখিয়াছিলেন,—"জাপানে সহস্র সহস্র মাইল ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু এক "বাকা," অর্থাৎ বোকা, এবং "নিকুরাশি" বা ঘৃণারপাত্র ব্যতীত, ক্রুদ্ধ হইলেও, অন্য কোন কুবাক্য বলিতে কাহাকেও শুনি নাই।" সত্য হইলে,ইহা নিরতিশয় সুখের ও বিস্ময়ের বিষয় বটে।

### বুশিদো

আমরা নীতিশিক্ষা বলিলে যাহা বুঝি, বুশিদো তাহাই। জাপানে প্রতি বিদ্যালয়ে এখন ইহার শিক্ষাদান হয়। সংযম, সন্ন্যাস ও বীরধর্ম্ম মিলাইয়া ইহা গঠিত। প্রায় দেড় সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই,সামুরাইগণ এই নীতির আদর্শে চালিত। ইহা পুস্তকবিশেষ হইতে সংগৃহীত নহে। জগতের সর্ব্বত্র বীর-রসাত্মক যে সমস্ত নীতি পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের সংমিশ্রণে ইহার পুষ্টিসাধনে কোন বাধা নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও রাজস্থানের বীরচরিত সমূহ, মহারাষ্ট্রীয়গণের গোব্রাহ্মণহিতায় দেহপাত, শিখগণের "গুরুজিকা ফতে," আনন্দমঠের নব-ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম্ম, ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের কালুডোম, লখ্যা ডোমনী, ও লাউসেনের কার্য্য-কলাপ প্রভৃতি হইতে আমরা বুশিদের মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। বুশিদো-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই, জাপানীসৈনিক আত্মোৎসর্গ ব্যাপারে আজ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'ভারতী' পত্রে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "বুশিদো" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বুশিদো বা জাপানী ক্ষাত্র-ধর্ম্মোপদিষ্ট দু একটি নীতির তিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন:—"বিবেক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, অবিচলিতভাবে কোন কার্য্য অনুসরণ করার নাম—ঋজুতা। ঋজুতা ব্যতীত, শুধু গুণে কিম্বা বিদ্যায়, সামরাই হওয়া যায় না। যদি শুধু ঋজুতা থাকে, আর কোন গুণ না থাকিলেও, কিছুই যায় আসে না। উচিত কাজ করাকেই সাহস বলে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা জানিয়াও যদি না করা যায়,তাহা হইলে তাহাতে সাহসের অভাব প্রকাশ পায়। যখন বাঁচিয়া থাকা উচিত,তখন বাঁচিয়া থাকা—যখন মরা উচিত, তখন মরিতে পারাই প্রকৃত সাহসের কাজ; নতুবা, অযোগ্য কার্য্যের উদ্দেশ্যে যে মৃত্যু, সে মৃত্যু কুক্কুরের মৃত্যু"। নব্যজাপান লেখক বলেন, বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতির ন্যায় বুশিদো জাপানীদের প্রধান নীতিশাস্ত্র এবং জাপানীরা এই গ্রন্থকে ভগবান্ ভাস্করের মুখ নিঃসৃত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

### ধর্ম্ম-বিশ্বাস

কাহারও ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন কথা বলা সহজ-ব্যাপার নহে। আপনাপন হৃদয় অনুসন্ধান করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে, উহা কিরূপ পরিবর্ত্তিতাকার ধারণ করে। মানসিক অবস্থানুসারে একই দিনে কখন জ্ঞান, কখন কর্ম্ম, কখন বা ভক্তির প্রাধান্য অনুভূত হয়। একই কথার অর্থ কত না নূতন ভাব ধারণ করে। কর্ম্মের

অর্থ কখন পূজা-প্রার্থনাদি, কখন বা দয়া-বৃত্তি প্রণোদিত অনুষ্ঠানাদি, কখন বা সচ্চরিত্র-গঠন মাত্র। কখন মনে হয়, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের আদেশমত, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান; কখন ক্লান্ত-হৃদয় ভয় পায়, অজ্ঞ আমরা নানা কারণে যথাবিধি ঐ সমস্ত ক্রিয়া সম্যক্-রূপে অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে পারি না, অতএব, ভক্তি, প্রার্থনা প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ। কখন মনে হয়, ভক্তি, প্রার্থনা প্রভৃতিতে কল্পনা লইয়াই খেলা হয় মাত্র। ঈশ্বর শুনিলেন কিনা, তুষ্ট বা রুষ্ট হইলেন—প্রমাণ কি? অতএব সৎকর্ম্মানুরক্তিই শ্রেষ্ঠ। আবার কখন মনে হয়, চিরকাল এই দুঃখময় সংসারের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া, আজীবন আত্মত্রাণে রত থাকাই বা সার কিসে? যাঁহার সংসার, তিনি ত রহিয়াছেন, আমার পূর্ব্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন, তবে আর সাধ করিয়া অহর্নিশি, পীড়িত, বুভুক্ষিত, ব্যাধিগ্রস্ত বা বিপন্ন-মাঝারে দিন কাটাইবার,—এ অপার নরক-সাগরে ডুবিয়া থাকিবার—প্রয়োজন কি? এ রহস্যময় সংসারে, এক জনের সুখে আর এক জনের দুঃখ বাড়ে। দেবগণ বাড়িলেন ত দৈত্যগণ কাঁদিলেন,—আবার দৈত্য যদি বাড়েন, তবে দেবগণ কাঁদেন। বাঁচিয়া থাকিলে কোটিজীবের দুঃখের কারণ হই, এবং হয় ত অত্যল্প-সংখ্যকের আরও অত্যল্প-পরিমাণ সুখের কারণ হই। কত মাথা কুটিয়া, কত প্রার্থনা করিয়া, কত উচ্চ-আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, একটুকু আশা হয়ত পূর্ণ হয়। এত সাধ্য-সাধনা করিয়া, শক্তিময়ের নিকট হইতে এতটুকু শক্তি যাচিয়া না লইলেই নয় কি? সত্যই কি এক একবার মনে হয় না, যে শক্তিটুকু মূলধন দিয়া ভগবান্ জগতে পাঠাইয়াছেন, সাধ্য থাকিলে তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতাম। সমুদয় কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ পূর্ব্বক, প্রকারান্তরে করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র এ সংসার হইতে চির-বিদায় লাভে—ত্রিবিধ দুঃখের অতীত, সেই মুক্তি-লাভে—আগ্রহ হয় না কি?

নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস-সম্বন্ধে যখন এই অনিশ্চিত ভাব, তখন অন্য দু এক জনের নহে, সমুদয় একটা জাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন কথা কহিলে, তাহা কতদূর যথার্থ হইবে, সহজেই অনুমেয়। তথাপি ধর্ম্ম-বিশ্বাস বিনা কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না। স্থূলদৃষ্টিতে জাপানীদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস যতদূর দেখা যায়, তাহাই মাত্র বলিতে আমরা সমর্থ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন বলেন, "জাপানে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। দেব দেবী, ভূত প্রেত, দানব দৈত্যের অভাব নাই; পাহাড় হ্রদাদি, প্রত্যেক প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে এক একটা অদ্ভুত পৌরাণিক গল্প সংশ্লিষ্ট। মন্দিরাদিতে, আমাদের দেশের জৈনদের মত, 'ওটা' (এক প্রকার সম্মার্জ্জনী) ও দর্পণ রক্ষিত। অশিক্ষিত জাপানীরা এখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন;—পৃথিবী একটা বৃহৎ নিদ্রিত মৎস্যের উপর রক্ষিত; মীনরাজ জাগিয়া উঠিয়া ডানা নাড়িলে ভূকম্পন উপস্থিত হয়।" কাঙ্গাড়া ভূকম্পের পর, কিন্তু, শিক্ষিত জাপানী পণ্ডিতের, ভূকম্পবিষয়ক অন্যবিধ মত, সকলে সাগ্রহে শুনিয়াছিল। শিন্তো-ধর্ম্মের একটা বিশ্বাস এই, শৃগাল, ব্যাঘ্র বা অন্যপ্রাণী, কখন কখন ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্য-সাধন জন্য মানব-রূপ পরিগ্রহ করে। মন্দিরাদিতে প্রবেশ-কালে, নিজের জুতা পরিত্যাগ করিয়া, তথায় রক্ষিত নেকড়ার জুতা পরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। জাপানীরা তীর্থদর্শন পুণ্য

কর্ম্ম মনে করেন। কোন কোন তীর্থের বর্ণনা পাঠকালে, ভারতীয় প্রাচীন তাপসগণের আশ্রম বলিয়া ভ্রম হয়। "নারা" জাপানের প্রাচীন রাজধানী; বর্ত্তমান সভ্যতালোকে ইহা এখনও আলোকিত হয় নাই। সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী প্রতিবৎসর এখানে আগমন করে। এখানে বিস্তর পোষা হরিণ বনে জঙ্গলে সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সমস্ত আশ্রম-মৃগ, যাত্রিগণের হাত হইতে খাবার খাইতে ভয় পায় না। জাপানীরাও বোধ হয়,আমাদের ন্যায় তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাসবান্। "সাঞ্জু-সাঙ্গেণ্ডু" মন্দিরে, প্রায় পাঁচ ফিট উচ্চ, বড় বড় বিস্তর দেবপ্রতিমা দৃষ্ট হয়। অনেক দেবতারই বহু-হস্ত ও বহু-শির। সূর্য্য, চন্দ্র, সুদর্শন চক্রের ন্যায় কর্ম্মচক্র, পদ্মফুল, কপাল বা নরমুণ্ড, পরস্তু, মন্দির ও অন্যান্য বহুবস্তু এইসব হস্তে শোভা পায়।

একটী দেবতার মস্তকে সত্যসত্যই একটা নর-কপাল শোভা পাইতেছে। উহার সম্বন্ধে প্রচলিত-কাহিনী এই—সাত শত বৎসর পূর্ব্বে যিনি মিকাডো ছিলেন, তাঁহার একবার কঠিন শিরঃপীড়া জন্মে। কোন চিকিৎসাতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে, রাজা একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, পূর্ব্বজন্মে তিনি একজন পুরোহিত ছিলেন, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে এ জন্মে সম্রাট্ হইয়াছেন, কিন্তু, তাঁহার পূর্ব্বদেহের শির এখনও নদীগর্ভে পড়িয়া আছে ও তাহার ভিতর একটী গাছ জন্মিয়াছে। বায়ুভরে এই গাছটী দুলিলেই, তাঁহাকে শিরঃপীড়ায় ঐরূপ কাতর হইতে হয়। পরদিন অনুসন্ধান করিয়া রাজা নদীমধ্য হইতে আপনার পূর্ব্বশির তুলিয়া আনেন ও দেব-মস্তকে তাহা পরাইয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস জাপানীদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। পরিশ্রান্ত শ্রমজীবীর মুখে শুনা যায়—"অদৃষ্টে দুঃখ আছে,না সহিয়া গতি কি?" দাসদাসীকে বিপদকালে বলিতে শুনিবে—"কে জানে কোন্ কর্ম্মবশে, তোমায় আমায় একত্র থাকিতে হইতেছে।" অপরাধী রাজদ্বারে দোষ-স্বীকার কালে বলে—"জানিতাম উহা অসৎকার্য্য, কিন্তু কি করিব, পূর্ব্বকর্ম্মফলে সুমতি প্রকাশ পাইল না।" অত্যাচারিত এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়, অদৃষ্ট বৈগুণ্যে তাহার ঐ লাঞ্ছনা ঘটিল। জননী শিশুকে ভয় দেখান—এই এই কার্য্য করিলে, পরজন্মে এই এই দণ্ড হইবে। পথভিখারী ভিক্ষালাভ করিয়া আশীর্ব্বাদ করে, পরজন্মে যেন ভিক্ষাদাতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্থবীর সানন্দ-চিত্তে মৃত্যু প্রতীক্ষা করেন, কারণ, মৃত্যুর পর নবদেহ লাভ হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের দেশের ঠাকুরঘরের ন্যায়, প্রায় প্রতি জাপানীগৃহেই,দুইটি করিয়া পবিত্রস্থল আছে। একটীর নাম শিন্তোবেদী বা 'কামিদানা,' অপরটীর নাম বুদ্ধ-বেদিকা। কামিদানা একটী কাঠের সিংহাসন বা শেল্‌ফ মাত্র, মধ্যে "টাইমা" বা "ওনুসা" নামে পবিত্রবস্তু রক্ষিত। আমাদের শালগ্রাম শিলা, নদীবিশেষে প্রাপ্ত,প্রস্তরীভূত সম্বুকমাত্র। জাপানী টাইমা কিন্তু, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদের ন্যায়, আইসি-নগরস্থ "দাইজিঙ্গু" দেবীর নৈবেদ্য বা প্রসাদের অংশমাত্র। ইনি উহাদের রাজবংশের প্রসূতি। সম্প্রতি, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সম্রাট্ এবং এডমিরাল টেগো, যুদ্ধজয়ান্তে, এই দেবতার মন্দিরে পূজা দিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরান্তে, এই দেবতার মন্দির হইতে প্রতি-

রাজভক্ত জাপানী গৃহে নৈবেদ্যের কিয়দংশ বিতরিত ও তাহা ঐরূপে সযত্নে সংরক্ষিত হয়। উক্ত প্রসাদ ব্যতীত, এই কাষ্ঠাধারে, বাস্তু-দেবতা ও অন্য শিন্তো দেবতাকে উৎসৃষ্ট পদার্থাদিও রক্ষিত হইয়া থাকে। শিন্তো ধর্ম্মাবলম্বী সংসারে, স্ববংশীয় পিতৃদেবগণের পূজার্থ আরও একটি কাষ্ঠাধার বা কামিদানা রক্ষিত হয়। উহাতে, ঘটকগণের কুলজি-গ্রন্থের ন্যায়, পিতৃ-পুরুষগণের বংশ পরিচয়, বয়স, মৃতাহ প্রভৃতি লিখিত থাকে।

আমাদের মাসিক, একোদ্দিষ্ট, মহালয়া, নান্দীমুখ প্রভৃতি শ্রাদ্ধাহের ন্যায়, জাপানেরও পর্ব্বাহ সংখ্যা অল্প নহে। পিতৃপুরুষের পূজা বা শ্রাদ্ধার্থ দিবস,মাস ও বৎসর নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা ব্যতীত,তর্পণ পক্ষে, আমাদের গঙ্গাতীরে তর্পণের ন্যায়, উঁহাদেরও নির্দ্দিষ্টকালে—সাধারণতঃ ১৩ই জুলাই হইতে ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত—ঘরে এবং শ্মশানে উভয় স্থানে শ্রাদ্ধ বা পূজা করিতে হয়।

ফলতঃ, পিতৃদেব পূজাই জাপানের প্রধান আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম। নববর্ষ, সম্রাটের জন্মদিন এবং সম্রাট বংশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার্থ দিবসগুলি, জাতীয় পর্ব্বাহ-রূপে পরিগণিত হয়।

পর্ব্বদিনে, উদীয়মান সূর্য্যদেবের চিত্রাঙ্কিত জাপানের জাতীয়-পতাকা প্রতি গৃহেই শোভা পায়। সকলে বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া বাহির হন। বালক বালিকাগণ বিদ্যালয়ে সমবেত হইয়া, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর চিত্রসম্মুখে প্রণাম করে। অনন্তর, শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে সম্রাটের ঘোষণাবাণী পড়িয়া শুনাইয়া, উহার অর্থ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

জাপানীদের ধর্ম্মবিশ্বাসে এইরূপ দেব পূজা, রাজপূজা, রাজবংশীয় ও স্ববংশীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের পূজা মিশিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষ-গণের পূজা, জাপানের ন্যায় চীনে, এবং সম্ভবতঃ, তীব্বতেও খুব প্রচলিত। ধর্ম্মসাম্য সংস্থাপনে ইচ্ছা থাকিলে, শ্রাদ্ধের উপর আমাদের অনুরাগ আবার বাড়াইতে হইবে। দেবতার মধ্যে দেখা যায়, বাঙ্গলার শক্তি-পূজা খুবই প্রচলিত আছে। যাঁহারা বলিয়া-ছেন "কলৌ জাগর্ত্তি কালিকা," কিম্বা কলিতে তন্ত্রের আদর বাড়াইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশ বেড়া-ইয়া আসিয়াছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু একটা বিচিত্র ব্যাপার এই, এখনও তীব্বত ও চীনে, শিব ও তারার পূজা হয়। লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, একজন চৈন, কালীঘাটে আসিয়া, বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া, শ্রীশ্রী৺কালিকা দেবীর সম্মুখে প্রণাম করি-তেছে, পাণ্ডারা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছে ও কেহ কেহ বিরক্ত করিতেও ছাড়িতেছে না। এই কালীঘাটেই একবার একজন তরুণ বয়স্ক, মুণ্ডিতমস্তক মগ-ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হয়; তিনি, সম্ভবতঃ পুণ্যতীর্থ বোধে, এই খানে পিতৃশ্রাদ্ধ জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, সময়াভাবে, ইহাঁর ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই,ইংরাজিতে দু একটি কথায় উঁহার আগমন-উদ্দেশ্য অবগত হইয়াছিলাম মাত্র। শুনা যায়, মুসলমান অধ্যুষিত সুদূর আফগানভূমি হইতেও, হিন্দুযাত্রীর এখানে মধ্যে মধ্যে শুভাগমন হয়। কালীঘাটের অশি-ক্ষিত জনসাধারণ ইঁহাদের সমুচিত আদর করিতে পারেন না। কৈলাস শুধু আমাদেরই তীর্থ নহে। চীনদেশে দশ-মহাবিদ্যা ও পঞ্চ মুনির (শ্রীশ্রীপঞ্চানন, মহাদেব নহেন ত? ইনিও ত সমাধি-মগ্ন মহাযোগী-রূপে কল্পিত হন) পূজা হয়। তীব্বতে কালীমামা বা কালীর

সন্ন্যাসীদের আদর অধিক। ভারতের নানা স্থানে বিস্তর কালীবাড়ী কত অনাথের প্রতিপালনে সাহায্য করে, কে সংবাদ রাখে। শুনা যায়, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের সহিত, ৺ রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও মহা-কালিকা-দেবীর উপাসনা নূতন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ভারতে কেহ রাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ বা অন্যান্য দেবতার উপাসক; ইঁহাদের মধ্যে গোঁড়ারা নিজ আরাধ্য ব্যতীত,অন্য দেবের উপাসনার নামে খড়্গহস্ত; বাঙ্গলার শাক্তগণ কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকটা সার্ব্বভৌম-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। যাঁহার যিনিই ইষ্টদেব হউন না কেন, গৃহে শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজায়, বা বারমাসে তের পার্ব্বণে অথবা সময়ে অসময়ে,শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের "সিরণী" অবধি দিতে বাধা নাই। ইহা যে ধর্ম্মবিশ্বাস শৈথিল্যের পরিচায়ক, এমন ত মনে হয় না। সেটা স্বীয় গুরুপদিষ্ট অভীষ্টদেবের প্রতি ভক্তি বা অভক্তি দ্বারা পরিমিত হয়। কোথায় যেন পড়িয়াছি, এই বাঙ্গলার লোকেই পূরাকালে তীব্বতের ধর্ম্মসংস্কার সাধনে সক্ষম হইয়াছিল। সম্প্রতি 'সঞ্জীবনীতে' জাপান-প্রবাসী ভারতবাসী আমাদিগকে জানাইয়াছেন, একসময় ভারতবর্ষ উঁহাদের নিকট স্বর্গভূমি ও ভারতবাসী স্বর্গবাসীরূপে পরিগণিত ছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে উঁহাদের নিকট ক্রমশঃ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইতেছে। উক্তপত্রেই আমরা অবগত হই, কোন কোন বিষয়ে জাপানীরা আমাদের অপেক্ষাও হীনাবস্থায় রহিয়াছেন। বৎসর কত পূর্ব্বে, আমরা যেমন টুল্মো পণ্ডিতদের উপর জাতক্রোধ হইয়া, অমুক অমুক বিষয়ে বৃহস্পতি, পরাশর, সারণ বা শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা কি জানিতে না চাহিয়া, তৎপরিবর্ত্তে মিল, স্পেন্সার, কোমৎ, মোক্ষমূলর প্রভৃতির মতে চলিতাম, এবং এখন,সেই সব স্থলে, একটা স্বকীয় স্বাধীনমত স্থাপনের ক্ষীণ প্রয়াস পাই, জাপানের এখনও এতটুকু প্রতীচ্য-মোহও বোধ হয় কাটে নাই। উক্ত পত্র প্রেরকের মতে, জাপানীদের চক্ষে ইংরাজ ও আমেরিকগণের মতামতই একমাত্র প্রমাণরূপে গণ্য হয়। এদেশের অবস্থা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, ইহার একটা প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই আসিবে অথবা আসিয়াছে। আমাদের পার্থিব উন্নতি নানা কারণে এখন প্রতিহত, কিন্তু তজ্জন্য মাথা হেঁট করিবার কারণ নাই। জাপানকে একবার আমাদের চিন্তাশক্তির সহিত পরিচিত করিতে পারিলে, ভাল হয়। আমাদের সংহিতা, গীতা, উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, কাদম্বরী, শকুন্তলা প্রভৃতির সহিত জাপানকে কেহ কি পরিচিত করিবার ভার লইতে পারেন না? জাপান-প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কি তথায় দোল-দুর্গোৎসব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালীপূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা উভয় দেশ মধ্যে প্রকৃষ্টতর পরিচয় স্থাপনে সাহায্য করিতে পারেন না? আমাদের দার্শনিকগণ উত্তম, মধ্যম, অধম প্রকৃতির উপযোগী করিয়া, এই সমস্তের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। নানা দেশ ঘুরিয়া জাপান, তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার সাধন আপাততঃ অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন, কিন্তু এখনও হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে এমন সাদৃশ্য আছে, যে চেষ্টা পাইলে ওদুটাকে একই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্লীন করা যায়। এ চেষ্টা করে কে? চিকাগো-জয়ী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত চেষ্টা পাইতেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য সম্প্রদায়ের এ বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

যেমন এদেশে, তেমনই জাপানেও বোধ হয় ধর্ম্মহীন-শিক্ষা-প্রভাবে শিক্ষিতলোকের ধর্ম্মবিশ্বাস বহু পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। একজন জাপানী পণ্ডিত স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, খ্রীষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে তুল্য মূল্য; ঠিক যেন কাল ও সবুজ চা। দুটাই তেজোবর্দ্ধক, যেটা ইচ্ছা যায় সেবন কর। আর একজন জাপানী পণ্ডিত খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের বহু নিন্দা করিয়াছেন;—একদিকে উহা অত্যধিক কোমলতা শিক্ষা দেয়, মানুষকে নারীজনোচিত গুণে বিভূষিত করিতে প্রয়াস পায়, কার্য্যে কিন্তু পিশাচেরও অধমরূপে পরিণত করে। খ্রীষ্টিয়ান প্রজা, বহুবার রাজহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছে। জাপানীর চক্ষে, এতদপেক্ষা মহাপাতক বোধ হয় আর নাই। বর্ত্তমানকালে খ্রীষ্টিয়ানগণের উৎপাতেই অবশিষ্ট জগৎ সন্ত্রস্ত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাপানের ধর্ম্ম-সংস্কার সাধনার্থ, দেশে বিদেশে একটা কমিশন প্রেরিত হইয়াছিল। নানা দেশ ঘুরিয়া আসিয়া ইঁহারা রিপোর্ট দিয়াছেন, জাপানের ধর্ম্ম-সংস্কার-সাধন চেষ্টায় আপাততঃ প্রয়োজন নাই। ফর্ম্মোসা দ্বীপবাসিগণের সহিত ব্যবহারকালেও, জাপানীরা ইংরাজদের অনুকরণে দ্বীপবাসিগণের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। উদারতার ন্যায়, ইহা ধর্ম্মবিশ্বাস-শৈথিল্যেরও পরিচায়ক হইতে পারে।

'পজিটিবিষ্ট রিবিউ' এর লেখক ফ্রেডরিক হ্যারিসনের মতে জাপানীরা যে পিতৃপুরুষের পূজা করে, তাহা তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মাত্র। পরজন্মে তাঁহাদের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস-বশতঃ করে না। প্রত্যক্ষাতীত আত্মাস্বরূপ কোন বস্তুতে তাঁহারা বিশ্বাসী নহেন। মৃত্যুর পর, পিতৃপুরুষদের সহ মিলন হইবে, জাপানীরা কল্পনা করিতে পারেন না। এ মত কতদূর সত্য, বলা যায় না। আমরাও জন্মান্তরে বিশ্বাস করি, অথচ শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিও করিয়া থাকি। মৃত্যুর পরক্ষণেই পৃথিবীতে জন্ম হয় না ভাবিলেই হইল। ক্রমশঃ

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

# স্ত্রী-পুং ভেদ। (৯)

## অপুংজনন

তবেই জীবরাজ্যে এই সাধারণ নিয়ম প্রতিপন্ন হইতেছে। জীবদেহ প্রথমতঃ অচিহ্নিত, তৎপরে স্ত্রী ও পুং উভয় চিহ্নিত এবং অবশেষে, কেবল স্ত্রী অথবা পুং, এই একচিহ্ন বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কীট ও পতঙ্গ শ্রেণীর কোন কোন জীব, প্রথম বয়সে পুং-চিহ্ন যুক্ত, পরিণত বয়সে, স্ত্রী-চিহ্ন যুক্ত; কেহ বা গ্রীষ্মে স্ত্রীচিহ্ন যুক্ত—অপত্য ধারণ করে, শীতে পুং চিহ্নিত—অপত্য প্রসব করে; অথবা, স্বয়ংই ঐ দুই ঋতুতে ঐ দুই লক্ষণ-যুক্ত হয়; কেহ বা সম্মুখ ভাগে পুং-ধর্ম্মযুক্ত, পশ্চাদ্ভাগে স্ত্রী-ধর্ম্মযুক্ত। উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যেও কোন কোন শ্রেণীতে নিম্নস্থ পুষ্প স্ত্রীচিহ্ন-যুক্ত, ঊর্দ্ধস্থ পুষ্প পুং-চিহ্ন-যুক্ত; এবং অনেক পুষ্পে স্ত্রী ও পুং উভয় চিহ্নই দেখা যায়। এই সকল ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, সেই পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে হয়। (১) অচি-

(১) নব্যভারত, ১৩১২,—২৯৮ হইতে ৩০১ পৃষ্ঠা।

হ্নিত কোষের পুষ্টিতেই স্ত্রীত্ব, আর অপুষ্টিতেই পুংত্ব। এই কথাই অন্যরূপে বলিলে বলা যায় যে, গঠন অথবা পোষণ ক্রিয়াই স্ত্রীত্বের অনুকূল, এবং ধ্বংস-ক্রিয়াই পুংত্বের অনুকূল। এ বিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছি। উপরে উভচিহ্নতা সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা দেখা গেল, তাহাতেও এই এক সাধারণ নিয়মই পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বয়সে, কোষের অপুষ্টিতাবশতঃ পুংজাতীয় কীট অথবা পতঙ্গের উৎপত্তি, আর পরিণত বয়সে, কোষের পুষ্টিতাহেতু স্ত্রীজাতীয়ের উৎপত্তি; ঐ নিয়মই পালন করিতেছে। গ্রীষ্মকালে তাপ, আলো, এবং আহার্য্যের প্রচুরতা-প্রযুক্ত স্ত্রী-চিহ্ন-বহুলতা, আর শীতকালে এই সকলের অল্পতা নিবন্ধন পুং-চিহ্ন বহুলতা; ঐ নিয়মই রক্ষা করিতেছে। কারণ, ঐ সকলের প্রাচুর্য্যেই কোষের পুষ্টি এবং অসদ্ভাবেই অপুষ্টি। উদ্ভিদের নিম্নদেশে রসের আধিক্য, ঊর্দ্ধদেশে বিরলতা; সুতরাং, নিম্নে স্ত্রী-পুষ্প এবং ঊর্দ্ধে পুং-চিহ্নিত পুষ্প হওয়ায় ঐ নিয়মই অনুসৃত হইল। অচিহ্নিত, অথবা উভচিহ্নিত অবস্থায় আহারের অসদ্ভাবে পুংত্ব ও প্রাচুর্য্যে স্ত্রীত্ব উৎপন্ন হয়; ইহা অনেকবার পরীক্ষিত হইয়াছে। (২) সুতরাং জীবকোষের আলোচনায়, এবং প্রাপ্তবয়স্ক জীবগণের আলোচনায় আমরা পূর্ব্বে যে সাধারণ নিয়ম অবগত হইয়াছিলাম, (৩) উভচিহ্নতার আলোচনায়ও সেই নিয়মই দৃঢ়ীভূত হইল। অচিহ্নিত অবস্থায় স্ত্রী ও পুং-চিহ্ন একত্রিত ও সাম্যাবস্থ; চিহ্নিত অবস্থায়, আহারের সদ্ভাবে অথবা অন্যপ্রকারে গঠন-ক্রিয়ার আধিক্য হইলে, স্ত্রীত্বের বিকাশ; আর আহারের অসদ্ভাবে, অথবা অন্য প্রকারে ধ্বংসক্রিয়ার আধিক্যে, পুংত্বের বিকাশ—জীব-রাজ্যের এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, স্ত্রী-পুং ভেদ আলোচনা করিতে গেলে, আর একটী ঘটনা বিশেষরূপে প্রণিধান করা উচিত। আমি অপুংজাত জীবের কথা উল্লেখ করিতেছি। যে সকল স্থলে, পুং-জাতীয় কোষের অনুপ্রাণন ব্যতীতও, স্ত্রী-ডিম্ব বর্দ্ধিত হইয়া অপত্যরূপে পরিণত হয় (Parthenogenesis), সে সকল স্থলের কথা বিবেচনা না করিলে, স্ত্রী পুং ভেদের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না।

কতিপয় ঘূর্ণ কীট (৪) (Rotifera) শম্বুক, এবং দ্বিপক্ষ মক্ষিকা (৫) অনেক সময়েই অপুংজাত হইতে দেখা যায়। কোন কোন মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, রেশমকীট ইত্যাদির মধ্যেও এইরূপ ব্যবহার কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা পুং-সংস্পর্শ ব্যতীতও, পুনঃ পুনঃ ডিম্বপ্রসব করিয়া থাকে।

আবার, কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, পুং-সংসর্গজাত ডিম্ব রীতিমত প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, সেই ডিম্ব (যদি স্ত্রী-জাতীয় হয়, তবে) পুংসংযোগ ব্যতীতও ডিম্বপ্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু, এইরূপে অপুংজাত অপত্য প্রায়ই পুংজাতীয় হয়; আর ঐ পুংজাতীয় অপত্য অকর্ম্মা এবং অলস হয় (Drones)। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যে, স্ত্রীজাতীয়গণের ডিম্ব-প্রসবই একমাত্র কর্ম্ম; ইহাদিগের প্রায় অন্য কোন কর্ম্ম নাই।

(২) Young raised the percentage of females in one brood of tadpoles from 56 in those unfed, to 78 in those fed with beef. —Ency. Brit., 9th Ed, Vol., 21 p. 722; নব্যভারত, ১৩১১,—৬৪৫ পৃষ্ঠা।

(৩) নব্যভারত, ১৩১২,—৫০১ হইতে ৫০৫ পৃষ্ঠা।

(৪) ইহারা বর্ষাকালে ডোবা, খাল ইত্যাদিতে থাকে। ক্ষুদ্র লম্বা ডিম্বের ন্যায়, গাত্রে সূক্ষ্ম রোম আছে।

(৫) মশক, প্রভৃতি।

যাহারা কর্ম্ম করে, এবং তত্তৎ-সমাজের নানাবিধ পরিচর্য্যা করে, তাহারা ক্লীব; অর্থাৎ স্ত্রী-জাতীয়, কিন্তু তাহাদিগের স্ত্রী-কোষ অপরিণত, সুতরাং কার্য্যক্ষম নহে। আর যাহারা পুং-জাতীয়,তাহারা অলস ও অকর্ম্মা। উহাদিগের পুং-কীট (Spermatozoid) প্রকৃত স্ত্রী-জাতীয়গণের ডিম্বকে অনুপ্রাণিত করিলেই,উহারা (পুং-জাতীয়েরা) মরিয়া যায়। তাহাদিগের অলসজীবনে, এই অনুপ্রাণন ভিন্ন, অন্য কর্ম্ম নাই। স্ত্রী-জাতীয় মধুমক্ষিকা, পুংজাত ডিম্ব প্রসব করিলে, সেই সকল ডিম্বের মধ্যে কতিপয় ডিম্বকে সঞ্চিত-পুং-কোষ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া, স্ত্রী-জাতীয়ে পরিণত করে; কিন্তু যাহাদিগকে ঐরূপ করে না, তাহারা আপনা হইতেই 'অকর্ম্মা' পুং-জাতীয়ে পরিণত হয়। (৬) কোন কোন অতি ক্ষুদ্র শম্বুক-শ্রেণীস্থ জীব ক্রমাগত অনেকবার অপুংজাত ডিম্ব প্রসব করে; কিন্তু, এইরূপে তাহার সঞ্চিত পুংশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেলে, তাহার পর আর অপুংজাত ডিম্বপ্রসব করিতে পারে না। তখন পুং-জাতীয়ের সাহায্য আবশ্যক হয়। গোলাপের কীট (Aphide), বহুবার অপুংজাত ডিম্ব প্রসব করতঃ, অবশেষে পুংসাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রায়ই শরৎকাল অথবা শীতের প্রারম্ভে,যখন আহারের অসদ্ভাবে দেহঃপোষণের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেই সময়েই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন দ্বিপক্ষ মক্ষিকার (Diptera) গর্ভস্থ ডিম্ব, মাতৃদেহের রসাদি গ্রহণ করতঃ বর্দ্ধিত হয়; তাহাতে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। কিন্তু, তাহার নিজেরও যথাসময়ে দেহ মধ্যে অপুংজাত ডিম্ব উৎপন্ন হইয়া, রসাদি শোষণ করতঃ স্বয়ং বর্দ্ধিত হইয়া, তাহাকে মারিয়া ফেলে। এইরূপে ইহাদিগের অনেক বংশপরম্পরা পর্য্যন্ত অপুংজাত ডিম্ব উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও রীতিমত জীবে পরিণত হয়। অনেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট, যাহারা আমাদিগের দেহ মধ্যে প্রবেশ করতঃ নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে, সম্ভবতঃ তাহাদিগের মধ্যেও অপুংজনন (Parthenogenesis)প্রথা প্রচলিত আছে। তাহার কেহ কেহ ২৪ ঘণ্টাতে প্রায় কোটিবংশপরম্পরা উৎপন্ন করে। কীট, পোকা, শম্বুক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণিগণের মধ্যেই এই প্রথা অনেক সময়ে দেখা যায়; উচ্চ প্রাণিগণের মধ্যে অপুংজনন প্রথা নাই। তথাপি কোন কোন ভেক, মুর্গী এবং হংসী অপুংজাত ডিম্ব কদাচিৎ প্রসব করিয়া থকে। হংসী পালকগণ ঐ সকল ডিম্বকে "বাওয়া ডিম্" বলে—উহা যেন বায়ু কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহাদিগের স্ত্রী-ডিম্ব(৭)পুংকীট(৮) কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত না হইলেও, কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু, তৎপরেই মরিয়া যায়। পুংকীট কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত না হইলে, উহারা পূর্ণাবয়ব অপত্যদেহ গঠিত করিতে পারে না। এই Parthenogenesis মনুষ্যশ্রেণী মধ্যেও কদাচিৎ দেখা যায় বলিয়া, আমার বিশ্বাস। তখন নারীগণ অত্যল্পকাল (একমাস, দেড়মাস) রজোবন্ধ হওয়ায়, গর্ভলক্ষণ অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু

(৬) The queen bee is impregnated by a drone ; * * the sperm thus received are stored up and used to fertilize the eggs * * * which will produce future queens, or else workers. Other eggs * * are unfertilized and thus develop solely into drones. —Geddes & Thomson, Evolution of Sex, P. 172.

(৭) Ovum (৮) Sparmatozoid

তাহা নহে। স্ত্রী-ডিম্ব স্বতঃই কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইবার পর মরিয়া যায় ও প্রচুর রজঃস্রোতের সহিত পরিত্যক্ত হয়। যাহাহউক, এই কথা সকলে স্বীকার না করিলেও, ইহা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, নিম্নশ্রেণীস্থ কীট, পোকা আদির কোন কোন শ্রেণীতে অপুংজনন-প্রথা প্রচলিত আছে। ঘূর্ণ কীট (Rotifera) শ্রেণীর কোন কোন শাখায় একটীও পুংজাতীয় নাই। তাহাদিগের সংখ্যা জগতে একরূপ অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদিগের মধ্যে অপুংজনন দ্বারাই বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিহ্নিত (৯) উদ্ভিদগণেরও কোন কোন নিম্নশ্রেণীতে অপুংজনম প্রথা লক্ষিত হয়। যে ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদকোষ আলুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আলুর চাষ নষ্ট করে, সেই শ্রেণীতে অপুংজনন অনেক সময় পরীক্ষিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্‌কে ইংরাজিতে Fungus কহে। উপরের বর্ণনা হইতে দেখা গিয়াছে যে, কোন২ জীবের পুংজননের পর, অপুংজনন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কাহারও বা অপুংজননের পর পুংজনন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যতক্ষণ মধুমক্ষিকার দেহস্থ নির্দ্দিষ্ট আধারে,পুংসংসর্গজনিত পুংকীট সঞ্চিত ও সবল ছিল, ততক্ষণ তাহার স্ত্রী-ডিম্বের অনুপ্রাণনের জন্য পুংসংসর্গ আবশ্যক হয় নাই; সেইজন্য অপুংজাত-ডিম্ব উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, ক্রমে যখন ঐ পুংকীটের সংখ্যা অথবা শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আবার পুংসংস্পর্শ আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা বংশবৃদ্ধি হয় নাই। অনির্দ্দিষ্ট স্ত্রী-ডিম্ব যখন গ্রীষ্মাদি ঋতুতে পুষ্ট হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহা, পুংকীটের অনুপ্রাণন ব্যতীতও, বর্দ্ধিত ও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার, যখন শীতাদি ঋতুতে পুষ্ট হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের দেহে যে সকল ক্ষুদ্র কীট প্রবিষ্ট হইয়া পীড়াউৎপাদন করে, তাহারা আমাদিগের দেহে প্রচুর আহার প্রাপ্ত হয়, অথবা আমাদিগের দেহস্থ পদার্থ বিশেষের দ্বারা উত্তেজিত হয়; এই আহার অথবা এই উত্তেজনাই, পুংসংস্পর্শের ন্যায় কার্য্য করে; সুতরাং, পুংসংসর্গ ব্যতীতও বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন পদার্থ বিশেষের সংস্পর্শে ডিম্বের অনুপ্রাণনের কার্য্য পুংসংযোগের ন্যায়ই হইয়া থাকে। যদিও এখন পর্য্যন্ত সেইসকল দ্রব্যের অধিক পরীক্ষা করা হয় নাই, তথাপি কতিপয় স্থলে উহা প্রাণী-তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পণ্ডিত টিকোমিরফ (Tichomiroff) বলেন যে, রেশমের গুঁটিপোকার ডিম্বকোষ হইতে অননুপ্রাণিত ডিম্ব লইয়া, তাহাকে ক্ষুদ্র বুরুস্‌ দিয়া ঘর্ষণ করিলে, অথবা গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric Acid) মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া শেষে ধুইয়া লইলে, পুংকীট কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত না হইলেও,ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে পারে, ও অপর পোকা উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু, আমি ঐরূপ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হই নাই। প্রাণীতত্ত্ববিৎ ডিউইজ (Dewitz) ভেকের ডিম্বকে Corrosive Sublimate মধ্যে ডুবাইয়া, পুংসংসর্গ ব্যতীতও, অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলতঃ,এই সকল দ্রব্যের উত্তেজনায়,ডিম্বের পোষণ অথবা ধ্বংস ক্রিয়ার সাহায্য করিলে, তাহাতেই পুংসংস্পর্শের ন্যায় কার্য্য করে। (১০) সুতরাং অপুং-

(৯) স্ত্রী-পুং-ভেদযুক্ত।

(১০) There are a few curious observations which go to show that in exceptional cirumstances, ova may develop when

জনন বৃত্তান্ত বিবেচনা করিতে গেলেও সেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। কোনরূপে কোষের পুষ্টি হইলেই স্ত্রীত্ব এবং অপুষ্টিতেই পুংস্ত্ব উৎপন্ন হয়। এইরূপেই, নৈসর্গিক কারণে, পুষ্টি অথবা অপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্ব প্রথমে অচিহ্নিত জীবকোষে স্ত্রী-পুংভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। পরে তাহা প্রায়ক্ষেত্রেই বংশগত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার আর এক দৃষ্টান্ত অন্যোন্যজনন বিবেচনা করিলেও পাওয়া যাইতে পারে। শেওলা শ্রেণীস্থ উদ্ভিদের, স্ত্রী-পুংভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পরাগ-রেণু (পুং-কোষ) ও গর্ভ-কেশর (স্ত্রীকোষ) আছে। স্ত্রীকোষ পুংরেণু কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইলেও, শৈবালের দেহ পরিত্যাগ করতঃ পৃথক হয় না। ঐ দেহেই পরপুষ্টের (parasite) ন্যায় থাকে। ক্রমে, ঐ অনুপ্রাণিত কোষ হইতে একটী ক্ষুদ্র শীষ অথবা ডাঁটা বাহির হয়। তাহার অগ্রভাগে অচিহ্নিত-কোষ উৎপন্ন হয়। ঐ কোষ মৃত্তিকায় পতিত হইলে, অনুপ্রাণন ব্যতীতই, তাহা হইতে সূত্রবৎ আঁস নির্গত হয়; এবং ঐ সূত্র হইতে স্ত্রী-পুং-চিহ্ন-যুক্ত অঙ্কুর জাত হয়। সেই অঙ্কুরের ভেদ চিহ্নযুক্ত কোষদ্বয়ের পরস্পর সংযোগে, আবার শেওলা উৎপন্ন হয়। এইরূপে ভেদ-চিহ্নযুক্ত কোষ হইতে অচিহ্নিত এবং অপুংজননক্ষম-কোষ উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে আবার ভেদচিহ্নযুক্ত কোষ জাত হয়; তখন বংশবৃদ্ধি জন্য আবার উভয়ের সংযোগ আবশ্যক হয়। এইরূপে চিহ্নিত কোষ হইতে অচিহ্নিত, আবার তাহা হইতে চিহ্নিতকোষের উৎপত্তি। ইহাকেই অন্যোন্যজনন (alternate generation) বলে। এই ঘটনাতেও দেখা যাইতেছে যে, চিহ্নিত কোষ যথারীতি অনুপ্রাণিত হইয়া শৈবালদেহেই পরপুষ্টের ন্যায় থাকায়, উহার প্রচুর আহার প্রাপ্তির সুবিধা হইয়াছে। সুতরাং, পুনরায় পুংকোষের অনুপ্রাণন ব্যতীতও, উহা হইতে চিহ্নিত কোষ উৎপন্ন হইল। এস্থলেও সেই পূর্ব্বোক্ত পুষ্টির সহিতই সম্বন্ধ। আর যখন ঐ কোষ মৃত্তিকায় পতিত হয়, তখন স্বীয় চেষ্টায় আহার সংগ্রহ করিতে গিয়া, উহার বলক্ষয় হয়; তখনই অচিহ্নিত সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া, উহার স্ত্রী-পুংভেদ সঞ্জাত হয়। এইরূপে, স্ত্রী-পুংভেদ সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত আমাদিগের নয়নগোচর হইতেছে, তৎসমুদয় হইতেই ইহা বুঝা যায় যে, স্ত্রী-পুংভেদ, অচিহ্নিত সাম্যাবস্থারই বিকার মাত্র; আর ঐ বিকার সংক্ষেপতঃ পোষণ ও ধ্বংস ক্রিয়ার তারতম্য বশতই, নৈসর্গিক কারণে, উৎপন্ন হইয়াছে। জীবকোষও তদনুসারেই ভেদচিহ্ন প্রাপ্ত, হইয়াছে। কিন্তু এখনও সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হয় নাই। সেইজন্যই উভচিহ্নিত জীবের এত আধিক্য। আর উচ্চতর জীব সমূহে যে একচিহ্নতা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও অব্যভিচারী নহে। ঐ এক চিহ্নতার মধ্যেও (অচিহ্নিতের ন্যায়) অপুংজনন এবং অন্যোন্যজনন, অদ্যাপি সেই অচিহ্নিত অবস্থাকেই স্মরণ করিয়া দিতেছে।

শ্রীশশধর রায়।

---

the male stimulus is replaced by some artificial re-agent.—Evolution of Sex, p., 170.

# সুপ্রতিষ্ঠ।

১। "জীবনের পরিণতি সহ
ঘুচিতেছে নয়নের ধাঁধা,
অমঙ্গল-বিষদ্রুম, দেখি
মঙ্গলের মূলে গোড়া-বাঁধা;
অন্তর্লীন পাবকের মত,
দেখি, প্রতি বেদনার মাঝে
( বুঝে না তা বিমূঢ় হৃদয় )
গূঢ় শুভ-ইচ্ছাই বিরাজে;—
দিবে যথা রবি অধিষ্ঠান,
সুপ্রতিষ্ঠ ধাতার বিধান।

২। "অন্ধকার, অমা-সহচর;
যাতনা ও পাতকের রীতি;
জানি স্থির, পাপ দণ্ড পাবে,—
কোনো খানে,—চিরে, বা ঝটিতি;
জানি, দুখ-কঠোর মন্থনে
আলোড়িত হ'লে হৃদিতল,
গণে আত্মা পরম কল্যাণ,
অমৃত-প্রবাহে লভি বল;—
বিকাশের ক্লেশই নিদান,
সুপ্রতিষ্ঠ ধাতার বিধান।

৩। "ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট গ্রন্থনে,
জানি, নাহি তিলমাত্র ভ্রান্তি,
সার্থক সকল সত্ত্বা, সাধে
চরমেতে মানবের শান্তি;
জানি যবে দেহ কারামুক্ত
আত্মা মোর করিবে প্রয়াণ—
দেশ-কাল-বিরহিত পথে
মহানন্দে হ'তে অন্তর্ধান,
ধ্বনিবে ওঁকারে মাঝে তার,—
সুপ্রতিষ্ঠ বিধান ধাতার।"

—শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্, এ, সি-এস্।

একদা কার্লাইল বলিয়াছিলেন,—"ঐ যে দেয়ালে শৈবাল রহিয়াছে, উহা বিশ্বসংসারের সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান।" অর্থাৎ বিশ্বের সমগ্রশক্তি যেন উহাকে উড়াইতে প্রস্তুত, তবু উহা নিজের প্রভূত শক্তিবলে, সকলকে পরাস্ত করিয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এই কথায় উত্তরে ঈশ্বর-পরায়ণ কিংস্‌লি বলেন,—"কার্লাইল এক দিক দেখিয়া, একদেশদর্শীর মত কথা বলিয়াছেন, অপর দিক যদি দেখিতেন, বলিতে বাধ্য হইতেন যে, বিশ্বের যাবতীয় শক্তি একত্রিত হইয়া, শৈবালকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়াছে—তাই উহা আজও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই।" বিশ্বসংসারে সংহারিণী-শক্তি অপেক্ষা সংরক্ষণী-শক্তি অধিকতর প্রবল। অন্ধকার আলোক, সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন অবস্থা দ্বারা এই ব্যক্ত জগৎ বলিতেছে। যদি নিরবচ্ছিন্ন আলোক থাকিত, অন্ধকার কেহ জানিত না, তাহা হইলে আলোকের মর্য্যাদা কে বুঝিত? দুঃখ না থাকিলে সুখের মূল্য কি? এই সকল জোড়া জোড়া—পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থ দ্বারাই, অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়াছেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এইরূপ বিপরীতভাব বিদ্যমান না থাকিলে জগৎ কিছুতেই চলে না। সত্ত্ব, রজ, তম,—তিন গুণের খেলাই প্রকৃতির বিদ্যমানতা; ত্রিগুণাতীত অবস্থা লয়ের অবস্থা, সেখানে সকল বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য, সমস্ত সেখানে অব্যক্ত, কিন্তু আছে। (১) ইহা বুঝিতে না পারিয়াই

(১) This Perfect never becomes the im-

কেহ কেহ তাঁহাকে শূন্য বলিয়া গিয়াছেন, কেহবা "সৎ অসদিব" বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

উপরোক্ত কারণেই, হিন্দুর সুরাসুর, মুসলমান খৃষ্টানের ঈশ্বর-সয়তান, বৌদ্ধের বুদ্ধ-মার, পার্শির স্পেন্তো মৈন্যুশ—অংগ্রো-মৈন্যুশ, প্রভৃতির কথা শুনা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এই যে, বিনা বাধায় বর্দ্ধন-বিকাশ অসম্ভব। একটী বীজকে যদি তুলায় জড়াইয়া সন্তর্পণে মখ্‌মলের বাক্সে রক্ষা করা যায়, তাহার দ্বারা কোন কাজই পাওয়া যায় না, বরং ক্রমে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। পরন্তু, উহাকে মাটিতে পুতিলে, ভূমির চাপ, বায়ুর কম্পন, জলের আঘাত, রৌদ্রের তেজ প্রভৃতি বিরুদ্ধ-শক্তি-সমূহের সহিত সংগ্রাম-জয়ী হইয়া বীজ অঙ্কুরে, অঙ্কুর ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ বৃক্ষরাজির জন্মহেতু, অসংখ্য বীজ উৎপাদন করতঃ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য-সাধন করে। ঠিক এই প্রণালীতে, কুস্তি-করা, মুগুর-ভাঁজা প্রভৃতি ব্যায়াম দ্বারা আমাদের দৈহিক উপকরণ সকল উন্নতি লাভ করিয়া, শরীরে বল সঞ্চার করে। আবার, এই পদ্ধতিতেই পাপ, প্রলোভন, বিপদ, অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই, আমাদের আত্মা, ঝড়-নাড়া গাছের গোড়ার মত, দৃঢ়তালাভ করিয়া সবল হয়। সুতরাং, ঐ সকল, আপাত দৃষ্টিতে অশুভ অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইলেও, পরিণামে আমাদের স্থায়ী-কল্যাণের কারণ হইয়া থাকে; উহাদের সহিত যুদ্ধব্যতীত আমাদের বিকাশ অসম্ভব। এই জন্যই সাধুরা বলেন, দুঃখ বিপদ আমাদের পরম বন্ধু। (১)

তারপর আর একটী কথা আমাদের বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। আমরা যখন যে অবস্থাতে পড়ি, জানিতে হইবে তাহাই তখনকার মত আমাদের আত্মার কল্যাণ হেতু উপযোগী; আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট (২) সুতরাং আমাদের হিতের জন্য জানিতে হইবে।

বিধাতা মঙ্গলময়, তাঁহার রচিত বিশ্বে অমঙ্গলের স্থান কি প্রকারে সম্ভবে? তবে যে আমাদের চক্ষে বিস্তর ব্যাপার অন্যায়, অনুপযোগী, অনুচিত, অশুভ বলিয়া বোধ হয়, সেটা কেবল মাত্র আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির জন্য। সন্তানের পীড়া হইলে, মাতা যখন বলপূর্ব্বক, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কটুতিক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া থাকেন, শিশু জননীর প্রতি কত না বিরক্ত হয়, রোগ-মোচনের হেতু ভেষজকে নিষ্প্রয়োনীয় অপ্রীতিকর সামগ্রী মনে করে। আমরাও ঠিক তদ্রূপ বিশ্ব-জননী জগদ্ধাত্রীর দ্বারা প্রযুক্ত ভবব্যাধি সারাইবার ঔষধ দুঃখবিপদসমূহকে বড়ই অন্যায় বলিয়া ভাবি; একটুও বিবেচনা করি না যে, একমাত্র যাঁহার করুণায় জীবিত থাকিয়া কত না সুখ-সম্ভোগ করিতেছি, আমাদের প্রতি যাঁহার দয়ার সীমা নাই, তাঁহার হুকুমে যাহা কিছু ঘটিবে তাহা কখনই অহিতকর বা অনুচিত হইতে পারে না। যাঁহার ইঙ্গিত

perfect, it *becomes* nothing. It is all Spirit and Matter, Strength and Weakness, Knowledge and Ignorance, Peace and Strife, Bliss and Pain, Power and Impotence,—the innumerable opposites of manifestation merge into each other and vainsh in non-manifestation. The All includes manifestation and non-manifestation—A. Besant (Study in Consciousness)

(১) Every evil is good in evolution—A. Besant

(২) Whatever is is best—C. W. Leadlecater.

ব্যতীত গাছের একটী পাতাও নড়ে না, তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন এই সুবিশাল বিশ্বের কোথও কি কিছু ঘটিতে পারে? আর সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, সদা-সর্ব্বত্র-সর্ব্বথা সম্পূর্ণ শুভঙ্করী জানিয়া, ভাল মন্দ সকল প্রকার সামগ্রী, তাঁহার হাত হইতে, অবনত মস্তকে গ্রহণ করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। (৩) "ঘোর বিপদেও ব'লব তোমায়, দয়াময়"—এই কথা কয়টী যেন কোন কালেও আমরা না ভুলি, তাঁহার ইচ্ছায় বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া যেন কখন রসনাকে কলঙ্কিত না করি। জয় মা আনন্দময়ী ত্রিভুবন পালিনি! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার বিশ্ববিজয়ী কল্যাণী নাম জয়যুক্ত হউক; প্রফুল্লচিত্তে যেন আমরা সর্ব্বদা ইহা বলিয়া দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি। জগদম্বা আমাদের সকলকে এইরূপ বল প্রদান করুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

# শিক্ষার ইতিহাস ও জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ

আমাদের দেশে কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিলে সুফল হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য অতীতকালের শিক্ষার ইতিহাস এবং বর্ত্তমানকালের শিক্ষার অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ ও নিরূপণ করা আবশ্যক। আমি এই প্রবন্ধে অতীতকালের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

আদিমকালে, মনুষ্য দুইটী বিষয়ে শিক্ষা দান করিত,—(১) জীবিকা-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে ও (২) পূজা-প্রণালী সম্বন্ধে। জীবিকা-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে শিক্ষা, প্রায়ই পিতা পুত্রকে দান করিতেন। ঘরে বসিয়া বালক পিতাকে সংসার কার্য্যে, খাদ্য আহরণ কার্য্যে, দ্রব্য নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিত, এবং তাহাতেই শনৈঃ শনৈঃ জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষালাভ করিত। তখন গৃহই পাঠশালা। পিতা শিক্ষক, পুত্র ছাত্র। পূজা প্রণালী সম্বন্ধে পিতা কতক শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু, দেবতাদিগের অনুগ্রহ লাভ করা সহজ নহে। অন্ততঃ, সংসার তত্ত্ব যত সহজ, দেবতত্ত্ব তত সহজ বিবেচিত হইত না। সুতরাং, মনুষ্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্মশিক্ষা দানের জন্য, দেবতাদিগের তুষ্টিলাভ জন্য এবং ভূতপ্রেতাদির উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত, এক পৃথক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা পুরোহিত নামে অভিহিত হন, এবং আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিবার জন্য পূজা ক্রিয়া-কলাপ দিন দিন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সাধারণ লোক এই পুরোহিতদিগের ভরণপোষণের জন্য প্রচুর খাদ্যাদি প্রদান করিত। অবসর লাভে, এই পুরোহিতগণ বিদ্যালাভে মনোযোগী হন; এবং, নানাপ্রকার দেবতত্ত্ব ও মনুষ্যতত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া, শ্লোকরচনা দ্বারা তাহা প্রচার করেন।

(৩) It has ever been held the highest wisdom for a man, not merely to submit to Necessity,—Necessity will make him to submit,—but to know and believe well that the stern thing which Necessity had ordered, was the wisests, the best, the thing wanted there,—to cease his frantic pretension of scanning the great God's world in his small fraction of a brain, to know that it *had* verily, though deep beyond his soundings, a Just Law, that the soul of it was Good,—that his part in it was to conform to the Law *of the whole*, and in devout silence follow that; not questioning it, obeying it as unquestionable—Thomas Carlyle.

মনুষ্য যেমন সভ্য হইতে লাগিল, তেমনি লেখা পড়া, শাস্ত্র উদ্ভাবন, শাস্ত্রচর্চ্চা, ইতিহাস, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ, পুরোহিত ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, ধর্ম্মের সংসর্গে দিনযাপন করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রাচীন মিসরে, প্রাচীন চীনে, প্রাচীন ভারতে, পৌরোহিত্যের নিভৃত প্রাঙ্গণে, ধর্ম্ম, জ্যোতিষ, দর্শন, সাহিত্য, শৈশবে যেন গলা জড়াজড়ি করিয়া, ক্রীড়া করিত, এবং বাহিরে আসিয়া যাগ-যজ্ঞের ক্রিয়ানুষ্ঠানে দেখা দিত।

মিশরের প্রাচীন কালের ইতিহাস যখন প্রথমে নয়নগোচর হয়, তখন দেখা যায়, পুরোহিতগণের শিক্ষার উত্তেজনায়, বিস্তৃত দেবায়তন নির্ম্মিত হইয়াছে। সমাজের জন্য কি ভাল কি মন্দ, তাহারাই বিচার করে। সাধারণ লোক, অশিক্ষিত, মূর্খ,—দারুণ রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে, ধনীকরধৃত কশাঘাতে চালিত ও নিপীড়িত হইয়া, ধনীদিগের আরামের জন্য, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে খাটিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে শত সহস্র লোক সুবিধা পাইয়া পলাইল; এবং লোহিত-সাগর পার হইয়া আরব দেশে আসিল—জিহোভার (Jehovah) নিকট স্বকীয় ধর্ম্মবিধি লাভ করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ফলতঃ, মিশরদেশের প্রাচীন ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে যেটুকু আলোক পড়িয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, তথাকথিত সভ্যতায় অল্প লোকের অত্যুচ্চ জ্ঞানোন্নতির সহিত, জনসাধারণের গভীর মূর্খতা ও নিতান্ত শোচনীয় দুর্গতি, একত্র বাস করিতে পারে। আর সিদ্ধান্ত হয় যে, ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তেই শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল।

চীনদেশে বিদ্যার খুব গৌরব ছিল, শিক্ষার প্রতি রাজার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু একটা দুর্ভাগ্য তাহাদিগের শিক্ষা প্রণালী ও সভ্যতাকে নিপীড়িত করিয়াছিল। এক সময়ে চীন, বেগে তরতর করিয়া, সভ্যতার সোপান পরম্পরা আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু, অবশেষে, যে স্থানে উঠিল, সেই খানেই থাকিল, আর উঠিল না, আর নড়িল না, সেই অবস্থাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিল। জগৎ চলিতেছে; চলে বলিয়া, গমন করে বলিয়া, তাহার নাম জগৎ, চীন তাহা ভাবিল না; জগতের কোথায় কি হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখাও আবশ্যক বিবেচনা করিল না; যে ধন সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারাই রক্ষার্থে বিব্রত,—নূতন জ্ঞানরত্ন আহরণ করার প্রয়োজন দেখিল না। জগতের অন্য জাতিগণ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্যই যেন, মানবজাতির বিস্ময়জনক একটা অদ্ভুত অতি প্রকাণ্ড প্রাচীর উচ্চ করিয়া তুলিল, যেন সে প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া থাকিবে, নিজের গণ্ডীর ভিতর কাহাকেও আসিতে দিবে না। সে নিজের ভিতরে, কূর্ম্মের ন্যায়, নিজের অঙ্গসকল টানিয়া লইল। সুতরাং চীনের শিক্ষাপ্রণালী অপরিবর্ত্তনীয়, উন্নতি-বিমুখ ছাঁচে ঢালা হইল; কেবল যাহা ছিল, কেবল পুরাতন, অতীত জীবন, তাহাই শেখ, তাহাই আলোচনা কর, নূতন কিছু শিখিও না—পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। ভবিষ্যৎকালকে অতীতকালের পুনরাবৃত্তি করিতে পারিলেই, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। চীন মনে করিল, চীন স্বর্গীয় রাজ্য; অন্য কোন জাতির সাধ্য নাই, চীনকে অতিক্রম করে। এই অভিমানের অহিফেন, বাহ্য অহিফেন সহ, চীন অনেক শতাব্দী সেবন করিয়া আসিতেছে। সুতরাং, চীন তাহার শিক্ষা-প্রণালীর কোন উন্নতি করিল না, জীর্ণ-গৃহের

সংস্কার করিল না; আধুনিক বিজ্ঞানের আলোক লইল না। তাই চীন জাপানের পদাঘাত খাইল। এই পদাঘাতে অধুনা একটু চৈতন্য হইয়াছে; শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার করিতেছে, জাপানের নিকট, ইউরোপের নিকট, অস্ত্র-শস্ত্রের দৈত্যশক্তি লাভ করিবার জন্য যেন একটু জাগিয়াছে। কিন্তু হায়! পদাঘাত পরম্পরায়, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া, ভারতের চৈতন্য হয় নাই।

ভারতের শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় কি বলিব? পাঠক নিজেই তাহা চতুষ্পাঠীতে দেখিয়াছেন। চীনের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, ভারতের সেই দুর্দ্দশা ঘটিল। ভারত বিদ্যাতে অতি মহৎ হইল। জ্ঞানে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিল। কিন্তু, ভারতের বর্ত্তমানকাল ও জীবন, অতীতকালের জীবনে মগ্ন হইয়া গেল। দশদিন আগে খাইয়াছি বলিয়া, অদ্যকার ভোজন অনাবশ্যক হয় না, অদ্য ভোজন না করিলে চলে না,—ইহা ভারত ভাবিল না। যেমন জীব-দেহে নিত্য যে বস্তুর ক্ষয় হইতেছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য প্রতিদিন আহারের, খাদ্য আহরণের, আবশ্যক হয়, তেমনি সমাজ-দেহে, জাতীয়-জীবনে, নিত্য যে শক্তির ক্ষয় হয়, তাহা পূরণ করিবার জন্য, নিত্য নূতন উদ্যমের, নূতন চিন্তার, নূতন কার্য্যের প্রয়োজন হয়। জগতের ইতিহাস নিত্য গর্জ্জিয়া বলিতেছে যে,—"না হয় অগ্রসর হও, না হয় অগ্রগামী জাতির পদতলে নিষ্পেষিত হও।" এই বিশ্বপুরীতে জগন্নাথের রথ, ঘর্ঘর নির্ঘোষে নিত্য চলিতেছে। তুমি সেই রথের সম্মুখে, অগ্রসর না হইয়া, যদি আহাম্মকের বা বাতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাক, রথ তোমার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, একটু মায়া মমতা করিবে না। এই নিত্য-গতিশীল-জগতে, স্থির হইয়া থাকিবার যো নাই। "চল, চল, চল"—এই গম্ভীর-রবে, কি দিবসে, কি নিশীথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইতেছে। "চল, চল চল"—এই গম্ভীর-রব "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে বাঙ্গালী সম্প্রতি শুনিতেছে। অদ্যকার "জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ"—যাহা হইতে এই শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধের অবতারণা, তাহাও—এই "চলো—চলো—চলো"-শব্দের আর একটা অর্থ। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-প্রণালী সুন্দর ও পবিত্র ছিল। কিন্তু তাহা "চলো, চলো, চলো"—শব্দের প্রতি বধির হইয়াছিল। যে ক'খানি পুঁথি প্রাচীন-কাল হইতে আমরা পাইয়াছিলাম, সেই কয়খানি মাত্র, ঠিক প্রাচীন পদ্ধতি রেখা অনুসরণ করিয়া, তাহা মুখস্থ, তাহারই টিপ্পনি, তাহারই ব্যাখ্যা, তাহারই ভাষ্যের গণ্ডীর ভিতর থাকিলাম। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে একটা অসীম গ্রন্থ, তাহার প্রতিপৃষ্ঠায় যে নূতন তত্ত্ব লিখিত আছে, ব্রহ্মাণ্ড যে অক্ষয় রত্নাকর—সাংখ্য ও বেদান্তে যে তাহা ফুরায় নাই, সমুদয় ষড়্‌দর্শনেও তাহা ফুরায় নাই, বাল্মিকী ও বেদব্যাস, ভবভূতি ও কালিদাসের কবিত্বে যে নিঃশেষ হয় নাই—তাহা ভারত ভুলিল; জড়জগৎকে যে আমরা, গৃহে ও বাহিরে, দাস দাসী করিয়া খাটাইতে পারি, তাহা ভারত বিস্মৃত হইল। ভারত "পুরাতনে" আর "নূতন" যোজনা করিতে চাহিল না। ভারত বলিল "বস্, বহুৎ আচ্ছা।" অতীতের গৌরবের মধ্যে ভারত বর্ত্তমানকে ক্ষুদ্র ও নীচ করিয়া ফেলিল। সুতরাং, এমন যে সুন্দর প্রণালী, যাহা অদ্যাপিও পুণ্য-ভূমি নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের চতুষ্পাঠীতে দেখিতে পান—তাহাও দেশের অবনতির পথ অবরোধ করিতে পারে

নাই। এই শিক্ষা-প্রণালীর দোষ সংক্ষেপে দেখাইতে হইলে বলিতে হয়—ইহা অবশেষে বর্ত্তমানকালকে অতীতকালের দাস করিয়াছে, স্বাধীন চিন্তার বাধা দিতেছে,—যাহা পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য বিষয় আলোচনা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; জড় জগতের তত্ত্ব হইতে মানসিক জগৎকে বিচ্যুত করিয়াছে;—জড়জগতে মনুষ্যের যে শক্তি আছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার সংকল্প পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছে; প্রাচীন ভারত মৃৎ ও চিৎ এই দুইটী সমভাবে আলোচনা না করিয়া, জ্ঞান, মৃণ্ময় স্থূল জড়-জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে বিহঙ্গম-পিঞ্জরবৎ ঘৃণা করিয়া, কেবলমাত্র চিদাকাশে উড্ডীন হইয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিত। এই শিক্ষা-প্রণালীর গুণঃ—ইহাতে শিক্ষক গুরু, পিতৃস্থানীয়; শিক্ষক-পত্নী, জননী-সমা; জনাকীর্ণ নগরের পাপ প্রলোভন অধ্যাপকের গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না; বৃহৎ জনপদের নানাবিধ বিষয় কার্য্যের নির্ঘোষ ছাত্রদিগের মনঃসংযোগের বিঘ্ন হইত না। সহরের নিত্যনব-হুজুক ছাত্রগণের কোমল হৃদয়কে এদিক ওদিক টানিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিত না। ছাত্রগণের প্রবৃত্তি, হৃদয়, শক্তি, ধারণা অধ্যাপক ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ ও সুবিধা পাইতেন, এবং ছাত্রের প্রবৃত্তি, শক্তি অনুসারে, অধিকারভেদে, তাহাদিগকে উপযোগী-শিক্ষা দিতে পারিতেন। এই আশ্রমে, বিলাস স্থান পাইত না। ছাত্র ব্রহ্মচারী; পবিত্র দেহে পবিত্র মনে, সৌখীন-দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া, দরিদ্রের ন্যায়, সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিয়া, বিদ্যা উপার্জ্জন করিত; ইহাতে ছাত্রগণ চিত্তসংযম শিক্ষা করিত। যখন যৌবনের নবোচ্ছ্বাসে নীতি ভাসিয়া পাপে ডুবিবার বিশেষ আশঙ্কা, তখন ছাত্র সংযমের উচ্চ শৈল-ক্রোড়ে যত্নে রক্ষিত হইত। সেই ব্রহ্মচর্য্যের সংযমে, দেহ ও মনের পাপরস যেন পরিপাক হইয়া যাইত; তখন শিষ্য পাঠসমাপ্ত করিয়া, গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিলেও, বিলাসের ও পাপের বিষ তাহার দেহ-মনে সহসা প্রবেশ করিত পারিত না। যে বেশ সাঁতার শিখিয়াছে, সে যেমন সহসা নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলে, অনায়াসে সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিতে পারে, তেমনি তখনকার সংযমশিক্ষিত গৃহী, বিলাসে পড়িলেও, প্রায়ই ডুবিতেন না, সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিতেন। নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইলে, প্রাচীনকালের নিয়ম অনুসারে, তাপে সেকে যেমন তাহার সুকুমার দেহটী, শক্ত করা হইত,—এখনকার মত ফ্লানেল, জামা, মোজা তাহার দরকার হইত না, এত ঘন ঘন সর্দ্দি কাশী হইত না—তেমনি, উপনয়নের নূতন জন্মের পরও, দ্বিজকে ব্রহ্মচর্য্যের সংযমে শক্ত করা হইত; এখনকার মত তখন নৈতিক সর্দ্দি বা নৈতিক ক্ষয়কাশ তত হইত না। প্রাচীনকালের শিক্ষা-প্রণালীর গুণগুলি আছে দোষ নাই, এবং নবীন-প্রণালীর গুণ আছে দোষ নাই, এমন একটা শিক্ষা-প্রণালী আমাদিগের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রচলিত করিতে পারিবেন, আশা করি।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রাচীনকালে, কোন বিদ্যালয়ে যে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল, তাহা দেখা যায় না। তাহার কারণও বুঝা যায়। মৃণ্ময় জগতের শক্তিতত্ত্ব তখন এত আলোচিত হইত না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জীবিকা-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে

জড়বিজ্ঞানকে—তাপকে, তাড়িৎকে, গতিকে, ও মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্র সকলকে—যে নানাবিধ উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহক্ষম কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, তখন তাহা এখনকার মত উদ্ভাবিত হয় নাই। তবে যে একবারে এ সকল বিষয় আলোচিত হইত না, তাহা নহে। ঋষিরা নিভৃত আশ্রমে কৃষি, রসায়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক-জ্ঞান লাভ করিতেন, এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের ব্যবহারিক ফল, জন-সাধারণকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শিখাইতেন। আর শিল্পী পুরুষানুক্রমে যে শিল্প দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, তৎসম্বন্ধে, তাহার নিজ জীবনের পরীক্ষার দ্বারা যাহা নূতন শিখিত, পুত্রকে তাহা শিখাইত। এই রূপে, "টেক্‌নিকাল স্কুল" না থাকা সত্বেও, তখন শিল্পের ও অন্যান্য ব্যবহারিক কার্য্যের উন্নতি হইত; অন্তত এক রকম বেশ কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু এই প্রথার মূলে বর্ণভেদ ছিল। পুত্র পিতৃবৃত্তি অবলম্বন করিবে, অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিবে না, এই নিয়ম ছিল। এই নিয়মানুসারে পুত্র পিতার কাছে যেন "এপ্রিনটিস্" থাকিত। এখন ক্রমশঃ সে নিয়ম লোপ পাইতেছে সুতরাং এখন যদি আমরা আমাদিগের বংশধরগণকে ভবপুরে জুয়াচোর বা ভিক্ষুক করিতে না চাহি, তাহা হইলে তাহাদিগকে বৃত্তিঘটিত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আগেকার সমাজ একবারে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। যেমন ছাপাখানায় একটী প্রবন্ধ, অক্ষর সাজাইয়া ছাপান হইলে, পরে সেই সাজান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নূতন একটী প্রবন্ধ ছাপাইতে হইলে, নূতন করিয়া অক্ষর সাজাইতে হয়; তেমনি, এক্ষণে নূতন করিয়া সমাজের অক্ষরগুলি বা ব্যক্তিগুলি সাজাইতে হইবে, এবং নূতন সমাজ রচনা করিতে হইবে। কিন্তু ছাপাখানার অক্ষর সাজান অপেক্ষা এই সমাজ সাজান খুব কঠিন, কেননা এখানে কোন অক্ষরটী বাদ দিবার যো নহি। সকল ব্যক্তিকে সমাজ-প্রবন্ধের বাঁধনিতে আঁটিতে হইবে। এই প্রবন্ধে নূতন করিয়া তাঁতি, কামার, ছুতার প্রভৃতি অক্ষর সাজাইতে হইবে। এখনকার উইভিং স্কুলের ছেলেরা "তাঁতি" হইবে, অন্যান্য টেক্‌নিকাল স্কুলের ছাত্রগণ কেহ "কামার" হইবে, কেহ "ছুতার" হইবে, কেহ "কৃষক" বা "চাসা" ভাই হইবে। আমাদের দেশের ভবিষ্য শিক্ষা প্রণালীতে এই সাজান,—এই "রি-ডিস্‌ট্রিবিউশনে"র (re-distribution) কায করিতে হইবে। "লীডার" দিগের মস্তিষ্ক সেই সমাজ-প্রবন্ধ রচনা করিবে, "ফলোয়ার্স" বা কম্পোজিটরগণের হস্ত তাহা কম্পোজ করিবে।

এক্ষণে প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করা যাউক। বোধ হইতেছে যে, শিক্ষা-প্রণালীর ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া কি ঝকমারি কাজ করিয়াছি। একটা মস্ত পুস্তকে যাহা বর্ণনা করা যায়, একটী প্রবন্ধে তাহা কেমন করিয়া সারিব? আবার যদি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি, পাঠক মহাশয় কুপিত হইতে পারেন। একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, তাহার পরের প্রবন্ধ দেখিয়া, পুরাতন ব্যাপার বলিয়া ফেলিয়া দিবেন। শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদিগের দেশের লোকের এমনি অনুরাগ যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় এ বিষয় একখানিও ভাল গ্রন্থ রচিত হয় নাই। প্রথমে ভূদেব বাবু শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। তাহার পর দুই একখানি ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে মাত্র।

ইংরাজি ভাষাতে সর্ব্বজনমান্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিদেশে এ বিষয় কিছু কম আশী খানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এক ইংরাজিভাষায় প্রায় চল্লিশ খানি ভাল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে মাসিক পত্রও আছে। আমাদিগের দেশে এ বিষয় কোন চর্চ্চা ছিল না। এখন একটা নবযুগের আবির্ভাব হওয়ায় যদি লোকের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হয়, এই আশা। যাহা হউক, আমি পাঠকের ধৈর্য্য পীড়ন করিব না। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, ভাণ্ডেও তাহা আছে—সেই অর্থে ইউরোপের শিক্ষা-সাহিত্যে যাহা আছে, আপনি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা পাইতে পারেন। আমি ব্যাপারটা সহজ করিয়া আনিতেছি। নিম্নলিখিত কয়েকটী ভাগ করিয়া লম্বাকে খাটো করিব :—

১। শিক্ষা—গ্রীসে ও রোমে।

২। শিক্ষা—ভূস্বামী-ভবনে ও সন্ন্যাস-নিকেতনে।

৩। শিক্ষা—ধর্ম্মসংস্কারে ও লুপ্ত জ্ঞানোদ্ধারে।

৪। শিক্ষা—আধুনিক শিক্ষা-সংস্কারে।

## ১। গ্রীস ও রোমের শিক্ষা।

একটা কথা বিলাতে চলিত আছে। Except the blind forces of Nature, nothing moves in this world which is not Greek in its origin. প্রকৃতির অন্ধশক্তিপুঞ্জ ব্যতীত, জগতে এমন কিছুই চলিতেছে না, যাহার মূলে গ্রীক নহে। এই কথা আমরা ঠিক স্বীকার করিতে পারি না। জগতে যেসকল প্রধান ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, গ্রীস তাহার মূলে নাই। বরঞ্চ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, এমন ধর্ম্ম সংসারে নাই, ভারত যাহার মূলে নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে জন্মগ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম্ম পালস্তিনে প্রচার হওয়ায়, খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। আর খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ ও প্রতিমা পূজাবিমুখতাদি অবলম্বন করিয়া মহম্মদীয়-ধর্ম্ম প্রচার হয়। মহম্মদীয়-ধর্ম্মের মূলে খ্রীষ্টধর্ম্ম, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মূলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলে হিন্দু-ধর্ম্ম। জগতের সমুদয় উন্নতির মূলে গ্রীকজাতি, এ কথা ঠিক সত্য না হইলেও, ইউরোপ গ্রীসের নিকট অতিশয় ঋণী, ইহা মুক্ত-কণ্ঠে বলা যাইতে পারে। তাই, গ্রীসের শিক্ষার বীজ-মন্ত্র কি, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করা আবশ্যক।

প্রাচীন গ্রীস বলিলেই মানস-নেত্রের সম্মুখে একটা সুন্দর উৎকর্ষের আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হয়। গ্রীসের নাম করিলেই যেন সক্রেতিস, প্লেটো, এরিস্ততল—ডিমসথিনিস, পেরিক্লিস, ফিদিয়াস—হিরডোটস, থিউসিদিদিস—হোমার, ইউরিপিদিস, সফোক্লিস—মিলতাইদিস থিমিসটক্লিস, লিওনিদাস—আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি মহাজনের ছায়া আসিয়া আমাদের সম্মুখে সগৌরবে দণ্ডায়মান হয়। সেই শিক্ষা কি প্রকার যাহাতে মনুষ্য এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে, জগৎ অদ্যাপি তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না?

গ্রীক জাতিই প্রথমত জ্ঞানলাভের জন্য জ্ঞানচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রাচীন-জাতিদিগের মধ্যে, গ্রীক-জাতির মধ্যেই, জ্ঞান ধর্ম্ম-যাজকদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। কি মিসরে, কি চীনে, কি ভারতে, জ্ঞান-চর্চ্চা ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। গ্রীক-শিক্ষাতে সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের যেমন বিকাশ হইয়াছিল, জগতে অন্যত্র কুত্রাপি তাহা হয় নাই। সৌন্দর্য্যকে গ্রীকগণ অধ্যয়ন করিত, ভাল

বাসিত, পূজা করিত। দেহের সৌন্দর্য্যকে মনের সৌন্দর্য্যের, নীতির সৌন্দর্য্যের, পরিচয় মনে করিত। একটী কথা মনে পড়িল। প্রাচীন এথেন্সে একদিন একটা মোকদ্দমা হইতেছে। আসামী একটী রমণী। উকীল দেখিলেন, জুরীগণ রমণীকে অপরাধিনী স্থির করিয়াছেন; এত যুক্তি, এত বাগ্মিতা কিছুই জুরিগণের মনে দাঁড়াইতেছে না। তখন নিরুপায়—বিদ্যুতের ন্যায় একটা কথা তাঁহার মনে হইল—গ্রীক জাতি কায়িক-সৌন্দর্য্যকে, নৈতিক-সৌন্দর্য্যের বাহ্যবিকাশ মাত্র মনে করেন। রমণী নিকটে। উকীল রমণীর বক্ষের আবরণ জোরে ছিঁড়িয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলের দেবকন্যার দেহের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য জুরিগণকে দেখাইয়া বলিলেন—"এমন নিরুপম সৌন্দর্য্যের ভিতরে কখন কি পাপ প্রবেশ করিতে পারে?—এই সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়, ইহা পবিত্র, এমন সৌন্দর্য্য কখন পাপ কালিমায় কলঙ্কিত হইতে পারে না।" এইরূপ ঘটনা আজি কালি কোন দায়রা বিচারে হইলে, উকীলকে ক্ষিপ্ত বোধ হইত, এবং রমণীকে বারাঙ্গনা মনে হইত। কিন্তু সুসভ্য, উৎকর্ষ-প্রাণ, সৌন্দর্য্য-দীক্ষিত এথিনিয়ন 'জুরি' রমণীকে খালাস দিলেন। এই একটামাত্র ঘটনায় বুঝা যায়, সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি, কতদূর বিকশিত হইয়াছিল। আর, মর্ম্মর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি,—পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা—জগতের বিস্ময় ফিদিয়াসের অমরকীর্ত্তি, এথিনিয়ান ভাস্কর বিদ্যার অক্ষয় গৌরব—তাহা যেন এথিনিয়ানগণের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অবিরামবাহী নির্ঝর। তাহাদিগের অনুশীলনের দুইটী দিক ছিল। শরীরের জন্য, ব্যায়াম (gymnastic); আত্মার জন্য, সঙ্গীত (music)। "মিউজিক" বলিলে তখন কাব্য, ইতিহাস, বাগ্মিতা বিজ্ঞান এবং এখন যাহাকে music বলে (অর্থাৎ, বাক্যে সুস্বর তাল-লয় যোজনা) এ সকলগুলিই বুঝাইত। "সফিষ্টস্" বলিয়া এক সম্প্রদায় ছিল; তাহারা বক্তৃতা ও তর্কশাস্ত্র বিষয়কার্য্যে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, তদ্বিষয় শিক্ষা দিত।

এথিনিয়ন শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, স্পার্টান শিক্ষা সম্বন্ধে তাহা খাটে না। তাহারা সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের বড় তোয়াক্কা রাখিত না, তাহারা জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্যও বিশেষ ব্যস্ত হয় নাই। তাহাদিগের শিক্ষা প্রণালী, দেহকে সবল ও সহিষ্ণু করিবার, এবং মনকে সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্ম-রক্ষক করিবার জন্য চেষ্টা করিত। তাই জগতে তাহারা বীর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে তাহারা দুইটী বস্তু জানিত—'জয়', না হয় 'মৃত্যু'। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, স্পার্টান রমণীও বীরভাবে মহীয়সী পুত্রের হয় জয়, না হয় মৃত্যু কামনা করিতেন। যদি কোন যোদ্ধা সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তাহার জননী, তাহার স্ত্রী, তাঁহার ভগ্নী সকলেই তাহাকে ধিক্কারে লাঞ্ছিত করিয়া, আত্মহত্যার অন্ধ-গুহায় আশ্রয় লইতে বাধ্য করিতেন। সার্জন ক্যাম্বেল ভাল মেজাজে একবার বলিয়াছিলেন, এসিয়ার মধ্যে বাঙ্গালী উৎকর্ষে "এথিনিয়ান" স্থানীয়। প্রশংসাটা অতিমাত্রায় হইয়াছিল। যাহা হউক, বাঙ্গালী নূতন শিক্ষা প্রণালীতে—এথিনিয়ানগণের মানসিক উৎকর্ষ এবং স্পার্টানগণের শারীরিক বল, সহিষ্ণুতা, নৈতিক বল এবং সাহস—এই উভয় শ্রেণীর গুণ যাহাতে লাভ করিতে পারে, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ইংরাজদিগের শাসনের যতই গুণ থাকুক, একদোষে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইতেছে। ইংরাজ বাঙ্গালীকে কাপুরুষ করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরাজ প্রথমে যখন বাঙ্গলাতে বাণিজ্য-জাল বিস্তার করিয়া, কৌশলে, উৎকোচে, বিশ্বাসঘাতকতার ও জুয়াচুরির সাহায্যে, বাঙ্গালাদেশ অধিকার করেন, তখন হইতে ক্লাইভ, হেষ্টিংস প্রভৃতি তখনকার ইংরাজগণ, অত্যাচার ও লুণ্ঠন ও নীচতার উত্তর-সাধক হইবার জন্য, বাঙ্গালীর মধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কতকগুলি কুলাঙ্গার বাহির করিয়াছিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মভীরু, তেজস্বী, ন্যায়পরায়ণ, স্বদেশবাসীপ্রিয়, তখনকার বাঙ্গালা-লুণ্ঠন-লুব্ধ ইংরাজদিগের নিকট তাহাদিগের কোন স্থান হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন যাহারা টাকার জন্য মিথ্যা কথা কহিতে পারে, ঘুস দিতে পারে, বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, অর্থের জন্য স্বদেশী-পুরুষকে জবাই করিতে পারে, স্বদেশী কুলবধূর তখন শেষনিগ্রহ করাইতে পারে, তাহারাই ইংরাজ জ্যোতিষ্কের "স্যাটেলাইট"—তাহারাই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তখন নরপিশাচ দেবীসিংহ প্রভৃতি বঙ্গ কুলাঙ্গারগণ সাহেবের প্রিয়পাত্র। একবার হেষ্টিংসের ইম্পীচমেণ্ট সম্বন্ধে বর্কের অগ্নিময়ী বক্তৃতা পাঠ করুন। যদি পাঠ না করিয়া থাকেন, দোহাই আপনার, পাঠ করুন। পাঠ করিতে করিতে রোমাঞ্চ হইবে। দেখিবেন, সয়তানি কার্য্যের জন্য, কিরূপে ইংরাজ বাছিয়া বাছিয়া বঙ্গীয় সয়তানের হস্তে বঙ্গের কার্য্যভার দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বঙ্গে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। সর্ব্বজীবে দয়াপরায়ণ, "অহিংসা পরমধর্ম্ম"-বাদী বৈষ্ণবের পক্ষে যেমন কশাই বৃত্তি অবলম্বন করা অসম্ভব, তেমনি ধর্ম্মভীরু, সত্যবাদী, আত্মমর্য্যাদাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত, ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়, ঘনিষ্টতা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু, ধর্ম্মপরায়ণ বাঙ্গালীগণও দেখিলেন, ইংরাজের এই বঙ্গীয় চরগুলিকে কতক সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে, ধন, মান, জাতি কিছু থাকে না। তখন ইংরাজের শাসনগুণে, বঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতিকে অধর্ম্মের নিকট নতজানু হইতে হইল, তখন, সাধু বঙ্গবাসী পাষণ্ড, স্বদেশদ্রোহী, নরপিশাচ বঙ্গবাসীগণের দ্বারস্থ। তখন যাহাদিগের কিছু বিষয়-আশয় ছিল, তাহারা মনে করিত ইংরাজ রাজত্বকালে ধর্ম্মের আদর নাই, সত্যবাদীর আদর নাই, তেজস্বীর আদর নাই; যে খোসামোদ করিতে পারে, মিথ্যা বলিতে পারে, ঘুস দিতে পারে, চাতুরী করিতে পারে, তাহারই উন্নতি হয়। সুতরাং, ইংরাজশাসনে বাঙ্গালী দেখিল, হয় ধন প্রতিপত্তির আশা ত্যাগ করিয়া ইংরাজের তফাৎ থাকিতে হয়, না হয় ইংরাজের নিকট ধন ও প্রতিপত্তি পাইবার জন্য, তাহার কাছে মিথ্যা, চাতুরী অবলম্বন করিতে হয়। ইহার প্রথম ফল,—প্রথমে মন্দলোক ব্যতীত ইংরাজের সহিত ঘনিষ্টতা করিত না, করিতে পারিত না; দ্বিতীয় ফল,—যাহারা পূর্ব্বে মন্দ ছিল না, আত্মরক্ষার জন্য অথবা উন্নতির জন্য, উন্নতির একমাত্র পথ, খোসামোদ, মিথ্যা, ঘুস, চাতুরী ইত্যাদি পাপে লিপ্ত হইতে লাগিল। সুতরাং, মেকলে বাঙ্গালীর যে দোষবর্ণনা করিয়া মিথ্যা কুৎসা রচনায় জগতে অক্ষয় অপকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় চরিত্রের স্বাভাবিক দোষ নহে, তাহা ইংরাজ-চরিত্র-সংসর্গে দূষিত বাঙ্গালী-চরিত্র, তাহা ইংরাজ কলঙ্কের সৃষ্টি-

স্তম্ভ। আমাদের বড়ই বিস্ময় হয়, যে ব্যক্তি জালিয়াত ক্লাইবের জীবনী লিখিয়াছিল, যে ব্যক্তি, পরস্ব-লুণ্ঠনকারী ঘুসখোরের শিরোমণি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জীবনের সমালোচনা করিয়াছিল, যে ব্যক্তি বঙ্গে ইংরাজবণিক্, ইংরাজশাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারের, মিথ্যা কথনের, জুয়াচুরির, বিশ্বাসঘাতকতার ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রমাণ পাইয়াছিল, সেই ব্যক্তি ও বাঙ্গালীর নিন্দা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। যাহা হউক, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের শিক্ষাগুণে, যদি আর কোন সুফল না হইয়া, কেবল মাত্র যদি এইটী হয় যে, মেকলে লিখিত লর্ড ক্লাইবের ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জীবনী আর কখন বাঙ্গালী ছাত্রগণের পাঠ করিতে হইবে না, তাহা হইলেও জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি আমাদের ধন্যবাদার্হ। পরম মাননীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহানুভব মহাশয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে, ঐ দুইটী প্রবন্ধ বাদ দিয়া মেকলের রচনা পাঠ করা যাইতে পারে। এখনও J. C. Nesfield M. A. সঙ্কলিত Middle Reader, Part I নামক পুস্তক (২২ পৃষ্ঠা) মেকলে লিখিত Execution of Nankumar—নন্দকুমারের ফাঁসির বিবরণ কলঙ্কিত করিয়াছে। আহা, নির্ব্বাচনে কি সুবিবেচনা! (১) নরহত্যা করিলেও অপরাধীকে আদৌ ফাঁসি দেওয়া উচিত নহে, Victor Hugo প্রভৃতি অনেক মহাত্মার এই মত। (২) জাল করিলে ফাঁসি দেওয়া একটা মহা বর্ব্বরতা, তাহা ইংলণ্ড নিজের দেশের আইন পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীকার করিয়াছে। (৩) নন্দকুমার প্রকৃত জাল করিয়াছিল, অথবা হেষ্টিংস নিজের বিচারকের হস্ত দ্বারা নন্দকুমারকে প্রকারান্তরে খুন করিয়াছিল, যাহা বর্ক এ বিষয়ের সমুদয় নথি আলোচনা করিয়া এবং বক্তৃতার উত্তেজনার সময় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। (৪) যদিও ইংরাজ-আইন অনুসারে তখন জালের দণ্ড-বধ, তথাপি এই আইন ভারতে কখন প্রচলিত হয় নাই। (৫) বরঞ্চ, ব্রাহ্মণের বধ-দণ্ড হিন্দুদিগের শাস্ত্রবিরুদ্ধ। (৬) যদি নন্দকুমারের জালের জন্য তাহার বধ-দণ্ড হইতে পারে, ক্লাইবের জালের জন্য তাহার বধদণ্ড কেন হইল না। নন্দকুমারের ফাঁসির বর্ণনা পড়িয়া, এইরূপ নানা কথা হিন্দু ছাত্রের মনে উদিত হয় এবং অবশেষে এই রচনাটী তাহার নিজের জাতির অবমাননা মাত্র অনুভব হয়। তথাপি, এই রচনাটী বাঙ্গালী বালককে পাঠ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ভরসা করি, শিক্ষকগণ এই পৃষ্ঠা বালকদিগকে পড়াইবেন না। আর যদি পড়ান, তাহা হইলে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অপকীর্ত্তি বর্কের স্পীচ হইতে পাঠ করিয়া, বুঝাইয়া দিবেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কৃপায় বাঙ্গালী সম্বন্ধে সত্য ইতিহাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবু ও বঙ্কিম বাবু যাহার সূচনা করিয়াছেন মাত্র, তাহা লিখিত হইবে ও পঠিত হইবে, আশা করি।

পাঠক, ক্ষমা করিবেন, মনের দুঃখে এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক কয়েকটী কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি। ফল কথা, যাহাতে ইংরাজ সংসর্গ জনিত চাতুরী ও কাপুরুষতা দূর হইয়া, আমাদিগের শিক্ষাতে স্পার্টানদিগের দৃঢ়তা, সাহস ও বীরত্ব প্রস্ফুটিত হয়, তাহাই করিতে হইবে।

শ্রীকপাল সৌধাধ্য সেন শান্‌ কায়স্থ, এম-

জগতে বিচরণ করিত। দর্শন ও কবিত্ব সম্মিলিত করিয়া একটা রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল। গ্রীস—জড়জগতে আত্মাকে ফুটাইতে চাহিত, চৈতন্যশূন্য মৃত প্রস্তরে কবিত্ব ঢালিয়া দিত, কার্য্য ও কল্পনাকে মিশ্রিত করিত। রোম—সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের মহিমা তত বুঝিত না, অন্তর্জগতের সঙ্গীত তাহাও বড় শুনিতে পাইত না। গ্রীস একদিকে জড় জগৎকে যেমন আত্মাত্মক করিয়াছিল, রোম অপরদিকে আত্মাকে জড়জগতে বিসর্পিত জ্ঞানিগণের বিচরণের জন্য, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জন্য, গ্রীস, মনোরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়া, বড় বড় রাজপথ বিসর্পিত করিয়াছিল। রোম, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহার শক্তি সংস্থাপিত করিয়া, রোম নগরী হইতে নানাদিকে সুবিস্তৃত, দীর্ঘ, বহুকালস্থায়ী বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া, দূরবর্ত্তী জনপদ সকলকে আপনার সহিত সংযোজিত করিয়াছিল। গ্রীস, তাহার কার্য্য, তাহার বিজ্ঞান, তাহার ললিতকলা দ্বারা জগৎকে জয় করিয়াছিল। আর, যখন আলেক্‌জাণ্ডার উত্তর হইতে আসিয়া দক্ষিণে মিশিয়া, দিগ্বিজয়ে নির্গত হন, তখন তাঁহার পতাকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বিদ্যা ও অনুশীলন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভগবানের রাজ্যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমঙ্গলের আচ্ছাদনের মধ্যে মঙ্গলের হেতু নিহিত থাকে। যুদ্ধ বিপ্লব ও দুঃখ মৃত্যুর মধ্যে, নূতন জীবন ও ভাবী উন্নতির বীজ ছড়ান হইয়া থাকে। গর্ব্বিত আলেক্‌জাণ্ডার ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি দিগ্বিজয় করিতে যাইতেছেন। বস্তুতঃ তিনি গ্রীক-জ্ঞান-ভাণ্ডার-ভার-বাহী যন্ত্র,—যাহা এথিনিয়ানগণ ঘরে বসিয়া অনেক বৎসরে সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাই দেশবিদেশে ছড়াইয়া দিবার জন্য, ভগবান তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের দিগ্বিজয়ে যেমন গ্রীক অনুশীলন বিস্তৃত হইয়াছিল—তেমনি রোমক-সাম্রাজ্য বিস্তারে, একটা সুশৃঙ্খলাযুক্ত শাসন, এবং রোমক আইন-কানুন দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়াছিল। এখন এই জাতির শিক্ষার বীজমন্ত্র কি, তাহা বোধ হয় পাঠক অনুমান করিতে পারিয়াছেন। যাহাদিগের জীবনের যেরূপ আদর্শ তাহাদিগের শিক্ষা-প্রণালীর প্রকৃতিও সেইরূপ। গ্রীসে শিক্ষা সম্বন্ধে প্লেতো তাহার "রিপাব্‌লিক" (Republic) এবং "লস্"(Laws) নামক গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। রোমক সাহিত্যে তেমন একখানি ও গ্রন্থ দেখা যায় না। তবে কুইন্‌টিলিয়ান (Quintilian), বাগ্মিতা সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে, প্রসঙ্গক্রমে, শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। মনুষ্যকে কেমন করিয়া কার্য্যপটু করিতে হয়, তদ্বিষয়ে এই পুস্তকে ভাল ভাল উপদেশ আছে। যে সকল উপায়ে মনুষ্য কার্য্যপটু হয়, তাহা সুশিক্ষার অন্তর্গত। সুতরাং, এই গ্রন্থে সুশিক্ষার বিষয় অবান্তরে সুন্দর আলোচনা হইয়াছে। গ্রীক-শিক্ষার মূলমন্ত্র, আত্ম-উৎকর্ষ—রোমক-শিক্ষার মূলমন্ত্র, আত্ম-বিসর্জ্জন। বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠের ভাষায় বলিতে হইলে, গ্রীক অনুশীলন, শান্তি—রোমক অনুশীলন, কল্যাণী। গ্রীক, সত্যানন্দ ও রোমক, চিকিৎসক। কিন্তু পাঠক তাহাতে ভুল বুঝিবেন। রোমের আত্মবিসর্জ্জন, অপরিজ্ঞাত মরুভূমির মধ্য দিয়া সেনাদল লইয়া যাইত—অন্য জাতিকে পরাজয় করিয়া, রোমক সভ্যতার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিত—বিদেশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিত, উপনিবেশ স্থাপন করিত; তাহারা

কার্য্যপটু, বাগ্মী, উৎসাহময়। গ্রীক—সুন্দর, বিচক্ষণ, ভাবপরায়ণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, পৃথিবীর আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উৎসাহী, অথচ স্বর্গসন্ধানে ব্যাপৃত; মহীয়সী আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিত; হিন্দুর ন্যায়, গ্রীক চিন্তাতে উচ্চাদপি উচ্চস্থানে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিত, এবং এই জগৎকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন এক বস্তুর ছায়া মনে করিত।

রোমের অনুশীলনটা কতকটা কর্ম্মযোগের দিকে, গ্রীসের অনুশীলন কতকটা জ্ঞান-যোগের দিকে।

যাহা হউক, গ্রীক ও রোমক শিক্ষা-প্রণালীর আদর্শ মিশ্রিত করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ইউরোপ অধুনা নূতন আদর্শ গড়িতে চেষ্টা করিতেছে। ঐ গ্রীক আত্মোৎকর্ষ, আর ঐ রোমক আত্মত্যাগ—গ্রীসের চিন্তা ও ভাব, রোমের কর্ম্ম ও সংযম—এই দুই আদর্শ আমাদিগের জাতীয়-শিক্ষাতে লক্ষ্য করিতে হইবে। দেহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, বল ও ভাবের স্ফূর্ত্তি, চিন্তার বিকাশ, কর্ম্মের বিস্তার—নিজের উৎকর্ষ; আর,দেশের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য, মানবজাতির জন্য, নিজের বিসর্জ্জন—এই আমাদের আবশ্যক। রোমক "সেনেট" যেমন রাজাদিগের কংগ্রেস, তেমনি প্রত্যেক রোমক নাগরিক যেন একজন সেনা-পতি,একজন শাসনকর্ত্তা। আমাদিগের শিক্ষা-প্রণালীতে ভাব, চিন্তা ও কর্ম্ম কোনটাকে ছাড়িলে চলিবে না।

## শিক্ষাপ্রণালী—দুর্গে ও মঠে

এখন মধ্যযুগে যাই; সেখানে শিক্ষার ভাবগতিক কিরূপ দেখি। ইউরোপে মধ্যযুগে, [illegible]গণের মঠে, বিদ্যা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসীগণের শিক্ষা-প্রণালীতে গাম্ভীর্য্য ছিল, সংযম ছিল, শাসন ছিল, কঠোরতাও ছিল। আনন্দকে, কৈশোর ও যৌবনের স্ফূর্ত্তিকে, প্রকৃতির দৈনিক আনন্দোৎসবের সহিত যোগদান করাকে, তাহারা পাপ-মনে করিত। শিক্ষা-প্রণালী যতই কঠিন, যতই নিষ্ঠুর হইত, ততই তাহাকে তাহারা উৎকৃষ্ট জীবন ও উচ্চ উদ্দেশ্যের উপযোগী মনে করিত। অরুণোদয়ের জগৎভরা রূপে, সান্ধ্য গগনে অস্তাচলগামী দিনমণির লোহিত হাস্যে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবনে, পাপিয়ার ডাকে, মলয় মারুতে সুখ অনুভব করা তাহারা পাপ ও অধর্ম্ম মনে করিত। কেবল পাঠ কর,কেবল ঈশ্বরের ভজনা কর,—হাসিও না, খেলিও না, জগতের সৌন্দর্য্য-লীলার দিকে কটাক্ষ-পাত করিও না। আর সর্ব্বাপেক্ষা সাবধান, রমণীর রূপকে, রমণীর ভালবাসাকে, তাহার সান্নিধ্যকে কালসর্পিণীবৎ পরিহার করিবে—যেখানে রমণী আছে, তাহার ত্রিসীমানায় যাইবে না। রমণী সয়তানের দূত; রমণীর প্ররোচনায় আদিম-মনুষ্য স্বর্গচ্যুত হন; এখন তাহার নিকটে যাইলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইবে। মঠের উদাসীনদিগের শিক্ষা এইরূপ কঠিনভাবে সাধিত হইত। তাহারা ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার, সঙ্গীত, গণিত, জ্যামিতি, ও জ্যোতিষ এই সাতটী বিদ্যার অনুশীলন করিত।

মঠের শিক্ষায় যেমন কঠিন শাসন, দুর্গের শিক্ষায় তেমনি শিথিল ভাব। সন্ন্যাসী নিকেতন,আনন্দহীন—ভূস্বামী ভবন, আনন্দময়। মঠমন্ত্রে, রমণী-বর্জ্জন—দুর্গতন্ত্রে, রমণী-সেবা। সন্ন্যাসীরা বিশ্বাস করিত, রমণী সেবায় জীবনের অবনতি হয়—ভূস্বামিগণ মনে করিতেন, রমণী ভক্তি উন্নতির সোপান, মনুষ্য [illegible]

উদার প্রবৃত্তির অনুশীলনের উপায়। দুর্গে, সুকুমার ছাত্র, বালক-ভৃত্য হইয়া, দুর্গেশ-নন্দিনীকে বা দুর্গেশ-বনিতাকে সেবা করিত। এই রমণী-ভক্তি ইতিহাসের একটা আশ্চর্য্য অধ্যায়। অসভ্য দেশেরত কথাই নাই, প্রাচীনকালে, গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যেও, রমণীর অবস্থা এবং স্থান উচ্চ ছিল না। প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মই ইউরোপকে রমণী-ভক্তি শিখায়। তাহার পরে, এই রমণী-ভক্তি—যাহাকে ইংরাজিতে Chivalry বলে—দুর্ব্বল রমণীজাতিকে রক্ষা করাই পুরুষের গৌরব, এই ভাবটা গভীরতরভাবে ইউরোপের হৃদয়ে খোদিত হইয়াছে। শিভাল্‌রীতে শিখিত—ঘোড়ায় চড়িতে, তীর ছুড়িতে, ঘুসাঘুসি করিতে, দাবা খেলিতে, কবিতা লিখিতে, আর পাখী শীকার করিতে। মঠে, একদিকে অতিমাত্রা—দুর্গে, অন্যদিকে অতিমাত্রা। সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষা-প্রণালীতে যে কঠোর শাসন ছিল তাহা বাড়াবাড়ি—"শিভাল্‌রী"তে যে শিথিলতা ও আলস্যপরায়ণতা ছিল, তাহাও ক্ষতিকর। এখানেও দেখি, উভয়ে কতক ভাল, কতক মন্দ আছে। শিক্ষা-প্রণালীতে সংযমও চাহি, আবার মনোহারিতাও চাহি। সংযম ও আনন্দ কিরূপে উচিতভাবে সংযোজিত করা যাইতে পারে—জীবনকে অকারণ কষ্টে কণ্টকিত না করিয়া, কিরূপে সংযম-শিক্ষা হয়—ইহা নব্য শিক্ষা-প্রণালীর সমস্যা।

## প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুদ্ধার ও ধর্ম্মসংস্কার

"রিণেজান্‌স" সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু তাঁহার সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন :—"পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষা অসভ্য ছিল। একটী ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট, বিস্মৃত, অপরিজ্ঞাত গ্রীক-সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণ স্রোতস্বতী কুল-পরিপ্লাবিনী হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর; আজ গেলিলিও, কাল বেকন; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল।" আমরা এই প্রাচীন জ্ঞান মূলক শিক্ষা-প্রণালী ইরাস্‌মস্ (Erasmus) এর গ্রন্থে দেখিতে পাই। ইরাস্‌মস্ বলেন :—বালককে গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে পণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ করিতে হইবে। স্বভাবকে অনুসরণ করিয়া বালকের উন্নতি শনৈঃ শনৈঃ সাধন করিতে হইবে। খেলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিতে হইবে। ব্যাকরণের সূত্রগুলি ক্ষুদ্র ও অল্প করিতে হইবে। স্বতঃই যাহাতে বালক সহজে লেখা পড়াতে অনুরক্ত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক বালককে একটী শিল্প শিখাইতে হইবে—চিত্র বা ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্য। মঠধারীদিগের শিক্ষা-প্রণালী হইতে এই শিক্ষা-প্রণালী কত ভিন্ন—ঘন কৃষ্ণ-কাদম্বিনীর পিছন হইতে যেন দিবাকর হাসিতে হাসিতে বাহির হইতেছেন। কল্পনা করুন, সন্ন্যাসী-শিক্ষকদিগের সেই করাল মুখমণ্ডল ও কর্কশ নির্ঘোষ, কম্পিত ছাত্রের অশ্রুসিক্ত বদন, ; আর ইরাস্‌মসের শিক্ষকের স্মিত স্নেহময় দৃষ্টি, উৎসাহ-প্রদ মধুর আহ্বান, ছাত্রের প্রফুল্লবদন, কৌতুহল-লোল-লোচন, হাস্য-লীলাতরঙ্গে জ্ঞানার্জ্জন, কত প্রভেদ!

এদিকে লুথর যখন প্রোটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তখন সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য প্রচলিত ভাষায় বাইবেলাদি গ্রন্থ অনুদিত হইল এবং দরিদ্র

কুটীর-বাসীর দ্বারেও তিনি বিদ্যাকে ও শিক্ষককে লইয়া গেলেন।

তাঁহার পরে, অনেক বড় বড় লোক, শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষের জন্য, ধন প্রাণ মান সঁপিয়া দিয়াছিলেন—বাঙ্গালী পাঠকের তাহা কি জানিবার জন্য ধৈর্য্য থাকিবে? এ দেশে অদ্যাপি অন্যকে ভাল শিক্ষা দিবার জন্য কে অনাহার স্বীকার করিয়াছে—কে নির্ব্বাসনে গিয়াছে—কে কারাগারে গিয়াছে? হায়! ইহার মধ্যে একটু শিক্ষালাভ করিতে না করিতেই আমাদের কত দম্ভ—আমরা ইউরোপায়দিগের সমান হইয়াছি,—জাপানীদিগের সমকক্ষ হইয়াছি মনে করিয়া, বুক ফুলাইয়া বেড়াই। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে যে সকল সংস্কার হইয়াছে, র‍্যাট্‌কি (Ratke) তাহার সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে কারাবাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি শিক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি—(১) প্রার্থনা করিয়া শিক্ষার কার্য্য আরম্ভ করিবে। (২) বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছাত্রকে মারিবে না। (৩) একটী বিষয় এক সময় শিখাইবে (৪) যাহা শিখাইবে তাহার বারম্বার অভ্যাস করাইবে। (৫) দৃষ্টান্ত দিবার পূর্ব্বে কোন সূত্র শিখাইবে না। (৬) মাতৃভাষাতে প্রথমে প্রত্যেক বিষয় শিখাইবে। (৭) ব্যাকরণ হইতে ভাষা শিখাইবে না, সাহিত্য হইতে শিখাইবে, ইত্যাদি।

কমিনিয়স (Comenius) মোরোভিয়া নিবাসী। তিনি বলিতেন; বিদেশীভাষা মাতৃভাষার ন্যায় শিখাইবে, অর্থাৎ কথোপকথনে। ভাষা ও শব্দ-শিক্ষার বাহুল্যে প্রকৃত জ্ঞানলাভের যাহাতে ব্যাঘাত না হয় তাহাই করিবে। আর ছাত্রগণকে উদার শিক্ষার সঙ্গে শিল্প-শিক্ষা দিবে।

জেজুইটগণ শিক্ষার জন্য অনেক খাটিয়াছিলেন—আদর্শ আত্মবিসর্জ্জন প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু, কতকগুলি ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের সহিত সংযুক্ত হওয়ায়, তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী ক্রমে ২ বিকৃত হইয়াছিল।

মনটেন্, লক্, মিল্টনের বিষয় না বলিয়া আধুনিক শিক্ষা-সংস্কারকদিগের বিষয় কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

## উপসংহারে

আধুনিক সংস্কারকগণের মধ্যে, রুসো বলেন,—স্বভাবকে অনুবর্ত্তন কর। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইবে না। বালকদিগের সহিত অধিক তর্ক করিবে না। হৃদয়কে উচিত কার্য্যে অনুরক্ত হইবার জন্য শিক্ষা দেও। ছাত্রগণকে প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ ও বস্তু পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞানলাভ করাইতে শিক্ষা দিবে। কোন না কোন একটী শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিবে। পনর বৎসর বয়সে, যখন যৌবনের উন্মেষ হইবে, তখন ছাত্রকে ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব এবং জগৎ সম্বন্ধে নানা বিষয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে।

পেষ্টালজি (Pestalozzi) বালকদিগের সুশিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের সহিত আহার করিতেন। তাহারা পীড়িত হইলে তাহাদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। ছাত্রগণ বেষ্টিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতেন। তাহারা শয়ন করিলে, তাহাদিগের সঙ্গে প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহারা যতক্ষণ জাগিয়া থাকিত, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। এমন ছাত্রবাৎসল্য জগতে অতি বিরল। কমিনিয়স প্রবর্ত্তিত শিক্ষা [illegible]

ও রূসো প্রচারিত স্বভাব অনুবর্ত্তন, উভয় মিশ্রিত হওয়ায়, পেষ্টালজির শিক্ষা-প্রণালী অতি সুন্দর হইয়াছিল।

হার্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করেন। আর তিনি বলেন—যাহা ভবিষ্যতে মনে থাকিবে না তাহা শেখান ভাল নহে; ছাত্রকে জবরদস্ত করিয়া পড়ান অনুচিত।

শিক্ষা-ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা গেল যে,—

১। ইউরোপে, অতীত কালের শিক্ষা সংস্কারকদিগের চেষ্টায়, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, অতি উদার, অথচ ব্যবহারিক, বিজ্ঞান সম্মত। ইউরোপ এখন বুঝিয়াছে যে, শিক্ষাতে শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, জীবিকাবৃত্তি—এই সমুদয় গুলির প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

২। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের শরীর-ধাতু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন, এবং শরীরের সহিত মনের যে সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

৩। ছাত্রের মনের গতি কি করিলে কোন দিকে যায়, তাহা শিক্ষকের অবগত হওয়া আবশ্যক। ছাত্রের দেহ ও মন অতি কোমল যন্ত্র; তাহার প্রত্যেক চক্র, প্রত্যেক কার্য্য, শিক্ষককে অনুধাবন করিতে হইবে।

৪। ছাত্র যাহাতে সমাজের উপকারী হইতে পারে, তাহাকে ঐরূপ শিক্ষা দিতে হইবে।

৫। ছাত্র স্বাধীন ভাবে অনায়াসে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহাকে এরূপ কোন শিল্প, হাতে কলমে, কারখানায় বা দোকানে বা বিদ্যালয়ে কারিকরের নিকট শিখাইতে হইবে।

৬। অতীতকালে মনুষ্য, দর্শন, পরীক্ষা, চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করিয়াছে, স্থান, সময় ও পাত্র বিবেচনা করিয়া, ছাত্রকে যতদূর তাহার উত্তরাধিকারী করা যায়, শিক্ষা দ্বারা তাহা করিতে হইবে; সংক্ষেপে, যাহাতে মনুষ্য সুস্থ, সাহসী, জীবিকা-নির্ব্বাহক্ষম, জ্ঞানী, পরোপকারী, ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিজের ও সমাজের মঙ্গলসাধন করিতে পারে, শিক্ষা দ্বারা তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

এই শিক্ষা, পুস্তক, মৌখিক উপদেশ, সংসর্গ, অবস্থা, দৃষ্টান্ত, নিসর্গক্রিয়া, এবং শিক্ষকের নিজের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে। ছাত্র বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে স্বতঃ পরিচালিত। শিক্ষক তাহার নিয়ামক। ছাত্রের জীবন তরি বিপদসঙ্কুল ভবসাগরে ভাসমান, রিপুবাত্যায় ঘূর্ণিত। শিক্ষক তাহার কর্ণধার। ছাত্র পরে কিরূপে নিজের তরির নিজে কর্ণধার হইতে পারিবে, শিক্ষক তদ্বিষয়ে উপদেষ্টা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

# মিলনের প্রকৃত পথ।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতার আবশ্যকতা, পার্টিশন ও স্বদেশী আলোচনার ন্যায়, সম্প্রতি একটী মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ততঃ বঙ্গদেশে, দেশীয় পরিচালিত এমন একখানিও দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র দৃষ্ট হইতেছে না, যাহার প্রত্যেক সংখ্যায় এই একতা প্রতিপাদনের যৌক্তিকতা প্রদর্শিত না হইতেছে। এরূপ

একতার আবশ্যকতা ঠিক কোন সময়ে এদেশে উদ্ভব হইয়াছিল, ইতিহাস নিশ্চয় করিয়া বলিতে অক্ষম। কিন্তু, ইহা যে ভারতের একটী অপেক্ষাকৃত পুরাতন চিন্তা, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জনসমাজের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা যেরূপ কথার দ্বারায়, নানকাদি ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ও আকবর-প্রমুখ সম্রাটগণের আমলে, তদ্রূপ কার্য্যের দ্বারায় লোকের চিন্তাশক্তিকে, অনন্ত সাময়িক ভাবে, ভারাক্রান্ত করিয়াছিল। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে, বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই আমরা অল্প কিছু আলোচনা করিব। এই একতার সমর্থন ও প্রতিবাদস্থলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার অধিক কিছু বলিবার যোগ্যতা ও আবশ্যকতা আমাদের নাই। আমরা কেবল আবিষ্কৃত পথ সহজ ও সরল কি না, জ্ঞান-বৃদ্ধ নেতাগণের বিবেচনার জন্য তাহাই উপস্থিত করিবার চেষ্টা পাইব।

আমরা যে দুই সম্প্রদায়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা করিতেছি, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে তাহাদের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এই গোড়াতেই আমাদের একটী বিষম ত্রুটী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ত্রুটী লইয়া, মিলনের প্রয়াস, বা তৎসংক্রান্ত আলোচনা সমস্তই পণ্ড হইবার বিশেষ আশঙ্কা। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ক্রিয়া কলাপ, চাল চলন, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি-আদির প্রতি বিশেষ মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলে, সর্ব্বত্রই যেন আশ্চর্য্য রকমের বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অন্যান্য শাখা পল্লবাদি পরিত্যাগ করিয়া, গোপূজক ও গোহন্তারক—সাকার-পূজক ও সাকার-বিনাশক—বর্ণাশ্রমের প্রতিপোষক ও বর্ণাশ্রম-বিনাশক দুইটী বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সম্প্রদায়কে মিলনক্ষেত্রে একত্রে দাঁড় করাইবার কল্পনামাত্রই যেন মন অবসাদগ্রস্থ হয়। কেবল যদি সামাজিক নিয়ম বা দেশাচার এতাদৃশ বিরুদ্ধভাবের মূলে থাকিত, কোন কথা ছিল না। কিন্তু, ঐ সমস্তের আদিতে শাস্ত্রীয় কঠোর আদেশ নিহিত থাকা হেতু ঐ বিরুদ্ধভাব গুলিকে যেন অতি সাবধানে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। আরবী ও পারসী ভাষার কঠিন আবরণে আবদ্ধ ইস্‌লামের শিক্ষা ও তাহার ভিত্তি যে কি প্রকার, একালের হিন্দুদের প্রায় অনধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। নিতান্তই যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা প্রতিবেশী মুসলমানের ধর্ম্মতত্ত্ব, ইয়োরোপের পাদরী সাহেবদের লিখিত গ্রন্থের সাহায্যে অবগত হইয়া কৃতার্থ হন। হিন্দু ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবার পক্ষে মুসলমানদের ততটা অন্তরায় না থাকিলেও, অমনোযোগ অন্তরায়টা বিলক্ষণই আছে। এমন অবস্থায় মিলনক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে পদে পদে ভ্রান্তপথে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে।

এদেশে "জাতীয়তা" বলিয়া একাল পর্য্যন্ত একটা কথা ছিল না। কংগ্রেস-রূপ-যন্ত্রের দ্বারা, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, ভারতময় ইহার বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু, ভূমি ও আব-হাওয়ার উপর তেমন লক্ষ্য রাখা হইতেছে না। জাপানাদি দেশের জাতীয়তার উপকরণ, ভারতের উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং, [illegible]

তাহার সহজ অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে গেলে অপকারেরই আশঙ্কা করা যায়। জাতীয়তা গঠনের সূচনায় যে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিকতা আসিয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে যে পুরাতন প্রীতির উদ্ভব হয়, সেই পুরাতন প্রীতিই হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এক বিষম ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে বসিয়াছে। আপন পূর্ব্ব-গৌরবের নামে অন্ধ হিন্দু, কথায় ও কার্য্যে "আমরা সর্ব্বস্ব" হইয়া ভারতকে একাই আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন। মুসলমানেরাও, এদেশের কেহ কিছু নহেন বলিয়া, প্রবাসী সাজিয়া, উক্ত ব্যবধানের প্রসারত্ব বৃদ্ধি করিতেছেন। উপস্থিত আন্দোলনের কথা বাদ দিলে, জাতীয় চিন্তাক্ষেত্রে, মুসলমানদের সম্বন্ধে হিন্দুদের আশ্চর্য্য রকমের বিস্মৃতি প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে ; জাতীয়তার উপকরণ বলিতে তাঁহারা, অজ্ঞাতসারে, প্রায় নিজকেই বুঝিয়া থাকেন। মুসলমান হিন্দুর এই ভ্রম প্রদর্শন দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদের সেই ভ্রমকে বিশ্বাসে পরিণত করার পক্ষে সাহায্যই করিতেছেন। হিন্দু যতই আর্য্য-মহিমা মহিমান্বিত করিতেছেন, মুসলমান ততই আর্য্যামির নামে বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হইতে এ দেশীয় মুসলমানের উদ্ভব, কিম্বা তাঁহাদের শরীরে ভারতীয় আর্য্যরক্ত অথবা অন্য কোন বংশের রক্ত প্রবাহিত, এস্থলে তাহা বিচার্য্য নহে। ধর্ম্ম-সম্পর্কে, ভারতের উপর মুসলমানদের কোন টান নাই। জন্ম-সম্পর্কেও তাঁহারা ভারতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হেন না। ভারতবহির্ভূত, একজন সামান্য অবস্থার গজনি বা খোরাসান বাসীর বংশধরের কোন কৌলিন্যমর্য্যাদা না থাকিলেও, কেবলমাত্র উপরোক্ত কারণে, ভারতীয় মুসলমান সমাজে তাঁহার পদমর্য্যাদা, ব্রাহ্মণাদি বংশের মুসলমান অপেক্ষা অগ্রগণ্য। ভারত সম্বন্ধে একদিকে মুসলমানদের উপরোক্ত প্রকারের উদাসীনতা, অন্য দিকে হিন্দুর "আমরা সর্ব্বস্ব"-ভাব, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিকতার নামে, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ, এই অবস্থার মধ্যেও একতার আশা করা হইতেছে। হিন্দুরা সমুদ্র-যাত্রাই করুন, আর গোমাংস ভক্ষণই করুন, আপন পুরাতত্ত্বাদি আলোচনার ফলে, তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে নবভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার সহিত মুসলমানেরা স্বীয়ভাব মিশ্রিত না করিলে, একতা বা জাতীয়তা যাহাই বলুন, সুদূর পরাহত বলিয়াই বোধ হয়। হিন্দুরা যতটা অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বর্ত্তমান নবভাব পরিত্যাগ যত্যপি অসম্ভব ও অকল্যাণকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে, মুসলমানদের পক্ষেই বা কি হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিলোপ, অন্ততঃপক্ষে, তাঁহাদের অনুসরণ করা, সম্ভব হইবে? ইসলাম মতাবলম্বীগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে, আফ্রিকার নিগ্রো হইতে আসিয়ার ককেশিয়ান ও মঙ্গোলিয়ান পর্য্যন্ত, কৃষ্ণ, ধবল, সকল ছাঁচের ও রঙ্গের মুসলমানের মধ্যে এক বিরাট ঐসলামিক একতা বা জাতীয়তার সহিত অবিচ্ছেদ্য গভীর আন্তরিক যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। মরুভূমিস্থিত তাঁহাদের সেই এক মক্কার প্রতি, যে কোন দেশবাসী সেই এক খলিফার প্রতি, সতৃষ্ণ এক দৃষ্টি লক্ষ্য করিলে, তাঁহাদের বর্ত্তমান সিংহাসন-কলহ যেন অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। আর তৎসহ ইঁহাদের পক্ষে, কোন দেশের কোন ধর্ম্মাবলম্বী জাতির সহিত, আপন স্বার্থ মিশাইয়া এক হইয়া থাকা সম্ভবপর কি না, তৎসম্বন্ধীয় চিন্তা স্বতঃই আরা-

ক্রান্ত হইয়া উঠে। খ্রীষ্টিয়ান জগতে, একখণ্ড [illegible]ার উপর একটী কল্পিত চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়া, তাহার চারি পার্শ্বে চারিটী বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থের পত্তন সম্ভব হইয়াছে। বনিয়াদ কাল্পনিক বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে যথা তথা জাতীয়তার ও মাতৃভূমির সৃষ্টি করিতেও বড় আটকাইতেছে না। নূতন ও প্রাচীন মহাদ্বীপের বিভিন্ন অংশস্থিত ইয়োরোপিয়ান উপনিবেশাদির কথা দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম, বর্ণ ও ভাষার একতা, তাহাদের নিত্য নবোৎপন্ন জাতীয়তার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে সক্ষম হয় নাই। ইসলাম জগতের অবস্থা ঠিক যেন তাহার বিপরীত। খ্রীষ্টিয়ানী দেশের আমদানী, উপরোক্ত "জাতীয়তা," এদেশে হিন্দুর মধ্যে যতটা প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে, মুসলমানের মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত কারণেই, তাহার কিছুই হইয়া উঠে নাই।

নানা প্রকারের বিরুদ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া, কেহ কেহ ইয়োরোপের রোমান-ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানাদির ন্যায়, এ দেশের হিন্দু মুসলমানকেও এক ভাবাপন্ন হইয়া, একযোগে দেশের হিতের জন্য অগ্রসর হইতে পরামর্শ দেন। নজিরটী শ্রুতি-মধুর হইলেও, অপ্রয়োজ্য বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টিয়ান মতের অন্তর্গত বহুবিধ সম্প্রদায়, হাজার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও একই বাইবেল-গ্রন্থ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের আচার ব্যবহারাদিতেও বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ঠিক যেন এ দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়। এ কালের বিজ্ঞান-মূলক শিক্ষা, ভারতের সাম্প্রদায়িকতা বিনাশের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়াও অনেকে আশা করেন। এই অনুমানটী স্বীকার্য্য না হউক, বিবেচনাযোগ্য, সন্দেহ নাই। এরূপ আশার অনেক কারণও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই অনুমানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, যাঁহারা সুদূর ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া দেখেন, তাঁহারা কল্পনাবলে, এমন একটী সমতল-ক্ষেত্র দেখিতে পান, যেখানে হিন্দু-মুসলমান আপনাপন শাস্ত্রীয় সুদৃঢ় প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বা ভঙ্গ করিয়া, মুক্ত-অন্তরে একত্রিত হইতে পারেন। কিন্তু, এরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে কি কোন আপত্তি উঠিতে পারে না? সাম্প্রদায়িকতা কি জগতের নিত্যবস্তু নহে? জগতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত; কি হ্রাস হওয়ার কোন প্রমাণ আছে? বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সংস্থাপিত ধর্ম্মমত কি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হয় নাই? পৃথিবীস্থ প্রত্যেক ধর্ম্মমতের উচ্চ বা শেষাবস্থার শিক্ষাই সাম্প্রদায়িকতা বিনাশের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু, সেই সমস্ত উদার-শিক্ষাও, ধর্ম্মক্ষেত্রে, একতা-সম্পাদনে স্থায়ীফল দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যে অন্ন ও সংস্রব বিচার নাই; সুতরাং, বিদেশগমন ও অন্যান্য সংস্রবাদিতে হিন্দুজাতিকে বাহ্যতঃ যতটা অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের বর্ত্তমান স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম প্রেমিকতার ফলে উৎপন্ন স্বতন্ত্রতার সমক্ষে অতি নগণ্য। এদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির ভিন্ন রকম ইতিহাসের আলোচনা না করিয়া, কেবলমাত্র ভারতেই সাত শত বৎসরে সাত কোটি মুসলমানের উদ্ভবের সংখ্যায় আস্থাবান হইয়া, হিন্দু মুসলমানের একাকারত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যাইত। কিন্তু, ইসলামের শক্তিশালী নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রীষ্টিয়ানমত ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান অবস্থা, সে ক্ষীণ আশাকেও ক্ষীণতর করিতে সক্ষম। ভারতোৎপন্ন বহুবিধ [illegible], কালে হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়াছে বলিয়া,

যাহারা হিন্দু মুসলমান সম্পর্কেও তদ্রূপ আশা করেন, তাঁহারা পৃথিবীস্থ মৌলিক ধর্ম্মমতাদির ভিত্তি পরীক্ষা করিয়া, তদ্রূপ আশা করিতেছেন কিনা, অবগত নহি।

ভারতবর্ষে একধর্ম্ম, একভাষা ও একছত্র শাসনকে যাঁহারা জাতীয়-জীবনা গঠনের প্রধান সহায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ইংরেজ, স্কচ্ ও আইরিষাদি জাতীর মধ্যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত বিচ্ছেদের কথা স্মরণপথে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ইংরেজ ও আইরিষাদির মধ্যে ব্যবধান যতটুকু, এ দেশে, এক হিন্দু বাঙ্গালির সহিত, হিন্দু মারাঠার ও হিন্দু পাঞ্জাবীর সহিত, হিন্দু উড়িয়ার ব্যবধান তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক। রাজশক্তির সহিত অনবরত বুঝা পড়ার অবস্থায়, ভারতবাসী একই স্বার্থে পরিচালিত হইয়া আসিতেছেন—অন্য কথা ভাবিবার তেমন অবসর পাইতেছেন না। কিন্তু, কালে উপরোক্ত অবস্থার অবসান হইলে, অর্থাৎ ইংলণ্ডের ন্যায় শাসন-ব্যবস্থা এ দেশেও প্রবর্ত্তিত হইলে, এই স্বার্থ-ঘটিত একতা ভারতময় সর্ব্বত্র সর্ব্ব-সময়ে থাকা সম্ভবপর হইবে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, একছত্র ইংরেজ-শাসন ও এক ইংরেজীভাষা, এ দেশের জাতীয়তার গোড়ায় যথেষ্ট জলসিঞ্চন করিয়াছে ও করিতেছে। এই ভাব-প্রধান বঙ্গদেশে, "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" করিতে একটী ধর্ম্মমতও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যে কোন কারণে হউক, বঙ্গদেশবাসীই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা সেই অঙ্কুরটীর গোড়ায়, স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম প্রেমিকতার নামে, ভিন্ন প্রকারের বীজ রোপণ করতঃ, কেবল যে তাহাকে বিনাশপথে টানিয়াছেন, এরূপ নহে, তাহাকে জাতীয়-জীবন ক্ষেত্রে আগাছারূপে নির্ব্বাচন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যে ইংরেজীভাষার সাহায্যে, একতা-ক্ষেত্রে, ভারতবাসী ভাব বিনিময় করিতে ও নানাবিধ আধুনিক সময়োপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে সক্ষম হইতেছিলেন এবং যাহার রক্ষা-কল্পে, লর্ড-কর্জ্জন-প্রমুখ রাজপুরুষগণকে এ পর্য্যন্ত দোষারোপ করিতে নিরস্ত হইতেছেন না, আজ কিনা ভারতের মস্তিস্ক-স্বরূপ বঙ্গদেশবাসীকে, সর্ব্বাগ্রে, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিকতার নামে, সেই ইংরেজীভাষাকে সহকারী ভাষায় পরিণত করতঃ, দেশীয় বিবিধ ভাষাকে প্রাধান্য দিয়া, শিক্ষা-কাউন্সিল গঠন করিতে অগ্রসর দেখিতেছি। আমরা দেশীয় ভাষার উন্নতির বিরোধী নহি। আর, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে দেশীয় ভাষা গুলি নেহাত মারা যাইতেছিল, এমনও নহে।

জাতীয় জীবনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ প্রকারের জাতীয়-উৎসবের আবশ্যকতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। এ দেশেও তাহার সূত্রপাত দেখা দিয়াছে। অধ্যবসায়ের অবতার ছত্রপতী শিবাজী, এই জাতীয়-উৎসব-ক্ষেত্রে, আদর্শরূপে দেখা দিয়াছেন। শিবাজী-জীবনের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও প্রতারণা আদি, তখনকার রাজনীতির অনুরোধে পরিত্যাজ্য হইলেও, তাঁহার মোগলের প্রসাদাকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়িলে কি, তাঁহাতে কোন মহৎ ভাবের আরোপ করিতে সাহস হয়? দরবার-ক্ষেত্রে সম্রাট আরংজেব সেই একটী ভুল না করিলে কি, কেহ ইতিহাস-পৃষ্ঠায় শিবাজীর নামটীর পর্য্যন্ত উল্লেখ দেখিতে পাইতেন? এ বৎসরের কলিকাতাস্থ শিবাজী-উৎসব-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত তিলক প্রমুখ নেতাগণ যে ভবাণী-পূজার আবশ্যকতা

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মূর্ত্তি-পূজার বিরোধীগণের যোগদানের বাধ্যবাধকতা থাকুক আর নাই থাকুক, ব্যাপারখানা যে হিন্দুদের "আমরা সর্ব্বস্ব"-ভাবের ফল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অনেকে এ ক্ষেত্রে হংসের দুগ্ধ-মিশ্রিত জলপানের অবস্থাকে অনুকরণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু, বৈদান্তিককালের উপযোগী সে সূক্ষ্ম দার্শনিক উপদেশ, প্রদান অপেক্ষা পালন যে অনেক কঠিন, সম্ভবতঃ তাঁহারা তাহা ভাবেন না। ভারতের দুইটী শক্তিশালী সম্প্রদায় যদ্যপি কার্য্যতঃ, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম প্রেমিকতার নামে, অজ্ঞাতসারে কি জ্ঞাতসারে, ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহা হইলে বক্তৃতা-প্রচার করিয়া আর ফল কি? ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল, গোরক্ষিণী-সভা, নদুয়াতল ওলমা ইত্যাদি সভা সমূহ আপনাপন স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট কার্য্যকর হইতে পারে। কিন্তু, ভারতের জাতীয় মিলন-ক্ষেত্রে এইসব গুলি কোন স্থান অধিকার করিয়া আছে, ভাবা উচিত। সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" কে, স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে, ভারতের জাতীয় বীজমন্ত্ররূপে পরিগণিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। মুসলমানেরা এই বীজমন্ত্র গ্রহণ করিবেন কি না এবং তাঁহাদের পক্ষে উহা সম্ভবপর হইবে কি না, চির-প্রথামত বিবেচনা করিয়া দেখা হয় নাই। এজন্য, এখনই স্থলবিশেষে, মুসলমানেরা বন্দে মাতার কার্য্য, "আল্লাহো আকবর" দ্বারায় সারিয়া লইতেছেন। হিন্দু নেতাগণের আবিষ্কৃত এই সমস্ত পথ, কেবল যে মুসলমানদেরই বিচার করিয়া গ্রহণ করা উচিত, ইহা নহে, সর্ব্বসাধারণ হিন্দুরও তাহাই করা কর্ত্তব্য। কলিকাতায়, ঢাকে কাটী পড়া মাত্রই যে, রাজ্যশুদ্ধ লোককে নাচিতে হইবে, ইহা কখনও বাঞ্ছনীয় নহে।

পার্টিশন ও স্বদেশী আন্দোলনকে হিন্দু মুসলমানের মনের মধ্যেও এক বিষম সমস্যা-রূপে দেখিতে পাইতেছি। ইহার পরিণামে কি যে দাঁড়াইবে, তাহা অনিশ্চিত। এই উপলক্ষে মুসলমানদের মধ্যে তিনটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম দল—গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী; দ্বিতীয় দল—হিন্দুদের সহিত এক যোগে চলিতে ইচ্ছুক। ইহা ব্যতিত, কোন দলের সহিত যোগদান করেন নাই, এরূপ লোকের সংখ্যাও কম নহে। খুব সম্ভবতঃ, ইহাঁরা এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার মতগঠন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহাঁরা বা এই দল যে দিক সমর্থন করিবেন, মুসলমানসমাজ কালে সেই দিকেই গড়াইবে। সুতরাং, এই দলকে বিশেষ সাবধানে মতগঠন করিতে হইবে। রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা যেমন মুসলমানদের পক্ষে স্বার্থ ও শাস্ত্র দুই দিক দিয়াই অকর্ত্তব্য—অন্ধ অনুসরণও তদ্রূপ সমাজের চক্ষে নির্জ্জীবতা ও কাপুরুষতার পরিচায়ক। গবর্ণমেণ্ট বলিলে, তাহার মূলে মানুষ ছাড়া আর কিছু বুঝায় না; সুতরাং, যেখানে মনুষ্য, সেই স্থানেই ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য্য। শকটের দুইটী চক্রের একটী খুলিয়া লইলে, দুইটীই যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এ দেশের হিন্দু মুসলমানের অবস্থাও ঠিক সেইপ্রকার। পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় মুসলমান প্রতিপত্তি বাড়ুক, আর নিজবঙ্গে হিন্দু প্রাধান্যই বহাল থাকুক, কিন্তু, এ খেচরান্ন হইতে দাল, চাল পৃথক করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। শয্যাগত মুসলমান সম্প্রদায়, রাজ-সাহায্যে যদি দাঁড়াইতে, অন্ততঃ বসিতে পারেন, সেত পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু, জগতের যে শীর্ষস্থানীয় দল-

মর্য্যাদা তাঁহারা হারাইতে বসিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে কি পরিমাণে রাজ-শক্তির আবশ্যক হইয়াছিল, দেখা আবশ্যক। সেই কন্থাধারী সাধারণ-নির্ব্বাচিত খলিফাগণ, ধর্ম্ম, নীতি ও স্বাবলম্বনের সাহায্যে, জগতকে যাহা দেখাইতে পারিয়াছেন, মুকুট ও সিংহাসনের অধিকারী, মুসলমান রাজশক্তিকর্ত্তৃক তাহার কতদূর হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে, আমরা ভাবিয়া দেখিতে পারি। একদিকে স্বাবলম্বনে দেশের লোকের শিক্ষার নিমিত্ত,রাজশক্তির তুল্য ক্ষমতায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের চেষ্টা—অন্যদিকে, রাজ-সাহায্যের নামে, দারোগাগিরির জন্য স্কুল কলেজ পূর্ণ করা, কি শোচনীয় বিপরীত অবস্থা! এরূপ রাজ-সাহায্য না পাইলে কি যে অনিষ্ট হইত,আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। গুণগ্রাহী ইংরেজজাতি, কল্য পূর্ব্ব-বাঙ্গলার হিন্দুকে চাকুরি-ক্ষেত্রে নিরাশবাণী শুনাইয়া, অদ্যই বিক্রমপুরীকে প্রধান বিচারপতির পদ-প্রদানে অসম্ভবকে সম্ভব করিলেন। কিন্তু, রাজ-সাহায্যে বা স্বামী-সাহায্যে—কোন সাহায্যেই মুসলমানদের অন্ততঃ ২।৪টা ডিপুটীগিরিও মিলিল না।

জাতীয়-জীবন-গঠন কার্য্যের অগ্রণীগণকে ভাল মন্দ বিস্তরই শুনিতে হইবে। ঠিক হউক, আর নাই হউক, দোষদর্শনে অনেকেই মজবুত। সেই হিসাবে, ভারতে জাতীয়তা সংস্থাপন-মানসে আবিষ্কৃত বর্ত্তমান পথ নানাবিধ কণ্টকে বদ্ধপ্রায় বলিয়া আমরা দেখাইলাম। আমাদের ধারণায় ভ্রম প্রমাদ থাকিবে, আশ্চর্য্য নহে। আগামীবারে, আবিষ্কৃত পথ-পরিষ্কার সহজ-সাধ্য, কি কোন নূতন পথ অবলম্বন কর্ত্তব্য, দেখাইবার চেষ্টা পাইব।

শ্রীআমানতউল্লা আহাম্মদ।

# উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী।

## গর্ভোপনিষৎ

ঋতুকালে পুংকীট(১) স্ত্রীডিম্বে(২) সংযুক্ত হ'লে,
একরাত্রে কলল (৩) জনমে,
সপ্তরাত্রে, বুদ্বুদ, (৪) অর্দ্ধমাসে, পিণ্ডাকার,
মাসান্তে কঠিন হয় ক্রমে।
দুই মাসে, হয় শিরঃ, মাসত্রয়ে, পাদদেশ,
চতুর্থে, জঠর, গুল্ফ, কটি ;—
পঞ্চমেতে, পৃষ্ঠবংশ, (৫) বদন, নাসিকা, ষষ্ঠে,
আর, চক্ষু কর্ণ, দুটি, দুটি।
সপ্তমে, চলন-শক্তি, অষ্টমে, লক্ষণ সব,
জনমে ভ্রূণের পরে পরে ;
স্ত্রীডিম্ব পুংকীটতেজে হইলে অনুপ্রাণিত
ক্রমে দেহ বাড়ে গর্ভাধারে।
পিতৃরেতঃ হয় যদি অধিক,আর্ত্তব(৬) হ'তে,
তাহা হ'লে পুত্র জাত হয় ;
আর্ত্তব অধিক হয় যদি, পিতৃরেতঃ হ'তে,
তবে কন্যা জনমে নিশ্চয়।
পিতৃরেতঃ মাতৃরেতঃ, সমবল হয় যদি
নপুংসক হয় তাহা হ'লে ;
তাঁদের (৭) ব্যাকুল মন হইলে, কুব্জ, বামন,
অন্ধ, খঞ্জ জন্মে ধরাতলে।

(১) Spermatozoon.
(২) Ovum.
(৩) ঈষৎ ঘন।
(৪) বর্ত্তুলবৎ।
(৫) মেরুদণ্ড।
(৬) মাতৃরেতঃ।
(৭) পিতা মাতার।

যদি পিতৃ মাতৃরেতঃ হ'য়ে বায়ু প্রপীড়িত,
দ্বিধা হয়, যমজ জনমে।
পঞ্চভূত-ময় দেহ, মননে(৮) সমর্থ সদা ;
রূপ আদি (৯) বুদ্ধির বিষয় ;
চিত্তে হয় বুদ্ধি-যোগ, তাহাতে অনিত্য আর
নিত্য-বস্তু ব্রহ্মজ্ঞান হয়। (১০)
তাই এই দেহ মাঝে, অষ্টপ্রকৃতি (১১) আর
ষোড়শ বিকার (১২) বিদ্যমান ;
নদী যথা সিন্ধুদিকে, সেই মত এরা সব
সদা ব্রহ্মে হয় ধাবমান ॥ ৪ ॥
ভ্রূণের নাভিতে যুক্ত, নাড়ী সূত্র দিয়া
মাতৃখাদ্য পেয় রস ভ্রূণ দেহে গিয়া
গর্ভাধারে আপ্যায়িত করে তা'র প্রাণ,
সেই রসে পুষ্ট ভ্রূণ হয় বলবান।
এরূপে নবম মাসে সর্ব্বজ্ঞান হয়,
তখন স্মরণ করে কথা সমুদয়।
পূর্ব্বজন্ম কথা আর শুভাশুভ কর্ম্ম,
সকল স্মরণ করি, পরে হয় জন্ম ॥ ৫ ॥
এই ভাবে চিন্তা করে ভ্রূণ গর্ভ-কোষে,—
"দেখিয়া সহস্র যোনি, হেথা অবশেষে
আইলাম, বর্ত্তমান জঠর মাঝারে।
সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমিনু আঁধারে।
বিবিধ আহার পূর্ব্বে করেছি ভোজন ;
নানাবিধ মাতৃস্তন করি আকর্ষণ
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে দুগ্ধ করিয়াছি পান ;
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হ'য়েছে বিধান।
পরিজন তরে আমি শুভাশুভ কত,
কত কর্ম্ম করিয়াছি, পূর্ব্বে অবিরত ;—
সেই শুভাশুভ কর্ম্ম দহিছে আমারে,
পরিজন ফলভোগ করেছে সংসারে।
আমি শুভাশুভ কর্ম্ম করি' হই বদ্ধ ;
পরিজন লভে ফল, এই ত সম্বন্ধ।
দুঃখার্ণবে পড়ি আজি ডুবিতেছি আমি;
কেমনে উদ্ধার হই, উপায় না জানি।
এই যোনি হতে মুক্ত হ'লে একবার,
অশুভ-বিনাশী মুক্তি-ফলের-আধার
সেই মহামহেশ্বরে লইব আশ্রয়,
অশুভ কর্ম্মেতে যাহে মতি নাহি হয়।
এই যোনি হ'তে মুক্ত হইলে এখন
সেবিব মঙ্গলময় দেব নারায়ণ।
অশুভ-বিনাশী, মুক্তি-ফলের-আধার,
তাঁহারে সেবিয়া মুক্ত হইব এবার।
এই যোনি মুক্ত হ'য়ে সাঙ্খ্যযোগ ক'রে
অশুভ-সংহারী মুক্তি লভিব এবারে।
এবার হইলে মুক্ত,—জানে অন্তর্যামি,—
সনাতন ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হব আমি ॥ ৬
এই ভাবে চিন্তা করি দ্বারদেশে আসি
জরায়ু-যন্ত্রপীড়নে, মহাদুঃখ রাশি
ভোগি, শিশু পদার্পণ করে এ ধরায়।
বায়ুরূপে স্পর্শে তা'রে, বৈষ্ণবী মায়ায়,

(৮) চিন্তা করিতে।

(৯) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ।

(১০) এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ চিন্তা করিতে সমর্থ। চিন্তা, অনুভূত বিষয় হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই অনুভূতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক,এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যোগে হইয়া থাকে। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, এই পঞ্চ বিষয় অনুভব করে। এই পঞ্চ বিষয়ের অনুভূতি হইতে, চিত্তে বুদ্ধির যোগ হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সংযোগ-বিয়োগেই সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হয় ; এবং ইহা বুদ্ধিরই কার্য্য। এই বুদ্ধি ক্রমে অনিত্য চিন্তন হইতে, অক্ষয় নিত্যবস্তুর জ্ঞানে উপনীত হয়।

(১১) ১। প্রকৃতি, ২। মহত্তত্ত্ব ( প্রাথমিক বুদ্ধি ) ৩। অহঙ্কার,(আত্ম-অনুভূতি) এবং ৪—৮ পঞ্চতন্মাত্র। এই অষ্ট প্রকৃতি। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থাকে তন্মাত্র বলা যায়।

(১২) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, এবং মন—এই ষোড়শ বিকৃতি। দেহে ৮ টা প্রকৃতি ও ১৬টী বিকৃতি বর্ত্তমান আছে।

তখনই ভুলিয়া যায় সকল কল্পনা ;
জন্মমৃত্যু শুভাশুভ স্মরণ থাকে না ॥ ৭ ॥
শরীর ইহার (১) নাম কি হেতু হইল ?—
অগ্নিত্রয়ে শীর্ণ তাই শরীর বলিল।
জ্ঞানাগ্নি, দর্শন-অগ্নি, কোষ্ঠাগ্নি দহনে
শীর্ণ এ শরীর ; ঐ নাম সে কারণে।
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়,—ভুক্তপীত যত
কোষ্ঠাগ্নিতে পরিপাক হইছে নিয়ত।
দর্শন-অগ্নিতে সদা রূপ-গ্রহ' হয়,
জ্ঞানাগ্নিতে শুভাশুভ জ্ঞানের উদয়।
এ তিন অগ্নির স্থান আছে তিন স্থানে(২)—
মুখেতে, উদরে, আর, হৃদয়-আসনে।
এই দেহে মহাযজ্ঞ হইছে সাধন ;
কহিতেছি নানাবিধ যজ্ঞের করণ।(৩)
আত্মা যজমান, মন ব্রহ্মা সম হয়,
লোভ-আদি পশুসম, জানিও নিশ্চয়।
ধৃতি (৪) ও সন্তোষ হয় দীক্ষার সমান।
জ্ঞানেন্দ্রিয় যজ্ঞপাত্র, বুঝহ সন্ধান।
মস্তক কপাল, (৫) ঘৃতসম কর্ম্মেন্দ্রিয়,
কেশরাজি কুশ, বেদী মুখেরে জানিও ॥৮॥
দেহের গঠন কহি ;—চতুরস্থি শিরঃ,
ষোল পার্শ্ব, ষোল দন্ত বুঝি লও ধীর।
এক শত সাত মর্ম্ম, একশত আণী
সংখ্যা গণনায় দেহমাঝে হয় পেশী।
তিন শত ষাটি অস্থি ; সার্দ্ধ চারি কোটী
লোমরাজি শোভে দেহে, অতি পরিপাটী।
বার পল (৬)সংখ্যা জল ; রস, আট পল,
তারপর ধাতু-সংখ্যা শুন, অচঞ্চল।
এক আড়ক(৬)কফ,আর এক প্রস্থ(৬)পিত্ত,
এক কুড়ব (৬)শুক্র, দুই প্রস্থ মেদ সত্য।
মল মূত্র, ইহাদের নাহি পরিমাণ—
যেমন আহার, তার তেমনি সন্ধান।
পুরাকালে পিপ্পলাদ কহিলা যেমন
এই মোক্ষ শাস্ত্র শেষ হইল তেমন ॥৯॥
॥ ওঁ তৎসৎ ॥
ইতি গর্ভোপনিষদ্ সমাপ্ত।
শ্রীশশধর রায়।

# রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি।

রাজা জন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, ম্যাগ্‌নাকার্টার পরিবর্ত্তে,আমার মুকুট তোমরা কাড়িয়া লইলেও আমার ক্ষতি হইবে না। একথা তিনি কাহাকে বলিয়াছিলেন ? লোকে জানে, রাজা ঈশ্বরের নিয়োজিত মহাশক্তি। অত্যুক্তি-পরায়ণ আমাদের ভারতবাসী 'দিল্লী-শ্বরো বা জগদীশ্বরোবা' বলিয়া স্তুতি করিত। জনের এই রাজশক্তি, কাহার শক্তির ভয়ে অস্থির হইয়া, নিজের মুকুট অপেক্ষা প্রিয়, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, এই প্রজাগণের প্রতি যথেচ্ছাচার শাসন পরিত্যাগ করিলেন ? ইহা সমবেত প্রজাশক্তি।

একদিন মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন প্রাতঃস্মরণীয়া রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এক বিল ( আইনের পাণ্ডুলিপি ) স্বাক্ষর করিতে গিয়াছিলেন। মহারাণীর অমত

---

(১) হস্ত দ্বারা দেহকে দেখাইতেছেন।

(২) মুখেতে দর্শনাগ্নি, নাম আহ্বনীয়। উদরে কোষ্ঠাগ্নি, নাম গার্হপত্য। হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি, নাম—দক্ষিণাগ্নি।

(৩) উপকরণ।

(৪) ধারণা।

(৫) অস্থি।

(৬) পল, আড়ক, প্রস্থ, কুড়ব—এ সকল পরি-মাণের সংখ্যা বিশেষ। সেই সংখ্যা অতীব অধিক।

হওয়াতে তিনি বলিলেন,—আমি করিব না। গ্লাডোষ্টোন বলিলেন,—মহাশয়া, আপনার এটী স্বাক্ষর করিতেই হইবে। মহারাণী স্তম্ভিতা হইয়া বলিলেন—জান তুমি, আমি কে? গ্লাডষ্টোন বলিলেন, আমি জানি আপনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া,—ইংলণ্ডের রাজ্ঞী জানে, আমি কে?—মহারাণী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, গ্লাডষ্টোন বলিলেন—আমি ইংলণ্ডের জনসাধারণ, people বা প্রজাশক্তি। এই প্রজাশক্তির নিকট তাঁহার মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল।

ইউরোপে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তিতে সমরানল কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী। এইজন্য চার্লস্ ফার্ষ্টের জীবন গিয়াছিল—লুই ষোড়শ মস্তক প্রদান করিয়াছিলেন—এবং রুস-সম্রাট্ সর্ব্বদা মস্তকের ভয়ে অস্থির আছেন। এই প্রজাশক্তি ফরাসীদেশে, মহাদানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাণ্ডব নিনাদে জগৎ কম্পিত করিয়াছিল। রাজার মস্তক, রাজ কুটুম্বদের ধন-প্রাণ-মান, ইহার নিকট বলিদান হইয়াছিল, পরিশেষে নেপোলিয়ানের সামরিক-শক্তি ফরাসীরাজ্য আত্মবিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এই প্রজাশক্তি ইংলণ্ড দেশে, ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃত্যে, ভীষণ তেজ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু, রক্ষণশীল ইংলণ্ড কেবল রাজার মস্তক বিনিময়ে, সেই বিষম বিভ্রাট হইতে রক্ষা পাইলেন। এক্ষণে ইংলণ্ডে এই প্রজাশক্তি মহা বলবান, রাজশক্তি নিষ্প্রভভাবে দিবা-প্রদীপের ন্যায় মিটি মিটি জ্বলিতেছে। ফ্রান্সে রাজশক্তি পদদলিত হইয়াছে, প্রজাশক্তি বিরাট মূর্ত্তিতে দেশশাসন করিতেছে। আমেরিকার রাজশক্তি নাই। প্রজাশক্তি জগতে অদ্ভুত সভ্যতা আনয়ন করিয়াছে। আশা করা যায়, জগতে এই প্রজাশক্তি একদিন প্রবল বেগে সমস্ত রাজ্যশাসন গ্রহণ করিবে, রাজশক্তি অন্তর্হিত হইবে।

রাজা কে? একদিন প্রজাগণ দেখিল,—খাদ্য লইয়া, কি জমি লইয়া, গৃহ লইয়া বা স্ত্রী লইয়া, যে সময়ে লোকের মধ্যে মহা কলহ উপস্থিত, একজন মহা বলবান ও বুদ্ধিমান লোক ন্যায়দণ্ড লইয়া তখনই মীমাংসা করিয়া দিল—যাহার ধন তাহাকে দিল,—যে চক্ষু রাঙ্গাইল, তাহাকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিল। তখন অত্যাচারিত প্রজাবর্গ বলিল,:আপনি আমাদের শাসন ও সংরক্ষণ ভার গ্রহণ করুণ। এইরূপে, জনসমাজের মধ্যে একজন সর্ব্বস্বীকৃত রাজা আসিলেন। যখন এই রাজা নিজে সমস্ত ভার কুলাইতে পারিলেন না, তখন মন্ত্রী আসিল, সেনাপতি আসিল, সৈন্য আসিল। আবার যখন প্রজাগণ রাজার যথেচ্ছাচার সহ্য করিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজসভা বসিল, প্রজা-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইল, স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। এইরূপে জগৎ মধ্যে, প্রথমে প্রজাশক্তি রাজা নিয়োগ করিল, পরে, রাজা প্রজাশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এইরূপে উভয় শক্তি মিলিত হইয়া রাজ্য-শাসন চলিতে লাগিল।

ভারতে এই রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির কি প্রকার সম্মিলন, আমরা তাহা দেখাইব বলিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। ইতিহাসের পূর্ব্ব-অংশ পরিত্যাগ করিয়া, অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করা যাক্। অনেকেই মনে করেন, যে সিরাজ-উদ্দৌলাকে লোকেরা নরাধম অত্যাচারী মনে করেন, তিনি তেমন ছিলেন না, সম্ভব ও হইতে পারে অসম্ভবও হইতে পারে, কেন না নবাব "সিরাজউদ্দৌলা" এই উক্তি যে কোন

ইংরাজের তাহা নহে, আমরাও আমাদের পিতামহ প্রভৃতির সময় হইতে শুনিয়া আসিতেছি। তবে একদিন সে স্বপ্ন দেখিয়া ভাবিলাম নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঠিক রাম রাজা; স্বপ্নতত্ত্বে আমার তত বিশ্বাস নাই। তবে একথা সম্ভব, যে সিরাজ নিজের পাপ অপেক্ষা, পূর্ব্বপুরুষের পাপের জন্যই প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ মুকুট ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ষোড়শ লুই ও প্রথম চার্লসও পূর্ব্বপুরুষের পাপে মুকুট ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। একদিনে অত বড় বিপ্লব ঘটে না, প্রজাশক্তির অন্তর্নিহিত প্রধুমিত বহ্নি ক্রমশঃ প্রবলবেগে সর্ব্বত্র বহ্নিমান হইয়া প্রবল দাবানল সঙ্ঘটন পূর্ব্বক দণ্ডের দাহন করিয়া থাকে। জগতে কোন ঘটনাই আকস্মিক নহে, এবং আসুন আমরা বিশ্বাস করি, কোন ঘটনাই সেই অনাদি-নিধান, সর্ব্বশক্তিমান মহাশক্তির হস্ত ভিন্ন সাধিত হয় নাই।

একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে কপট ধার্ম্মিক আরঙ্গিবের অত্যাচারে, মহারাষ্ট্রে শিবজীর আবির্ভাব হইয়াছিল, রাজপুতানায় রাজসিংহ ও অজিতসিংহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে প্রজাশক্তি জাগিয়াছিল। তখনও এই শক্তির মধ্যে হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত। কবির কল্পনা বলিয়া অগ্রাহ্য করিও না, বাস্তবিকই রাণী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, মীর্জ্জাফর প্রভৃতি এই রাজশক্তির অত্যাচার নিপীড়িত প্রজা-প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, সিরাজের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন। তাই শিব গড়িতে, তাহারা বানর গড়িলেন। কিন্তু, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিলেন, আমি এই বীজ হইতেই তোদের উদ্ধার করিব। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে শক্তি রাষ্ট্রবিপ্লবে অক্ষম হইয়া বিদেশীয় বণিককে ডাকিয়া আনিয়াছিল। বঙ্গদেশ নিবাসী প্রজাগণের অন্তর্নিহিত বহ্নি কেবল যে এই বিপ্লব সূচনা করিয়াছিল, তাহা নহে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আংশিক বিপ্লবে বঙ্গদেশের রাজশক্তি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ১৭৭৩ সালে এক বিরাট পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মহান্ ধর্ম্ম-বিপ্লব উৎপন্ন করিলেন, এবং ক্রমশঃই সেই আদি বিপ্লবের শাখা-প্রশাখা-কখনও রাষ্ট্র-বিপ্লব, কখনও ধর্ম্ম-বিপ্লব, কখনও সমাজ-বিপ্লব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দী বঙ্গের অভ্যুত্থান-যুগ—ভাবী বঙ্গ-সভ্যতার উদ্বোধন, ভারতের ভবিষ্যৎ দিবালোকের নবীন উষা। এই যুগেই দয়াময় শান্তির অসি লইয়া, নূতন বিধান পাঠাইলেন, যাহা জগতে বিনা রক্তপাতে স্বর্গরাজ্য জয় করিবে।

এক্ষণে বর্ত্তমান রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বিষয় দেখা যাউক। ইংরাজ বিনাযুদ্ধে, বিনা আয়াসে, আমাদের সাহায্যে, আমাদের দেশ জয় করিলেন। ভারতবাসী ভাবিয়াছিল, যে ইংরাজ আমাদের নির্ব্বিরোধ রাজা, কেননা, ইংরাজ ন্যায়-বিচারক, ইংরাজ দস্যু তস্কর নিবারণ করিয়াছেন, ইংরাজ আমাদের ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করিতেছেন। এ জন্যই ভারতবাসী এক অজ্ঞাত-বণিকের মস্তকে রাজমুকুট বসাইল। সুতরাং, ইংরেজের রাজ্যে নিয়োগ প্রজাশক্তি কর্ত্তৃক, এবং রাজত্ব রক্ষাও প্রজাশক্তির বলে। কিন্তু, এক্ষণে ভারতবাসী বুঝিয়াছে, যে ইংরাজের ন্যায়-বিচার কেবল আংশিক, স্বজাতির প্রতি ইংরাজের আইন, শক্তিহীন। তাই যখন যখন ইংরাজ ও দেশীয়ে

সংঘর্ষ হয়, তখন ইংরাজ যে দেবতা, তাহা মনে হয় না। ইংরাজী সভ্যতার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে দেশবাসী মোহান্ধ হইয়া মনে করিত, ইংরাজ মানুষ নয় দেবতা, ইংরাজের শক্তি-সাধ্য, ইংরাজের চরিত্র বল, ইংরাজের বীরত্ব, সকলই অমানুষিক বলিয়া বোধ হইত। তাই অপ্রতিহত প্রভাবে ইংরাজ এদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। আজি যেন কতক পরিমাণে ঐ ঐন্দ্রজালিক প্রভাব দূর হইয়াছে। এক্ষণে দেশবাসী বুঝিয়াছে, যে ইংরাজ-রাজত্ব কেবল ইংরাজ বণিকের জন্য, ইংরাজের সুবিচার কেবল নিরেট স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা অবাধে বিলাতে প্রেরণের জন্য, সুশাসন কেবল অর্থোপার্জ্জন বা অর্থাপহরণের ব্যপদেশ মাত্র। ইংরেজ নিজের জন্য যত ব্যস্ত, আমাদের জন্য তত ব্যস্ত নহে। ইংরাজের বিচার, স্বার্থ-কলঙ্কিত—জাতিন্যায়ার মুখ চাওয়া বিচার। ক্রমে লোকের হাইকোর্টের প্রতিও অনাস্থা হইতেছে। এদিকে লোকেরা বুঝিয়াছে, যে ইংরাজ দেবতা নহে, তাহারাও আমাদের ন্যায় খায়, পরে ও মরে। একজন ইংরাজ না হয় দুইজন বাঙ্গালীর ন্যায় বলবান। এক্ষণে দেশবাসী বুঝিয়াছে, যে ইংরেজের বল ইংরেজের নহে। ইংরেজের বল শিখ ও গুর্খার। ইংরেজের বুদ্ধি রাজসিক ও তামসিক—সত্বগুণের ইংরাজে সম্পূর্ণ অভাব। তাই আজি যেন আমাদের চক্ষের একটা ঘোর অন্ধকার দূর হইয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালি অর্থ, স্বার্থ ও শোণিত বিনিময়ে বুঝিতে পারিয়াছে, যে ইংরাজের উদ্দেশ্য ভারত-লুণ্ঠন। ভারতের সমগ্র প্রজা কুলি হইবে, আর ইংলণ্ডের সমস্ত ইংরাজ প্রভু হইয়া তাহাদিগকে খাটাইবে, তাই ইংরেজ বঙ্গে শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, এবং, মাথা ভাঙ্গিয়া, স্বদেশী আন্দোলন রোধ করিতেছে। কিন্তু, বাঙ্গালি জাগ্রত হইয়াছে। এক্ষণে আর প্রতারণা ও ইন্দ্রজাল চলিবে না। দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালি মরিয়া হইয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালি বুঝিয়াছে, খাবার চাহিলে, ইংরাজ পাথর দিবে। তাই এক্ষণে নিজের অন্ন নিজে সংগ্রহে ব্যস্ত হইতেছে। ফুলারের গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে, হিন্দুকে চাকুরী দিব না, হিন্দু বলিতেছে তথাস্তু। আমরা স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করিব। ইংরেজ বলিতেছে,—মারিয়া তোমাদের মিছিল ভাঙ্গিব, বাঙ্গালি বলিতেছে,—এস, আমরা মস্তক পাতিয়া দিব। ফুলার বলিতেছে, তোদের সভা ভাঙ্গিব, বাঙ্গালি বলিতেছে, আমাদের মনের সভা তো ভাঙ্গিতে পারিবে না—তোমাদের কয়টা সেপাই কয়েকটা ম্যাক্‌সিম্ গান, আমরা সিন্ধুতীরের বালুকার ন্যায় অগণ্য। এতদিন ইংরেজ ভয় দেখাইত, বাঙ্গালি তোমাকে মারিব, বাঙ্গালি ভীত হইত। আজি বাঙ্গালি মরিতে শিখিয়াছে, বোধ হয় কাজেও দেখাইবে যে, এক দিন মরিতেই হইবে, তবে আর ভয় কি? আজি সমগ্র ভারতে না হউক, বঙ্গদেশে প্রজা-শক্তি জাগ্রত হইয়াছে। বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়াছে, দুই একজন নবাব আলি বা সলিম চাচা লইয়া মুসলমান-সমাজ নহে, মুসলমানও জাগ্রত; তবে, তাহাদের একটা ধোকা আছে, যে ইংরাজ তাহাকে চাকুরী দিবে। কিন্তু তাহাদের মনে করা উচিত যে ইংরাজ হিন্দুরও নহে, মুসলমানেরও নহে; ইংরাজ ইংরাজের। তাহার মূল-মন্ত্র শোষণ ও পেষণ; এই দুই মূল-মন্ত্র লইয়া একবার হিন্দুর ঘাড় ভাঙ্গিতেছে, একবার

মুসলমানের ঘাড় ভাঙ্গিতেছে। হিন্দুর মধ্যে দুই একজন কোট প্যাণ্ট পরিয়া চাকুরী পাইয়াছিল, তাহার মাহাত্ম্যে, তাহার সকল কুটুম্ব বন্ধু অকর্ম্মণ্য হইয়া, শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ, বৃথা অহঙ্কারী ও জীবন-সংগ্রামে অক্ষম হইয়াছেন। আবার, একজন মুসলমান ডেপুটী হইবে, আর ৫০ জন চাসা কৃষি-কর্ম্ম ভুলিয়া, ভিক্ষা-বৃত্তি ও পদলেহনে অভ্যস্ত হইবে। পাঁচ জন মুসলমান দারোগা হইবে, আর শত জন অকর্ম্মণ্য ও আত্মম্ভরী হইবে, এই উপায়ে হিন্দু জীবন-সংগ্রামে অক্ষম হইয়াছে, এই উপায়ে মুসলমান হীন-বীর্য্য হইবে। সুতরাং, ইংরাজ, সেই পণির-ভাগী বিচারকের ন্যায়, হিন্দু-মুসলমানের সর্ব্বস্ব শোষণ করিবে। মুসলমান একথা আজিও না বুঝিয়া থাকিলে, দশ দিন পরে বুঝিবে।

কিন্তু এই জগৎ নিয়ন্তা বিহীন নহে, স্বয়ং বিধাতা প্রজা-রক্ষক, তাই তাঁহার নাম প্রজা-পতি। জগতে নিরো, সিজারের পতন হইয়াছে, আলাউদ্দীনের বা আওরঙ্গীবের রাজত্ব আর নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ প্রজাহীন হয় নাই। বরং, ভগবান রাজগণকে পরীক্ষা করিতেছেন। হিন্দু যতদিন শক্তিসম্পন্ন ছিল, ততদিন তাহার হস্তে রাজ্য ছিল। যখন হিন্দু-অযোগ্য হইল, তখন মুসলমানের হস্তে তিনি রাজ্যভার প্রদান করিলেন। আবার যখন মুসলমান প্রজা-রক্ষণে অমনোযোগী হইয়া বিলাসে মন দিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়েরা এক দিন রাজ-শক্তি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ভগ-বান ইংরাজকে অধিক উপযুক্ত বলিয়া তাহার হস্তে রাজ-শক্তি দিলেন। তিনি ব্যক্তি-বিশেষের বন্ধু নহেন; তিনি প্রজা-সাধারণের রক্ষক। যে উপযুক্ত তাহাকেই রক্ষা করেন; আবার অযোগ্য হইলেই, তাহার হস্ত হইতে রাজ-পদ গ্রহণ করেন। তাই বলি ইংরেজ, তুমি পদ-গর্ব্বে মত্ত হইয়া মনে করিতেছ, এই মলিন-বর্ণ জাতি তোমারই দাস হইবার জন্য জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু চাহিয়া দেখ, সেই বিশ্ব-ভাগ্য বিধাতা তাঁহার অনন্তচক্র ঘুরাইতে-ছেন, কাহার হস্ত হইতে কাহাকে দিবেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, যেদিন তুমি তাঁহার পথ হইতে স্খলিত হইয়া স্বার্থের জন্য কার্য্য করিবে, সেইদিন উপযুক্ত অপর হস্তে রাজ-শক্তি প্রদান করিবেন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

# বৌদ্ধযুগের শিল্প-বাণিজ্য।

প্রাচীন-ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের ধারা-বাহিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ভারতের অধিকাংশ প্রাচীন-গ্রন্থই ধর্ম্মবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-মূলক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। ঐ সকল উপাখ্যান মুখ্যউদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে বসিয়া, কোনও কোনও গ্রন্থকার কোন কোনও শিল্প-বাণিজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন একটী বিষয়েরই আমূল ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে, দেশের লোকের নিকট শিল্প-বাণিজ্য যে অজ্ঞাত ছিল না, নানা প্রকার শিল্প ও শিল্পী যে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়া-ছিল, বাণিজ্য-ব্যাপারে যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল,—এ সকলের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কি ভাবে সে উন্নতি

সাধিত হইল, কখন কি ভাবে তাহার সূত্রপাত হয়, এ সকল খবর জানিতে হইলে হতাশ হইতে হয়। অধ্যাপক জিম্মার (Prof-Zimmer), পেকিন, ডাক্তার ফিক্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, ভারতীয় বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাব্য, জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থ-সমূহ আলোচনা-প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ঐ সকল এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, তৎকালীন অধিকাংশ ব্যক্তিই, ধনাগম-পন্থা বৃদ্ধি, সাংসারিক ব্যয়-সংস্থানের উপায় ইত্যাদি জীবনধারণের প্রাত্যহিক কার্য্য সমূহের উন্নতি-কল্পে বড় একটা আগ্রহ-প্রকাশ করিতেন না, তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মেই জীবনের অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত করিতেন।

প্রাচীন মগধরাজ্যের সুবিখ্যাত নরপতি অজাতশত্রু মহাত্মা বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন,—

"সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, আপনার প্রচারিত পন্থা অবলম্বন করিলে,এই পৃথিবীতে কি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই লোকগুলি (নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীগণ), সাধারণ-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে। এতদ্দ্বারা তাহারা এই পৃথিবীতেই স্ত্রী-পুত্র-সহ এক রকম সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। মহাত্মন! সর্ব্বস্ব-ত্যাগী-ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কোন্ ফললাভে সক্ষম, তাহা কি আমায় দেখাইয়া দিবেন?"

ভগবান্ বুদ্ধ ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সহিত আলোচ্য প্রবন্ধের কোন সংশ্রব নাই। অজাতশত্রু যে সকল ব্যবসায়ীর নামোল্লেখ করেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ দেখিবেন, যাহাদের সাহচর্য্য রাজার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, প্রশ্নে অজাতশত্রু কেবল সেই সকল ব্যবসায়ীরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। যথা,—

১। হাতীর মাহুত; ২। অশ্বারোহী বা সহিস; ৩। শকট-চালক; ৪। তীরন্দাজ; (৫ হইতে ১৩)। নয় শ্রেণীর সৈন্য; ১৪। ক্রীতদাস; ১৫। পাচক; ১৬। নাপিত; ১৭। খানসামা (bath attendants); ১৮। মেঠাই-ওয়ালা; ১৯। মালাকার; ২০। ধোপা; ২১। ঝুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুতকারক; ২২। কুম্ভকার; ২৩। কেরাণী; ২৪। হিসাব-নবিস এবং ২৫। তন্তুবায়।

রাজ-সরকারে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হইত, সুতরাং, অজাতশত্রু রাজানুরূপ প্রশ্নে, তাহারই উল্লেখ করেন। নানারূপ প্রমাণ পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়, রাজার এই তালিকা কোন অংশে অত্যুক্তি নহে। ঐ সময়ের লিখিত গ্রন্থাদিতে এতদতিরিক্ত বহুতর বিভিন্ন শিল্পীর উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থে আঠার প্রকার শিল্পীর উল্লেখ আছে কিন্তু তাহাতে সবগুলির নাম নাই। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীরাই জাতকের লিখিত অষ্টাদশ শিল্পী। *

(১) কাঠ-ব্যবসায়ী। ইহারা বর্ত্তমানকালের সাধারণ-ছুত্রধরের ন্যায় ছিল না। ইহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ, জাহাজ, নানাপ্রকারের যান-বাহন চাকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিত।

(২) কর্ম্মকার। লৌহ-নির্ম্মিত সমস্ত

* Buddhist India, P. 90.

দ্রব্য, সকল প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, লাঙ্গলের ফাল, কুঠার, ছুরি, কাঁচি, খুর ইত্যাদি প্রস্তুত করিত। ছুঁচ প্রভৃতি নানাবিধ সূক্ষ্ম ও হাল্‌কা দ্রব্য এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের নানা প্রকার সুদৃশ্য ও সৌখীন দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিতেও ইহারা সুদক্ষ ছিল।

(৩) প্রস্তর-কারিকর। ইহারা পাথরের নানাপ্রকার কাজ করিত। গৃহের সুদীর্ঘ সিঁড়ি বা জলাশয়ে উঠা নামার ধাপ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহের ভিত্তিমূল প্রস্তুত করিত, তাহার উপর পরে গৃহ-নির্ম্মিত হইত। পাথর খোদাই ও বাঁকান এবং নানারূপ সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য করিতে ইহারা নিপুণ ছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর কার্য্যের পরিচয় আজিও শাকাস্তূপে দৃষ্টি-গোচর হয়। তথায় পাথরের উপরের crystal bowl এবং পাথরের coffer অতীতের সাক্ষীরূপে পড়িয়া আছে।

(৪) তন্তুবায়। ইহারা কেবল সাধারণ আটপৌরে বস্ত্রাদি বয়ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত না। বিদেশে রপ্তানীর নিমিত্ত সুন্দর ও মূল্যবান মস্‌লিন ও রেশমী বস্ত্র, কম্বল, গালিচা, ধুসা, তসর, বিছানার চাদর প্রভৃতি বয়ন করিত।

(৫) চর্ম্মকার। ইহারা নানা শ্রেণীর চর্ম্মপাদুকা এবং শীতকালে ব্যবহারের নিমিত্ত একরকম কাষ্ঠপাদুকা নির্ম্মাণ করিত। এতদ্ব্যতীত রাজ-রাজরা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত নানা প্রকার কারু-কার্য্য সমন্বিত মূল্যবান পাদুকাও প্রস্তুত করিত।

(৬) কুম্ভকার। সাধারণ ব্যবহারোপযোগী মাটীর নানা প্রকার ঘটি, বাটি, থালা, রেকাব প্রস্তুত করিত। সময় সময় ইহারা এই সকল জিনিষ ফেরি করিয়া বিক্রয় করিত।

(৭) গজদন্ত-কারিকর। সচরাচর ব্যবহারের নিমিত্ত ইহারা গজদন্তের নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিত। ভারতবর্ষ যাহার জন্য আজিও প্রসিদ্ধ, সেই বহু মূল্যবান দ্বিরদ-রদ প্রক্ষিপ্ত অলঙ্কার ও নানা শ্রেণীর খোদাই কাজ ইহাদের সুদক্ষ হস্ত হইতে প্রসূত হইত।

(৮) রংওয়ালা। তন্তুবায়গণের বোনা-বস্ত্রাদি ইহারা নানাবর্ণে রঞ্জিত করিত।

(৯) জহুরী। ইহাদের হস্ত-প্রসূত নানা-প্রকার অলঙ্কার অদ্যাপি জগতের নানা স্থানে লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। পাশ্চাত্যগণ এই সকল অলঙ্কারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

(১০) মৎস্য-ব্যবসায়ী। ইহারা নদীতে মৎস্য ধরিত। সমুদ্রে মৎস্যধরার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(১১) কসাই। ইহাদের মাংসের দোকান ছিল।

(১২) শিকারী। ইহারা বন জঙ্গলে নানা প্রকার জীবজন্তু শিকার এবং ফলমূলাদি সংগ্রহ করিত। ইহারা মৃগ-শিশু ধৃত করিয়া সহরে দেখাইয়া বেড়াইত এবং সময় সময় বিক্রয় করিত। ইহা প্রাচীন-কালের এক-প্রয়োজনীয় ব্যবসা ছিল। বহুযোজন বিস্তৃত অরণ্য, সকলের প্রবেশের পক্ষেই উদ্‌ঘাটিত। কসাইখানার জন্য পশু ধৃত করিয়া পালন করিবার রীতি-প্রচলিত ছিল না। বনের উৎপন্ন—নানাপ্রকার লোম, পশম, অস্থি, গজদন্ত ইত্যাদি দ্রব্যের অত্যন্ত আদর ছিল। প্রাচীন-কালে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট থাকায়, উপরোক্ত ব্যবসায়ী শিকারী ভিন্ন অপর কোন জাতি উক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিলে লোক-সমাজে নিন্দনীয়

হইত বলিয়া, যাহারা পুরুষানুক্রমে শিকার ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাহাদিগকে সকলেই উৎসাহ প্রদান করিত। ইহাতে পাঠকগণ মনে করি বেন না যে, তাহাদের মধ্যেই মৃগয়ার সুখামোদ সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য, দেশীয় নরপতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সময় সময় মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহারা ব্যবসা উপলক্ষ করিয়া কখনও প্রাণীবধে লিপ্ত হইতেন না।

(১৩) পাচক ও মিঠাইওয়ালা। ইহাদের সংখ্যা বিপুল ছিল। সম্ভবতঃ ইহাদের সংঙ্ঘ (guild) ছিল।

(১৪) ক্ষৌরকার ও ভৃত্য-শ্রেণী (shampoorers); ইহাদেরও সংঙ্ঘ ছিল; তথায় বহুতর ব্যক্তি একত্রিত হইত। ইহারা গন্ধদ্রব্যেরও ব্যবসা করিত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের শিরোভূষণ প্রকাণ্ড 'তারবান' সাজাইয়া বাঁধিয়া দিত। আজকাল গঙ্গার ঘাটে একটী পয়সার বিনিময়ে উৎকল ও পশ্চিমদেশীয় ভৃত্যবর্গ তৈলমর্দ্দন ও স্নান করাইয়া দেয়, পূর্ব্বে এই শ্রেণীস্থ অনেকে তদ্রূপ কার্য্য করিত।

(১৫) মালাকর; ইহারা মাল্যরচনা ও পুষ্প-বিক্রয় করিত।

(১৬) নাবিক। ইহারা বড় বড় নদী সমুদ্রে নৌকা এবং জাহাজ চালনা করিত। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'নভ' নামক সমুদ্রপোত ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত সমুদ্র অতিক্রম করে—তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। শীত ঋতুতে সমুদ্র গমন একরূপ স্থগিত থাকিত। ঐ সকল গ্রন্থের কিছু পরবর্ত্তী, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে, সমুদ্র-যাত্রার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর গ্রন্থাদিতে বেণারসের নিম্নবাহিনী ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারত-সমুদ্রের পর-পারে এবং ব্রহ্মদেশের অপরতীরে গমন ইত্যাদি জলভ্রমণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময় কেপ্ কমরিণ ঘুরিয়া ভরুকচ্ছ(বর্ত্তমান ব্রোচ) গমনাগমন পন্থাও ভারতীয় নাবিক-বৃন্দের নিকট অপরিচিত ছিল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়,ভারতীয় নাবিকগণ এক সময় বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে।

(১৭) ঝুড়ি, ডালি, মোড়া প্রভৃতি বেতের ও বাঁশের কর্ম্মীগণ।

(১৮) চিত্রকর। ইহারা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের গৃহ চিত্রিত করিত; Frescoe (চিত্র বিশেষ) চিত্রণেও ইহারা সুদক্ষ ছিল। ফ্রেস্‌কো-চিত্রের উল্লেখ হইতে মগধ ও কোশল রাজ্যের প্রমোদ-কানন সমূহের কথা মনে পড়ে। এই সকল উদ্যানে ঐরূপ বহু চিত্র থাকিত। এই ফ্রেস্‌কো, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর অজন্টা গুহের এবং পঞ্চম শতাব্দীর লঙ্কার সিগ্‌রীগিরির উপরের ফ্রেস্‌কোর অনুরূপ নহে; এতদপেক্ষাও উহা প্রাচীন ধরণের।

পূর্ব্বোক্ত শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণ ব্যতীত বহুতর ব্যক্তি কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ইয়ুরোপের মাধ্যমিক সঙ্ঘের (mediaeval guilds অনুরূপ না হইলেও, উহাদের অধিকাংশ শ্রেণীরই সংঙ্ঘ ছিল। প্রয়োজনের সময়, দেশাধিপতি এই সংঙ্ঘ হইতে লোক লইতেন। বিভিন্ন সঙ্ঘের সভাপতিগণ অতি সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য এবং রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। নিজ নিজ পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ সালিশি-দ্বারা মীমাংসা করিবার ক্ষমতা সঙ্ঘের প্রতি ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সংঙ্ঘের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, 'মহাশ্রেষ্ঠি' (Lord High Treasurer) কর্ত্তৃক তাহার বিচার হইত।

কৃষক ও হস্তশিল্পী ব্যতীত, তৎকালে [illegible]

সংখ্যক বণিক্ ও মহাজন ব্যবসায়ী ছিল; তাহারা নৌকাযোগে বহু দূরদেশে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত। দূরবর্ত্তী নদীশূন্য স্থানে, শকটে মাল বোঝাই করতঃ, অনেকে একত্রে দলবদ্ধভাবে গমনাগমনের প্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ এক এক দলে বহু সংখ্যক দুই চক্র বিশিষ্ট শকট থাকিত; দুইটি বলিষ্ঠ মহিষ কর্ত্তৃক তাহার এক একখানি বাহিত হইত। এই গাড়ীগুলি প্রাচীনকালের একটী বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কার। এই শকটশ্রেণী গমনাগমনের কোনও বিশিষ্ট পথ, বা নানা নদীর উপর কোন প্রকার সেতু বিদ্যমান ছিল না। গ্রাম্য কৃষকগণ, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমনের যে পথ প্রস্তুত করিত, সেই পথেই এবং সময় সময় বনজঙ্গলের মধ্য দিয়াও, প্রাগুক্ত শকটশ্রেণী যাতায়াত করিত। ঘণ্টায় দুই মাইলের বেশী উহারা পথ অতিক্রম করিতে পারিত না। পথিমধ্যে নদী পড়িলে এবং তাহার জল গভীর হইলে, খেয়ার নৌকায় গাড়ী পার করা হইত। যে সকল জলাশয়ের জল অল্প হইত, তাহা উত্তীর্ণ হইতে কিছুরই সাহায্য প্রয়োজন হইত না। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার কালে, এই সকল শকটের কর (Octroi duty) আদায় হইত। এই প্রকার স্থলবাণিজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খরচ—পুলিশ প্রহরীর বেতন। দস্যু তস্করের হস্ত হইতে পণ্য দ্রব্য রক্ষার্থে, বহুতর সশস্ত্র শান্তিরক্ষক প্রহরী, শকট শ্রেণীর পশ্চাতে নিযুক্ত থাকিত। তজ্জন্য শকটের পণ্যের মূল্যাধিক্য হইত; মূল্যের হার সময় সময় এতই বর্দ্ধিত হইত যে, কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলিই বিক্রয় হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলির অত্যধিক মূল্য ধার্য্য হওয়া হেতু, প্রায় বিক্রয় হইত না।

বর্ত্তমান কালের ন্যায়, অসংখ্য যাত্রীর গতায়াত সুবিধা এবং খাদ্য দ্রব্য ও জ্বালানী দ্রব্যের সহজ আমদানী রপ্তানী তৎকালে ছিল না। তৎকালীন প্রধান পণ্য—রেশমী ও পশমী দ্রব্য এবং মস্‌লিন প্রভৃতি সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি; ছুরি, কাঁচি, ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র; রেশমী ঝালর, কম্বল; আতর গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য; তৈজস দ্রব্য সমূহ; গজদন্ত এবং তৎনির্ম্মিত দ্রব্য সামগ্রী; স্বর্ণ (এবং কদাচিৎ রৌপ্যের) অলঙ্কার এবং মণি মুক্তা জহরৎ। ইহাই সেকালের ব্যবসায়ের প্রধান পণ্যদ্রব্য।

বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বকালের সেই ব্যবসায়ের বিনিময় প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসঙ্গে ডেভিড্ মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"The older system of traffic by barter had entirely passed away never to return. The later system of a currency of standard and token coins issued and regulated by Government authority had not yet arisen. Transactions were carried on, values estimated, and bargain struck in terms of the *Kahapana*, a square copper coin weighing about 146 grains, and guaranteed as to weight and fineness by punch-marks made by private individuals. Whether these punch-marks are the tokens of merchants, or of guilds, or simply of the bullion dealer, is not certain." *

তৎকালে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল না; তাম্রের অর্দ্ধ এবং সিকি 'কহাপনা' ব্যতীত অপর কোনরূপ মুদ্রা ছিল না। পরবর্ত্তীকালে, স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, তাহার কোনও প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ছাপ্ (punch) দ্বারা চিহ্নিত কতিপয় পুরু স্বর্ণের টুক্‌রা শাক্যস্তূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অবয়ব দেখিয়া কিন্তু, মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয়

* Buddist India, p. 100.

না। আলেকজেণ্ডার ভারত-শাসন সময়ে, ভারতীয় মুদ্রার অনুকরণে এক প্রকার তামার অর্দ্ধ-কহাপনার প্রচলন করেন। এই কহাপনা তৎকালীন গ্রীক্-মুদ্রার ন্যায় গোলাকৃতি ছিল না।

ইহার পরবর্ত্তী সময়ে, দেশের শাসনকর্ত্তা-দ্বারা বাজার-মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালে একজন রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন, যিনি কেবল মাত্র দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের মূল্য অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান-কালের তাম্রের মূল্য অনুসারে, প্রাচীন কহাপনার মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, উহার মূল্য প্রায় এক আনা হয়। কিন্তু, তৎকালে উহার যে মূল্য ছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় বার আনার তুল্য। বড় বড় ব্যবসায়ীগণ বিদেশে যাইয়া ধারেও দ্রব্য বিক্রয় করিত, কিন্তু তাহার প্রথাটা কিছু বিচিত্র। যিনি ধারে দ্রব্য কিনিতেন, তিনি একখানি কাগজে ক্রীত দ্রব্যের নাম ও তাহার মূল্য লিখিয়া, মোট মূল্যের বাবদে একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্র ( বর্ত্তমান-কালের কারেন্সি-নোটের অনুরূপ ) মহাজনের বরাবর লিখিয়া দিতেন। তাহাতে সুদের উল্লেখ থাকিত না। কিন্তু অতি প্রাচীন-কালেও সুদ-গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ্যে কোনরূপ সুদের চুক্তি না থাকিলেও, মহাজনেরা গোপনে সুদ আদায় করিতেন অথবা দ্রব্যের মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখাইয়া লইতেন। এই সময়ের কিছু পরবর্ত্তীকালের পুস্তকাদিতে বার্ষিক শতকরা আঠার টাকা সুদের উল্লেখ আছে।

একালের ন্যায় তখন ব্যাঙ্ক (bank) ছিল না। লোকে স্ব-ভবনেই মুদ্রাদি রাখিতেন। কেহ বা জালায় করিয়া, মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত রাখিতেন, কেহ বা বন্ধুবর্গের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার-পত্র লিখাইয়া লইতেন।

পূর্ব্বে দ্রব্যের মূল্যাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে সেকালের গরীব দুঃখী মধ্যবিত্ত এবং ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি সকলেরই খরচের পরিমাণটা এক রকম অনুমান করা যায়। বর্ত্তমানকালে বড় বড় সমৃদ্ধিশালী-প্রদেশে যেমন—নাই, নাই, কি খাই, কি খাই ?—ভাব, তৎকালে সেরূপ ছিল না। কেহ বেতন গ্রহণে কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিলে বা চাকুরী করিলে, তাহাকে হতভাগ্য বলা হইত। আর আজকাল চাকুরী না করিলে সম্ভ্রম থাকে না, চাকুরী না করিলে জীবিকা নির্ব্বাহের অর্থোপার্জ্জন হয় না। কিন্তু সেকেলে অতি অল্প লোকেই গোলামগিরি করিত, সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত। অথচ তখনও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ আবাদোপযোগী ভূমি পতিত ছিল।

পক্ষান্তরে, যে পরিমাণ অর্থ-বৈভব থাকিলে তৎকালে লোকে ধনাঢ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন, সেই পরিমাণ ধন বা তদ্রূপ ধনাঢ্য ব্যক্তির সংখ্যা অধিক ছিল না। যে সময়ের কথা আমি লিখিতেছি, সে সময়ে প্রায় কুড়িজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন ; ইঁহাদের উপার্জ্জন—কেবল ভূমিকর এবং অন্যান্য কতকগুলি বাটা ও দস্তরী। উচ্চবংশসম্ভূত কতিপয় ব্যক্তি এবং কয়েকজন পুরোহিত অর্থশালী ছিলেন। ইঁহাদের দুই একখানি করিয়া গ্রাম জায়গীর ছিল। তক্ষশীলা, শ্রাবস্তি, বারাণসী, রাজগৃহ, বৈশালী, কৌশম্ব

এবং সমুদ্রবন্দর সমূহে গুটী বারো ক্রোড়পতি বণিক এবং দুই একটী সহরে বা গণ্ডগ্রামে কতিপয় মধ্যবস্থার ব্যবসায়ী ও গৃহস্থ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অপর কোন ভূম্যধিকারী ছিল না। প্রজাপুঞ্জের অধিকাংশই কৃষক ও শিল্পী-শ্রেণীর, ইহাদের অবস্থা অতীব স্বচ্ছল ছিল। ইহাদের অনেকেরই আবাদোপযোগী নিজ নিজ জমি ছিল। ইহারা স্ব-নির্ব্বাচিত দলপতির দ্বারা শাসিত ও চালিত হইত।

খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের জনসাধারণের এই আর্থিক অবস্থার (cconomic condition) কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে তৎকালের বাণিজ্য-পথ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌদ্ধ-প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থাদিতে ইহার কিছুমাত্র নির্দ্দেশ নাই। পুরাতন পালিগ্রন্থে, পর্য্যটনশীল প্রচারকগণের ভ্রমণকাহিনী অবগত হওয়া যায়। দীর্ঘ পর্য্যটন-কালে এই সকল প্রচারকগণ বণিকদিগের অনুসৃত পন্থাতেই গমনাগমন করিতেন। সুতরাং তাহাদের ভ্রমণকাহিনী হইতে বণিকগণের গমনাগমনের জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই জ্ঞাত হওয়া যায়।

(১) উত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম; শ্রাবস্তি হইতে পতিশ্বনা বা পইথান পর্য্যন্ত গমনাগমন পন্থা। দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম মাহেশ্বতি, তৎপর ক্রমান্বয়ে উজ্জয়িনী, গোনদ্ধা বেদিশা, কৌশম্বী এবং সাকেত—এই দেশগুলি প্রধান বিশ্রাম-স্থান (stopping place) ছিল।

(২) উত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব; শ্রাবস্তি হইতে রাজগৃহ পর্য্যন্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুই প্রাচীন নগরে গমনাগমনের কোনও সোজা পথ ছিল না। গিরিমালার প্রান্ত দিয়া বরাবর অগ্রসর হইয়া, বৈশালীর দক্ষিণে একটী গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইত, পরে তথা হইতে দক্ষিণে ফিরিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যাইতে হইত। পর্ব্বতমালার সানুদেশ দিয়া পথ অবলম্বন করায়, বাঁকা চুরা পথে অনেকবার হাঁটিয়া নদী পার হইতে হইত। সাধারণ দৃষ্টিতে এইরূপ বক্রপথের কোনরূপ সার্থকতা পরিলক্ষিত না হইলেও রাজনৈতিক হিসাবে এই ঘোরা ফেরা পথের মূল্য থাকিতে পারে। এই পথের অবস্থান বা বিশ্রাম স্থান,—(শ্রাবস্তি হইতে) শ্বেতাভ, কপিল বস্তু, কুশিনারা, পভা, হাথিগমা, ভাণ্ডগমা, বিশালী, পাটলীপুত্র এবং নলন্দা। এই রাস্তাটি বোধ হয় গয়া হইয়া গিয়াছিল, যেখানে তীরাভিমুখ হইতে অপর একটী রাস্তা আসিয়া মিলিত হয়। শেষোক্ত পথটি তাম্রলিপ্তি হইতে বেনারস পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম; এই দিকের প্রধান ও সহজ গমনাগমনের উপায় জলপথে। নদীর ঘাটে অসংখ্য নৌকা, সকল সময়েই আরোহীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত। নদীর উজানদিকে গঙ্গা বহিয়া, পশ্চিমে সাহাজাতি নামক স্থান পর্য্যন্ত এবং যমুনা বহিয়া কৌশম্বী পর্য্যন্ত পশ্চিমে যাওয়া যাইত। ভাটি দিকে গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত এবং তৎপর তথা হইতে ব্রহ্মদেশের উপকূল (১) বা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বণিকবৃন্দ উহার অপর পারে ধাবিত হইত। নদীর ভাটি বা নিম্নদিকে গমনাগমন প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বণিকগণের মগধ অর্থাৎ চাম্বা-পয়েণ্ট পর্য্যন্ত গতায়তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তথা হইতে ঊর্দ্ধদিকে কৌশম্বী; এখানে দক্ষিণ দিক হইতে এক বাণিজ্য পথ আসিয়া মিলিত হইয়াছিল এবং এইস্থান হইতেই দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর

(১) That is Thaton, then called Suvarna-bhumi, the Gold Coast.—See Dr. Mabel Bode in the *Sasana Vamsa*, p. 12.

পশ্চিম দেশাভিমুখে শকটশ্রেণী ধাবিত হইত।

এতদ্ব্যতীত বণিকগণ বিদেহ হইতে, গান্ধার, মগধ হইতে, সভীর ভারুকচ্ছা হইতে, ব্রহ্মোপকূল, বেনারস হইতে গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত এবং চাম্বা হইতে ব্রহ্মপ্রদেশে যাতায়াত করিত। (২) রাজপুতানার পশ্চিমের মরুভূমি অতিক্রম করিবার সময়, বণিক-শকটশ্রেণী কেবল রজনীতেই চলিতে থাকিত, এবং জাহাজ চালাইবার নিমিত্ত যেমন আড়কাটি বা প্রদর্শক থাকে, বনিকদিগের এই শকটশ্রেণী মরুভূমি উত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত, তেমন স্থল-আড়কাটি (Land-pilot) নিযুক্ত হইত। আড়কাটিরা রজনীতে নক্ষত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মরুদেশ অতিক্রম করিত। প্রাচীনকালের বাণিজ্য ভ্রমণের এই উজ্জল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মনে হয়, তাহারা যেন কত কি আবিষ্কার করিত। বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্য দিয়াও যে বাণিজ্য পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। মরুভূমির এই আড়কাটিই, অন্য সময়ে, সমুদ্রে জাহাজ চালনা করিত বলিয়া আমাদের ধারণা।

প্রাচীন জাতক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভারতীয় পণ্য-পূর্ণ অর্ণবপোত দেশীয় ব্যক্তিবৃন্দ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্রপথে ব্যাবিলন প্রদেশেও উপস্থিত হইত। কিন্তু তৎকালের নির্দ্দিষ্ট বন্দরের নাম জানিতে পারা যায় না। (৩) উক্ত গ্রন্থে সেই Sirens গণের বিশ্ববিশ্রুত একটী গল্প স্থান পাইয়াছে। তাহারা তাম্রপর্ণী দ্বীপে সুরম্য নয়নাভিরাম প্রদেশে (সম্ভবতঃ, সিলোন) বাস করিত। ইহার প্রায় দুই শতাব্দী পরবর্ত্তী এক খানি (৪) গ্রন্থে ভারতীয় বণিকের চীনদেশে গমনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ Buddhist India নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

(২) "Has the foreign country called Seruma (Jatak 3. 189) any connection with Sumer or the land of Akkaḍ?"—Buddhist. India.

(৩) Milinda—p. 127, 327, 359.

(৪) জাতক, তৃতীয় অধ্যায়।

# ভারতে মুসলমানের প্রথম উপনিবেশ।*

দক্ষিণাত্যের দক্ষিণে, আরব সাগরের তীরে, কর্ণাট এবং বিজয় নগরের সন্নিকটে, মালাবার প্রদেশ অবস্থিত। তৎকালে কালীকাট এবং কোচিন, মালাবারের দুই প্রধান শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু আয়তনে ইহারা মালাবারের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র ছিল। এই মালাবার প্রদেশেই সর্ব্ব প্রথমে আরবীয় মুসলমানগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। মালাবার প্রদেশ সাগরতটে অবস্থিত বলিয়া, বিদেশীয় বণিকেরা জলপথে সহজে বাণিজ্য করিতে পারিতেন। খ্রীষ্টান এবং য়িহুদীগণ বহুদিন হইতেই তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে বাস করিতেছিল। ধর্ম্মপ্রচার এবং পণ্য দ্রব্যের

* এই প্রবন্ধ প্রণয়নে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি—

(১) মুল তওয়ারিখে ফেরেস্তা (পার্শী)
(২) তারিখে হিন্দুস্থান-কালান (পার্শী)।
(৩) History of India.
(৪) Portuguese Discoveries Dependencies.
(৫) Roteiro—The Journal of the Voyage of Vasco-da-Gama by the sea to India.

আমদানী রপ্তানীই তাহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। তথাকার সামন্ত রাজগণ স্বদেশে বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারে বিঘ্ন ঘটাইতেন না। মালাবারে তখন ধর্ম্মের বন্ধন অনেকাংশে শিথিল ছিল। তখন নানা ধর্ম্ম নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশে ব্যস্ত ছিল। উত্তর ভারতের ন্যায় মালাবারে তখনও হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয় নাই; তখন নেয়ার জাতি অর্দ্ধহিন্দু—নিকটস্থ পার্ব্বত্য জাতি কোন ধর্ম্মই মানিত না। সামন্তগণও তখন অর্দ্ধহিন্দু বলিয়া পরিচিত। কতিপয় ব্রাহ্মণ মিলিয়া তখন মালাবারে একটী সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় সংগঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্প্রদায়ও তখন ক্ষুদ্র ও হীনশক্তি ছিল। ব্রাহ্মণগণ তখন সামন্ত রাজগণের মন্ত্রীত্ব করিতেন।

২০০ দুই শত হিজরীতে, একদল মুসলমান তীর্থভ্রমণ মানসে পোতারোহণে সিংহল দ্বীপে যাইতেছিলেন। (১) বায়ুর প্রতিকূলতা হেতু তাহারা স্বীয় ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছিতে না পারিয়া, মালাবারে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মালাবারের অধীনস্থ কদঙ্কলার নগরে অবতরণ করেন।

ক্লান্ত, তরঙ্গ-বিধ্বস্ত, ঝটিকাতাড়িত, আরবগণ দেখিলেন, তাঁহাদিগের চক্ষের সম্মুখে এক নূতন রাজ্যের মায়াদ্বার সহসা যেন মন্ত্রবলে উন্মোচিত হইয়াছে; তাঁহাদের পক্ষে এদেশের সবই নূতন, সবই আশ্চর্য্য। তাঁহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, মালাবারের অধিবাসীগণ কৃষ্ণবর্ণ; তাহাদিগের কেশ ও শ্মশ্রু দীর্ঘ, কেহ কেহ বা মুণ্ডিত মস্তক, কেহ বা জটাধারী। কাহারও কাহারও মস্তকে এক গুচ্ছ কৃষ্ণ কেশ বাতাসে কম্পিত হইতেছে। "নেটিভ"দিগের কর্ণে বহু ছিদ্র, সেই সকল ছিদ্রে স্বর্ণালঙ্কার দুলিতেছে। তাহাদিগের কটি হইতে ঊর্দ্ধদেশ সম্পূর্ণ অনাবৃত; কিন্তু যেখানে কটিদেশ আবৃত, তাহা অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। ধনবানদিগের এইরূপ পরিচ্ছদ; সাধারণলোকে যার যেমন ইচ্ছা সে তেমন বেশ পরিধান করে। রমণীগণ প্রায়ই কুৎসিতা, খর্ব্বাকৃতি এবং ক্ষীণাঙ্গী। তাহাদিগের কণ্ঠে ভারি ভারি স্বর্ণাভরণ, বাহুমূলে বাউটী, পদাঙ্গুলে মূল্যবান প্রস্তর-সন্নিবিষ্ট অঙ্গুরীয় শোভা পাইতেছে। দেখিতে কুরূপা হউক, কিন্তু রমণীগণ কোমলস্বভাবা, ভদ্রা, সর্ব্ব বিষয়ে অজ্ঞ এবং অতিশয় লোভপরবশ।

মালাবারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল যে, বিদেশীয় একদল অদ্ভুত জীব আসিয়াছে,—উহারা তাহাদিগের মত হাসে, তাহাদিগের মত কথা কহে, তাহাদিগের মত চলিয়া বেড়ায়, কিন্তু উহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ অভিনব, ভাষা অভিনব ও নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য—উহারা আরব জাতি। সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী আসিয়া আরবগণকে পরম সমাদরে রাজসভায় উপস্থিত করিলেন।

রামরাজার হত্যাকাণ্ডের পর হইতে মালাবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করে। তৎকালে মালাবারে "সামেরী" অর্থাৎ চেরামন পেরুমল (Cheramon Perumal) নামক একজন প্রবল প্রতাপান্বিত স্বাধীন নরপতি রাজত্ব করিতেন। ইনি তৎকালীন সুধীমণ্ডলীর মধ্যে একজন বিচক্ষণ জ্ঞানী ও সদাচার-সম্পন্ন নরপতি ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধান

(১) সিংহলদ্বীপ বা সরন্দীপে মানবের আদি পিতা হজরত আদম স্বর্গচ্যুত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন; অতএব, সেই স্থানটী মুসলমান, খ্রীষ্টান য়ীহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীগণের তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। (বাইবেল ও কোরান দেখ)।

স্পৃহা তাঁহার নিতান্ত প্রবল ছিল। আরব্য এবং পারস্য ভাষায়ও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আরবীয় তীর্থযাত্রীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে অতি সম্ভ্রমে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আরবগণ রাজসন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আরবীয় মুসলমানগণের সহবাসে এবং তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ কথোপকথনে রাজার হঠাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল; এমন কি, তিনি স্বীয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, রাজ্যের স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভয়ে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ-বার্ত্তা সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন না। অতঃপর, আরবীয় তীর্থ যাত্রীগণ উপ্‌সিত তীর্থ স্থানে, অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে, গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল; রাজা সামেরী (১) স্বীয় ভদ্রতার নিদর্শন স্বরূপ নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করতঃ তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন এবং প্রত্যাগমন কালে পুনরায় কদঙ্কলোর নগরে পদার্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন।

ধর্ম্মগত-প্রাণ তীর্থযাত্রীগণ যথাসময়ে সিংহলদ্বীপে উপনীত হইয়া, আদি পিতা হজরত আদমের "পদাঙ্কভূমি" দর্শনে চরিতার্থ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে, কদঙ্কলোর নগরে উপস্থিত হইলে,মহারাজা সামেরী তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও অভ্যর্থনা করিলেন এবং পবিত্র ভূমি মক্কা গমনের বাসনা তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। প্রকাশ্যভাবে মুসলমান তীর্থস্থানে গমন করা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন বিবেচনা করিয়া, এক দিবস রাজ্যের প্রধান ও অধীনস্থ সামন্ত রাজগণ এবং অমাত্যবর্গ, আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন—"মহোদয়গণ! আমার অন্তঃকরণ ঈশ্বর আরাধনা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। অতএব আমি দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি যে, সংসারের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিব। আমার অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে নানারূপ বিভ্রাট ঘটিতে পারে,সুতরাং রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় একখানি ব্যবস্থা-পত্র রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি আপনারা আমার অভাবেও আমার ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।" অনেক তর্ক বিতর্কের পর,তাঁহারা ব্যবস্থা-পত্রের নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন বলিয়া সকলেই অঙ্গীকার করিলেন। রাজা সামেরী স্বীয় উত্তরাধিকারীগণকে রাজ্য বণ্টন ও স্বহস্তে মালাবারী ভাষায় নিম্নোক্ত মর্ম্মানুযায়ী একখানি ব্যবস্থা-পত্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন। ব্যবস্থাপত্র (১)—আমি যাহাকে রাজ্যের যে অংশ ও যে যে বস্তু প্রদান করিলাম,তাঁহারা তাহা বংশানুক্রমে ভোগাধিকার করিতে সমর্থ হইবে। কেহই নিজের অংশ ব্যতীত অন্যের অংশ ভোগ করিতে পারিবে না। যদি অংশীগণের মধ্যে অনৈক্য ঘটে, তথাপি কেহ কাহারও রাজ্য ধ্বংস অথবা কলহ বিরোধ ও পরস্পর যুদ্ধ করিতে পারিবে না। যাহাতে রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ-বিপ্লব না ঘটে, তজ্জন্য সকলকেই সাবধান থাকিতে হইবে। যদি কখন

(১) সামেরী ও চেরামন পেরুমল অভিন্ন ব্যক্তি। চেরামন পেরুমলকেই পারস্য ঐতিহাসিকগণ সামেরী বলিয়া লিখিয়াছেন। (লেখক)

(১) ফেরেস্তা বলেন যে, ১০৫০ হিজরী পর্য্যন্ত সামেরীর এই ব্যবস্থা-পত্র বর্ত্তমান ছিল এবং তিনি নিজে ঐ ব্যবস্থা-পত্র দর্শন করিয়াছেন। (লেখক)

কোন শত্রু রাজ্য আক্রমণ করে, তবে সমস্ত শক্তি সমবেত হইয়া শত্রু-দমনের চেষ্টা করিবে এবং শত্রুপক্ষ কর্তৃক যদি কোন শাসনকর্ত্তা নিহত হন, তবে শত্রুপক্ষ এবং শত্রুপক্ষের রাজ্য যে পর্য্যন্ত ধ্বংসীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত কেহই প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিবে না। কেহ এই ব্যবস্থা-পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য না করিলে, সমস্ত শক্তি একত্রিত হইয়া, তাঁহাকে ব্যবস্থা-পত্রের নিয়ম পালন করিবার জন্য বাধ্য করিতে হইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইরূপ নানা বিষয়ে বহুবিধ উপদেশদান করিয়া রাজা সামেরী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন,—"মহোদয়গণ! যাহা কিছু বলিলাম তাহা সকলেই অবশ্য পালন করিবেন। আমি এখন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঈশ্বরারাধনায় মনো-নিবেশার্থ গমন করিতেছি, এক সপ্তাহের মধ্যে কেহই আমার দর্শন পাইবেন না"। এই বলিয়া একটী প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে যোগসাধন করিবেন বলিয়া গমন করতঃ, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। গভীর নিশিথ সময়ে, ঐ আরবীয় তীর্থ যাত্রীগণের নিকট, গুপ্তভাবে উপস্থিত হইয়া, পোতারোহণপূর্ব্বক মক্কা ও মদিনা শরিফের দিকে রওয়ানা হইলেন। (১)

কয়েক দিন সমুদ্র পথে গমনের পর "কান্দারিয়া" প্রভৃতি বন্দর হইয়া "শজ্জর" নামক বন্দরে যাইয়া উপস্থিত হন, দুর্ভাগ্য-ক্রমে সামেরী ভয়ানক রোগগ্রস্থ হইয়া পড়ি-লেন। রোগের অবস্থা ক্রমেই সাংঘাতিক বোধ হইতে লাগিল। সামেরী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন তাঁহার সংসার-বাণিজ্যের শেষ হইয়াছে। তখন মুমূর্ষু সামেরী, তাঁহার আরবীয় বন্ধুগণকে বলিতে লাগিলেন,—ভ্রাতৃ-গণ! আর আমার অব্যাহতি নাই, জীবন-প্রদীপ এইবারে নির্ব্বাপিত হইবে। যত আশা, যত আকাঙ্ক্ষা, যত বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম, তৎসমস্তই বায়ু সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। তখন তাঁহার আরবীয় বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন,—ভাই সামেরী, আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল যে, মালাবারের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করি; কিন্তু যখন আমরা তোমার ন্যায় একজন হিতৈষী বন্ধুকে হারাইতেছি, তখন আর আমাদের এ আশা ফলবতী হইতে পারিল না। তদুত্তরে সামেরী বলিলেন,—ভ্রাতৃগণ! আমার আত্মীয়বর্গের নিকট আমি স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, এই পত্র সঙ্গে করিয়া আপনারা মালাবার উপস্থিত হইলে, তাঁহারা অবশ্য আপনাদের সাহায্য ও সম্মান করিবেন, কোন চিন্তা নাই। কিন্তু সাবধান, আমি যে আপনাদের সঙ্গে আসিয়াছি, এ কথা যেন তাঁহারা জানিতে না পারেন, কারণ তাহাতে তাঁহারা অন্যরূপ বুঝিয়া, নানা অনর্থপাত ঘটাইতে পারেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, রাস্তায় আপনাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই বলিয়া রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়া মুমূর্ষু সামেরী আদেশ-পত্র লিখিতে লাগিলেন, যথা—

"আমি চেরা অর্থাৎ মালাবার অধিপতি সামেরী, এই আদেশ-পত্র দ্বারা তোমা-দিগকে জানাইতেছি যে, আমি পরম কারু-ণিক জগদীশ্বরের আদেশক্রমে তোমাদের

(১) মালাবারবাসীগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে সামেরীর যোগসাধনার স্থানে গিয়া, দেখিলেন সামেরী নাই। অতএব তাহাদের মনে ধারণা হইল যে, সামেরী স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, আবার পুনরায় কোন সময়ে আসিবেন। এই ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া মালাবার বাসিগণ আজ পর্য্যন্তও ঐস্থানে পাদ প্রক্ষালনার্থ জল এবং "খড়ম" রাখা করিয়া থাকেন। (লেখক)

নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি, সত্বরেই তোমাদের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। আমি তোমাদের সম্মুখে আছি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা আমার আদেশ পালন করিবে। আমার আদেশ মানিয়া চলিলে, তোমাদের ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল হইবে। মালেক বিন্নে হবিব ও তাঁহার সঙ্গীগণ তোমাদের দেশে বাণিজ্যোপলক্ষে গমন করিতেছেন। ইঁহারা অতিশয় সচ্চরিত্র, ন্যায়বান, ধর্ম্মপরায়ণ এবং সত্যবাদী লোক। ইঁহাদের সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, তাঁহাদেরই হস্তে এই "হুকুমনামা" প্রদান করিলাম। তোমরা ইঁহাদিগকে সম্মান ও আদর করিবে। ইঁহাদিগকে অবাধ-বাণিজ্যের সত্বদান করিয়া, প্রত্যেক বিষয়ে ইঁহাদের সহায়তা করিবে। ইঁহারা যাহাতে মালাবারে সুখে ও স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারেন, সেদিকে সর্ব্বদাই তোমরা দৃষ্টি রাখিবে। মালাবারে ইঁহাদের অবস্থান নিতান্ত শুভকর বলিয়া জানিবে। ইঁহারা যথেচ্ছাক্রমে বাটী, উদ্যান, ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। তাহাতে তোমরা ইঁহাদের সহায়তা করিবে। ইঁহাদের প্রতি তোমরা এবং অন্য কেহ যেন কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে, সে বিষয় তোমরা দৃষ্টি রাখিবে।"

এইরূপ আদেশ-পত্র লিখিয়া আরবীয় মুসলমানবর্গের হাতে দিলেন এবং বলিলেন— আপনারা এই আদেশপত্র কদঙ্কলোরের শাসন-কর্ত্তার হাতে দিবেন। আমার মৃত্যু সংবাদ এবং আপনাদের সঙ্গে আসিবার সংবাদ সম্পূর্ণ গোপনে রাখিবেন। অতঃপর সামেরী তথা হইতে "জেকার" নগরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। জেকার নগরে আজিও তাঁহার পবিত্র সমাধি বর্ত্তমান আছে।

সামেরীকে জেকার নগরে সমাধিস্থ করিয়া, শরকবিন্নে মালেক, মালেকবিন্নে দিনার এবং মালেকবিন্নে হবিব প্রভৃতি আরবীয় মুসলমানগণ দলবল-সহ কদঙ্কলোরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার শাসনকর্ত্তাকে সামেরীর আদেশ-পত্র প্রদান করেন। সামেরীর স্বহস্ত লিখিত আদেশ-পত্র পাইয়া মালাবারবাসীগণ নিতান্ত সন্তোষ ও কৌতুহলাক্রান্ত হ'ন এবং সামেরী কোথায় আছেন, কেন সুখের রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন, ইত্যাদি, অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সুচতুর আরবীয়েরা কোন কথাই তাঁহাদের নিকট প্রকাশ না করিয়া, শুধু বলিলেন যে, তাঁহারা সামেরীর বিশেষ কোন খবর রাখেন না। "শজ্জর" বন্দরে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের সহিত সামেরীর সাক্ষাৎ হয়। কেন তিনি রাজ্যপাট পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন সাজিয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোনই উত্তর দেন নাই। তাঁহারা মালাবার দেশে পুনরায় বাণিজ্যার্থে যাইতেছেন এই কথা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি এই আদেশপত্র দিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত সামেরীসম্বন্ধে কোন তত্ত্ব তাঁহারা অবগত নহেন।"

যাহা হউক, কদঙ্কলোরের শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। রাজ্যের সমস্ত সামন্ত এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হইয়া, এক প্রকাশ্য সভায় আরবীয় মুসলমানগণকে সাদর সম্ভাষণ এবং অবাধে বাণিজ্য করিবার ও যথেচ্ছা বাটী, উদ্যান, ভজনালয় ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। অতঃপর মুসলমানগণ কদঙ্কলোর

নগরে একটী মসজিদ ও বাগান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, ক্রমান্বয়ে "কোলাম" "বালী-মারবি" "হারকয়েন" "দ্বারকয়েন" "কান্দরিয়া "ফকলোব" "মনফলু" "কালীঙ্গার ফোর্ট" প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ বৃহৎ মনোহর মসজিদ ও উপনিবেশ সমূহ সংস্থাপন করেন। ক্রমেই তাঁহাদের দলবল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহারা অবশেষে মালাবার রাজ্যও হস্তগত করেন। সে সমস্ত বৃত্তান্ত পরে পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রহিল।

সৈয়দ নুরুল হোসেন।

# মায়ের মিনতি।

আর কেন বাবা! দুরাশার বোঝা,
ব্যথিত হৃদয়ে বেড়াও ব'য়ে,
কেন "আমন্ত্রণ", কারে "আবেদন"?—
যা হ'বার সেতো গিয়েছে হয়ে!

২

"আপনার ঘরে আপনি ভিখারী,
আপনার ধনে আপনি চোর,
সুহৃদ, সোদর, দারুণ অরাতি!"
সবি তো হয়েছে কপালে তোর!

৩

মাণিক রতন হেলায় হারা'লে
পরে কি তা' কভু খুঁজিয়া আনে,
আপন মঙ্গল আপনি ভুলিলে,
পরে কি গো স্মরে প্রাণের টানে?

৪

আপন শকতি আপনি বাড়াবে,
আপনি রাখিবে আপন গেহ,
আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াবে,
কি হবে পরের করুণা-স্নেহ?

৫

নিজ ধুলা গুঁড়া, কিবা খুদ কুড়া,
গুছিয়ে রাখিলে আপন ঘরে,
জননী কমলা হইবে অচলা,
সে আরাম কভু দিবে না পরে।

কত দিন বাপ! গেছে অবহেলে
সে উপেক্ষা ফল "দাসত্ব করা"—
দাঁড়াবার ঠাঁই, কোথা ছিল নাই,
সে জীবন—সে তো জীবন্তে মরা!

৭

তা'বলে কেঁদনা, কিসের বেদনা?—
উঠিবার লাগি মানব পড়ে,
সুখের লাগিয়া, দুখের আঘাতে,
দেবতা মানবে "মহত" করে।

৮

যা গেছে তা' গেছে, তায় লাগি যত
বৃথা হা হুতাশ যাউক চলি;
মুছি পুরাতন জড়তা নীচতা,
নব-বলে জাগ হইয়া বলী।

৯

বিদেশের পানে দেখনা চাহিয়া—
একতা, উদ্যম, আয়াস-বলে,
রাজ-রাজেশ্বর বণিক-নিকর,
একছত্রী আজ তপন-তলে।

১০

দেখ ইতিহাস—যোগী ম্যাট্সিনি,
শূর গ্যারিবল্ডি আপনা দানে,
জীবনের ব্রত কেমনে পালিলা,
কি বর লভিলা দেবতা স্থানে।

১১

স্বদেশে তোমার, কর অন্বেষণ,—
যোগীন্দ্র শিবাজী তপস্যা-বলে,
কি মন্ত্রে জীয়ালে জড়মৃত জাতি,
নির্ব্বাণ অনল উঠিল জ্বলে!

১২

দেখ শিখগুরু, কিবা মন্ত্র-বলে
গঠিলা জগতে অজেয় জাতি;
প্রতাপ-আদিত্য, বীর সীতারাম,
কার পূজা করি উঠিল মাতি।

১৩

তোরা যে অশক্ত নির্জ্জীব নিরীহ,
রক্ষিতে নারিস্ আপন দেহ,—
কেমনে রাখিবি আশ্রিত অনাথে
অবলা জননী, সাধের গেহ?

১৪

সেই ক্ষোভ—সেই মহা অপমানে
হৃদয় আমার গিয়াছে ফাটি,
উপলক্ষ্য শুধু কর্জ্জন-গর্জ্জন
বিধাতাই শির ফেলেছে কাটি!

১৫

সেই ভাঙা বুক গড়িতে আবার
কাহার চরণ ধরিছ সেধে?—
সেই কাটা মাথা যোড়া দিতে পুনঃ
কাহার দুয়ারে মরিছ কেঁদে?

১৬

আজো আর্য্য-রক্ত বহে যার বুকে,
এ ব্যবসা কিরে তাহার সাজে,
হিমাদ্রি কি কাঁপে ঝটিকার দাপে?—
পড়ে ক্ষুদ্র তরু কানন মাঝে!

১৭

অমৃত যে বাছা! তোমাদেরি কাছে—
সঞ্জীবনী-সুধা লুকিয়ে আছে,
সব ভাই বোন খুঁজিয়া দেখনা,
মুমূর্ষু মা ফিরে বাঁচে না বাঁচে।

১৮

অলক্ষ্যে এসেছে বিধির আদেশ—
"বিদেশী-বর্জ্জন, স্বদেশী-প্রীতি,"
সেই আজ্ঞা বহি যাও গম্য পথে,
পূজি বিধাতার মহতী-নীতি।

১৯

হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-রমণী
প্রভেদ, দূরতা, সকলি ভুলি,
স্বদেশের সেবা কর এক সাথে,
বিলাও মমতা পরাণ খুলি।

২০

ছাড় ভিক্ষা-আশা—লহ ভালবাসা,
ভীরুতা ছাড়িয়া, বীরত্ব ধর,
জীবনের ব্রত—কর্ত্তব্য-পালন,—
পবিত্র হইয়া গ্রহণ কর।

২১

তবে বাপধন! শুষ্ক এ জীবন
অমৃত বরষ সরস রবে,
তবে-ই তোদের অমীয় সঙ্গীত
"বন্দে মাতরম্" সফল হবে।

(হত?) শ্রীমা—

# উপনিষদের উপদেশ। (২৪)

## জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

পুনরায় সেইদিন প্রদোষ-সময়ে, যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"মহারাজ! দূরদেশে গমনার্থীব্যক্তি যেমন গমনোপযুক্ত রথ বা পোতাদি সংগ্রহ করিয়া, তদবলম্বনে গমন করে, আপনিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-লাভের যথোপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। আপনি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মলাভ করিয়াছেন; আত্মজ্ঞান লাভার্থ, যথাবিধি আচার্য্যদিগের মুখে জ্ঞানালোচনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; উপনিষদাদি ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থনিচয় অধ্যয়ন করিয়াছেন। সুতরাং, আপনি তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী। আপনি উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই আপনাকে আমি একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। বলুন্ ত, মহারাজ! এই দৃশ্যমান জড় শরীর পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ লোকে আপনার গতি হইবে? যদি এ তত্ত্ব আপনার না জানা থাকে, তবে আমি স্বয়ংই সে তত্ত্ব আপনাকে শুনাইব; আপনি শ্রবন করুন্,—

"মহারাজ! জাগ্রতাবস্থায়, আত্মচৈতন্য (জীবাত্মা) চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সহায়ে বাহ্য-বিষয়ের উপলব্ধি-লাভ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় যাবতীয় বিষয় প্রকাশিত হয় বলিয়া, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এই পুরুষচৈতন্যকে প্রকৃত পক্ষে "ইন্ধ" নামে অভিহিত করাই উচিত। কেন না, তৎকালে বিষয় 'ইন্ধ্যমান' হইতে থাকে, অর্থাৎ বিষয় 'প্রকাশিত' হয়। কিন্তু, পরোক্ষভাবে,লোকে এই আত্মাকে "ইন্দ্র" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু, এই নামটী গৌণ-নাম। ইন্দ্রিয় গুলি তাঁহার চিহ্ন বা পরিচায়ক লিঙ্গ এই অভিপ্রায়ে তাঁহার "ইন্দ্র" নাম। অথবা "ইদং পশ্যতি"—এই বিষয়টীর দর্শন বা প্রত্যক্ষ হয়—এই ব্যুৎপত্তি-বলে তাঁহাকে লোকে "ইন্দ্র" শব্দে নির্দ্দেশ করে। কথাটা এই যে, জাগরিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বার-যোগে বিষয় গ্রহণ করেন বলিয়া, আত্মার প্রকৃত নিরুপাধিক স্বরূপ এই অবস্থায় প্রকাশিত হয় না, বাহ্য ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি-যোগে (outer senses), এই অবস্থায়, আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়; সুতরাং ইহা আত্মার গৌণ স্বরূপ। ইহা স্থূলরূপ। স্থূল বিষয় সকলই, এ অবস্থায়, আত্মার ভোগ্য ও পোষক।

"জীব যে সময়ে স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া থাকে, তখন জীবাত্মার সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল বিষয় থাকে না। পূর্ব্বানুভূত স্থূল বিষয় সমূহের সংস্কার, সূক্ষ্মরূপে মনে নিহিত থাকে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল বৈষয়িক সংস্কারগুলি আত্মায় কার্য্য করিতে থাকে। ইহাও আত্মার নিরুপাধিক স্বরূপ নহে। অন্তঃকরণের যোগে বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি তখন হয় বলিয়া, ইহাও গৌণস্বরূপ। এই অবস্থায়, অন্তঃকরণ-রূপ উপাধির সম্বন্ধ থাকে বলিয়া, আত্মার এই গৌণ স্বরূপের নাম "তৈজস"। এ অবস্থায় সূক্ষ্ম সংস্কারাত্মক বিষয়গুলিই আত্মার ভোগ্য ও পরিপোষক। আমরা অন্ন-পানাদি যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা জঠরাগ্নিদ্বারা পরিপক্ক হইয়া, দ্বিবিধ অবস্থা বা বিকার প্রাপ্ত হয়; একটী স্থূল, অপরটী তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অবস্থা। স্থূল, বৈকারিক অংশগুলি মলমূত্রাদিরূপে বহির্গত হয়! সূক্ষ্ম বৈকারিক অংশগুলি পুনরায় জঠরাগ্নিদ্বারা রূপান্তরিত হইয়া দুই প্রকার রসে পরিণত হয়। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম রসগুলি শুক্র-শোণিতাদিরূপে দেহের পরিপুষ্টি করে। এবং, অন্য প্রকারের রসগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তাহাই হৃদয়স্থ "লোহিত-পিণ্ডের" পোষণ করে এবং হৃদয়স্থ শোণিত-বহা নাড়ীতে (blood-vessels) প্রবেশের পর, উহাই সূক্ষ্ম শরীরের পোষণ করিতে থাকে। ইহাই সূক্ষ্মদেহের ভোগ্য বলিয়া, সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মারও ইহাই ভোগ্য ও পোষণকারক বলিয়া অভিহিত হয়। হৃদয় হইতে সহস্র সহস্র শিরা-জাল

দেহের সর্ব্বাংশে প্রসৃত হইয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই শিরাপথগুলিই, সূক্ষ্ম শরীরের গমনাগমন-মার্গ। সূক্ষ্ম বিজ্ঞানশক্তি ও প্রাণশক্তি দ্বারাই এই সূক্ষ্ম-দেহ গঠিত। এই সূক্ষ্মদেহেই বৈষয়িক শব্দ-স্পর্শাদি সংস্কার সকল নিহিত থাকে। সুতরাং, এই সূক্ষ্মদেহ-রূপ উপাধিযোগে, স্বপ্নাবস্থায় আত্মার জ্ঞান ও ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। অতএব এ অবস্থাতেও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় না। তৎকালে প্রাণ ও অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকে। স্থূল ইন্দ্রিয় ও বিষয় তৎকালে উপরত হইলেও,—অন্তঃকরণে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্কারগুলি সূক্ষ্মরূপে উপস্থিত থাকে। তদ্দারাই জীবের স্বপ্নদর্শন সংঘটিত হয়। তদ্দারাই জীব বাসনাময় বিষয় সকলের প্রত্যক্ষ করে।

"এই দুই অবস্থা ব্যতীত আত্মার "সুষুপ্তাবস্থা" নামে আর একটী অবস্থা আছে। এ অবস্থায় জীব কোন প্রকার বিষয়-দর্শন করে না। ইহাই জীবের গাঢ় নিদ্রাবস্থা। তখন বাহ্য বা আন্তর কোন প্রকার বোধ থাকে না;—কোন প্রকার বাসনা থাকে না। এ অবস্থায় জ্ঞানশক্তি ও প্রাণশক্তি বিলীনভাবে অবস্থান করে। কিন্তু, তথাপি ইহা আত্মার প্রকৃতস্বরূপ নহে—নিরুপাধিকরূপ নহে। তখন সকলই কেবলমাত্র বীজশক্তিরূপে লুক্কায়িত থাকে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া তি কিন্তু, তথাপি বীজশক্তিরূপ উপাধি গূঢ়ভাবে রহে বলিয়া, ইহাও আত্মার গৌণরূপ। প্রাণের সহিত একীভূত ভাবে আত্মা অবস্থিত থাকেন বলিয়া, এই আত্মার "প্রাজ্ঞ" নাম বলিয়া পণ্ডিতেরা বলেন। সুষুপ্ত পুরুষের দেহে ক্রিয়া হইতে দেখা যায় বলিয়া তখন আত্মা, প্রাণশক্তির সহিত একীভূত হইয়া যায়; এবং বিজ্ঞানশক্তিও এই প্রাণশক্তিতে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করে। জাগরিত হইলে, পুনরায় বিষয়-সংযোগে, ইহারা কারণাবস্থা, বীজাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, আবার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার আকারে উদ্ভূত হয়। এই শক্তিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধচ্যুত হয় না বলিয়া, এ অবস্থাতেও ব্রহ্মের ঠিক্ প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় না।

"মহারাজ! ব্রহ্মের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বর্জ্জিত; তাহা এই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অবস্থা হইতে পৃথক্। সে অবস্থাটীকে বোধের বিষয়ীভূত করিতে হইলে, "তাহা, ইহা নহে; তাহা, উহা নহে"—এই ভাবে করিতে হয়। আত্মার প্রকৃত, নিরুপাধিক স্বরূপের বোধ জন্মিলে, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা কোনরূপ উপাধি দ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারেন না। আত্মাকে কেহ ধ্বংস বা বিশীর্ণ করিতে পারে না; ইনি অসঙ্গ, ইঁহার বন্ধন নাই এবং ভয়-ক্লেশ-বিমুক্ত। মহারাজ! আপনি এ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আপনি জন্ম-মরণাদি ভয়শূন্য হইতে পারিয়াছেন।

মহারাজ জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের এই উপদেশ পাইয়া তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইয়া, আপনার রাজ্য, ধন প্রভৃতি যাহা কিছু আপনার বলিতে বুঝায়,—তৎসমস্তই অর্পণ করিলেন এবং আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগত কোন ভেদ নাই। যদিও সংসার-দশায় জীবাত্মাকে হর্ষ-শোক জড়িত, ক্লেশ-তাপ পীড়িত ও সংসার-পাশ নিগড়িত বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আত্মা বিষয়ের অতীত ও

বিষয় হইতে পৃথক্। আমরা জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই তিন অবস্থার বিষয়ে উত্তম-রূপে বিচার ও প্রণিধান করিয়া দেখিলে, জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে, এই জন্যই উপনিষদের নানা স্থানে, এই ত্রিবিধ অবস্থার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরাও সেইজন্য, এই বিষয়টীর প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জাগ্রতাবস্থাকেই সংসারাবস্থা বলা যায়। এই অবস্থায়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বিশ্ব-পট উদ্‌ঘাটিত থাকে এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ, আত্মা এই স্থূল-বিষয়গুলি লইয়াই ক্রীড়া করে। বিষয়ের দ্বারা আত্মা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ও বিষয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত থাকে। এই স্থূল বিষয় সকল, ইন্দ্রিয়-পথে ক্রিয়া উপস্থিত করিয়া, আত্মার অনু-ভূতির উদ্রেক করায়। এইরূপেই বিষয়-প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু, বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপটী বুঝিয়া দেখিলে, এ অবস্থাতেও, আত্মা যে বিষয় হইতে পৃথক্, তাহা বুঝিতে পারা যায়। শব্দ স্পর্শাদিকে আমাদের জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে গেলে, মনঃসংযোগ(attention) অনুভূতিগুলির মধ্যে তুলনা করিয়া, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের (assimilation and differen-tiation)পৃথক্‌করণ,এবং অনুভূতিগুলিকে দেশ ও কালের দ্বারা শ্রেণীবদ্ধকরণ,—এই ক্রিয়া-গুলির আবশ্যক হয়; নতুবা বিষয়ের প্রত্যক্ষ (perception) হইতে পারে না। যে আত্মা এই ক্রিয়াগুলির বিকাশ করিয়া থাকে, যে আত্মা অনুভূতিগুলির উপর এইরূপে বিচার শক্তির প্রয়োগ করিয়া, তাহাদিগকে আত্ম-জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিয়া লয়, সে আত্মা যে অবশ্যই অনুভূতি হইতে পৃথক্ পদার্থ,তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। যে আত্মাতে সর্ব্বদা বিষয়ের অনুভূতি জন্মিতেছে, সে আত্মা যে অবিকারী, নিত্য ও এক এবং অনুভূতিগুলি যে অনিত্য ও নিয়ত রূপান্তর পরিগ্রহ করে,—এই তত্ত্বগুলি আমাদের স্বপ্নাবস্থাতেও বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। স্বপ্নাবস্থায়, স্থূলবিষয়গুলি থাকে না; কেবল অন্তঃকরণ, পূর্ব্বলব্ধ-রূপ রসাদির সংস্কার লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। জাগ্রতাবস্থায় ইহাদের যে দেশ-বদ্ধ স্থূল আকার ছিল, এখন আর সে আকার নাই। এখন তাহারা বাসনাত্মক সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে। এখন তাহারা কেবল মানসিক সংস্কাররূপে ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু, বিষয়-গুলি যদিও রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি, যে আত্মা পূর্ব্বে জাগ্রতাবস্থায় বিষয়ের স্থূল-অনুভূতি লাভ করিয়াছিল, সেই এক, নিত্য, অবিকারী আত্মাই,স্বপ্নাবস্থাতেও, সূক্ষ্ম বৈষয়িক অনুভূতি পাইতেছে। সুতরাং, রূপ-রসাদির রূপান্তর ঘটিলেও, বিষয়ী আত্মার কোন রূপান্তর ঘটিতেছে না। গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তির অবস্থাতেও এই কথা প্রমাণিত হয়। এ অবস্থায়, রূপরসাদির অন্যরূপ আকার হইয়া যায়। নিদ্রাবস্থায়, যখন স্বপ্ন দর্শন ঘটে, তখন যে রূপরসাদির সংস্কার লইয়া মন ব্যস্ত ছিল;—সুষুপ্তির সময়ে,সেই সংস্কার-গুলিও মন তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু সেই নিত্য, অবিকারী আত্মা জাগ্রত থাকে। জাগ্রতাবস্থায় যে আত্মা বিষয়ের স্থূল অনুভূতি পাইয়াছিল, যে আত্মা স্বপ্ন সন্দর্শনকালে, সংস্কারগুলি লইয়া খেলা করিয়াছিল, সেই আত্মাই এই সুষুপ্তিরও অনুভবকর্ত্তা। অতএব আমরা ইহা উত্তম বুঝিতে পারিতেছি যে, আত্মা নিয়ত স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়া যাই-

তেছে; কিন্তু, বিষয়-গুলি নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। বৈষয়িক আকার বা রূপ-গুলি একেবারে তিরোহিত হইলেও, আত্মার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। মূর্চ্ছাদির অবস্থাতেও, বিষয়ের কোন আকার থাকে না; কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব থাকে। অতএব, যদিও বৈষয়িক অনুভূতিগুলি আত্মাতেই ঘটিয়া থাকে, তথাপি, অনুভূতির পরিবর্ত্তনে, আত্মার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে না। অনুভূতির পূর্ব্বেও আত্মা বর্ত্তমান ছিল, অনুভূতির পরে ও আত্মা বর্ত্তমান থাকিবে।

শ্রুতিতে, এই তিন অবস্থার অতীত "তুরীয়" নামে একটী অবস্থায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইটীকে আত্মার নিরূপাধিক স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এটী, প্রকৃতির সহিত আত্মার সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ-শূন্য অবস্থা। সুষুপ্তি-অবস্থাতেও, প্রকৃতির সম্বন্ধ-চ্যুত হওয়া যায় না। সুষুপ্তিকালে, রূপ-রসাদির সংস্কার গূঢ়ভাবে,—শক্তি বা বীজ-রূপে,—লুক্কায়িত থাকে। জাগিলেই আবার তাহারা বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। সুতরাং, প্রকৃতির অতীত অবস্থা বুঝাইবার জন্যই, শ্রুতি "তুরীয়"-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্ব-প্রকাশের জন্য যে কয়েকটী শক্তি মিলিয়া মিশিয়া ক্রিয়া করিতেছে, সমষ্টি-ভাবে সেই কয়েকটী শক্তির নাম "প্রকৃতি"। কিন্তু ব্রহ্ম ত অনন্ত-শক্তি স্বরূপ। এই কয়েকটীমাত্র শক্তিই কি ব্রহ্ম স্বরূপের ইয়ত্তা করিতে পারে? এই কয়েকটী মাত্র শক্তি দ্বারাই কি ব্রহ্মের স্বরূপ নিঃশেষ-রূপে (exhaustively) প্রকাশিত হইতে পারে?—কখনই না। এই জন্যই মহাত্মা জীব গোস্বামী ব্রহ্মের "স্বরূপ-শক্তি"ও "প্রকৃতি-শক্তি" এই দ্বিবিধ শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহাতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে "তুরীয়"-স্বরূপের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মের স্বরূপ অবশ্যই এ বিশ্বের প্রত্যেক শক্তিতে ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে, উভয়-ভাবেই প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রতি পদার্থেই তাঁহারই স্বরূপ, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু, তিনি প্রত্যেক শক্তি হইতে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাবেই, সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রতি পদার্থ হইতেই, তিনি, বষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে, সম্পূর্ণ পৃথক্। এই মহারহস্য বুঝাইবার জন্যই উপনিষদে তাঁহার "তুরীয়"-রূপের বর্ণনা আছে। গোলাপ, পদ্ম, যুথি, গন্ধরাজ,—প্রত্যেক পুষ্পটীতেই তাঁহারই সৌন্দর্য্য বিকসিত হইতেছে; আবার সমগ্র পুষ্পজাতিতেও, সেই তাঁহারই সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু, ব্যষ্টিভাবে,—গোলাপই বল, আর পদ্মই বল, কিম্বা যুথিই বল, আর কদম্বই বল,—কোনটীই তাঁহার সে বিশাল অনন্ত সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা করিতে পারিতেছে না। আবার, সমষ্টি-ভাবে, পৃথিবীর সমগ্র পুষ্প-জাতি,—সে বিশাল সৌন্দর্য্যের কিছুই ইয়ত্তা করিতে পারিতেছে না!! শ্রুতিতে, ব্রহ্মের এই তুরীয়-স্বরূপটীকে "শান্ত" ও "শিব" (মঙ্গল) নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আমরা প্রসঙ্গতঃ এস্থলে, উপনিষদ্-কথিত জাগ্রদাদি চারিটী অবস্থার উল্লেখ করিয়া, তাহার তৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলাম। এই অবস্থাগুলির আরো বিশেষ বিবরণ, আমরা যথাস্থলে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়া দেখিব।

এই "জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে", আমরা প্রধানতঃ যে কয়েকটী উপদেশ পাইয়াছি, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে,—

১। ব্রহ্ম, জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ। জ্ঞানেরই ক্রিয়োন্মুখ অবস্থাকে শক্তি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কতকগুলি শক্তি, জগৎ-রচনায় নিযুক্ত রহিয়াছে; এই শক্তিগুলিকে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের, জগৎ-রচনা-সম্বন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

২। যে সকল শক্তির বিকাশে জগৎ রচিত হইয়া চলিয়াছে, সেই শক্তিগুলি প্রথমতঃ সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতির আকারে সৌরজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। পরে, প্রকাশিত ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি, অগ্নি, সূর্য্যাদিতে গূঢ়-ভাবে নিহিত ছিল; নতুবা, ইহারা প্রাণীদেহে পরে কোথা হইতে আসিল? সূর্য্য, চন্দ্রাদিতে যাহা বীজরূপে প্রচ্ছন্ন, তাহাই যথাকালে প্রাণীদেহে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়।* এই মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই, শ্রুতিতে, সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতিকে, চক্ষু বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তির দেবতা বা সমষ্টি বলিয়া বলিয়া বর্ণিত আছে।

৩। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটী জীবের অবস্থা। বিষয়গুলি নিয়ত রূপান্তর পরিগ্রহ করে; কিন্তু জীবের আত্ম-চৈতন্যে তাহাদের অনুভূতি জন্মে। এই অনুভূতিগুলির পরিবর্ত্তন হইলেও, অনুভব-কর্ত্তা বা বিষয়ী-আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না; তিনি নিয়ত একরূপ।

৪। এই আত্ম-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য স্বরূপতঃ এক।

৫। প্রকৃতিশক্তি, ব্রহ্মশক্তির ইয়ত্তা করিতে পারে না। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্-এ।

# বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের প্রাচীন কাহিনী।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন,—"কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে দুই এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে, বাঙ্গলা ব্রাহ্মণ-শূন্য অনার্য্যভূমি ছিল।" এই সিদ্ধান্তের হেতু তিনি পরে বলিতেছেন,—"আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, অষ্টম শতাব্দী বা আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তাঁহারা স্মরণকরিয়া বলিতে পারেন কি? প্রাচীন আর্য্যজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের চিহ্ন-স্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই।"—বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ।

প্রত্ন-তত্ত্ব-গবেষণায় প্রগাঢ় পরিশ্রমী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, তদীয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" প্রথম অধ্যায়ে, সুদৃঢ় যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন যে,—"সাড়ে চারি হাজার বা পাঁচ হাজার বর্ষ হইতে চলিল, গৌড়ে (বর্ত্তমান বঙ্গে) ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় হইয়াছিল" —৫৫ পৃষ্ঠা। কিন্তু, তিনি বঙ্কিম বাবুর কথিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই। আমি আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বর্ত্তমান

* টীকা। এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের প্রকৃত অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে "মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানের" শেষ-সংখ্যা 'নব-ভারতে' দেখুন।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের পুর্ব্ব-পুরুষগণ, বিরচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা দ্বারা নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি দৃঢ়ীকৃত করিতে ইচ্ছা করি।

আর্য্যক্ষেমীশ্বর 'চণ্ড-কৌষিক'-নামক এক প্রসিদ্ধ নাটক প্রস্তুত করেন। ঐ নাটকের নান্দী-শ্লোকের সূত্রধারের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে—'মহীপালদেবের আদেশক্রমে নাটকের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' সেন-বংশীয় রাজাদিগের পূর্ব্বে, পালবংশীয় রাজারা বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। তন্মধ্যে মহীপাল নামক একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার স্বনামে খ্যাত এক দীঘি এ পর্য্যন্ত দিনাজপুর-প্রদেশে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব, ইহা দ্বারা অনুমান হইতেছে যে, ঐ মহীপাল রাজার সময়ে, অথবা তাহার কিছুদিন পরে, এই নাটক রচনা হইয়া থাকিবে। (১) ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালীন বৌদ্ধ-নৃপতিগণ হিন্দুপ্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ, তাহাদিগের উন্নতি-সাধনে তৎপর ছিলেন।

রাঢ়দেশের বিষ্ণুপুর গ্রামে, কান্যকুব্জীয় পঞ্চগোত্র বহির্ভূত, মৌদ্গল্য-গোত্রে মুরারি মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'অনর্ঘ-রাঘব' নামক প্রসিদ্ধ নাটকের প্রণেতা। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে পাশ্চাত্য বৈদিককুলে-জাত ও একাদশ শত শকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (২) তাঁহার প্রথম উক্তি সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"অনর্ঘ-রাঘব নাটককার, মহাকবি মুরারি মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিককুল সম্ভূত কি না, তদ্বিষয় সন্দেহ স্থল। কারণ, তদ্বংশীয়দিগকে ষড়্‌গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ আপনাদিগের সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাদিগকে 'সাতশতী' অর্থাৎ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অথবা মধ্য-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। মুরারি মিশ্র নিজপরিচয়ে কোন খানে পাশ্চাত্য কিম্বা দাক্ষিণাত্য, এরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বৈদিককুলের ব্যক্তি-বিশেষের মুখে শুনিয়াই, তাঁহাকে পাশ্চাত্য স্থির করিয়াছেন।" (৩)

তর্কবাগীশ মহাশয়ের দ্বিতীয় উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্য প্রণীত 'শঙ্কর-বিজয়' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"নিজশিষ্যপদং গতানুদীচ্যান্ ইতি কৃত্বাথ
বিদেহকৌশলাদ্যৈঃ।
বিহিতাপচিতিস্তথাঙ্গ-বঙ্গেষ্বমমাস্তীর্য্য যশো
জগাম গৌড়ান্।
অভিভূয় মুরারিমিশ্র বর্যাং সহসা চোদয়নং
বিজিত্য বাদে।
অবধূয় চ ধর্ম্মগুপ্তমিশ্রং স্বযশঃ প্রৌঢ়ং অগাপয়ৎ
স গৌড়ান্।

—পঞ্চদশ অধ্যায়, ১৬১ ও ১৬২ শ্লোক।

উত্তর দেশীয় পণ্ডিতেরা সকলেই শঙ্করের শিষ্য হইলে, মিথিলা-দেশস্থ পণ্ডিতগণ শঙ্করকে বিধিবিধানে পূজা করিলে, শঙ্কর অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি দেশে স্বীয় কীর্ত্তি-পতাকা দোলিত করিয়া, শেষে গৌড়দেশে উপনীত হন ও গৌড়দেশের তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত মুরারি মিশ্রকে জয় করেন। উদয়ন ও ধর্ম্মগুপ্তকে শাস্ত্রীয়বাদে পরাজয় করিয়া, আপনার নূতন কীর্ত্তি ঐ গৌড় দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গীত করাইয়া ছিলেন।

(১) ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ, ৭৭পৃষ্ঠা।
(২) তর্কবাগীশ মহাশয় প্রকাশিত অনর্ঘ-রাঘবের ভূমিকা।
(৩) সম্বন্ধ-নির্ণয়, ২৮৮পৃষ্ঠা।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বহুতর প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন যে, আদিশূর, ৯৯৬ হইতে ১০০৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উইলসন্ ও কোলব্রুক, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল, ৮০০ খ্রীঃ অঃ হইতে ৯০০ খ্রীঃ অঃ ইহার মধ্যে নিদ্ধারণ করিয়াছেন। অন্যান্য প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নয় শত খ্রীঃ অব্দের পরবর্ত্তী বলেন নাই; বরঞ্চ, Hodgson সাহেবের মতে, তিনি ৮০০ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং, তিনি যে আদিশূরের দুই এক শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সুনিশ্চিত। ইহা দ্বারা সুন্দররূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, 'অনর্ঘ রাঘব'-কার পণ্ডিতবর্য্য মুরারিমিশ্র, আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

'রাঘব পাণ্ডবীয়'-নামক মহাকাব্যের রচয়িতা কবিরাজ মহাশয়ও আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী এ দেশীয় ব্রাহ্মণ। তিনি জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভায় ছিলেন এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। (৪) বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগে, খাসিয়ার পূর্ব্বদেশে, জয়ন্তীপুর নামে এক নগর আছে। কামদেব এই নগরের রাজা ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গেই সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সংখ্যা পূর্ব্বেও অধিক ছিল, এখনও আছে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের ৪২টি গাঁইয়ের মধ্যে কামদেব নামক একটি গাঁই আছে। রাঘব পাণ্ডবীয় হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটিতে উক্ত যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ জয়ন্তীপুরে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে রাজা কামদেব স্বীয় নামাঙ্কিত কামদেব গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারাই কামদেব গ্রামের সপ্তশতীদিগের আদিপুরুষ। অনেকে কবিরাজ মহাশয়কে আদিশূরের পরবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করেন, কেননা রাঘব পাণ্ডবীয়-গ্রন্থে ধারাপতি মুঞ্জরাজের নাম উল্লেখ আছে, এবং ইঁহাদের মতে, মুঞ্জরাজ আদিশূরের পরবর্ত্তী। কিন্তু ইহা ভ্রম মাত্র। কেননা, কামদেবের রাজত্বকালে, সেন বংশীয় হিন্দুরাজগণ গৌড়দেশের অধিপতি হইলে, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইত না। বস্তুতঃ, তৎকালে পালবংশীয় বৌদ্ধরাজা ছিলেন এজন্য তিনি বৌদ্ধের নিকট ব্রাহ্মণ প্রার্থনা পরিহার করিয়া, হিন্দু-রাজ-শাসিত মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। আরও কহ্লন-কৃত 'রাজতরঙ্গিণীতে' লিখিত আছে যে—"শঙ্কর বর্ম্মা ভারত-বিখ্যাত ভোজরাজকে জয় করিয়াছিলেন।" (৫) শঙ্করবর্ম্মা ৮৯০ খ্রীঃ অঃ হইতে ৯০৭ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন; উজ্জয়িনীর অন্তঃপাতী ধারানগরীর অধিপতি মুঞ্জরাজ ভোজরাজের পিতৃব্য ছিলেন, সুতরাং তাহার আবির্ভাবকাল আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইল। পুনশ্চ, যদি ভোজপ্রবন্ধের অধিনায়ক ভোজরাজ ও পূর্ব্বোক্ত ভোজরাজ একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মুঞ্জরাজের আবির্ভাব-কাল আরও পূর্ব্বগামী হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, এরূপে দেখা গেল যে রাঘব পাণ্ডবীয়-প্রণেতা কবিরাজ, আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

---

(৪) আনেতা মধ্যদেশাৎ প্রবচনবিদুষাং সোমপাং ব্রাহ্মণানাম্।
আরোঢ়া মর্ত্ত্যমূর্ত্ত্যা সুরপতিসদসো মণ্ডলং মালবত্যাঃ।
জেতা ভূমের্জ্জয়ন্তীপুর-পুরমথন শ্রীপদাম্ভোজভৃঙ্গঃ
সোঽপিক্ষ্মাপালনেতুঃ স্বকুলকুলগিরিং যোঽম্বুলেভে তপোভিঃ।
—রাঘব পাণ্ডবীয়, ১ম সর্গ, ২৫ শ্লোক।

(৫) ৫ম তরঙ্গ, ১৫৬ শ্লোক।

অনেকের বিশ্বাস 'নৈষধ-চরিত' প্রণেতা শ্রীহর্ষও আদিশূরের সময়ে, কান্যকুব্জ হইতে আগত শ্রীহর্ষ, অভিন্ন ব্যক্তি। বঙ্কিম বাবুও এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিয়াছেন,—ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ, তাঁহার (আদিশূরের) সমসাময়িক। (৬) কিন্তু,নিম্নলিখিত হেতুবশতঃ এই বিশ্বাস অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়—

(১) নৈষধ-চরিত প্রণেতা শ্রীহর্ষের পিতার নাম—শ্রীহীর (১ম সর্গ, শেষ শ্লোক); কিন্তু, শেষোক্ত শ্রীহর্ষের পিতার নাম—ক্ষিতীশ (কুলরমা)।

(২) আদিশূরের নিকট স্বপরিচয়দান কালে ভট্টনারায়ণ যেমন স্বপ্রণীত 'বেণী-সংহারের' উল্লেখ করেন, সেইরূপ শ্রীহর্ষের আত্মপরিচায়ক শ্লোকের মধ্যে নিজ কৃত নয়খানি গ্রন্থের একখানিরও উল্লেখনাই।

(৩) আদিশূর যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন জন্য আমন্ত্রণ-পত্র পাঠান,তখন সে স্থানে বীরসিংহ নামে এক নৃপতি ছিলেন। শ্রীহর্ষ স্বগ্রন্থে তাঁহার কোনও উল্লেখ করেন নাই।

(৪) পটুযুক্তি নিকৃত সর্ব্বশাস্ত্রং
গুরুভট্টোদয়নাদি কৈরজয্যম্।
সহি খণ্ডনকার মূঢ়দর্পং
বহুধা বুদ্যা বশং বদং চকার॥ —১৫৭ শ্লোক।
তদনন্তরমেষ কামরূপানধিগত্যাভিনবোপশব্দযুক্তম্।
অজয়ৎ কিল শাক্তভাষ্যকারং স চ ভগ্নমনসেদ-
মামুলোচে॥—১৫৮ শ্লোক।
শঙ্করবিজয়, পঞ্চদশ অধ্যায়।
[খণ্ডনকারং শ্রীহর্ষাখ্যম্ ইতি ধনপুরিকৃত টীকা]

অনুবাদ—খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ আপনার পটুযুক্তি দ্বারাসকল শাস্ত্রের মত খণ্ডন করেন। গুরু প্রভাকর, ভট্টপাদ ও ভাস্কর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রীহর্ষকে জয় করিতে পারেন নাই। এই কারণে, শ্রীহর্ষের গর্ব্ব অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু, আচার্য্য শঙ্কর সেই শ্রীহর্ষের সঙ্গে অবিশ্রান্ত বিবাদ করিয়া, তাঁহাকে আপনার বশীভূত করেন। তৎপরে আচার্য্য শঙ্কর কামরূপ প্রভৃতি দেশে গমন করেন। তথায় অভিনব গুপ্ত নামক একজন পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি শাক্তদিগের শাস্ত্রে ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শঙ্কর তাঁহাকেও পরাস্ত করেন। তখন অভিনব গুপ্ত ভগ্নমনোরথ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই দুইটি শ্লোক হইতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে যে, মধ্যদেশ হইতে কামরূপে যাইবার সময়ে, শঙ্করাচার্য্য পথিমধ্যে 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' রচয়িতা শ্রীহর্ষকে বিচারে পরাজিত করেন। সুতরাং, তিনি শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক হইয়া পড়িলেন, আদিশূরের নহে। নৈষধ-চরিতে, শ্রীহর্ষ যে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে দুইটি বিষয় ব্যক্ত হয়। প্রথমতঃ, যেহেতু তিনি কান্যকুব্জাধিপতির নিকট হইতে প্রসাদ-তাম্বুল প্রাপ্তির কথা লিখিয়াছেন, সেইজন্য বুঝা যাইতেছে যে,তিনি কান্যকুব্জ রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি 'গৌড়োর্ব্বীশ কুলপ্রশস্তি' গ্রন্থ-রচনা করিয়া গৌড়েশ্বরকে উপহার দিয়াছেন, ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি গৌড়-রাজসভাতেও বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীহর্ষ 'নব-সাহ-সাঙ্ক-চরিত' নামক কান্যকুব্জ-রাজের জীবনী লিখিয়াছেন। ঐ সাহসাঙ্কের রাজত্বকাল খ্রীঃ, অঃ, ৯০০ বৎসর। এই সময়েই শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি শ্রীহর্ষকে দেশীয় ব্রাহ্মণ-মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে।

(৬) বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ।

মুরারি মিশ্র সম্বন্ধে লিখিবার কালে আমি দেখাইয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য গৌড়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে জয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর একটি ঘটনার প্রতি অবধান করুন। 'শঙ্কর-বিজয়ে' লিখিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীর দেশে গমন পূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে জয় করিয়া সরস্বতী পীঠে স্থিতি করেন। 'রাজতরঙ্গিণীতে' তদনুযায়ী এক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষকালে কতকগুলি তীর্থ-যাত্রী ব্যক্তি কাশ্মীরস্থ লোক ও তত্রস্থ সরস্বতীর মন্দির দর্শনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন; তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও কারণবশতঃ অত্যন্ত সংগ্রাম হয়।

গৌড়োপজীবিনামাসীৎ সত্যমত্যদ্ভুতং তদা।
জহর্যে জীবিতং ধীরা পরোক্ষস্য প্রভোঃকৃতে॥
শারদাদর্শনামিষাৎ কাশ্মীরান্ সংপ্রবিশ্যতে।
মধ্যস্থদেবাবসথং সংহতাঃ সমবেষ্টয়ন্॥
—রাজতরঙ্গিনী, ৪ তরঙ্গ, ৩২৫ ও ৩২৬ শ্লোক।

ললিতাদিত্যের কালে, গৌড়দেশোপজীবী ব্যক্তিদিগের অতি অদ্ভুত কার্য্য হইয়াছিল। পরোক্ষ দেবতার জন্য সেই পণ্ডিতেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহারা সরস্বতী দর্শনচ্ছলে কাশ্মীরদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক একত্র হইয়া তন্মধ্যস্থিত দেবালয়কে বেষ্টন করিয়াছিলেন। কাশ্মীর দেশ ও তন্মধ্যে বিশেষ স্থান সরস্বতীর পীঠস্থল। উভয় দলের উৎকট বিবাদ; সেই বিবাদের কারণ কেবল ধর্ম্মের অনৈক্য, ইত্যাদি। এই ঘটনার অনেক বিষয়ে 'রাজতরঙ্গিণী' এবং 'শঙ্করদিগ্বিজয়' উভয় গ্রন্থ অবিকল হইতেছে।"—ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ—৪৮ পৃষ্ঠা।

এই বিবরণ পাঠে ইহা অনুমিত হইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক গৌড়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের জয়কালে, তত্রত্য অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে গমন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যকে গৌড়দেশে আসিয়া বৌদ্ধ-বিজয়ের সুযোগ হয় নাই। পরন্তু, তিনি শাক্ত প্রভৃতি প... শস্য শ্যামলা ... গণকে স্বীয় অদ্বৈতমতে ... হইয়া পড়িয়াছে। ছিলেন। ইহাতে ইহাই সুস্পষ্ট ঘটনাবলীও হইতেছে যে আদিশূরের অনেক পূর্ব্ব হই...ধি- এদেশে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র পরিচালিত ব্রাহ্মণ-সমাজ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং, "খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে, এদেশে ব্রাহ্মণ্য-সমাজ ছিল না"—বঙ্কিম বাবুর লিখিত এই কথাটি আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু, "বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের প্রাবল্য-প্রযুক্ত আদিশূরের রাজত্বের প্রাক্‌কালে এ দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্যন্তিক অভাব ঘটিয়াছিল"—এই প্রচলিত প্রত্যয়ের প্রতিকূলে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন (১) তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

(১) বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন—"আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ, কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রূপ বা তদধিক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যহেতু যদি বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ-সংখ্যা অল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণ-বংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে।"—বিবিধপ্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ।

# খেয়া।

চিরদিনকার একি মায়া খেলা
এপার হইতে ওপারে,
খেয়া বাওয়া তব অসীম সাগরে
সমান আলোক আঁধারে!
নানাছলে তুমি ডেকেছ আমারে,
নানা ঘটনায় বিবিধ আকারে,
তোমা হ'তে [illegible]রেছি সুদূরে
[illegible] ভবনে,—
কিন্তু, [illegible]ন্যে, মোর মুখ চেয়ে
[illegible] ডাক তার মাঝে গোপনে!

ভোরের আলোকে ঊষা-কুমারীর,
লোহিত-লজ্জা-রেখায়
পড়েছি হাজার মনের কাহিনী
বিবিধ বর্ণ লেখায়!
তখন ছিলনা কোন আবরণ,
মাথার উপরে উন্মুক্ত গগন,
ওঠেনি তুফান, ডাকেনিক' বান,
তরণী ওঠেনি কাঁপিয়া,
স্রোত চলচল, সোণা ঝলমল,
তটিনী ছুটেছে নাচিয়া!

মিছে মুখ চেনা, মিছে মন জানা,
এঘাটে, ওঘাটে, সেঘাটে!
মিছে বেচা-কেনা—হিসাব-নিকাশ,
এহাটে, ওহাটে, সে হাটে!
সারি সারি ধায় লোক নিরুপায়,
চায়, পায় কেহ, কেহ বা হারায়,
কেহ ফিরে ঘরে, কাণাকাণি করে,
ঘোর সংশয় আঁধারে!
আমি যারে খুঁজি, সে কোথা?—সে কথা
এখনো বলিনি কাহারে!

লুকাব না আর যাহা লুকাবার
কহিব মর্ম্ম-কাহিনী,
দিবালোকে হাসি, অশ্রু-সলিলে
কেন গো কাটাই যামিনী!
যে প্রীতিটি জাগে স্মৃতির আলোকে,
এ জীবন পারে বিপুল পুলকে,
মরণ ওপারে, নাহি মিলে তারে—
যে মোর জীবনে মরণে!
হৃদয়ের গান, নাহি পায় প্রাণ,
কোথাও মিলন ভবনে!

যুগে যুগে খেয়া, করে আসা যাওয়া,
এ পার হইতে ওপারে,
জীবন মরণ, যমজ সোদর,
খেলিছে আলোকে আঁধারে!
অতি ক্ষণ-তরে ক্ষীণ পরিচয়,
ফুটে আর টুটে, ভর নাহি সয়,
খেয়া বারবার, করে পারাপার,
হয় ত যে পথ ধরিয়া—
অচেনা আঁধারে, দূর পরপারে
হয় তো সে আছে বসিয়া!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

---

# বিলাতী পণ্যবর্জ্জনে স্বদেশী দীক্ষা। *

নদীতে বান ডাকিবার পূর্ব্বে জলের একটা কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বান ডাকিবার বিলম্ব নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়াও যাহারা তীরে দাঁড়াইয়া প্রতিকূলতা করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়

* ৭ই আগষ্টের উৎসবের দিনে, কুমিল্লা জাতীয়-বিদ্যালয়ে পঠিত।

হইয়া দাঁড়ায়; হয়ত, তাহারা ভাসিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

আজ বাঙ্গালীর বিলাতী পণ্যবর্জ্জন প্রতিজ্ঞার প্রথম বার্ষিক উৎসবের দিন। বাঙ্গালার জাতীয় ইতিবৃত্তে ইহা একটী স্মরণীয় ঘটনা। ইহাতেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইয়াছে।

১৩১২ সনের এই স্মরনীয় ২২শে শ্রাবণ তারিখে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদজনিত মর্ম্মকষ্টে বাঙ্গালার প্রতি নগরের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইয়া, কলিকাতার টাউনহলে, ভীমকণ্ঠে বিলাতী পণ্যবর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন। আমার সৌভাগ্য ক্রমে, আমি সেই পুণ্যদিনে আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে সেই বিরাট সভায় উপস্থিত ছিলাম!

এই ভাব-তরঙ্গের শেষ কোথায়, কে ত্যবে? ইহার নানাদিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "ইয্যক আলোচনা করিতে পারি, তেমন শক্তি ৎ ক্ষমতা আমার নাই। এই এক বৎসরে বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে ইহা যে এক নবীন উচ্ছ্বাস আনয়ন করিয়াছে, তাহারই ঘটনাবলী এই প্রস্তাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বঙ্গে এই বর্ত্তমান জাতীয় উদ্দীপনার প্রত্যক্ষ কারণ সেই বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা হইলেও, ইহার প্রকৃত কারণ অনেক সুদূর পরাহত। ইংরাজের অত্যাচার অবিচার, ইংরাজ হস্তে কৃষ্ণাঙ্গের বিনা অপরাধে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি, দেশী বনাম ফিরিঙ্গির ফৌজদারী মোকদ্দমায় অন্যায় বিচার-বিভ্রাট এবং সর্ব্বোপরি, আমাদের স্বার্থে কল্যাণকারী কর্জ্জনের কষাঘাত, রাজপুরুষগণের ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে একান্ত অনিচ্ছা—এই সমস্ত কারণ বহু বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশমধ্যে মহা অসন্তোষের বীজবপন করিতেছিল—লোকের মনে অলক্ষিতভাবে প্রচলিত শাসনের প্রতি ভীষণ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছিল। যেমন ভূমি-গর্ভে ধীরে ধীরে জল সঞ্চিত হইয়া, হটাৎ সুযোগ বুঝিয়া, প্রস্রবণের সৃষ্টি করে, সেইরূপে, বহুদিন ধরিয়া নীরবে একটী শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল, বর্ত্তমান সুযোগে স্ফূর্ত্তি পাইয়া, ভারত মরুভূমিকে পুনঃ শস্য শ্যামলা করিবার জন্য, বিধি নিয়োগে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলীও আমাদের সমাজের উপর অত্যাশ্চর্য্য আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, বিগত বুয়র-যুদ্ধের কালে দেশের অনেকেই মনে মনে অত্যাচারিত স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বুয়রদিগের সহিত সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তারপর, বর্ত্তমান জাপানযুদ্ধকে দেশের লোক নিজ দেশের ব্যাপারের ন্যায় মনে করিয়া, জাপানের জয়ে গৌরবান্বিত ও সুখী মনে করিতেন। এ সকলের কি কোন কারণ নাই? অন্যদিকে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, দেশ মধ্যে একটা জিঘিংসার ভাবও নিতান্ত গোপনে ফুটিয়া উঠিতেছিল; যে দিন তাহা পূরণ করিবার পথ পাইল সেই মুহূর্ত্তেই দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেশের আপামর সর্ব্বসাধারণ, বিনা বাক্যব্যয়ে, নত মস্তকে, অবলীলাক্রমে, স্বদেশী-ব্রত অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিল।

আমেরিকাহস্তে উৎপীড়িত চীনবাসীদিগের আমেরিক-পণ্যবর্জ্জণের প্রতিজ্ঞা কি প্রকার ফলবতী হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া,

যে এই বিলাতী-পণ্যবর্জ্জনের কথা দেশের নেতৃবৃন্দের মনে প্রথম উদিত হয়, নিঃসন্দেহ। তবে, কোন স্থান হইতে, কি সূত্রে ইহার প্রথম সূচনা হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। ইহা ঠিক যে, কলিকাতার সেই মহসভার পর হইতেই এই নবদীক্ষা অসাধারণ বিস্তৃতি লাভ করে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সর্ব্বপ্রথমে যে দিন বৈকালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিজ্ঞাপন কলিকাতায় তারের সংবাদে প্রকাশিত হয়, তখন দেশমান্য প্রকৃত-স্বদেশভক্ত 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহোদয় এতদূর অস্থির হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে ঘৃণা ও ক্রোধের বহ্নি এত প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল যে, তিনি সেই রাত্রি গোলদিঘিতে পরিভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তারপর, সতেজে নিজ কাগজে প্রকাশ করিলেন যে, আমরা এমন আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিব, যাহাতে ব্রিটিশ সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। আরও লিখিলেন,—আমরা করকচ্ খাইব তবু লিভারপুলের লবণ খাইব না, গুড় খাইব, বিদেশী চিনি খাইব না; ছালা পরিব, তবু বিলাতী কাপড় পরিব না—ইত্যাদি। অনেকেই হাসিয়াছিলেন; আমরাও ছাত্রাবাসে বসিয়া কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল যে 'সঞ্জীবনীর' সেই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত এই কথাতে এই পণ বঙ্গে বর্ত্তমান বিরাট ও সার্ব্বজনীন আকার ধারণ করিবে। এই আন্দোলনের মূলে, মহাত্মা কৃষ্ণকুমার।

এই স্বদেশী-ব্রত-গ্রহণ পর্ব্বে যে বিধাতার হাত রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। ১৩১০ সালের পৌষ মাসে, যখন রিজলি-স্বাক্ষরিত পরওয়ানা দ্বারা চট্টগ্রাম-বিভাগ এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলাদ্বয়ের আসামে সামিল হওয়ার প্রস্তাব প্রচারিত হয়, তখনও দেশময় একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল। কিন্তু, তাহা প্রধানতঃ কলিকাতার 'জমীদার-সভার' উদ্যোগেই হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া, নানা স্থানে পুস্তিকা বিতরণ করিয়া, তবে তাহাকে স্থায়ী করিতে হইয়াছিল। ইহা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। সে সময়ে কলিকাতার ত্রিপুরাবাসী ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি চাঁদপুর গিয়াছিলাম। লোকদিগকে বহু কষ্টে, কত যত্ন করিয়া যে একত্রিত করিতে হইত, তাহা বলিবার নহে। সে আন্দোলনের বেগও ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। স্বদেশী আন্দোলন কল্পে কিন্তু কলিকাতা হইতে ততদূর [illegible]জন করিতে হয় নাই, দেশ আপনিই জ[illegible] দেখিতে দেখিতে বিলাতী কাপ[illegible] অগ্রি[illegible] বাৎসরিক চুক্তি—Forward contract—বন্ধ হইল। বোম্বাই কলওয়ালারা হঠাৎ এত কাপড় যোগাইতে পারিল না বটে, কিন্তু কোথা হইতে দেশের লোকের মধ্যে ত্যাগের এক অভিনব শিক্ষা আসিল—সকলেই যথাসম্ভব বস্ত্র-সংক্ষেপ সহ্য করিল। যাহা পাওয়া গেল, দ্বিগুণ, তিন-গুণ মূল্যে তাহা আনন্দে ক্রয় করিল। দেশের আশা যুবকবৃন্দ দুঃখ-কষ্ট ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দোকানে ২ চৌকি দিয়া, এ প্রতিজ্ঞার যথার্থ হোমাগ্নি প্রদান করিল। সেই অবধি আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ কি মানুষের কাজ? যে কারাগারের নামে পূর্ব্বে লোক কম্পিত ক[illegible]পতিকৃত, আজ দেশের জন্য, স্বচ্ছন্দে অম্লানবদনে তথায় কত লোক যাইতেছে, কত শত লোক যাইবার জন্য

প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত নিগ্রহ প্রফুল্ল চিত্তে ভোগ করিতেছে।

বিগত বৎসর ২২শে শ্রাবণ তারিখে যখন কলিকাতার দুই সহস্র যুবক ছাত্রবৃন্দ বিভিন্ন বর্ণের উত্তরীয় স্কন্ধে লইয়া, সুদীর্ঘ সারিবদ্ধ হইয়া, গোলদিঘি হইতে টাউনহলের মহাসভায় উপস্থিত হয়, সেই দিন হইতেই দেশের যুবকবৃন্দ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। সে দিনে মৃতপ্রাণ-সঞ্জীবনী মাতৃ-মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে সমস্ত পথ মুখরিত হয় নাই বটে, তবুও সে দিনেই উহার নীরব উদ্বোধন সূচিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয়-নব-উদ্দীপনাক্ষেত্রে গোলদিঘি রাজ-নৈতিক পীঠস্থান। অন্যূন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন সহধ্যায়ীগণ-সহ ইহারই তীরে, অখাদ্য-ভক্ষণ, সুরাপান, ইত্যাদি পাশ্চাত্য-শিক্ষার ও সভ্যতার (?) স্রোত "ইয়ং বেঙ্গল" অর্থাৎ নব্য-বঙ্গ সমাজে প্রচারিত করিয়া প্রাচীনের সহিত নবীনের সমর ঘোষণা করেন। প্রথম অবস্থার যাহা হইবার তাহা হইল। মধুসূদনের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কয়েক পুরুষের লোকেরা দেশ হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন। দেশের সমস্ত চিন্তাবৃত্তি বহির্মুখীন হইল; ইংরাজ তাঁহাদের চক্ষে দেবতা; তাহাদের অনুকরণই কর্ত্তব্য বিবেচিত হইল। কালের কুটিল গতিতে আবার ঠিক সেইস্থানেই বর্ত্তমান বঙ্গীয় যুবক-সমাজ, অর্দ্ধ-শতাব্দীর পরে ঘরে ফিরিয়াছে, দেশ চিনিয়াছে। গোলদিঘির ধারে প্রত্যহ সন্ধ্যা কালে মাতৃমন্দিরে আহ্বান করিয়া, যুবক-বৃন্দকে যে উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হইত, বঙ্গের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আজ তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সে উৎসাহ, সে জলন্ত তেজ, না দেখিলে বুঝা যায় না। দেশের সমস্ত নেতৃবৃন্দের পাদস্পর্শে সেই পীঠস্থান ধন্য। এই গোলদীঘির তীরে দাঁড়াইয়াই অঙ্গচ্ছেদে অশৌচগ্রস্থ যুবকগণ তিন দিন নগ্নপদে উত্তরীয় ধারণ করিয়াছিল; সমস্ত বঙ্গদেশের ছাত্রবৃন্দ সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। এই সহানুভূতি, একপ্রাণতা, একযোগে কার্য্যকারিতার কি মূল্য নাই? যে দিন অঙ্গচ্ছেদের ঘোষণা পত্র-প্রচারিত হইল, সে দিন কলিকাতার সমস্ত কলেজের ছাত্রবৃন্দ দেখিতে দেখিতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, গোলদীঘিতে সমবেত হইল। অদ্ভুত-কর্ম্মী, প্রকৃত-ত্যাগী স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের কার্য্যক্ষেত্রও এই গোলদীঘি। সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া, দুঃখ-কষ্টে নিরপেক্ষ হইয়া, কি প্রকারে স্বদেশসেবা করিতে হয়, তাহা রমাকান্ত রায়ই প্রথম এ দেশে দেখাইয়াছেন। এই গোলদীঘির তীরেই জাতীয়-বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও সূচনা হয়। জাতীয়-সঙ্গীতের মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মায়ের নাম প্রচার করিবার প্রথাও আরম্ভ হয়, এই গোলদীঘি হইতে। সেই জাতীয় উদ্দীপনার বোধন-কালে নিত্য নিত্য গোলদীঘির পশ্চিম পার হইতে জনৈক যুবক সুললিত কণ্ঠে—"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখ রেখ মনে ধ্রুব জ্ঞান"—গান করিত। সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ ভর করিয়া সেই মধুর সঙ্গীত দূর সুদূর পর্য্যন্ত নরনারীর প্রাণমন ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তরতম স্থানে পশিত—পাষাণ হৃদয়েও স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়া উঠিত। তারপর, ক্রমে ক্রমে সহরের নানা স্থানে দলে দলে স্বদেশ-প্রীতিতে মাতোয়ারা ছাত্রবৃন্দ মাতৃ-সঙ্গীতের মিছিলও বাহির করিল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি গোলদীঘি।

যে দিন (১লা সেপ্টেম্বর) অঙ্গচ্ছেদের ঘোষণা-পত্র কলিকাতায় প্রচারিত হইল, সে

দিনই কতিপয় ছাত্রবৃন্দের সহিত হোওয়াইট-ওয়ে কোংএর জনৈক উদ্ধত ফিরিঙ্গির সহিত বচসা হয়। ফিরিঙ্গি অন্যায়ভাবে যুবককে আক্রমণ করিয়া প্রহারে উদ্যত হইল; নিদ্রিত আত্ম সম্মানের ভাব তখনই জাগিল—এ অপমান আর চুরি করা হইবে না—তাহার উপযুক্ত প্রতিদান হাতে হাতে দেওয়া হইল। ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যা-বেলায়, হাবড়ার পোলের নিকট, হাওড়ার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেণ্টিস্ সাহেব গাড়ী হাঁকাইয়া ছাত্রদলের উপর আসিয়া পড়েন। এ অপমানেরও উপযুক্ত প্রতিদান হইল। বঙ্গে আত্ম-সম্মান জ্ঞান উন্মুক্ত ও আত্মশক্তির বীজ রোপিত হইল।

বিজয়াদশমী মারওয়ারী বণিক-সমাজে "লক্ষ্মী দিন" বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। পর বৎসরের প্রায় সমস্ত নূতন চুক্তি এই দিনেই সম্পাদিত হয়। গত বৎসর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই "লক্ষীদিনের" প্রায় সমস্ত নূতন চুক্তিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব-চুক্তিমতে যে সমস্ত বিলাতি কাপড়ের আমদানী হইয়াছিল, আজও তাহা গুদামজাত হইয়া পচিতেছে—অর্থ-পিশাচ বণিকদিগের আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও নূতন চুক্তি করিবার সাহস কুলাইল না। এক সময়ে ইংরেজ-বণিক বাঙ্গালীর পণের কথা লইয়া কত বিদ্রূপ করিয়াছিল, আজ তাহার সত্য সত্যই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। গাত্রজ্বালায় অন্তর্দাহে উৎব্যাস্ত হইয়া, উপায়ান্তর না পাইয়া তাহারা Englishman প্রমুখ সংবাদপত্রে বাঙ্গালীকে নানা প্রকার কটূক্তি করিতেছে।

তারপর ৩০শে আশ্বিনের কথা। লক্ষ লক্ষ প্রজাপুঞ্জের সমবেত মতের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুর এইদিন বঙ্গ-বিভাগ করিলেন। একদিকে রাজশক্তি, অপরদিকে প্রজাশক্তি। প্রজাশক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল। কিন্তু, এই দারুণ আঘাত পাইয়া প্রজাশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই দিনের সেই জাতীয় জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাস, জীবনে ভুলিবার নয়। রাজশক্তি যাহাকে বিভক্ত করিয়াছে, প্রজাশক্তি তাহাকে সর্ব্বথা যুক্ত রাখিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ হইল। যাহা সরকারী আইনে বিভক্ত, "রাখী-বন্ধনে" তাহা যুক্ত হইল। সকলে সমবেত হইয়া পুণ্য-ভাগীরথীতে স্নাত হইয়া, রাখী-বন্ধনে যুক্ত হইয়া বঙ্গে যে নবীন একপ্রাণতা ও জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার শক্তি কত! তাহা আরও ঘনীভূত ও সুপরিচালিত হইলে, এমন কোন অসাধ্য কার্য্য নাই যাহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে না পারিবে। বর্ত্তমান নানা ঘটনাবলীর ভিতরে সে শক্তির কার্য্য-কারিতা এই অল্পদিনের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিধাতার বিশেষ দয়া ব্যতিত, কাহার শক্তিতে সমস্ত বঙ্গদেশের চুক্তি অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইল এবং দেশের আপামর সাধারণ স্বেচ্ছাকৃত উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিল?—তাহাতে কি বিধাতার ইঙ্গিত নাই? সে দিন কলিকাতার যুক্তবঙ্গ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে জনসাধারণের বিপুল উচ্ছ্বাস কি শুধু ক্ষণিক? পঞ্চাশ সহস্র লোক কোথা হইতে, কাহার আদেশে সেই স্থানে সমবেত হইল? দেশের নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে সাধারণ ইতর লোক পর্য্যন্ত সেস্থানে নগ্নপদে কাহার আদেশে সমাগত হইয়াছিল? রুগ্ন ও পীড়িত দেশমান্য আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে যখন স্বেচ্ছা-সেবক-দল বহিয়া আনয়ন করেন, তখন তাহার রুগ্নদেহে ও শুষ্কমুখে

যে জ্যোতি ফুটিয়াছিল, তাহা বর্ণানাতীত। তাহার সে দিনের বক্তৃতা, অগ্নিময়ী ; তাহার সেই জলদ গম্ভীর ঘোষণা,—'আমি সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিতেছি, আমরা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ স্বীকার করিব না এবং আমাদের জাতীয় একতা রক্ষা করিবই করিব ; ইহার প্রতিকূলে যত চেষ্টা হইবে তাহাকে ব্যর্থ করিবই করিব।'—ইহার ভিতরে কত যে, শক্তির বীজ লুক্কাইত ছিল, তাহা কে বলিবে। আনন্দমোহনের দুই দিকে দুই জন ভিষক্প্রবর ঔষধ হস্তে দণ্ডায়মান—পাছে, জনসঙ্ঘের বিপুল উচ্ছ্বাস দর্শনে তাঁহার মূর্চ্ছা হয়। তারপর যখন সেই যুক্ত বঙ্গ-মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন করিতে প্রস্তরে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে। কি মহান দৃশ্য ! বঙ্গের মহারথিগণ তাহার চারি দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে কতিপয় উৎসাহী যুবক বুকের রক্ত দ্বারা সেই মাতৃ-মন্দিরের ভিত্তিকে পূজা করিতে চাহিয়াছিল ; আনন্দ মোহন নিষেধ করিয়া বলিলেন—"এখনও সময় হয় নাই।" তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে সেই স্থানে আর অধিকক্ষণ অবস্থান অনুচিত বিবেচিত হওয়ায়,স্বেচ্ছাসেবকগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে পৌছাইয়া দিয়া আসিল। তিনি বাড়ীতে পৌছিলে পর, কোন ব্যক্তি তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করায়, প্রত্যুত্তর করিলেন, "এখন মরিলেও দুঃখ নাই, আর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে মরিলে দুঃখের অবধি থাকিত না। জীবনের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইতাম না।" কি মহা দেশ-হিতৈষণা !

বঙ্গের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে যে দিন রাখী-বন্ধন ও অরন্ধন-ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দিন প্রথম বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে চিনিল, বাস্তবিক সেই দিনেই সর্ব্ব প্রথমে—"বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার বায়ু বাঙ্গালার ফল, পুণ্য হইল। সে দিনেই বাঙ্গালার ঘর, বাঙলার হাট, বাঙলার বন, বাঙলার মাঠ, বাঙ্গালির প্রাণ, বাঙ্গালির মন,বাঙ্গালির ঘরে সমস্ত ভাই বোন, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় ক্ষেত্রে এক হইল। সে দিনেই ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা, যে সত্য ও পূর্ণ হইবে, তাহারি বীজ রোপিত হইল।

যাহারা সেদিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতা বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে সম্মিলিত লক্ষাধিক লোকের সমাগম সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহারা জাতীয়-জীবন উচ্ছ্বাসের কিছু আভাষ পাইয়াছেন। দিনান্তে অন্ন-সংস্থান হয় না এমন যে মুটে মজুর, তাহারাও তাহাদে[illegible] দেয় অর্দ্ধ পয়সা, [illegible] পয়সা দিবার জন্য কি আবেগে ছুটিয়াছিল ? ধন-ভাণ্ডারের জন্য সে দিন দুই শত টাকার অর্দ্ধ পয়সা সংগৃহীত হইয়াছিল ; ঐ প্রত্যেকটী অর্দ্ধ পয়সার সঙ্গে কত অমূল্য হৃদয় যে দেশের দিকে ছুটিয়াছিল, গণনা করা অসম্ভব। ধনীনির্ধনের এমন সমাগম, মাতৃ-সেবার জন্য এমন উচ্ছ্বাস বঙ্গে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গে যুগান্তর সমাগত।

এতদিন সরকার বাহাদুর এই বিলাতী বর্জ্জনের আন্দোলনকে একটা ভাব-তরঙ্গের অস্থায়ী উচ্ছ্বাস মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল, মনে করিত—It must die its natural death—প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী ইহার বিনাশ অনিবার্য্য। যখন দেখিল

বিজয়ার লক্ষ্মী-দিনে মাড়োয়ারী বণিকগণ বিলাতী মালের নূতন চুক্তি করিল না এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ দিনে বাঙ্গালীগণ 'রাখী-বন্ধনে' জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, যে ভেদনীতি অনুশীলনে, ইংরেজ, ভারতে তাহাদের রাজ-নৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত, তখন সরকার প্রমাদ গণিলেন। তাহারি ফলে, কার্লাইলের ছাত্র-দলনী পরোয়ানা জাহির হইল ; সরকার যে এতকাল আমাদের ছাত্র-বৃন্দের আন্তরিক মঙ্গলের(?)জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মূলে শুধু স্বদেশী-আন্দোলন দমনের একটা ঘৃণিত ইচ্ছা বর্ত্তমান। রাজপুরুষগণ দেখিলেন, যদিও এই স্বদেশী-আন্দোলনের সূচনা বিলাতি-পণ্য বর্জ্জন হইতে, কিন্তু ইহার শেষ কোথায় স্থিরতা নাই। আরও দেখিলেন, ইহা একটী সার্ব্বভৌমিক আন্দোলন—ইহাতে দেশের ধনী নির্ধন সকলই যুক্ত—ইহাতে জাতীয়-জীবনের উন্মেষ অবশ্যম্ভাবী।— স্বার্থ-রক্ষার্থে কাজেই ইহারি মূলচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। স্বদেশী আন্দোলন প্রচারের মূলে, দেশের যুবক-শক্তি যে প্রকৃত কার্য্যকারী এবং ছাত্রবৃন্দই যে মাতৃযজ্ঞের প্রকৃত পুরোহিত, তাহা তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

অধ্যাপক-শ্রেষ্ঠ সিলি তাহার Expansion of the British Empire,—'বৃটীশ-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি'-নামক পুস্তকে, অনেক গবেষণার পর, ভারতশাসনের তিনটী মূল সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিলি লিখিয়াছেন,—আশ্চর্য্যের বিষয়, এত যোজন দূর হইতে মুষ্টিমেয় একদল বণিক গিয়া কি প্রকারে, এত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। তরবারির সাহায্যে তাহা অসম্ভব। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—এ ভারতে জাতীয়তা নাই। একদল অন্য দলের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত নয়। তাহারি ফলে, আমরা ভারত জয় করিয়াছি। ভারতে বৃটীশ-শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তিনটী কাজ করিতে হইবে,—

প্রথমে,—এমন কোন আন্দোলন যেন না জাগিতে পারে, যাহাতে দেশের ধনী নির্ধন সমস্তই যোগ দিতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি করিতে হইবে। National movement— জাতীয়-আন্দোলন—যদি কোন দিন দেখা দেয়, তাহাকে অঙ্কুরেই, ছলে বলে কৌশলে, বিনাশ করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর একটীকে অন্যটীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া রাখিতে হইবে, যেন সমবেত-শক্তি না জাগিতে পারে। যদি কোন গতি-শক্তি জাগে, তবে ইংরাজকে 'with beg and beggage'—যথা-সর্ব্বস্ব লইয়া স্বদেশে ফিরিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ,—সেনা-বিভাগে দেশীয়দিগকে এমন কোন পদ যেন দেওয়া না হয়, যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে কোন প্রকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ,—ড্যালহৌসীর নীতি পরিহার করিয়া, দেশীয় রাজাদিগকে স্ব স্ব স্থানে রাখিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা যাহাতে ইংরেজের হাতে থাকে তাহা করিতে হইবে।

চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অধ্যাপক সিলির মূল সূত্রানুযায়ী এদেশের শাসন-চক্র ঘুরিতেছে। কাজেই স্বদেশী আন্দোলন দমনের এত চেষ্টা।

স্মরণীয় ২২শে শ্রাবণের মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন তাঁহার বক্তৃতার শেষ-অংশে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—Out of evil shall come

good—এই অকল্যাণ হইতেই আমাদের মঙ্গল হইবে—তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। রঙ্গপুরের ছাত্রগণ সর্ব্বপ্রথমে এই অন্যায় কার্লাইল-হুকুম অমান্য করিল। সেজন্য যখন তাহাদিগের জরিমানা হইল, তাহারা অম্লান-বদনে, দেশের মুখ-রক্ষার জন্য, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের পথ-প্রদর্শন করিয়া, ঘৃণা-ভরে সেই সরকারী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহারা অকূল পাথারে ঝাঁপ দিল; বিধাতা তাহাদের উদ্ধারের জন্য,এক জাতীয়-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। অবিভাবকবর্গ নিজেরা ছাত্রগণের শিক্ষার ভার লইলেন। বঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত। বলিতে লজ্জা হয়, যদিও ঘটনাকালে বাঙ্গালা দেশ হইতে তাহারা দুই সহস্র সহানুভূতি জ্ঞাপক টেলিগ্রাফ পাইয়াছিল, কিন্তু, কার্য্যকালে অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাহাদের সহিত যোগ দিয়া প্রকৃত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন।

তারপর, কলিকাতায় অদ্ভুত কর্ম্মী পরলোকগত রমাকান্ত রায় Anti-Circular Society—পরোয়ানা-বিরোধী-সভা—স্থাপিত করিয়া যুবকদিগকে দেশের কাজে সজোরে টানিয়া আনিলেন। যুবকবৃন্দ ত্যাগ-ব্রত ধারণ করিল। দেশী কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া, রৌদ্র বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, যুবকবৃন্দ স্বদেশী-প্রচার ব্রত উদযাপন করিতে লাগিল।

যখন রঙ্গপুরের ছাত্রেরা এরূপভাবে সহানুভূতিশূন্য হইয়া ভাসিতেছে, তাহাদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমীদার মহাশয় সঙ্গীত-সমাজের সম্মুখস্থ মাঠে এক প্রকাণ্ড সভায় বলিলেন,—"আমরা একক হইয়া রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জাতীয়-বিদ্যালয় রক্ষা করিতে পারি, তেমন শক্তি নাই। আমাদের পশ্চাতে যদি দেশের লোক দণ্ডায়মান হন, আমরা শেষ পর্য্যন্ত একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।" তখনকার অবস্থা অতীব শোচনীয়; সহানুভূতির অভাবের ভিতর পড়িয়া, রঙ্গপুর বাঙ্গালীর সম্মান-রক্ষা করিতে পারিবে কি না, সকলে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের তরী অকুল পাথারে ডুবু ডুবু; বুঝিবা অতল-তলে বিলীন হয়। অনেক মন্ত্রণা,অনেক সভা-সমিতি হইল। 'ফিল্ড এণ্ড একাডমির'গৃহে আমাদের শ্রদ্ধেয় দেশভক্ত স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত আবদুল রসুল জাতীয়-শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন। পটলডাঙ্গার মল্লিক বাড়ীতে, কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর নিকট জাতীয়-শিক্ষার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করার উপকারিতা নির্দ্দেশ করিয়া, আবেগময়ী উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু, শিক্ষাভার স্বহস্তে লইবার অন্তরায় হইল, অর্থাভাব। এই অমানিশার অন্ধকারে পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয়-শিক্ষা কল্পে এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইয়া, বঙ্গে নব-আশা-চন্দ্র সমুদিত করিয়া অন্ধকার কিছু দূর করিলেন। আসন্ন-বিপন্ন জাতীয় তরণীর পুরোভাগে সুবোধচন্দ্র কর্ণধার; ধীরে ধীরে জাতীয়-শিক্ষা-পারিষদের সূচনা হইল। গৌরীপুরের পুণ্যশ্লোক মহাভাগ যুবক জমীদার ব্রজেন্দ্রকিশোর,রাজপুরুষদিগের ভ্রূকুটী অগ্রাহ্য করিয়া, অকুতোভয়ে পঞ্চলক্ষ টাকা দান করিলেন; জাতীয়-শিক্ষা-পারিষদ স্থাপিত হইল। ইহার পরে, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি দেশমান্য শ্রীযুক্ত তারকানাথ পালিত মহোদয়

ছুই লক্ষ টাকা দান করিয়া, ইতিমধ্যে বঙ্গীয়-শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কেহ কি ভাবিতে পারিয়াছিল, যে দেশের ধনীবৃন্দ এতদিন রাজপদ-সেবায় অজস্র-ধারে অর্থ ব্যয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, আজ তাঁহারা অন্তর্মুখীন হইয়া দেশসেবার সহায়তা-কল্পে অগ্রসর হইবেন। সমস্তই বিধাতার কৃপা; তাঁহার কৃপায় অসাধ্য সাধিত হয়।

সরকার দেখিলেন, নিগ্রহ অত্যাচার ব্যতীত এই আন্দোলন দমনের আর উপায়ান্তর নাই। কাজেই রঙ্গপুরে ভদ্রলোকদিগকে-পাহারাওয়ালার শ্রেণীভুক্ত করিয়া, মাদারীপুরে বালক অনন্তমোহনের, ময়মনসিংহের যুবক খগেন্দ্রজীবনের, বল্লার শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথের, ময়মনসিংহের এডওয়ার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপিনবিহারী দাস গুপ্তের, বরিশাল জেলার উকিলদ্বয়ের, জলপাইগুড়ীতে ৩টী বালকের, রাজবাড়ী মোহরমল্লার, সিরাজগঞ্জের ডাক্তার শশধর নিয়োগীর, ঢাকা নবসিংহদীয় জমিদারদের, বরিশাল নলছিটের মুসলমান জমীদারদের, মাধবপাশায় অধিবাসীদের, রঙ্গপুর কুড়িগ্রামের স্বদেশভক্তদের, বিভিন্ন উপায়ে, নানা প্রকারের নিগ্রহ নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। অত্যাচারীত বাঙ্গালী তবুও মাতৃ-মন্ত্র ভুলিল না; বরং আরও দৃঢ়কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' বলিতে লাগিল। কলিকাতার কেরোল দারোগা যখন যুবক যতীন্দ্র সিংহকে, ছুই জন চৌকীদার দ্বারা বাঁধিয়া, নীচজনোচিত প্রহার করিতে করিতে বলিয়াছিল,—"Where is your Bande Mataram now"—এখন তোমার বন্দে মাতরম্ কোথায়?—তখন প্রহারে জর্জ্জরিত রক্তাক্ত-কলেবর বীর যতীন্দ্রমোহন নির্ভীকচিত্তে প্রত্যুত্তর করিল,—"Bande Mataram is still in my heart"—বন্দে মাতরম্ এখনও আমার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। যতীন্দ্রমোহন আরও বলিল বন্ধন করিয়া এরূপ কাপুরুষের ন্যায় প্রহার করিতেছ কেন; উন্মুক্তভাবে সমান অবস্থায় আইস,—উভয়ের বল ও শক্তির পরীক্ষা হউক। সেই ছুর্বৃত্ত কেরোলকেও প্রকৃত আত্মতেজ ও শক্তির নিকট নত হইতে হইয়াছিল, কেরোল ইহার বন্ধন-মোচন করিয়া দিল। ময়মনসিংহের বালক খগেন্দ্র জীবনের অকুতোভয় ও সাহস-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, পুলিশের সুপারিণ্টেডেণ্ট প্রহারে উদ্যত পাহারাওয়ালাদ্বয়কে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—"মৎ মার, এ সেরকা বাচ্চা"। বাস্তবিক তাঁহারা এদেশে সিংহ-শাবক। বল্লার রাজেন্দ্রলাল ইংরেজের আদালতে দাঁড়াইয়া Charge-Sheet—অভিযোগ-জ্ঞাপক নথি—সহি করিবার কালে বিলাতী কলম দেখিয়া বলিল, "আমি উহা স্পর্শ করিব না।" আদালতকে বাধ্য হইয়া দেশী কলমের বন্দোবস্ত করিতে হইল। রাজেন্দ্র ইহাতে বিচারকের অসন্তোষের কারণ হইয়া, তাহার নিজের শাস্তির পথ প্রশস্ত করিল, কিন্তু সেদিকে তখন তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি প্রথমে রঙ্গপুরের ছাত্রদের উপকারার্থে, তাহাদের জন্য একটা পন্থা করিবার উদ্দেশ্যে, স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু, যতই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই জনসাধারণের দৃষ্টি বহির্মুখীন হইতে অন্তর্মুখীন হইল। ইংরেজের বিদ্যালয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে হইতেও পারে, যাহাতে জাতীয়-শক্তি উদ্বোধিত হয়, তাহা কখনই শিক্ষা দেওয়া হয় না। বরিশালের গুরখাদের অত্যাচারে লোকের

চক্ষু আরও কুটিল। সকলে বুঝিল, দেশের রাজা, নিজ দেশীয় বণিকমণ্ডলীর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া, অনায়াসে রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন। সেই স্বার্থ সংরক্ষণার্থে ব্যাকুল হইয়া সরকার বাহাদুর নিরপরাধী প্রজা-পুঞ্জকে উৎপীড়িত করিয়া, তাহাদের জাতীয় উদ্দীপনার অবসান করিবার জন্য, তাহা-দিগের মধ্যে, দয়ামায়া বিবর্জ্জিত চরিত্র-বিহীন কতকগুলি গুরখা-সেনা ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা বিনাকারণে বরিশালের উকিল শ্যামাচরণের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া অর্দ্ধমৃত করিল; বিনামূল্যে দোকান-দারদের পণ্যাদি লুণ্ঠন করিল; লোকের বাড়ীর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া, যথাতথা অত্যাচার করিতে লাগিল; রমণীর সতীত্ব-রক্ষা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। রাজশক্তি এ সকলের প্রতিকার করিতে পরাঙ্মুখ। এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপারে, দেশে রাজভক্তি যে কতদূর শিথিল হইয়াছে, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই, বুঝিতে পারা যায়।

এই অত্যাচার অবিচারের ফলে দেশের মধ্যে একটা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষার জন্যই যে শিক্ষা-প্রণালী আমাদের স্বীয় করায়ত্ত হওয়া একান্ত আব-শ্যক, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। ইংরাজ যে কেবল স্বার্থপরবশ হইয়াই শিক্ষা-বিধান করে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল। এই নবজীবনের সঙ্গেসঙ্গেই ইতিহাস-পর্য্যালোচনা দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেখা গেল,—ইংরাজ এদেশে শিক্ষা-বিস্তার করিতে সদাই শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, পাছে দেশের লোকের মানসিক শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, নিজ অধঃপতিত অবস্থার জ্ঞান জাগরিত করে ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়, তবেই ইংরাজকে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। এই জন্য সরকার বাহাদুর সতত ভয়ে ভয়ে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে, উইলবারফোর্স প্রথম যখন ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব করেন, তৎকালীন কোম্পানী বাহাদুরের জনৈক সদস্য বলেন,—"আমরা আমেরিকায় শিক্ষা-বিস্তার করিয়া সেদেশ হারাইয়াছি; ভারতে আর সে ভুল করা হইবে না।" কি উদার নীতি! ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে, লর্ড এলেনবরার সহিত স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনা হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। মহাত্মা দ্বারিকানাথ একদা কলিকাতা টাউন-হলে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর, লাট সাহেবের সাক্ষাতে সেই প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। লাট সাহেব বলিলেন,—"তোমরা যে দেশীয়দিগকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিতে চাও, বাস্তবিক তাহা হইলে, এদেশে আমাদের তিন মাসের অধিক থাকিতে হইবে না।" দ্বারিকানাথ হাসিয়া বলিলেন,—"তিন মাস কেন, তিন সপ্তাহ।" লাট সাহেবও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। যাক্; রাজপুরুষদিগের শিক্ষা-নীতির মূল-সূত্র বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে, রঙ্গপুরের দেখাদেখি, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঢাকা প্রভৃতি নানা স্থানে জাতীয়-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

ফুলার লাট (রাহু কাটিয়া গিয়াছে) যখন সফরে বাহির হইতেন, পূর্ব্ব-বঙ্গ তাঁহাকে কোনরূপ অভিনন্দন-পত্র প্রদান বা অভ্যর্থনা

করে নাই। ইহা জাতীয় জীবনের এক অগ্নি-পরীক্ষা—ইহাতে উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন। এই মনুষ্যত্বের ফলে, আজ ফুলারকে চির-বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। জাতীয়শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারে, ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাঙ্গালী-বিদ্বেষী 'পাইওনিয়ার' পত্রিকাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে—"It is a victory for the popular leaders"— দেশীয় নেতৃবৃন্দের ইহা এক মহা জয়।

স্বদেশ-ভক্ত বীরজনের পূজা, জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ। বিগত ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় গ্রাণ্ড-রঙ্গমঞ্চে স্বদেশের জন্য লাঞ্ছিত দেশভক্তদিগের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তাহাদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিয়া দেশবাসী ধন্য হইয়াছে। এইরূপ নানা স্থানেই উৎপীড়িত স্বদেশ-ভক্তের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের নামে যাহারা ইংরাজ আদালতে শাস্তি পাইয়াছে, তাহাদের কারামুক্তির দিনে অনেকস্থলে সহস্র সহস্র লোক কারাদ্বারে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের আদর অভ্যর্থনা ও পুষ্প-চন্দনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে।

বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বঙ্গবাসী নবজীবন লাভ করিয়াছে। নববর্ষের প্রথম দিনে, পুণ্যভূমি বরিশালে, রাজশক্তি-তাড়িত প্রজাশক্তি এক অভূতপূর্ব্ব বীর্য্য লাভ করিয়াছে। ধৈর্য্যই যে বীর্য্যের প্রকৃত পরিচায়ক,—তাহা পুলিশ-প্রহৃত চিত্তরঞ্জন, ব্রজেন্দ্রনাথ, ফণিভূষণ প্রভৃতি যুবকবৃন্দ বরিশালে দেখাইয়াছে। শরীরের রক্ত দিয়া, ইহারাই প্রকৃত মাতৃপূজা সম্পন্ন করিয়াছে। ভারতের রাজশক্তি যে প্রচলিত আইনের ধার ধারে না, লৌকিকতা মানে না, বিধিবিধান গণে না, যথেচ্ছাচারী হইয়া যে দেশনায়ক সর্ব্বজনপূজ্য সুরেন্দ্র নাথকে পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত করিতে কুণ্ঠিত নয়, নানা স্থানের সমবেত প্রতিনিধিবর্গ স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজা এখন, নানা প্রকারে, সংবাদ-পত্রে, সত্য মিথ্যা কৈফিয়ৎ প্রকাশ করিলেও, এ অবিচার অত্যাচারের কথা দেশের কুটীরে কুটীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সকলে বুঝিয়াছে, যাহা একবার সংঘটিত হইয়াছে, তাহার পৌনঃপুনিক অভিনয় অসম্ভব নহে। পাশববলের বিরুদ্ধে পাশব বল, শক্তির উত্তরে শক্তি ও হিংসার প্রতিহিংসাই প্রকৃত ঔষধ। সেই কারণে, বরিশালের ঘটনার পরে, সকলেই শক্তিসঞ্চারে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন। শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার মানসে, বরিশালের অধিবেশনান্তে, দেশমান্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও 'রাজা' শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অগ্নিময়ী বক্তৃতায় জন-সাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, সাধারণ লোক পর্য্যন্ত রাজনীতির নানা জটিল কূট প্রশ্নসকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইল। এতদিনে বহির্মুখীন চিন্তা-স্রোত অন্তর্মুখীন হইল।

বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে কলিকাতার সঙ্গীত-সমাজের সম্মুখস্থ বৃহৎ মাঠে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে মহারাষ্ট্র-কুলতিলক নির্ভীক-চিত্ত শ্রীযুক্ত বাল-গঙ্গাধর তিলক ও অমরাবতী দেশনায়ক শ্রীযুক্ত খাপর্দ্দে মহোদয় আগমন করেন।

বাঙ্গালীর সহিত মহারাষ্ট্রীয় মিত্রতাবন্ধন এই সূত্রে সুদৃঢ় হইয়াছে। এই উৎসবে তিলক মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"দেশকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, বিদেশী-বর্জ্জন আপনা হইতেই আসিবে। অন্যের অনুগ্রহ-অনুকম্পা ভিক্ষা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-শক্তিতে দীক্ষিত হও।" রাজপুরুষদের দয়াকে তিনি কারা-রুদ্ধ বন্দীর প্রতি কারাধ্যক্ষের দয়ার সহিত তুলনা করেন। অধ্যক্ষ বন্দীকে বেত্রাঘাত করে; পরে, রক্তাক্ত কলেবর-দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে। রাজনৈতিক দয়া এই প্রকার।

এই আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় বঙ্গবাসী অঙ্গচ্ছেদের শোকে অধীর হইয়া অভিমান-সূচক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—"যতদিন না বিভক্ত বঙ্গ যুক্ত হয়, ততদিন বিলাতী-বর্জ্জন করিব।" আশা ছিল, এই প্রতিজ্ঞার ফল-স্বরূপ প্রজাশক্তি কিছু বলশালী হইলেই, রাজা মত হইয়া আসিবেন ও মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন। ক্রমে ক্রমে সে বিশ্বাস অনেকটা শিথিল হইয়াছে। স্বনাম-খ্যাত অধ্যাপক গোখলে মহোদয়, বিগত ১১ই জুলাই তারিখে, লণ্ডন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে, ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে এক সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে এইরূপ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন—ভারতের রাজপুরুষগণ যাহাই বলুক্ না কেন, ভারতের শিক্ষিত-সমাজ পূর্ব্বে কখনও ইংরাজ-শাসন হইতে বিচ্যুত হইতে চায় নাই। *** [illegible] বিধগত শাসনকর্ত্তাদের চরিত্র-মাধুর্য্য, ও [illegible]উদ্দেশ্য [illegible]াহাদের স্বাধীনতার বন্ধু বলিয়া খ্যাতি[illegible] সর্ব্বোপরি, ভারত-শাসনে তাহাদে[illegible] [illegible]াপিত উদার সাম্য-নীতি অবলোকনে [illegible]বাসীর মনে এক ঐন্দ্র-জালিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎ-সঙ্গে, ভারতে ইংরাজ কর্ত্তৃক শান্তি-স্থাপনা, তথায় পাশ্চাত্য সর্ব্বোচ্চ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তন, উচ্চ-বিজ্ঞান-শিক্ষা-বিধানার্থে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বাক্য ও লিপির স্বাধীনতা দান, গমনাগমনের সুবিধার জন্য রেলবর্ত্ম সৃষ্টি, সংবাদ প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাফ ও ডাক-ঘরের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, ইত্যাদি নানা বিষয়ে, এবং এই সমস্তের আনুসঙ্গিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া, কৃতজ্ঞ ভারতবাসী প্রথম অবস্থায় মনে মনে ইংরাজকে যথার্থ ভক্তি করিত। বর্ত্তমান অত্যাচারাদিতে, অবিচারে, রোগ-শোক দুর্ভিক্ষ-যন্ত্রণায় প্রপীড়িত নর-নারীর প্রাণে কিন্তু ক্রমেই সন্দেহ বাড়িতেছে। মরীচিকা, এই কুহক, এই বিজাতীয় মোহ-ইন্দ্র-জাল ক্রমেই অপসারিত হইতেছে। যাহা পূর্ব্বে সুখ-সমৃদ্ধি বলিয়া বিবেচিত হইত, ক্রমে তাহা ভারবহ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভূয়োভূয়ঃ আত্ম-সম্মানে আঘাত, মনুষ্যত্ব-বিকাশের সুযোগের অভাব, জাতীয়তার ক্রমাবনতি, পরাধীনতার জন্য বাণিজ্য-ঘটিত আর্থিক অধোগতি, ইত্যাদি নানা প্রকারের আত্মক্ষতি, ওই কুহকে পড়িয়া, জন-সাধারণ এতদিন ততটা লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু, আজকাল সে সকল নিতান্ত অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে * * * * * *।" গোখলে মহোদয় এই মতপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবর্ণ সত্য। তাহার মতে ভারতবাসী সমস্ত সত্ব ও অধিকার না পাইলে, এই দুরারোগ্য বিদ্বেষ-বীজ মুক্ত হইবে না। তিনি বলেন,—"ভারতবাসীতে এমন অধিকার দিতে হইবে যাহাতে রাজা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজার দাস হইবেন। "Till at last the officials will become

*in fact*, as in theory, the servants of the people"—কিন্তু, হায়, এ আশা দুরাশা মাত্র। জাতিসকলের শক্তি এক সমান না হওয়া পর্য্যন্ত, বুঝিবা দুর্ব্বলের উপর প্রবলের আধিপত্য-বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। তাহাদের ভিতরে কোন ন্যায়, কোন সত্য, কোন ধর্ম্ম বলিয়া জিনিষ থাকে না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার তাহার 'সমাজ-তত্ত্বে' (Socialism) বলিয়াছেন,—"যে সমস্ত ভাব ও কার্য্য আমাদের স্বার্থের-বিরোধী নহে, তাহাকে আমরা সাধু ও মঙ্গল কাজ বলি, এবং যে সকল কার্য্যে আমাদের স্বার্থ ও প্রভাব বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী হয়, তাহাকে আমরা অন্যায় ও অবৈধ কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করি। 'উইলিয়ম টেল' প্রভৃতির পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক উপাখ্যানে, কোন দেশের নিপীড়িত লোকের উৎপীড়ন-কারী রাজশক্তির বিপক্ষে উত্থান ও নির্ভীকতা, স্বদেশ-প্রীতি ও সাহস দেখিলে আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু, আমরাই যদি সেই দেশবাসীকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া থাকি, আর যদি তথায় উইলিয়ম টেলের ন্যায় লোক আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে প্রশংসা ত দূরের কথা—ঘৃণা ও ক্রোধে মন গর্ গর্ করে। আমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হিন্দুরা চেষ্টা পাইলে, তাহাদিগকে পাপাসক্ত জ্ঞান করি। * * *" এই অভিমতের স্বার্থকতা প্রতিপাদনার্থে আমাদিগকে বহু দূরে যাইতে হইবে না। অল্পদিন হইল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায়, এক দিকে বিপ্লবকারী "ডুমার" সভ্যদিগকে, স্বয়ং ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী নানা প্রকারে প্রশংসা করিলেন,—অপরদিকে, আবার তাঁহারই অনুচর ফ্রেডরিক হ্যারিসন ভারতের মাতৃভক্তদিগকে রাষ্ট্রবিপ্লবকারী বলিয়া উক্ত সভায় নানা প্রকার কটূক্তি করিয়াছেন। রাজশক্তির স্বার্থের অন্তরায় যাহাতে সম্ভব হইতে পারে, সে সমস্তের বিরুদ্ধে, ন্যায় ও অন্যায়রূপে, সমর-ঘোষণা ইংরাজ করিবেই করিবে। প্রজাশক্তিকে সে সকল উপেক্ষা করিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। যেখানে রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থের অনুকূল, তথায় রামরাজত্ব বিরাজমান। যে দেশে দুই বিরোধী স্বার্থ পরস্পরে প্রতিযোগীতা করিয়া থাকে, তথায় ঘোর-সংগ্রাম হইবেই হইবে। ভারতে প্রজা-পুঞ্জের এখনও অনেক সহ্য করিতে বাকী আছে।

আজ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র অমরকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গীত গাহিয়াছিলেন। আর কেহ না বুঝিতে পারিলেও, বিচক্ষণ ভবিষ্যৎদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যথা সময়ে ঐ গীতের মর্ম্মে বঙ্গবাসী সকলে অনুপ্রাণিত হইবে। আজ সে শুভদিন উপস্থিত। বহুদিনাবধি বঙ্গের আধুনিক কবিমণ্ডলী,—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি মহরথীগণ—তাঁহাদের সুললিত বীণার ঝঙ্কারে মাতৃ-পূজা করিয়া আসিতেছেন, আজ তাহা সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। [illegible]র-থিয়েটার-প্রমুখ বঙ্গীয় নাট্যশালা, গত কয় বৎসর যাবত জাতীয় উদ্দীপণা পূর্ণ 'প্রতাপাদিত্য'-প্রভৃতি নাটকাদির অভিনয়ে লোকের মনকে বর্ত্তমান আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এই সমস্তের ফলে, এক অভিনব জাতী[illegible] একতা ও আত্মসংবর্দ্ধণার প্রবৃত্তি জাগিয়া [illegible]ঠিয়াছে। ফলে, বার্ণ কোম্পানীর কের[illegible]াণী-মণ্ডলীর, ট্রামওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারী[illegible]-বর্গের, মুদ্রাকরদিগের

ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। অত্যাচারিত পদদলিত বাঙ্গালী,আত্মসম্মানের মূল্য বুঝিয়াছে; একে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হইতে শিখিয়াছে; পরস্পরে সহানুভূতির ভাব জাগিয়াছে।

আমরা বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জন-ব্রত লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে, নানা ঘটনাবৈচিত্রের ভিতর দিয়া,মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চলিয়াছি। বিধাতা স্বয়ং আমাদের সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। মাটী কাটিতে আসিয়া কোহিনুর পাইয়া বসিয়াছি। সে রত্ন আমাদের উদ্ধার করিতেই হইবে, ফিরিলে চলিবে না।

দেশ-প্রীতি জাগিলে, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে, আর সকল সাধনা সিদ্ধ হইবেই হইবে, সকল অভাব পূর্ণ হইবে। আজ এই উৎসবের দিনে, সকলে সম্মিলিত হইয়া, বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তিনি আমাদের স্বদেশ-প্রীতি অটুট রাখুন। বিপদ-ভঞ্জন আমাদের সকল বিপদের অবসান করিবেন। দীন দুর্ব্বলের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন তিনি; তাঁহার কৃপা পাইলে শরীরে শক্তি-সঞ্চার হইবে—হৃদয়ে দৃঢ়তা আসিবে—মনে প্রতিজ্ঞার বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর ভিতরে বিধাতার কি অপার করুণা আমরা দেখিতে পাইলাম। এই এক বৎসরের সাধনের ফল, আমরা শিব-শঙ্করের মঙ্গলময় চরণে নিবেদন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জন উপলক্ষ্য-মাত্র—জাতীয়-জীবন-প্রতিষ্ঠাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন এই উদ্দেশ্য-সাধনে সফলতা লাভ করি।

বিগত বৎসরের সাধনার ফলে বাঙ্গালীর 'বাক্যবীর'-অপবাদ কথঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছে। স্বদেশী জাহাজ আজ চট্টগ্রাম হইতে পণ্য-দ্রব্যাদি লইয়া রেঙ্গুন যাইতেছে। তিনটী কাপড়ের কল স্থাপনের আয়োজন প্রায় সফল হইয়াছে। দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইবার আয়োজন হইতেছে। আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্পাদি দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—এই অল্প সময়ের মধ্যে সে সমস্ত নির্দ্দেশ করা অসাধ্য।

আশা—বুকভরা আশা লইয়া, ভবিষ্যতের দিকে চল আমরা অগ্রসর হই। ভাগ্য-সূর্য্য পূর্ব্বগগণে উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চিমের আবর্ত্তন শেষ হইয়াছে। ঐ শোন আজিও স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জলদ-গম্ভীর স্বরে আকাশ হইতে ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচার করিতেছেন—"আবার পূর্ব্বগগণে বালার্ক কিরণরাশি ধীরে ধীরে এসিয়াকে অনুপ্রাণিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে নবীন তপন মধ্যাহ্ন-গগণে আসিয়া, নিশ্চয়ই এই সুজলা সুফলা, মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা ভারতকে সগৌরবে আলোকিত করিবে।"—জয় দয়াময়, তাই হোক।

আয় ভাই আয়, বাণ ডাকিয়াছে—স্রোতের প্রতিকূলে যাস্‌না; মৃত্যু নিশ্চয়। চল্, নির্ভয়ে চল—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে ভাই হবেই হবে।
যদি পণ করে' থাকিস্
সে পণ তোর রবেই রবে।

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত।

# বঙ্গের কৃষক

(১)

কে গো ওই ধীরি ধীরি সভয় অন্তরে,
সদাই আকুল প্রাণে
হেরিছে আকাশ পানে ?
বিষাদ-কালিমা কেন সদা ও অধরে ?

(২)

কেন আকাশের পানে রয়েছে চাহিয়া ?
কেন কভু হাসে সুখে,
কেন বা কাঁদে ও দুখে,
আকাশের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করিয়া ?

(৩)

যদিও উহার বস্ত্র হয়েছে মলিন,
নাহি মানে ক্ষতি তায় ;
আগ্রহে সদাই চায়
আকাশের মলিনতা বরষা কালীন !

(৪)

বঙ্গের কৃষক ওই হতভাগা হায় !
তাই গো এ হেন বেশে,
আর্ত্ত অনশন-ক্লেশে
সংসার-সাগরে সদা ঘুরিয়া বেড়ায় !

(৫)

একমুষ্টি অন্ন তরে হইয়া পাগল,
ধনীর চরণ ধ'রে
কাতরে কাঁদিয়া মরে ;
সদাই আবদ্ধ রহে ধনীর অর্গল !

(৬)

কি আশ্চর্য্য ! যা' হইতে শস্যের জনম—
বারেক ফিরিয়া হায় !
কেহ না হেরে গো তায় ;
ভুলেছে জগত আজি ধরম করম !

(৭)

বিলাসিতা ক্রোড়ে সুপ্ত যত ধনীগণ
সর্ব্বস্ব হরিয়া লয় ;
কৃষকের গণ্ডে বয়
দর দর অশ্রু ধারা ; কাঁদিতে জীবন।

(৮)

জন্ম মৃত্যু পলে পলে পায় রাজাগণ—
[illegible] [illegible] ৰ,
প্রজা-পুঞ্জের এখনও
বাকী আছে।
আ [illegible] বারণ !
[illegible]াজ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎস[illegible]
[illegible] সাহি[illegible] —

(৯)

[illegible]শ-গৌরব-রবি কৃষি জীবিগণ,
বারেক হইলে হত,
জীব-শ্রেষ্ঠ হবে গত ;
কোন ক্রিয়া বলে কবে হবে তা পূরণ ?

(১০)

সে দিন হ'য়েছে গত এবঙ্গ সংসারে,
যখন প্রত্যেক স্থান,
আহার্য্য করিত দান ;
সবাই করিত পূজা ভারত মাতারে।

(১১)

নাহি ছিল সেই দিন বিলাস-সাধনা,—
'সুজলাম্ সুফলাম্'
ছিল গো বঙ্গের নাম ;
করিত না লোকে কভু দুখ-উপাসনা।

(১২)

এবে সেই বঙ্গ কোথা গিয়াছে লুকায়ে,—
অচিন্ত্য অশনি বান,
দহিছে কৃষক প্রাণ,—
অনন্ত দারিদ্র্য বক্ষে সবারে বসায়ে ?

(১৩)

ব্যসনের দাস এবে যত ধনীগণ
চাহেনা একটিবার—
প্রশমিতে দুখ ভার
কৃষকের হাহা ধ্বনি ভেদিছে গগন।

(১৪)

বঙ্গের ঐশ্বর্য্য কথা খ্যাত চিরদিন;
বলিতে হৃদয় কাঁদে,
সে ধন বিলাস মদে
ব্যয়িত বিলাসীগৃহে হয় প্রতিদিন!

(১৫)

তাই গো ও কৃষি-জীবি কাতর অন্তরে,
শূন্য মনে শূন্য প্রাণে,
হেরিছে আকাশ পানে
দয়ালের দয়া যদি বৃষ্টিরূপে ঝরে।

(১৬)

তাই গো অভাগা স্বেদসিক্ত কলেবরে
ভাবিছে নীরবে বসি,
সংসারের অমানিশি,
ক্লিষ্ট প্রিয়জন মুখ হেরিছে কাতরে।

(১৭)

নিদারুণ অনশনে বিদগ্ধ-পরাণ,
ত্যজিয়া কৃষকগণ
নিজ নিজ পরিজন,
অনন্ত প্রদেশে সদা করিছে পয়ান।

(১৮)

তুমিও মাধুরীমাখা কবিতা সুন্দরী!
পালাও পালাও ত্বরা
তেয়াগি, এ বঙ্গ ধরা,
যেখানে কিছুই নাই কেবল চাতুরী।

শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়

---

# রাষ্ট্রতন্ত্রে নগর ও পল্লী বিপর্য্যয়।

This is a question of a whole continent with its teeming millions and what shall be their present and future fate.
—John Bright.

Let our comprehension be as broad as the country for which we act, our aspirations as high as its certain destiny—let us not be pigmies n a case that calls for men.
i—Danial Webster.

Scarcely anyone can help yielding to the current infatuation of his sect or party. Soon the gravest sage shares the folly of the party with which he acts and with which he worships.
—Waller Bagehot.

বিখ্যাত ফরাসী ভাবুক এবং গ্রন্থকার F. Guizot, ফরাসী সভ্যতায় ইতিহাস নামক বিখ্যাত গ্রন্থে, ফরাসী ইতিহাসে Third Estate এর উৎপত্তি, গতি এবং গঠন সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত গভীরতার সহিত অধ্যয়ন করিবার সময়, বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছে। এত সত্বর যে এই সময় আসিবে, তাহা পূর্ব্বে কল্পনা করা যায় নাই। নানারূপ ঘটনা সাংঘাতের ভিতর দিয়া যখন আমরা অন্ততঃ একটী কূলে উঠিয়া দাঁড়ান সমীচীন স্থির করিয়াছি, তখন এইরূপ কূলের উপর দিয়া যে সমস্ত পুরাতন পথিক চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সংস্থান, উপদেশ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদজালজাত মন্ত্রণা-সম্পদ আমাদের একবার সন্ধান করিয়া লওয়া উচিত। সমরক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে, স্থান প্রভৃতি স্থির এবং নির্ণয়ের জন্য, যেমন অগ্রদূত পাঠান প্রয়োজন, তেমনি বর্ত্তমান কোলাহলের একটু বাহিরে গিয়া, আমাদের অবশ্য গন্তব্য-

কথা; তজ্জন্য হা হুতাশ এবং অশ্রুবিসর্জ্জন করাও সম্প্রতি সময়ের অপব্যবহার।

সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে কোন শস্য-শ্যামল দ্বীপ ভাসিয়া গেলে,তাহাদের যেমন সব কিছু নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হয়—লুপ্ত-চেতনা ভারতবাসীও, মাত্র সম্প্রতি নিজকে একটু জানিতে চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া পাঁচ সহস্র বৎসরের ইতিহাস বহিয়া গেছে,কিন্তু আমাদের জাতীয় বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আমরা বিশেষ অনুভব করি না। একথা সকলেই স্বীকার করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে আমরা বালক মাত্র—আমাদের জাতীয় জীবনের নাকি ইহা শৈশব অবস্থা, কাজেই সাগু কিম্বা এরারুট ছাড়া কোন গুরুপাক খাদ্য আমাদের হজম হইবে না। আমাদের এখন সব বিষয়ে হাতে খড়ি দিতে হইবে। আমরা যেন আন্দামান কিম্বা হিমালয় পর্ব্বতের কিন্নর-সেবিত কোন কূপ হইতে সবে মাত্র উপস্থিত হইয়াছি।

মাঝে মাঝে বিস্মিত হইতে হয়, পঞ্চশত বৎসর পর্য্যন্ত রণ-রক্ত-প্লাবিত বঙ্গভূমির অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়া,—লক্ষাধিক পল্লী এবং গ্রাম্যজীবন সহস্র বৎসরকাল পর্য্যন্ত আত্ম-চেষ্টায় চালাইয়া, আজ আমরা নাকি কিছু জানি না, বুঝি না। এ কথা যদি কেবল বিভিন্নধর্ম্মী বিজেতৃগণের হইত, তবে আমরা চুপ করিতে পারিতাম—কারণ স্বার্থের খাতিরে, কিম্বা 'পলিসির' খাতিরে, তাঁহারা অনেক সময় খাঁটি সত্যকথা;বলিতে পারেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বাঙ্গালার ইতিহাস নামক কোন গ্রন্থ নাই,তখন যুবকগণের মধ্যে National Congressই আমাদের পঞ্চসহস্র বৎসরের সাধনার ফলে লব্ধ পুনর্জ্জন্মের শৈশব মাত্র, এ কথা বিবেচনা করা কিছুই অসম্ভব নহে।

সম্প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন—কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী শত বৎসরের যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্ম্ম-বৈচিত্র-যুক্ত ইতিহাসের সহিত, আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত জাতির রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, কি করিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। আমাদিগকে কেবল বিগত পঞ্চাশ বৎসর হইতে জীবনীরস সংগ্রহ করিতে হইলে, আমরা কর্দ্দমাক্ত পঙ্কিল ক্ষুদ্র ইংরাজরাজ্যের পয়ঃপ্রণালীর জল মাত্র পাইব—সমুদ্র কিম্বা নদীর প্রবল প্রবাহের সোমরস হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। দেশের মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্বের এই প্রবাহ, স্বদেশের ইতিহাস হইতে অনুভব করিতে না পারিলে, আমাদের কিছুতেই আত্ম বিশ্বাস জন্মিবে না।

ইংরাজ রাজের রচিত নগরের পয়ঃপ্রণালী হইতে লব্ধ জীবনীরস সংগ্রহ করিয়া সেদিন মাত্র Indian World নামক কলিকাতার একখানি বিখ্যাত মাসিকপত্রে কোন লেখক লিখিতেছেন :—

National independence is a very good ideal and is the goal of all self-respecting and self-reliant people, but it is conveniently forgotten that many stages of evolution and training have to be passed and got through before that goal can be finally attained.

প্রবন্ধ লেখকের মতে, আমাদের এখনও শৈশব-অবস্থা; আমাদিগকে অনেক স্তর অতিক্রম করিতে হইবে। আমরা এখনও স্বায়ত্ত-শাসন কিম্বা স্বাধীনতার উপযুক্ত নহি। যখন দেখা যাইতেছে, অশিক্ষিত আফগান জাতিও নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া আছে; আফ্রিকা খণ্ডে নিগ্রোরাও Libiria নামক প্রদেশে নিজের দেশ শাসন করিতেছে, তখন আমরা—যাহাদের পশ্চাতে সহস্র বৎসরের ইতিহাস আছে—

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনুপযুক্ত এ কথা নিতান্ত অসত্য এবং কাপুরুষোচিত। ইহাতে দেখা যায়,লেখকের চোখের সাম্‌নে, কেবল ইংরাজী ইতিহাস ভাসিতেছে—দেশের অতীতের সহিত তাঁহার কোন জীবন্ত সম্বন্ধ নাই; বাঙ্গালীর অতীত জীবন তিনি একেবারে অনুভব করেন না।

মোটকথা, আমরা কেবল বর্ত্তমানের দিকে চাহিয়া আছি—কেবলই ইংরাজের ঐশ্বর্য্য কল্পনা করিতেছি। গোলামিতে এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে,নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা পর্য্যন্ত হারাইয়াছি। আমেরিকার প্রসিদ্ধ Bryan সাহেব কিছুদিন ভারতে থাকিয়া বলিতেছেন :—

The request for self-government is not granted—why?—because a local Government composed of natives, selected by the people, would protest against so large an army, reduce the taxes and put Indians, at lower salaries, into places now held by Europeans. It is the fear of what an Indian local Government would do, that prevents that experiment.

এই হচ্ছে যথার্থ কারণ। অন্য সব কথা, ফাঁকা আওয়াজ। বিগত কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে Smedley সাহেব, যুগাগত আত্মশাসন কার্য্যে অভ্যস্ত আমাদের ক্ষমতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

When I go back to my country, I will tell my countrymen, that you are able, that you have much ability and you are prepared in every way to manage your own affairs.

আমাদের পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে কিছুকাল হইল Sir William Wedderburn, বিলাতের এক সভায় বলিয়াছিলেন—

The Villages were self-governing little republics. There had long been a great deal of local self-government in India, such as we were trying to set up in England, for every village had its Parish Council.

Indian World এর লেথক বলিতেছেন, আমাদিগকে নানা evolution ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু নানা evolution এর ভিতর দিয়া পাঁচ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আসিয়া যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা কি তাঁহার নূতন কল্পিত evolution-রূপী সঙ্কীর্ণ Cheviot শৈলের গুহায় যাইতে হইলে ছাড়িয়া দিতে হইবে? তাঁহার evolution কার্য্যের প্রারম্ভ কি, খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৬ সাল? আলোক ও বায়ুর ন্যায় যাহা মানবের সমাজ-হিতের পক্ষে সর্ব্ব প্রথম দরকার, তাঁহার মতে, তাহা পাইতে আমাদিগকে কয়টী সমুদ্র এবং কয়টি নদীর পারে যাইতে হইবে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে এই সব সঙ্কীর্ণ আদর্শ এমনই মারাত্মকভাবে স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালার মনুষ্যত্বপ্রবাহ, প্রবল বন্যার ন্যায়,দেশকে প্লাবিত না করিলে, ক্ষুদ্র আলোকে, ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে, আমরা সব হারাইয়া বসিব।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা দেশের সমগ্র শরীর সুস্থ ও সবল ছিল। স্থানে স্থানে প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ আংশিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত। নবাবী আমলে, সমগ্র বঙ্গ দেশে দশটী ফৌজদারী ছিল। ইস্‌লামাবাদ্ বা চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর বা রাঙ্গামাটী, জেলালগড় বা পূর্ণিয়া, আকবরনগর, রাজমহল, তাজমাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলী। এই সব স্থানে একজন ফৌজদার থাকিতেন—কিন্তু ইহারা আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অপেক্ষা অনেক ভিন্ন পদার্থ ছিলেন। ফৌজদারগণের মধ্যে অনেকেই, কেহ বা এক হাজারী, কেহ দোহাজারী, কেহ বা চার হাজারী পর্য্যন্ত মনসবদারী বা সেনানায়কত্ব প্রাপ্ত হইতেন। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসীগণ সৈনিকের কার্য্য করিতে পারিতেন।

বস্তুতঃ, এই ফৌজদারীগুলি এক একটি boroughর ন্যায় ছিল।

এই সব স্থান এখনও আছে, কিন্তু তাহা লুণ্ঠিত-মুকুট ও ভগ্নাবশেষ মাত্র। কি করিয়া ইহাদের ভিতর হইতে, ইহাদের শক্তি লইয়া, জাতিগঠনের উপাদান নির্ম্মান করা যাইতে পারে, তাহা ক্রমশঃ আলোচিত হইবে। বাঙ্গালার প্রাচীন জমিদারগণকে স্থূলতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়*—

(১) প্রাচীন স্বাধীন ও করদরাজগণ—ইহারা অধীন হইয়াও স্বরাজ্যের আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তে স্বাধীন রাজার মত ব্যবহার করিতেন।

(২) হিন্দু ও মুসলমান সামন্তগণ—ইঁহারাও প্রথম শ্রেণীর রাজাগণের ন্যায় স্বকীয় অধিকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই থাকিতেন।

(৩) রাজস্ব আদায়কারী আমিলগণ।

(৪) অর্থশালী ব্যক্তিগণ।

কাজেই যে দেশ অহরহঃ এইরূপ জীবন্ত অস্তিত্বের শোণিত প্রবাহ অনুভব করিত, সে দেশে বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ অল্পাধিক ভাবে সর্ব্বত্রই চলিত—সে দেশে Battle of Waterloo হয় নাই বলিয়া,আমাদের তেমন ক্ষোভ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিভিন্ন ইতিহাস পড়িয়া আমরা কেবল Napoleon ও Nelson খুঁজিতেছি—পত্রে পত্রে শোণিতাক্ষরে বাঙ্গালার যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করি না।

যে বিপ্লবে আমরা আমাদের সব কিছু হারাইয়া নিজকে সম্প্রতি বালক বিবেচনা করিতেছি, সে বিপ্লবে দেশের আরো আর একটি ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যাহা আলোচনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

দেশ-কলেবরের সর্ব্বত্র শক্তি বিকশিত করিয়া তুলিতে হইলে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে শক্তিমান করিয়া তোলা প্রয়োজন। কেবল স্থান বিশেষকে অনাবশ্যক স্ফীত করিলে, দেশের স্বাস্থ্য-সঞ্চার হইবে না। ইংরাজ রাজের ষ্টীম রোলারের (Steam-Roller) ঘর্ষণে, বাঙ্গালা দেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সহর গুলির প্রাচীন বিশেষত্ব লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কাজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; ইহার প্রতিবিধান প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, জর্ম্মণী, ফ্রান্স প্রভৃতিস্থানের ইতিহাসে borough গুলি অসাধারণ কাজ করিয়াছিল এবং ইহাও বলিয়াছি, বাঙ্গালার বিভিন্ন সহরগুলি, নানা কারণে, কালক্রমে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং নির্ভিকতা প্রভৃতি হারাইয়া, অন্তঃসার শূন্য ছবির ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

ফরাসী প্রদেশের ন্যায় আমাদের যে যে একটা Third Estate গঠন করিয়া তুলিতে হইবে, এতৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কাজেই, বর্ত্তমান স্বদেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলোচনা প্রয়োজন। ইউরোপে ফরাসী নগরগুলি, আমাদের সহরগুলির ন্যায়, অপেক্ষাকৃত বিশেষত্ব-বিহীন থাকিলেও, তাহা হইতে ধীরে ধীরে বিরাট সমাজশক্তি গঠন করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহাতে আমাদের নিতান্ত আশা ও আনন্দ হয়।

কারণ, ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অলক্ষ্যে আমাদের ইতিহাস বিস্মৃতি ঘটিতেছিল, তেমনি পূর্ব্বোক্ত স্থানগুলিও ধীরে ধীরে লুপ্তবীর্য্য এবং তথাকার জমিদার এবং মনসবদারগণ হৃতসৌভাগ্য ও হতশ্রী হইয়া পড়িতে ছিল। ইহা শুধু ওখানেই পর্য্যবসিত হয় নাই। এতদিন পল্লীসমাজ

* বাঙ্গালার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

পঞ্চায়েত প্রভৃতির সাহায্যে এবং কতকটা সামাজিক উৎসব-আনন্দে পল্লীর যে সমস্ত অভাব মোচন করিয়া আসিতেছিল—যে জন্য কেবল বিধাতার আশীর্ব্বাদ ছাড়া, কাহার নিকট করজোড় করিতে হয় নাই—আজ সে সমাজ, পথ ঘাট পুকুর প্রভৃতি বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা এবং এইজন্য অহরহঃ দরখাস্ত করিয়া, দিন দিন বিকৃত হইতেছে।

সম্প্রতি বর্ত্তমান সভ্যতার আকর্ষণে সকলেই নগরের দিকে ছুটিয়াছে—পথ ঘাট মাঠ অনাদৃত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইহাতে দেশের প্রভূত অমঙ্গল—ইহাতে সমগ্র দেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কাজেই, জাতিগঠন-কার্য্যে বহু অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

যে দেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ,প্রত্যেক স্থান যেখানে পূর্ণ মনুষ্যত্বে বিকশিত, সে দেশে এরূপ নগরমুখী জনপ্রবাহ অস্বাস্থ্যকর নহে—অন্ততঃ জাতির আত্মরক্ষা এবং আত্মাবলম্বন কার্য্যে তেমন বাধা দেয়না। কিন্তু, যে দেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্থ ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্মস্থানগুলি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া গেছে, সে দেশে যাহা কিছু অবশিষ্ট, তাহা স্থানে স্থানে না থাকিয়া, এক জায়গায় হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দিলে, ব্যক্তিগত হিসাবে ক্ষণস্থায়ী বাহাবা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সমগ্র জাতিগত হিসাবে, তাহা পাপঃ বই আর কিছুই নহে।

সময় ছিল,যখন সমগ্র বাঙ্গলাদেশ জয় করা সহজ ছিলনা। পশ্চিমে মেদিনীপুরকে আক্রমণ কর,কিম্বা পূর্ব্বে চট্টগ্রামকে আক্রমণ কর, উভয়দিক হইতে তুল্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, উভয় স্থান রাজধানীর দিকে না চাহিয়া, নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে, কারণ—আত্মরক্ষা কার্য্যে লিখিবার কিছুই নাই—তাহা স্বভাবতঃই সর্ব্বত্র চর্চ্চা হইত। এইজন্য দু'একটি জায়গা আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশ অধিকার করা অসম্ভব ছিল।

এইজন্য প্রত্যেক স্থানের জনসাধারণ অস্ত্রেশস্ত্রে নিপুণ ছিল—প্রত্যেক স্থানের সবলতা দুর্ব্বলতা জানিয়া নিজের অবস্থানুযায়ী অভাব অসুবিধা দূর করিত। এক কথায় তখনকার শক্তি, সমগ্র বাঙ্গলা দেশে প্রবাহিত হইত—স্থান বিশেষে নিবদ্ধ হইয়া, নিজকে দুর্ব্বল করিতে না।

এইজন্যই স্থলবিশেষ অধিকৃত হইলেও দেশের কিছু পরিবর্ত্তন হইত না, আমাদের জাতীয় নিরত্ন যদি নানাদিকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে স্থলবিশেষ হইতে কিছু চুরি হইলেও, আমাদের অনেক থাকিয়া যায়—কিন্তু কৃপণের ন্যায়, স্বার্থপরের ন্যায়, যদি আমরা অগ্রে একটি জায়গায় আমাদের সমগ্র অর্থসঞ্চিত করিয়া রাখি, তবে সে জায়গায় ডাকাত পড়িলে, একদিনেই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইব।

বস্তুতঃ, এইরূপ অবস্থা কোনকালে কোন সুস্থ দেশে থাকিতে পারেনা। জর্ম্মণী, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রতীচ্য-প্রদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছি—প্রাচ্য-খণ্ডেও জাপান, চীন, আফগানিস্থান এবং ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে, তাহা উপলব্ধি হইবে। প্রত্যেক স্থানেই কতকগুলি বিশেষ জায়গা, কতকগুলি বিশেষ বিষয় শিক্ষা দিতেছে এবং প্রত্যেকের এই অখণ্ড শক্তি-সংহতি সমগ্র দেশকে অধৃষ্য করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের দেশেও এইরূপ অবস্থা ছিল,—

কিন্তু, এই শত বৎসরের ইতিহাসে ভয়ানক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ,এই মৃত্যুমুখী গতি, সমুচ্চ আকাশ হইতে প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের গতির ন্যায়, উত্তরোত্তর তীব্রতর হইয়া পড়িতেছে।

এই বিষয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে জমিদারগণ একে একে নিজের সমগ্র ক্ষমতা এবং উপযোগিতা হারাইয়াছে। যতই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া, ধীরে ধীরে দেশকে নিরস্ত্র করিয়া, দেশের ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার ভার পর্য্যন্ত নিজের হাতে লইল, ততই জমিদাগণ ধীরে ধীরে গ্রাম এবং পল্লী হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল। দেশে Permanent Settlement নামক ব্যাপার সেদিন ছিল—ক্রমশঃ তাহা road cess প্রভৃতি দ্বারা চূর্ণ করা হইল। Bengal Tenancy Act এর দ্বারা জমিদার প্রজার মোকদ্দমা লাগিয়া গেল। এই জন্যই, এমত অবস্থায়, গবর্ণমেণ্টের শুধু কামধেনু হইয়া থাকা অপেক্ষা absolutef landlord হওয়া শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইয়াছে।

অবশ্য, একথা সকলেই জানেন, অনেক ইংরেজ, জমিদারগণের বহুসংখ্যক প্রজার উপর আধিপত্য সহ্য করিতে পারে না—এজন্য নূতন settlementএ গভর্ণমেণ্ট একেবারে প্রজার সহিত সম্বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে—middle class নামক কোন পদার্থ রাখিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

কিন্তু চোরের উপর রাগ করিয়া অনাবৃত ভাবে ভূমিতলে আহার করিবার পলিসিটি কোন কালেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই সমস্ত আইন হইতেছে এবং হইবে। যেখানে বিজেতার সহিত বিজিতের সম্পর্ক, সেইখানে আইনের সর্পগতি জগতের ইতিহাসে নূতন নহে। এই সমস্ত অসুবিধার ভিতর দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

যে middle classকে গভর্ণমেণ্ট ভয় করেন এবং যাহার কোনরূপ প্রতিপত্তি গভর্ণমেণ্টের চক্ষুঃশূল, সেই middle class দেশের যথার্থ অবলম্বন—সেই middle class দেশে সুস্থজাতি গঠন করিয়া তুলিবে। কিন্তু এই মধ্য-শ্রেণীর শক্তি-অর্জ্জনের জন্য স্থানে স্থানে যে সব কেন্দ্র ছিল ইতিহাস-বিপর্য্যয়ে আজ তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেছে।

সম্প্রতি জমিদারগণের মধ্যে ক্ষমতাশালী অনেকেই *absentee landlord* হইয়া পড়িয়াছেন। উপস্থিত থাকা যখন নিরাপদ নহে, তখন অনুপস্থিত থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

কিন্তু এই অনুপস্থিতিই—আমি কেবল জমিদারদের কথা বলিতেছিনা—উপস্থিতকে বিভীষিকপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে বৃক্ষাদির সমীপবর্ত্তী যে যে স্থানে ভূত প্রেতাদির চিত্র দেখা যায়, সেস্থানে অগ্রসর হইয়া, বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ দরকার—কারণ জগতে ভূতেরও অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কাজেই স্থানে স্থানে প্রবল মহীরুহের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবার লোক অত্যন্ত দরকার—যাহার আশ্রয়ে লতাবিতান এবং চতুর্দ্দিকে সঙ্কোচিত পল্লী-শ্রী বিকশিত হইয়া উঠিবে। অবশ্য বজ্র কণা মস্তকে সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু ঐ রক্তে সমগ্রদেশ শস্যশ্যামল হইয়া উঠিবে—তাহাতে নব নব শক্তি জন্মগ্রহণ করিবে। ইহাই জগতের নিয়ম।

একেবারে মাথা বাড়াইয়া বড় হওয়ার দৃশ্য জগতে কোন জাতির ভিতরই দেখা

যায় নাই। অত্যাচার অবিচার রক্তপাত প্রভৃতি হইতেই কার্য্যের সূচনা হয়। সেদিন সেই সামান্য রক্তপাত হইতে যদি সমগ্র জাতি দ্বিগুণবল লাভ করিয়া থাকে এবং ঐ অত-টুকুতেই যদি বন্দেমাতরম্ সার্কুলার রহিত হয়, তবে যখন একে একে দেশের উচ্চ করতালি এবং আনন্দ কল্লোলের মধ্যে যুবকগণ আত্ম বিসর্জ্জন করিতে যাইবে এবং আত্ম বিসর্জ্জন করিবে, তখন দেশে কর্ম্মের কি প্রবল উদ্বেলিত প্রবাহ উঠিবে, কল্পনা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

আরও একটা দৃষ্টান্ত দিব। অনেকেই জানেন সম্প্রতি "বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী" নামক সমুদ্রগামী ষ্টীমার চালাইবার জন্য এক বিরাট্ কোম্পানী চট্টগ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে ইহা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। পদ্মার উপর ছোট ছোট যে সব ষ্টীমার চলিতেছে, তাহার এক শত কি দুই শত একত্র করিলে আয়তনে এই কোম্পানীর এক একখানি ষ্টীমারের সমকক্ষ হইতে পারে। মোট কথা ইহাদের আয়তন এক একখানি বড় বড় যুদ্ধ জাহাজের ন্যায়। জানি না, এমন সময় কখনও আসিবে কিনা, যখন বঙ্গোপসাগরের সমগ্র ষ্টীমার-শ্রেণী বাঙ্গালীর হইবে। বাঙ্গালীই সব চালাইবে—ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু বাঙ্গালীর হাত দিয়া যাইবে।

সে দিন হয়ত দূরে—হয়ত বহু দূরেও নহে। কিন্তু এই ষ্টীমার কোম্পানী হইতেই তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই ইহার রক্তাক্ত ইতিহাস অনেকের মনোরঞ্জন করিতে পারে। তাহা উল্লেখ করিতে আমার সেই দৃশ্য মনে পড়িতেছে, যখন অসংখ্য লোক-শ্রেণী চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীতীরে দাঁড়াইয়া অশ্রান্ত "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যে কোম্পানীর প্রথম ষ্টীমার (Proteus) 'প্রটিয়স'কে বরণ করিয়া লইতেছিল এবং স্বচ্ছ শুভ্র রজত ধবলা কর্ণফুলী নদীবক্ষে Proteus সমর-বিজয়ী রণতরীর ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। সে আনন্দে শরীর এখনও কণ্টকিত হয়।

সাহেব কোম্পানীর ষ্টীমারে নানারূপ অত্যাচার হয়,ইহা সর্ব্ববিদিত। একবার কয়েক জন প্যাসেঞ্জার অত্যাচার উৎপাত প্রভৃতি কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে আকিয়াব রেঙ্গুন এবং চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান উচ্চ নীচ সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনা হয়। রেঙ্গুনে যে দিন এই অত্যাচার নিবারণের জন্য নূতন ষ্টীমার কোম্পানী স্থাপন করিবার কথা হয়, সে দিন টেবিলের উপর অর্থরাশি স্তূপাকার হইয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, দুইটি লোকের রক্তের বিনিময়ে এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

যেখানে কর্ম্মের প্রসারে ভয় কিম্বা অসুবিধা রহিয়াছে, সেখানে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, কারণ তাহাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ এবং তাহার ফল সর্ব্বদাই মঙ্গলজনক। যেখানে শয্যা হইতে উঠিবার সময় বৈতালিক দল আত্মকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া উঠে না—যেখানে অহরহঃ দুঃখদৈন্য দুর্ব্বল জাতিকে দুর্ব্বলতর করিয়া তুলিতেছে,—যেখানে পূতিগন্ধপূর্ণ জঙ্গলময় রাস্তাঘাট যাতায়াতকে কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে,—যেখানে ম্যালেরিয়ার জল তরঙ্গ ধ্বনি এবং কোন শ্রদ্ধেয় লেখকের উল্লিখিত মশকের ব্যাণ্ডবাদ্য মাত্র শোনা যায়, ইলেকট্রিক এবং গ্যাসালোকের স্থলে যে নিকটস্থ খদ্যোতশ্রেণী কিম্বা বহু দূরস্থ নক্ষত্রগুলি অভিষিক্ত—যেখানে কলেরা প্রভৃতির

আক্রমণে অদৃষ্টবাদী এই জাতির অদৃষ্টের উপর নির্ভর বৃত্তি বাড়িয়া যাইতেছে—সেখানে, সেই অনাদৃত পল্লীতে, কাজ করিতে একটু ক্ষমতা চাহি—কারণ স্বদেশহিতৈষণা নামক প্রবৃত্তিটি সব জায়গায় খাঁটি নহে। বহুস্থলে তাহা আত্মপ্রশংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম জাত হয়। কাজেই যেখানে আত্ম-প্রশংসার জয়ঢাক মুহুর্মুহু বাজে না, সেখানে তথাকথিত Patriotism এর প্রধান উপাদানই চলিয়া যায়।

নদী তীরস্থ কোমল, স্নিগ্ধ সরস মৃত্তিকায় বপ্রক্রীড়া চলে, কিন্তু যেখানে কুঞ্চিত-ললাট রুক্ষ কর্কশ মর্ম্মর শৈল-কলেবর দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে আত্ম সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আত্ম প্রশংসার জয়বাদ্য চারিদিকে বাজাইলেও সেখানকার গম্যপথ সরল হইবে না।

অথচ আমাদের অগ্রবর্ত্তী বাধাবিঘ্ন যে যথার্থ প্রস্তরের ন্যায়, তাহা আমরা স্বীকার করিয়াও ভুলিয়া যাই। কারণ, ভুলিয়া গেলে অনেক আপদ চুকিয়া যায়। কথিত আছে পক্ষীবিশেষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিবেচনা করে যে, জগতের সকলের চক্ষু বুঝি দৃষ্টিহীন হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কার্য্য বেশীদূর অগ্রসর হয় না।

সাহসের সহিত যে পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতেই হইবে, সে পথে সর্ব্ব প্রকার আত্ম প্রলোভন দূর করা প্রয়োজন। নিজেদের মধ্যে যাহা কিছু ভেক্ রহিয়াছে, তাহা উন্মূলিত করিয়া ধীরে ধীরে নিজকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

এইজন্য আমার মতে প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে আত্ম প্রশংসা সেবার প্রবৃত্তিটি জয় করা দরকার। সংবাদ পত্রে প্রশংসা—বিশেষতঃ বর্ত্তমান অনুচ্চ আদর্শ সংবাদ পত্র সমূহের—দেশকৃত্যের একমাত্র পুরস্কার নহে, এ কথা আমাদের দেশের যুবকগণ কখন বুঝিবে? আমরা জানি, কলিকাতা হইতে অনেক যুবক মফঃস্বলে বক্তৃতা দিতে আসিয়া—সম্প্রতি কিছুকাল বোধ হয় ইহাই স্বদেশপ্রেম বলিয়া অভিহিত হইবে—কলিকাতার সংবাদ পত্রে নিজেরাই আত্ম ব্যাখ্যা এবং electrifiped the audience প্রভৃতি লিখিয়া পাঠান। আর চারিদিকে উচ্চ কলরব উঠিয়া যায়। দেশকৃত্যের মধ্যে যে ভগবানের একটা প্রেরণা আছে, ইহা যে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা—ইহা যে অর্ঘ্য এবং যথার্থতঃ দেশের চরম লক্ষ্যের হিসাবে যে ইহা হয়ত ধূলিকণার পরিমাণও নহে, তাহা ভুলিয়া এই সমস্ত কাণ্ড করিতে যে একটু লজ্জাও হয় না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়। অনেকে জানে না, কারণ সংবাদ পত্রে তাহাদের জয়ডঙ্কা বাজে না—যে গ্রামে গ্রামে এমন সব সহজ সুন্দর প্রাণস্পর্শী বক্তা রহিয়াছে, যাঁহার তুলনায় প্রাদেশিক সমিতির বক্তাস্তূপ নগণ্য। ইহাদের অন্য কোন সান্ত্বনা নাই, গ্রামে গ্রামে কার্য্য করিয়া কেবল মাত্র ভগবানের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ইঁহারা জীবনপথে চলিয়াছে। জানি না, কখন পল্লীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইবে এবং সাধারণের মন ফিরিবে। জানি না, কখন যথার্থ কার্য্যের জন্য যুবক দল "নিন্দা প্রশংসার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া দলে দলে পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইবে এবং শিক্ষায় দীক্ষায় আশায় আনন্দে সাধারণের হৃদয় ভরপুর করিয়া তুলিবে।

যোসেফ ম্যাটসিনি সমগ্র জীবন ইতালীর জন্য প্রাণপাত করিয়া যে প্রশংসা অর্জ্জন

করিতে পারেন নাই, আজ কথায় কথায় যদি তদপেক্ষা অধিক প্রশংসা দেওয়া হয়, তবে শুস্ক প্রশংসা বা appreciation হইতে কার্য্যকরী যে শক্তি জন্মে, তাহারও মুখ বন্ধ করা হয়। এ বিষয়টি কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক আইরিষম্যান্ Bengaleeপত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সহরগুলি ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে শৌর্য্যে বীর্য্যে ঐশ্বর্য্যে দিন দিন ম্রিয়মান হইয়া সম্প্রতি একেবারে ছায়ার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের সম্মিলিত শ্মশানের উপর ইংরাজের অর্থাপহরণের প্রধান দ্বার স্বরূপ কলিকাতা নগর উঠিয়াছে। এই রাজধানীতে সমস্ত সহরের লোক রহিয়াছে, এবং ইহার ব্যবসা বাণিজ্য, ট্রাম ও ড্রাম প্রভৃতিকে স্বরচিত মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে।

একটা প্রবল স্রোত একদিকে প্রবাহিত হইলে, তাহাকে ফিরান বড় মুস্কিল, তাহা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু এই মহানগর চুম্বক হওয়াতে নানা ঐশ্বর্য্য ঐখনে গিয়া ভস্মসাৎ হইতেছে—অনেক জাহাজ উহার প্রস্তর-হৃদয়ে চূর্ণীকৃত হইতেছে।

অবশ্য যাহা রাজধানী এবং বন্দর, তাহা ব্যবসা বাণিজ্যে শীর্ষস্থানীয় না হইয়া পারেনা। তাহা স্বাভাবিক এবং তাহাতে দেশে মনুষ্যত্বগঠনের পথে বিশেষ হানি হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নগরে শুধু ব্যবসা বাণিজ্যজাত শক্তিমাত্র কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, এমন নহে।

জাতিশরীর গঠনের জন্য সমগ্র দেশের মাঝে কতকগুলি স্থান সম্মানের সহিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে এবং এই জন্য ইহাদের অভিমুখে একটা আকর্ষণ বজায় রাখিতে পারিলে, জাতিগঠনের সহায়তা হয়—নচেৎ নগর ছাড়া, পল্লী মাত্রই মফঃস্বল মাত্রই যদি ধিকৃত হয়, তবে দেশের মধ্যে আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল।

প্রত্যেক দেশেই কোন কোন বিষয়ের জন্য কোন কোন স্থান বিখ্যাত রহিয়াছে। এইজন্য এই সমস্ত স্থান সম্মানের সহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া, সকলেই বিশেষ বিষয়-শিক্ষার কিম্বা অনুশীলনের জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়—দেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, দেশের প্রত্যেক স্থানই পরিচিত হইয়া উঠে। পরিচয়ের সঙ্গেই যোগ এবং যোগের সহিত দেশময় বিপুল শক্তি জাগিয়া উঠে। উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হইবে; যেমন ইংলণ্ডের জাতি কলেবরে লণ্ডনের আসন অতি ক্ষুদ্র। ইহার জনসংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য নগর হইতে অধিক, ইহার ব্যবসা বাণিজ্য, অভ্রভেদী হর্ম্ম্যশ্রেণী, ধূময়মান চিম্‌নী বহুল আকাশ ইহার ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের সকল নগরকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের শক্তি, ইংলণ্ডের মনুষ্যত্ব বা এক কথায় ইংলণ্ডের যুবকগণ লণ্ডন সহরে তৈয়ার হয় না। যে জীবনে কখনও লণ্ডনে কিছুকাল বাস করে নাই, তাহার যথোপযুক্ত সম্মান প্রাপ্তির পক্ষে কোন বাধা সেখানে নাই। ইংলণ্ডের রাজধানী না হইলেও জ্ঞানের জন্য কেম্ব্রিজ, অক্‌স্‌ফোর্ড, ডারহাম্ প্রভৃতি স্থান রহিয়াছে। শিল্প শিক্ষার জন্য ম্যান্‌চেষ্টার, প্রেষ্টন প্রভৃতি স্থান; লৌহজাত শিল্পের জন্য বর্মিংহাম, সেফিল্ড; জাহাজ প্রস্তুতের জন্য বার্কেনহেড্, পেম্‌ব্রোক্; রণতরী সংগ্রহের জন্য পোর্টস্‌মাউথ

প্লিমাউথ, ডিভনপোর্ট; সামরিক অস্ত্রশস্ত্রাদির জন্য চাথম্, উলউইচ্ প্রভৃতি স্থান সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এক একটি বিষয়ের জন্য এক একটী স্থান সর্ব্বশীর্ষ স্থানীয় হওয়াতে প্রত্যেক স্থানই সম্মানের সহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কাজেই প্রত্যেক স্থানই মনুষ্যত্বগঠনের উপযোগী। এই জন্য ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র উত্তেজনা আত্মবিশ্বাস এবং কাজে-কাজেই শক্তি উদ্বোধিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। ইংলণ্ডে প্রত্যেক স্থানের উপরই নজর রাখিতে হয়—প্রত্যেক স্থানকেই কোন কোন বিষয়ের জন্য শীর্ষস্থানে রাখিতে হয়। আমার বিশ্বাস, সমগ্র দেশ কলেবরকে সম্মানের সহিত না দেখিলে, মনুষ্যত্বগঠন এবং জাতিগঠন অসম্ভব। দৃষ্টান্ত পরে দিতেছি।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি বর্ত্তমান ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর পক্ষেও খাটে।

জাপান সাম্রাজ্যেও টোকিও নগর একমাত্র ধ্রুবতারা নহে। জাপানী যুবকগণ টোকিও নগরে তৈয়ার হয় না। সমগ্র জাপান-শরীর সুস্থ স্বাধীন সবল অস্তিত্বে দণ্ডায়মান। যেখানে যাও দেখিবে মানুষ গঠনের পক্ষে কোন বাধা নাই; সর্ব্বত্র আলোকিত এবং প্রত্যেক স্থান সম্মানের জিনিষ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, শিক্ষা দীক্ষা, প্রভৃতি জগতের সাধনা-যোগ্য সব জিনিসের আদর্শ কোন একটি দুর্ব্বল—এরূপ অবস্থায় দুর্ব্বল না হইয়া পারে না—স্থান হইতে সংগৃহীত হয় না।

আমাদের দেশেও এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা ইতিহাসে কখনও ছিলনা—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং ফৌজদারী বিভাগে দেখাইয়াছি। সম্প্রতি যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা মাত্র গত চল্লিশ বৎসরের বিবেচনাহীন কর্ম্মফলে হইয়াছে! কিন্তু সময় আসিয়াছে, যখন, যে অবস্থা সুধু পিটিস্যান (Petition) দেওয়া, resolution পাশকরা কিম্বা মেমোরিয়াল দেওয়ার পক্ষে উপযোগী, তাহাকে ধিকার দিয়া সমগ্র দেশময় মনুষ্যত্ব বিকাশ করিবার চেষ্টা করা হইবে।

সময় ছিল, যখন বিদ্যার জন্য নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সম্মান শীর্ষস্থানে ছিল এবং তথাকার পণ্ডিতগণ সমগ্র বঙ্গদেশে পরিচিত হইতেন। সম্প্রতি ইংরাজী না জানিলে যেমন স্কুল কিম্বা কলেজ পণ্ডিত হওয়া যায় না, তেমনি কলিকাতায় পাণ্ডিত্য দেখাইতে না পারিলে তাহার পণ্ডিত জন্মই বৃথা। তবু নবদ্বীপের সম্মান যৎকিঞ্চিৎ রহিয়াছে—অন্যান্য সমস্ত সহর একেবারে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ কলিকাতার কোন অন্ধকারপূর্ণ গলিতে জন্মগ্রহণ করিলেও অন্যান্য স্থানের বিদ্বদ্গুলী অপেক্ষা তাঁহার নামে জয়ঢাক অধিক পরিমাণে ধ্বনিত হয়। এজন্য নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য লোকও ঘোরতর সারবান্ বলিয়া সংসারে হৈ চৈ আরম্ভ করে। কলিকাতার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা যাহার আছে, আশা করি, তিনি উপরোক্ত উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।

এইরূপ অবস্থার কারণ আছে। দেখা যাইতেছে, স্থলবিশেষে কেবল গ্যাসালোক কিম্বা কতকগুলি হর্ম্ম্যমাত্র থাকিলে, তাহা অজ্ঞলোকের সাময়িক বিস্ময় মাত্র উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সম্মান নহে। যে কারণেএ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সংবাদ পত্র দেশের মধ্যে শক্তি বিশেষ। সংবাদ পত্র সমগ্র দেশের বাক্শক্তি; শুধু তাহাই নহে, সংবাদ পত্র মত গঠন করে এবং সমগ্র জাতিকে চালিত

করে। কাজেই সংবাদ পত্রের কার্য্যক্ষেত্রের অবস্থিতির উপর, মতামতের উপর এবং সম্পাদকের শিক্ষার উপর, দেশের বর্ত্তমান অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

আমাদের দেশে, সংবাদ পত্রের বিস্তৃতি ও ক্ষমতার ইতিহাস অল্প দিনের। সাত আট বৎসর বলিলেই চলে। সম্প্রতি যে সমস্ত সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে, তাহা সমস্তই কলিকাতা হইতে। মফঃস্বলের কাগজ মফঃস্বলের লোকেরাই পড়ে না এবং এক ডিষ্ট্রীক্টের কাগজ অন্য ডিষ্ট্রীক্টে কখনও পড়া হয় না। মফঃস্বলের কাগজের আয়তন অনুসারে দাম অত্যন্ত বেশী, তারপর আবার কোন মূল্যবান্ পুস্তক উপহার নাই—এজন্য গ্রাহক সংখ্যা যৎসামান্য। এই সমস্ত কারণে দেশে ইহাদের প্রতিপত্তি অত্যন্ত কম।

কাজেই, যে কারণে পল্লীগ্রাম এবং মফঃস্বল দিন দিন হতশ্রী এবং প্রতিপত্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছে, সে কারণে মফঃস্বলের সংবাদ পত্রগুলিও মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

এ সব বিষয় একেবারে উড়াইয়া দেওয়ার জিনিস নহে—স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তি মাত্রেরই নিবিড় চিন্তার বিষয়। সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এইরূপ ভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইলে চলিবে কেন? ইহার প্রতিকারের জন্য সকলে অগ্রসর না হইলে স্বদেশের প্রতি পাপ করা হইবে। শুধু সংবাদ পত্রের কথা নহে, প্রত্যেক বিষয়েই সকলের দৃষ্টি পল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের দিকে ছুটিয়া গেছে। আমার বক্তব্য, একবার সকলকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, মন ফিরাইতে হইবে। স্বদেশের কার্য্য পল্লী হইতে আরম্ভ করা সম্প্রতি নিতান্ত প্রয়োজন—নগর হইতে নহে।

যেখানে গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য দেশের শীর্ষ স্থানীয় সাহিত্যিকগণের গ্রন্থাদি উপহার দেওয়া হয়—এই নিয়মটা আমার মতে ভালই, কারণ, ইহাতে দুইটি কার্য্য এক সঙ্গে হয়—সেখানে দেশের লোক, সম্পাদকগণের দোষ গুণ বিচার করিয়া, তাঁহাদের হাতে সাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার ভার দিয়াছে, এ কথা যে মনে করে, সে ভ্রান্ত।

কিন্তু এইরূপে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আর্থিক লাভ প্রভৃতি হওয়ায় ব্যবসায়ের দিক্ হইতে কলিকাতার কাগজগুলির আকৃতি এবং ক্ষমতা বাড়িয়া গেছে। কিন্তু কলিকাতার কাগজ কেবল কলিকাতার এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের সংবাদ পত্র নহে, ইহারা সমগ্র বাঙ্গলা দেশের মুখপত্ররূপে বিরাজ করিতেছে। এই জন্যই গোল। কারণ, এই সম্পাদকগণের অনেকেই এখন সমগ্র বাঙ্গলাদেশের প্রধান স্থান বা ডিষ্ট্রীক্টগুলি পর্য্যন্ত দেখেন নাই। কথাটা অনেকের নূতন ঠেকিতে পারে। যাঁহারা বাঙ্গলাদেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খবরই রাখেন না, কোন স্থানে কি সুবিধা, শক্তি, তাহা যাঁহারা ডাক্তারের ন্যায় তীক্ষ্ণভাবে অধ্যয়ন করে নাই, তাহাদের এক মাত্র কার্য্য, আবেদন কিম্বা কোলাহল ছাড়া কি হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত কাজ স্বদেশ কৃত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ।

কাজেই বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশের নানা স্থান হইতে নগরের ন্যায় ক্ষমতাশালী সুবৃহৎ কাগজ বাহির না হইয়া কেবল একটি ক্ষুদ্র জায়গা হইতে ভাল মন্দ সব কিছু বাহির হইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়ে কোনদেশে নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের নিকটস্থ জাপান কিম্বা সুদূরে ইউরোপীয় যে কোন প্রদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা উপলব্ধি হইবে।

সংবাদ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য দেশময় শক্তি জাগ্রত করা। কিন্তু এক স্থানে আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া, সর্ব্বত্র শক্তি সঞ্চার করিবার চেষ্টা হাস্যজনক। এই সমস্ত প্রতিবিধান করিবার ভার, বাঙ্গলার জন সাধারণের আছে বলিয়াই, আলোচনা করিতেছি। আজ হউক কিম্বা কালই হো'ক, প্রতিকার করিতেই যে হইবে, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কারণ আমাদের ভবিষ্য লক্ষ্য ঘন কুজ্ঝাটিকায় আবৃত নহে—তাহা সম্প্রতি মেঘমুক্ত হইয়াছে—এক কথায় তাহা গোলামী হইতে পরিত্রাণ।

সংবাদ পত্র আলোচনায় ক্ষুদ্র জিনিষকেও বৃহৎ করিয়া ফেলে এবং আলোচনার অভাবে বৃহৎ জিনিষও, ক্ষুদ্র হইয়া যায়। কাজেই অনেক সময় পল্লীর ভয়ানক বিপ্লবও কলিকাতার কোন গলির নিকটস্থ দাম্পত্যকলহ অপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে না।

কল্পনা করিতে ক্ষতি নাই, কারণ, কল্পনার বিষয়টি গুরুতর নহে। কল্পনা করুন, যদি কলিকাতার সমস্ত সংবাদ পত্রগুলির মফঃস্বলের স্থানে স্থানে আড্ডা হয়, যদি Bengalee চট্টগ্রাম হইতে, অমৃতবাজার ঢাকা হইতে, Indian Mirror বরিশাল হইতে—এইরূপে সঞ্জীবনী, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি কাগজ মফঃস্বলের নানাস্থান হইতে বাহির হয়, তবে দেশের ভাব জগতে কি বিপ্লব উপস্থিত হয়। এবং বাঙ্গলা দেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুহূর্ত্তেক মধ্যে কিরূপ আলোকিত হইয়া উঠে।

জাতি কলেবর জাগ্রত করিতে হইলে এই কাগজগুলিকেই মফঃস্বলে যাইতে, হইবে, এ কথা আমি বলি না। তবে ইহা বলিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ করি না যে Mass Educa-tion এর ভূমিকারূপে এবং Mass Education সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষা পাঠশালায় হউক কিম্বা মৌখিকই হউক—বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক প্রধান District হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ সহস্র গ্রাহক কর্ত্তৃক অনুগৃহীত এক একখানি পত্র বাহির হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইলেও উপায় নাই, কারণ, সর্ব্বত্র পাটোয়ারী বুদ্ধি খরচ করিলে চলে না।

বিস্মিত হইলে চলিবে না। নিম্নে কয়েকটী ডিষ্ট্রীক্টের জনসংখ্যা দিতেছি :—

| নাম | বর্গমাইল | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| ময়মনসিংহ | ৬,৩৩২ | ৩৪,৭২,১৮৯ |
| মেদিনীপুর | ৫,০৮২ | ২৫,১৭,৮৫২ |
| চট্টগ্রাম (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) | ২,৫৬৭ | ১৩,৯৮,৯৬৭ |
| বাখরগঞ্জ | ৩,৬৪৯ | ১৯,০০,৮৮৯ |
| ঢাকা | ২,৭৭৬ | ১৮,৫২,৯৯৩ |

এরূপ অবস্থায় একটা ডিষ্ট্রীক্টের একখানি কাগজের মাত্র পঞ্চাশসহস্র গ্রাহক প্রয়োজন মনে করা বোধ হয় অতিরিক্ত কিছু নহে। সংবাদ-পত্র সমূহকে, কেবল সাময়িক সংবাদে পরিপূর্ণ করিলে চলিবে না—কারণ সাধারণের শিক্ষা যে দেশে অগ্রসর হয় নাই, সেখানে সংবাদ পত্রকে, লোক-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

আমার এই প্রবন্ধে যদি কেহ কিছু socialistic ভাব দেখেন, তবে আশা করি, তাঁহার অনাবশ্যক বিরাগ কিম্বা অনুরাগ হইতে মুক্তি পাইব। সময় আসিয়াছে, যখন, দেশময় আগুনের মত socialistic ভাব বিস্তার করা দরকার এবং জর্ম্মণী প্রভৃতি প্রদেশের socialism এর ইতিহাস হইতে আমাদের জাতিগঠনের অনেক উপাদান গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য, প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টের যুবকগণ, প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে যেন এক একখানি স্বাধীন progressive নীতি-মূলক পত্রিকা বাহির করেন এবং উপযুক্ত লোক যেন সম্পাদক হইবার জন্য অন্ততঃ পাঁচ ছয় বৎসর নিজকে প্রস্তুত করেন এবং যথাসম্ভব বাঙ্গলা দেশকে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু যতদিন নগরের রাগিণীই একমাত্র জীবনকুঞ্জে বাজিতে থাকিবে, নগরের কলহ-কটু ক্ষীণ আওয়াজই পরম-পুরুষার্থ থাকিবে, ততদিন এ সব আশা করা বৃথা। কি উপায়ে সংবাদ পত্রের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহার আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কিন্তু জাতীয় দেশ-কলেবর সুস্থ করিতে হইলে, নগর হইতে চক্ষু ফিরান যে একান্ত দরকার, এতৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

যেমন মোটা কাপড় ব্যবহার করা সভ্যতা এবং বাবুয়ানার লক্ষণ হইলে বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকও মোটা কাপড় পরিতে আরম্ভ করিবে, তেমনি যাহারা পল্লীগ্রামে আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইবে,তাহাদের যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করা হয়—প্রকৃত পক্ষে তাহারাই দেশের যোগ্যতম ব্যক্তি—সঙ্গে সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান নেতৃগণও বার মাস কলিকাতায় না কাটাইয়া অন্ততঃ আটটি মাস যদি মফঃস্বলে কাটান, তবে, পল্লীগ্রামের দিকে সকলেরই নজর ফিরিবে। কারণ স্বদেশ-প্রেমিকতায় যথেষ্ট ভেল রহিয়াছে—তাহাতেও ফ্যাসন্ আছে। সকলে, দেশের সব কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতে পারে না—সাময়িক স্রোতের উজান যে দিকে বহে, সে দিকেই সম্মান, সমাদর কিম্বা আর্থিক লাভ প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই ছোটে। প্রাদেশিক সমিতিতে কিম্বা কলিকাতা টাউনহলে বক্তৃতা দেওয়া যদি স্বদেশ-হিতৈষণার চরম লক্ষ্য হয়, তবে,পল্লীর,দেশের অনাদৃত সাধারণের ঐ মৌন অথচ তীব্র আহ্বান এবং ক্রন্দন ধ্বনি শুনিবে কে?

আমি অনেক যুবক বন্ধুকে জানি, যাহারা, টাউনহলে একবার বক্তৃতা দিয়া কিম্বা প্রাদেশিক সমিতির মঞ্চে পাঁচ মিনিটের জন্য চীৎকার করিয়া, মফঃস্বলের সহস্র স্থানে বলিয়া বেড়াইয়াছেন—"আমি টাউনহলে (Town Hall) কিম্বা প্রাদেশিক সমিতিতে বক্তৃতা দিয়াছি।" মফঃস্বলের ভদ্রলোকগণকে এই সমস্ত নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। তুমি টাউনহলে বক্তৃতাই দেও বা প্রাদেশিক সমিতিতে কষ্টে সৃষ্টে, একটা বক্তৃতা করিবার সুযোগই পাও, তাহাতে দেশের জন-সাধারণের কি আসে যায়? গোলামের নৃত্য অপেক্ষা তুষ্ণীভাব ভাল। কি কঠোর পরিহাস!

দেশের জন-সাধারণ অজ্ঞ এবং শক্তিহীন বলিয়া তাহাদিগকে দেশীয়গণের অত্যাচারও সহ্য করিতে হইতেছে। ইহা গৌরবের কথা নহে—ইহার re-action না হইয়া পারে না। re-action হইতে আরম্ভ হইলেও একই ফুৎকারে এই সমস্ত কৃত্রিম স্বদেশহিতৈষী লোক উড়িয়া যাইবে। দেশের পক্ষে এই দিন শীঘ্র আসা প্রয়োজন। ভগবান করুন, তাঁহার করুণায় সমগ্র দেশ, পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুক।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সংবাদ পত্রগুলি অস্বাভাবিকভাবে centralised হওয়াতে এবং দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানের জাতীয় ভাব সম্পদ সম্যক্ প্রকাশ করিতে না পারায়, এইরূপ বিপর্য্যয় অস্বাভাবিকভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পাইতেছে। সম্প্রতি পল্লীজগৎ আলোকিত হইবার পথে ইহাই বিঘ্ন।

সম্প্রতি নগরের প্রতি প্রলোভন এত বেশী—কারণ পাঁচ কোটি বাঙ্গালী অধ্যুষিত, বিরাট বাঙ্গলা দেশের মাঝে ঐ জায়গাতেই কোলাহল বেশী—যে,যদি ভগবান্ স্বয়ং বলিয়া যান পনর বৎসরের মধ্যে তোমাদের দেশ স্বাধীন হইতে পারিবে, যদি তোমরা পল্লীতে যাও এবং উহাকেই কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া অশ্রান্তভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ কর—তবুও দেশকৃত্যাভিমানী, গোলামী-পরায়ণ কেহ নগর ছাড়িয়া, পল্লীতে আসিবে, এ বিশ্বাস আমি করি না। যিনি দেশের চক্ষু পল্লীর দিকে ফিরাইতে পারেন, তিনিই এ যুগের স্বদেশ-প্রেমিক—তাঁহারই অঘটন ঘটন পটিয়সী শক্তি স্বদেশকে অজস্র কল্যাণ-বারিতে অভিষিক্ত করিবে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন,কলিকাতার খ্যাতনামা লোকগণ কি মফঃস্বলে যান না? আমি স্বীকার করি, এই স্বদেশী আন্দোলনে তাহাদের কেহ কেহ পল্লীতে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু সে ব্যাপারটা এমন একটা বিদ্রূপ এবং এমন হাস্যজনক যে, তাহা উল্লেখ না করিয়া, পারিলাম না।

Alexender the Great যখন এক স্থানের পর অন্যস্থান জয় করেন, তখন তিনি সর্ব্বত্র ovation পাইয়াছিলেন—ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্তু যে দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন অশিক্ষিত, দুর্ব্বল, রুগ্ন, সে দেশবাসী কোন লোক যদি হঠাৎ আসিয়া কোন স্থানে উপস্থিত হন, দুইটা বক্তৃতা করেন এবং কেহ কেহ তাহার অশ্ববিহীন শকটকে সজোরে টানিয়া কতকটা জায়গা পরিক্রমণ করে,—বোধ হয়,এই দৃশ্য Napoleonএর ভাগ্যে ও ঘটে নাই এবং সন্ধ্যার ট্রেণে যদি তিনি চলিয়া যান, তবে তাহাতে পল্লীগ্রামে তামাসা ছাড়া আর কি হইল, আমি ত বুঝিতে পারি না। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বীরত্ব এবং দীর্ঘকালব্যাপী পল্লী সাধারণকে লইয়া সাধনার মধ্যে যে একটু তফাৎ আছে,আশা করি,তাহা নিতান্ত গোঁড়া লোকও স্বীকার করিবেন। প্রথমটি resolution pass করিবার উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টিই জাতি তৈয়ার করিবার একমাত্র উপায়!

কেহ কেহ বলিতে পারেন, একদিনের অধিক থাকিলে সম্মানের হানি হইতে পারে, একদিন থাকিলে সকলে যেরূপ মনোযোগের সহিত কথা শুনিবে, দীর্ঘকাল থাকিলে তাহা হইবে না, guest এবং residentএ অনেক প্রভেদ রহিয়াছে।

ভাল কথা—কিন্তু যে সম্মান মাত্র কেবল ক্ষণস্থায়ী অবস্থান হইতে জন্মে এবং যাহা একটু সময় অতিবাহিত হইলেই চলিয়া যায়, সে সম্মানে প্রয়োজন কি? নিজের মনুষ্যত্ব থাকিলে এবং নিজে যথার্থ খাঁটিলোক হইলে, সাধনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তি বাড়িবার কথা, কমিবার নহে। যে লোক কৃত্রিম, তাহার প্রতিপত্তি কমিতে পারে।

আমরা বিজিত জাতি, আমরা গোলাম, একথাটা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় একটী গোলামের শকট আরোহণ এবং অনেকগুলি গোলামের তাহার অশ্বযুক্ত শকট লইয়া টানাটানি, এই দৃশ্যটি কি নিতান্ত তীব্র এবং শুষ্ক পরিহাস নহে? দেশের সর্ব্বজন পূজ্য দুই একজন সম্বন্ধে সাধারণ চুপ থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র এ কি কাণ্ড হইতেছে?

অবশ্য দেশের সর্ব্বত্রই সবলোক খাঁটি

হইবে, এইরূপ প্রত্যাশা করাও অনেকটা বাড়াবাড়ি। অল্প কয়েক দিবস হইল, কলিকাতার কোন খ্যাতনামা বারিষ্টার কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—

"There are political black guards also—often even the leaders can not do without them."

আমার কথা স্বতন্ত্র। আমার বক্তব্য, যাহাতে দেশের লোকের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি সর্ব্বত্র জাগ্রত দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং সেইজন্য যথাসম্ভব পল্লী কিম্বা মফঃস্বলে সাময়িক কাণ্ড না করিয়া স্থায়ীভাবে কার্য্যের সূত্রপাত করা প্রয়োজন।

গ্যারিবল্ডি কিম্বা ম্যাট্‌সিনি যদি এই অধঃপতিত দেশের শ্মশানের উপর এই সব নৃত্য দেখিতেন, তবে কি মনে করিতেন, জানি না। কোথা সেই নিবিড় দেশব্যাপী সাধনা, আর কোথায় এই সমস্ত চটুল করতালির ফেনোদ্গম!

মফঃস্বল কিম্বা পল্লীর প্রতি এই সাধারণ অবজ্ঞার: মৌলিক কারণের যৌক্তিকতা কোথাও খুঁজিয়া পাই না। কলিকাতায় অবস্থিতি গৌরবজনক—পল্লীতে তদ্বিপরীত, এই অস্বাভাবিক ভাব দেশে কি করিয়া হইল? কলিকাতার কোন political গণ্ডমূর্খের কথা মফঃস্বলের কোন প্রবীণ লোকের অপেক্ষাও বেশী হৈ চৈ করে কেন? ইহার কারণ কতকটা বলিয়াছি। ইহাও বলা আবশ্যক, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ব্যাপার অসম্ভব।

ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে বলিয়া এবং দেশের সর্ব্বত্র মনুষ্যত্ব প্রসারের অনুকূল নহে বলিয়া আর একটী উদাহরণ দিব।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিতে বোধ হয়, অনেকেই গিয়াছেন। প্রাদেশিক সমিতির প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতা হইতে আসেন এবং যাঁহারা মফঃস্বল হইতে উপস্থিত হন, আদর অভ্যর্থনার যে অনেক পার্থক্য এতদুভয় শ্রেণীর মধ্যে ঘটে, তাহা গত পাঁচ সাত বৎসরের প্রতিনিধিগণ জানেন। কলিকাতায় অগণ্য নগণ্য প্রতিনিধিগণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে থাকেন—উৎকৃষ্ট চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতির দ্বারা আপ্যায়িত হন।

অবশ্য ইহা বেশ সুখের বিষয়। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানাস্থান হইতে অশ্রান্তকর্ম্মী যে সব শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন, তুলনায় তাহাদের সমাদরে একেবারে কেন যে ভাটা পড়িবে, তাহা বুঝিনা। ইহাতে অবশ্য নিমন্ত্রণ-কর্ত্তাদের কোন দোষ নাই—কারণ মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ যে, তাঁহারা মফঃস্বলকে কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন—দ্বিতীয় অপরাধ তাঁহাদের হাতে কোন ক্ষমতাশালী খবরের কাগজ নাই। কলিকাতার প্রতিনিধিগণের সমাদরের কিছু ত্রুটি হইলে কলিকাতার সংবাদপত্রে কোলাহল উঠিবে—এবং হয়ত সেই উপলক্ষে কিম্বা অন্য উপলক্ষে সেই হতভাগ্য ডিষ্ট্রিক্টের উপর তীব্র গালাগালি বর্ষিত হইবে। মফঃস্বলের লোকের হাতে তেমন কোন অস্ত্র নাই, কাজেই কেবল কলিকাতা যদি আনন্দিত হয়, তবেই বাঙ্গলা দেশকে সুখী করা হইল।

যাহা হউক, এই ব্যাপার অতি সামান্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যকলাপের মধ্যেও মফঃস্বলের মাথা তুলিবার উপায় নাই। কলিকাতা হইতে আগত অনেক বালকও বিপুল বক্তৃতা-ঝঙ্কার

দিতেছে, অথচ মফঃস্বল কিম্বা পল্লীর অনেক প্রবীণ লোকেরও কর্ম্মক্ষেত্রলব্ধ অভিজ্ঞতা বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকিলেও চুপ থাকিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান Constitutional agitation এ অভিজ্ঞ কাহারও এ সমস্ত কথা অজ্ঞাত নহে।

যতদিন এইরূপ অবস্থা থাকিবে—ততদিন পল্লীকে কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিবার ইচ্ছা দেশের যুবকগণের হইবে কিনা, জানিনা। এই সমস্ত অবজ্ঞতার ভার বহন করিয়া ধন্যবাদ-বিহীন পল্লীর মাঝে, শক্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা কিঞ্চিৎ সুদূর-পরাহত বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে কেবল অভাব এবং অসুবিধার দিক্ হইতে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, পল্লীতে যাহারা কাজ করিতেছে, এবং করিবে তাহাদের ক্ষমতা বেশী। নগরে কি না আছে? ধনবল, জনবল, জ্ঞান বিস্তারের সমস্ত সহজ পন্থা – যেমন পত্রিকা প্রভৃতি — সব কিছু রহিয়াছে। সেখানে পুলিসের উৎপাত কম—রাজকর্ম্মচারীর সৃষ্টিছাড়া অত্যাচার কম—এবং লোক সংখ্যা অধিক থাকায় অন্যান্য উপদ্রবও কম। নগরের রাস্তা ঘাট, আলো, যান প্রভৃতির ব্যবস্থা—কলেরা বা ম্যালেরিয়ার অপেক্ষাকৃত অভাব, জীবন যাত্রার কার্য্যের পথ অত্যন্ত সহজ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার সহিত পল্লী-গ্রামের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে, নগরে যাহারা কাজ করে, তাহাদের কৃতিত্ব বেশী, না পল্লীতে যাহারা মাথার ঘর্ম্ম পায়ে ফেলিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তাহাদের মনুষ্যত্ব অধিক।

যাহা কঠিন, তাহাই আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। কারণ সাধনার পথ কখনও সরল ছিল না। আমাদের অভিশপ্ত দেশকে এত সহজে আমরা ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিতে পারিব, একথা মনে করিয়া ভাবরাজ্য ক্রীড়া করিতে থাকিলে আমাদের উপস্থিত কার্য্যও ব্যর্থ হইবে।

পল্লীর প্রতি দেশময় অবজ্ঞা হওয়াতে পল্লী দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। সেখানে প্রতিভা উৎসাহ না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—কাজেই দেশময় চতুর্দ্দিকে শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে! আর একটা উদাহরণ দিব।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে নানা বিষয়ের গবেষণার জন্য নানা সমিতি রহিয়াছে। সমিতির সভ্য সংখ্যাও কম নহে—প্রায় সকলেই নগরের লোক, সেখানে অফিসে গিয়া, ওকালতী করিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করা বিশেষতঃ সাহিত্যের গবেষণা করা বড় সহজ নহে এবং প্রতিভার ক্ষেত্রও কেবল নগর নহে। দুঃখের বিষয়, পাঁচ কোটি বাঙালীর মধ্যে ক্ষমতাবান্ লোক বাছিয়া লইবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকের আছে। এবং এইজন্য দেশময় কোন organisationও নাই, যাহাতে নানা স্থানের উপযুক্ত লোককে অন্ধকার হইতে বাহির করা এবং প্রকৃত কার্য্যভার হস্তে দিয়া তাহার শক্তির অপব্যয় নিবারণ করা হয়। আমাদের দেশে এ অবস্থা না আসিয়া থাকিলে ইহাকে যে সমীপবর্ত্তী করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

পল্লীর শক্তি জাগ্রত করা উচিত, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ কল্পনাও করা যায় না।—কিন্তু অসম্ভব ব্যাপারও যখন কখনও কখনও সম্ভব হয়, তখন কেহ কেহ বলিতে পারেন, পল্লীশক্তি জাগ্রত হইয়া যদি public opinion এর unanimity নষ্ট হয়, তবে উপায় কি হইবে?

ইহার উত্তরে প্রথম বক্তব্য যে, পল্লীশক্তি জাগ্রত না করিয়াও এখন এমন কি unanimity দেখিতেছি? এবং এই unanimityর মূল্য কি?

দ্বিতীয়তঃ যে unanimity কেবল দরখাস্ত করার কিম্বা একই আকৃতির resolution মাত্র পাশ করার উপযোগী, সে unanimity দ্বারা আমরা গোলামী হইতে পরিত্রাণ পাইব কি করিয়া? যে সব দেশে mass education খুব বিস্তৃত,সেখানে ananimityর ত কোন হানি হয় না। আমাদের গন্তব্য পথ এক দিকে—গোলামীর পরিত্যাগ, এতৎ সম্বন্ধে দুই মত ত কল্পনা করিতে পারি না। তা ছাড়া unanimity না হইলেও unity যে সম্ভব এবং সর্ব্বত্র তাহা রহিয়াছে, একথা আমরা দেখি না কেন? জাতীয় বর্ত্তমান দৌর্ব্বল্য রাখিবার ইচ্ছা না থাকিলে অবিলম্বে পল্লীশক্তি জাগ্রত করা প্রয়োজন।

একথাটী অত্যন্ত সহজ যে,জাতীয় ভাব বা স্বদেশ-প্রেম জিনিষটী একতার একটী প্রধান রজ্জু,—এবং পল্লীশক্তি জাগ্রত করাও একমাত্র স্বদেশ-প্রেমের ভিতর দিয়াই সম্ভব। ইহা মানুষকে অনৈক্যের দিকে লইয়া যাইবে না—ঐক্যের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে।

দেশের শক্তি পল্লী হইতে কাজ করিতে না থাকিলে যে দেশব্যাপী সমগ্র কার্য্য বিফল হইবে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিব। প্রথমতঃ বলা দরকার, নানাস্থানে নানা কার্য্যের বহু সুবিধা অসুবিধা রহিয়াছে, এজন্য প্রত্যেক স্থানের অবস্থা ও ইতিহাস কিছু বিভিন্ন। কাজেই নগর হইতে যখন তখন যে কোন একটা তৈয়ারী করা cutand dried scheme মফঃস্বলের উপর ন্যস্ত করিলেই অমনি তাহা মঞ্জরিত হইয়া উঠিবে না। পল্লীগ্রামের কার্য্যের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে নগরের খুব কম লোকেরই অভিজ্ঞতা আছে। এজন্য প্রত্যেক জিনিষ স্থায়ী হইতে হইলে স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক স্থানের মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হওয়া দরকার। কাজেই cut and dried অনেক ভাল schemeও ব্যর্থ হইতেছে। উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদের, সম্প্রতি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, মফঃস্বল এবং পল্লীকে কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করা—কার্য্য সামান্য পরিমাণে অগ্রসর হইলেই নানাস্থানের বিশেষ সুবিধা অসুবিধা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তখন নানাস্থানের নানা জেলার সকলে কাজের দিক হইতে সমগ্র দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা সম্ভব হইবে এবং গন্তব্যপথ নির্ণয় করা সরল হইবে। নচেৎ স্থান বিশেষ হইতে হুকুম প্রদান করিলেই কার্য্য অগ্রসর হইবে, একথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন,তাঁহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। কাজেই কার্য্যক্রমের অন্যান্য আলোচনা ভবিষ্য-প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সৌভাগ্যক্রমে জাতীয় জীবনের শৈশবকাল শেষ হইয়াছে, কার্য্যেই যৌবনের বলদৃপ্ত সমগ্র দেহ কলেবরে কর্ম্মের উত্তাল উদ্দাম ডমরুধ্বনির ভৈরব আরব-কণ্টকিত সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠা প্রয়োজন। তাহা সম্ভব, যদি সকলেই পল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করে। একটী পুরাতন ক্ষুদ্র ইংরাজি কথা আছে,—The nation lives in the cottage.

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

# সাধু আনন্দমোহন।

**জন্ম—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জয়সিদ্ধি নামক গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে।**

**মৃত্যু—৪ঠা ভাদ্র, (১৩১৩) ২০শে আগষ্ট, (১৯০৬) সোমবার, কলিকাতা।**

**পিতার নাম ৺পদ্মলোচন বসু।**

বঙ্গদেশে যখন অগণ্য নর-নারী দুর্ভিক্ষের নিদারুণ কষাঘাতে অবসন্ন-দেহ ও স্পন্দহীন, তখন এই কথা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়াছে যে, আনন্দমোহন আর ইহজগতে নাই। এই সংবাদ যে শুনে, সে-ই হাহাকার করে, সে-ই চক্ষের জল ফেলে, কিন্তু আনন্দ-মোহনের সম্যক আদর যাহারা করিবে, সেই নগণ্য জন-শ্রেণী আজ দুর্ব্বিপাকে জীবন-সংগ্রামের কঠোর নিষ্পেষণে আত্মহারা এবং অস্থির। বুঝিবা, আনন্দমোহন দুঃখীদের দুঃখকাহিনী সহ্য করিতে না পারিয়া অসময়ে প্রস্থান করিয়াছেন!

আজ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের কথা স্মৃতিতে উথলিয়া উঠিতেছে। আমরা তখন ভবানী-পুর লণ্ডন মিশনরী স্কুলে অধ্যয়ন করি। এলাহাবাদের সুবিখ্যাত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র, কানপুরের সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ, হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকীল রঘুনাথ ও শরচ্চন্দ্র পরিবেষ্টিত হইয়া আমরা একদিন সোৎসুক নেত্রে, সাধু জগচ্চন্দ্র দাসের নিকট, ইংলণ্ডপ্রবাসী এক ব্যক্তির অনিন্দিত সৌম্য মূর্ত্তির ফটো দেখিতেছিলাম, নবভানুর নব কীরণ যেন চতুর্দ্দিক ঝলসিয়া ছুটিতেছিল—দিব্য কান্তিতে কত শোভাই ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমরা সেই অতুল শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম;—শুধু মোহিত নয়, আত্মহারা হইয়াছিলাম;—মনে হইয়াছিল, আমরা যেন পৃথিবীর কোন এক উচ্চ স্তরে উঠিয়াছি। যে আলেখ্য মানুষকে উচ্চ স্তরে উত্থিত করে, সে কি আলেখ্য?

অনেক দিন পরে, ঘটনাচক্রে, আমরা যখন সেই অতুল শোভার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তখন বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছিলাম যে, এখন সুদিন আমাদের জীবনে ঘটিয়াছে! অনেক দিন, অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতাম, তিনি কি মানুষ, না দেবতা?

তিনি কতবার আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, কতদিন দরিদ্রের ঘরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কত কত ভালবাসিয়াছিলেন, কত কত আব্দার শুনিয়াছিলেন, বলিব কি, কত কত রূপ সমাদর করিয়াছিলেন! কত অযোগ্য নীচ লোকের প্রতি তাঁহার কত অপরাজিত দয়া! তিনি কি মানুষ, না দেবতা ছিলেন?

আমি সত্যই ইদানীং দেবতার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া থাকিয়া সদা ভাবিতাম, আনন্দমোহন মানুষ নন্, দেবতা। এই সংসা-রকে দেবত্বে উন্নীত করিবার জন্য এই মর্ত্ত্যে তাঁহার আগমন হইয়াছিল। তিনি যেন মহান্ধকারের ক্ষণবিদ্যুৎ, তিনি যেন মহাপাপ-বিভীষিকার মধ্যে সুস্নিগ্ধ পুণ্য-চন্দ্রালোক; তিনি যেন উত্তপ্ত মরুভূমিতে সুশীতল সরসী। অথবা আমি কি জানি যে, তাহার অশেষ গুণাবলী স্মরণ করিবার বা লিখিবার যোগ্য? তিনি মানবদেহে অমর দেবতা! আজ তাঁহার চরণে এ দীনের কোটি কোটি প্রণাম।

আমাদের চক্ষের সম্মুখে আজ ৩০ বৎসরের ইতিহাস ভাসিতেছে;—বঙ্গদেশের উত্থানের ইতিহাস কত আশাপ্রদ, কত তৃপ্তিপ্রদ, কত

মনোমুগ্ধকর, কত শান্তিদায়ক। মহর্ষি, রামতনু এবং রাজনারায়ণের পুণ্য-বীণা যখন মধুর তানে ঝঙ্কারিত হইতেছিল, কেশবচন্দ্রের ভক্তিতত্ত্ব যখন এক বিভাগকে মধুময় করিতেছিল, রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণদাসের প্রতিভায় যখন কলিকাতা উজ্জ্বলিত হইতেছিল, বিদ্যাসাগর, মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাঙ্গালা ভাষাকে অতুল শোভায় ভূষিত করিতেছিলেন, তখন এদেশের জনসাধারণকে উন্নতির উচ্চ মঞ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল;—তিনি ম্যাট্‌সিনির পুণ্যময় ধর্ম্মজীবন-সুধাপানে মাতোয়ারা আনন্দমোহন। কেহ কেহ বলে, তিনি রামমোহন রায়ের একমাত্র উপযুক্ত শিষ্য, আমরা সে কথা অস্বীকার করি; রামমোহনের জীবনের কোন কোন অপবিত্র কাজ হইতে আনন্দমোহন চিরকাল সুরক্ষিত। কেহ কেহ বলেন, তিনি সমঞ্জসীভূত উন্নতিতে থিওডোর পার্কারের একমাত্র মানসপুত্র, আমরা সে কথাও অস্বীকার করি, কেননা, তিনি আগ্নেয় অস্ত্রের প্রয়োজনীয় স্বীকার করিতেন না; যদি করিতেন, তবে তিনি সর্ব্বশ্রেণীর সমাদর ও পূজা পাইতেন না। আমাদের মনে হয়, তিনি ধর্ম্মভাব ও চরিত্রে, পুণ্য ও পবিত্রতায়, অজেয় প্রতিভা ও জ্ঞানে, স্বভাবের মাধুর্য্য ও কমনীয়তায় কেবল ম্যাট্‌সিনির যোগ্য। আনন্দমোহন যদি ম্যাট্‌সিনি হন, তবে গ্যারিবল্ডি কোথায়? ম্যাট্‌সিনির সহিত যেমন গ্যারিবল্ডির মিলন, আনন্দ মোহনের সহিত তেমনি সুরেন্দ্রনাথের সম্মিলন। দুইয়ে মিলিয়া এক, অথবা একের দুই রূপ। একজন কর্ণধার, অন্য জন দাঁড়ী; একজন পরামর্শদাতা, অন্যজন আদর্শ কার্য্যবীর। দুই শক্তির অপূর্ব্ব মিলনে নব্যবঙ্গের উত্থান হইয়াছে। কেহ কেহ এই তুলনায় উপহাসের ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিতে পারেন, তবে স্বাধীনতা কোথায়? অষ্ট্রীয়া যেমন ইতালীতে মৃত, ইংলণ্ডও আজ তেমনি ভারতে মৃত। পাশব-শক্তি-ধারী ইংরাজ আজও জাগিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পুণ্য-পবিত্রতার অজেয় শক্তিধারী প্রজা-বন্ধু ইংরাজ, বহুদিন হইল, মরিয়া পচিয়া কালের গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। হেয়ার, বেথুন, কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতির দুর্জ্জয় নৈতিক প্রতাপ রিপণের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হইয়াছে। এখন যাহা দেখিতেছ, উহা পূতিগন্ধময় মৃত জীবের পৈশাচিক তাণ্ডব আস্ফালন মাত্র।

আমি দেখিতেছি, ৩০ বৎসরের ইতিহাসের ঘটনার পরলে পরলে আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের অক্ষয়কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। দুই দশটী ঘটনার ব্যাখ্যায় তাহা পরিসমাপ্ত হইতে পারে না। সে অক্ষয়কীর্ত্তি, নব্যবঙ্গের উত্থান। দেখিতেছি, তোমরা ভারতসভা, বা বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়, বা সিটী-কলেজ বা ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয় বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা তুলিয়া আনন্দমোহনের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে চাও। ঐ সকল কীর্ত্তিতে আনন্দমোহন কখনও জীবিত থাকিবেন না; কেন না, ভারতসভা থাকিয়াও না থাকার মধ্যে গণ্য, বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয় বেঙ্গল-ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের ন্যায় অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সিটী কলেজ বা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ পুণ্যশ্লোক আনন্দমোহনের গৌরব না অগৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা ভাবী বংশধরেরা বিচার করিবে। তোমরা, বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি লাভে, বা হাইকোর্টের বাক্‌বিতণ্ডার কৃতিত্বে

তাঁহার মহত্ব ঘোষণা করিতে চাও, তাহাও মহাভুল। তিনি বিশ্ববিস্থালয়ের অনেক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, আরো কত জন প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় প্রথম হইতেছে। কত ডবলিউ-সি-ব্যানার্জি, কত এস্-পি সিংহের অভ্যুদয় হইয়াছে; কত পরাঞ্জপের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু আনন্দমোহন বঙ্গে একজন, শুধু বঙ্গে কেন, ভারতবর্ষে একজন। সুরেন্দ্রনাথও একজন। অনেক সুবক্তা, অনেক নেতার অভ্যুদয় হইতে পারে, হইয়াছে এবং হইবে, কিন্তু বহু পুণ্যের ফলে এদেশে যে আনন্দমোহনের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা বহু হইবে না; হইতে পারে না।

কেহ কেহ এমন নীচ পরশ্রীকাতর ব্যক্তি আছেন, যিনি বা যাঁহারা সুরেন্দ্রনাথের দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অবনমিত করিয়া তাঁহার বিজয় সিংহাসন অধিকার করিতে চাহেন। তিনি বা তাঁহারা জানেন না যে, সুরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে কে? সুরেন্দ্রনাথ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া যখন কলিকাতায় আসিলেন, তখন আনন্দমোহন তাঁহার হৃদয়ের অতুল সুস্নিগ্ধ সদ্ভাবচন্দনে সুরেন্দ্রনাথকে চর্চ্চিত করিয়া, স্বদেশের মঙ্গলকামনার মুকুট মস্তকে দিয়া, স্বদেশ-প্রেমে দীক্ষিত করিলেন। লিখিতে আমরা কুণ্ঠিত নই, স্বদেশ-প্রেমিক সুরেন্দ্রনাথের উত্থানের মূল আনন্দমোহন; অথবা আনন্দমোহনের অজেয় অক্ষয় কীর্ত্তি সুরেন্দ্রনাথের উত্থান। সুরেন্দ্রনাথকে অবনমিত করিতে পারে, এমন লোক ভারতে নাই।

ম্যাট্‌সিনির কথা বলিতেছিলাম। ম্যাটসিনি কে ছিলেন? ম্যাটসিনি তাঁহার পিতা মাতার ছিলেন না, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণের ছিলেন না, ম্যাটসিনি ছিলেন, ইতালীর অনন্ত জনসাধারণের। তাঁহার "মানবের কর্ত্তব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ কর, বুঝিতে পারিবে, ম্যাটসিনি এবং জনসাধারণ অবিভক্ত কি না? ম্যাট্‌সিনি উঠিলেন, এ কথা বলিলে আমরা বুঝি, ইতালীর জনসাধারণের উত্থান হইল। সংযত আনন্দমোহনের জীবনের পশ্চাতে বসিয়া বসিয়া আমরা বুঝিয়া আসিয়াছি, তিনিও তাঁহার পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্রের ছিলেন না, তিনি ছিলেন, অগণ্য বঙ্গবাসী প্রজা-সাধারণের। এ কথার সাক্ষী দিবার জন্য এদেশে বহু লোক জীবিত আছেন। সাধারণকে জাগরিত করিবার জন্য, সাধারণের মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য—প্রজাশক্তিকে রাজশক্তির সমতুল্য করিবার জন্য আজীবন তিনি খাটিয়া গিয়াছেন। এই খানেই তাঁহার বিশেষত্ব, তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ আর কেহ করে নাই; তিনি প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া এই এক মহা কাজ সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে আজ স্বদেশী আন্দোলন এত বিস্তৃত, এত শক্তিশালী, এত অজেয় হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দমোহন কি মৃত? ভুল কথা। আজ তিনি প্রজাশক্তিতে নবশক্তিশালী ম্যাট্‌সিনিরূপে নবোত্থিত।

আমরা রাজা নহি, আমরা রাজশক্তি বুঝি না; আমরা প্রজা, বুঝি কেবল প্রজাশক্তি। প্রজাশক্তি এদেশে সুষুপ্ত ছিল। অহিফেন সেবনের দ্বারা চীন-প্রজাকে সুষুপ্তিতে যেমন ইংরাজ ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, তেমনি, মদ্যপান, চা-পান, এবং বিলাসিতার দ্বারা বুদ্ধিবিদ্যায় ভারতে-শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-প্রজাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিতেছিলেন। আর ঘোর দারিদ্র্যের কশাঘাতে মারিয়া মারিয়া তাহাদিগকে সুষুপ্তির যোগ্য করিয়া তুলিতেছিলেন। তাহারা জাগিত না—মহা প্রহারেও নড়িত না।

বিধাতা দেখিলেন—এ জাতি যায়; এদেশ যায়। তাই তুলিবার জন্য আয়োজন করিলেন। আনন্দ-মোহন সেই আয়োজনের মহা ফল। আনন্দমোহনের জীবনব্যাপী চেষ্টায় আজ সুষুপ্ত বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আনন্দমোহনের জীবনের মহা কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর জাগরণ এবং আনন্দমোহনের তিরোধান, একই কথা, যখন কার্য্য সিদ্ধ হইল, তখন তিনি আর থাকিবেন কেন? তিনি শরীর বিসর্জন দিয়া এখন নব শক্তিতে অগণ্য বঙ্গবাসীর জীবনে অজেয় প্রজাশক্তি রূপে জাগরিত। জয় আনন্দ-মোহনের জয়। জয় প্রজাশক্তির জয়। জয় মাতৃভূমির জয়। জয় বিশ্বপতির জয়।

কি শক্তিতে আনন্দ-মোহন এদেশে প্রজাশক্তিকে জাগাইতে সক্ষম হইলেন? যে শক্তিতে ম্যাট্‌সিনি ইতালীকে জাগাইয়াছিলেন, সেই শক্তিই আনন্দমোহনের সম্বল ছিল। সে শক্তি পাশব শক্তি নয়, সে শক্তি চরিত্রের শক্তি, ধর্ম্মের শক্তি, প্রার্থনার শক্তি। ম্যাট্‌সিনি একেশ্বরবাদী, আনন্দমোহনও একেশ্বরবাদী। দুই জনই ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য পৃথিবীতে নানা নির্যাতন সহ্য করিয়া গিয়াছেন। ম্যাট্‌সিনি উনবিংশ শতাব্দীর লোক, আনন্দমোহনও উনবিংশ শতাব্দীর লোক। দুইজনই আইন-ব্যবসায়ে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা দুইয়ের কাহারও লক্ষ্য ছিল না। ম্যাট্‌সিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে অজেয়, আনন্দমোহনও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে অজেয়। যে পুণ্য ও পবিত্রতার অস্ত্রে ম্যাট্‌সিনি অষ্ট্রেলিয়ার পাশব শক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই পুণ্য ও পবিত্রতার অস্ত্রে আনন্দমোহনও ইংরাজের দুর্জ্জয় পাশব শক্তিকে পরাস্ত করিয়া নব্য বঙ্গকে সুষুপ্তি-অধীনতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া মহা জাগরণের পথে আনয়ন করিয়াছেন।

এ জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাঁহারা আপনাদের জয় ঘোষণা আপনারা করে,—আপনাদের প্রশংসা আপনারা গায়; আনন্দ মোহন সর্ব্বদা সে কার্য্যকে ঘৃণা করিতেন। তিনি সর্ব্বদা সংযত, নিরহঙ্কারী, আড়ম্বরহীন থাকিতেন। বিনয় তাঁহার জীবনের নিত্য সহচর;—পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা তাঁহার জীবনের ত্রিসীমায় পৌঁছিতে পারিত না। কেহ কখনও তাঁহাকে বৃথা আস্ফালনে প্রবৃত্ত হইবে দেখে নাই! মহা চটুল ব্যক্তিও তাঁহার নিকটে আসিয়া সংযত হইত। তিনি যে বঙ্গের নেতা, তাহাও তিনি বুঝিতেন না। তিনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের মহা সম্রাট, তাহাও তিনি জানিতেন না। সদাই তিনি সঙ্কুচিত, সদাই তিনি দেশের দুর্দ্দশা চিন্তায় ম্রিয়মান,—হাস্য-পরিহাস-বিরহিত। তিনি অক্লান্ত অন্তরে দিন রাত্রি খাটিতেন, কিন্তু কখনও প্রকাশ্যে ধরা দিতেন না। তিনি চরিত্রে গুপ্ত এবং লুপ্ত থাকিতেন। মজিয়া, মজিয়া তিনি বিমল চরিত্রের পরিপক্কতার বিশ্ববিজয়ী রাজ্যে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই গুণেই তিনি সর্ব্বজন পূজ্য এবং এই গুণেই তিনি সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কি কোন দোষ ছিল না? কেহ কেহ বেঙ্গল-ব্যাঙ্কিং-করপোরেশনের কথা তুলিয়া তাঁহার চরিত্রে কালিমা লেপন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ এ দেশের অনুপযোগী জানিয়াও তাহা চালাইতে চেষ্টা করিয়া সমাজ-বিপ্লবের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, তিনি অযাচিত ভাবে অবৈতনিক উপদেশ দিয়া মানুষের সম্মানের লাঘব করিতেন। এ সকল কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহার গুণের ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিদিগকে যেরূপ বলিয়াছি, তাঁহাদিগকেও, সেই প্রকার, বলিতে পারি, তাঁহার গুণ সকল যেমন কোন কার্য্যে নিবদ্ধ নয়, তাঁহার দোষ সকলও তেমনি কোন ঘটনায় পরিব্যক্ত নয়। দেশের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য ঐ করপোরেশন সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ঘটনার নিষ্পেষণে তাহা উঠিয়া গিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি বা কার্য্যকরী শক্তির ত্রুটী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের কোন কলঙ্ক নাই; তিনি উহার একটী পয়সা আত্মসাৎ করেন নাই বা উহাদ্বারা কোন স্বার্থ সাধন করেন নাই। পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ বা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত অনেক ব্যক্তিই কিছু কিছু পাশ্চাত্যানুকরণে সিদ্ধি লাভ করেন, এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ যে পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদের অনুপযোগী, তাহা জানিয়াও তাঁহারা সভ্যতার ভাণ করিয়া উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত সভ্যতা যে চরিত্র-মূলক, আচার-ব্যবহার-মূলক নয়, ইহা তাঁহারা জানেন না। আনন্দমোহনের অনন্য-সাধারণ প্রতিভাও এস্থলে পরাজিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহার মহাভ্রান্তি তিনি বুঝিয়া পারিবারিক জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষকে মানুষ করিবার বাসনায় সর্ব্বদা উন্মনা থাকিতেন, এজন্য উপদেশের বাহুল্য তদীয় জীবনে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার অনবদ্য দেশহিতৈষণার অকৃত্রিম উত্তেজনারই পরিচয় দেয়, চরিত্র-কালিমা ঘোষণা করে না। তাঁহার মহদন্তকরণের গুণাবলীর পরিব্যাপ্তি বা পরিস্ফুটি যেমন কোন সামান্য কার্য্যে নিবদ্ধ হয় নাই, তাঁহার দোষ ত্রুটীও তেমনি কোন ঘটনায় প্রকাশিত হয় নাই। মানব দেহধারী হইলেই দোষ-সংস্পর্শে আসিতে হয়, একথা যদি সত্যও হয়, তবে আমরা বলিব, নিঃসন্দেহে বলিব, আনন্দমোহনের প্রকৃত মহত্বও যেমন কার্য্যের অতীত, দোষও তেমনি ঘটনার অতীত হইয়া আপনার ভিতরেই মানসময় রাজ্যের বস্তু হইয়াছিল, লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় নাই। সামান্য২ কাজের সাফল্যে আনন্দমোহনের প্রতিভা বা চরিত্রের পরিচয় পাইবে না, সামান্য সামান্য কাজের মধ্যে, তেমনি, তাঁহার ত্রুটী বা দোষও দেখিতে পাইবে না। তিনি সাংসারিক লোকের সাধারণ গুণের অতীত, দোষেরও অতীত ছিলেন। তিনি "নেতি নেতি মন্ত্রের" দোষ-গুণ-বিরহিত অমর-ধামের এমন এক অলৌকিক বস্তু ছিলেন, যাহার তুলনা কেবল তিনি নিজেই—অন্যের সহিত তাঁহার তুলনা সম্ভবে না।

তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, তাহা ব্যাখ্যা করিবার ভাষা নাই। মহাসাগরের বিস্তৃতি ও উচ্ছ্বাস যেমন ব্যাখ্যাত হইবার নয়, কাঞ্চন-জঙ্ঘার তুষার-ধবল শ্বেতকান্তি ও গাম্ভীর্য্য যেমন ব্যাখ্যাত হইবার নয়, আনন্দমোহনের মহত্ব-ব্যঞ্জক জীবনও, তেমনি, ব্যাখ্যাত হইবার নয়। তাহা পরিস্ফুট অনন্ত মানব পরিবারে, তাহা বিস্তৃত অনন্ত মানব-চরিত্রে। নব্য-ইতালী ম্যাট্‌সিনির অপূর্ব্ব সৃষ্টি, নব্য-বঙ্গ আনন্দমোহনের আশ্চর্য্য রচনা। পূর্ব্বে ধর্ম্ম ছিল, ধার্ম্মিক ছিল, নেতা ছিল, নেতৃত্ব ছিল, আন্দোলন ছিল, চালক

ছিল, ভাবা ছিল, গাথা ছিল, কিন্তু ছিল না, জাতীয় উত্থান, ছিল না অগ্রকার সমুন্নত নব্য-বঙ্গ। ৩০ বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ যে এখন কোথায় লুক্কায়িত হইয়াছে, কেহ তাহা ধারণাও করিতে পারিবেন না। ৩০ বৎসরের কঠোর-সাধনার ফলে নব্য-বঙ্গের উত্থান হইয়াছে। ইহা আনন্দমোহনের অলৌকিক চরিত্র-বিশ্লেষণের ফল। তোমরা অনুসন্ধান করিলে, বাহিরে ইঁহাকে তাঁহাকে, কতজনকে কত রূপে, ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবে; দেখিতে পাইবে, কতজন বাহাবা লইবার জন্য অগ্রসর, কিন্তু ধীর এবং স্থির ভাবে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে, নব্য-বঙ্গের উত্থানের মূল কারণ আনন্দমোহন এবং তাঁহার সহচর সুরেন্দ্রনাথ। যেমন গৌর-নিতাই, যেমন কেশব-প্রতাপ, তেমনি, নব্য-বঙ্গের অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ। দুইয়ের জীবন এমনই সংযোগ-রজ্জুতে আবদ্ধ যে, একজনকে বাদ দিয়া অন্যের জীবন ভাবা যায় না। নব্য-বঙ্গের উত্থান রূপ মহৎ কাজেই আনন্দ মোহনের দুর্লভ জীবন ব্যয়িত। আনন্দমোহনের মানবদেহ ধারণ সার্থক হইয়াছে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কিরূপে আনন্দমোহন অজেয় দেবশক্তি পাইলেন? আনন্দমোহন কেশবচন্দ্রের প্রদর্শিত ভক্তি-সিন্ধুতে অবগাহন করিয়া দুর্লভ চরিত্র-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন;—প্রতিভা বা বুদ্ধি, কৃতিত্ব বা স্বামীত্ব, অহংজ্ঞান বা কর্ত্তব্য, সব ভক্তিতে বিমিশ্রিত হইয়া তদীয় জীবনে এমন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল, যাহার তুলনা আর কোথাও পাইবে না। অনুসন্ধান কর, চিন্তা কর, গবেষণা কর—বুঝিতে পারিবে,—এদেশে আনন্দমোহনের সমতুল্য ব্যক্তি আর দেখিতে পাইবে না। তিনি নব্য-বঙ্গ উত্থানের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। যতদিন নব্য-বঙ্গ থাকিবে, ততদিন আনন্দমোহনকে ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিতে পাইবে। আজ সকলে "বন্দেমাতরমের" বিজয়-নিশান তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বল "জয় আনন্দমোহনের জয়, জয় নব্য-বঙ্গের জয়।"

---

# প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২। পরিব্রাজক। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত; "রামকৃষ্ণ মিশন" (১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সারদাপ্রেসে মুদ্রিত। পরিপাটী ছাপা ও কাগজ, ১৬২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য বার আনা মাত্র।

আমাদের হস্তে এই পুস্তকের বিশেষ সমালোচনা বা প্রশংসার যে প্রয়োজন হইবে, বিশ্বাস হয় না। পরলোকগত মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ যে পুস্তকের প্রণেতা, তাহার প্রচলন অনায়াস-লব্ধ। পুস্তকখানি এতই মনোরম যে, আমরা পড়িতে পড়িতে সম্মুখে যাঁহাকে পাইয়াছি, তাঁহাকেই সামান্য বার গণ্ডা পয়সা খরচ করিয়া, একবার ইহা অধ্যয়ন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। পয়সা সার্থক হইবে, পাঠে সকলেই অতুল আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিবেন।

ভক্ত স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থপ্রারম্ভে 'পরি-

চক্রে' লিখিতেছেন—"অতিথি যতিকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে স্থান দিবে কি? এবার কেবল ভারতভ্রমণ নহে; পৃথিবীর নানা স্থান পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা-দানে তিনি প্রস্তুত। * * * কিসে ভারতের বর্ত্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্ব্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে, এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাহার প্রতি পাদবিক্ষেপের মূলে। * * * হে স্বদেশী! তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহু শ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্য্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে?" আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থের ভিতরে যে সকল সারগর্ভ তত্ত্ব অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকটিত হইয়াছে, তাহার কিছু নিদর্শন পাইলে, কোন গৃহস্বামীর দ্বারস্থ হইয়া পরিব্রাজককে উপেক্ষায় প্রত্যাগমন করিতে হইবে না; তিনি সমাদরে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবেন ও তথায় ভক্তি-পুষ্প-চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া চির-আতিথ্য লাভ করিবেন।

গ্রন্থের পরিচয় গ্রন্থেই অন্তর্নিহিত। যথা—

(১) "রোজই তোমায় কি হচ্চে খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু ঐ বাঙ্গালী "কিন্তু" বড়ই গোল বাঁধায়। * * * কাজে সেটা অনন্ত "কাল" নামক সময়েতেই থাকে; এক পাও এগুতে পারে না।"

(২) "একটা বাহাদুরী আছে—তিনি (রামদাস হনুমান) লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস রাক্ষসীর চাঁদমুখ দেখে ছিলেন, আর আমরা রাক্ষস রাক্ষসীর দলের সঙ্গে যাচ্ছি।"

(৩) "ঐ ভারতবর্ষে যা হয়, তাই থেকে যায়। তার যত উন্নতি হোক না কেন, নীচের ধাপ গুলিতে উঠ্‌বার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপ গুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হোলো; তার ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথমে বেহালা হলো; ক্রমে কতরূপ বদল হলো, কত তার হলো, তাঁত হলো; ছড়ির নাম, রূপ বদলাল; এস্‌রাজ সারঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনো কি গাড়োয়ান মিঞারা, ঘোড়ার গাছ কতক বালাঞ্চি নিয়ে, একটা ভাঁড়ের মধ্যে বাঁশের ঠেঙ্গা বসিয়ে ক্যাঁ কোঁ করে "মজওয়ার কাহারের" জাল বুনবার বৃত্তান্ত জাহির করে না?"

(৪) "ইংরাজরাজ! তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ত হইয়াছে, আরও হোক্, আরও হোক্! কপ্‌নি, ধূতির টুক্‌রো পোরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু পায়ে শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লি যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়ে ছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়্‌লেই, দিশি ধর্ম্ম ছাড়্‌লেই, দিশি চালচলন ছাড়্‌লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাকি নাচ্‌বে, শুনে ছিলুম; কর্ত্তে যাই আর কি, এমন সময় গোরা-পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপসপ,—পালা, পালা, সাহেবিতে কাজ নাই, নেটিভ্‌ কব্‌লা!"

(৫) "নেতা বা সরদার কে হ'তে পারে?—"শিরদার ত সরদার"; মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। * * *"

৬। "এক 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মে'র বাড়ীতে ঢুকেছে চোর। কর্ত্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া করে, বেদম্ পিট্‌ছে। তখন কর্ত্তা দোতালার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন,—"ওরে মারিস্

নি, মারিস্ নি ; অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।” বাচ্ছা অহিংসারা, মার থামিয়ে, জিজ্ঞাসা করলে,—“তবে চোরকে কি করা যায় ?” কর্ত্তা আদেশ করলেন,—“ওকে থলিতে পুরে, জলে ফেলে দাও।” চোর যোড়হাত কোরে, আপ্যায়িত হয়ে, বল্লে—“আহা কর্ত্তার কি দয়া !”

আর কত উদ্ধৃত করিব। ইচ্ছা, সমস্ত পুস্তক খানাই তুলিয়া দিই। যে দৃশ্য নিজে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনার বলে, শত গুণ মধুময় হইয়াছে। অভিনব তাৎপর্য্যার্থ সকল জ্ঞাত হইয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। পুস্তকখানির মধ্যে কত সহস্র বিষয় যে আছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। স্বামীজির রঙ্গরস, তাহার প্রাণ-বিমোহন উপাখ্যান, তাঁহার সাধারণ চলতি ভাষা, তাঁহার বিষয়ের অভ্যন্তর-নিরীক্ষণ, তাহার ইতিহাসে দখল, অনেক কথা ভুকথায় সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার সমস্তই নৈপুণ্য পরিপূর্ণ—দেখিয়া, পড়িয়া, ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। যেখানে দোষ দেখিয়াছেন, শ্লেষবাক্য তাহাকে নির্ভীকচিত্তে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার পরিচয় ৬৩ ও ৬৪ পৃষ্ঠায় সিলোনি ঢং পাঠে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি স্বদেশের কাহারও দোষ দেখিতে পাইয়া অব্যাহতি দেন নাই। পাঠক একবার ৪৯, ৫০, ৫১ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখুন, ভারতের উচ্চবর্ণেরা মৃত, নীচবর্ণেরাই যথার্থ জীবিত, ইহা কি জ্বলন্ত ভাষায় স্বামীজি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভবিষ্যত ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হইতে আসিবে, স্বামীজির নিজ ভাষায় শুনুনঃ—

“তোমরা ( উচ্চবর্ণের লোকেরা ) শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে, দুনিয়া উলটে দিতে পারবে ; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম ! ! অতীতের কঙ্কালচয় !—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।”

আর প্রয়োজন নাই। কেমন পাঠক, পরিব্রাজকের পরিচয় পাইয়াছ ত ? ‘প্রাচীন পরিব্রাজক আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান।’ আপনার কুলত চির-প্রথিত আতিথ্যদানে পরিব্রাজককে কি বঞ্চিত করিবেন—পারিবেন কি ?—না, এখনও এত কঠিন প্রাণ হয় নাই।

৩। **কালার কথা**—শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রুদ্রকর (ফরিদপুর) হইতে শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা এডওয়ার্ড যন্ত্রে মুদ্রিত ; ১৮৩ পৃষ্ঠায়, ১৭৮টী চতুর্দ্দশ পদী কবিতায় সমাপ্ত। মূল্য উল্লিখিত হয় নাই।

পুস্তকখানির কবিত্ব-পূর্ণ নাম দেখিয়া, আমাদের অল্প বুদ্ধিদোষে ভাবিয়াছিলাম—বুঝি বা

কোন দুর্ভাগ্য মূক বধিরের হৃদয় গ্লানিতে ইহা পরিপূর্ণ। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমাদের সে ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। গ্রন্থকার কৃষ্ণবর্ণের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আশা,—"এ গ্রন্থ পাঠে যদি একটী স্বদেশবাসীরও 'কালার' প্রতি প্রীতি জন্মে, তাহা হইলেই গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে।" গ্রন্থকর্ত্তা এই সামান্য উদ্দেশ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষায়, এত শ্রম ও এত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়। বলা বাহুল্য, পুস্তকখানি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত ; বাঙ্গালীকেই এই পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে। আবার, বাঙ্গালীই 'কালা আদমী'। যে কালা আদমী, তাহাকে তাহার ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে, 'কালা' হইলেও প্রীতি ও স্নেহ করিতে হইবে, এই শিক্ষা দিবার জন্য, আমাদের মতে এ মহা বিরাট আয়োজনের আবশ্যক ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়, গ্রন্থকারেরও—

কালরূপে মজেছে যে মন,
ও সে যে মিস্‌মিসে কাল
অতি নিরুপম—

পরন্তু, শত সহস্র কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ প্রকৃতিতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, অতএব, যাহা কাল, তাহাই উৎকৃষ্ট, এ কোন্ যুক্তি-সিদ্ধ ন্যায়ানুমোদিত তর্ক, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমাদের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইল,—হায় রে, আমাদের পূর্ব্ব-আশানুযায়ী, গ্রন্থকর্ত্তা মূক ও বধির হইলে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেন।

৪। বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য—শ্রীগোলাপমোহেন প্রণীত। মাগুরা, ভুবনানন্দ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

অনেক চেষ্টা করিলাম, গলদঘর্ম্মও হইয়াছি, আমরা গ্রন্থকারের নিকটে ক্ষমা চাই, তাহার পুস্তকের জ্ঞান, আমাদের পূর্ণ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত স্ত্রী-শিক্ষার ন্যায়, নারিকেলের মালার মত, অর্দ্ধেকই রহিয়া গেল। বাবা, কবিতা পাঠ যদি এতটা শ্রমসাপেক্ষ হয়, গ্রন্থকারের পাঠকবর্গ এই অবসাদগ্রস্ত ভারতে আজও আবির্ভূত হয় নাই।

'বিশেষ দ্রষ্টব্য' ভূমিকায় গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন—"তিনি এক আশা পুষিয়া রাখিয়াছিলেন—জীবনের কোন এক সময়ে তাহার রচিত কোন একখানি গ্রন্থ বন্ধু বান্ধবকে প্রীতি-উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবেন।" আশা করি, গ্রন্থকারের সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে,—"বিধাতে তত সারবত্তা নাই। *** কাব্যের প্রতি চরণে হয়তঃ ছন্দঃ পতনের ছড়াছড়ি। পদে পদে অমিল। ভাষার প্রাঞ্জলতার নিতান্ত অভাব। বাকচাতুর্য্য, পদলালিত্য প্রভৃতির আদৌ 'গোজর' (?) নাই।" তবে এ উপহারের উদ্দেশ্য তিনি বলেন,—"গ্রাহকের মনস্তুষ্টি-সাধন"। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, Confession is good for the soul—গ্রন্থকারের পরলোকে সংগতি, অনিবার্য্য। কিন্তু, তিনি কি সত্য সত্যই বিবেচনা করেন, বঙ্গীয়-পাঠক-মণ্ডলীর এতদূর পতন হইয়াছে যে, সারবত্তা'-শূন্য কাব্য তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধনে সক্ষম হইবে। যদি হয়, সেই অন্তঃসারশূন্য পাঠকবর্গের নিকটে আমাদের সানুনয় নিবেদন, সত্বর তাঁহারা যেন পূর্ব্বোল্লিখিত আট আনা মূল্য গ্রন্থকারের নিকটে প্রেরণ করিয়া, "সমাজের কল্যাণকারিণী, শুভবিধায়িনী বঙ্গীয় মহিলাগণের প্রতি ভ্রূকুটি"-উপহার গ্রহণে প্রাণের তৃষ্ণা মিটান। ...

দের কেবল দুঃখ এই, সাহিত্য-গুরু বঙ্কিম চন্দ্রের তিরোধানের এত অল্প কালের মধ্যেই বাঙ্গলার নব্য-লেখকদিগের প্রতি তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশাবলীর পঞ্চম নীতিটী (প্রচার, মাঘ, ১২৯১ সাল, দেখুন) কর্ম্মনাশার জলে বিলীন হইল!!

৫। প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীসরোজ-বাসিনী গুপ্তা প্রণীত। বরিশাল আদর্শ-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ও আদর্শ-যন্ত্রে মুদ্রিত। ১০৭ পৃষ্ঠা। ৩২টা কবিতা আছে। মূল্য আট আনা। কাপড়ে-বাঁধা বার আনা।

টা'য়ে টা'য়ে, রা'য়ে রা'য়ে, মিলাইতে পারিলেই যে কবিতা হয়, যিনি ইহা মনে করেন, তাঁহার ন্যায় ভ্রান্ত আর নাই। কবিতার রস বলিয়া একটা জিনিষ আছে, একটা 'মমতা' আছে, একটা ভাব আছে—Expression আছে। আজ কাল ভূরি ভূরি ছন্দে মিলান রচনা আমরা দেখিতে পাই—ভাবিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, তাহাদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি? এইহেতু, সাধারণত এদেশে কবিতার উপরই একটা অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িতেছে। পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে অনুসন্ধানে জানা যায়, কবিতার আর সেরূপ আদর নাই; কবিতা পুস্তকের আদর কমিয়াছে বলিয়াই, কলিকাতার নূতন রাস্তার মোড়ে, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শত শত কবিতা-পুস্তক এক পয়সা মূল্যে বিক্রয় হয়। উত্তম কবিতা যে আজকাল আর লেখা হয় না, আমরা সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু, এত অধিক আবর্জ্জনাপূর্ণ কবিতা-পুস্তকের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে যে, পাঠকবর্গ ঠকিয়া ঠকিয়া, এখন কবিতার বাজারে অগ্রসর হইতেই ভীত হন। ইহার ফলে, পদ্মোক্ত-ভাবে, স্বনামখ্যাত কবি ব্যতীত, উন্নত নবীন প্রকৃত কবিও তাহার 'সওদা' লইয়া, বাজারে যাইতে সাহসী হইতেছেন না। ক্রমে, এই কারণে, বঙ্গ-সাহিত্য-বাজারে উত্তম কবিতার অভাব হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গে কবিতা-দুর্ভিক্ষ-আসন্নপ্রায়।

মহিলাদিগের প্রাণ-'প্রীতি'তে স্বতঃই গ্রন্থের ন্যায় সরল [illegible]নীভূত হয়, প্রচারে, আশা হয়, এই অপবাদ [illegible] বি[illegible]সাধ্য শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে আ[illegible]রস দানাদার হ[illegible]ব আকাঙ্ক্ষা নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র শর্করায় পরিণত হ[illegible] সহকে আস্বাদ্য পাঠ্য করি[illegible]স প্রাণ তাহাতে তখন [illegible]ময় হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'; ইহার প্রমাণ গিরীন্দ্রমোহিনীর 'গাথা'। ইহার কথঞ্চিত প্রমাণ পাইলাম, নবীন-কবি সরোজবাসিনীর 'প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি'তে।

মানকুমারীর যে দুঃখ, গিরীন্দ্রমোহিনীর যে অবস্থা, সেই বঙ্গরমণীর সর্ব্বপ্রধান আঘাতে নবীন লেখিকার কোমল হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

বিদ্যুৎ চমক শেষে পথিকের ধাঁধা সম,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হায়! সুখের স্বপন মম!
সকলি গিয়াছে, হায়! জগতে কি আছে আর?
আছে তব স্মৃতিটুকু—আছে শুধু অশ্রুধার!

ব্যথার ব্যথী না হইলে, ব্যথিতের দুঃখ কে প্রকাশ করিতে পারে? সম-দুঃখে দুঃখী সরোজবাসিনী বঙ্গ-বিধবার কি মর্ম্মান্তিক কাহিনী প্রচার করিতেছেন, পাঠক একবার হৃদয়ঙ্গম করুন—

শিরীষ কুসুম প্রায় কত যে বালিকা হায়,
—বুঝেনা সে ভালমন্দ, সুকোমলমতি—
বোঝে না সে কার্য্যাকার্য্য, সে পালিছে ব্রহ্মচর্য্য,
চেনেনা জানেনা বালা—কেমন সে পতি!
এই দুঃখ নিবারিতে, নাহি কিছু পৃথিবীতে
বিধবার অশ্রু মুছিবে না-আর!

তাঁহারা কাঁদিতে ভবে এসেছিল, কেঁদে যাবে
কপালের লেখা যে গো দোষ দিব কা'র!

জগতের সুখ শান্তিতে অশ্রদ্ধা জন্মিলে, ঐহিক যন্ত্রণা অসহ্য হইলে, মানবের প্রাণ তৃপ্তিহেতু অন্তরঙ্গ সাধনের পথে ধাবিত হয়। বাহ্যজগত তখন শুধু যন্ত্রণার কারণ হয়। চিত্ত তখন নির্ব্বাণ লাভ করিয়া, মোক্ষ লাভের জন্য [illegible] শান্তি [illegible] আকাঙ্ক্ষায়, এত শ্রম ও হইয়া উঠে [illegible] ও, [illegible]য় করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার মর্ম্মান্তি[illegible] পুস্তকখানি বাঙ্গলাভাষা[illegible] লিপি ভারবহু[illegible] হইয়াছে। [illegible]ন বলিতে[illegible] এই [illegible] ধ্যায়ন ছেন,—

শ্রদ্ধায় চন্দনে মাখি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
অভয় চরণ তলে,
দাও সবে কুতূহলে :
প্রবৃত্তি নৈবেদ্য দাও, জ্ঞান-বাতি জ্বালি,
মা'র পদতলে দাও ষড়রিপু বলি।
জীবন দক্ষিণা দাও, ও রাঙ্গা চরণে,
দেখিতে হবে না আর,
এ সংসার কারাগার,
জ্বলিতে হবে না আর তাপের দহনে ;
ভুল না মায়ের নাম জীবনে মরণে।

পুস্তকখানিতে এরূপ সুন্দর সুন্দর স্থান অনেক আছে, ইচ্ছা হয় পাঠকবর্গকে শুনাই। সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কাজেই সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে হইল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নবীন লেখিবার মঙ্গলকামনা করি। আমরা আশা করি, নবীন লেখিকা এই প্রথম উদ্যমে যে মনোরম প্রসূন-সৌরভ বিস্তার করিয়াছেন, সাধারণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, ভবিষ্যতে বঙ্গীয়-কাব্য-উদ্যানে আরো নব নব সুষমা বিস্তার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

৬। সঙ্গীত-প্রেমাঞ্জলি।— শ্রীমহেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিরচিত। সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মুদ্রাঙ্কন পরিপাটী, কাগজও আইভরি ফিনিস। ৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে ১২৫শ টী প্রেমপূর্ণ গান আছে। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তকখানি আমরা সমালোচনার্থে না পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। কোন এক শ্রেণীর লোকের নিকট ইহা সমাদৃত হইবে, কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সঙ্গীতগুলির রুচি সুমার্জ্জিত নহে। ইহাতে দেশের বিশেষ উপকার হইবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। হৃদয়ের সকল কথা গদ্যে, পদ্যে ও সঙ্গীতে প্রকাশিত করায় কি যে বিশেষ পৌরুষ আছে, আমরা বুঝিতে একান্তই অক্ষম। বাণী বীণাপাণি একবার সম্মার্জ্জনী পাণি হইয়াছে— যাক্। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—"* * * মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম।"—তথাস্তু। যদি সত্যই না বলিতে পারিলাম, তবে নীরব থাকাই শ্রেয়।

৭।—স্বদেশী আন্দোলন—কথা, ও ধর্ম্ম—বঙ্গবাসীর নিকট শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল, বি, এল, মহাশয়ের নিবেদন। ঢাকা বাঙ্গলাবাজার, স্যমন্তক যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৯ পৃষ্ঠা। বিনামূল্যে বিতরিত।

স্বদেশ-বৎসল ভাওয়াল মহাশয় এই সারগর্ভ প্রবন্ধে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের ও বিদেশ-জাত দ্রব্যের বর্জ্জন ও পরিহার বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিরূপে দেশের শিল্প মরিয়াছে, শিল্পী মরিয়াছে— প্রাসাদ কুটীরে ও কুটীর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—জনপদ অরণ্য হইয়াছে, এ দেশে দুর্ভিক্ষের বাসাবাড়ী হইয়াছে—এই প্রবন্ধে সে সকল তত্ত্ব লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশে এক বৎসরে কি পরিমাণে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হয়, তাহার একটী তালিকা সন্নিবিষ্ট করিয়া আমাদের দুরবস্থা দেখাইয়া দিয়াছেন।

দেশের দুরবস্থার হৃদয়বিদারক চিত্র অঙ্কিত করিয়াই ভাওয়াল মহাশয় নিরস্ত হন নাই। এই দুরবস্থা মোচনের উপায় সম্বন্ধেও তাঁহার প্রস্তাব আছে। তাঁহার মতে, সূতা প্রস্তুতের সুব্যবস্থা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ত্যক্ত জিনিষের পুনর্গ্রহণ মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিবেচনায়, চরকা সহযোগে সূত্র প্রস্তুতের প্রস্তাব ততদূর যে কার্য্যকর হইবে, তিনি সন্দেহ করেন। কলের সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করাই তাহার অনুমোদিত। বিস্তারিত হিসাবাদি দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রামে গ্রামে,মহকুমায় মহকুমায়,জেলায় জেলায়,নগরীতে নগরীতে, কি উপায় অবলম্বন করিলে অর্থসংগ্রহ হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"'দেশীয় প্রথানুসারে বঙ্গীয় জমিদার ও ধনীর গৃহে সাত্বিক "শক্তি পূজা" উপলক্ষে রাজসিক ও তামসিক আমোদ প্রমোদে বর্ষে বর্ষে যে টাকা ব্যয়িত হয়, ঐ টাকা যদি ঐ ভাবে ব্যয়িত না হইয়া, জন্মভূমির পূজায় ব্যয়িত হয়, তবে ১০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ কলকারখানায় ছাইয়া যাইতে পারে।"—সত্য কথা! কিন্তু ভাওয়াল মহাশয়ের এ সমস্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে সততা, বিচক্ষণতা, কার্য্য-তৎপরতা, স্বার্থহীনতা এবং সর্ব্বোপরি যে প্রকৃত স্বদেশবাৎসল্য প্রয়োজন, তাহা কোথায়? স্বদেশী আন্দোলনে ভাওয়াল মহাশয় জীবনের যে ঈষৎ স্পন্দন লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, আমরা এখনও নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আশা করি, ভাওয়াল মহাশয়ের কেবল অরণ্যে রোদন করা হইবে না।

৮। **সনাতন-ধর্ম্ম**—প্রথম শিক্ষা। ৫৬ পদ্মপুকুর রোডে প্রাপ্তব্য। বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত। পরিষ্কার ছাপা; ২৬৬ পৃষ্ঠা। অতি সুন্দর বিলাতী ধরণে কাপড়ের বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা।

যাহাতে আর্য্য সন্তানগণ অনায়াসে শাস্ত্রার্থের কথঞ্চিত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, এতদুদ্দেশ্যে কাশীধামস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের ট্রষ্টীগণ যে সুন্দর গ্রন্থ ইংরাজীতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রকৃত পক্ষে সুকুমারমতি বালক ও যুবকদিগের নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও, প্রাপ্তবয়স্ক অনেকেই ইহা অধ্যয়নে প্রীতিলাভ ও উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের ধ্রুববিশ্বাস। অধুনাতন শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও দিন দিন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা বর্দ্ধিত হইতেছে। এই গ্রন্থের ন্যায় সরল ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির প্রচারে, আশা হয়, এই অপবাদ দূর হইবে। শ্রমসাধ্য শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে আজকালকার লোকের আকাঙ্ক্ষা নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র-সমুদ্রের গূঢ় তত্ত্ব সকল সংক্ষেপে সুপাঠ্য করিয়া প্রচার করা যেমন দুরূহ ব্যাপার, সংক্ষেপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাও সেইরূপ বা ততোধিক কঠিন। তবে, সহজধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারে লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে। নামে একবার রুচি জন্মিলে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

আজ কাল, প্রকৃত ধর্ম্মে মতি গতি যেমন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থের সকল মতের সহিত আমরা একমত না হইলেও ইহার প্রকাশে যে দেশের প্রভূত উপকার হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সকলের মত যে এক হইবে, এমন কোন কারণ নাই। মত এক না হইলেও, সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনকল্পে সর্ব্বমত পর্য্যালোচনা করা সম্যকরূপে কর্ত্তব্য।

যে দিক দিয়াই ধরা যাউক, আমরা সদা সর্ব্বদাই এই প্রকার গ্রন্থের মঙ্গলকামনা করিয়া থাকি। বিধাতা গ্রন্থ-প্রকাশকের মঙ্গল করুন।

৯। **আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; ৫৯ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, বকলণ্ড-প্রেস হইতে মুদ্রিত। ৫৮ পৃষ্ঠা। স্বামীজির একখানি হাফ্‌টোন প্রতিকৃতি সম্বলিত। মূল্য অনুল্লেখিত।

প্রবন্ধটী পূর্ব্বে 'বান্ধব'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন,

"* * যাঁহারা হিন্দু-জাতির সংস্কারপ্রার্থী,—যাঁহারা এই বিপন্ন ও ব্যাধিজীর্ণ হিন্দুর উদ্ধার-কল্পে বস্তুতই অভিলাষী, এবং তন্নিমিত্ত হিন্দুর সংস্কার সম্পর্কীয় রীতি-প্রণালীর আলোচনায় যাঁহারা সবিশেষ অনুরাগী, তাঁহাদিগের পক্ষে এই পুস্তিকা কোন না কোন উপকারে আসিবে বলিয়া ভরসা আছে।" বিনয়বশতঃ দেবেন্দ্র বাবু আশা এই পর্য্যন্ত রাখিলেও, আমাদের ন্যায় উচ্চ অভিলাষ-বিবর্জ্জিত ব্যক্তিও পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছে। বীরপূজা যে জাতীয় উন্নতির মূল, আমরা তাহা বহুবার বলিয়া আসিয়াছি। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যে আদর্শ সংস্কারক ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিয়া, দেবেন্দ্র বাবু যদি একটী পাঠকেরও হৃদয়ে স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে সমর্থ হন, তাঁহার শ্রম সফল হইবে, বিশ্বাস করি।

রুগ্নজনেরই চিকিৎসকের প্রয়োজন। হিন্দু-জাতি এখন বড়ই রুগ্ন। মহাত্মা দয়ানন্দ-প্রমুখ সাধুভক্তের সাধনার ফল তাঁহাদের বিমল চরিত্রের সুবাতাসে বসবাস করা, সেই অচলা ভক্তির, সেই গভীর জ্ঞানের, সেই বিমল-চরিত্রের সরসীতে স্নান করা, সেই বিশ্বাস,সেই বৈরাগ্য, সেই সেবার অমৃতময় ফল সেবনই এই দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র ঔষধ ও পথ্য।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে, স্বামীজির সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে, হিন্দুপ্রকৃতি, হিন্দু-জীবন ও হিন্দু-সমাজের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আছে। অতঃপর, স্বজাতিজ্ঞতা, স্বজাতি-প্রিয়তা, রক্ষণ-পরতা, সত্যনিষ্ঠা, সত্যের শক্তিতে বিশ্বাস, আত্ম-বিলোপ প্রভৃতি, সংস্কারকের বিশেষ বিশেষ লক্ষণাবলীর আলোচনা করিয়া, গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, এই সকল প্রত্যেকটী গুণই মহাত্মা দয়ানন্দে বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত, হিন্দু-সংস্কারক হইতে হইলে যে সকল বিশেষ বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন, স্বামীজির যে তাহার কোনটীর অভাব ছিল না, তাহাও পুস্তকখানি পাঠে প্রতীয়মান হইবে। আমরা পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা পাইয়াছি। বস্তুতঃ, ক্ষুদ্র হইলেও পুস্তকখানি বেশ সারগর্ভ গবেষণা-পূর্ণ।

১০। সরল সেতার-শিক্ষা। শ্রীবনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক সংকলিত ও সংরচিত। মূল্য ২॥০।

বৈজ্ঞানিক-প্রণালীর অনুক্রমে এই সুবিস্তৃত পুস্তক খানি সংরচিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি অতীব সুন্দর হইয়াছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রের ইতিহাস অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; একটু স্থান তুলিয়া দিলাম, যথা—

"এইক্ষণকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে অনুমান করেন যে, যে সময়ে আর্য্য পুরুষগণ মধ্য আসিয়ার সুবিস্তৃত ভূখণ্ড হইতে হিন্দুকুশ প্রভৃতি পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন করিয়া পঞ্চনদে উপস্থিত হন, সেই বৈদিককালে তাঁহারা বিজ্ঞান-বলে "স রি গ ম প ধ নি" এই স্বর-সপ্তক এবং উদারা মুদারা তারা গ্রাম-ত্রিতয় ও গমক, মূর্চ্ছনা, শ্রুতি রাগ রাগিণী ইত্যাদি সৃষ্টি করেন, তৎপরে তাঁহারা পূত পঞ্চনদ-বাহিনী সরস্বতী ও সিন্ধুতীরে উপবিষ্ট হইয়া সুমধুর স্বরে সাম গীত গান করিতেন। কোন কোন পুরাবৃত্তসন্ধিৎসু ব্যক্তি ঋক্ যজুঃ হইতে সামবেদকে পরবর্ত্তি-কালের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে "ব্রহ্মা অগ্নি হইতে ঋক্‌বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।" ইহার অন্যবিধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও থাকিতে পারে; ফল কথা, মনুর এই বচনানুসারে সামবেদকে ঋক্‌বেদের সমসাময়িক বলিয়া বিশ্বাস করা অসঙ্গত নহে, সুতরাং সপ্রমাণ হইতেছে, বৈদিককালেই সঙ্গীত বিশুদ্ধপ্রণালীতে সৃষ্ট হইয়াছে।"

এই পুস্তকখানি বিশেষ ভাবে আদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

# বালযোগী ধ্রুব। (১)

ভক্তিরস প্রধান পুণ্যস্তম্ভ শ্রীমৎভাগবতে বালযোগী ধ্রুব-চরিত্র কি মধুর! কি মধুর! নিত্য-সুখপাঠ্য, নিত্য-নবীন ও চির-মধুর। ভাগবত-শাস্ত্রে মহাযোগী ধ্রুবের চরিত্র-বিবরণ যেন দেবদুর্লভ অমৃত রসের অপূর্ব্ব ও অনন্ত নির্ঝর! এই অত্যাশ্চর্য্য যোগীশ্রেষ্ঠের অতুলনীয় কার্য্যকলাপ যেমন মায়ামুগ্ধ মানবের সৎশিক্ষার জন্য সুদৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত তেমনি সনাতন হিন্দুর শাশ্বত-ধর্ম্মের অসাধারণ সামর্থ্যের অত্যুজ্জ্বল পরিচায়ক বলিয়া সুপরিচিত। বাস্তবিক বালযোগী ধ্রুবের বিবরণ মধু হইতে মধুময়, এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর। ভগবৎ ভক্ত পুরুষের ইহা পরমানন্দের আকর, বিশুদ্ধ আর্য্য-সন্তানের মহত্ত্বের ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অসীম সামর্থ্যশালী অনাদি ও অনন্ত পুরুষের ভক্তবৎসলতা গুণের ইহা প্রধান দৃষ্টান্ত এবং ধ্যানপরায়ণ যোগীদিগের যোগ-বিদ্যার অসাধারণতার ইহা অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয়। কেবল চর্ম্মচক্ষু দ্বারা ধ্রুব-চরিত্র পাঠ করিলে, কেহ ইহাকে "অসম্ভব ব্যাপার," কেহ ইহাকে "কাল্পনিক," কেহ "উপকথা" কেহবা কেবল ভাষাভিজ্ঞতার সহায়তায় বহির্দ্দেশস্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া ইহাকে "পৌরাণিক কাহিনী" ভাবিয়া নিরস্ত হইতে পারেন, কিন্তু দিব্যচক্ষু দ্বারা বিবেকী-পুরুষ যখন মহাযোগী ধ্রুবের পবিত্র জীবন-চরিত্র পাঠ করিয়া ইহার আভ্যন্তরিক মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন অপার আধ্যাত্মিক আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্ঞানালোকে হৃদয় আলোকিত, ব্রহ্মপ্রেম ভাবে স্বকীয় জীবনকে উন্নত এবং ভগবৎভক্তিভাবে নয়নদ্বয়কে প্রেমাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত বোধ করেন। যাহা হউক, ধ্রুব-চরিত্রকে যে ভাবেই আলোচনা কর, ইহা নিতুই নবীন, নিতুই আনন্দখনি এবং সদা সুখপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। শ্রীমৎ ভাগবতের মহর্ষি মহোদয় লিখিয়াছেন,—"বিপুল-কীর্ত্তি ধ্রুবের সাধুসম্মত চরিত্র যিনি পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি পবিত্রতা লাভ করেন। ধ্রুব-চরিত ধন্য, পবিত্র, আয়ুষ্কর, যশোবর্দ্ধক, মহৎ স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ, স্বর্গ-প্রাপক, নিত্য পদদায়ী, প্রশংসনীয় এবং পাপনাশক। কৃষ্ণভক্ত-ধ্রুবের এই সুপবিত্র বিবরণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ ও নিষ্কামভাবে অনুসরণ করিলে শ্রীহরিতে ভক্তি জন্মে, আত্মপ্রসাদের উৎপত্তি হয়, এবং বহুক্লেশ দূরীভূত হইয়া যায়। শ্রোতা বা পাঠকের যদি মহত্ত্ব লাভ করিবার বাসনা থাকে তাহা হইলে ধ্রুব-চরিত পাঠ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা শ্রবণ করিলে সদ্গুণপ্রার্থী শীলাদি গুণ, তেজঃপ্রার্থী তেজ এবং মনস্বীব্যক্তি উন্নত মন প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" পাঠক মহাশয়, ধ্রুব-চরিত্রের ইহাই শাস্ত্রসম্মত ফলশ্রুতি। ইহা মহা মহর্ষির প্রত্যাদিষ্ট উপদেশ ও ব্রহ্মবাক্য। অনেকে শাস্ত্র পাঠ করেন, অনেকে ধ্রুব-চরিত্র শ্রবণ ও পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্র-সম্মত সুফল কয়জনে অর্জ্জন করিয়া থাকেন? অনেকে যে এবম্প্রকার সুফল প্রাপ্ত হয়েন না, ইহা ধ্রুব-বাক্য। খ্রীষ্টানদিগের সুবিখ্যাত সাধুপল লিখিয়াছেন—"Ever learning, never knowing" অর্থাৎ "চিরদিনই

পাঠ হয় কিন্তু কখনই জ্ঞান হয় না"। আর একজন বিদেশীয় ব্রহ্মবিদ লিখিতেছেন—"You do not know what you read"—তুমি কি পাঠ কর তাহা তুমি জান না। সাধুপল আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"Ye ask but ye receive not, because ye do not know how to ask"—তুমি প্রার্থনা করিয়াও অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হও না, কারণ কেমন করিয়া প্রার্থনা করিতে হয় তাহা তুমি জ্ঞাত নহ। গোস্বামীগুরু তুলসী দাস কহিয়াছেন—

পুঁথি পড়ি পড়ি জনম্ বিতা
পণ্ডিত ভয়া না কোয়।
একই অচ্ছর্ প্রেমকা পড়ে
সো জন পণ্ডিত হোয়॥

গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি কেহ পণ্ডিত হইল না। যে ব্যক্তি প্রেমের একটি মাত্রও অক্ষর পড়িতে জানে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়। এক্ষণে পাঠক-মহাশয়েরা নিজ নিজ বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিয়া লউন, ফলশ্রুতি-লেখকের দোষ, কি অজ্ঞ পাঠকের দোষ।

যাহা হউক, পাঠক মহাশয়! এক্ষণে জগৎযশস্বী ধ্রুবের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। উত্তানপাদ নামক এক নরপতির সুনীতি ও সুরুচি নামে দুই সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তন্মধ্যে সুরুচিই রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুনীতিকে রাজা মহাশয় যথোচিত স্নেহ করিতেন না। এক পুরুষের দুই জন স্ত্রী হইলে সচরাচর যেরূপ অশান্তি ও অসুখের উদয় হয়, রাজা উত্তানপাদের প্রাসাদেও তাহাই ঘটিয়াছিল। রাণীদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরে সদ্ভাব ছিল না। সুরুচির গর্ভজাত পুত্র যে প্রকার আদর প্রাপ্ত হইত, সুনীতির গর্ভজাত বালক তদ্রূপ স্নেহ প্রাপ্ত হইত না। এক দিবস নরপতি উত্তানপাদ সুরুচির পুত্রকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আদর করিতে করিতে স্নেহময়, সুপ্রিয় ও সুমিষ্ট বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে রাণী সুনীতির বালক পুত্র ধ্রুব তথায় উপস্থিত হইল, কিন্তু রাজা কিম্বা রাণী কেহই তাঁহাকে স্নেহ বা আদর করিলেন না। বালক ধ্রুব তাহার পিতা উত্তানপাদের ক্রোড়ে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রাজা তাহার সমাদর করিলেন না। গর্ব্বিতা সুরুচি সপত্নী তনয়ের এতাদৃশ লাঞ্ছনা দর্শন করিয়া ঐকান্তিকী প্রীতি লাভ পূর্ব্বক নরপতির সম্মুখে কহিতে লাগিলেন,—"বৎস ধ্রুব! তুমি রাজপুত্র সত্য, কিন্তু আমার গর্ভে তুমি জন্ম গ্রহণ কর নাই, সুতরাং আমার তনয়ের তুল্য সমাদর তুমি কেমনে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর? তুমি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে নিশ্চয়ই অনুপযুক্ত। কারণ, তুমি অন্য মহিষী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, সুনীতিসুত বলিয়া গণ্য হইয়াছ। যাহা হউক, রে অবোধ বালক! রে দুরাকাঙ্ক্ষী সুনীতি-সন্তান! যদি সত্য সত্যই রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবার জন্য তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তপস্যা দ্বারা পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়া তাঁহার করুণা ও আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতে পরিশ্রম কর।" রাণীর দুর্ব্বাক্য বাণে বালক সন্তানের হৃদয় বিদ্ধ হইয়া গেল। নিরপরাধী বালক দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নয়নদ্বয় হইতে অনিবার অশ্রুপতন করিতে লাগিল; কিন্তু রাজা তাহার পিতা হইয়াও তাহাকে সান্ত্বনা অথবা বিমাতা রাণীকে একটি মাত্রও উপদেশ

বাক্য কহিলেন না। যাহা হউক, বালক ধ্রুব কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার গর্ভধারিণী সুনীতির নিকট উপস্থিত হইয়া রাজা ও রাণীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা আদ্যন্ত বর্ণনা করিল। নির্ম্মল চরিত্রা সুনীতি সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন—"হে পুত্র! আমি বাস্তবিক হতভাগিনী; তোমার পিতা আমাকে রাণী (ভার্য্যা) বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক, দাসী বলিয়াও স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করেন। যাহা হউক, হে বৎস! তোমার বিমাতা তোমাকে একটি অত্যন্ত সত্য ও সারবান কথা কহিয়াছেন, তুমি সেই প্রয়োজনীয় কথার অনুসরণ কর। যদি বাস্তবিক তোমার পিতৃদেবের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া পূতজন্ম ও কৃতার্থ জীবন হও। শ্রীভগবান সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হইয়া এই বিশ্ব সংসার পালন ও রক্ষণ করিতেছেন। যোগীজন মন প্রাণ জয় করিয়া তাঁহারাই পদারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন এবং এবম্প্রকার ধ্যানে ঐকান্তিক সুখলাভ করেন। হে পুত্র! মুক্তি অভিলাষী মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে শ্রীহরি চরণ সেবা করা মুখ্য কর্ত্তব্য। তুমি স্বধর্ম্ম-শোধিত অনন্য ভাব চিত্তদ্বারা তাঁহাকেই অর্চ্চনা কর; সেই ভক্তবৎসল ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ তোমার এই মনোদুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে না।" গর্ভধারিনীর বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বালক ধ্রুব চিত্ত সংযম পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে সুনীতি কহিলেন—"বৎস! ভগবানের ধ্যানে যদি তোমার চিত্ত সংযত হইয়া থাকে, যদি সেই দেব দুর্লভ পদারবিন্দের মধু পানে তোমার মনভৃঙ্গ একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষা কর; আমি তোমাকে ভক্তাধিক ভক্ত সাধুর ন্যায় সাজাইয়া দিই। কিন্তু বৎস! আমি হতভাগিনী ও দরিদ্রা; রাণী হইয়াও আমি নিঃস্বা এবং চিরদুঃখিনী; বিদেশে পুত্রকে প্রেরণ করিবার সময়ে তাহাকে যথোচিত ভাবে সুসজ্জিত করিয়া, তাহার সঙ্গে সম্বল স্বরূপে কিঞ্চিৎ প্রদান করা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রিয়তম! মূল্যবান মণিমাণিক্য বা সুশোভন সুবর্ণাদি কোথায় পাইব? হৃদয়ানন্দদায়ী হীরকই বা কোথায়? সুতরাং আমি তোমাকে অন্য প্রকার অলঙ্কারে সাজাইয়া দিতে বাসনা করি।" এই পর্য্যন্ত কহিয়া ধর্ম্মপরায়ণা সুনীতি পুনরপি বলিলেন—"বৎস! তুমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, তুমি আদর্শ ক্ষত্রিয় বালক; সুশীলতার তুমি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমার যতটুকু সামর্থ্য হইতে পারে, তদনুসারে তোমাকে অলঙ্কৃত করিয়া মনের সাধ মিটাইব। বৎস! বিশুদ্ধ ভক্তি-চন্দনে তোমার সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত হউক; পবিত্র ও সুগন্ধ ভক্তি-চন্দন দ্বারা তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ শ্রীহরির সুধাময় নামে চিত্রিত হউক; সত্যের মালা তুমি কণ্ঠে ধারণ কর, প্রেম তোমার দণ্ড এবং ধৃতি তোমার কমণ্ডলু হউক, বলয়রূপে দয়া তোমার বাহুদ্বয়ের শোভা বর্দ্ধন করুক, প্রীতি তোমার কৌপীন এবং আনন্দ তোমার বহির্বাস হউক, তুমি অনন্ত আকাশকে মস্তকাবরণ ও মাতা বসুধাকে শয্যা ও আসন জ্ঞান কর, অধ্যবসায় তোমার পাত্র এবং সাহস তোমার তপাগ্নি হউক; জীব সমূহ তোমার সখা হউক, বায়ু তোমার বিজনী ও সুকোমল নবীন শস্পক্ষেত্র তোমার বিচরণের স্থান হউক, এবং ক্ষুধিত ও পিপাসিত বোধ করিলে, হে বৎস!

তুমি সেই পরমারাধ্য পরমকীর্ত্তি পরমেশ্বরের সর্ব্বদুঃখহারী পবিত্র নামামৃত ভোজন অথবা ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত অখণ্ড সুখময় মুক্তি-নীর পান করিয়া বিমল শান্তি লাভ করিও।" * বালক ধ্রুব জননীর নিকটে এই সকল দেবদুর্লভ অমূল্য আশীর্ব্বাদ অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইলেন। ক্রমে এই সকল বৃত্তান্ত দেবর্ষি নারদের কর্ণগোচর হইল। তিনি অতীব বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই ক্ষত্রিয় বালকের কি অসাধারণ তেজ! ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ অপমান সহ্য করিতে অসমর্থ। যাহাহউক, এক পুরুষের দুই স্ত্রী জীবিতা থাকিলে যে কুফল হয়, রাজা উত্তানপাদের প্রাসাদে তাহাই হইয়াছে। যাহাহউক, দেবর্ষি নারদ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ধ্রুব তথায় উপস্থিত হইল; মুনিবর তাঁহার পাপনাশন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি এখন ও বালক, বালকেরা সকল সময়েই ক্রীড়াসক্ত, অতএব এ অবস্থায় তোমার মান বা অপমান সমতুল্য। সংসারে মনুষ্যগণ আপনাপন কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং মানাপমানে সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নহে। কারণ এইরূপ ভেদবোধ মায়ার কার্য্য। অতএব সর্ব্ব শক্তিমান ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ইহা বিবেচনা করিয়া সুবুদ্ধি পুরুষেরা দৈব হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই প্রীত ও শান্ত থাকেন। তোমার মাতা উপদেশচ্ছলে যে প্রকার সাধনায় নিযুক্ত হইতে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত কঠিন; জিতেন্দ্রিয় যোগীগণ অতীব ক্লেশে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তাহাও সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। সুতরাং এই অসাধারণ উদ্যম হইতে বিরত হও। আপাততঃ ইহাতে কোন ফলোৎপন্ন হইবে না। বয়সের আধিক্যকালে শ্রীহরির চরণারবিন্দের সুধাপানে পরিশ্রম করিও; বাল্যাবস্থায় প্রবৃদ্ধ পুরুষের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইও না। সুখ ও দুঃখকে সমতুল্য জ্ঞান করিয়া, ভগবানে ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়াই মোক্ষধনার্জ্জনের চেষ্টা কর।" মহর্ষি নারদ ধ্রুবকে অনেক উপদেশ বাক্য শুনাইলেন বটে, কিন্তু ধ্রুবের মনোমধ্যে তখন রজঃগুণের প্রবলতা ছিল, সুতরাং মহর্ষির কথায় বালক ধ্রুব মনোযোগী হইল না। ধ্রুব ক্ষত্রিয়ের সন্তান, রজঃগুণে তাহার জন্ম, বিমাতার দুর্ব্বাক্য বাণে তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে ছিল, সুতরাং প্রবলভাবে রজঃগুণের বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার চিত্ত শান্ত হইতে পারিতে ছিল না। মহর্ষি নারদ পুনরপি বলিলেন,—"হে বৎস ধ্রুব! তোমার সাহস, প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় চিন্তা করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম; এক্ষণে তোমাকে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান্ বাসুদেব তোমার অভীষ্ট লাভের পথস্বরূপ। তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁহাকেই ভজনা কর। যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ আপন কুশল কামনা করিবেন, তিনি একমাত্র সেই পতিতপাবন, অধমতারণ, অদ্বিতীয় শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা করিবেন; তদ্ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। বৎস! তুমি যমুনাতীরস্থ সুপবিত্র মধুবনে গমন কর; আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি প্রথমে পুণ্যসলিলা যমুনার বিমল জলে স্নান করিয়া, পিতৃলোকদিগের তর্পণ এবং দেবতা-

---

* সুনীতির এই কথাগুলি শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। আমি অন্য গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।—লেখক।

দিগের পূজা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত আসনে উপবেশন করিবে। পরে, তিন প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনশ্চাঞ্চল্য বিনাশ করিয়া, নির্ম্মল ও নিশ্চল মনে শ্রীহরির ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবে। ভগবান বাসুদেব জীবের আশ্রয়, পুরুষার্থের আকর, শরণাগত-প্রতিপালক ও করুণার সাগর। তিনি অনাথের শরণ, পতিতের জীবন, দীনের বন্ধু, কৃপার সিন্ধু, ভক্তের ভরসা এবং দুঃখীর দারিদ্র্য-দুঃখ ভঞ্জনকারী পরম দাতা। তিনি ভীতের অভয়, দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, লজ্জিতের লজ্জানিবারক এবং সেবকের সমীপে বাঞ্ছাকল্পতরু। সর্ব্বপ্রকার পাপের ও তাপের, রোগের ও শোকের এবং বিপদ ও বিপত্তির তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা। তিনি সুন্দর হইতেও সুন্দরতর। অতএব তুমি তাঁহারই উপাসনা কর। তিনি নখরাজি-বিরাজিত পাদযুগল দ্বারা হৃদয়-কমলের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া ভক্তের মনোমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। হে পুত্র ধ্রুব! ধারণা দ্বারা স্থিরীকৃত এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া তুমি সেই বরপ্রদ বরণীয় পুরুষ-প্রধানকে ধ্যান কর। ভগবানের মঙ্গলপ্রদ রূপ ভাবনা করিতে করিতে মন পরমশান্তি লাভ করে এবং সুস্থির হইয়া আর তাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। হে ধ্রুব! "ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়"—এই পবিত্র ও প্রাচীন মন্ত্র দ্বারা তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিও। হে ধ্রুব! তোমার ইহা যেন স্মরণ থাকে, যিনি পূজা করেন তিনি জিতেন্দ্রিয়, সংযতচিত্ত, প্রশান্তমনা হয়েন এবং পবিত্র বন্য ফল মূল আহার করিয়া জীবনাতিপাত করিয়া থাকেন। হে ধ্রুব! ব্রহ্মোপাসনা দুই প্রকার; যাঁহারা সকামী অর্থাৎ কামনা করিয়া কায়মনোবাক্যে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ সেবা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীনারায়ণ তাঁহাদের অভীষ্ট পার্থিব ফল প্রদান করিতে বিমুখ বা বিস্মৃত হয়েন না। যাঁহারা নিষ্কামী অর্থাৎ কেবল মুক্তিধনের প্রার্থী, তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সুখ পরিহার পূর্ব্বক ঐকান্তিকী-ভক্তি-সহ ভগবানের পূজা করিয়া সেই অক্ষয়, অব্যয় পরমপদে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

মুনিবর নারদের এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া, বালক ধ্রুব তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, মধুবনাভিমুখে প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইল। নারদ ধ্রুবকে বিদায় দিয়া রাজা উত্তানপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। রাজা উত্তানপাদকে ম্লানবদন দর্শন করিয়া, নারদমুণি কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তানপাদ কহিলেন—"হে ব্রহ্মণ! আমি পত্নীপ্রেমে বশবর্ত্তী হইয়া নির্দ্দয় হৃদয়ে পঞ্চমবর্ষীয় সুবোধবালক-পুত্রকে তাহার জননীর সহিত নির্ব্বাসিত করিয়াছি। হে মুনে! ক্ষুধার্ত্ত, শ্রান্ত, ম্লানবদন, নিরাশ্রয় সুতরাং বনমধ্যে একাকী শয়ান, আমার সেই ক্ষুদ্র শিশুসন্তানকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে এতদিন কি ভক্ষণ করে নাই? অহো! আমি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করিয়াছি। প্রিয়পুত্র স্নেহবশতঃ আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু নরাধম আমি তাহাকে আদর করি নাই।"

মুনিবর নারদ কহিলেন,—"হে রাজন! তোমার ঔরসজাত সন্তান ধ্রুব এক্ষণে যে মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছে, অনন্ত সামর্থ্যশালী শাশ্বত পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিবার কারণ যে কঠোর তপস্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়াছে, তাহা দেবতা-

দিগের পক্ষেও অনেক সময়ে দুঃসাধ্য; যাহা হউক তুমি চিন্তিত বা শঙ্কিত হইও না, তোমার ধার্ম্মিক পুত্রকে দেবগণ নিরাপদে রক্ষা করিতেছেন। হে রাজন্! ধ্রুবের অমিত প্রভাব তুমি অবগত নহ। তাহার অমর-কীর্ত্তি-কুসুমের যশঃসুরভি সমগ্র চরাচরে পরিব্যাপ্ত হইবে এবং ঐ বিপুল-কীর্ত্তি ধ্রুবের অসাধারণ পুণ্যতেজে ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে তুমিও বসুধাবিখ্যাত হইবে। মহারাজ! লোকপালগণ যে কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন, আপনার সৌভাগ্য-সমন্বিত সন্তান অচিরে তাহা সমাধান করিয়া আপনার ও তাঁহার যশ বিস্তার পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবেন।" এই কথা কহিয়া দেবর্ষি নারদ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন কিন্তু নরপতি উত্তানপাদ নিরন্তর পুত্রের বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাণী সুরুচিও এই সমস্ত কথা অবগত হইলেন, কিন্তু রাজা উত্তানপাদ রাণী সুরুচির পুত্র উত্তমের কল্যাণ-কামনায় যতটুকু চিন্তা করিতেন, এখন হইতে সুনীতির সন্তান ধ্রুবের মঙ্গলোদ্দেশে তদপেক্ষা শতগুণাধিক চিন্তা ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিন্দিত স্ত্রৈণ পুরুষের ন্যায় সুরুচির প্রেমে দাসানুদাসের ন্যায় বশবর্ত্তী হইয়া ধ্রুবের ন্যায় এমন সুন্দর স্বভাব-সম্পন্ন তনয়ের মনোমধ্যে বিষম ব্যথার উৎপাদন করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধ্রুব দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বকথিত অনুজ্ঞা ও উপদেশানুসারে সুপবিত্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া মধুকর পুঞ্জ কর্ত্তৃক বিপুঞ্জিত চিরমধুর মধুবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় বিমানবিহারী বিবিধ বিহঙ্গবর্গের বিনোদ-কলরবে দিকদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল; প্রস্ফুটিত প্রসূনপুঞ্জের চিত্তাবিমোহিনী সুরভিতে সমস্ত মধুবন আমোদিত হইতেছিল; বিবিধ মনোমোহিনী লতা ও লতিকার শোভায় প্রকৃতি-সুন্দরী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইয়া পান্থপুঞ্জের চিত্তে ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার করিয়া দিতে ছিল। মধুবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বালক ধ্রুব শ্রীবৃন্দাবনধামের অভূতপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া নির্ব্বাক্ নরের ন্যায় অথবা মন্ত্রমুগ্ধবৎ অহিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। ধ্রুব দেখিলেন, পতিতপাবনী শ্যামসলিলা যমুনা-তটে অত্যাশ্চর্য্য শ্রীবৃন্দাবন অপূর্ব্ব-শোভায় অবস্থিত। ব্রজধামের ইহাই রাজধানী এবং গোপীগণ এই রাজধানীর প্রধানা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সুপবিত্র শ্রীবৃন্দাবনে রাখাল-রূপে রাজত্ব করেন এবং ভগবৎভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রজারূপে বাস স্থাপন করিয়া শ্রীমতী রাধারাণীকে বেষ্টন করিয়া দিনযাপন করিতেছেন। কোকিলকুল মধুর মধুর কুহুরবে, শুকসারি দম্পতী ভক্তি তানে, ময়ূর ময়ূরী ফুল্ল মনে, পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষিগণ মনোমধুর শব্দে এবং ভক্তাধিক ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনিতে সমগ্র বৃন্দাবন ধামকে এক অপূর্ব্ব মনোমোহন ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বালক ধ্রুব যোগী বেশে মধুবনে প্রবেশ পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত আসনে যথারীতি উপবিষ্ট হইলেন। পাঠকপুঞ্জের মধ্যে বোধ হয় অনেকে যোগ অথবা যোগাসন সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব অবগত নহেন। পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিয়া অথবা বক্তৃতা দ্বারা যোগ বা আসন বুঝান যায় না; এবম্প্রকার উপায়ে যে ব্যক্তি যোগ বা আসন বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ। যোগ সর্ব্বদাই Practical (প্রাক্‌টিকাল), ইহা অভ্যাসের

জিনিষ, ইহা সাধনের বিষয়। তত্ত্বজ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকটে অথবা যোগাভ্যাসে যুক্ত পুরুষের নিকটে ইহা রীতিমত শিক্ষা করিয়া অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাসের জন্য যে সকল নিয়ম পালন করা উচিত, তাহা যথাবিধি পালন না করিলে যোগাভ্যাস হয় না। আহার, বিহার, উপবেশন, কায়া, মন, বাক্য, বিলাস প্রভৃতির সংযম সম্বন্ধে যে সমূহ বিধি আছে, তাহা অবশ্য পালনীয়। অনাদি পরব্রহ্মের সহিত যে উপায়ে সংযুক্ত হওয়া যায় তাহার নাম যোগ। চিত্তের একাগ্রতা যোগের প্রথম সোপান। যে উপায়ে মানবের জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সংস্পর্শ-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই যোগ। যোগের দ্বারা পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং অপূর্ব্ব সামর্থ্য সমূহ লাভ করিতে পারা যায়। পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, গরুড়াসন, বীরাসন প্রভৃতি বহু প্রকার আসন আছে; ইহাদের মধ্যে যে কোন প্রকার আসনে উপবেশন করিয়া, যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। আসন শিক্ষা করিতেও সময়ের প্রয়োজন, কারণ ইহাও অভ্যাসের বিষয়।

যাহা হউক, ধ্রুব যমুনাজলে স্নান করিয়া মধুবনে প্রবেশপূর্ব্বক নারদ কথিত আসনে উপবেশন করতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দিবস তিনি কোন প্রকার আহার্য্য বা পানীয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার পঞ্চভৌতিক দেহ রক্ষার জন্য কেবল তিন দিবস অন্তর একটী কপিত্থ বা বদরী ফলমাত্র ভক্ষণ করিতেন, এইরূপে এক মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। দ্বিতীয় মাসে তিনি প্রত্যেক ষষ্ঠ দিবসে তৃণ বা পত্র আহার করিয়া শীর্ণ দেহে প্রভুর অর্চনা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় মাসে নয় দিন অন্তরে একবার জলমাত্র পান করিয়া সমাধি যোগে শ্রীহরির আরাধনা করিলেন। চতুর্থ মাস সমাগত হইলে, প্রত্যেক দ্বাদশ দিবসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণ জয় করতঃ উপাসনা করিলেন। পঞ্চম মাসে এক পদে, স্থাণুর ন্যায় অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। শব্দাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রাম স্থান ভূত মনকে হৃদয় মধ্যে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করিলেন না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে তিনি কেবল পরব্রহ্মের সত্বাই দেখিতে লাগিলেন এবং নিজের দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও আত্মায় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার বোধ হইল, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নাই যেথানে ঈশ্বর নাই, এমন কোন বস্তু নাই যাহা ঈশ্বরের সত্বায় সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত নহে। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

পুরাণ বিশেষে লিখিত আছে, ধ্রুবের পরীক্ষা জন্য এবং তাঁহাকে কঠোর তপস্যা হইতে বিরত করিবার কারণে, বিঘ্ন নামক দৈত্য মায়া প্রভাবে বহু প্রকার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপনীত হওনান্তর আতঙ্ক দেখাইতে লাগিল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ধ্রুব কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অসুর ও মায়াবীগণ নানাবিধ আশঙ্কার উৎপাদন করিল, কেহ বা তাঁহাকে গ্রাস করিতে, কেহবা দগ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু অধ্যবসায়ী ধ্রুব ভগ্নমনোরথ হইলেন না। অশেষ প্রকার বিপদের সৃষ্টি করিয়াও যখন কেহ কোন মতে স্থির-প্রতিজ্ঞ বাল-যোগীর ধ্যানভঙ্গ বা উৎসাহদীপ নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইল না,

তখন একে একে ক্রমশঃ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। দেবতারা "ধন্য ধন্য" কহিয়া ঐশীশব্দে আকাশ নিনাদিত করিলেন; স্বর্গ হইতে রাশি রাশি পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। বালযোগী ধ্রুব যেমন ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তদ্রূপ ধ্যানেই নিমগ্ন রহিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

# জাপানের অভ্যুদয়। (৪)

## জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব

বর্ত্তমান রুশ জাপান যুদ্ধে প্রতীচ্য-খণ্ড-বাসিগণ জাপানের কার্য্য কলাপ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। জাপানী চরিত্র যতই তাঁহারা অনুশীলন করিতেছেন ততই যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন; বুঝি বুঝি করিয়াও, জাপানকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। উহঁাদের প্রমুখাৎ জাপানীদের যে সব কার্য্য কলাপ শুনিতে পাই, তাহা ভাবিতে বসিলে আমাদেরও ঐ দশা হয়। আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলাম।

ধর্ম্মবিশ্বাস বলিলে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, জাপানীদের মাঝে সেটি যেন নাই। স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি চিন্তার প্রভাব জাপানী চরিত্রের উপর দৃষ্ট হয় না। মরিবার সময় উহাঁরা রাজা ও দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণত্যাগ করেন। এ হিসাবে উহাদিগকে free-thinker বা নাস্তিক বলিলেও দোষ হয় না। ইহা কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ফল? জাপানীদিগকে কেহ কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাস-হীন জাতি বলিলে, উহারা বিরক্ত হন।

আধুনিক বিজ্ঞান চর্চ্চা এবং আপনাদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও সাহসের ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে বিজয় লাভ হয়, সম্রাটের চরিত্র-গুণেই সে সমস্ত সিদ্ধ হইয়াছে বলা হয়। সম্রাট্‌কে তাহা হইলে উহারা কি চক্ষে নিরীক্ষণ করেন? রাজ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রোক্তি আছে বটে,—"মহতী দেবতা হ্যেষানররূপেণ তিষ্ঠতি"। আকবর বাদশাহের সময় একবার "দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা" কথাটার প্রচার হইয়াছিল এবং এখনও স্ত্রীলোকগণের মুখে শুনিতে পাই "আকবরি মোহর যার ঘরে, লক্ষ্মী বাঁধা তার ঘরে"। আমাদের শ্রীরাম চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, রাজা ও দেবতা উভয়ই এবং এখনও এইরূপে পূজা প্রাপ্ত হন। ইহা ব্যতীত ৺তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, প্রভৃতি অনেকেই অনেকের উপাস্য। জাপানের মিকাডো ও কি জাপানবাসীর সেইরূপ উপাস্য? ব্যাপার দেখিয়া এইরূপই ত মনে হয়।

সত্য রক্ষার্থ রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বন গমন—বলি, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির সর্ব্বস্ব দান,—প্রহ্লাদ, সুধন্বা প্রভৃতির গভীর ধর্ম্ম বিশ্বাস—ধ্রুব, বাল্মীকি ও তপস্বীকুলের অবিচলিত কঠোর তপস্যা—ভীষ্মের অটল প্রতিজ্ঞা—একলব্যের গুরু দক্ষিণা দান—সবংশে বিনাশ পর্য্যন্ত দশানন ও দুর্য্যোধনের সমর-নিরতি প্রভৃতি যে সব যুগের ব্যাপার, মনে হয় জাপানীরা যেন সেই যুগের লোক। বর্ত্তমান যুগে "কিংশুমারু" জাহাজের নাবিক ও অফিসারগণ বাঁচিবার সুযোগ সত্ত্বেও পরাজয় অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছেন। এক "কিংশু-

মারু জাহাজের ঘটনায় নহে, জাপানীরা যে অবলীলাক্রমে আত্মপ্রাণ বলি দিতে সমর্থ তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দিয়াছে। রাজপুতগণের জহরব্রত এখন অতীত কাহিনী, কিন্তু উঁহাদের "হরকিরি" এখনও প্রচলিত। পরিজন স্নেহে মুগ্ধ হইয়া পাছে গৃহকর্ত্তা সমরবিমুখ হন, সেই আশঙ্কায় কত জাপানী স্ত্রী পুরুষ আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহা ভাল কি মন্দ সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু উহা জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

যে দেশে রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীও, প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে তাহাকে যে ভোজ দিবার রীতি আছে, কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অর্থ যুদ্ধফণ্ডে জমা দেয়,মনে হয় সে কিরূপ দেশ? যে দেশে যুদ্ধে পুত্রের পতন সংবাদে মাতা অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন, যাহাকে গর্ভ হইতে রক্ষা ও পালন করিয়া আসিয়াছেন দেশের হিতার্থে সে বলি প্রদত্ত হইল ভাবিয়া প্রবোধ লাভে চেষ্টা পান, দাতাকর্ণের যশঃ ম্লানকারী সে দেশ ও সে দেশের জননীকে বুঝিতে আমরা সক্ষম হইব কি? জাপানে পতির পতন সংবাদ পাইয়া সহধর্ম্মিণী সত্য বুকে ছুরি মারিয়া সহগমন করে। মৃত সৈনিকের পরিবার বর্গকে পেন্সন দিতে যাইলে, অনেকে তাহা প্রত্যাখ্যান করে। পাছে অসুখ বা অন্য কারণে, ডাক্তার যুদ্ধে যাইতে না দেয় জাপানী সৈনিকের এই ভয়। বিপজ্জনক কার্য্যে যাইতে অনুমতি লাভার্থ আবেদন প্রেরণ কালে, জাপানী সৈনিক আঙ্গুল কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্তে আবেদন লিখে।

জাপানী রমণী এক অদ্ভুত রক্ষা কবচের সন্ধান জানেন; উহা ধারণ করিয়া যুদ্ধে গেলে পুরুষ যুদ্ধে রক্ষা পান। একখানি ছিটের কাপড়ের ফালতি বা টুকরা লইয়া তেমাথার বা রাস্তার কোণে দাঁড়াইতে হয়; অন্য কোন রমণী সেখান দিয়া যাইবার সময় উহার এক এক বিন্দুতে সূচি চালাইয়া সূতার এক একটি গ্রন্থি বাঁধিয়া যান। ছিটের ফালিটুকুতে এক হাজার বিন্দু থাকে, সুতরাং সমস্ত ফালিটুকুতে ১০০০ স্ত্রীলোকে ১০০০ গ্রন্থি দেয়। এই ফালিটুকু কোমরে বাঁধিয়া যুদ্ধে গেলে, আদ্যাশক্তির ফলা-স্বরূপা সহস্র রমণীর আশীর্ব্বাদ বা প্রার্থনা তাহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবে। ইহাকে কুসংস্কার বলিতে হয় বল, কিন্তু নিন্দা করিতে ইচ্ছা যায় কি?

কোন কোন সমালোচক মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের "নির্ব্বাণই বাঞ্ছনীয়, সংসার দুঃখময়" ভাবিতে ভাবিতে, জাপানীদের হৃদয়ে এই মৃত্যু জন্য প্রবল আগ্রহ বিকশিত হইয়াছে। কোন কার্য্যের খপ্ করিয়া অমন কারণ নির্দ্দেশে আমরা পটু নহি। অল্পাক্ষরে জাপানী চরিত্র বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, "রাজা ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ" জাপানীদের আদর্শ; এই বলেই উঁহারা চালিত হন এবং ইহাই উঁহাদের ধর্ম্ম। বাল্য হইতেই উঁহারা এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং এই ব্রত গ্রহণ করিয়াই উঁহারা জীবন পথে চলিতে থাকেন।

জাপানী রাজভক্তি ও স্বদেশ প্রীতি অতীব প্রশংসার্হ ও বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি উহা আমাদের যেন সম্যক্‌রূপ অনুকরণীয় মনে হয় না। চরিত্রের একাংশ মাত্র যেন উহাতে বিকশিত; কঠোর-প্রকৃতি ক্ষত্রিয়গণেরই যেন ইহা উপযোগী। হয়ত, জাতীয় অভ্যুত্থান সাধনে, সমাজ-দেহের বাহুবল বর্দ্ধনই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, কিন্তু ইহার ফলে অনেক জাপানীকেই

কোন না কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মায়া কাটাইতে হইয়াছে। আরও একটা দৃষ্টান্ত শুনুন। উত্তর জাপানে বন্যা আসিয়া জনৈক গৃহস্থের ঘর দ্বার ভাসাইয়া লইবার উপক্রম করিল। গৃহস্বামী স্ত্রী পুত্র রক্ষার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বাগ্রে সম্রাটের চিত্রখানি বাঁচাইতে গেল এবং ইহার জন্য সে ধন্যবাদও লাভ করে। দেবতাকে বিনা এরূপ ভক্তি দেখান অসম্ভব এবং তাহাও হয় ত গঙ্গা-সাগরে-সন্তান-বিসর্জ্জন-যুগেই সম্ভবপর ছিল—এ যুগে নহে। অথবা প্রবল ধর্ম্মবিশ্বাস থাকিলে মানুষ কি যে পারে না, বলা যায় না। ঘরে আগুন লাগিলে, সর্ব্বাগ্রে গো ও শালগ্রাম শিলা বাঁচাইতে চেষ্টা পান, এমন হিন্দু অসম্ভব নহে। আমাদের মাঝে এক কথ আছে—"বিশ্বাসে পাইবে তাঁরে তর্কে বহুদূর।" কার্লাইল মহোদয় বলেন অন্তরের সহিত যাহা বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, আর যে কার্য্যে হৃদয় আলোড়িত হয় না, মুখেই শুধু যাহার ভাসা শিকড়, তাহা ভণ্ডামি (sham) বা মিথ্যা। ফরাসি বিদ্রোহিগণ, এই জন্য, ধর্ম্মার্থে জীবন দিয়াছে বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। কোন একটা আদর্শের পিছনে একটা জাতির অনুরাগ ও বিশ্বাস আকর্ষণ করাই মূল কথা, তা সেটা দেশভক্তি, ভগবৎপ্রীতি, দয়া বা যাহাই হউক না কেন।

প্রকৃতি ভেদে আদর্শ ভেদ হয়। আমাদের সম্মুখেও ত্যাগের, আত্মোৎসর্গের অত্যুচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত আছে, তবে আমরা চক্ষু মুদিয়া থাকি; সে গুলি দেখিতে, সে গুলির অনুসরণে জীবন গঠিত ও পবিত্র করিতে প্রয়াস পাই না, এই যা কথা। কেমন একটা জড়ভাবে আমরা আচ্ছন্ন। নতুবা, আমাদের দেশে যে সব ত্যাগের, আত্মোৎসর্গের আদর্শ আছে, তাহাদের তুলনায় অন্য দেশের আদর্শগুলি বরং খাটো হইয়া যায়। বহু জনের হিতার্থ স্বেচ্ছায় একজনের আত্মবলি গৌরবের বিষয় নিশ্চিতই। যাঁহার প্রাণ যাইতেছে, বা, স্বার্থহানি হইতেছে, তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন,আর একজন ঐ অনিষ্টটা বহন করুক না কেন? কষ্টের বেলায় তিনি, সুখভোগের বেলায় অন্যে, এরূপ বিধানে কেহ সম্মত না হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। ছাগলটাকে যদি বলা যায় তুমি বাপু হত হও, তোমার মাংসে আমরা পুষ্ট হই, আর তোমাকে ধন্য ধন্য করি, ছাগল যদি তাহাতে সম্মত না হয়, বড় অন্যায় কার্য্য করে কি? সেই জন্য যদি কেহ স্বেচ্ছায় সম্মত হন, তাঁহার দয়ার আধিক্যে অন্য সকলে নিস্তার পায় ও বহুমুখে তাঁহার প্রশংসা শ্রুত হয়। আবার যেমন দান করা অভ্যাস থাকিলে, প্রতিগ্রহটা তত দোষের হয় না, তদ্রূপ স্বয়ং ত্যাগী না হইয়া অন্যের ত্যাগ স্বীকার আশা করায় পাপ হয়। তবে কথা এই, শ্রাদ্ধান্তে আমরা যেমন পিতৃপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ কামনা করি—"আমরা যেন বহু যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হই, কিন্তু আমাদিগকে যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে না হয়"—সেইরূপ জীবনে যিনি শুধু দান করিয়া যাইতে পারেন, প্রতিগ্রহে প্রয়োজন হয় না, দয়া দেখাইয়া যাইতে পারেন কৃপাভিক্ষার্থী হইতে হয় না, তিনিই ধন্য। এই জন্যই বলা হয়—"কোধর্ম্মো? ভূতদয়া।" অন্যের দুঃখ দূর ও সুখবর্দ্ধন জন্যই ঐ বৃত্তিটার বিকাশ। আবার, ব্যয়কালে যেমন যেখানে লাভ সম্ভাবনা অধিক সেইখানেই অর্থ ব্যয়ে ইচ্ছা যায়, তদ্রূপ দয়াপ্রকাশ কালেও, যেস্থলে বহুজনের হিত সম্ভাবনা

তথায় দয়া-প্রকাশ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে। উহা যেন অনেকটা লেন-দেন-ব্যাপার, লাভ লোকসান খতাইয়া কাজ করা। কিন্তু, দয়ার আদর্শ উহাকে বলা যায় না। এরূপ খতাইয়া কাজ করা অভ্যাস করিলে বরং ক্রমশঃ দয়া বৃত্তিটা বিশুষ্ক হইবারই আশঙ্কা আছে; অক্ষমকে দয়া করিয়া কি হইবে, সক্ষমকে দয়া করিলে, তেলামাথায় তেল ঢালিলে বরং সুফল সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু, যে ক্ষেত্রে বহুজনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তথায় দয়া-প্রকাশের, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত কয়টা দিতে পার? খৃষ্টকে খাটো করা উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত 'আপনার মৃত্যুতে অনাগত ও বর্ত্তমান পাপিগণের হিত সম্ভাবনা নাই, কিন্তু একজনের ঐহিক কল্যাণ সম্ভাবনা আছে, আপনি স্বীয় প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত আছেন কি না?'— তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিতেন জানিতে ইচ্ছা যায়। দধীচি মুনির অস্থি দান কার্য্যটা শুধু ইন্দ্রের নহে, বহু দেবের কল্যাণার্থ বলিতে পার, কিন্তু শিবিরাজার কপোত-রক্ষার্থ আত্মদেহ দানের সহিত কাহার তুলনা করিবে? স্বর্গভ্রষ্ট যযাতির উপর করুণা পরবশ হইয়া যে তিনজন মহাপুরুষ স্বীয় স্বীয় পুণ্যফল তাঁহাকে অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, মহাভারতের সে বৃত্তান্তটি অনেকেই অবগত থাকিতে পারেন। দয়া বৃত্তিটা যদি একটু অতিরিক্ত কোমল বিবেচিত হয়, সত্যরক্ষার্থ রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের বনগমন এবং প্রতিজ্ঞাপালন জন্য, ভীষ্মের দেহ ত্যাগটা কিরূপ বিবেচিত হয়? ফলতঃ, ঋষিজন সেবিত পুণ্যভূমি ভারতে এরূপ আদর্শ বিরল নহে। আমাদের মাঝে যে সমস্ত আত্মত্যাগের আদর্শ আছে, সে গুলি প্রায়ই দয়া বা ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মোক্ষলাভার্থ সন্ন্যাসীকুলের আত্মবিসর্জ্জন আর একটা উদাহরণ। ইহা কি জাতীয়-প্রকৃতির পরিচায়ক?

আদর্শ হিসাবে আমাদের আদর্শ কাহাপেক্ষাও নিকৃষ্ট না হউক, বা অনেকের অপেক্ষা উচ্চতর হউক, ইহা আমাদের ভুলা উচিত নহে, ঐ সমস্ত সাধারণতঃ প্রাচীন ভারতের কাহিনী। পুরাতন কথার আলোচনায় সুখভোগ আর সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকা একই কথা। প্রমাণ-নিচয় মধ্যে যেমন প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ-প্রমাণ, তদ্রূপ অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে, বর্ত্তমানই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। অতীতের আলোচনায় লাভ আছে, যদি বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি-সাধনে তাহা সহায় হয়, এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দূরদৃষ্টি পরিচায়ক হয়, যদি বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে কোন সুবিধা করিতে পারি। নতুবা, অতীত ও ভবিষ্যৎ আলোচনা গল্প গুজবে সময়ক্ষেপ মাত্র।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে মনে হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের কল্যাণার্থ আমরা যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করি। অনেক কষ্ট, অনেক অপমান আমরা নীরবে সহ্য করি, প্রতীকারার্থ অগ্রসর হই না, শুধু আমাদের অবর্ত্তমানে, আমাদের স্ত্রী-পুত্রের কি দুর্গতি হইবে, এই আশঙ্কায়। সমাজে যদি অন্নচিন্তা কোনরূপে হ্রাস পায়, জীবনধারণ জন্য পরের করুণায় নির্ভর করিতে না হয়, সহসা আমাদের সকলের উন্নতি হইতে পারে। উপার্জ্জন-শীল পুরুষের অভাব হইলে, কোন পরিবারের যদি অধোগতি-প্রাপ্তি না হয়, সমাজের দশজন মিলিয়া তাহার প্রতিরোধে যদি বদ্ধপরিকর হয়, দেখিবে প্রয়োজন হইলে হাসিতে হাসিতে অনেকে প্রাণ

দিতে পারিবে। শুনিতে বিস্ময়কর হইতে পারে, কিন্তু জাপানের অনুকরণে আমাদের নৈতিক উন্নতি-সাধনে ইচ্ছা থাকিলে, আগে এই দেশব্যাপী কঠোর দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। অথবা, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গের চিন্তার উর্দ্ধে অবস্থিত আনন্দ-মঠের সেই সন্তান-সম্প্রদায়ের পুনর্গঠনে প্রয়াস পাইতে হইবে।

দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা ব্যতীতও জলের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জনে প্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। বিধাতার ইচ্ছা হইলে অন্যরূপে হয়ত আমাদের ঐ অবস্থা ঘটিতে পারে, কিন্তু সেটাকে উন্নতি বলিব কি অবনতি বলিব, বুঝিতে পারিতেছি না। দুর্ভিক্ষাদির প্রকোপকালে, সাধারণতঃ দস্যু তস্করাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত দুঃখে পড়িলেও, মানুষ মরিয়া হয়। জীবনান্তপণ পরিশ্রম করিয়াই যদি জীবিত থাকিতে হয়; জীবনে যদি সুখের মুখ দেখার আশা দুরাশা হয়, তাহা হইলে তুষানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা, এক মুহূর্ত্তে সে জীবন ত্যাগ করিতে অনেকে প্রস্তুত হইতে পারে। পড়া যায়, ফরাসী বিদ্রোহের প্রাক্কালে, ফরাসী প্রজাগণের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। শুনা যায়, রুশ প্রজাগণের বর্ত্তমান অবস্থা এই প্রকার। আর আমাদের রাজপুরুষগণ বুঝিতেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতবাসীরা ক্রমশঃ সেই দশায় উপনীত হইতেছে। ভিতরে যদি শস্য থাকে, তাহা হইলে ধান অধিক মাড়াইলে, চাউল বাহির হয়, শুধু তুঁষ হইলে অবশ্যই হয় না। ভারতবাসীর ভিতর যদি কিছু মনুষ্যত্ব থাকে, মানুষের প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে তাহার যদি কিছু ধারণা থাকে, তাহা হইলে ক্রমাগত পদদলিত হইতে হইতে তাহার ভিতরের শস্য বা চাউল বাহির হইয়া পড়িবে। এই টিমিড্ (ভীরু) হিন্দুই তখন শুধু মরিয়া সুখী হইবার জন্য অকাতরে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে। এখনও সে পারিতেছে না, তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির মুখ চাহিয়া। কিন্তু, যখন সে বুঝিবে সে বাঁচিয়া থাকিয়াও তাহাদের সুখী করিতে পারিতেছে না, ধ্বংস-প্রাপ্তিই তাহার ও তাহার পরিবারবর্গের এক মাত্র পরিণাম, তখন সে রুদ্রাণীর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক বলিয়া, এমন হুহুঙ্কারে মরিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, যে হয়ত তাহা আমরা এখন কল্পনায়ও আনিতে পারি না।

একজন জাগ্রত বিধাতার উপর পূর্ণ-বিশ্বাসী হইলেও, আত্মত্যাগ অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার হয়। সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু আমাদেরই দেশের কোন মহাপুরুষ, যখন পরিজন বর্গের বিচলিত হৃদয় হইতেছিলেন, সহসা তিনি সম্মুখে দেখিলেন একটি টিক্‌-টিকির ডিম ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার ভিতর হইতে টিকটিকির ছানা বাহির হইল। মহাপুরুষের মনে হইল, ইহার এই অসহায় অবস্থায় কে ইহাকে রক্ষা করিবে? সহসা কোথা হইতে এক মাছি আসিয়া সেই অণ্ডের লালায় জড়াইয়া গেল, ছানা টিকটিকি তাহা খাইয়া ফেলিল। মহাপুরুষের চমক ভাঙ্গিল! তিনি বুঝিলেন, মোহবশতঃ আমরা মনে করি বটে, আমরা না থাকিলে সংসার চলিবে না, কিন্তু নিত্য কত লোক যাইতেছে, তথাপি সংসার নবোদ্যমে চলিতেছে। এ সংসার তোমারও নহে, আমারও নহে, আমাদের অপেক্ষাও আর একজন ঘোর সংসারী আছেন, এ সংসার তাঁহারই। তাঁহার সংসার তাঁহারই হাতে সঁপিয়া যাইব, ভয় কি? তিনি মারিলে, কেহ রাখিতে পারিবে না—তিনি যদি

রাখেন, কেহ মারিতে পারে না। হৃদয়ে যদি এই জ্ঞান ও বিশ্বাস স্থান পায়, মানুষ যে কোন মুহূর্ত্তে আত্ম-জীবন-দানে প্রস্তুত হইতে পারে। জনসাধারণের মাঝে এই ভাবের উদ্বোধন কিন্তু সহজ ব্যাপার নহে।

দধীচিমুনিকে যদি বলা হইত, ঠাকুর আপ নিত মরিবেনই, আমাদের দশজনের মঙ্গলার্থ দুজন অসুর মারিয়া প্রাণত্যাগ করুন, তাহা হইলে তিনি কি করিতেন জানিতে ইচ্ছা যায়। শিবিরাজাকে অথবা বুদ্ধদেবকে যদি বলা হইত "কপোতকুলের বা জীবকুলের হিতার্থ শ্যেনটাকে বা ব্যাঘ্রটাকে বধ করুন, তৎপরিবর্ত্তে আত্মমাংসদানের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা কি উত্তর দিতেন, ভাবিতে ইচ্ছা করে। ফলতঃ, প্রকৃতিভেদে আত্ম-ত্যাগেরও মূর্ত্তিভেদ হয়। সেকন্দর শাহও দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্যও দিগ্বিজয়ী; কিন্তু উভয় দিগ্বিজয়ীর মধ্যে আদর্শগত প্রভেদ। খ্রীষ্টীয় কোয়েকার সম্প্রদায় শুনা যায় কখনও কাহারও প্রাণহানির কারণ হন না। তদ্রূপ, দেশের কল্যাণার্থ হইলেও ক্ষত্রিয় জনোচিত মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তির মধ্যে যে বীরত্ব বা আত্মত্যাগের বিকাশ, তাহা এদেশে কতটা প্রবুদ্ধ হইতে পারে, ভাল বুঝা যায় না। আশ্রয় দাতার কল্যাণার্থ জননী কুন্তী, পুত্রকে রাক্ষস বধার্থ প্রায় মৃত্যুমুখে পাঠাইতে কুণ্ঠিতা হন নাই এবং ভীমসেনও সাগ্রহে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, সেই একই বংশে জন্ম হইলেও, চিরসঞ্চিত সমরসাধ মিটাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলে, আত্মীয় স্বজনের বধসাধনে স্বীয় বীরত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে বুঝিয়া, অর্জ্জুন মোহাভিভূত হইলেন। মহাভারতের যুদ্ধ কি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। তথায় দশের চিন্তার, দেশের চিন্তার স্থান নাই। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মের আহ্বানে ভারতের ক্ষাত্রতেজ এক স্থানে পুঞ্জীভূত। যুদ্ধে কোনরূপ অন্যায় আচরণ অনুষ্ঠিত না হইলেই হইল, নতুবা ভ্রাতায় ভ্রাতায়, গুরু-শিষ্যে, এমন কি পিতা পুত্রে অবধি যুদ্ধে পাপ নাই, কারণ যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, যুদ্ধের জন্যই তাহার জন্ম, এবং যুদ্ধে প্রাণ দানই তাহার ধর্ম্ম। আজ কাল জাপানে ও অন্য সভ্যরাজ্য সমূহে সমগ্র দেশবাসিগণকে এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা হইতেছে। এদেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও জন-সাধারণের প্রকৃতি, এই ক্ষাত্র-ধর্ম্ম-বিকাশের পক্ষে অনুকূল বোধ হয় না। এক দিকে বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের শিক্ষা, দীক্ষা—অন্য দিকে চির-অধীনতা। গীতার নিষ্কাম মন্ত্রে সকলেই অনুপ্রাণিত হইবে, আশা করা যায় না। অন্যায় বা অত্যাচার দেখিলেই, তৎপ্রতীকারার্থ নিষ্ফল আত্ম-বিসর্জ্জনে সকলের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। বহু যুগের শিক্ষা দীক্ষা ফলে, কিম্বা সংসার সংগ্রামে নিত্য পরাজিত হইয়া, এদেশবাসিগণের হৃদয়ে সাধারণতঃ বৈরাগ্য ভাবটা বড় প্রবল। ঘোর কষ্টে পড়িলে, এদেশের লোকের হৃদয়ে, এই দুঃখময় সংসার হইতে চির মুক্তি লাভ জন্য প্রবল বাসনা হয়—অন্য দেশে সেই অবস্থায় সোশিয়ালিষ্ট, নিহিলিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এদেশের অবস্থা ও প্রকৃতি, active resistance অপেক্ষা passive resistance-এর অধিকতর উপযোগী এবং উহা উপেক্ষণীয়ও নহে। আমাদের মাঝে এক প্রবাদ আছে—"নীহেড়ের বল বেশী," জলের গতিরোধ করা সর্ব্বত্র অনায়াস-সাধ্য কর্ম্ম নহে। পক্ষান্তরে, ইহাও আমরা

অবগত আছি, passive resistance-টাই কাল সহকারে active resistanceএ রূপান্তরিত হইতে পারে। খ্রীষ্টীয় মার্টারগণের পরিণামে, যুদ্ধ-প্রিয় খ্রীষ্টীয়ানগণের জন্ম হয়। ফলতঃ, লোকের প্রকৃতি ও আদর্শ পরিবর্ত্তিত হওয়া, কিছুই নূতন ব্যাপার নহে। গুরু-গোবিন্দের পূর্ব্বে শিখগণ নিরীহ ও যুদ্ধ-বিমুখ সম্প্রদায় ছিলেন। রণজিতের সময় উঁহারা এক প্রধান সামরিক জাতিরূপে পরিণত হন। আবার ইংরাজ শাসনাধীনে আসিবার পর, ভারতের সমুদয় সামরিক জাতিই, এত দ্রুত-ভাবে শান্তিপ্রিয় জাতিতে, পরিণত হয়, যে নব-বিজিত দেশ সমূহ লইতে উঁহাদিগকে সমরপ্রিয় সৈনিক সংগ্রহ জন্য চেষ্টা পাইতে হয়। এই কারণেই কি অন্য কারণে জানিনা, উঁহাদের মাঝে আজ পূরবিয়া, কাল শিখ, পরশ্ব গুরখা তার পর দিন আফ্রিদী সৈন্যের আদর দেখিতে পাই। খ্রীষ্ট শিষ্যগণের শান্তি-মন্ত্রে-দীক্ষা-গ্রহণের পরিণামও আমরা সকলে দেখিতেছি। যে দেশে যুদ্ধ-যজ্ঞে একদা অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল, সে দেশের জনসাধারণের নিরীহ প্রকৃতি ঘুচিয়া যাওয়া, কিছুই বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। এখনও কিন্তু এ ভাব আসে নাই, ইহাও যথার্থ।

ফলতঃ, ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। এখানে নানা প্রকৃতির লোক বিদ্যমান। উঁহাদের সকলের আদর্শ একবিধ হইবে, আশা করা যায় না। দেশের কল্যাণ যদি সকলেরই লক্ষ্য থাকে, পথ ভিন্নতায় তাদৃশ ক্ষতি হইবে না।

## জাপানের কৃষি ও শিল্প।

একখানি মটর বা হাওয়া গাড়িতে চড়িয়া জাপানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত, ৫০ ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায়। দেশটা ত এত ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহাতেই দেশের অধিবাসিগণের আহার্য্যের সঙ্কুলান হইয়া, প্রচুর পরিমাণ শস্য বিদেশেও রপ্তানি হয়। Baron Justus von Liebig M. Scrottky ভারতীয় ও জাপানী কৃষির অবস্থা পর্য্য-বেক্ষণান্তে মত প্রকাশ করিয়াছেন, জাপানী প্রথায় চাষ আরম্ভ করিলে, ভারত আরও অধিক লাভবান হইবে। তাঁহার মতে (ক) গভীর কর্ষণ (খ) ক্রমান্বয়ে শস্যোৎপাদন এবং (গ) অবিরাম সার প্রদান—জাপানী কৃষির এই তিনটি প্রধান অঙ্গ।

স্ক্রটকি মহোদয়ের মতের সমালোচনার আমরা উপযুক্ত নহি; কিন্তু, আমাদের শুনা আছে, গভীর কর্ষণ এদেশের বহুস্থলের অনুপ-যোগী। নূতন লাঙ্গলগুলির প্রায়ই গভীর ভাবে কর্ষণ করিতে দৃষ্টি, চির প্রচলিত পুরা-তন লাঙ্গলগুলিতে জমিতে একটু আঁচড় পড়ে মাত্র। পক্ষান্তরে, গভীরভাবে কর্ষণে অসু-বিধা ও অনেক। ভারি লাঙ্গল টানিতে বহু সংখ্যক বৃষের প্রয়োজন; আরও অনেক সময় উহাতে নীচের অনুর্ব্বর মাটি বাহির হইয়া পড়ে। কোন্ মত সত্য, বিনা পরীক্ষায় বলা যায় না। প্রচুর সার সংগ্রহ করিতে পারিলে, নীচের অনুর্ব্বর মৃত্তিকার আশঙ্কা থাকে না। জাপানীরা যে উপায়ে সুলভে প্রচুর সার সংগ্রহ করে, তাহা এদেশে কখন আদৃত হইবে কিনা সন্দেহ। সে কথা পরে বলিব।

জাপানীরা ইচ্ছামত ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করে। উঁচু জমি, জলা জমি প্রভৃতির জন্য চিন্তিত হয় না। এই দেখিলাম জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। গম কাটার পর সে জমি দু রকমের হইয়া গেল; একভাগ নিম্ন ও

জলাভূমি, অপর ভাগ উচ্চ ও শুষ্ক। জলাভূমিতে ধান চাষ ও উচ্চ ভূমিতে কার্পাস, রাঙ্গা আলু বা ঐরূপ কিছুর আবাদ হইল। জাপানীরা একই ক্ষেত্র হইতে, এইরূপে নানাবিধ ফসল আবাদ করিয়া লয়।

জাপানীরা মিশ্র কর্ষণের বড় পক্ষপাতী। এ কাল য়ুরোপেও ইহা আদৃত হইতেছে। বৎসরের কোন্ সময় কি ফসল হয় জানা থাকিলেই, বুঝিয়া চাষ করিলে বারমাসই ক্ষেত হইতে নানাবিধ ফসল পাওয়া যায়। মনে কর, ক্ষেতে বর্ষাকালে ফল দিবে এরূপ গাছপালা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপিত হইল। সেই গুলি বড় হইতে থাকিল, ইতাবসরে প্রতি দুই সারি গাছের মধ্যস্থ জমিতে, শরৎ বা শীতকালে ফল দিবে, এমন সব গাছের বীজ পুতিলে। বর্ষার ফসল পাইবা মাত্র, গাছ কাটিয়া, নূতন সার দিয়া, বসন্তের উপযোগী বীজ পুতিলে। ওদিকে শরৎ বা শীতের গাছ ততদিনে বড় হইয়া উঠিয়াছে, ইত্যাদি।

এইবার জাপানী সারের বীভৎস কথা কহিতে হইবে। আমাদের প্রবৃত্তি বা সংস্কারের ইহা একান্ত বিরোধী, তবে বৈজ্ঞানিকস্থলে প্রবৃত্তি বা সংস্কারের কথা উঠা উচিত নহে। জাপানীরা বলেন, আমাদের মল মূত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার, বিনাব্যয়ে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহার অব্যবহার মূর্খতা বা কুসংস্কারের পরিচায়ক। য়ুরোপীয়গণই বলেন, তাঁহারা অস্থিচূর্ণ, সোরা, গুয়ানো, খৈল প্রভৃতি কতকরূপ বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহারে যে ফল পান, জাপানীরা তাঁহাদের ঐ একটী সার হইতেই তাহার অধিক ফললাভ করেন। আরও একটা ভাবিবার কথা আছে। জাপানীরা বলেন, আমোনিয়া, সোরা প্রভৃতি ব্যবহারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কৃত্রিম ভাবে উত্তেজিত হইয়া, অবশেষে অবসাদের লক্ষণ দেখায়। এ তর্ক সত্য কি অসত্য, কে বিচার করিবে? যাহাহউক, জাপানীরা তাঁহাদের দেশ-প্রচলিত সারই শ্রেষ্ঠস্থানে ব্যবহার করিতেছেন। জাপানে মানব মলের রীতিমত ব্যবসায় চলে। প্রতি প্রভাতে হাজার হাজার নৌকা মলপূর্ণ টব বোঝাই হইয়া, নগরে জমা হয় এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত বিক্রীত হইয়া যায়। সমস্ত দিন খাটিয়া গৃহে ফিরিবার সময়, শুধু হাতে না ফিরিয়া, কুলিমজুরেরা সারি বাঁধিয়া প্রত্যেকে টব দুই ময়লা কিনিয়া ফিরিতেছে, অথবা গাড়োয়ান খালিগাড়ি লইয়া না ফিরিয়া, কিছু কিনিয়া লইয়া যাইতেছে, এদৃশ্য নিত্য দেখা যায়। এই সমস্ত মলরাশি শুষ্ক চূর্ণীকৃত বা অন্য উপায়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয় না, অমনই অবিকৃত অবস্থায় ক্রীত ও বিক্রীত হয়। সর্ব্ববিধ বীজই বপনকালে, তদুপরি উক্ত সার জলে গুলিয়া ক্ষেত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। আমাদের মনে হয়, আমরা যদি গোময়ের ভূরি ব্যবহার করি, তাহা হইলে হয় ত উক্তরূপ ফল পাই। কোন গুণ না দেখিতে পাইলে, পূর্ব্বপুরুষগণ যে সে কারণে গোময়-সহযোগে ভূমি উপলিপ্ত করিতে উপদেশ দিতেন না। জাপানী সার অপেক্ষাও, এক হিসাবে ইহা শ্রেষ্ঠ সার। চাউল, দাইল প্রভৃতি আমরা খাইলাম, অব্যবহার্য্য খড়, ভুষি, খইল প্রভৃতি আমাদে বৃষ ও গাভীগণের ব্যবহারে আসিল। উহাদের পরিবর্ত্তে আমরা আবার ফিরিয়া পাইলাম দেহের অমৃত—দুগ্ধ ও ভূমির অমৃত—গোময়। বৃষগুলি দ্বারা আমরা যত কাজ করাইয়া লইতে পারি, সে সমস্ত উপরি লাভ। অধিকন্তু, আমাদের সংস্কারেরও ইহা অবিরোধী। বস্তুতঃ, গো-

বংশের উন্নতি ও বৃদ্ধিই আমাদের কৃষির ও আমাদের জাতির উন্নতি-সাধনের সহজ এবং বোধ হয় একমাত্র উপায়। গ্রামে গ্রামে গোচারণ ভূমির স্থাপন, পাট ও অন্য ফসল কমাইয়া, গো ও মানবের প্রাণ ধারণের উপযোগী ধান্য, দাইল, সর্ষপ প্রভৃতির ক্ষেত্র পরিমাণ বৃদ্ধি, পাউণ্ড বা খোঁয়াড় গুলি তুলিয়া দেওয়া, ধর্ম্মের ষাঁড়ের উপর অত্যাচার নিবারণ, গোয়াল গোবাহন প্রভৃতির অধিক মাত্রায় প্রচলন এবং যথসাম্ভব গোহত্যা নিবারণ প্রভৃতি উক্ত উদ্দেশ্য-সাধক উপায়াবলী।

জাপানীরা বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ড চাস ভালবাসে না। প্রতীচ্য-খণ্ডে কলে চাস হয়। তথায় হাজার হাজার বিঘার কমে চাস করা সুবিধাজনক নহে। ভারতে বৃষের বলই প্রধান সম্বল, এখানে কৃষ্ট ভূমির পরিমাণ মধ্যম গোছের। জাপানে মানুষে চাস করে, তথায় এক এক জনের কর্ষণীয় ভূখণ্ডের পরিমাণ কাযেই ক্ষুদ্র—যেন এক একটা ছোট বাগান। এই সমস্ত ছোট ছোট বাগানে জাপানী-কৃষক দুচারি হাত স্থানে, এক একরূপ ফসল জন্মাইয়া সমস্ত বাগানটি হইতে নানারূপ ফসল প্রাপ্ত হয়। যখনই বীজ উপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে সারও প্রদত্ত হয়। প্রায় এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ পুরুষ এবং এক কোটি সাড়ে নয় লক্ষ স্ত্রীলোক অর্থাৎ জাপানের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। রেশম এবং চাএর চাস, স্ত্রীলোকগণের প্রায় একচেটিয়া।

জাপানী সখের বাগানগুলি ক্ষুদ্রায়তন বৃক্ষ জন্য প্রসিদ্ধ। একখানি ইংরাজি পুস্তকে পড়া গিয়াছে, কোন সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্রপাত্রে চারা পুঁতিলে, এই চারার শিকড়গুলি যদি বাড়িতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে গাছটি বামন বা খর্ব্বাকার হয়। বামন-বৃক্ষ উৎপাদনের উহাই প্রকৃত কৌশল কিনা, নির্ণয় করা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। অন্যত্র পড়া গিয়াছে, গাছের উপরে জাল বাঁধিয়া গাছগুলিকে উঁচু হইতে দেওয়া হয় না। এদেশের কলমের গাছগুলি সাধারণতঃ একটু ক্ষুদ্রাকৃতি হয়—অল্পবয়সে ফুল ফল দেয়। যাহা হউক, জাপানীরা অদ্ভুত-দর্শন বস্তুমাত্রেরই সংগ্রহে অতিশয় যত্নশীল। বামন-বৃক্ষের উদ্যান তাহারই এক দৃষ্টান্ত। এই বাগান গুলিতে কেবল ছোট ছোট গাছ থাকে না, কৃত্রিম পাহাড়, নদী, পুকুর, গাছপালা এমনই মানানসহি আকারে রক্ষিত হয়, যেন একখানি খেলাঘরের বা ছবির বাগান বলিয়া মনে হয়।

বৎসর বৎসর আমাদের দেশের দু এক জন যুবক শিল্প-শিক্ষার্থ জাপান যান। তাঁহারা এদেশের জনকত "কাগজি"কে যদি তথায় লইয়া যান, তাহা হইলে উক্ত ভারতীয়-শিল্পের মহদুপকার সাধন হয়। কাগজ-শিল্পে জাপানীরা বোধ হয় জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৃক্ষত্বক্ ও আগাছা সমুদয় হইতে উঁহাদের কাগজ নির্ম্মিত হয়। উঁহাদের গৃহ-প্রাচীর অনেকস্থলে কাঠের ফ্রেমে পাতলা কাগজ বসান মাত্র। কাচের ন্যায় ভিতরে আলো আসে, কিন্তু বায়ু আসে না। জাপানী-তৈলাক্ত কাগজ এক বিচিত্র বস্তু। উহা যেমন সুলভ তেমনই দীর্ঘস্থায়ী। তথায় দরিদ্রলোকে ইহাতে জলরোধক (water-proof) পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে এবং নিয়ত ব্যবহারেও উহা প্রায় এক বৎসর চলে। বৃষ্টির জলে দ্রব্যাদির রক্ষা প্রয়োজন হইলে, ইহা ঢাকিয়া দেওয়া যায়। যে সব কার্য্যে আমরা "বোরা" বা গুণের থলিয়া ব্যবহার করি, জাপানীরা সে সব স্থলে, গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত কাগ-

জের থলিয়া ব্যবহার করে। উহার একটা গুণ, সহজে পোকায় কাটে না। জাপানী-কাগজগুলির মধ্যে "চর্ম্ম-কাগজ"ই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র বস্তু। উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, চর্ম্মের ন্যায় স্থায়ী, কার্ডবোর্ডের ন্যায় পুরু অথচ অত্যন্ত নমনশীল অর্থাৎ সহজে ভাঁজ পড়ে না।

পাশ্চাত্য সংসর্গে আসিয়া জাপানীরা ব্যাঙ্ক নামধেয় সমিতিগুলির স্থষ্টিতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছে। সাধারণ-শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৭৯৯। ইহাদের মধ্যে ৪টি মাত্র বিদেশীয়-গণ পরিচালিত। সেভিংস-ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৪৬৭, একটিমাত্র বিদেশীয়। কৃষি-শিল্প-বিষয়ক ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫০টি। এই সব ব্যাঙ্ক ব্যতীত ইন্‌সিওরেন্স বা বীমার আফিসও বিস্তর আছে। জাপানের রেল, টেলিগ্রাফ, খনি, কুঠি, টেলিফোঁ, কলের জাহাজ, বৈদ্যুতিক-কারখানা, কলের জল প্রভৃতি সমস্তই তাহার নিজের এবং জাপানী অর্থে ঐগুলি পরিচালিত। এই বিষয়ে এদেশ কি ভয়ঙ্করভাবে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশেও রেলওয়ে, বৈদ্যুতিক-ট্রাম, বৈদ্যুতিক কারখানা, গ্যাস, কলের জল, জাহাজ, খনি এবং বহুবিধ কল কারখানা আছে, কিন্তু ঐ গুলিতে দেশ-বাসীর কোন কৃতিত্ব বা সভ্যতার পরিচয় পাই কি? ঐ সমস্তের প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে শক্তি জন্মিলে, তবে আমরা এবিষয়ে জাপানের সমকক্ষ হইব।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে চাউল, বার্লি, কলাই, নীল, তামাক, চা ও কর্পূর প্রধান। আকর হইতে কয়লা, তাম্র, মাঙ্গালিস, লৌহ ও সীসক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে ৩৩৫০০ টন তাম্র এবং ৮৯,৪৬,০০০টন কয়লা উত্তোলিত হয়। এক এক টনে প্রায় ২৭ মন।

জাপানী কারখানা সমূহে শিল্পী-সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ, ইহাদের মধ্যে শতকরা ৬২ জন স্ত্রীলোক। জাপানে বাষ্পীয়যান, যন্ত্র ও জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা আছে। লৌহ-ঢালাইয়ের কারখানা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্পূর্ণ হইলে, দেশের যাহা কিছু লৌহের প্রয়োজন, উহা হইতেই পাওয়া যাইবে। ভারত-গৌরব তাতা সাহেবের বংশধরগণের চেষ্টায় আমাদের এদেশেও লৌহ-ঢালাইয়ের এক সুবৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

জাপানী-শিল্পের মধ্যে তুলাজাত-দ্রব্য, রেশম, কাগজ, দেশালাই, মাদুর, চীনাবাসন, বার্ণিশ ইত্যাদি প্রধান। শিল্প সম্বন্ধে চীনাদের সুখ্যাতি চিরকাল; চীনাবাজারে বাঁশ বা বেতের নানাবিধ দ্রব্য সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। এ বিষয়ে উঁহাদের প্রতিবেশী জাপানীরাও বড় কম নহেন। বাষ্পীয়-যন্ত্রের এই প্রবল প্রতিযোগিতার দিনেও, উঁহাদের উন্নত হস্ত-শিল্প বহু বিষয়ে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। এদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের সার্থকতা-সাধন জন্য আমরা আজ জাপানী হ্যাণ্ডলুমের সাহায্যপ্রার্থী। জাপানী-গবর্ণমেণ্টের যত্নে জাপানী-শিল্পের আজ এতদূর শ্রীবৃদ্ধি। প্রতীচ্য-সংসর্গে আসিবার পর হইতে জাপান বৈদ্যুতিক ও বাষ্পীয়-যন্ত্র সমূহ নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, এবং আত্ম-রক্ষোপযোগী বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র-নিচয়ও নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে এখনও প্রতীচ্যগণের বহুপশ্চাতে পড়িয়া আছে। কেবল বারুদটা সম্বন্ধে শুনা যায় জাপানের সিমোজ বারুদই বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ অন্য কোন দেশের কোন বারুদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। জাপানী-শিল্পের

বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিবার জন্ত আমরা 'হিতবাদী' পত্র হইতে একটা স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সম্প্রতি ৩১ জন ভারতীয়-যুবক জাপানে বিদ্যার্থী রূপে অবস্থান করিতেছেন। এই ৩১ জনের মধ্যে ১৬ জন বাঙ্গালী, ২ জন বিহারী, ২ জন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-বাসী, ১ জন পঞ্জাবী, ৪ জন বোম্বাই-বাসী, এবং ৬ জন নেপালী। এই সকল ছাত্র রসায়ন, ভৈষজ্য-তত্ত্ব, চর্ম্ম-পরিষ্করণ, চীনামাটির কার্য্য, কাচ-নির্ম্মাণ, খনি-বিদ্যা, এবং ধাতু-বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিতেছেন। পেন্সিল, সাবান, দেশা লাই নির্ম্মাণ, বস্ত্র-বয়ন, বস্ত্র-রঞ্জন, কৃষি প্রভৃতি বিষয় ও অনেকে শিক্ষা করিতেছেন।"

"জাপান হইতে সুলভ মূল্যে রেশম, কাচের জিনিস, চীনামাটির জিনিস, সিমেণ্ট অর্থাৎ বিলাতী মাটি, ধাতুদ্রব্য. দেশলাই, পেন্সিল, সাবান, পেরেক, সূচ, আলপিন, নানা প্রকার গ্যাস ও তৈলের ইঞ্জিন, বোতাম, সিগারেট, নানা প্রকার যন্ত্রাদি, খেলেনা, ঔষধ, রং, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, প্রভৃতি আনাইতে পারা যায়। এই সকল দ্রব্য ইউরোপ-জাত-দ্রব্য অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। ইঞ্জিনীয়ারিং ও অঙ্কন-বিদ্যার জন্ত যে সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির প্রয়োজন, তাহা জাপান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সুলভে পাওয়া যাইতে পারে। যদি কেহ উল্লিখিত কোন দ্রব্য সম্বন্ধে কিছু সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে—

To The Secretary
Indo-Japanese Association,
16, Neshisugacho, Hongo,
Tokio, Japan

এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে, সমিতির সম্পাদক বিশেষ যত্ন-সহকারে সকল প্রকার সংবাদ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে জাপানে পত্র লিখিলে পত্রে ✓১০ দশ পয়সা মাশুল লাগে।'

( হিতবাদী—দৈনিক সংস্করণ—২০শে কার্ত্তিক ১৩১২, ইং ৮-১১-০৫, সোমবার )

## জাপানী বাণিজ্য।

কৃষি শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যও হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। জাপানী দেশলাই এদেশে বিলাতী মালকে হটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। শুনা যায়, শীঘ্রই জাপানী ছাতার আমদানী হইবে। বিদেশে কি উপায়ে জাপানী শিল্পের প্রচলন হইতে পারে, তজ্জন্য বহু জাপানী এজেণ্ট নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এদেশের কোন কোন পার্শী, গুজরাটি ও মুসলমান সুসন্তানের যত্নে, অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড আমেরিকা ও আফ্রিকায় ভারতীয় শিল্প এখনও একটু আধটু বিক্রীত হয়। অধীন ভারতবাসী কিন্তু বহুস্থলেই অবজ্ঞাত, স্বাধীন জাপানের বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ অসুবিধা ক্রমশঃ কাটিতেছে।

জাপানের রপ্তানীর একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল,—

| | খ্রীঃ অব্দ | মূল্য |
|---|---|---|
| দেশলাই | ১৯০২— | ৮,৩৪,০১৭ পাউণ্ড। |
| | ১৯০৩— | ৮,৬৪,৯৫৯ ,, |
| রেশমজাত দ্রব্য | ১৯০০— | ২৩,১০,০০০ ,, |
| | ১৯০১— | ২৯,৭৮,০০০ ,, |
| | ১৯০২— | ৩১,১৪,০০০ ,, |
| | ১৯০৩— | ৩২,১০,০০০ ,, |
| তুলাজাত দ্রব্য | ১৮৯৯ম | পা২৯,১১,৫৬৩ ,, |
| | ১৯০১ম— | ২০,৩১,৬১৪ ,, |
| | ১৯০৩— | ৩২,০৫,২৩৩ ,, |

গড়পড়তা হিসাব।

| খ্রীঃঅব্দ | আমদানী মূল্য | রপ্তানী মূল্য |
|---|---|---|
| ১৮৯৮—১৯০১— | ২,৬৫,৬৬,৭৩৭ পাঃ | ২,১৩,৭২,৭৫৭পাঃ |
| ১৯০২— | ২,৭৭,৩৯,২৩২ ,, | ২,৬৩,৬৮,৩২০ ,, |
| ১৯০৩— | ৩,২৩,৭৪,২৫০ | ২,৯৫,৫৩,৩৭৪ |

কাউণ্ট ওকুমা বলেন কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে নব্যজাপান বর্ষদশ মধ্যে তাহার দেশের অর্থ প্রায় তিনগুণ বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছে।

"চাউল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও,সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত বিদেশে প্রেরিত হইতে পারে না। তুলাজাত দ্রব্য ও পাথুরিয়া কয়লা চীন দেশে নীত হইয়া থাকে। দিয়াশলাই, রেশম, কর্পূর, বিবিধ গন্ধ দ্রব্য, তাম্র বাসনাদি ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে। গম, চিনি, গজদন্ত, স্বর্ণ, লৌহ, কাচ (অন্যত্র দৃষ্ট হইবে জাপানে কাচ নির্ম্মাণ বিদ্যা শিখিতে ভারতবাসী গমন করে এবং জাপানীরা এ দেশে কাচের জিনিস রপ্তানী করিতে প্রস্তুত। কোন্‌টা সত্য, প্রবন্ধ-লেখক বলিতে অক্ষম) ও বিবিধ প্রকার তৈল বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে চীনের গম ও কোরিয়ার সুবর্ণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

"যে সমস্ত জাপানী সওদাগরেরা পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছেন, তন্মধ্যে ফুকিসামা, আমাজেসাকি, লিটসু, নিফন,গোডো,কানাকিম ও ওসাকা কোম্পানি সর্ব্বপ্রধান। ইঁহাদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় এক কোটী টাকার ন্যূন হইবে না।"

—নব্য জাপান, ৪৭।৪৮ পৃঃ।

জাপানের বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও, ইংরাজ ও আমেরিকগণের তুলনায় এখনও ইহা কিছুই নহে। দ্রষ্টব্য এই টুকু, জাপানী বাণিজ্য ইহারই মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রতীচ্যের পার্শ্বে দাঁড়াইতে সক্ষম। এদেশে জাপানী দেশলাইয়ের আমদানী তাহার প্রমাণ।

## উপসংহার।

"বেদে রামায়ণে পুণ্যে, পুরাণে ভারতে তথা, আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"—বেদে পুরাণে মহাভারতে রামায়ণে, আদিতে মধ্যে অন্তে সর্ব্বত্র সেই শ্রীহরি কীর্ত্তিত। জাপানের বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গীন—রাজনৈতিক, সামাজিক, অথবা কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি যে কোন বিষয়ে—অভ্যুদয়ও তদ্রূপ এক মহাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মহাভাবটি হইতেছে, "জাপান যেন জ্ঞানে ও বলে জগতের কোন দেশ হইতে হীন না হয়।" জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান নহে, যে জ্ঞানে আমাদের শক্তি বা বল বৃদ্ধি হয়, সেই জ্ঞান। বল বৃদ্ধি জন্য জ্ঞানের কত প্রয়োজন এবং শুধু জ্ঞান নহে, কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতিই ইহার সহিত কিরূপ বিজড়িত, আমরা ভূমিকায় বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি।

এই মহাভাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত জাপানবাসী আজ প্রাণান্ত পণ করিয়াছে। দেশের জন্য আত্মোৎসর্গই জাপানবাসীর অভ্যুদয়ের মূল। জাপান বিষয়ক এই প্রবন্ধ মধ্যে আমরা উহা যথাশক্তি বিশদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই মহাভাবটির যেখানে যেখানে স্ফুরণ নাই, সেখানে সেখানে জাপানকে জগতের অন্য দেশ সমূহ হইতে তাদৃশ পৃথক্ করিতে পারা যায় না এবং বড় বলিতেও ইচ্ছা হয় না। জাপানের "গেইসা" বা "জন্‌কিনো" আমাদের মাঝে নাই, অথবা উহাঁদের ন্যায় বাঁশের বালিশে মাথা দিয়া আমরা ঘুমাই না; তজ্জন্য কিছু ক্ষতিবৃদ্ধিও মনে করি না। জাপানীরা ভাত শুখাইয়া খায় জানিয়া আমাদের কি লাভ। কিন্তু যখনই স্মরণ করা যায়, রণক্ষেত্রে অতি সহজে ঐ জন্য উহাঁদের খাদ্য প্রস্তুত হয়, তখন স্বতঃই বিদেশে বা পথে আহারের সুবিধা জন্য, আমাদের চিঁড়া মুড়কির উপর দৃষ্টি পড়ে। ঘড়ি,বাইসিকেল প্রভৃতি আজকাল জাপানেও হইতেছে, ইহাতে বিস্ময়কর কি আছে? জেনেভাতেও ঘড়ি হয় এবং সম্ভবতঃ তাহা

জাপানী ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; বাইসিকেল গুলাও হয়ত এখনও উন্নত ভাবে প্রস্তুত হয় না। Round the World on Wheels নামক পুস্তকে তিন জন সাহেব ভ্রমণকারী, জাপানী বাইসিকেলের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু যখনই স্মরণ করা যায় ঐ সমস্ত চেষ্টা, ভিতরের পরমুখাপেক্ষিতা পরিহারের লক্ষণ মাত্র, তখন উহাদের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ হইয়া দাঁড়ায়। তখনই বুঝিতে পারি, জাপানকে উন্নত বলি কেন?

এমন জাতি কি জগতে আছে, যাহাদের হৃদয়ে, "অন্য দেশের তুলনায় স্বদেশ আমার হীনরূপে প্রতিভাত না হউক,"—এ চিন্তা স্থান পায় না? আমরা ত অধীন জাতি, আমাদের মনেও সাধ যায় না কি, আমাদের ভারত ধনে মানে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করুক? এই স্বদেশ-ভক্তির ভিতর কিন্তু একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। বর্ত্তমানকালে প্রাচ্যরাজ্যগুলি যেন সকলেই নিজ নিজ দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং পরস্পরের সহিত একটা অলক্ষ্য সহানুভূতি সূত্রে গ্রথিত হইতেছেন, আত্ম-রক্ষার্থ সকলে মিলিয়া যেন এক মহা জাতিরূপে পরিণত হইতে সমুৎসুক হইয়াছেন। যে কোন এশিয়াবাসীকে "স্বদেশী" জ্ঞানে সম্বোধন করিতে এখন অনেকের কুণ্ঠা বোধ হয় না। এসিয়াবাসিগণ মধ্যে স্বদেশের অর্থ এইরূপ একটু উদারতর আকার ধারণ করিতেছে। আমরা যে অধীন জাতি, আমাদের মনেও যে কোন প্রাচ্য জাতির শক্তি বৃদ্ধি শ্রবণে উল্লাস হয়। অন্য প্রাচ্য জাতি নিচয়ের মনের ভাব কি আমরা বিশেষরূপ অবগত নহি। কিন্তু Ideals of the East পুস্তকে জাপানের শ্রীযুক্ত ওকাকুরা স্পষ্টই বলিয়াছেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এক অখণ্ড মহাজাতিরূপে পরিগণিত হইবার অধিকারী; সমুদয় প্রাচ্য জাতির এক প্রকৃতি, এক লক্ষ্য, একই বৈরাগ্যমূলক সভ্যতায় ও অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিবার আদর্শে সকলে অনুপ্রাণিত। ইতিহাস আলোচনা করিলে এই বিষয়টা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদের আদর্শ রাজগণ রাজা ও ঋষি উভয়ই। মুসলমান খলিফাগণের কাহিনী পাঠে মনে হয়, উঁহারা ফকিরেরই একটা রাজ-সংস্করণ মাত্র। নাদীর শাহ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে,—একদা কোন ফকির তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন, তিনি যদি নিজকে ঈশ্বরজ্ঞান করেন, যেন লোকের সুখ বর্দ্ধনে মন দেন; আর যদি আপনাকে মানুষ বলিয়াই জানেন, তাহা হইলে যেন দর্পান্ধভাবে নরশোণিতপাতে আর প্রবৃত্ত না হন। তিরস্কৃত হইয়া দিগ্বিজয়ী বীর সহাস্যমুখে উত্তর দিলেন, তিনি আপনাকে দেবতা বা মানুষ কোনটাই মনে করেন না, ঈশ্বরের হাতে তিনি একটা চাবুক মাত্র। চারিদিকে দণ্ড্যের দণ্ডদান জন্যই ঈশ্বর তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়াছেন। এই উত্তরের ভিতর "ত্বয়া হৃষীকেশের" একটু সম্পর্ক পাওয়া যায় না? তথাপি নাদীর আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত হন নাই। গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম পড়িয়াছি—জাপানীদের স্বর্গ নরক বাদহীন জীবনে; কংফুছে, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কৃপায় উদ্ভাসিত, সমাজহিত আদর্শে অনুপ্রাণিত চৈন সভ্যতায় তাহারই বিকাশ দেখি না কি? ধর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে যোগে আত্মদর্শন আমাদের মতে পরম ধর্ম্ম।

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সংকল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলে মিদং স্মৃতম্।
ইজ্যাচার দমাহিংসা দানং স্বাধ্যায় কর্ম্ম চ।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্ম দর্শনম্।

(বঙ্গবাসীর প্রকাশিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
১ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)

ধর্ম্মের এমন পবিত্রতা-ব্যাপক লক্ষণ অল্পই দৃষ্ট হয়। সকল ধর্ম্মেই শ্রুতি, স্মৃতি (যাহার যাহা শাস্ত্র) আপনার প্রীতি, সম্যক্ সংকল্প-জনিত কাম বা কার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মমূলরূপে স্বীকৃত হয়। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে যোগে আত্ম-দর্শন হিন্দু ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু শুধুই কি ভারতীয় হিন্দুধর্ম্ম যোগের উপর শ্রদ্ধা সম্পন্ন? তিব্বতীয়গণেরও যোগ শক্তির উপর অটল বিশ্বাস। লেখক কোন শ্রদ্ধেয় থিয়সফিষ্টের মুখে শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, বর্ত্তমান জাপান সম্রাট একজন যোগ-শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ। অন্ততঃ জাপানীরা যে তাঁহাদের রাজাকে দেবতার ন্যায় মনে করেন, এই প্রবন্ধ মধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ রাজারা ব্রাহ্মণদের প্রতিপালক ছিলেন, ইতিহাস খুঁজিলে দেখা যাইবে মুসলমান বাদ-শাহগণও কেহ কেহ সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি-পালক ছিলেন। উদাসীন ফকির সন্ন্যাসী প্রভৃতির মধ্যে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি ভেদ করা কিছু কঠিন ব্যাপার। আর অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। পাঠক স্বচেষ্টায় প্রাচ্য প্রকৃতির বিশেষত্বটুকু বাহির করিতে যত্ন পাইবেন।

প্রাচ্য প্রকৃতির এই একত্ব অনুভব করিয়া আজ উন্নত জাপান, শুধু জাপানের নহে, সমুদয় প্রাচ্যভূমির উদ্ধার-সাধন জন্য এক একবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। এ কল্পনা কবে এবং কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে, কিছুই স্থির নাই। ইহারই মধ্যে কিন্তু পীতাতঙ্ক পীড়া কাহারও কাহারও ক্লেশের কারণ হইয়াছে।

জাপান জাগিয়াছে এবং কারণ নিরূপণ জন্য আমরা বলি, উঁহাদের অতুলনীয় আত্মোৎ-সর্গই ঐ অদ্ভুত পূর্ব্ব উন্নতির মূল, কিন্তু শুধু আত্মোৎসর্গই যে জাতীয় উন্নতির কারণ আমাদের এমন মনে হয় না। উন্নতির সময় হয় ত আত্মোৎসর্গের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়, কিন্তু আমাদের মনে হয় উহা কারণ নহে, প্রত্যুত কার্য্যের সহিত তুলনীয়। জাতীয় উন্নতি-তত্ত্ব ঠিক "নিহিতং গুহায়াম্" না হই-লেও, অতীব রহস্যময় বটে। সবংশে নিহত হইবার কালে, দশানন বা দুর্য্যোধন কিছু কম আত্মোৎসর্গ দেখাইয়া ছিলেন কি? স্পানি-য়ার্ডগণ কর্ত্তৃক মেক্সিকো বিজয়কালে, মেক্সি-কোর অধিবাসিগণ অথবা রোমকগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত কার্থেজবাসিগণ কিছু কম আত্মোৎ-সর্গ দেখাইয়াছে কি? বুয়র যুদ্ধ যখন প্রবল ভাবে চলিতেছিল, তখন ইংরাজ কবি-বিরচিত—

"Freedom's battle once begun,
Bequeathed from bleeding sire to son,
Though oft lost is ever won"

—কবিতাটি স্মরণ করিয়া বুয়রগণের সিদ্ধি লাভ বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলাম, কিন্তু সে বিশ্বাস ফলিয়াছে কি? তাই বলিতেছিলাম, এ সব তত্ত্বের মীমাংসা বড়ই জটিল। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, একটি বিষয়ে আমাদের স্বতঃই চক্ষু যায়। সেটি প্রাচ্য ভূখণ্ডের ক্রম-জাগরণ।

জাপান জাগিয়াছে; কিন্তু শুধু কি জাপান! ঘরের পাশের অপর রাজ্যগুলার দিকে দৃষ্টিপাত কর। আফগানিস্থানের আমীরের শক্তি পূর্ব্বে সামন্তবর্গ মাঝে বহুধা বিভক্ত ছিল। যুদ্ধকালে সাহসী কাবুলী বা আফ্রি-দীরা কোন কালেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে, কিন্তু সমবেত শক্তির সুশৃঙ্খল ভাবে প্রয়োগে যে সুবিধা, তাহা তাহারা পায় না। আমীর সম্প্রতি এই অসুবিধা দূরীকরণে চেষ্টিত হইয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জাপানী সম্রাট্ স্বরাজ্যে প্রজাতন্ত্র-মূলক শাসন-নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। চীনেও নয় দশ বর্ষ

মধ্যে পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহারই মধ্যে তাহার জন্য আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মনন্দ মহাভারতীর প্রসাদে আমরা অবগত হই, শ্যাম দেশবাসিগণের সহিত বাঙ্গালিদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই শ্যাম দেশের রাজাও ইয়ুরোপ যাওয়া আসা করিতেছেন, স্বরাজ্য ইয়ুরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রাচ্য সমাজের এই ক্রম-জাগরণ লক্ষনীয়। আগেই উদয় গিরিতে (জাপানীরা তাঁহাদের দেশকে সূর্য্যের উদয় স্থান নামে অভিহিত করেন) প্রভাত আরম্ভ হইয়াছে। দিনরাত্রি, নিদ্রা জাগরণ—ইহাই বুঝি সৃষ্টি-রহস্য। শ্বাস প্রশ্বাস, উত্থান পতন, ঘাত প্রতিঘাত, পুষ্টি ক্ষয়—সর্ব্বত্র এই ব্যাপার দৃষ্ট হয়। এই জগৎটাই যেন তরঙ্গ বা ভুজঙ্গ গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাসুকী বা শেষ নাগের কল্পনা নিতান্ত কল্পনা নাও হইতে পারে। আমরা যে আলোক অনুভব করি, তাহাও শুনা যায় ঈশ্বরের তরঙ্গ গতির উপর নির্ভর করে। দৈব ও ব্রহ্ম দিন রাত্রির ন্যায়, জাতীয় জীবনেও বোধ হয় দিন রাত আসে। এই দেখনা কেন, যে প্রতীচ্য জাতির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এই সমস্ত প্রাচ্য জাতি জাগিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে স্বাধীনতা-প্রিয়তা কেমন ধীরে ধীরে অন্যের স্বাধীনতা-হরণ প্রবৃত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা কি জাতীয় জীবনে রাত্রির পূর্ব্ব-সূচনা নহে? যাহা হউক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমাজের একটা বিশেষত্ব এই,—প্রাচ্য সমাজ রাজ অনুকম্পায় প্রতিষ্ঠিত ও রাজ অনুগ্রহে পুষ্ট; প্রতীচ্য সমাজ আত্মচেষ্টায়, আত্মশক্তিতে যাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে, ততটা মাত্র তাহার অধিকার। চীন জাপানের পার্লিয়ামেণ্ট, আর ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলনা কর; কথাটা বুঝিতে পারিবে। রুশ প্রজার অধিকার বিস্তৃতি, আইরিশের হোমরুল প্রাপ্তি, ফরাসার সাধারণ-তন্ত্র ও আরও কত দৃষ্টান্ত নজরে পড়িবে। বিধাতার ইচ্ছায় আমরা প্রতীচ্য সমাজের অধীনে আসিয়াছি। চীন জাপান এবং হয় ত আফগানিস্থান যে পথে উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইবে, আমাদের সে পথ নাই। বিধাতা আমাদিগকে ক্ষুরধার ভিন্ন পথের পথিক করিয়াছেন। তাই পদে পদে ক্ষত বিক্ষত হইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি কখন উন্নত হইতে পারি, অন্য এশিয়াবাসিগণের উন্নতিতে যে ত্রুটিটুকু পাকিয়া যাইবে, আমাদের দ্বারা হয় ত তাহার পূরণ হইবে। তখন আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্বীকার করিব, ইংরাজগণ আমাদের বিধাতাপ্রেরিত উদ্ধার কর্ত্তাই বটে; উঁহারা আমাদের মুখে দুধভাত তুলিয়া দেন নাই যথার্থ, কিন্তু উঁহাদেরই কল্যাণে কিরূপে দুধভাতের যোগাড় করিতে হয় শিখিয়াছি। আর চারিদিকে প্রাচ্য সমাজের এই জাগরণের দিনেও, বিগ্ন ত্রাশন গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া, যদি আমরা মাথা তুলিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে য়িহুদিগণের অথবা কোল, সাঁওতাল, জুলু, হটেণ্টট, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান প্রভৃতিগণের ন্যায়, কৃপাময়ের কৃপা প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা, বা ধরাধাম হইতে বিলুপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যথাশক্তি দুঃখ মুক্তি জন্য চেষ্টা পাওয়া ব্যতীত আমাদের আর গতি কি?

এই দুঃখ-মুক্তির চেষ্টা জাপানের অনুকরণে করিতে হইলে, আমাদের সকলকেই যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার, একই লক্ষ্য সাধন জন্য শক্তি সমবায় এবং আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করিতে হইবে। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনকে তাই আমরা আশাপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছি।

—সমাপ্ত—

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

# ক্রমবিকাশ।

## ১। ত্রিমূর্ত্তি (Three Logii)

শাস্ত্রে সগুণব্রহ্মের তিন প্রকার বিভাবের (aspects) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই তিন বিভাব অনুসারে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। নির্গুণ ব্রহ্মের সংসার সৃষ্টি হয় না বলিয়া, তিনি মায়োপাধিক হইয়া তিন প্রকার বিভাব অনুসারে তিন প্রকার পুরুষরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

তত্ত্ব-সৃষ্টির নাম, কারণ-সৃষ্টি এবং জীব-সৃষ্টির নাম, কার্য্য-সৃষ্টি। ঐ সকল তত্ত্বের যিনি আত্মা, যিনি ঐ সকল তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রতি পরমাণুকে,প্রতি-তত্ত্বকে, প্রকৃতির প্রতি-বিভাগকে জীবন সম্পন্ন করেন, তিনিই প্রথম পুরুষ। প্রথম পুরুষ বিশুদ্ধ-আত্মা। সৃষ্টি রচনা হয় না বলিয়া অশরীরী পুরুষরূপে ঈশ্বরের এই উপাধি-গ্রহণ। উক্ত তত্ত্ব সকল সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

> নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
> নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ।।
>
> (১ অংশ—২য় অধ্যায়—৪৮)

অর্থাৎ ইহারা নানাবীর্য্য ও পৃথক্-ভূত বলিয়া সংহতি বিনা সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়াছিল। তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইল বটে, কিন্তু তাহারা জীব-সংস্থানের জন্য লোক সকল এবং জীব-শরীর রচনা করিতে পারিল না। তত্ত্ব সকল স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইল, কিন্তু তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিল না। এই জন্য পুরাণে রূপক-চ্ছলে এই প্রকার কথিত আছে যে, লোক রচনায় অসমর্থ, অসমবেত ভাবে অবস্থিত, স্বশক্তি মহদাদির অসংহত ভাবে অবস্থান অবগত হইয়া, ভগবান্ মূল প্রকৃতি রূপ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া এককালে ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় পুরুষ মূল প্রকৃতি রূপ শরীরবিশিষ্ট হইয়া কার্য্য-সৃষ্টির অর্থাৎ জীব সমূহের আত্মা-রূপে প্রতিভাত হইলেন। তত্ত্ব সকল যে বিরাট দেহ রচনা করিয়াছিল তাহার আকার অণ্ডের ন্যায়, সেই অণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। দ্বিতীয় পুরুষ সেই সমস্ত অণ্ডকে অনুপ্রাণিত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুরুষ সমগ্র-জীবের আত্মা। তিনি কূটস্থ। তিনি পুরাণে বিরাট-পুরুষ, উপনিষদে প্রজাপতি, এবং বেদে সহস্র-শীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্র-পাদ পুরুষ বলিয়া খ্যাত আছেন। তিনি কল্পের ঈশ্বর। তিনি কল্পের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় বিধান করিয়া থাকেন। ইঁহাকেই ভাগবত আদ্য অবতার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের প্রভেদ এই যে, যে শক্তি-দ্বারা তত্ত্ব সকল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত হইতে পারে তাহাই প্রথম পুরুষের শক্তি, এবং যে শক্তি-দ্বারা তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বিভিন্নদেহ ও লোক রচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহাই দ্বিতীয় পুরুষের শক্তি।

যখন কূটস্থ ভাব ত্যাগ করিয়া জীব সকল পৃথক্‌ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়, তখন তিনি তৃতীয় পুরুষ হইয়া প্রতি-জীবের আত্মা বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি সকল ভূতের অন্তঃস্থ হইয়া সকল ভূতকে যন্ত্রের ন্যায় চালাইতেছেন। তাহারই প্রেরণায় জীব সকল উদ্ভিদাদি

আকার ধারণ করে এবং তাঁহারই চিৎশক্তি প্রভাবে জীবের দৈহিক ব্যাপার ও ইন্দ্রিয়-জনিত সংজ্ঞা-লাভ হয়। তিন পুরুষ সম্বন্ধে কূর্ম্ম্য-পুরাণে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে—

"তস্মিন্ কার্য্যস্য করণং সংসিদ্ধং পরমেষ্টিনঃ।
প্রাকৃতেহণ্ডে বিবৃদ্ধে তু ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিত॥
সবৈ শরীরী প্রথমঃ সবৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা সভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥"

( পূর্ব্বভাগ—৪—৩৭ ও ৩৮ )

অর্থাৎ প্রাকৃত অণ্ড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, স্রষ্টার কার্য্যের সংসিদ্ধ করণ-স্বরূপ "ক্ষেত্রজ্ঞ-ব্রহ্ম" এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত, যিনি প্রথমপুরুষ বলিয়া কথিত এবং ভূত-সমূহের আদিকর্ত্তা সেই ব্রহ্ম অগ্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সকলং সপ্তলোকবলান্বিতম্।
দ্বিতীয়ং তস্য দেবস্য শরীরং পরমেষ্ঠিনঃ॥"

( ঐ—ঐ—৪৮ )

অর্থাৎ এই সপ্তলোক বলযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বিতীয় শরীর।

"হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ ব্রহ্মা, বৈ কণকাণ্ডজঃ।
তৃতীয়ং ভগবদ্রূপং প্রাহুর্বেদার্থবেদিনঃ॥

( ঐ—ঐ—৪৯ )

অর্থাৎ সুবর্ণ-অণ্ড হইতে সমুৎপন্ন হিরণ্য-গর্ভ, ভগবান্ ব্রহ্মা, ভগবানের তৃতীয় রূপ, ইহা বেদার্থবাদীরা বলিয়া থাকেন। তৎপরে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বাত্মা বিশ্ব-সুথ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বিষ্ণু সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট জগৎপালন করেন। অন্তকালে সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর রুদ্রদেব স্বয়ং তমোগুণ অবলম্বন করিয়া জগৎসংহার করে।

এই জন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে,

একোহপিসন্ মহাদেবস্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ।
সর্গ-রক্ষা লয়গুণৈ র্নির্গুণোহপি নিরঞ্জনঃ॥
একধা সদ্বিধা চৈব ত্রিধা চ বহুধা গুণৈঃ॥

( ঐ—ঐ—৫,৫৩৪ )

অর্থাৎ নির্গুণ এবং নিরঞ্জন মহাদেব এক হইলেও সৃষ্টি-পালন-সংহার-গুণ দ্বারা ত্রিমূর্ত্তিতে অবস্থিত; তিনি গুণভেদে এক মূর্ত্তি, দ্বিমূর্ত্তি ও ত্রিমূর্ত্তি বিশিষ্ট।

শ্রীধর স্বামী সাত্বত তন্ত্র হইতে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার যোজনা করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।"

অর্থাৎ বিষ্ণুর পুরুষাখ্য তিন রূপ আছে। প্রথম, মহতের অর্থাৎ মহতাদি ২৩শ তত্ত্বের স্রষ্টা, দ্বিতীয় অণ্ডে সংস্থিত এবং তৃতায় সর্ব্ব-ভূতস্থ। এই তিন রূপের দ্বারা ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার বিভাবকে (aspects) লক্ষ্য করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত তিন পুরুষ তিন হইয়াও এক। তাঁহাদিগকে ত্রিমূর্ত্তি বলা হয়। কেবল বিভিন্ন কার্য্যের জন্য এক ঈশ্বরকে তিন হইতে হই-য়াছে। একমাত্র চৈতন্য বিভিন্ন উপাধিযোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত হইয়াছেন; বস্তুগত্যা ইঁহাদের কোন ভেদ নাই। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ। (১-২-৬২)

অর্থাৎ কেবল মাত্র এক জনার্দ্দনই সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব এই তিন উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে এবং তাঁহার শক্তিকে সরস্বতী অথবা জ্ঞানের বা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বলে। বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের পালক বলে। তাঁহার শক্তির নাম লক্ষ্মী। শিবকে প্রলয়ের কর্ত্তা বলে। তাঁহার শক্তিকে উমা বলে। এই শক্তি ব্রহ্ম বিদ্যা নামেও অভিহিত হইয়া

থাকে। ইহা আত্মাকে কোশ সকল হইতে মুক্ত করে, অবিদ্যার ধ্বংস করে, বিদ্যা প্রদান করে এবং ব্রহ্মাণ্ডকে লয়ে পরিণত করিয়া শান্তি বিধান করিয়া থাকে।

এস্থলে ইহা বক্তব্য যে ব্রহ্মাণ্ড একটী নহে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা শিব এক নহেন। দেবী ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"সংখ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে॥
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাদয়ঃ।"(৯-৩-৭-৮)

অর্থাৎ ধূলিকণা সমূহের সংখ্যা হয়, কিন্তু বিশ্ব সমূহের কদাপি সংখ্যা করা যায় না। সেই প্রকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির সংখ্যা হয় না। প্রতিবিশ্বে এই প্রকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি আছেন।

## প্রথম জীবন-তরঙ্গ (First Life Wave)

পুরুষের পূর্ব্বোক্ত তিন বিভাব অনুসারে সৃষ্টি প্রকরণেরও তিনটী বিভাগ করিতে হইয়াছে। এক এক পুরুষের এক এক জীবন-তরঙ্গে বিশ্বের এক এক বিভাব গঠিত হইয়াছে। তৃতীয় পুরুষ হইতে যে জীবন তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে তাহাকে প্রথম জীবন তরঙ্গ (First Life Wave) বলে। ইহার প্রভাবে ভূতাদি অর্থাৎ বিশ্বের উপকরণ সৃষ্ট হইয়াছে এবং সুর, অসুর, খনিজ, উদ্ভিদ, স্থাবর, জন্তু এবং মনুষ্যের ideal types সৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় পুরুষ হইতে যে জীবন তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে তাহাকে দ্বিতীয় জীবন তরঙ্গ (Second Life Wave) বলে। ইহার প্রভাবে প্রাণ ও চিৎ-সর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম পুরুষ হইতে যে জীবন তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে তাহাকে তৃতীয় জীবন তরঙ্গ (Third Life Wave) বলা হয়। ইহার প্রভাবে মনুষ্যের আত্মজ্ঞান (Self-Consciousness) উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রথম জীবন তরঙ্গে পঞ্চ তন্মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। তৎপরে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল বা মিশ্রভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে সপ্ত পাতাল এবং ভূরাদি সপ্তলোক এবং বিভিন্ন জন্তুর শরীরাদি রচিত হইয়াছে। প্রথম জীবন তরঙ্গে পদার্থ বা ভূতের ক্রম বিকাশ (Evolution of Matter) সাধিত হইয়াছে।

## অসংহত সৃষ্টি।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে সৃষ্টিতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যে সকল তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি তাহারা প্রথম জীবন তরঙ্গের দ্বারা কিরূপে পরিণমিত হইয়াছে তাহা নিম্নে আলোচিত হইল। সাধকেরা অবগত আছেন যে, যখন কোন চিন্তা করা যায় তখন সেই চিন্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশ পায়। ইহাকে পাশ্চাত্যেরা Thought form এবং প্রাচ্যেরা 'কৃত্যা' বলিয়া থাকেন। চিন্তা শক্তি, ঐ মূর্ত্তির জীবন বা প্রাণ ( life ) স্বরূপ। চিন্তা-শক্তির প্রাখর্য্যের উপর উহার স্থিতি-কাল নির্ভর করিয়া থাকে। চিন্তা-মূর্ত্তি প্রথমে মানস ভূমির উপাদান নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পরে উহা যে ভূমির উপযোগী হইয়া গঠিত হইয়াছে, সেই ভূমির উপাদান সকল গ্রহণ করিয়া সেই ভূমিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ, স্থূল বিষয়ের চিন্তা হইলে উহা স্থূলরূপ গ্রহণ করে এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তা হইলে সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। চিন্তামূর্ত্তিকে আমরা চিন্তার বিকার ( Modifications ) বলিয়া থাকি এবং চিন্তা-মূর্ত্তির যে টুকু প্রাণ বা জীবনী শক্তি আছে, সে টুকুকে আমরা চিন্তার

কার্য্যকারী শক্তি (energy) বলিয়া থাকি। এই জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধেও ঐ প্রকার হইয়া থাকে। পরমেশ্বর যখন জগৎ সৃজন করিবার চিন্তা করেন তখন তাঁহার পরমেশ্বরীয় সংবিতের ( Divine Consciousness ) বিকার (Modifications) হয়; ঐ সকল বিকারকে (Modifications) 'তন্মাত্র' বলে। 'তন্মাত্র অর্থে 'তৎ' অর্থাৎ সংবিতের 'মাত্রা' বা পরিমাণ ( measures ) বুঝাইয়া থাকে। পরমেশ্বর সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহার পরমেশ্বরীয় সংবিতে বিভিন্ন'মাত্রা' ( measures ) দিয়া থাকেন। মনুষ্য যখন চিন্তা করে তখন তাহার চিন্তা যেমন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর যখন জগৎ-সৃজনের ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার চিন্তা 'তন্মাত্র' রূপ বিকার (modification) ধারণ করিয়া থাকে। আমরা যেমন চিন্তার কার্য্যকারী শক্তিকে (energy) চিন্তা-মূর্ত্তির জীবন ( life ) বলিয়া থাকি, তদ্রূপ ঐ সকল 'তন্মাত্রের' জীবন বা শক্তিকে ( energy ) আমরা 'তত্ত্ব' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। সাধকেরা অবগত আছেন যে চিন্তা করিবার মাত্র, সেই চিন্তা মনোময় কোষের উপাদানে পরিবৃত হইয়া মনোময় ক্ষেত্রে উদ্ভূত হইয়া থাকে; পরে উহা যখন প্রাণময় ক্ষেত্রে, আগমন করে তখন প্রাণময় কোষের উপাদানে পরিবৃত হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তির ও ঐরূপ বিকার হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা শক্তি প্রথমে তন্মাত্র, পরে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিরূপে বিকার প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই সকল বিকারের মধ্যে যেটুকু তাঁহার শক্তি (energy) তাহার নামই 'তত্ত্ব' অর্থাৎ 'তাঁহারই ভাব'বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

'তত্ত্ব' ও 'তন্মাত্রের' স্বরূপ অবগত হইতে হইলে, নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ আমাদের এমন একটী পরমাণুর (atcm) কল্পনা করিতে হইবে যাহার আর কোন বিভাগ হয় না। এইরূপ পরমানুকে প্রাথমিক পরমাণু (Primary Atom) বলা হয়। সংবিতের 'মাত্রা' দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই পরমাণু 'মাত্রা' বা পরিমাণ অনুযায়ী স্পন্দন করিবে। বৈজ্ঞানিক কথায় বলিতে হইলে আমরা বলিব যে ঐ পরমানুর স্পন্দনের (vibration) জন্য যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার দৈর্ঘ্যের (wave-length) পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন পরমাণু সকল বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। এইজন্য এক ভূমির এক প্রকারের স্পন্দনশীল পরমাণু অন্য ভূমির অন্য প্রকারের স্পন্দনশীল পরমাণু হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে। আমরা যদি কোন একটী দানা (crystal) লই, যেমন লবণের দানা, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহার বিভিন্ন (axes) আছে,এবং এই (axes) দানার ধারের সহিত যে সকল কোণ (angle) উৎপন্ন করে, সেই সকল কোণের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত আছে। এই সম্বন্ধ ঠিক আছে বলিয়াই লবণের দানাগুলি ছোট হউক বা বড় হউক তাহাতে ক্ষতি নাই,কিন্তু উক্ত কোণ(angles) গুলি ঠিক থাকে। সেই প্রকার পূর্ব্বোল্লিখিত পরমাণুগুলি সম্বন্ধে ও ঐরূপ হইয়া থাকে। 'তত্ত্ব' বা জীবনী শক্তির জন্য ঐ পরমাণুর axes এবং angular পরিমাণ ঠিক্ থাকে, সুতরাং অন্য প্রকারের 'তত্ত্ব'যুক্ত পরমাণুর সহিত উহা মিশিয়া যায় না। পরমেশ্বর জগৎ সৃজন করিবার পূর্ব্বে যেরূপ 'মাত্রা' দিয়াছেন, সেই অনুসারে পরমাণু সকল 'গণ্ডী' ধারণ করিয়া

স্পন্দন করিতেছে এবং যে প্রকার 'তত্ত্ব' প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই প্রকারে পরমাণু সকল গঠিত হইয়াছে। ইহাদিগের কোন প্রকারে পরিবর্ত্তন করা যায় না। এই কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য দেবী ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অহঙ্কার কৃতং সর্ব্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
কথং তদ্রহিতং পুত্র ভবেৎকল্প শতৈরপি ॥"
(৩—৮—১৭)

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক্ সমুদয় বিশ্ব অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং শত শত কল্পেও কি প্রকারে উহার রহিত করা যায়?

পরমেশ্বর যদি আর একটী জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেখানে যেরূপ 'মাত্রা' ও 'তত্ত্ব' প্রয়োগ করিয়াছেন সেই অনুসারে সেই জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরমাণু সকল গঠিত হইয়াছে। কিন্তু 'তত্ত্বের' পার্থক্যের জন্য এ জগতের কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের পরমাণু অন্য জগতের সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের পরমাণুর সহিত মিশিয়া যাইবে না। পুনশ্চ 'মাত্রা' এবং 'তত্ত্বের' জন্য পরমাণু সকলের axes এবং angular পরিমাণ ঠিক আছে বলিয়া সকল ব্যক্তিই জগতকে একই প্রকার দেখিতেছে। উক্ত 'মাত্রা' এবং 'তত্ত্বের' জন্যই প্রত্যেক পরমাণু নির্দ্দিষ্ট প্রকার আকার পাইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা ইহা অবগত হইয়াছি যে পরমেশ্বরের শক্তি তাঁহার ইচ্ছাতে 'মহৎ', 'অহঙ্কার', 'ইন্দ্রিয়াদি' নামে এক দিকে energy রূপে 'তত্ত্ব' নাম ধারণ করিয়া জাগ্রত হইল এবং অপরদিকে 'মহৎ', 'অহঙ্কার' 'ইন্দ্রিয়াদি' সম্পন্ন শক্তি দ্বারা পরমেশ্বরীয় সংবিতের বিকার (modifications) করিয়া সৃষ্টি প্রসব করিল। তত্ত্বকে সৃষ্টির প্রাণ (Life) এবং পঞ্চভূতকে তদীয় আকার (Form) বলা যায়।

নিরীশ্বর সাংখ্য প্রকৃতিকে স্বাধীনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া, প্রকৃতির পূর্ণরূপ দেখিতে পান নাই। তাঁহাকে কেবল জড়-রূপা বলিয়া জড়প্রপঞ্চের জননী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেশ্বর অদ্বৈত সাংখ্য প্রকৃতিকে "চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বিদ্যমান তিনিই প্রকৃতি। শ্রুতিতে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, এই প্রকৃতি জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। যে অংশের দ্বারা প্রকৃতি জীব ভাব কল্পনা করিয়াছেন, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ "দৈবী প্রকৃতি" বলিয়া গীতাতে উল্লেখ করিয়াছেন। জীবাত্মাই পরমেশ্বরের সৃষ্টির প্রধান পরিচয়। যখন পঞ্চ সূক্ষ্মভূতরূপী তন্মাত্র সকল সৃষ্ট হইয়াছিল তখন তাহার সহিত এইরূপ ধার্য্য হইয়াছিল যে, কালেতে ঐ সূক্ষ্মভূত সকল স্থূলভূতরূপে পরিণত হইলে, তৎসমুদয়ের দ্বারা যেমন জড় ও উদ্ভিদ্ পদার্থ সকল সৃষ্ট হইবে, সেই প্রকার তৎসমুদয়ের যথাযোগ্য অংশের দ্বারা জীবের নিমিত্ত স্থূলদেহ প্রস্তুত হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মদেহ ব্যতীত স্থূলদেহ কোন কার্য্যের হয় না। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-প্রাণ, বুদ্ধি এবং মন এই সপ্তদশ অবয়বকে সূক্ষ্মদেহ কহে। ইহারা পঞ্চভূতের তমঃ অংশের বিকারজ। ইহারা সমুদয় সূক্ষ্ম-শক্তি মাত্র। পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়াদিকে মনু "আত্মামাত্রা" * আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পঞ্চ সূক্ষ্মভূত যেমন পরমেশ্বরীর সংবিতের বিকার (modifications) সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ অবয়ব

* মনুসংহিতা—১—১৬।

জীবাত্মার (Monad) বিকার। আত্মাতে (Monad) মাত্রা বা পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ অবয়ব সৃষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য আত্মাতে বিভিন্ন মাত্রা প্রদান করাতে বিভিন্ন প্রকারের জীব উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, তত্ত্বগুলির সৃষ্টিকে বৈকারিক-সৃষ্টি বলা হয়। ইহারা অসংহত সূক্ষ্ম-সৃষ্টি মাত্র। পুরাণে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে ঐ সকল সূক্ষ্ম মাত্রা বহুকাল পর্য্যন্ত অসংহত অর্থাৎ অমিলিত অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম-ভূতগণ পঞ্চীকৃত এবং আত্মমাত্রার সহিত পরস্পর যথাযোগ্য সামঞ্জসীভূত হয় নাই। যেরূপ ভাগে পরস্পর সমবেত হইলে জগৎ নির্ম্মাণে সমর্থ হয়, সেইরূপে ঐ সকল মাত্রা সংহত বা মিলিত হয় নাই। উহারা পরস্পরে মিলিত না হওয়াতে শরীর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎপরে ভগবান, কাল, কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। তাহার পর সেই সকল পদার্থ হইতে একটী অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল। এই অণ্ড সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জলে শয়ান হইয়া থাকিলে পর চৈতন্যদাতা পরমাত্মা অদৃষ্ট, কাল ও স্বভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন।

এই অণ্ডকে "হিরণ্ময়" অণ্ড আখ্যাপ্রদান করা হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন যে, "তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং"—অর্থাৎ সেই হৈম অণ্ড সহস্র সূর্য্যের সমান প্রভাবিবিশিষ্ট।

বিষ্ণু ও কূর্ম্ম-পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে জলবুদ্বুদের ন্যায় উহা জলে অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে ভাসমাণ ছিল। সেই অণ্ডে দেব, অসুর, মানুষ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও বায়ুর সহিত বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। দশগুণ জলের দ্বারা সেই অণ্ডের বহির্দেশ আবৃত, দশগুণ তেজোদ্বারা জলের বহির্ভাগ আবৃত, দশগুণ বায়ুর দ্বারা তেজ আবৃত, এইরূপ আকাশ দ্বারা বায়ু আবৃত, আকাশ ভূতাদি দ্বারা আবৃত, ভূতাদি মহৎ দ্বারা আবৃত এবং মহৎ অব্যক্ত দ্বারা আবৃত। তৎপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"এতে লোকা মহাত্মানঃ সর্ব্বে তত্ত্বাভিমানিনঃ।
বসন্তি তত্র পুরুষাস্তদাত্মানো ব্যবস্থিতাঃ॥
(ঐ—ঐ—৪৪)

এই সকল লোক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাতটী আবরণ সেখানে তদাত্মবান্ হইয়া মহাত্মা ও তত্ত্বাভিমানী পুরুষরূপে বাস করেন। ইঁহাদিগকে Christian রা "Seven spirits before the throne of God" বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রভুত্বশালী, যোগপরায়ণ, তত্ত্বচিন্তক, রজোগুণ-বিহীন এবং নিত্য প্রমোদচিত্ত।

ভাগবতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে উক্ত অণ্ড জল হইতে উত্থিত হইয়াও বহু সহস্র বৎসর জলের উপরি শয়ান ছিল। এস্থলে জলশব্দে মূল প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরে পরমেশ্বরের এই অণ্ডকে বিভাগ করিলেন। বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভগবান্ উহার পৃষ্ঠে একদিকে পর্ব্বত সকল এবং অন্যদিকে সমুদ্র স্থাপন করিলেন। এইরূপে পৃথিবী গঠিত হইলে তৎপরে স্বর্গাদি গঠিত হইয়াছিল।

পৃথিবীর উদ্ধারে প্রকৃতি এতদূর ব্যক্তাবস্থায় পরিণত হইয়াছিল যে উহার মধ্যস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টির উপাদান সকল, যাহারা গুপ্ত ভাবে নিহিত ছিল, তাহারা উদ্ভিদ্ ও জীব

প্রকাশের দ্বারা ঐ অচেতন অণ্ডকে সচেতন করিয়া জীব সৃষ্টিতে ধরণীকে উজ্জ্বল করিল। বৃহন্নারদীয় পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

"যথাক্রমং কারণতামেকৈকস্যো পযান্তি বৈ।"

অর্থাৎ ভূতগণ একে একে যথা ক্রমে কারণতা লাভ করে। ইহা যে কেবল ভূতগণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা নহে অন্যান্য সৃষ্টি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। জগতের ক্রমিক উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ক্রমিক উৎপত্তিবাদ অর্থাৎ ক্রম বিকাশ বাদ আজ কাল বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণনা করিয়াছি। এবং যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা এই প্রস্তাবে বর্ণনা করিব।

প্রথম জীবন তরঙ্গে পদার্থ সমুদয় কি রূপে ক্রমবিকশিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেবী ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণ কারণম্।
তত্ত্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্॥
সর্ব্বকর্ম্ম ঘনীভূতমিচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশ্রয়ম্।
হ্রীঙ্কার মন্ত্রবাচ্যং তদাদিতত্ত্বং তদুচ্যতে॥"

(৭—৩২—২৫,২৬)

অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত আছে যে, উহা সমুদয় কারণেরও করণ, অখিল তত্ত্বেই আদিভূত এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। উহাতেই অখিল প্রাণীপুঞ্জের অখিল কর্ম্মই ঘনীভূত ভাবে অবস্থিত উহাই প্রাণিগণের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আধার ও উহাই হ্রীঙ্কারমন্ত্রের প্রতিপাদ্য, এই জন্যই বুধগণ উহাকে আদি তত্ত্ব বলিয়া থাকেন।

প্রথম জীবন তরঙ্গের দ্বারা যে তত্ত্ব প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাকেই আদিতত্ত্ব বলা হয়। তৎপরে বুদ্ধিতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে। এই দুইটী তত্ত্বের পর পঞ্চতন্মাত্রা উদ্ভূত হইয়াছে। কোন কোন মতে প্রথম দুইটী তত্ত্বকে মহৎ ও অহঙ্কার এবং কোন কোন মতে আদি অনুপাদক তত্ত্ব বলা হয়। এই সপ্ত তত্ত্ব হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য মনু বলিয়াছেন যে,—

"তেষামিদন্তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্।
সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবতি......"

(মনুসংহিতা—১—১৯)

অর্থাৎ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটী অনন্ত-কার্য্যক্ষম পুরুষতুল্য পদার্থের সূক্ষ্মমাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অণ্বোমাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ।

ঐ—ঐ—২৭

অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও পরিণামী—পঞ্চতন্মাত্রার সহিত এই সমুদয় সৃষ্টি আনুপূর্ব্বীক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে স্থূলতরক্রমে অর্থাৎ ক্রমবিকাশের ধারাতে, উৎপন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল বা মিশ্রভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চীকরণের প্রথা এইরূপ;—প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতকে সমান দুই ভাগ করিবে, পরে প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতের প্রথম ভাগকে সমান চারিভাগ করিয়া অন্য ভূতের প্রত্যেক প্রথমাংশে ঐ চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে পঞ্চীকৃত হইবেক। সুতরাং পঞ্চীকৃত আকাশের অর্দ্ধাংশ আকাশ, দুই আনা পরিমাণ বায়ু, দুই আনা তেজ, দুই আনা জল ও দুই আনা পৃথিবী আছে। এই প্রকার বায়ু ও অন্যান্য সকল ভূত গঠিত হয়। প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের

অংশ সমাবেশ থাকিলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই ভূত বলিয়া কথিত হয়।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে সপ্ত পাতাল,—অতল, বিতল, ভূতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এবং ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক তপলোক এবং সত্যলোক রচিত হইয়াছে। প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থাভেদে এই সপ্তলোক গঠিত। এই সপ্তলোকের সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই সাতটী লোকের পরও আরও দুইটী লোক আছে। তাহাদিগকে বৈকুণ্ঠ ও গোলক বলে। ইহারা অনুপাদক ও আদিতত্ত্বের দ্বারা রচিত হইয়াছে ভূর্লোকে পৃথিবীতত্ত্ব, ভুবর্লোকে অপ্‌তত্ত্ব, স্বঃ ওমহঃ লোকে অগ্নিতত্ত্ব, জনও-তপঃ লোকে বায়ুতত্ত্ব এবং সত্যলোকে আকাশতত্ত্ব বিশেষরূপে প্রকাশমান। সপ্তপাতালকে অনেকে ভূলোকের মধ্যে পরিগণিত করেন।

আদি তত্ত্বের বিভিন্ন সমাবেশে গোলক কল্পিত হইয়াছে। ইহাকে মহাপরিনির্ব্বাণ ভূমি বলা হয়। অনুপাদক তত্ত্বের বিভিন্ন সমবায়ে বৈকুণ্ঠ বা পরিনির্ব্বাণলোক গঠিত হইয়াছে। আকাশ তন্মাত্রের বিভিন্ন প্রকার সমবায় অর্থাৎ পঞ্চীকরণে, সত্য বা ব্রহ্মলোক অর্থাৎ নির্ব্বাণ লোক গঠিত হইয়াছে। উক্ত প্রকারে যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী তন্মাত্রের বিভিন্ন প্রকার সমবায় দ্বারা তপ, জন, মহ স্বঃ ভুবঃ এবং ভূঃ গঠিত হইয়াছে। এক একটী তন্মাত্রের যে সকল গুণ আছে, তাহা অনুধাবন করিলে এক এক ভূমির বা লোকের গুণ সকল অবগত হওয়া যায়।*

নিম্নে সপ্তলোক ও তদুপাদন সম্বন্ধে একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

| নং | ভূমির নাম | যে তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন | সংবিতের ক্ষেত্র | ভূমির উপযোগী শরীর | ভূমির উপযোগী কোশ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ভূঃ (Physical) | পৃথ্বী | খনিজ, উদ্ভিদ, জন্তু এবং স্বাভাবিক মানবীয় ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র— | স্থূল | অন্নময় ও প্রাণময় |
| ২ | ভুবঃ (Emotional) | অপ্‌ | | সূক্ষ্ম | মনোময় |
| ৩ | স্বঃ (Mental) | অগ্নি | | | |
| ৪ | মহ (Mental) | | | | বিজ্ঞানময় |
| ৫ | জন (Budhic) | বায়ু | অস্বাভাবিক (Super normal) মানবীয় ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র— | কারণ | আনন্দময় |
| ৬ | তপ (Budhic) | | | | |
| ৭ | সত্য (Nirvanic) | আকাশ | | | |
| ৮ | বৈকুণ্ঠ (Puranirvanic) | অনুপাদক | পুরুষের ক্ষেত্র | | |
| ৯ | গোলক (Mahapari nirvanic) | আদি | | | |

* ভাগবত—৩—২৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোকের সমাহারকে ত্রিলোকী বলা হয় জীব সকলের ভোগের জন্য ত্রিলোকী রচিত হইয়াছে। কামনা দ্বারা জীব সকল ত্রৈলোক্যে চালিত হইতেছে। প্রতিকল্পে ত্রিলোকীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্যান্য লোক সকল প্রতিকল্পে সৃজিত হয় না। ব্রহ্মার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উহাদের স্থিতি। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা ঐ সকল লোক লভ্য হয় নিষ্কাম ধর্ম্মই উহাদের জীবন। নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে ঐ সকল লোক লভ্য হয় না। জনলোকের অধিবাসীকে কুমার বলা হয়। কর্ম্মফলে মনুষ্য যখন জনলোকে উপনীত হইবে, তখন তাহার কুমার পদবী হইবে।

মৃত্যুর পর মনুষ্য ভুবর্লোকে ( Astral world ) যায়। তথায় তাহার ভূত, প্রেত কিম্বা পিশাচ হয়। সেখানে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তাহারা স্বর্গলোকে (Devachan) উপস্থিত হয়। সেখানে তাহারা দেবতা হন, ইহাঁরা প্রাকৃত দেবসৃষ্টির দেবতা নন, ক্ষণিক দেবভাবাপন্ন দেবতা। কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে ইহারা মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিবার জন্য দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অবরোহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্য যদি নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে স্বর্লোক হইতে মহর্লোকে উপস্থিত হন। মহর্লোকের অধিবাসিকে প্রজাপতি আখ্যা প্রদান করা হয়। এইরূপে মনুষ্য একলোক হইতে অন্যলোকে গিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মার শেষ দিনে নিষ্কামী পুরুষেরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

প্রথম জীবন তরঙ্গ প্রভাবে বিশ্বের উপকরণ সকল অর্থাৎ ভূতাদি সৃষ্টি হইয়াছে। এবং বিভিন্ন জীবের শরীরাদি রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মা হইতেই তৃতীয় জীবন তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে। ব্রহ্মা তপস্যা দ্বারা প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর মূল ছাঁচ (arce types) গঠিত করিয়াছিলেন। আমরা শিব পুরাণ এবং ভাগবত হইতে অগবত হইয়াছি যে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে অনুপ্রাণিত করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সাহায্য লইয়াছিলেন। সে বিষয় দ্বিতীয় জীবনতরঙ্গে আলোচিত হইবে।

শেষ দুইটী ভূমি আমাদের সৌরজগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। আদিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"We may imagine the highest, the Adi, as consisting of so much of the matter of space......as the Loges has marked out to form the material basis of the system, He is about to produce." *

অনুপাদক-তত্ত্ব সম্বন্ধে "প্রণববাদ" নামক একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথিতে সবিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে তত্ত্বের আধার নাই, তাহাকে অনুপাদক-তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

"We may imagine the Anupadaka...... as cosisting of this same matter, modifid by His individual life, coloured to use a significant metapher, by His all-ensouling consciousness, and thus differing in some way from the corresponding plane in another solar system."

এই দুইটী ভূমি পুরুষের ক্রীড়াক্ষেত্র। জন, তপ ও সত্য উন্নত (Initiated) যোগীব্যক্তির আত্মরমণের ক্ষেত্র। ভূ, ভুবঃ স্ব ও মহঃ, ভূমি, খনিজ, উদ্ভিজ্জ, জান্তব এবং অষ্টম ও নবম স্বাভাবিক মানবীয় ক্রমবিকাশের-ক্ষেত্র। প্রথম হইতে সাতটী ভূমি ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র। অষ্টম ও নবম ভূমি ঐশ্বরিক সংবিত্তের ক্ষেত্র। —ক্রমশঃ।

শ্রীআশুতোষ দেব।

* A Study in Consciousness, p. 4.

# মুট ফকির।

ফকির সাহেবের প্রকৃত নাম মুট ফকির নয়, তাঁহার আদত নাম জহিরদ্দি বাবা। নিবাস পাবনা জেলায় ছিল। তিনি কৈশোর বয়সে ত্রিপুরা জেলাস্থিত শঙ্খচাইল গ্রামে আসেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাঁহাকে ক্রমে ৪।৫ বার দেশে নিয়া যায়, তিনি বাড়ীতে থাকেন না, পুনরায় শঙ্খ-চাইলের দিকে আসিয়া, কখন বা নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরার পাহাড়ে, কখন বা ঝোপ জঙ্গলে, কখন বা নদীর ধারে কিছু দিন থাকিতেন, কদাচিৎ কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইতেন। এরূপ ভাবে প্রায় ২০ বৎসর অতিক্রম করার পর, প্রায় বারমাসই পাহাড়ের নির্জ্জন গহ্বরে পড়িয়া থাকিতেন, যাহারা পাহাড়ে কাজ করিতে যাইত, তাহারা দেখিতে পাইলে তাঁহাকে কিছু খাবার দিত। বাড়ীতে স্ত্রী,পুত্র,বিত্ত, বৈভব ফেলিয়া তাঁহার এইদশা, দেখিয়া পিতা, মাতা, ও প্রতিবাসিগণের মনে বড় কষ্ট হইত। তিনি উর্দ্দু, হিন্দি, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষা কিছু জানেন বলিয়া বোধ হয়। প্রায়ই তাঁহার মুখে সুন্দর কয়েকটী বয়াৎ (ভগবানের গুণ-গান) শুনা যায়; আর বাইবেলেরও ২।১টী কথা আওড়ান। আজ প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি লোকা-লয়ের ধারে আসিয়াছেন। তবু মাঝে মাঝে পাহাড়ে চলিয়া যান। ২৫।৩০ দিন পর হঠাৎ একদিন আসিয়া উপস্থিত হন। তখন গায়ে ধুলা বালি মাখা, শরীরের কোথাও বা কত কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে, আর দর দর ধারে রক্ত পড়িতেছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলেন,—"শরীর রক্ষণীয় সত্য, কিন্তু সকল কাজেরই সীমা আছে, খোদার নামে মাতিলে আর শরীরের কথা মনে থাকে না, নচেৎ তো খাই, তেল মাখি, বিছানায় শুই, বিড়ী হুক্কা দিয়া তামাক ও খাই।" তিনি কখনও কাহার বাড়ীর উপর থাকেন না, হয় মাঠে, নতুবা বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী কোন অনাবাদ জায়গায় থাকেন। তিনি নিজ হাতে খান না, অন্যে তাঁহাকে খাওয়াইয়া দেয়। তাঁহার ডান্ হাত মুটের মত বদ্ধ। সাধারণ্যে প্রকাশ, এই তিনি তাঁহার গুরু হইতে কোন কিছু একটা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর পাহাড়েই তাঁহার সংগুরু লাভ হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুটের মত বদ্ধ থাকার অপর একটী কারণ অনুমিত হয়,—তাঁহার গুরুদত্ত নাম জপের প্রতি একনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে অনবরত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য ও হস্তমুট বদ্ধ থাকিতে পারে। কি উদ্দেশ্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বদ্ধ, তিনি কাহা-কেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না। যাহাহউক, নানা সময় তাঁহার মুখে, কালী, দুর্গা, হরি, খোদা, আল্লা,ওঁ ব্রহ্ম, গড্ ইত্যাদি নাম শুনা যায়। তিনি জাতিভেদ ভাল বাসেন না। তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলাপ ও অনেক সময় বুঝা যায় না, এ সব কথা আকার ইঙ্গিতে বলেন; ধর্ম্মকথা বুঝিতে হইলে তাঁহার কথার প্রতি একটু তীক্ষ্ণ মনোযোগের দরকার। তিনি ভগবানের নাম করা ও উপাসনার বড় পক্ষপাতী। তাঁহার নিকট যাইলে ২।১টী বাজে কথার পরই বলেন, "খেলাও"অর্থাৎ নাম বা উপাসনা কর; ইহার

আর বিরাম হওয়া চাই না। তাঁহার মধ্যে জড়, উন্মত্ত পিশাচ ও বালকের ভাব দৃষ্ট হয়। বালকের ও পাগলের ভাবই বেশী জাগ্রত। তিনি সর্ব্বজনীন উদার ভাবের পক্ষপাতী। পরোপকার জীবনের প্রধান ব্রত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য—এই ইচ্ছা বেশ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—"খোদা তো তুনিয়ার সকলেরই, তবে কেন একজন আর এক জনকে কাটিবে?" (অপকার করিবে)। ফকির সাহেবের আত্মদৃষ্টি এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি বড়ই প্রখর। এই তিনি হাসিতেছেন, গল্প করিতেছেন, পরমুহূর্ত্তেই দেখা যায়, তিনি আত্মস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যেন আর ইহ-সংসারে নাই, শরীরটা হইতে যেন তিনি সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। অন্তর্দ্দৃষ্টির একটী ঘটনা শুনুন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন; তিনি আর ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিকট যান নাই, এই প্রথম দর্শন। যাওয়ার পূর্ব্বে, ফকির সাহেবের কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা শুনিয়া এবং তাঁহার নিস্পৃহ নির্ব্বিকার সরল ভাবের কথা শুনিয়া, তিনি বড়ই ভক্তিমান চিত্তে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছেন। এক দিন বৈকালে তিনি তাঁহার এক শিক্ষিত বন্ধু সহিত তাঁহার নিকট গেলেন। তিনি যাইয়া দেখেন, ফকির সাহেব মেনীমাছ পোড়া খাইতেছেন, আর তুইটী স্ত্রীলোক (একটীর বয়স ৭০ কি ৭৫ বৎসর, অপরটীর বয়স ৫০ কি ৫৫ বৎসর হইবে) কিয়ৎক্ষণ পর ফকির সাহেবের কাছে বড়ই আসা যাওয়া করিতেছে; এই তুইটী দৃশ্যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের মনে একটু অভক্তি ও নিরাশার ভাব আসিল। তিনি ভাবিলেন,—"এত উচ্চ কথা শুনিলাম, আর এখানে আসিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, একবার সম্পূর্ণ বিপরীত, এর চেয়ে না আসাই ভাল ছিল।" মনে বড়ই বিরক্তির ভাব আসিল। কিছুকাল পর ফকির সাহেব অপর একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখ, আর তো আমার সেই ভাব-ভক্তি নাই, আমি পোড়া মেনী মাছ খাই, স্ত্রীলোক আমার কাছে আনাগুনা করে, আর তো আমার সেই মনের টান নাই,"—ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া লেখকের এক মহা চমক ভাঙ্গিল; মনে মনে আত্ম ধিক্কার দিতে লাগিলেন,—"এই মন, এই চক্ষু নিয়া আমি সাধুদর্শন করিতে আসিয়াছি? যত দিন এই দোষ গুলি হীন না হইবে, তত দিন আর কোন সাধু দর্শন করিব না।" এরূপ ভাবে যখন অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন সেই দয়ার্দ্র ফকির সাহেব নিকটে ডাকিয়া নিয়া, তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইলেন, এবং বলিলেন,—"বাবা তোমার কোন ভয় নাই, আগে যদি গুণটী দেখিতে, তাহা হইলে পরিণামও খুব সরস হইত, মিষ্ট হইত; কোন ভয় নাই, তোমার কোন দোষ হয় নাই, তুমি তো আপন বশে ছিলেনা। যাও, তুমি আমার বেটা, আর তো কোন সন্দেহ নাই?" লেখকের প্রায়শ্চিত্তের অবসান হইল। তৎপর ফকির সাহেবকে তিনি একটী গান শুনাইবার মনস্থ করিলেন; ফকির সাহেব একে একে উপস্থিত সকলকেই বলিলেন, "বাবা তুমি একটী গান কর।" সকলের মুখেই 'না' শব্দ হইল। তখন ফকির সাহেব লেখককে বলিলেন,—"বাবা, এখন নিশ্চিন্তে গাও, এরা তো কেহই গান করিতে জানেনা, বলিতেছে।" বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধ লেখক ফকির সাহেবের নিকট কোন ঐহিক মঙ্গল সাধনের প্রার্থী ছিলেন না, সরল

ভাবে উজ্জ্বল জীবন্ত ২।১টী ধর্ম্মোপদেশ শুনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রাণের ব্যাকুলতায় যদি কেহ অশান্তি-নাশকারী নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, লেখকের ইহা ধ্রুব ধারণা। তিনি অনাসক্ত ভাবেই দিন কাটান, প্রত্যহ কত জন কত খাদ্য দ্রব্য ও জিনিষ আনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতেছেন, কিন্তু ফকির সাহেবের এসকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা, ব্যাকুলতা, নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাস, এগুলি যেন একাধারে তাঁহার মধ্যে সাকার-রূপ ধারণ করিয়া আছে। মিথ্যাকথাকে তিনি বড়ই ঘৃণা করেন।

শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষ।

---

# অপূর্ব্ব কৃষিকাহিনী।

আমাদিগের দেশের লোক প্রধানতঃ কৃষিজীবী। তথাপি, অন্য দেশে কৃষি-বিভাগে বিজ্ঞান যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, সত্য ঘটনা দ্বারা যে বিচিত্র উপন্যাস রচনা করিয়াছে, এক মহীয়ান্ চিৎ-মৃৎ-কাব্য সৃজন করিয়াছে—মৃৎ-দৈত্যকে পরাজিত করিয়া, তাহাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্য করিয়া, চিৎ-দেবতা কিরূপে আপনার রাজ্য ও মহিমা বিস্তার করিতেছেন—তাহার সংবাদ বঙ্গদেশে কয়জন রাখেন?

আমাদের দেশের প্রায়ই কোন জমীদার কৃষক তাহার কোন সংবাদ রাখেন না; এমন কি শুনিলে তাহা উপন্যাসবৎ মনে করিবেন। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আগ্রহ সহকারে কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু "পুষা" কলেজে কতকগুলি ইংরাজ পোষা হইবে, তাহা আমরা যত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, ভারত-কৃষক-চালিত-কৃষি-কার্য্য পুষা কলেজের কার্য্য-কলাপে কত দূর উপকৃত হইবে, তাহা এক্ষণও তত স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। এদেশে জমীদারগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কখন বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা গবেষণা অদ্যাপি অবিষ্কার করিতে পারে নাই। বঙ্গের কৃষককুল নিরক্ষর, নিরুৎসাহ, দরিদ্র—উদরের অন্নই সকল সময় জুটে না—ঋণে জড়িত। সে কায়ক্লেশে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে যেরূপ কৃষি প্রণালী এই দেশে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই অনুবর্ত্তন করিয়া, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া, ভূমিকর্ষণ করে। ভূমিতে সার দেওয়ার আবশ্যকতা ইত্যাদি, যে সকল সাধারণ তথ্য সে অবগত আছে, তাহাও বিষম দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া, কার্য্যে সে ভাল প্রয়োগ করিতে পারে না। বঙ্গের শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর মহোদয়গণ এতাবৎকাল বক্তৃতা ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা ব্যতীত দেশের জন্য কোন হিতজনক ব্যাপারে, অর্থাৎ শিল্প কর্ম্ম ইত্যাদির উন্নতি কল্পে, সময় ও শ্রম নিয়োজিত করিতে বড় অবকাশ পান নাই। অধুনা, যেন তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিয়াছে, যেন তাঁহারা বুঝিতেছেন, দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, বক্তৃতা ও আবেদনের গণ্ডীর বাহির হইয়া, নিজের

সাধ্যমত শিল্প ও কৃষি কার্য্যের উন্নতি করা আবশ্যক, এবং তৎসম্বন্ধে কার্য্যগত উপযোগী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বৎসর বৎসর শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হইতেছে। এটা নিশ্চয় ভাল। কিন্তু, শিল্প ও কৃষি বিষয়ে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী শিক্ষা না দিলে, এই প্রদর্শনী একটা তামাসাতে পরিণত হইবে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্স বিগত বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অপিচ, ইহা বিশেষ মনে রাখা আবশ্যক যে, এই কন্‌ফারেন্সে কেবল কয়েকটী করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিলে, দেশে বিশেষ উপকার হইবে না? কিরূপে ও কোথায় শিল্প ও কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে পারে; ছাত্রগণ কিরূপে বিদ্যালয়-লব্ধ-বিদ্যা কার্য্যে লাগাইয়া. দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে—"কন্‌ফারেন্স" এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইয়া, কার্য্য আরম্ভ না করিলে, অতি অল্পই উপকার হইবার সম্ভাবনা। কৃষিবিদ্যা, অন্য দেশে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়া, দিন দিন অধিকতর শস্য উৎপাদন করিতেছে, সেই সকল তথ্য জানিয়া দেশের কৃষকগণের মধ্যে যথাসম্ভব উপায়ে ক্রমশঃ সেই সকল উপায় প্রচলিত করিতে হইবে।

মিঃ হারউড্ প্রণীত 'নূতন পৃথিবী' নামক গ্রন্থে (The NewEarth by Mr. W. S. Harwood)আমেরিকার অপূর্ব্ব কৃষিকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে একটী ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। "চিৎ" বিজ্ঞানের নাম লইয়া, মৃত "মৃৎ"কে জীবিত করিতেছে, মরুভূমিতে কোথাও শ্যামল-পল্লবরাজি-শোভিত পাদপাবলী, কোথাও জীবনপ্রদ হাস্যময় শস্য, যেন ভেল্কী দ্বারা আনিতেছে; বন্ধ্যা দীনা মৃত্তিকাকে পুত্রবতী ও ভাগ্যবতী করিতেছে, কণ্টকময় অরণ্যকে সুস্বাদু-ফলভারাবনত মনোরম বৃক্ষ-বাটিকাতে পরিণত করিতেছে।

সার দিলে জমী উর্ব্বর হয়, ইহা সকলেই জানেন। বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে, বায়ুতে নাইট্রোজেন নামক যে বায়বীয় পদার্থ আছে, তাহাই উর্ব্বরতার একটী প্রধান কারণ। ক্ষেত্রে সার দিলে, বৃক্ষাদি ঐ নাইট্রোজেন চুষিয়া লইতে পারে। সারে অসংখ্য জীবাণু আছে। তাহারা নিয়তই জীবন্ত জগতের উদ্ভিদ ও জীবগণের জন্য নীরবে যেন নিষ্কামভাবে পরোপকার করিতেছে। বায়ু নাইট্রোজনের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জীবাণু-গুলি ঐ অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে নাইট্রোজন লইয়া, তাহাকে রন্ধন করিয়া, বৃক্ষাদির আহা-রের উপযোগী করিতেছে। যে ভূমিতে এই জীবাণু-কৃত নাইট্রোজেন-রন্ধন অধিক পরি-মাণে চলিতেছে, তাহাকেই আমরা উর্ব্বরা ভূমি বলিয়া থাকি। গমের চাষে, ভূমির নাইট্রোজেনের ক্ষয় অধিক পরিমাণে হয়, অপেক্ষকৃত অল্প সময়ে ভূমি অসার হইয়া যায়। কোন রূপে নূতন নাইট্রোজেন আবার জোগাইতে না পারিলে, ঐ ভূমিতে আর ফসল হয় না। জীবাণু না থাকিলে, ঐ নাই-ট্রোজেন জোগানর অন্য উপায় হয় না।

উত্তর আমেরিকার একটী প্রতীচ্য প্রদেশে, অনুর্ব্বরক্ষেত্রে ঐ জীবাণুর অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রাচ্য প্রদেশ হইতে ঐ জীবাণুপূর্ণ মৃত্তিকা কিয়ৎপরিমাণে আনয়ন করিয়া, অনু-র্ব্বর ক্ষেত্রে, রোপিত-উদ্ভিজ্জ বিশেষে সংযো-জিত হইল। জীবাণুগুলি যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্ষেত্র তেমনি আবার উর্ব্বর হইতে লাগিল। জীবাণু, প্রকারভেদে, কোথাও ভৈরব মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া, কলেরা ও প্লেগ

উৎপাদন করিতেছে, প্রকৃতির অবিরাম সংহার কার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোথাও বা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, জীবগণের আহার জোগাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণুর উপর আমাদিগের জীবন ও মরণ নির্ভর করিতেছে। তাই বলি, জগতে ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিওনা। যাহারা আপনাদিগকে মহৎ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাও ক্ষুদ্রের অনুগ্রহ-জীবী, ক্ষুদ্রের আঘাতে ধরাশায়ী ও হত। সে কথা যাউক।

বিজ্ঞান যে কেবল ভূমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া উর্ব্বর ক্ষেত্রকে শস্যশালী করিতেছে, তাহা নহে; বৃক্ষের প্রকৃতি ও পরিবর্ত্তন করিতেছে—দুর্ব্বল বীজকে সবল করিতেছে। উৎকৃষ্ট জাতির ঘোটকীর সহিত উৎকৃষ্ট ভিন্ন জাতির ঘোটক সংযোজনা করিলে, উৎকৃষ্টতর ঘোটকজাত হইতে পারে, তাহা সকলেই জানেন। সেইরূপে উৎকৃষ্ট বৃক্ষও উৎপাদন করিতে পারা যায়। অধিকাংশ পাঠক শৈশবে চারুপাঠে বীজোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছিলেন, আশা করি, তাহা ভুলিয়া যান নাই। বীজ উৎপাদন করাই পুষ্প জীবনের উদ্দেশ্য বা "মিশন"। এই বীজ হইতে ভবিষ্যতে বৃক্ষ জন্মে। পুষ্পের গর্ভ কোষস্থ পীঠে পুষ্পের পরাগ মিলিত হয়। এই পরাগ-সঙ্গমে ফল বা বীজ উৎপন্ন হয়। পরাগ-সঙ্গম দুই প্রকারে ঘটিতে পারে। একই ফুলের পরাগ, ইহার গর্ভকোষে প্রবেশ করিতে পারে; অথবা এক পুষ্পের পরাগ অন্য পুষ্পের গর্ভকোষে সঞ্চারিত হইতে পারে। প্রথমটীকে স্ব-পরাগ-সঙ্গম, দ্বিতীয়টীকে পর-পরাগ-সঙ্গম বলা যাইতে পারে। প্রথমটী যেন ভাই ভগিনীর মধ্যে বিবাহ, যাহা মনুষ্য সমাজে নিষিদ্ধ, কিন্তু পশুদিগের মধ্যেও পুষ্পরাজ্যে প্রচলিত। দ্বিতীয় স্থলে, পাত্র এক বংশের, পাত্রী অপর বংশের। মনুষ্য-সমাজে দেখা যায়, অতি নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ হইলে, সন্তান দুর্ব্বল হয়, অথবা ক্রমে বংশ লোপ হয়। উদ্ভিদ সমাজেও দেখা যায়, অনেক জাতি বৃক্ষের পর-পরাগ-সঙ্গম-জনিত বীজ অপেক্ষাকৃত উত্তম হয়, এবং এই বীজ হইতে যে বৃক্ষ জন্মে, তাহাও স্ব-পরাগ-সঙ্গম-জনিত বীজোৎপন্ন বৃক্ষ অপেক্ষা ভাল হয়। প্রসিদ্ধ ডার্ব্বিন প্রমাণ করিয়াছেন যে,—পর-পরাগ-সঙ্গম-জনিত বীজের বৃক্ষ সতেজ, আশু মুঞ্জিত-পুষ্প ধারণ করে এবং জীবন সংগ্রামে অধিকতর উপযোগী; অর্থাৎ যে, সকল অবস্থায় স্ব-পরাগ-সঙ্গম-জনিত বীজের বৃক্ষ বাঁচে না, সে অবস্থায় ইহা বাঁচিয়া থাকে।

বিজ্ঞানের এই তথ্য অবলম্বন করিয়া, বিশেষ বৃক্ষের পুষ্পপরাগ অন্য বিশেষ বৃক্ষের পুষ্পগর্ভকোষে সংযোজিত করিয়া, কৃষি বিজ্ঞানবিৎ প্রযোক্তাগণ এমন বীজ উৎপাদন করিয়াছেন যে, তাহাতে কঠিন ক্ষেত্রেও প্রচুর শস্য জন্মিতেছে। কৃষিবিজ্ঞান কেবল ইচ্ছামত বন্ধ্যা ভূমিকে শস্য-প্রসবিনী করিতেছে, তাহা নহে; শস্যকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিয়া, ভূমির উপযোগী করিতেছে। অর্থাৎ, একদিকে ভূমিকে জীবাণু দ্বারা শস্যের উপযোগী করিতেছে; অপরদিকে পর-পরাগ-সঙ্গম দ্বারা শস্যকে ভূমির উপযোগী করিতেছে। যেন যাদুকর বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি, ঐন্দ্রজালিক যষ্টি আন্দোলন করিয়া, অনুর্ব্বর ভূমিকে বলিতেছেন যে,—"ভূমির শস্য উৎপাদন করিয়া, আমাদিগের খাদ্য প্রস্তুত কর।" অমনি ভূমি "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই আদেশ প্রতিপালন

করিতেছে। আবার যাদুকর যষ্টি দোলাইয়া বলিতেছেন,—"শস্য! তুমি এক্ষণ হইতে এই স্থানে জন্মিতে থাকিবে।" শস্য বলিতেছে—"যে আজ্ঞা", আর জন্মিতেছে। বিজ্ঞান যাদুকারের খেলা; না, তাহার অপেক্ষা চমৎকার খেলা। যাদুকর যে খাদ্য প্রস্তুত করে, তাহাতে কোন জাতির ধন বৃদ্ধি করে না, তাহা দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে পারে না। কিন্তু, বিজ্ঞান-বলে যে শস্য উৎপাদন হইতেছে, তাহা খাইয়া কতজনে জীবন ধারণ করিতেছে। তাই বলি, বিজ্ঞান ইন্দ্রজাল অপেক্ষা বিচিত্র, অথচ তাহাতে ভেল্কীর ফাঁকি নাই, কিছু মিথ্যা নহে; সবই সত্য।

কৌশল পূর্ব্বক কৃষিবিজ্ঞান প্রয়োগ করিতে পারিলে, ভারতবর্ষে রাজপুতনার ন্যায় কত কঠিন অনুর্ব্বর স্থানেও, ভাল ফসল জন্মিতে পারে।

আবার, যে বৃক্ষ বা লতা পূর্ব্বে কণ্টকময় ছিল, যাহাতে আহারের উপযোগী কিছুই জন্মিত না, বিজ্ঞানবিৎ সংযোজনা-পরীক্ষক, বহুবৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া, তাহা হইতেই রসাল সারবান্ খাদ্য বাহির করিয়াছেন।

ভারতে শস্যনাশী অনেক কীট আছে। তাহা Maxwell Lefry প্রণীত Indian Pests নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। কালিফর্ণিয়াতে কিরূপে এক জাতি কীটের নাশ হইল, তাহার কাহিনী শুনুন। সেখানে কমলা-লেবুর প্রচুর চাষ আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, "স্কেল" নামক ক্ষুদ্র কীট তাহা ধ্বংস করিতে লাগিল। এই উপদ্রবে যেখানে ৮০০০ হাজার গাড়ি লেবু হইত, সেখানে ৮০০ লেবু হয় কি না, সন্দেহ।

উপায় কি?—দেখ, কোনও কীট এই 'স্কেল' কীটকে সংহার করে কি না। অন্বেষণে জানা গেল যে, অষ্ট্রেলিয়াতে "লেডিবার্ড" (ladybird) নামক একরকম কীট আছে, তাহা "স্কেল" নামক কীট খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহা ভক্ষকের ভক্ষক, তাহা সংহারকের সংহারক। সেই কীটের ডিম অষ্ট্রেলিয়া হইতে কালিফর্ণিয়াতে আনা হইল। ডিম গুলি যত্নে ফুটান হইল। তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। "স্কেল"দিগের মধ্যে "লেডিবার্ড" কীট ছাড়িয়া দেওয়া হইল। টপ্ টপ্ করিয়া লেডিবার্ড কমলালেবুর শত্রু গুলিকে খাইয়া ফেলিতে লাগিল। তাহারা কেবল "স্কেল" খায়, আর কিছু খায় না; সুতরাং, স্কেলগুলি লুকাইলে পরিত্রাণ পায় না। যেখানে "স্কেল" লুকাইয়া থাকে, "লেডিবার্ড অন্বেষণ করিয়া তাহাকে শীকার করে। "লেডিবার্ড" সৈন্যদল এমনি দক্ষতাসহ কার্য্য করিতে লাগিল, যে কমলালেবু আবার নব-জীবন লাভ করিল, আবার প্রচুর কমলা লেবু জন্মিতে লাগিল, এবং অনেকগুলি লোকের যে উপজীবিকা নষ্ট হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল। আবার দেখুন, এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট যেমন এক দিকে ধ্বংস বিস্তার করিয়াছিল, আর এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট জীবন সঞ্চার করিল। তাই আবার বলি! তুমি মহৎ, কিন্তু ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিও না।

The New Earth পুস্তকখানি পাঠ করিলে কৃষি বিভাগে আমেরিকাতে যে অপূর্ব্ব কাণ্ড হইতেছে, বিজ্ঞানে জীবগণের আহার উৎপাদনে যে বিচিত্র সাহায্য করিতেছে, তাহা জানিয়া অবাক্ হইতে হয়। আমরা কি করিতেছি? কেবল প্রাচীন আর্য্যগণের গৌরবের দোহাই দিয়া, বৃথা গর্ব্বে মত্ত হইয়া, ক্ষিপ্তের ন্যায় আস্ফালন করিয়া থাকি; আর বক্তৃতা, বক্তৃতা—অনন্ত অসীম বক্তৃতা। এখানে

আবিষ্কার করিতে না পারি, অন্য জাতিতে যাহা আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা জানিয়া আমাদিগের দেশের অবস্থামত পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রয়োগ করিতে পারি ত? ধনশালী জমীদারগণ নানারূপ বিলাসে, নানা খেয়ালে, নানাপ্রকারে অর্থের অপব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু যে কৃষিকার্য্য হইতে তাঁহাদিগের অর্থের সমাগম হয়, তাহার উন্নতির জন্য, আর যে কৃষককুলের শ্রমে তাঁহারা, ঘরে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে, সুখ সম্পদ উপভোগ করেন, তাহদিগের জন্য বৎসরে কয়টী টাকা ব্যয় করেন? "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়শন" ও "ল্যাণ্ড হোণ্ডার্স এসোসিয়েশন" আবেদনের কারাগারে চিরকাল আবদ্ধ থাকিবেন—না,নবযুগের স্বদেশী, ভাবে উত্তেজিত হইয়া, স্বাবলম্বন আশ্রয় করিয়া, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, স্বদেশের উপকারের জন্য কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন?

একদিকে যেমন শিল্পের উন্নতির চেষ্টা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে কৃষিকার্য্যের ও কৃষককুলের উন্নতি বিধানের জন্য কায়মনোবাক্যে কার্য্য করার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। কবে বক্তার সংখ্যা কমিয়া কর্ম্মীর সংখ্যা বাড়িবে? ভাল বিষয়ে যে বক্তৃতা হয়, তাহা মন্দ নহে। তবে বক্তৃতা মন্দ ও অনিষ্টজনক হয়, তখন, যখন বক্তৃতা বক্তৃতাতেই পর্য্যাবসিত হয়। কখন কার্য্যে পরিণত হয় না। তখন বক্তৃতা জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে, তখন তাহা জাতীয় ব্যাধির লক্ষণ। তখন বুঝিতে হইবে, বক্তৃতা রোগীর প্রলাপবাক্য। তখন প্রতিকার না করিলে জাতীয় মৃত্যু অচিরাৎ ঘটিয়া থাকে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

# রেনেলের সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ। *

রেনেল সাহেবের নাম ইতিহাসজ্ঞ এবং ভূগোল ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। তৎকৃত ম্যাপের পরিচয় অনেকের নিকট শুনা যায়, কিন্তু তৎকৃত সংগ্রহ সকল অধিক লোকের নয়নপথের বশবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কোন কোন ইংরাজ, বাঙ্গালীর লিখিত নোট দেখিয়া, তদবলম্বনে তাহার নাম লইয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের উহা দর্শনের সম্যক সুবিধা ঘটিয়াছিল, সেইহেতু এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

রেনেলের পদবীসহ নাম—জেমস রেনেল, এফ, আর, এস। এই মহাত্মা বঙ্গদেশের সার্ব্বেয়ারজেনেরেল এবং ইঞ্জিয়ার শ্রেণীর মেজর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, কোর্ট কব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকর্ত্তৃক সমগ্র বঙ্গ বিহার ও এলাহাবাদের মানচিত্র অঙ্কিত ও মুদ্রিত হয়।

ইংরাজাধিকারের প্রথম সময়ে, বঙ্গ বিহার আট ভাগে বিভক্ত হয়, যথা—(১) হুগলী (২) মুরশিদাবাদ (৩) পাটনা (৪) দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের,

* ফরিদপুরের ইতিহাসের জন্য লিখিত। ভরসাকরি, দয়াকরিয়া জনসাধারণ ফরিদপুর সম্বন্ধে যিনি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারেন, অনুগ্রহ করিয়া লেখকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

বান্দীয়া, ছাপরা (৫) মালদহ (৬) ঢাকা (৭) মেদিনীপুর (৮) পানামোসিংহ প্রভৃতি। এই আটটী বিভাগে, একবিংশতি খানা মানচিত্র অঙ্কিত হয়।

১ম ম্যাপ,—পশ্চিমে, হুগলী এবং কাশীমবাজার নদী; দক্ষিণে,সমুদ্র; উত্তরে,মুর্শিদাবাদ হইতে জলঙ্গী এবং গঙ্গা পর্য্যন্ত রাজপথ এবং ঢাকা ও ত্রিপুরার নদী; পূর্ব্বদিকে, আরাকান ও আবা। এই ম্যাপখানা ফ্রান্সিস রাসেল, স্কোয়ারের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে মুদ্রিত হয়।

২য় ম্যাপ,—পশ্চিমে, করকপুর পাহাড়, বেহার এবং রামগড়; উত্তরে, গঙ্গা; পূর্ব্বদিকে, মালদহ ও কাশীনবাজার নদী; দক্ষিণে, আতদিল এবং দামোদর নদী, বীরভূম, রাজসাহী, ভাগলপুর প্রভৃতি। ১৭৭৯ সনে মুদ্রিত।

৩য় ম্যাপ,—পশ্চিমে,গাজীপুর এবং চুনার; উত্তরে, গঙ্গা; পূর্ব্বে, মুঙ্গের এবং জঙ্গলময় প্রদেশ; দক্ষিণে, পালামো ও রামগড়। উহা বথের নাইট সার হেক্টর মনরোর নামে উৎসর্গীকৃত। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত।

৪র্থ ম্যাপ,—পশ্চিমে, অযোধ্যা; উত্তরে, নেপাল এবং অরঙ্গ পাহাড়; পূর্ব্বদিকে,পুরুলিয়া; দক্ষিণে, গঙ্গা। ব্রিগেডিয়ার জেনেরাল জন কানাডের নামে উৎসর্গিত। ১৭৭৯খ্রীঃ মুদ্রিত।

৫ম ম্যাপ,—পশ্চিমে,উত্তর বিহার; উত্তরে, সৌরঙ্গ এবং ভুটান; পূর্ব্বে, আসাম ও গারো পাহাড়; দক্ষিণে, গঙ্গা এবং রাজমহল হইতে শিবগঞ্জ এবং দেওয়ানগঞ্জ রাজপথ পর্য্যন্ত। হুগ ইংলিস, স্কোয়ারের নামে উৎসর্গিত। মুদ্রিত, ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দ, আগষ্ট।

৬ষ্ঠ ম্যাপ,—পশ্চিমে, মুরশিদাবাদ হইতে মালদহ রাস্তা পর্য্যন্ত; উত্তরে, মালহদ হইতে শিবগঞ্জ এবং দেওয়ানগঞ্জ রাস্তা পর্য্যন্ত এবং গারো পর্ব্বত; পূর্ব্বে, কাছাড় এবং আবা; দক্ষিণে, মুরশিদাবাদ হইতে জলঙ্গী গঙ্গা, ঢাকা এবং ত্রিপুরা নদী পর্য্যন্ত। টমাস কেলাদ ১ ফরি...ন্যায়ারের নামে উৎসর্গ ১৭৭৯ চড়মনাদনের ১৩ই মুদ্রিত।

লীপুর ৭ম পশ্চিমে, বাউমিল, নাগপুর ও ..নগড় হিল; উত্তরে, আতজি, দামোদর নদী; পূর্ব্বে, হুগলী নদী; দক্ষিণে, নীপাচর পাহাড় এবং সমুদ্র। হারি বারলেষ্ট নামে উৎসর্গ। মুদ্রিত ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৮ম ম্যাপ,—পশ্চিমে, সিরগুজা, জাকার; উত্তরে, বেহার ও বোটজসর পাহাড়; পূর্ব্বে, জঙ্গলা প্রদেশ, পারেট, সিংহভূম; দক্ষিণে, কটকজেলা। মেজর জেকব কসাক নামে উৎসৃষ্ট। ১৭৭৯ সনে মুদ্রিত।

৯ম ম্যাপ,—বাঙ্গলা বিহারের সমগ্র ম্যাপ। ইহা তৎ সময়ের গবর্ণজেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গ।

১০ম ম্যাপ,—অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আগ্রা ও দিল্লীর অংশসহ। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর, জন কার্টীয়ার নামে উৎসর্গ। ১৭৮০ সাল মুদ্রিত।

১১শ ম্যাপ,—কাশীমাবজার দ্বীপ। ইহা পূর্ব্ব গবর্ণর ক্লাইব, বেরণ অব পলাশী, নামে উৎসর্গ। ১৮৮০ সাল মুদ্রিত।

১২শ ম্যাপ,—ঢাকা ও তন্নিকটস্থ স্থান। ১৭৮১ সনে মুদ্রিত।

১৩শ ম্যাপ,—দোয়াব হইতে এলাহাবাদ ও কালসা। ১৭৮০ সনে মুদ্রিত।

১৪শ ম্যাপ,—গঙ্গা হইতে এলাহাবাদ ও পাটনা এলাহাবাদ ও চুনাগরের চিত্রসহ। ১৭৮০ সনে।

১৫শ ম্যাপ,—গঙ্গা হইতে পাটনা সারদা; পাটনা ও মুঙ্গেরের চিত্রসহ ১৭৮০ সনে।

১৬শ,—গঙ্গা হইতে সারন্দা কালীগঙ্গা পর্য্যন্ত ঝিলের চিত্রসহ। ১৭৮০ সনে মুদ্রিত।

১৭শ,—গঙ্গা হইতে কালীগঙ্গা সংযুক্ত মেঘনা ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গানদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত। ১৭৮০ সনে মুদ্রিত।

১৮শ,—ব্রহ্মপুত্র হইতে লক্ষ্মী[illegible] ও আসাম পর্য্যন্ত; দেনারকোটা ও [illegible] দৃশ্য সহ। ১৭৮০ সনে।

১৯শ,—হুগলীনদী বালেশ্বর গঙ্গা পর্য্যন্ত, আটক এবং উদয় (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ) প্ল্যান সহিত। ১৭৮০ সনে মুদ্রিত।

২০শ,—সুন্দরবন বালেশ্বর জঙ্গল। চারলস্ ডক্রি ও বোষ্টন বাউসা, স্কোয়ার নামে উৎসর্গ। ১৭৮০ সনে মুদ্রিত।

২১শ,—উদয়নালা এবং চুনাগারের দৃশ্য। ১৭৮০ সনে মুদ্রিত।

আমরা এস্থলে দ্বাদশ ও সপ্তদশ সংখ্যক ম্যাপের কোন কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াস পাইলাম। বঙ্গদেশের প্রাচীন মানচিত্র পরিদর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে খাস বাঙ্গালা প্রধানতঃ নৈসর্গিক কারণে, দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যদিও প্রায় ঐরূপই পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি উহার অনেক স্থান ও নদী নালার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এস্থলে যে দুইটী ভাগের কথা উল্লেখ করা হইল, উহার এক ভাগের পশ্চিমে, হুগলী নদী হইতে আরম্ভ পূর্ব্বদিকে গঙ্গা বা পদ্মা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার উত্তরে, বেতরিয়া; দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগর। অপর ভূভাগের পশ্চিমে পদ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদের পশ্চিম-তট পর্য্যন্ত, উহার উত্তরাংশ পর্ব্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ ব্রহ্মপুত্র-নদের তটবর্ত্তী স্থান-নিচয়; দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগর; এই ভূভাগই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ "ব" দ্বীপনামে পরিচিত।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর প্রথম রাজ্য-শাসন সময়ে প্রথম বিভাগে—

(১) রাজসাহী পরগণা (২) চুণাখালী (৩) সাজন (৪) জানাবাদ (৫) কৃষ্ণনগর (৬) হুগলী (৭) যশোহর (৮) ভূষণা (৯) মহম্মদসাহী (১০) সুন্দরবন এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১ম—পাটপাসার, ২য়—ঢাকা, ৩য়—আটীয়া, ৪র্থ—পুখরিয়া, ৫ম—কাগসাইর ৬ষ্ঠ—আমিরাবাদ এই কয়েকটী স্থান পরিলক্ষিত হইত। এতদ্ভিন্ন ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র দুইটী স্থান, মেঘনানদের পূর্ব্বতটে কোগইর নদীর আয়ত্তাধীন হইয়াছিল।

তৎসময় ঢাকা বলিতে, উত্তরে—কড়ইবাড়ী ও গোনাসার পাহাড় ও শ্রীহট্ট, পূর্ব্বদিকে—মেঘনার পূর্ব্বতটবর্ত্তী ভুহুয়া, লক্ষীপুরা ও জুগদীয়ার, পূর্ব্ব পশ্চিমে—পুখরিয়া ও আবীয়ার পশ্চিম এবং ভূষণা, দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর। বর্ত্তমান সময়ের সমুদয় বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলা ফরিদপুরের চতুর্থাংশ এবং সমস্ত নোয়াখালী ইহার অন্তর্গত ছিল।

ভূষণার সীমা তৎসময় এইরূপ ছিল—উত্তরে—পদ্মা ও বেতরিয়ার ক্ষুদ্রাংশ এবং কুবারসাহী; পশ্চিমে—মহম্মদসাহী, নলডাঙ্গা ও যশোহর; দক্ষিণে—ঢাকার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের অংশ বিশেষ।

ঢাকা বিভাগের সম্পূর্ণ স্থানগুলির পরিচয় দেওয়া এস্থলে সহজসাধ্য নয়। এখানে মাত্র ঢাকা হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গা বা পদ্মার সহিত মেঘনা সম্মিলিত হইয়া যে স্থান হইতে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছে, সেই ভূভাগ মধ্যে কতিপয় স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তৎসময় নোয়াখালী ও ত্রিপু-

য়ার কতকাংশ ঢাকার অন্তর্গত ছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইল।

১ শ্যামপুর, ২ ফতুল্লা, ৩ নারায়ণগঞ্জ, ৪ ইদ্রাপুর, (মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি) ৫ ফিরিঙ্গিবাজার, ৬ আবদুল্লাপুর, ৭ মীরগঞ্জ, ৮ মাকহাটী, ৯ সেরাজদী, ১০ রাজাবাড়ী, ১১ সেকেরনগর, ১২ হাসারা, ১৩ ষোলঘর, ১৪ বারইখালী, ১৫ সুরপুর, ১৬ ঠাউদিয়া, ১৭ বালীগাঁ, ১৮ সুনকিশর, ১৯ রাজাবাড়ী, ২০ চণ্ডীপুর। রেনেলের ম্যাপে ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থান গুলি ধনেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা ও কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাহা অধুনা আইরনবিল নামে প্রসিদ্ধ, তৎসময় উহা চুরাইনবিল নামে পরিচিত ছিল।

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ-তটবর্ত্তী স্থান—

১ মুলফৎগঞ্জ, ২ করাতীকাল, ৩ জপসা, ৪ কান্দাপাড়া, ৫ শ্যামপুর, ৬ খীলগাঁ, ৭ সারেঙ্গা, ৮ চিকন্দী, ৯ গঙ্গানগর, ১০ রাধানগর, ১১ খাগটীয়া, ১২ সমকোট, ১৩ রাজনগর, ১৪ লড়িকুল, ১৫ নবীপুর, ১৬ ফুলবাড়ী, প্রভৃতি।

মেঘনাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ—

১ বুহার, ২ মানঘাটা, ৩ কার্ত্তিকপুর, ৪ ডলুই, ৫ বামগাও, ৬ ভয়রা, ৭ সাদকপুর, ৮ শ্রীরামপুর, ৯ পাতলাভাঙ্গা, ১০ সিরান্দী, ১১ হুহুলিয়া, ১২ সনসদীয়া (মিলন্দীয়া), ১২ লস্কারদিয়া, ১৩ ঢেউখালী, ১৪ ছোটবাখরগঞ্জ, ১৫ গাজিয়া।

পদ্মাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণে—

১ দীঘাড়িপাড়া, ২ রাজাখালী, ৩ ভাঙ্গাবাড়ী, ৪ কলারগাঁ, ৫ বালীসার, ৬ বুদারশাপ (বদরাসন), ৭ মাছুয়াখালী, ৮ গজারিয়া, ৯ সোনাপাড়া, ১০ সনরপুর, ১১ সলুরারহাট, ১২ বগাও, ১৩ কুশারিয়া, ১৪ ইসবারচর, ১৫ মেন্দিগঞ্জ, ১৬ আবদুল্লাপুর, ১৭ সুলতানী, ১৮ কন্দর্পপুর। এই কন্দর্পপুরের নিম্নে মেঘনা ও পদ্মার সম্মিলন ঘটে।

গঙ্গা পদ্মার শাখা বা হরগঙ্গার তটবর্ত্তী স্থান—

১ ফরিদপুর, ২ পাটপাসার, ৩ হাজিগঞ্জ, ৪ চড়মনরিয়া (চরমুকুন্দিয়া), ৫ আলীপুর। এই আলীপুর হইতে হরগঙ্গা বরাবর দক্ষিণাভিমুখে হাবুল্লা নাম ধারণ করিয়াছিল। তাহার তীরে,—৬ সাহারপুর, ৭ সাজাদপুর, ৮ পাটীখালী, ৯ বন্দরখলা, ১০ পাচ্চর, ১১ সেকপাড়া, ১২ গোপালগঞ্জ, ১৩ হবিগঞ্জ, ১৪ আলুরাবাদ, ১৫ মাদারিপুর, ১৬ কুলপদ্বীপ, ১৭ কালকিনী, ১৮ সেনাপট্টী, ১৯ টেঙ্গরামারি, ২০ মসজীদ, ২১ রামনগর, ২২ গৌরনদী। আর বাহুল্য প্রযুক্ত উল্লেখ করা হইল না।

ভূষণার অন্তর্গত স্থানের নাম—

১ কোষাখালী, ২ হোগলা, ৩ হাবাসপুর, ৪ কুমারখালী, ৫ বেরামপুর, ৬ সাদাপুর ৭ গুলিশপুর, ৮ বেলগাছী, ৯ কলকাপুর, ১০ জাহাডিঙ্গা, ১১ কমলদিঘী, ১২ মজুল, ১৩ সেনপাড়া, ১৪ বেরপুর, ২৫ বালীয়াকান্দী, ১৬ নহুয়া, ১৭ অভাসকুনারী, ১৮ গোত্রাখালী, ২০ কৃষ্ণপুর, ২১ ফরিদপুর, ২২ ছোটডোমান, ২৩ মথুরাপুর, ২৪ কানাইপুর, ২৫ হীরাপুর, ২৬ সহর ভূষণা, ২৭ গোপালপুর, ২৮ মালিকনগর, ২৯ তালসা, ৩০ হাকিমপুর, ৩১ বাবুখালী, ৩২ জয়নগর, ৩৩ গড়টী, ৩৪ রাজাপুর, ৩৫ বিনটপুর, ৩৬ মহম্মদপুরী, ৩৭ কামারগাঁ, ৩৮ কলনাপটি, ৩৯ কাগাইল, ৪০ কালীনগর, ৪১ নহাট্টা, ৪২ মীরগঞ্জ, ৪৩ মুকসুদপুর, ৪৪ বাইটকামারী, ৪৫ টেঙ্গরাখালী, ৪৬ মহারাজপুর, ৪৭ দিগলনগর, ৪৮ পুলটীয়া, ৪৯ বজিগঞ্জ, ৫০ সেকপাড়া, ৫১

কালীনগর, ৫২ গাঙ্গাটীয়া, ৫৩ বন্নাসী, ৫৪ কময়া, ৫৫ মজুমপুর, ৫৬ শালথীয়া, ৫৫ খাজুরা, ৫৬ শ্রীরামপুর, ৫৭ দামনাথী, ৫৮ গাণ্ডারহাটী, ৫৯ রাজাপুর, ৬০ সাতরিয়া, ৬১ ইনাইতপুর, ৬২ আড়পাড়া, ৬৩ ডুকালী, (ঢেউখালী), ৬৪ রাজাপুর, ৬৫ গোড়াখালী, ৬৬ দাউদপুর, ৬৭ বানসরী, ৬৮ কলনা, ৬৯ সামরুল, ৭০ কালনডিঙ্গা, ৭১ শৌনপুর, ৭২ চামারী, ৭৩ কালীয়া, ৭৪ দেয়ানশ্রী, ৭৫ গোপালগঞ্জ, ৭৬ গোত্রা, ৬৭ বারানী, ৭৮ টাঙ্গিপাড়া, ৭৯ ঘোড়াডাঙ্গা, ৮০ শিবরামপুর, ৮১ চাঁদপুর, ৮২ ফলসী, ৮৬ নেজারহাট, ৮৪ খড়রিয়ার কতকাংশ বিলসমষ্টি।

অধুনা ভূষণার কতকাংশ যশোহর ও খুলনা জেলার অন্তর্গত এবং কতকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার বর্ত্তমান ম্যাপ অনুসন্ধান করিয়া পরে উহার নির্দ্ধারণ করা যাইবে।

ঢাকার দক্ষিণে ধলেশ্বর নদীর দক্ষিণতট হইতে বরাবর দক্ষিণদিক অগ্রসর হইলে, একমাত্র কালী গঙ্গা নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। উহা বিক্রমপুরের বক্ষদেশে উপবীতবৎ প্রতীয়মান হইত। মেঘনা হইতে একটী পায়ঃনালী বাহির হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণতটে মুলফৎগঞ্জ ও উত্তর তটে ফুলবাড়ীর নিকট প্রবাহিত হইয়া, পরে তথা হইতে দুইটী ক্ষুদ্র শাখা বরাবর পশ্চিমাভিমুখে দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া রাধানগরের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। রাজনগর, সোমকোট, রাধানগর, ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থান উভয় নদীর মধ্যস্থলে বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণদিগের শাখা তটে মুলফৎগঞ্জ, নবীপুর, জপসা, নরিকুল, কান্দাপাড়া, সারেঙ্গা, চিকন্দী, গঙ্গানগর এবং উত্তরদিগের শাখার উত্তর তটে, চণ্ডীপুর, ঢোলসমুদ্র, ধাউড়া, ঠানকোনা, মুলগাঁ প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থিতি ছিল। তৎসময় কার্ত্তিকপুর কালীগঙ্গার দক্ষিণ ভাগে মেঘনা নদের তটে ও রাজাবাড়ী কালীগঙ্গার উত্তর ভাগে ঐ মেঘনা তটে বিদ্যমান ছিল।

১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে রেনেলের এই মানচিত্র অঙ্কিত হয়। তৎসময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুর মধ্যে কীর্ত্তিনাশা বা ইদিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গলীর উদ্ভব হয় নাই। পূর্ব্বে রাজাবাড়ী ও চণ্ডীপুর উভয় স্থান কালীগঙ্গার উত্তর দিকে ছিল; পরে যে সময় কীর্ত্তিনাশার বিস্তার হয়, তৎসময় আমরা কীর্ত্তিনাশার পূর্ব্বোত্তর পার রাজাবাড়ী এবং দক্ষিণ পার চণ্ডীপুরের অবস্থান দেখিয়াছি। অধুনা চণ্ডীপুর নদীগর্ত্তস্থ হইয়া পুনরায় চরে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর কালীগঙ্গা হইতে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলিত স্থান, কন্দর্পপুর পর্য্যন্ত আর কোন নদীর অস্তিত্ব এই মানচিত্রে বিদ্যমান নাই। পরে, কিন্তু ইদিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গলী এবং সাহাবাদপুর ও আবদুল্লাপুর মধ্যে মেন্দিগঞ্জ নামে একটী নদীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সময় হইতেই, কীর্ত্তিনাশা, নয়াভাঙ্গলী, মেন্দিগঞ্জ নদীত্রয় মেঘনার সহিত পদ্মার সম্মিলন করিয়া দেয়।

ফরিদপুরের উত্তর-পূর্ব্বে পদ্মা বা গঙ্গা বিদ্যমান ছিল। অতি পূর্ব্বকালে এই নদী ফরিদপুর ও পাঠপাসারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে, পাঠপাসারের পূর্ব্বোত্তর দিক দিয়া ইহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পাঠপাসারের নিকট হরগঙ্গা নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, ফরিদপুরের উত্তরদিকে এবং কৃষ্ণপুরের

দক্ষিণে পুনরায় পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ফরিদপুরের নিকট হইতে আবার একটী ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া, আলীপুরের নিকট পুনরায় পদ্মাতে পতিত হইয়াছিল। হরগঙ্গার তটে কলসদিঘী একটী বৃহৎ বন্দর ছিল। পশ্চিমে চন্দনানদী মধীপুরের নিকট পদ্মা হইতে বাহির হইয়া, কানাইপুর, গোপালপুর, কুমারগঞ্জ, কালীনগর, টেঙ্গ্রা-খালী, দিগনগর, কবিরাজপুর, হবিগঞ্জ হইয়া মাদারিপুরের নিকট হারবিলা নদীর সহিত মিলিয়াছিল। রেনেলের পরবর্ত্তী মানচিত্রে দেখা যায়,এই হারবিলার একাংশই ভুবনেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছে। অবশিষ্টাংশ আইরলখার মধ্যে বিল ও ভূভাগে পরিণত হইয়াছে। চন্দনার দক্ষিণাংশের নাম মধুমতী নদী, ইহার তীরে গোপালগঞ্জ, গোত্রা, খরড়িয়ার বিল ও কোটালীপাড়ার বিল সমষ্টি।

বলাবাহুল্য, শত বৎসরের মধ্যে, পূর্ব্ববঙ্গ, বিশেষত ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যভাগে, নদী কর্ত্তৃক এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। স্থল ভাগ জলে, জল স্থলে, এবং এক নদীর স্থানে অন্য আর একটা প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নূতনে পরিণত করিয়াছে। একমাত্র মানচিত্রের সহায়তা ব্যতীত তাহা অনুমানে নির্ণয় করা কাহারও পক্ষে সহজ সাধ্য নয়।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

## সাহিত্য-সমালোচনায় অধিকার-ভেদ।

অধিকার ভেদ বিচার করা আর্য্য হিন্দুদিগের এক প্রধান নীতি ছিল। কি ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, কি আহারে ও ব্যবহারে, কি সমাজে ও পরিবারে, কি আচারে ও বিচারে, কি কাব্য ও অলঙ্কারে, কি শিক্ষায় ও উপদেশে, কি জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে—সর্ব্ব বিষয়েই ও সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের অধিকার-ভেদ। তাহাদিগের সাহিত্য-সমালোচনায়ও এই নীতি স্থান লাভ করিয়াছে। এই দেখুন, নিম্নলিখিত শ্লোকে কি আছেঃ—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে॥"

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিকৃত 'পরমাত্মসন্দর্ভে' উদ্ধৃত বচন।

সমালোচ্য-গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রধানতঃ এই কতিপয় লিঙ্গ বা বিষয় ধরিয়া বিচার করা উচিত—

(১) গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার কিরূপ? উপক্রমে যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, উপসংহারে তাহারই পরিণাম সিদ্ধ হইয়াছে কি না? কিরূপ মূলের কিরূপ শেষ হইয়াছে দেখিতে হইবে।

(২) যে প্রসঙ্গ গৃহীত হইয়াছে, গ্রন্থমধ্যে তাহারই পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন করা হইয়াছে কি না? কুলাল যেমন চক্র ঘুরাইয়া, ঘট গড়িয়া আনে, গ্রন্থকার ও তেমনি একই বিষয়ের সঙ্গে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যোজনা করিয়াও, সকলকেই এক অঙ্গীভূত করিয়া, গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করিয়া আনেন। সেইরূপে সম্পূর্ণ হইলেই গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে "সম্পূর্ণ" হয়।

(৩) প্রসঙ্গের অপূর্ব্বতা চাই। যে বিষয় পূর্ব্বে কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, তাহা

নহে। যদি গ্রহণ করা হয়, তবে, তাহাকে এমন নূতন ভাবে গড়িতে হয়, যেন তাহার আর পূর্ব্ব মূর্ত্তি না থাকে। শুধু প্রসঙ্গ অপূর্ব্ব হইলে হইবে না, ভাষাও অপূর্ব্ব হওয়া আবশ্যক।

(৪) পূর্ব্ব ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন করিয়া গ্রন্থকে এরূপে রচনা করিতে হইবে, যেন তৎপাঠে কোন ফলোৎপত্তি হয়। যে গ্রন্থ পাঠে কোন ফল নাই, সে গ্রন্থ বৃথাই রচিত হইয়াছে। অধ্যয়ন ফল যদি ভাল হয়, তবে গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে—মন্দ হইলে, সে গ্রন্থ অতি নিন্দিত ও হেয় হইয়াছে। সুতরাং, এই ফল ধরিয়া সকল গ্রন্থের বিচার সিদ্ধ হয়। আর্য্য-সাহিত্যে এই ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল গ্রন্থই রচিত হইয়াছে। পুরাণে ইহার নাম "ফলশ্রুতি"। এ ফল-শ্রুতিতে যাহা আছে, যদি অধ্যয়ন-ফল সেই রূপই হয়, তবেই গ্রন্থখানি প্রকৃষ্টরূপে অধীত হইয়াছে, নহিলে যথোচিত অধ্যয়ন সম্পন্ন হয় নাই, বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ফল-শ্রুতি যাহা, গীতাধ্যয়নে যদি সেই ফল লাভ করা যায়, তবেই গীতা প্রকৃতপক্ষে অধীত হইয়াছে, নহিলে নহে। অতএব, এই অধ্যয়ন-ফলই সর্ব্বগ্রন্থের প্রধান পরীক্ষা। এবং সেই ফল ধরিয়াই গ্রন্থের সমালোচনা সম্পন্ন হওয়া উচিত।

(৫) অর্থবাদ বা গ্রন্থের অধিকার বিচার। এ বিষয় পরে বলিতেছি।

(৬) উপপত্তি। গ্রন্থের অধিকার ও অধি-কারীর উপযোগী করিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অধ্যায়-পরিচ্ছেদাদি এরূপ পর পর সজ্জিত করিয়া রচনা করিতে হইবে, যেন তাহা উপ-পত্তি-ক্রমে উপক্রম হইতে উপসংহারে উপ-নীত হইয়া ফলোৎপত্তি করিতে সমর্থ হয়।

আর্য্য-সাহিত্যের রীতি অনুসারে সমা-লোচনা করিতে হইলে এই ষড়বিধ বিষয় বিচার করিতে হয়। এ বড় কম ব্যাপার নহে। এই ছয় বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে যে "অর্থবাদ" বা অধিকার-বিচার রহিয়াছে, তাহাই আমাদের এ প্রস্তাবে আলোচ্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অভ্যাস দ্বারাই গ্রন্থের অবয়ব সংগঠিত হয়। আলঙ্কারিক দণ্ডী সেই গ্রন্থ-শরীরের এইরূপ লক্ষণ-বিধান করিয়াছেন :—

"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।"

যে পদাবলীর কোন ইষ্টার্থ (Desired effect) আছে, তদ্দ্বারাই গ্রন্থাবয়ব সং-গঠিত হয়। সুতরাং, প্রতি গ্রন্থেরই "ইষ্টার্থ" থাকা আবশ্যক। এই ইষ্টার্থই আমাদিগের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের "ফলম্।" ইষ্টার্থই গ্রন্থের পরম প্রয়োজন। যে প্রয়োজন সাধনার্থ যে গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহাই তাহার ইষ্টার্থ। গ্রন্থের প্রয়োজন থাকিলেই, সেই প্রয়োজনের অধিকারীও আছে। কাহার বা কাহাদিগের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে? যে অর্থের জন্য এবং যে অর্থীর জন্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই অর্থার্থীর বাদের নামই "অর্থবাদ।" সুতরাং অর্থবাদের অর্থ অধি-কার হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আর্য্য-সাহিত্যে অনেক গ্রন্থের অধিকার, গ্রন্থ-প্রারম্ভেই উক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য যে, সেই অধিকারী জনগণেরই সেই সেই গ্রন্থ পাঠ্য এবং সেই অধিকার ধরিয়াই তাঁহা-দের বিচার। অতএব, সেই সাহিত্যে, সমা-লোচনার যে এক প্রধান বিষয় এই অধিকার হইবে, এ কথা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। অধি-কারী বিশেষের জন্য গ্রন্থ লিখিত হইলে, তাহার ফলও প্রভূত হয়।

গ্রন্থ মাত্রেরই অধিকার আছে। কারণ, গ্রন্থস্থ বিষয় ও প্রসঙ্গের অধিকার আছে। কোন প্রসঙ্গই অসীম নহে। প্রসঙ্গমাত্রেরই যদি নির্দ্দিষ্ট সীমা ও অধিকার থাকে, তবে তাহার সমালোচনা ও সেই অধিকার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত। যদি সমালোচনা সেই অধিকারের বহির্ভূত হয়, তবে তাহা নিশ্চয় অযথা ও অন্যায্য হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার যদি কোন স্থলে নিজ অধিকারের বাহিরে গিয়া থাকেন, সমালোচক তাহা দেখাইয়া দিবেন। গ্রন্থের যাহা প্রধান রস, সেই রসে যিনি নিমগ্ন হইতে না পারেন, তিনি তাহার সমালোচক হইবার যোগ্য পাত্র নহেন। প্রতিভা-সম্পন্ন লোকেরা, এক এক জন এক এক অধিকারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহার প্রতিভা যে ভাবে স্ফুরিত হইয়াছে, তাঁহাকে সেই অধিকার ধরিয়াই বিচার করা উচিত। কেহবা হাস্য-রসে প্রধান, কেহ বা বীররসে, কেহবা আদিরসে, কেহবা শান্তিরসে প্রাধান্য-লাভ করিয়াছেন। কেহবা কৌতুক করিতে, কেহবা মন মাতাইতে, কেহবা করুণরসে চিত্ত-বিগলিত করিতে সমর্থ। যাঁহার যে রসে অধিকার, তাঁহাকে সেই রস ধরিয়া বিচার করা উচিত। এজন্য সমালোচককে বিশেষরূপে রসজ্ঞ হইতে হইবে। অনেকে বীভৎসকে করুণ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাই খুনে পর্য্যবসিত, পাপের ঘৃণিত চিত্র-পূর্ণ, বীভৎস-রস প্রধান উপন্যাস বা কাব্যকে, করুণ-রস-প্রধান ভ্রমে, অযথা প্রশংসা করিয়া থাকেন। করুণ-রসে মন আর্দ্র হয়; কিন্তু বীভৎসে ঘৃণার উদয় হয়। এজন্য বীভৎস কখনই প্রীতিকর নহে। সেই ঘৃণিত বীভৎসকে করুণের সহিত ভুল করা নিতান্ত দোষাই। তদ্রূপ এক জাতীয় প্রতিভাকে, অন্য জাতীয় প্রতিভার সহিত তুলনা করাও অন্যায়। যিনি যে জাতীয় কবি, তাঁহাকে তজ্জাতীয় কবির সহিত তুলনা করাই উচিত। গরুর যে সকল গুণ আছে, তাহা গরুকেই প্রাধান্য দিয়াছে, তদ্রূপ ঘোড়ার গুণ ঘোড়াতেই ঘটিতেছে। তাই বলিয়া, যিনি গরুকে ঘোড়ার গুণ দিয়া বিচার করিবেন, তিনি কি ঠিক্ বিচার কর্ত্তা? তদ্রূপ, আমরা যদি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের কবিতার সহিত, ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার তুলনা করি, তাহা হইলে কি ঠিক বিচার করা হইল? কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, নবীনসেনের গ্রন্থের আদর বাড়াইবার জন্য, সে দিন "হিতবাদী" তাঁহার একটী কবিতা ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের কবিতার সহিত অযথা তুলনা করিয়াছিলেন। ৺ ঈশ্বরগুপ্ত যে রসে প্রধান, শ্রীযুক্ত নবীনসেনের কবিতায় তাহা নাই এবং শ্রীযুক্ত নবীন সেনের কবিতায় যাহা আছে, ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বা ৺ ভারতচন্দ্রের কবিতায় তাহা নাই। একথা স্মরণ করিয়া বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে, শ্রীযুক্ত নবীন সেনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, তাঁহার কবিতার সহিত ৺ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার তুলনা করা উচিত নহে, তাঁহাকে স্বজাতীয় প্রতিভাসম্পন্ন কবির রচনা ধরিয়া বিচার করিলেই, তাহার ঠিক বিচার করা হইত; যেমন, ৺ ভারতচন্দ্রের সহিত ৺ঈশ্বর গুপ্তের তুলনা করিলে, তবে উভয়ের প্রতিভার প্রকৃতি ঠিক নির্ণয় করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

আর্য্যশাস্ত্র সমুদায় অধিকার অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। বেদবেদান্ত যে প্রত্যক্ষ সিদ্ধতত্ত্ব সকল খ্যাপন করিয়াছে, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে তাহারই অনুমানমূলক বিস্তার ও বিবৃতি। বেদ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া যে জ্ঞানে আরোহণ করেন, বেদান্ত সেই জ্ঞানকাণ্ড

ধরিয়া মোক্ষে উপনীত করেন। সেই বেদ-বেদান্তে আপাততঃ সামান্য জ্ঞানে যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসায় সেই সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদের নিরাস-সাধন হইয়াছে। এবং তাহাতে যে মোক্ষধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে, তাহারই সাধনপথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য, এই মীমাংসাদ্বয় এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রদ্বয়,সেই বেদবেদান্তেরই চক্ষু-স্বরূপ হওয়াতে, তাহাদিগকে দর্শন-শাস্ত্র বলে। ন্যায়শাস্ত্রও অন্যবিধ সাধন-পথ দেখাইয়া,সেই একই মোক্ষে আনিয়া উপনীত করেন। এজন্য, সেই ন্যায়শাস্ত্রও দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বেদবেদান্ত এবং দর্শনে যাহা সূক্ষ্মতত্ত্বরূপে উপদিষ্ট, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে তাহা স্থূলরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন বাহ্যবিজ্ঞানে, সূক্ষ্ম বিষয় সকল ছবিদ্বারা প্রদর্শিত করা হয়, তেমনি অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে, আত্মার মোক্ষপথে উঠিবার বিবিধ স্তর ও আধ্যাত্মিক অবস্থা, ছবি আঁকিয়া দেখাইবার জন্য, পুরাণ ও তন্ত্রাদির সৃষ্টি। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। মুনি ঋষিগণ সাধনাপথে যে বালভাবে উপনীত হয়েন, যে বালভাবে বাল্য-সরলতা, নির্ভাবনার শান্তিসুখ ও সদানন্দভাব উপলব্ধি হয়, যে ভাব সমুদায় শৈশবকালে বালকগণে সুন্দর পরিদৃষ্ট হয়,সেই বালভাবকে দেদীপ্যমান করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রজলীলায় ব্রজভাব বা বিষয়াসক্তি পরিত্যক্ত হইলে যে ভাব দাঁড়ায়,সেই নির্ভাবনার শান্তিময় সরল ও সদানন্দ চিত্তাবস্থা, সমুদায় প্রকটিত হইয়াছে। সেই ব্রজলীলায় স্বয়ং ভগবান্ সদানন্দময় বালকৃষ্ণ এবং ব্রজবাসী রাখালগণ ও গোপীরা সকলেই বালক বালিকারূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের লীলাও,বালভাবের অকপট ও সরল ব্রজলীলা। তাহাতে পাপের ছন্দাংশ নাই। সেই বাল্য-লীলায় যে সমস্ত চিত্তাবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মুনিঋষিগণের বালভাবে উপনীত চিত্তাবস্থা। এই ব্রজলীলার অধিকার যাঁহারা না জানেন, তাহারাই অজ্ঞতা বশতঃ, খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণের ন্যায়,নানারূপ অনধিকার চর্চ্চা এবং অযথা সমালোচনা করিয়া মূর্খতারই পরিচয় দিয়া থাকেন।

পুরাণাদিতে যেমন এইরূপ সাধনা পথের নানা স্তর ও চিত্তাবস্থা স্থূল অবয়বে জাজ্বল্যমান করা হইয়াছে, তেমনি ভগবানের নানা বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য, নানাবিধ শক্তির বিকাশ ও জগল্লীলার সূক্ষ্ম কার্য্য, দেবদেবীর মূর্ত্তি ও লীলায় স্থূলরূপে প্রকটিত হইয়াছে। পুরাণ এবং তন্ত্রের এ অধিকারও অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু যাঁহারা সে অধিকার ঠিক বুঝিতে না পারেন, তাঁহারাও সেই সেই শাস্ত্রের বিচার ও সমালোচন-স্থলে নানা প্রলাপ-বাক্যে,আপনাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। কোথায় তত্ত্ববিৎ ঋষিগণের জ্ঞানগর্ভ বাক্য, আর কোথায় অজ্ঞানান্ধ সংসারী-জনগণের অমৃত বালভাষিত!

অতএব, কি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বেদ-বেদান্ত, কি অনুমানমূলক দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্র, সকলেরই অধিকার স্বতন্ত্র। আর্য্য-সাহিত্যের কাব্যাদি সুতরাং যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির উপর স্থাপিত, তাহাদেরও অধিকার তদনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই অধিকার অনুসারেই,সেই কাব্যাদির সমালোচনা ও বিচার-সিদ্ধ হওয়া উচিত। নহিলে, তাঁহাদিগের উচ্চাদর্শের কাব্যাদির সহিত, বিলাতী-কাব্যাদির তুলনা করা, আর স্বর্গ মর্ত্ত্যের তুলনা

করা সমান কথা। সে তুলনা কিরূপ, তাহা আমরা "সাহিত্য-চিন্তা"য় কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি।

গ্রন্থের অধিকার ভেদ-বশতঃ এ বিষয়ের অধিকার ভেদ ঘটে। যে অধিকারীর যে বিষয় গ্রহণীয়, তাহা বিবেচনা করিয়াই গ্রন্থে বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়। সমালোচকের ইহাই বিচার্য্য। নহিলে অনেক সমালোচককে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থের অধিকার না বুঝিয়া, তাঁহারা বিষয়ের সমালোচনা করিয়া বসেন। গীতার অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা বলিয়া বসেন,—লোকের যে সত্য কথা বলা উচিত, মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে, গীতায় এ সকল সামাজিক নীতি-কথা কই? কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, স্মৃতি-শাস্ত্রের মানব-ধর্ম্মের কথা গীতায় উক্ত হইবে কেন? মানবের সমাজ-নীতি ও ধর্ম্ম-নীতি যে অধ্যাত্ম-বিদ্যার সোপান, সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব-কথা স্মৃতি-শাস্ত্রে নাই, অথবা মনু সেই অধ্যাত্ম-বিদ্যার সহিত, ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতির সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য, কেবল শেষ অধ্যায়ে, সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বের স্থূল স্থূল কথার উল্লেখ করিয়া,গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু, সেই অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্যক্‌রূপে বিচার করিবার জন্য, আর্য্য-সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। গীতা, যোগবাশিষ্ট, মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মীয় পর্ব্বাবলী, সেই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের সকল বিস্তারিত বিচার যেমন স্মৃতিতে নাই, তেমনি স্মৃতির মানব-ধর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা মোক্ষধর্ম্ম সং-ক্রান্ত অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে নাই। যেমন, বেদবেদান্তের অধিকার না বুঝিয়া, অনেকে বেদের মধ্যে বেদান্তের তত্ত্ব এবং বেদান্ত মধ্যে বেদের তত্ত্ব দেখিতে চান, তেমনি মোক্ষ-ধর্ম্মীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাঁহারা সমাজ-ধর্ম্মের নীতি-কথা অন্বেষণ করেন। যে ঘরে যাহা রাখা হয় নাই, সে ঘরে তাহা খুঁজিলে পাইবেন কেন? তবে, মহাভারতে সাধারণতঃ সর্ব্ব-বিষয়ই গৃহীত হইয়াছে। এজন্য সমাজ-ধর্ম্মও গৃহীত হইয়াছে। রাজ-ধর্ম্মাদির কথা স্থলে, তাহা স্বতন্ত্রাকারে সংক্ষেপে আলোচিত হই-য়াছে।

দর্শন-শাস্ত্র সচরাচর ত্রিবিধ প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়—ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত। কি ন্যায়, কি সাংখ্য, কি বেদান্ত, সকলই অধ্যাত্ম-পথের পথিক,—সকল দর্শনই মোক্ষধর্ম্মে আত্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু, সেই পথ বিভিন্ন দিক্‌ দিয়া গিয়াছে। ন্যায়—আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় নিঃশ্রেয়স সাধন-পথ,সাংখ্য—পঞ্চ-ভূতের প্রকৃতি-তত্ত্বের বিচারে পুরুষ তত্ত্ব এবং বেদান্ত—ব্রহ্ম-বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্ত ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশ দেখাইয়া, সকলই ব্রহ্মময় প্রতিপাদন করিয়াছেন, সাংখ্য বাহ্যপ্রকৃতির বিচার করিয়া, পুরুষতত্ত্বে উঠিয়া সেই ব্রহ্মময়ত্ব দেখা-ইয়াছেন; কিন্তু ন্যায়ের তত্ত্ববিচার স্বতন্ত্র। সাংখ্য যেমন বাহ্যপ্রকৃতি ধরিয়া ভূত-তত্ত্বের বিচারে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছেন, ন্যায় তেমনি আভ্যন্তরিক মনের ও চিত্তের প্রকৃতি-বিচার ধরিয়া,জগৎকে আত্মময় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ন্যায় মনোবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, সাংখ্য সমগ্র প্রাকৃ-তিক বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, বেদান্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। এজন্য সকলের তত্ত্ব-কথা সমান নহে। ন্যায়ের তত্ত্ব বিচারের সহিত সাংখ্যের তত্ত্ব বিচার সমান নহে এবং সাংখ্যের তত্ত্বকথা বেদান্তের তত্ত্ব কথার সহিত সমান নহে। কিন্তু সকলের তত্ত্বকথা সমান না হইলেও,পরি-ণাম-ফল একই। তদ্রূপ, এই কতিপয় দর্শ

নের অবান্তর-ভেদও আছে। পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্ম-কাণ্ড লইয়াছেন, উত্তর মীমাংসা জ্ঞান-কাণ্ড লইয়াছেন। কাপিল-সাংখ্য যে সকল তত্ত্ব স্থির করিয়াছেন, পাতঞ্জল-যোগ সেই সকল তত্ত্বের ক্রম,ক্রমে লয়-সাধন শিক্ষ্য ইয়া, সমস্ত প্রকৃতি লয়সাধক মুক্তিপথে আত্মলাভ করিয়াছেন। তদ্রূপ অক্ষপাদ আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় যে জাতিতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, কণাদ, বৈশেষিক দর্শনে, সেই জাতিতত্ত্বের আবার বিশেষ বিশেষ পরমাণু-তত্ত্ব স্থির করিয়া, সেই জাতি-তত্ত্বের নিত্যত্ব হইতে আত্মার নিত্যত্ব স্থাপন পূর্ব্বক, অক্ষপাদের সহিত দেখাইয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ক্রমশঃ অপবর্গ-লাভ এবং সেই অপবর্গ-লাভই নিঃশ্রেয়স এবং সাংখ্যের পুরুষার্থ ও বেদান্তীর ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারে, ন্যায়—বৈশেষিক এবং সাংখ্য-পাতঞ্জল যে তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ-প্রণালী-ক্রমে যে আত্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, বেদান্ত দেখাইলেন, সেই আত্মাই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মরূপে তিনি বিশ্বময় ব্যাপ্ত। ন্যায়ের অধিকার মনোবিজ্ঞান, সাংখ্যের অধিকার সমগ্র প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং বেদান্তের অধিকার এতদুভয়ই। ন্যায় ও সাংখ্য ব্রহ্মে উঠিয়াছেন, বেদান্ত সেই ব্রহ্ম হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া, সেই ব্রহ্মকে বাহ্য-জগৎ কি অন্তর্জগৎ, উভয় জগতেই দর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, ইঁহাদের অধিকারের বিভিন্নতার রেখা অতি সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

শুধু কি বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-সাংখ্য, এবং শ্রুতি-স্মৃতির অধিকার বিভিন্ন, পুরাণ ইতিহাস ও তন্ত্রের অধিকারও তদ্রূপ সুস্পষ্ট। যে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সকল বেদাদি শাস্ত্রে বিচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পুরাণ ইতিহাস ও তন্ত্র সেই সকল পরমার্থতত্ত্ব, ভক্তি ও শক্তিবাদে, উপাখ্যানচ্ছলে, উজ্জ্বলবর্ণে জাজ্জ্বল্যমান করিয়াছেন। ইহাদের উপকরণ যুক্তি নহে, কিন্তু ভক্তির উপন্যাস এবং শক্তির রুদ্র ও মোহিনী-মূর্ত্তি। ইহা এক স্বতন্ত্র রাজ্য ও অধিকার। এ অধিকারে শুধু হৃদয়ের ব্যাপার—ভক্তি, ভয় ও সৌন্দর্য্যের মোহন অধিকার। মানবের সমস্ত প্রবৃত্তিকে লইয়া পুরাণ-তন্ত্রের অধিকার। প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত, সৎপথে চালিত, সমুন্নত, সংযত এবং নিবৃত্তি-মুখী করিতে, উপন্যাস ও আখ্যানের যে প্রভূত শক্তি, পুরাণ-তন্ত্র সেই শক্তিবলে নিজ অধিকারে বলীয়ান। কালিদাসাদি পৌরাণিক কবিগণ, কাব্য-নাটকে যে রসের সৃষ্টি দেখাইয়াছেন, সেই রসময় রাজ্যে পুরাণ-তন্ত্রের অধিকার সুবিস্তৃত হইয়া, আর্য্য-সাহিত্যের মহা গৌরব সম্পাদন করিয়া, বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছে। সকলেরই অধিকার স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু সকলেই এক মুখে আর্য্যধর্ম্মকেই জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং, আর্য্য-সাহিত্যের সমস্ত অঙ্গের অধ্যয়ন-ফল, একই সুবর্ণ বর্ণে সমুজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, প্রভৃতি কবিগণের প্রতিভা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কাব্য, নাটকাদির রচনা, রস ও অধিকারও স্বতন্ত্র, ঋষিগণের শাস্ত্রীয় রচনা ও যুক্তিপথও স্বতন্ত্র; কিন্তু সকলে একই ধর্ম্মলাভ-রূপ ফলধারণ করিয়া রহিয়াছে। আস্বাদন করিয়া দেখ, তেমন ফল আর কোন দেশের কোন জাতির সাহিত্যে সুপরিণত হয় নাই।

আর্য্যসাহিত্য কেমন অধিকারানুসারে সজ্জিত এবং বিরচিত হইয়াছে; তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। শুধু আর্য্য-সাহিত্য কেন, সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যেরও সেই ধর্ম্ম। সমস্ত ভাল ভাল গ্রন্থেরই অধিকার আছে; অধিকার

আছে বলিলে এই বুঝায় যে, সেই গ্রন্থের অধিকারী-বিবেচনায় বিষয়ের বিভাগ ও সন্নিবেশ হইয়াছে। সুতরাং সেই অধিকারের অতিরিক্ত বিষয় তন্মধ্যে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সেরূপ প্রত্যাশা করা কখনই বিচারসিদ্ধ নহে।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যেরূপ উত্তম, মধ্যম এবং অধম জ্ঞানাধিকারীর জন্য গ্রন্থ বিরচিত, তাহা ঠিক তদুপযোগী হইয়াছে কি না? তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে, গ্রন্থ যে সমাজস্থ, যে কালের ও যে বয়সের লোকের জন্য লিখিত, সেই দেশীয় এবং সেই কালীন জনসমাজোপযোগী কি না? এইরূপ দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী করিয়া যে গ্রন্থ রচিত, তাহারই অধ্যয়ন-ফল প্রভূত। সমালোচন-কালে তবে গ্রন্থের অধিকারই প্রধানতঃ বিচার্য্য। সমালোচনা করিবার অগ্রে গ্রন্থের উত্তমাধমাদি জ্ঞানাধিকার ঠিক অবধারণ করা উচিত, সেই অধিকার অনুসারে পাত্রাপাত্র ও দেশ কাল বিবেচনায় তাহার বিষয় বিচার্য্য। সেই অধিকার বিচার ঠিক না থাকিলে গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করা সুদুষ্কর। এজন্য গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ আর্য্যসমালোচক বলিয়াছেন, সেই গ্রন্থের ঠিক ফল ফলিবে কি না, তাহা অবধারণ করিতে হইলে তাহার অধিকার ও প্রয়োজন দেখা উচিত। এইরূপ প্রয়োজন-বিচারই "অর্থবাদ।" এই অধিকার বিচার বা অর্থবাদই সমালোচন-তরীর কর্ণস্বরূপ। সেই তরির কর্ণধার যদি এ কর্ণ ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার সমালোচন-তরী যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা নাই। সেই জন্য সমালোচন-কার্য্যে গ্রন্থের অর্থবাদ বরাবরই স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। নহিলে গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণীত হইবে না। তাই আর্য্যসমালোচক কলমের পরেই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে বলিয়াছেনঃ—

'অর্থবাদোপপাতীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে।'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

# ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

## সে ও মেঘ।

তার চরণচুমি কিরণ-মাথে
জলদ, অধরে;
আর উরজ-তলে গরজি ডাকে
নিবেদি' সাধরে।
ওসে আনন ঢাকি' ঘন অলকে
সাজিলে মানিনী,
এসে উরু বেড়িয়া গুরু-চমকে
কাঁপায় দামিনী।
শেষে শরদে-চাঁদে স্বরিতে নারী
লুকালে হাসিয়া,
ভেসে আকাশ-পথে আবাস তারি
খোঁজেরে আসিয়া।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

## সংগীত।

পরজ—একতালা।

("মা জগত-জননী" গানের সুর)

মা ভারত-জননী! রক্ত-বীজ-প্রসবিনী!
বৈরাগ্য-বসনা মাগো, চির-সন্ন্যাসিনী!
অঞ্চলে ঝরিছে মণিমুক্তা কত,
যোগ-ভক্তি-জ্ঞান সেবা দান ব্রত;

কণ্ঠেতে তোমার ভক্ত-রত্ন-হার
(ওমা) ভক্ত-মুণ্ড-মালিনী!
কামনা-অনলে জ্বলিছে সংসার
ভ্রূক্ষেপ তাহে নাহি মা তোমার;
ক'রে আত্ম-জয়, বাসনা-বিজয়,
তুমি বিশ্ব-জয়িনী;
নীরব শ্মশানে পাতি যোগাসন,
নীরব গৌরবে সমাধি-মগন;
রাজ-দ্বারে তব এত কলরব,
(তুমি) মহা যোগে যোগিনী।
নিখিল সংসার ছুটিছে বাহিরে,
তুমি মা কেবলি ডুবিছ অন্তরে;
কি সুধা পেয়েছ! কি রসে মজেছ!
কি ধনে তুমি মা ধনী!
যুগ যুগ কর এত বিতরণ,
কভু কি ফুরাবে তব গুপ্ত ধন?
রাজ-রাজেশ্বরী! ওমা যোগেশ্বরী!
(তুমি) জগৎ আলোকিনী।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

---

## চঞ্চলা।

১

আমি গগন-চারিণী চঞ্চলা;
আমি সজল মেঘের উজল-গৃহিণী,
সঙ্গিনী তার দিবস-যামিনী,
কষিত কনক-বসনধারিণী,
দীপ্ত-হীরক অঞ্চলা।
আমি গগন-চারিণী চঞ্চলা।

২

আমি নিঠুর নিদাঘে, ভীম বরষায়
লম্বিত সদা পতির গলায়,
তপ্ত, তরল দেহ-লতিকায়
কনক-কান্তি-কুন্তলা।
আমি গগন-চারিণী চঞ্চলা।

আমি আপনার ভাবে আপনি অধীর,
কভু না পরের পরশি শরীর,
নাচি, খেলি, গাই গাত্রে পতির,
মানিনা কোনই শৃঙ্খলা।

৪

আমি গগন-চারিণী চঞ্চলা।
পতির জীবনে জীবন আমার,
পতির মরণে ত্যজি দেহ-ভার,
কান্তা এমন কোথা আছে আর
কান্ত-প্রণয়-সম্বলা?
আমি গগন-চারিণী চঞ্চলা।

৫

অস্ত্র আমার ভীষণ অশনি,
ইঙ্গিতে নাশে দুষ্টে অমনি,
দেখেছ কি চোখে এহেন রমণী
শুভ্র, শ্যামল, পিঙ্গলা?
আমি গগন-চারিণী চঞ্চলা।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

## অভিযুক্তের চিন্তা।

কখন প্রভাত হ'ল—তার পর গেল সারাদিন,
কোথা দিয়ে সন্ধ্যা এল, দিবসের আলো হ'ল ক্ষীণ,
উষার সে আলোটুকু রেখে গেছে ঘন অন্ধকার—
নভোনীল মেঘে ঢাকা—ঝরিতেছে ঝরঝর ধার।
এ জীবনে কতবার বসিয়াছি বিজন নিভৃতে
কি করিনু ভাবিয়াছি বিপরীত কেন হ'ল হিতে?
জ্ঞাতসারে চাহি নাই করিবারে কারো অমঙ্গল,
জগতের লোক তবু কেন করে মন্ত্রণায় বল?
সম্মুখে উদার গঙ্গা, ঊর্ম্মি তার নাচিছে ভীষণ,
ক্ষুদ্র অনন্তের শোভা দেখি সাধ ভরি প্রাণ মন;
সন্ধ্যার প্রদীপ যত জ্বলিতেছে প্রতি ঘরে ঘরে,
নিরাশা হৃদয়ে মোর বারবার প্রতিধ্বনি করে;
মুকতি ভিখারী আমি, আমি চাই প্রাণময় আশা,
শব্দময় এ জগতে, চাই আমি শব্দহীন ভাষা।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## প্রার্থনা।

মোর চিদাকাশে আজি পড়িয়াছে রক্তরাগ রেখা,
হিরণ্ময় প্রাচ্য-দ্বার উঠিতেছে সুধীরে রাঙিয়া ;
বিহঙ্গ ললিত ছন্দে গাইতেছে আপনা ভুলিয়া
উজলিয়া সারা বিশ্ব হে ভাস্কর, দাও তুমি দেখা।
অশ্রু-ধৌত ভাব-পুষ্প এখনোত্ত বিরলে ফুটিয়া
রয়েছে দিগ্ভ্রান্ত যেন শুধু নাথ, তব প্রতীক্ষায় ;
মৃদুল হিল্লোলে বায়ু দোলাইয়ে বিটপী-লতায়
তোমার সন্ধানে আস্নো চারি পাশে ফিরিছে ছুটিয়া !
মানস-তটিনী মোর, তরে প্রতি লহরে লহরে
তব কোটি প্রতিবিম্ব খেলাইতে করিছে কামনা ;
পুণ্য মন্দাকিনী-নীরে স্নাত হয়ে পূর্ণ হর্ষ ভরে
আমিও যে অর্ঘ্য হাতে বসে আছি করিতে অর্চ্চনা।
আকুল উদ্বেগে মোর কাটিতেছে প্রত্যেক নিমেষ
প্রকাশ হে জ্যোতির্ম্ময়, উদ্ভাসিয়ে গুপ্ত অন্তর্দ্দেশ !।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

## জননী।

স্বর্ণোজ্জ্বল হিমাচল কিরীট তোমার,
ঘন মুক্ত মেঘ-মালা সুকেশের ভার ;
কত মণি মরকত অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে,
খেলে নীল সিন্ধু ওই চরণের তলে ;
শ্যামল অঞ্চল তব শস্যে শস্যে ভরা,
অন্নপূর্ণা তব অন্নে পূর্ণ বসুন্ধরা ;
ঐশ্বর্য্যের রাণী তুমি তোমারি দুয়ারে
তোমার সন্তান আজ শুষ্ক অনাহারে ;
জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন দেহ কাতর নয়ন
কেন্দ্রে কেন্দ্রে উঠে শুধু করুণ ক্রন্দন ;
কর দূর এ দীনতা, জাগগো, জননি,
ওই দেখ ব'য়ে যায় কালের তরণী ;
সন্তানে মা দাও বল সাহস দুর্জ্জয়
দাও রক্ষা-বন্ধ বাঁধি হউক মা জয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

## কে তুমি ?

কে তুমি ? কে তুমি ? বল সদা অনুরাগে
জাগিতেছ মম হৃদে দিবস যামিনী ?
শয়নে স্বপনে সদা অতুল সোহাগে
আছ তুমি মম সঙ্গে নহ অভিমানী।
দিবসে জাগিয়া থাকি তপন আলোকে
হাসে বিশ্ব চরাচর মধুময় হাসি !
আমি হাসি রসরঙ্গে মনের পুলকে ;
তুমি থাক হৃদি মাঝে আমি ভালবাসি।
আকুল আগ্রহে তোমায় দেখিবারে চাই,
তুমি নাহি দাও দেখা ভ্রমে একবার ;
তবুও তোমার গুণে তুলনা ত নাই,
কত ভ্রম অপরাধ ক্ষমিছ আমার।
যে হও সে হও তুমি কিবা ক্ষতি তায় ?
হৃদি মাঝে থেক তুমি ভুলনা আমায়।

---

## নিশীথ শান্তি।

আমার নিশীথ শান্তি শুধু নীলাম্বর !
সাজিয়া তারকাদলে হইবে সুন্দর !
জ্বলন্ত তারার মালা পরিবে রজনী
লুকায়ে আঁধারে যেন হাসিবে ধরণী ?
জ্বলিবে খদ্যোত-মালা থাকিয়া থাকিয়া
ডাকিবে বিহগ-কুল জাগিয়া জাগিয়া।
ব'হে যাবে স্রোতস্বিনী তরঙ্গ-মালায়
বহিবে সঘন এবে সুশীতল বায়।
নাহি রবে কোলাহল নাহি রবে শব্দ
নীরবে ঘুমাবে সবে প্রকৃতি নিস্তব্ধ !
আমি পাব শান্তি-সুধা এহেন নিশায়
বসে রব নিরজনে কে দেখে আমায় ?
যে দেখিবে সে দেখিবে কিবা তাহে ক্ষতি,
নিষ্ঠুর করে রে ব্যঙ্গ ব্যথিতের প্রতি।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন গুপ্ত।

## আহ্বান।

কেন রে মালিন্য এত, কেন এত দুখ ?
কে যাবিরে ছুটে আয়, হাসি খুসি মুখ,
বিশ্ব-জননীর স্নেহ-পারাবার-নীরে
যদিরে করিবি স্নান। শুধু বসি তীরে
কেন রে ফেলিস্ তোরা সুদীর্ঘ নিশ্বাস—
মালিন্যের সহচর ? উদ্বেগ বাতাস,—
সতত চঞ্চল, হায়, সতত অধীর,—
কেনরে অশান্ত করে হৃদয়-মন্দির
প্রলয়ের ঝড়রূপে ? কেন অবিরল
অশান্তি-সাপিনী হৃদে ঢালিছে গরল
জ্বালানল-শিখা-ময় ? কেন রে হুতাশ
সতত হৃদয়-পিণ্ড করিবারে গ্রাস
ব্যাপ্ত করিয়াছে মুখ রাক্ষসের মত ?
অজ্ঞাতে, নিঃশব্দ-পদে শত শত শত
পশি মনে চিন্তা-কীট শত ছিদ্র-পথে
কেন করে হৃদি-রক্ত পান ? মনোরথে
কেন শোক-দৈত্য কাটি করে খান খান ?
বিশ্ব-জননীর তোরা সবাই সন্তান ;
সকলেই সমপ্রিয় ! তাঁর কোটি কর
সন্তানে লইতে বুকে যুগ-যুগান্তর
প্রসারিত বিশ্ব যুড়ি। মিটাইতে ক্ষুধা
সে মায়ের কোটি স্তন ছেয়েছে বসুধা
পূর্ণিত পিযূষ-রসে। নয়নের জল
মুছাইতে, নিত্য তাঁর করুণ অঞ্চল
জুড়িয়া র'য়েছে ধরা! 'হায় হায়!' শুনি
কেন তবে চ'লে যায় দিবস রজনী—
বধির, হৃদয়হীন ? বহি নেত্র-দ্বার
দীনতার চিহ্ন-রূপ অশ্রুর আসার
কেন প্রবাহিত বল্ ? কিসের কারণ
এত মোহ ? ত্বরা করি কর্‌রে বর্জ্জন
দৈন্য মলিনতা মোহ এ সাগর-তটে ;
প্রীতি ও উৎসাহে স্থাপি হৃদয়ের পটে
ছু'টে আয়, ছু'টে আয়, হাসিখুসি মুখ !
বিশ্ব-মাতা মাতা যার, তার কিরে দুখ ?
স্নেহে ডাকিছেন অই জগৎ-জননী।
তাঁহার আহ্বান-ধ্বনি তোরা কিরে শুনি
রহিবি জড়ের মত ?—না রে, ছুটে আয়,
সবে মিলে পড়ি গিয়া জননীর পায় ;
পুণ্য, পবিত্রতা, শান্তি লইগে মাগিয়া
তাঁহার ভাণ্ডার হ'তে ; ভক্তি-পূত হিয়া,
তাঁর পুণ্য-পারাবারে সুখে স্নান করি,
পাপ তাপ অশান্তিরে, বলি দিয়া, মরি,
মাতৃ-স্নেহামৃত পানে জুড়াইগে প্রাণ—
আয়রে মায়ের কোলে মায়ের সন্তান !

শ্রীমনোমোহন কর গুপ্ত।

# উপনিষদের উপদেশ। (২৫)

## জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

আর একদিন মহারাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! জীব-সমূহ কোন্ আলোকের সহায়তায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ? কাহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্য-ক্ষম হয় ? সেই আলোক কি দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, না দেহাদিরই অন্তর্ভুক্ত ? এই বিষয়টী অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বুঝাইয়া দিন্।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজার অভিপ্রায় হৃদয়-ঙ্গম করিয়া, উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! আমি ক্রমে আপনার প্রশ্নের যাহা প্রকৃত উত্তর, তাহা প্রদান করিতেছি, আপনি বুঝিতে চেষ্টা করুন্। এই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ব্যতি-

রিক্ত সূর্য্যালোকই; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক-রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, দেহেন্দ্রিয়াদি ক্রিয়ার চালক। সূর্য্যের আলোকের সহায়তায় জীব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।"

মহারাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনরপি বলিলেন,—"মহাশয়! আদিত্য ত সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে না। যখন সূর্য্য অস্তে যায়, সে সময়ে কোন্ জ্যোতির সহায়তায় জীব ক্রিয়া করিয়া থাকে? যদি বলেন যে, সূর্য্য অস্তগমন করিলেও, চন্দ্র বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং তখন জীব সকল চন্দ্রালোকের সহায়তায় দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু মহর্ষে! চন্দ্রও ত অস্তগমন করে। সূর্য্য ও চন্দ্র, উভয়ের অভাবে,—কোন্ জ্যোতির সাহায্যে ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! চন্দ্র ও সূর্য্য,—এই উভয় অস্তগমন করিলে, অগ্নি ত বর্ত্তমান থাকে। এই অগ্নির প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াই জীবসকল ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়। আর এই অগ্নিও যখন শান্ত হয়, তখন জানিবেন, বাক্যরূপ জ্যোতির সহায়তায় জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শব্দ-রূপ বিষয় দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। শব্দদ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হইলে, মন বস্তু নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয়; সেই মনের দ্বারা তখন বাহ্য-চেষ্টার উদ্রেক হয়। অতএব বাক্য-রূপ জ্যোতি দ্বারাই তখন মনুষ্যের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আপনি কি দেখেন নাই যে, নিবিড় প্রাবৃট্-কালে,—যখন ঘন-ঘোরান্ধকারে নিকটস্থ বস্তুটীকেও গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সূর্য্য চন্দ্র অগ্ন্যাদির জ্যোতি যখন তিরোহিত হইয়া যায়,—তখন কেবল এই শব্দ দ্বারাই বস্তু নির্ণীত হইয়া থাকে; অতএব বাক্যালোকের সহায়তাতেই জীবের ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। গন্ধাদি দ্বারা যখন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় অনুগৃহীত হয়, তখনই জীবের ক্রিয়া হইয়া থাকে। যখন জীব জাগরিত থাকে, তখন বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়বর্গই, বিষয়-যোগে প্রদীপ্ত হইয়া, ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। সূর্য্যাদির আলোক, এই ইন্দ্রিয়াদির সহায়রূপে তখন বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু যখন এই বাহ্য-আলোকের অভাব হয়, অর্থাৎ যখন জীব নিদ্রিত বা সুষুপ্ত থাকে, তখনও ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত এক আলোক দ্বারাই জীবের স্বপ্নাদি সন্দর্শন বা সুখ-সুপ্তি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য-শব্দাদির উপশম হইলেও, এই অন্তর্জ্যোতি দ্বারাই জীবের ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। স্বপ্নাবস্থায় যখন বাহ্য-শব্দাদি বিষয় অন্তর্হিত হয় ও বাহ্য-ইন্দ্রিয় সকল উপশান্ত হয়,—তখনও ত জীব স্বপ্নে বন্ধুর সহিত সংযোগ-বিয়োগ একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়া থাকে। আবার গাঢ় সুষুপ্তির পরেও ত জীব অনুভব করে যে, সে কেমন সুখে নিদ্রা গিয়াছিল। অতএব এই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ এবং সূর্য্য চন্দ্রাদি হইতে ব্যতিরিক্ত একটী জ্যোতি আছে;—যে জ্যোতির বলে, জীব সকল নিদ্রা প্রভৃতির সময়ে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। ইহাই আত্ম-জ্যোতি নামে কথিত হয়। ইহাই আত্মার আলোক বা চৈতন্যের প্রকাশ। এই আত্মালোক, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই আলোকের বলেই, দেহেন্দ্রিয়াদি পরিচালিত ও কর্ম্ম-ক্ষম হইয়া থাকে। এই আলোক, চক্ষুরাদির গ্রাহ্য নহে। চক্ষুরাদি

ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক—ক্রিয়ার সহায়—স্বরূপে বর্ত্তমান সূর্য্যালোকাদি যেমন চক্ষুরাদির গ্রাহ্য, এই অন্তরালোক সেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। সমানজাতীয় পদার্থই যে সমান-জাতীয় পদার্থের উপকার করিতে পারে, অন্যে পারে না, এরূপ কোন নিয়ম নাই। সূর্য্য-চন্দ্রাদি ভৌতিক পদার্থ; দেহেন্দ্রিয়াদিও ভূতের পরিণাম হইতে উৎপন্ন,—সুতরাং ভৌতিক। এস্থলে অবশ্য সমান-জাতীয় পদার্থই সমানজাতীয় পদার্থান্তরের উপকারক বা ক্রিয়া-নির্ব্বাহের সহায়ক হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হয়, তাহা নহে। এই দৃষ্টান্তেই সে কথা প্রমাণিত হইতে পারে। সূর্য্যালোক ভৌতিক পদার্থ, ইহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক; কিন্তু ইন্দ্রিয়-শক্তি গুলি প্রত্যক্ষের অযোগ্য। অতএব একান্তভাবে সমানজাতীয় কৈ হইল? অতএব আত্মজ্যোতি, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও সম্পূর্ণ পৃথক্। এই আত্ম-জ্যোতিকে কেহ কেহ দেহেরই ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, আদিত্য যেমন দেহাদিকে প্রকাশিত করিয়াও, দেহাদি হইতে পৃথক্; অতএব দেহাদির প্রকাশক আত্ম-চৈতন্যও দেহাদি হইতে পৃথক;—এ কথাও বলা যায় না। কেন না, অন্যরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও ত দেহাদির প্রকাশক; অথচ চক্ষুরাদি ত দেহ হইতে ভিন্ন নহে। আর যদি ইন্দ্রিয়াদিকে দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়াই ধরা যায়, তথাপি উহারা যে চেতন, তাহা ত সিদ্ধ হয় না। কেন না, সূর্য্যচন্দ্রাদিও ত দেহাদি হইতে পৃথক্; অথচ তাহারা ত চেতন নহে। অতএব আত্ম-চৈতন্য, দেহেরই ধর্ম্ম। তবে যে কখনও দর্শন শ্রবণাদি হয়, কখনও হয় না; দেহের স্বভাবই উহার হেতু। দেহের স্বভাবই এই যে, সর্ব্বদা সকল ক্রিয়া হয় না। এইরূপ যুক্তির বলে কেহ কেহ দেহাতিরিক্ত চৈতন্য স্বীকার করেন না।

কিন্তু মহারাজ! এ সকল যুক্তি নিতান্ত অসার। দেহেন্দ্রিয়াদির প্রকাশক আত্ম-জ্যোতি, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। উহা দেহাদির ধর্ম্ম হইতে পারে না। যদি দর্শনাদি ক্রিয়া দেহেরই হয়; তবে দেখুন্ অন্ধ ত কখনই স্বপ্ন দেখিতে সক্ষম হইত না। যাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল, স্বপ্নে তাহাই ত পুনরায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহ-ব্যতিরিক্ত যদি কোন পৃথক্ দ্রষ্টা না থাকে, তবে যে চক্ষু (দেহ) দ্বারা অন্ধ পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, সেই চক্ষু অস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়ার পর, অন্ধ ত কদাপি স্বপ্নে তাহা দেখিতে পারিত না। কিন্তু অন্ধ ত স্বপ্ন দেখিয়াই থাকে। অতএব দেহাতিরিক্ত দ্রষ্টা নিশ্চয়ই আছে। আবার দেখুন, যিনি কোন বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই ত পরে তাহা স্মরণ করিয়া থাকেন। এস্থলেও দেহাতিরিক্ত দ্রষ্টা প্রমাণিত হইতেছে। কেন না, দেহই যদি দ্রষ্টা হয়,—দেহাতিরিক্ত যদি দ্রষ্টা না থাকে,—তবে দেহাবয়বভূত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ত পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হইতে পারিত না। কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও ত পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং দেহাতিরিক্ত দ্রষ্টা সিদ্ধ হইতেছে। একই আত্মা দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তা। আবার দেখুন, দেহাতিরিক্ত দ্রষ্টা না থাকিলে, মৃত-ব্যক্তিও ত দর্শনাদি করিতে সক্ষম হইত। অতএব দেহে যে বস্তুটী থাকিলে দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়, না থাকিলে হয় না;—তাহাই দেহাতিরিক্ত চৈতন্য,—তাহাই প্রকৃত দ্রষ্টা। এই আত্মজ্যোতি দ্বারাই দেহেন্দ্রিয়া-

দির দর্শনাদি ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়। আবার বুঝিয়া দেখুন, দেহাবয়বভূত পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়গুলিই যদি দর্শনাক্রিয়ার কর্ত্তা হইত; তবে যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই তাহা স্পর্শ করিলেন,—এরূপ ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারিত না। কেন না, একজনের দৃষ্ট ও অনুভূত পদার্থকে, অপরে কিরূপে অনুভব করিবে? অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কেও দ্রষ্টা বলা যায় না। এইরূপ অন্তঃকরণকেও দ্রষ্টা বলা সঙ্গত নহে। কেন না, অন্তঃকরণও চক্ষুরাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়মাত্র। মনও দৃশ্যমাত্র; আত্মার পক্ষে অন্তঃকরণও বিষয় (object) মাত্র, উহা বিষয়ী হইতে পারে না। অতএব প্রমাণিত হইল যে, দ্রষ্টা (subject) বা আত্ম-জ্যোতি,—দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্, সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহা দেহেন্দ্রিয়াদির প্রকাশক ও কার্য্যনির্ব্বাহক।

এই অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্ম-জ্যোতিই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক এবং প্রকাশক। ইহা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ ও অত্যন্ত পৃথক্। এই আত্ম-জ্যোতি দ্বারাই জীবের অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া ক্রিয়া-নির্ব্বাহের যোগ্য হয়। ইহাই আত্মা। বুদ্ধিরূপ উপাধি-যোগে এই আত্মাকেই "বিজ্ঞানময়" নামে লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা বুদ্ধি ও প্রাণ উভয়েরই অন্তস্থ, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রাণ এই উভয় হইতেই ব্যতিরিক্ত। এই আলোকে আলোকিত হইয়া বুদ্ধি,—শব্দ, স্পর্শ, লজ্জা, ভয়াদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানাকারে পরিণত হয় এবং এই আলোকে আলোকিত হইয়াই প্রাণ,—দর্শনাদি ক্রিয়া ও রক্তরসাদির পরিচালন করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধি, আত্মার নিতান্তই সমীপবর্ত্তী বলিয়া, লোকে বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু আত্মা বুদ্ধ্যাদি তাবৎ পদার্থ হইতেই পৃথক্। এই আত্ম-জ্যোতি না থাকিলে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১১। খোকার দপ্তর। শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত। মূল্য ।০। এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। চিত্রগুলি সুন্দর এবং লেখা অতি মিষ্ট।

১২। শ্রীহট্টে মাতৃপূজা। শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ দে প্রণীত, মূল্য ⁄০। এখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, কিন্তু স্বদেশ-প্রীতির অপূর্ব্ব কাহিনী।

১৩। মালিকা। শ্রীঅর্দ্ধেন্দুনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা। এই পুস্তকের প্রথমে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় যে একটু ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা না থাকিলেও কোন দোষ হইত না; কেন না, যে সুন্দর সে আপনিই জগৎকে ভুলাইতে পারে, অন্যের প্রশংসার অপেক্ষা করে না। এই পুস্তকখানি কত সুন্দর, এই কবিতাটী তাহার পরিচয় দিবে।

অয়ি শৈলেন্দ্র-শোভিতা, সাগর-সেবিতা
জননী জনম-ভূমি!
আজি, গত বরষ অন্তে—নব বরষ-প্রান্তে,
কেন বিষাদিতা তুমি?
অনন্তে মিশিছে আজ বর্ষ এক,
মা ব'লে কি কেহ ডাকেনি বারেক,
তাই কি বিষণ্ণা, তাই কি ক্ষুণ্ণা,
অশ্রু রহিছে কপোল চুমি',—
অয়ি শৈলেন্দ্র-শোভিতা, সাগর-সেবিতা,
জননী জনম-ভূমি!
আজি, বিশাল অবনী, করি জয়-ধ্বনি,
উঠিছে উন্নতি-সোপানে,

তবে, অয়ি মা আমার, কেন আজি তুই
বিলুণ্ঠিতা ধূলি-শয়নে?
বীর-কীর্ত্তিময়ী, জ্ঞান-গর্ব্বে-ভরা?—
আজো সে গৌরবে পূর্ণ বসুন্ধরা,
অতীত কাহিনী, মানস-বাহিনী
অশ্রু আনিছে নয়নে,
অয়ি জ্ঞান-গৌরবিণি, নাহি কি গো কেহ
দুঃখ ঘুচা'তে এখনে?
যদি, বরষে বরষ, এইরূপে হবে
বিফল তোর,
তবে হে দীনা জননী, তব দুখ-নিশি
হবে কি ভোর?
আজি বরষের এই প্রথম-প্রভাতে
নবীন উষার কিরণ-সম্পাতে,
স্মরি' তোর স্নেহ, জাগিবে না কেহ
মুছাতে নয়ন-লোর?—
হে মহিমা-ময়ি জ্ঞান-গরীয়সি,
লাঞ্ছিতা জননি মোর!
কভু তোরই মা বিদ্যা, তোরই মা বুদ্ধি,
জগতে দিয়াছে জ্ঞান,
আজি জগতের পদতলে হায়,
তোরি মা হয়েছে স্থান!
তোরি কীর্ত্তিরাশি আজিও স্মরিলে,
গর্ব্বে স্ফীত বক্ষ, আনন্দ উথলে,
পুনঃ কোন্ শুভ দিনে পশিবে শ্রবণে
গত সে বিজয়-গান?—
চির বিষাদিনি, প্রফুল্ল হেরিব
ও মুখ বিষাদ-ম্লান?

১৪। গৃহশিক্ষা। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত, মূল্য ৷৶০। গৃহশিক্ষা সম্বন্ধীয় এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। কথোপকথনে এই পুস্তকের বিষয় সকল সরল ও সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকখানির বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম, কিন্তু সে স্থান নাই। আমরা আশা করি, প্রতি গৃহে এই পুস্তক শোভা পাইবে। পুস্তকখানি রত্নের খনি বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৫। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র বা আত্মতত্ত্ব। ষষ্ঠ সংখ্যা। শ্রীবিশ্ববিন্দুক রায় প্রণীত। সান্যাল এণ্ড কোং দ্বারা ভারত-মিহির-যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে ধারাবাহিক রূপে নানা হিন্দু আচার, রীতি, নীতি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। আচার-রীতি আমাদের মতে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ মাত্র। বহিরঙ্গ-সাধন ধর্ম্মের নিকৃষ্ট অংশ। বাহিরের রীতি-নীতির দিকে লোকের মন যতই আকর্ষিত হয়, গভীর অন্তরঙ্গ-সাধনে ততই অন্তরায় বৃদ্ধি পায়। আমাদের বড় আকাঙ্ক্ষা হয়, বঙ্গভূমি দিনে দিনে বাহ্যিক আড়ম্বরাদির প্রতি দৃষ্টি সংক্ষিপ্ত করিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে ভক্তিযোগের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠুক। সে অন্তরের অন্তরতম সাধনায় সিদ্ধ হইলে, লোকের দেশ কাল পাত্রাপাত্র ভেদাভেদ থাকে না। মানব তন্ময়ত্ব লাভ করে।

সামান্য সামান্য বাহ্যিক আচার রীতি নীতির পার্থক্যই আজ বঙ্গের নবীন উদ্দীপনা-ক্ষেত্রে প্রকৃত জাতীয়-একতার যে কি বিষম অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবেন। আমাদের ভয় হয়, হিন্দু-ধর্ম্ম পুনরুত্থান ব্রতে ব্রতী-সমাজের প্রমত্ত আবেগের ফলে, বুঝিবা এই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনাবশ্যকীয় ধর্ম্মের বাহ্যিক রীতি-নীতি বৃদ্ধি পাইয়া, জাতীয় উদ্দীপনীর দিনে নব নব বিপদ-জাল সৃজন করে। অপরদিকে, হিন্দুধর্ম্মের যে সমস্ত নির্দ্দোষ বিধিব্যবস্থা ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও বহুদিনাবধি দেশের প্রভূত মঙ্গল-সাধন করিয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মগত শৈথিল্যের ভিতরে পড়িয়া, আমরা যদি সে সমস্ত বিস্মৃত হই, আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব মধ্যপথ অবলম্বনীয়।

এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে। আমাদের বিশ্বাস, ইহা অনেকেরই চিত্ত-চরিতার্থতা সম্পাদনে সমর্থ হইবে।

# অথর্ব্ববেদে ব্রাহ্মণী ও গোধন

অথর্ব্ববেদের পঞ্চম কাণ্ডে, "ব্রহ্মজায়াদেবত্য" বিষয়ে একটী সূক্ত, এবং "ব্রহ্মগাভী দেবত্য" বিষয়ে দুইটী সূক্ত আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আপনাদের পত্নী এবং গোধন রক্ষার জন্য যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তৎকালের সামাজিক অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণপত্নীর কথা ১৮টী ঋক্‌যুক্ত সপ্তদশ সূক্তে আছে। প্রথম ঋকে মাতরিশ্বার দোহাই দিয়া, এবং দ্বিতীয় ঋকে ব্রাহ্মণ-পত্নীর প্রতি সোম, বরুণ, মিত্র এবং অগ্নির ব্যবহারের কথা বলিয়া, তৃতীয় ঋকে কথিত হইতেছে;—ব্রাহ্মণ যে রমণীর "হস্ত" ধারণ করিবেন, তিনি ব্রাহ্মণের জায়া বলিয়া সকলে জানিবেন; তাঁহার প্রতি যদি কোন অত্যাচার না হয়, তাহা হইলে রাজন্যের রাজ্য সুরক্ষিত রহিবে; কেহ তাঁহাকে কোন দৌত্যে প্রেরণ করিবেন না। চতুর্থ হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত ঋকে আছে,—যে রাজ্যে ব্রাহ্মণ-পত্নীর অবমাননা হয়, তাঁহার প্রতি দুর্নীতিজনক কার্য্য কৃত হয়, সে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিবে।

অষ্টম এবং নবম ঋকে আছে :—যে রমণী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অন্য দশটী পতিও লাভ করিয়াছিলেন, যখন ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণের জায়া হইলেন। এবং তখন ব্রাহ্মণই কেবল তাঁহার পতি; অন্য কেহ তাঁহার পতি হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণই যে তাঁহার পতি, কিন্তু রাজন্য বা বৈশ্য নহেন, একথা পঞ্চ জনের সকল মানবকে সূর্য্য বলিয়াছেন।

তাহার পর দশম ঋকে একটী নজীর দেখাইয়া, পরবর্ত্তী কয়েকটী ঋকে ব্রাহ্মণপত্নী হরণের কুফলের কথা বলা হইয়াছে;—ব্রাহ্মণ-জায়াকে দেবতারা হরণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, রাজারাও ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, মনুষ্যেরা সকলেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন (১০)। রাজারা ব্রাহ্মণপত্নী প্রত্যর্পণ করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং বিস্তৃত (উরুগায়) পৃথিবী সম্ভোগ করিয়াছিলেন। যিনি ব্রাহ্মণপত্নী ফিরাইয়া না দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখেন, তাঁহার পত্নী বন্ধ্যা হয়; তিনি শয্যায় শত সন্তান-দায়িনী (শতবাহী) সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেন না। তাঁহার পুকুরে যে পদ্ম পর্য্যন্ত ফুটিবে না, এ কথাও ১৬ ঋকে আছে।

সূক্তটীর শেষ ঋক্ বা অষ্টাদশ ঋকে আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীটী না পাইয়া অপহরণকারীর দ্বারে এক রাত্রিকাল দুঃখে অতিবাহিত করেন, তবে ঐ ব্যক্তির দোহা গাই পর্য্যন্ত দুধ দিবে না। এ অভিসম্পাৎ সেকালে খুব কঠিন ছিল।

ব্রহ্মগাভী দেবত্য, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ সূক্তে ত্রিশটী ঋকে কথিত হইয়াছে। ঋকের সংখ্যা দিয়া উহার মধ্য হইতে দশটী ঋকের পরিচয় দিতেছি। প্রথমতঃ অষ্টাদশ সূক্তের, এবং তৎপরে ঊনবিংশ সূক্তের ঋক্‌গুলি প্রদত্ত হইল।

১। হে নৃপতি, ব্রাহ্মণের গোরুটী দেবতারা তোমাদের আহারের জন্য দেন নাই। ব্রাহ্মণের গোরু খাইতে নাই, উহা খাইও না।

২। যে দুষ্ট আত্মসংহারকারী (আত্মপরাজিত) রাজন্য, ব্রাহ্মণের গোরু কাটিয়া

থাইবে, সে আজি জীবিত আছে, কাল থাকিবে না।

১০। বৈতহব্য রাজন্যেরা সংখ্যায় এক হাজার ছিলেন, এবং তাঁহারা সহস্র সহস্র লোকের অধিপতি ছিলেন,তাঁহারাও ব্রাহ্মণের গোরু আহার করিয়া ধ্বংস হইয়াছিলেন। (পরাভূ)।

১২। ঐ অপরাধে একশত এক লোকের জনতা ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

১। সৃঞ্জয় এবং বৈতহব্যেরা বড়ই বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু ভৃগুর গোরু নাশ করিয়া নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

২। যাহারা ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়া তাহার গায়ে থুথু ফেলে, তাহারা রক্ত নদীতে বসিয়া কেশ ভক্ষণ করিবে।

৪। ব্রাহ্মণের গো রন্ধন করিয়া থাইলে, ঐ মাংস শরীরের যতদূর যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তেজ নষ্ট করে, এবং রাজ্য হীনশ্রী হয়। বংশে সন্তান উৎপাদনক্ষম (বৃষণ) বীরপুত্র জন্মে না।

৫। ব্রাহ্মণে গোরু কাটা বড় কঠিন কথা; উহার মাংস (পিশিত) দুষ্পাচ্য। যদি কেহ উহার দুধ (ক্ষীর) থায়, তাহা হইলেও পাপ করে।

১১। নবগুণ নবতি সংখ্যকেরা, ব্রাহ্মণের হানি করিয়া ভূমিকম্পে মরিয়া গিয়াছিল।

১২। হে ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী, যে কূড়ী বৃক্ষের শাখা মৃতের শবে দান করে, তাহা তোমাদের শয্যা বলিয়া দেবতারা বিধান করিয়াছেন।

"কূড়ী"র অর্থ ভাষ্যে বদরী লিখিত আছে। ড এবং ল উচ্চারণের নিয়ম ধরিলে শব্দটী "কূলী" হয়। বাঙ্গলায় কুল্ বটে, কিন্তু উৎকল দেশে ঠিক কূলী শব্দই ব্যবহৃত হয়। কুলের কাঁটা শয়ে দিবার প্রথা এখন কোথাও আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিলে হয়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# স্ত্রী-পুং-ভেদ। (১০)

## উপসংহার।

আমরা সুদীর্ঘ কাল যে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলাম, তাহা হইতে স্ত্রী-পুং-ভেদের মূল কারণ সম্বন্ধে কি জানা গেল? পূর্ব্ব প্রবন্ধ সকলের সার উদ্ধার করত এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিব।

স্ত্রী-পুং-ভেদ চিন্তা করিতে গেলেই সর্ব্ব প্রথমে জীব-কোষের কথা মনে হয় কোষের মধ্যে যে জীব-বস্তু (protoplasm) নিহিত আছে, উহা নানা পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত। ঐ সংযোগ স্বভাবতঃই সর্ব্বদা বিশ্লিষ্ট হইতেছে। জীব-দেহে আহার্য্যবস্তু প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপাদান দ্বারা পুনরায় ঐ বিশ্লিষ্ট পদার্থ প্রস্তুত করিতেছে। বিশ্লেষণকেই ধ্বংসক্রিয়া বলিয়াছি; এবং পুনর্গঠনকে গঠন-ক্রিয়া বলিয়াছি। জীবদেহ এই উভয় ক্রিয়ার আধার। গঠন ক্রিয়াতেই জীব-কোষের পুষ্টি এবং পুষ্টিতেই স্ত্রী-ডিম্বের (ovum) উদ্ভব। আর ধ্বংসক্রিয়া অথবা তদনুরূপ ব্যাপার হইতেই পুংকীটের (spermatozoon) উদ্ভব। "তদনুরূপ ব্যাপার" বলিতে জীবকোষের শীর্ণতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি বোধ করে। জীব-কোষের অন্তর্গত সমস্ত জীববস্তুর স্ত্রী-পুং-ভেদ উৎপন্ন করিবার উপযোগীতা নাই। ঐ জীব-বস্তু

মধ্যে কেন্দ্রবিন্দুটাই এই কার্য্যের অধিকারী। অপর অংশ তাহারই পুষ্টি সাধন করে।

আহারের সদ্ভাবেই জীব-কোষের পুষ্টি। অসদ্ভাবেই দুর্ব্বলতা। সুতরাং স্ত্রী-পুং-ভেদ উৎপাদনে আহারের বিশেষ কার্য্যকারীতা আছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন প্রাণীর ডিম্বাবস্থায় কিম্বা গোলক (larva) অবস্থায় পুষ্টি-জনক আহার দিলে তাহা হইতে অধিক সংখ্যক স্ত্রী-চিহ্নিত প্রাণী উৎপন্ন হয়। আর আহারের অল্পতা হইলে অধিক সংখ্যক পুংচিহ্নিত প্রাণী হয়।

কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে, অচিহ্নিত ডিম্ব অথবা গোলককে কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে স্ত্রী-পুং-ভেদ যুক্ত অপত্যে পরিণত করা যায়। এই বিষয় "অপুং জনন" প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এই সকল হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, কোষের পুষ্টি অথবা গঠনক্রিয়ার অনুকূল ব্যাপারে স্ত্রী-ত্বের উদ্ভব; আর ধ্বংস-ক্রিয়া অথবা তদনুরূপ ব্যাপারে পুংত্বের উদ্ভব।

অচিহ্নিত জীবকোষ যখন ধ্বংস ও গঠন, এতদুভয় ক্রিয়ার তারতম্যে স্ত্রী অথবা পুং-চিহ্নিত হইল, তখন স্ত্রী-ডিম্ব অথবা পুংকীট জীবদেহের সর্ব্বত্রই জন্মিত, এবং দেহাবরণ কাটিয়া পুংকীট বাহির হইয়া স্থিতিশীল স্ত্রী-ডিম্বের সহিত মিলিত হইয়া বংশরক্ষা করিত। এ অবস্থায় উভচিহ্নত্ব (Hermaphroditism) উৎপন্ন হইত। পরে পূর্ব্বোক্ত উভয় ক্রিয়ার তারতম্যেই জীবরাজ্যে এক-চিহ্নিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি উভচিহ্নতা কোন জীবদেহেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রত্যেক জীবদেহই অদ্যাপি অল্পাধিক উভচিহ্নতার পরিচয় দিতেছে। তবে, যে চিহ্ন অধিক প্রস্ফুট, তদনুসারে ঐ জীবকে স্ত্রী অথবা পুংজাতীয় বলা যায়।

প্রথম অবস্থায় স্ত্রী-ডিম্ব অথবা পুংকীট জীবদেহের সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হইত, তাহা বলিয়াছি; এবং ত্বক-ছিদ্র দিয়া পুংকীট* নির্গত হইয়া স্ত্রী-ডিম্বে যুক্ত হইত। কালে ত্বক পুরু ও কঠিন হওয়ায় ঐ পথে বহির্গত হওয়ার অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন পুংকীট দেহের যে কোন অংশে উৎপন্ন হইয়া নিকটস্থ দ্বার দিয়া বাহির হইত। মুখ ছিদ্র অর্থাৎ আহার গ্রহণ-পথেও নির্গত হইত; এবং পায়ু অর্থাৎ পরিত্যক্ত পদার্থের নির্গমন পথেও বাহির হইত। আরও উচ্চশ্রেণীর জীবগণের স্ত্রী-পুং কোষোৎপত্তির স্থান ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল। তখন আর দেহের সর্ব্বস্থান হইতে উৎপন্ন হয় না, কেবল নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভব হয়। স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে প্রথমতঃ পাকস্থলীর নিকটবর্ত্তী আইলবৎ (abdominal ridge) স্থানে উৎপন্ন হইত, এবং তথা হইতে ত্বক্ মুখছিদ্র অথবা পায়ু যোগে নির্গত হইত। ক্রমে নির্গমন পথও নির্দ্দিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। পুংকীটের নির্গমন পথ প্রস্তুতের চেষ্টাতেই বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক স্রাবযন্ত্র নির্ম্মিত হইল। পাকস্থলীর নিকটবর্ত্তী যে আইলে পুংকীট উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহা ক্রমে বিভক্ত এবং ক্ষুদ্র হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জীবদেহে নীচের দিকে নামিতে লাগিল। ঐ আইলের খণ্ডগুলি সংখ্যায় দুইটীতে পরিণত হইল; এবং বৃত্ত, অথবা বৃত্তাভাসের ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হইল। এখন মানবদেহে ঐ আকারেই পুংকীটের

* পুংকীট চঞ্চল, স্ত্রীডিম্ব অলস। সুতরাং পুংকীটই গিয়া স্ত্রীডিম্বে যুক্ত হইত; স্ত্রীডিম্ব স্বীয় কোষ স্থানেই থাকিত।

উদ্ভব-স্থান বর্ত্তমান। পুংকীটের আধারস্থান মানব প্রভৃতির দেহে পাকস্থলীর এত নীচে নামিয়াছে যে, একবারে বাহিরে নির্গত হইয়াছে। কিন্তু হস্তি প্রভৃতির অণ্ড ততদূর নামে নাই; সুতরাং বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই আধারে যে রস সঞ্চিত হয়, তাহাই জীব বস্তুতে পরিণত হয়; এবং তাহা হইতেই পুংকীট গঠিত হয়। ঐ পুংকীট নির্গত হইবার জন্য অণ্ডাধার হইতে যে ক্ষুদ্র নালী বা পথ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার মুখ বাহ্যত্বকে আবৃত।

কথিত আইলের খণ্ড সকল স্ত্রীদেহে উর্দ্ধগামী হইয়াছিল, বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং ক্রমে বহু বিভক্ত হইয়া আভ্যন্তরিক ত্বকের সাহায্যে কোষগুচ্ছ উৎপন্ন করিয়াছে। এই গুচ্ছ সকলই স্ত্রীডিম্বের আধার। এই গুলির মধ্যে যে রস সঞ্চয় হয়, তাহাই জীব-বস্তুতে পরিণত হয়। এবং তাহা হইতেই স্ত্রীডিম্ব গঠিত হয়। স্ত্রী ও পুং চিহ্নিত কোষের সংযোগ জন্য, স্ত্রীডিম্ব-গুচ্ছ ফাটিয়া নির্গত হইয়া ক্রমে নালী বা ক্ষুদ্র পথে আসিয়া একটী আধারে উপস্থিত হয়। সেই আধারকোষেই অথবা নালী মধ্যে উভয়ের সংযোগ হয়। নালী মধ্যে সংযোগ হইলেও কিয়ৎকাল পরে ঐ যুক্ত-কোষ আসিয়া আধারে উপস্থিত হয়। তথায় ঐ যুক্তকোষ অথবা ভ্রূণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তজ্জন্য উহার আয়তন বিস্তৃত। * স্ত্রীডিম্ব-গুচ্ছ হইতে বাহির হইয়া এই জরায়ুতে আসিবার জন্যই নালীপথ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে; অথবা এই নালীপথ (tube) হইলেই এই পথে আসিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। জরায়ু মধ্যে ভ্রূণ বর্দ্ধিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা ডিম্বরূপী। তৎকালে ডিম্ব ফাটিয়া অপত্য নির্গত হওয়া দেহের-বহির্ভাগের ক্রিয়া ছিল। কিন্তু কালে ক্রমে এই ক্রিয়া দেহ মধ্যেই হইতে লাগিল; কারণ জরায়ু মধ্যে অবস্থিতি করা ভ্রূণের পক্ষে সহজ। তখন অপত্য দেহত্যাগ কালে পিতৃ মাতৃ-রূপ-ধারণ করিয়া নির্গত হইতে লাগিল। ভ্রূণের নির্গমন পথ প্রস্তুত করিতেই বাহিক স্ত্রীযন্ত্র উৎপন্ন হইল।

এইরূপে দেখা গেল যে, অচিহ্নিত কোষ প্রধানত পুষ্টি এবং অপুষ্টি বশতঃই স্ত্রীপুংভেদ প্রাপ্ত হইল; আর পুংকোষের নির্গমন-পথ প্রস্তুত চেষ্টায় পুংযন্ত্র; এবং স্ত্রী ডিম্বের ও ভ্রূণের নির্গমন পথ প্রস্তুতের চেষ্টায় স্ত্রী যন্ত্র উৎপন্ন হইল।

আমরা এতক্ষণ অচিহ্নিত কোষের পুষ্টি এবং অপুষ্টির বিষয় বলিতে ধ্বংস ও গঠন ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি। এবং তাহা প্রধানতঃ আহার গ্রহণ কার্য্যের প্রতিই নির্ভর করে, এইরূপ বলিয়াছি। ইহা সত্য। কিন্তু এই বিষয়ে আরও কতিপয় আনুষঙ্গিক কারণেরও কার্য্য লক্ষিত হয়। তাপ, শৈত্য, আর্দ্রতা, শুষ্কতা ইত্যাদি কারণ বশতঃও স্ত্রীপুংভেদের তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু মৌলিক কারণ যে আহারের, অথবা পুষ্টি অপুষ্টির উপর নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুষ্টি অর্থে উত্তেজনা, আর অপুষ্টি অবসাদ। সুতরাং কোন কোন রাসায়নিক বস্তু যোগে উত্তেজনা অথবা অবসাদ উৎপন্ন করিয়া জনন কার্য্য কদাচিৎ সম্পাদন করা যাইতে পারে; সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদুভয় কারণ বশতই কোন কোন জীব-দেহের একাংশ পুংধর্ম্মযুক্ত, অপরাংশ স্ত্রীধর্ম্ম-যুক্ত; কেহ বা * প্রথম বয়সে পুংধর্ম্মযুক্ত, পরিণত বয়সে স্ত্রীধর্ম্মযুক্ত। ঋতুভেদেও এই জন্যই

* উহাই—জরায়ু।

* যথা কতিপয় গ্রন্থীপদ (Arthropods)

স্ত্রীপুংচিহ্নের তারতম্য হইয়া থাকে। দেহের যে অংশে ধ্বংস-ক্রিয়ার আধিক্য, তাহাই পুংভাবাপন্ন; আর যেখানে পোষণ ক্রিয়ার আধিক্য, তাহাই স্ত্রীভাবাপন্ন। বয়স অথবা ঋতুভেদও এইরূপেই কার্য্য করে। আবার কোন কোন জীব এক পুরুষে অচিহ্নিত, পর পুরুষে চিহ্নিত আকার ধারণ করে *। তাহারও মূল কারণ ইহাই। জীবকোষের পুষ্টি এবং অপুষ্টি; উত্তেজনা এবং অবসাদ;— ইহাই অচিহ্নিত অবস্থা হইতে স্ত্রী-পুং-ভেদ চিহ্ন উৎপন্ন করিয়াছে। কালক্রমে এই ভেদ চিহ্ন অপরিবর্ত্তনীয় ও বংশজাত হইয়াছে। তথাপি সময় সময় নপুংসকের উৎপত্তিতে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অচিহ্নিত অবস্থা ঐ উভয় কারণের সাম্যাবস্থা। পরে তাহাদিগের একের আধিক্য বশতঃ ক্রমে একচিহ্নিতা (unisexuality) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অচিহ্নিত অবস্থা হইতে একচিহ্নতায় পরিণত হইতে উভচিহ্নতার মধ্য দিয়া প্রত্যেক জীবের আসিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবকোষস্থ জীব বস্তুর সকল অংশ এই ব্যাপারে লিপ্ত নহে; কেবল কোষের কেন্দ্র-বিন্দুই † এই পরিবর্ত্তনের নিয়ামক। এই জীব-বিন্দু অচিহ্নিত থাকিয়া পরে দ্বি-চিহ্নিত; তৎপর এক-চিহ্নিত হইয়াছে। জগতে জীব বস্তুই চেতন পদার্থ; এবং উহার কেন্দ্র-বিন্দুই জীবকোষের অধিনায়ক। তিনিই কর্ত্তা। তিনি চিরাতীত কাল হইতে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে অবস্থিত। ‡ কেন্দ্র-বিন্দু স্বয়ং এক কৌষিক (unicellular) এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রায় অতীন্দ্রিয়ভাবে অবস্থিত। তিনিই জীববস্তুর অপর অংশ যোগে স্বীয় সত্তা হইতে ক্রমে বিবিধ জীবদেহ উৎপন্ন করিয়াছেন। নিজের দেহরূপ আবরণ নিজেই রচিত করিয়াছেন, এবং তদ্দেহবাসী হইয়াছেন। যাহা অব্যক্ত, তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন; যাহা অচিহ্নিত, তাহাকে ভেদ-যুক্ত করিয়াছেন; এবং এই স্ত্রী-পুংভেদ উৎপন্ন করিয়াই জীব-জগতের বন্ধন রচিত করিয়াছেন। কারণ এই প্রভেদ হইতেই কালক্রমে প্রেম, ভালবাসা, এবং তাহা হইতে অপত্য উৎপন্ন হইয়া স্নেহ, মমতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি দেবোপম বৃত্তি সকল উদ্ভূত হইয়া মানবকে দেবত্বের অধিকারী করিয়াছে। স্ত্রী-পুং-ভেদই জীব-জগৎকে গৌরবান্বিত এবং জীবকে একদিকে যেমন উন্নত, অপর দিকে তেমনই ভববন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে। যিনি নির্লিপ্ত, তিনি স্বেচ্ছায়ই নিবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু স্ত্রী ও পুংরূপ দ্বি-ভাবাপন্ন হইলেও এখনও সম্পূর্ণ পৃথক আকারে পরিণত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখনও উভয়ে উভয়ের অনুরূপই আছে। উভয়েরই এখনও দ্বি-চিহ্নিত (Hermaphrodite) সুতরাং একত্ব লোপ হয় নাই। যিনি এই দ্বি-মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া ভববন্ধন রচিত করিয়াছেন, তিনি এক; সুতরাং দ্বিভাবেও একত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। এ বন্ধন এক দিকে যেমন কেন্দ্রবিন্দুর অবরোধ, অপরদিকে এই পথ দিয়াই কেন্দ্র-বিন্দুর দেহমুক্তি। ইহা আমি অন্যত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আর ইহাই সেই অপরিবর্ত্তনীয় এক অতীন্দ্রিয়ের ব্রহ্মাণ্ডলীলা এবং ইহাই তাহার সফলতা।

* Alternate generation.
† Nucleus অথবা Nucleolus
‡ ভারতী ১৩১২। পৃষ্ঠা ৬৫১—৬৫২।

## এই প্রবন্ধের ব্যবহৃত পরিভাষা।

অচিহ্নিত ··· asexual

অনির্দ্দিষ্টরূপ ··· Amœboid.

অন্যোন্যজনন ··· Alternate generation
অপুংজনন ... Parthenogenesis
অস্থায়ীকর ··· Pseudopodia
আইল ··· Ridge
আঁশ ··· Cilia
এককোষিক ... Unicellular
একচিহ্নিত ... Unisexual
কোষ ··· Cell
কোষগুচ্ছ ··· Cluster of cells
গঠন-ক্রিয়া, স্থিতিশক্তি ··· Anabolism
গুগ্‌লি ... Oyster
গূঢ় ··· Potential
গ্রন্থীপদ ··· Arthropod
ঘূর্ণ-কীট ··· Rotifera
চিহ্নিত ··· Sexual
জীববস্তু ··· Protoplasm
ডিম্বাধার ·· Ovary
দ্বি-চিহ্নিত, উভয়চিহ্নিত } Bisexual
উভ-চিহ্নিত } Hermaphrodite
নালী ··· Tube
পশু-পালক ··· Breeder
পুংকীট ... Spermatozoon
প্রণালী ··· Duct
বহিরাবরণ-যুক্ত ... Encysted
বহু কৌষিক ... Multicellular
বহুপদ ··· Myriopod
বংশরক্ষক-কোষ ··· Reproductive cell
বিন্দু, কেন্দ্রবিন্দু ··· Nucleus, Nucleolus
বিভাগ-শক্তি, ধ্বংস-ক্রিয়া } Katabolism
ব্যক্ত ··· Kinetic
ভ্রূণ-তত্ত্ব ··· Embriology
স্ত্রী-বীজ, স্ত্রী-ডিম্ব, বুত্ত } ··· Ovum
সংযোগ ··· Conjugation.

শ্রীশশধর রায়।

# ক্রমবিকাশ। (২)

## (২) সংহত সৃষ্টি।

প্রথম জীবন-তরঙ্গ প্রভাবে বিশ্বের উপকরণ সৃষ্ট হইয়াছে এবং জীব সকলের বিভিন্ন আকৃতি গঠিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন আকৃতির মধ্য দিয়া জীবাত্মা ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া অবশেষে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ ধারাকে ক্রমবিকাশ বলা হয়। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লিখিত যে,—

"স্থাবরে লক্ষ বিংশত্যো জলজং নবলক্ষকম্।
কৃমিজং রুদ্রলক্ষং পক্ষিজং দশলক্ষকম্।
পশ্বাদীনাং লক্ষত্রিংশ চতুর্লক্ষং বানরে।
ততোহপি মানুষা জাতাঃ কুৎসিতাদিদ্বিলক্ষকম্।

স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, জলজ অর্থাৎ মৎস্য মকরাদি যোনিতে নবলক্ষ, কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষি যোনিতে দশ লক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্লক্ষ, এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ জন্মের পর মনুষ্য জন্ম হয়। ক্রমে জীব উত্তম হইতে উত্তমতর জন্মলাভ করে। কল্পকল্পান্তর ধরিয়া জীবের যে প্রকার ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইল। প্রথমতঃ স্থাবর যোনি, তৎপরে মৎস্য-মকর যোনি, তৎপরে কৃমি এবং কীট পতঙ্গ যোনি, তৎপরে পক্ষি-যোনি, তৎপরে পশু যোনি, তৎপরে বানর

যোনি এবং অবশেষে মনুষ্য যোনিতে জীব জন্ম গ্রহণ করে। এই প্রকার চতুরশীতি লক্ষ জন্ম গ্রহণ করিতে কত যুগ কাটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর জীব, ক্রমবিকাশ ফলে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

## (ক) উদ্ভিদ সৃষ্টি।

পূর্ব্বে আমরা যে সকল সৃষ্টির আলোচনা করিয়াছি, তাহাদিগকে শাস্ত্র "অবুদ্ধি পূর্ব্বকঃ সম্ভূতঃ" * বলিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে "অবুদ্ধিরবিদ্যাখ্য প্রকৃতিস্তৎপূর্ব্বকঃ সংভূতঃ" অর্থাৎ ইহারা অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি সম্ভূত। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ সৃষ্টি ছিল, ব্রহ্মা তাহা চিন্তা করিলে, অবুদ্ধি পূর্ব্বক তমোময় সর্গ প্রাদুর্ভূত হইল। অর্থাৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল। ভাগবত পুরাণ এই পঞ্চ অবিদ্যাকে প্রাকৃত উপাদানের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। প্রাকৃত উপাদান সকল বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব শরীর রচনা করে এবং প্রাকৃত দেব সকল জীবের ইন্দ্রিয় বৃত্তির অধিনায়ক হয়।

ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করায় তিন প্রকার বৈকৃত সৃষ্টি উৎপন্ন হইল। যথা,—(১) উদ্ধ্বস্রোতঃ, (২) তির্য্যক স্রোতঃ এবং (৩) অর্ব্বাক্ স্রোত। বিষ্ণুপুরাণের মতে তির্য্যক স্রোতের পর সাত্তিক উর্দ্ধবাকী উর্দ্ধস্রোত উৎপন্ন হইয়াছিল।

যাহাদের আহার উর্দ্ধে সঞ্চালিত হয়, তাহাদিগকে উদ্ধ্বস্রোতঃ বলে। এই সৃষ্টির নাম স্থাবর বা নগ সৃষ্টি। ভাগবত ইহাদিগকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—(১) বনস্পতি, (২) ঔষধি, (৩) লতা, (৪) ত্বক্সার, (৫) বীরুধ এবং (৬) দ্রুম। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে, পুষ্প বিনা যাহাদের ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে, ফল পক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যাহারা জীবিত থাকে, তাহাদিগকে ওষধি বলে, যাহারা আরোহণের অপেক্ষা রাখে, তাহাদিগকে লতা বলে, বেণু প্রভৃতিকে ত্বক্সার বলে, যাহারা লতার ন্যায়, অথচ কঠিন বিষয়ে আরোহণের অপেক্ষা রাখে না, তাহাদিগকে বীরুধ বলে, এবং পুষ্প হইতে যাহার ফল হয়, তাহাকে দ্রুম বলে। বিষ্ণুপুরাণ * কিন্তু এই সর্গকে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—"বৃক্ষগুল্মলতাবীরুৎসমস্তাস্তৃণজাতয়ঃ," —অর্থাৎ (১) বৃক্ষ, (২) গুল্ম ও গুচ্ছ, (৩) লতান বা লতা। (৪) বল্লী বা ভূমিলতা এবং (৫) তৃণ ও ওষধি। (গুচ্ছ—মল্লিকাদি, গুল্ম—বংশাদি, প্রতান—অলাবু কুষ্মাণ্ডাদি এবং বল্লী—গুড়ুচ্যাদি)। মনু ‡ বলিয়াছেন যে, সমুদয় উদ্ভিদই স্থাবর। তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে ও কতকগুলি রোপিত শাখা হইতে উৎপন্ন হয়; যাহারা বহু পুষ্প-ফলযুক্ত হইয়া থাকে ও ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে; যথা ধান্য, যব প্রভৃতি। যাহারা পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে; এবং পুষ্পিতই হউক বা কেবল ফলবান্ই হউক, উভয় প্রকারকেই বৃক্ষ বলা যায়। গুচ্ছ ও গুল্ম নানা প্রকারের আছে; তৃণ জাতিও বিবিধ প্রকার; বিবিধ প্রকার প্রতান ও বল্লী আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, কেহ বা কাণ্ড হইতে জন্মে। স্থাবর সৃষ্টি সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

* বিষ্ণুপুরাণ ১—৫—২০। দেবী ভাগবত—৭—৩২—২৩ দ্রষ্টব্য।

* ১—৫—৬, শ্রীধর টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ মনুসংহিতা ১—৪৬,৪৭,৪৮।

(১) "পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গোধ্যায়তোহপ্রতিবোধবান্।
বহিরন্তোহপ্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ।"

বিষ্ণুপুরাণ, ১।৫।৬

অর্থাৎ ব্রহ্মার যত্ন দ্বারা এই যে স্থাবর সৃষ্টি হইল, ইহা চিন্তাশক্তিশূন্য,বাহ্য ও অন্তরে অপ্রকাশ, আত্মজ্ঞান বিহীন এবং জড়াত্মক।

(২) "তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্ম হেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা।"

মনু—১—৪৯

বহুবিধ কর্ম্মফলে ইহারা তমোগুণে আচ্ছন্ন, ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং ইহারা সুখ দুঃখও অনুভব করে।

(৩) "তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ।"

ভাগবত—৩—১০—২০

অর্থাৎ ইহারা অব্যক্ত চৈতন্য; ইহাদের কেবল অন্তরে স্পর্শজ্ঞান আছে এবং অব্যবস্থিত পরিণামাদি ভেদে ইহাদের বিবিধ ভেদ হইয়া থাকে।

(৪) "বহিরন্তশ্চাপ্রকাশঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গ এবচ।"

কূর্ম্ম—পূর্ব্ব—৭—৪

অর্থাৎ ইহারা বহিঃ ও অভ্যন্তরে অপ্রকাশ, শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ।

(৫) মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, —বৃক্ষ লতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফল পুষ্পোদ্গম হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সমুদায় ম্লান ও বিকীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফল পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন নিশ্চয় বোধ করিতে হইবে যে,উহাদের শ্রবণ শক্তি আছে। দর্শনহীন ব্যক্তি কখন পথ চলিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতা সমুদয় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাতে বেষ্টন ও ইতস্তত গমন করে, তখন উহাদের দর্শন শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষ লতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইয়াছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূল দ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখ দ্বারা উৎপল নাল গ্রহণ করিয়া জলশোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবন সহযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করে। এইরূপে যখন উহাদিগকে সুখ দুঃখ সংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্য বিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। শান্তিপর্ব্ব, ১৮৪ অধ্যায়।

সুতরাং আমরা স্থাবর সম্বন্ধে অবগত হইলাম যে,ইহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়,প্রাণ এবং সুখ দুঃখ বোধ আছে। ইহারা চিন্তাশক্তিশূন্য,আত্মজ্ঞান (self-unconciousness) বিহীন, ইহাদের অন্তরে চৈতন্য (conciousness)আছে।

এই সৃষ্টির নাম মুখ্য-সর্গ। ইহা পশ্বাদি, মানব ও দেবাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে হইয়াছিল।

ব্রহ্মার এই সৃষ্টিতে পৃথিবী বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাদিতে ঘোর অরণ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু ব্রহ্মা যখন এই সৃষ্টিকে * "অসাধক" অর্থাৎ পুরুষার্থহীন বলিয়া অবগত হইলেন, তখন অন্য প্রকার সৃষ্টি করিলেন।

### খ। তির্য্যক যোনি।

এই সৃষ্টির নাম তৈর্য্যক-স্রোত। ইহারা আহার করিলে ভক্ষিত দ্রব্য বক্রপথে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা,—

১ম। স্থলচর ;—

(ক) দ্বিশফ (অর্থাৎ দুইটী ক্ষুর বিশিষ্ট)। যেমন ;—

(১) গো, (২) ছাগ, (৩) মহিষ, (৪) কৃষ্ণসার, (৫) শূকর, (৬) গবয়, (৭) রুরু, (মৃগ-বিশেষ) (৮) মেষ, (৯) উষ্ট্র।

(খ) একশফ (অর্থাৎ একক্ষুর বিশিষ্ট)। যেমন ;—

(১০) গর্দ্দভ, (১১) অশ্ব, (১২) অশ্বতর, (১৩) গৌর, (১৪) শরভ ও (১৫) চমরী।

(গ) পঞ্চনখ। যেমন ;—

(১৬) কুক্কুর, (১৭) শৃগাল, (১৮) বৃক, (১৯) ব্যাঘ্র, (২০) বিড়াল, (২১) শশক, (২২) শল্লক, (২৩) সিংহ, (২৪) বানর, (২৫) হস্তী, (২৬) কচ্ছপ ও (২৭) গোধা।

২য়। (২৮) জলচর ও পক্ষী। যেমন মকরাদি জলচর এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জন্তু খেচর। কীট পতঙ্গাদিও খেচরের মধ্যে অন্তর্গত।

এই সৃষ্টি সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"পশ্চাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমঃ প্রায়াহ্যবেদিনঃ।
উৎপথগ্রাহিণশ্চৈব তেঽজ্ঞানে জ্ঞান মানিনঃ॥
অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টাবিংশদ্বধাত্মকাঃ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্ব্বে আবৃতাশ্চ পরস্পরম্।"
বিষ্ণুপুরাণ, ৫, ৮—১০।

অর্থাৎ ইহারা সকলে তমঃপ্রায়, অবেদী অর্থাৎ অনুসন্ধানশূন্য, উৎপথগ্রাহী অজ্ঞানে জ্ঞানশালী, অহঙ্কৃত, অহম্মান, অষ্টাবিংশ-বিধাত্মক, অন্তঃপ্রকাশ এবং পরস্পর আবৃত।

(২) "অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ।"
(ভাগবত—৩—১০—২১)

অর্থাৎ, ইহারা ভবিষ্যৎ জ্ঞান শূন্য, বহুল তমোগুণ বিশিষ্ট, দীর্ঘ সন্ধান-শূন্য এবং কেবল আহারাদি কার্য্যে তৎপর। ইহারা কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বাক্য হইতে আমরা অবগত হইলাম যে, ইহারা অনুসন্ধানশূন্য, ভবিষ্যৎ জ্ঞান শূন্য, দীর্ঘ সন্ধানশূন্য, অজ্ঞানে জ্ঞানশালী।

এই সৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন না। উহাদিগকে অসাধক বিবেচনা করিয়া তিনি অন্য সৃষ্টির ধ্যান করিলেন।

### গ। বৈকারিক দেবসৃষ্টি।

এই সৃষ্টির নাম বৈকারিক দেবসৃষ্টি। এই সৃষ্টি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহারা উর্দ্ধবাসী উদ্ধস্রোতঃ সাত্ত্বিক সৃষ্টি। ইহারা সুখপ্রীতিবহুল, বহিরন্তঃ অনাবৃত অতএব বহিরন্তঃ প্রকাশ। এই সর্গ তুষ্টাত্মা ব্রহ্মার তৃতীয় দেবসর্গ নামে খ্যাত ; এই সর্গ নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মার প্রীতি হইয়াছিল। এই সৃষ্টি আট প্রকার যথা ;—(১) দেব, (২) পিতৃগণ, (৩) অসুর, (৪) গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, (৫) যক্ষ, রাক্ষস, (৬) সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, (৭) ভূত, প্রেত, পিশাচ,(৮) কিন্নর, কিম্পুরুষ,ইত্যাদি।

প্রাকৃত সৃষ্টির আলোচনার সময় আমরা যে দশটী বৈকারিক অধিদেবতার কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহাদিগকে বৈদিক দেবতাও বলা হয়। কার্য্য-সৃষ্টি অর্থাৎ মনুষ্যাদি জীবসৃষ্টির

* (বিষ্ণুপুরাণ, ১—৫)

পূর্ব্বে উঁহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এখন আমরা যে সকল দেব সৃষ্টির কথা বলিলাম, উঁহারা বৈকৃত দেব-সৃষ্টি। ইঁহারা প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহেন। ইঁহারা দেবযোনি নামে খ্যাত। প্রাকৃত দেব অপেক্ষা এই সকল দেব ন্যূনশক্তি সম্পন্ন, এইজন্য ইহাদিগকে বিকৃত দেব বলা যায়। কিন্তু দেবতা বলিয়া ইহাদিগকে ভাগবত, প্রাকৃতদেব সৃষ্টির অন্তর্গত করিয়াছেন।

পঞ্চভূতের পাঁচটী অধীশ্বরের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ এবং কুবের যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতির অধীশ্বর। প্রকৃতির এই পঞ্চ বিভাগের পঞ্চ অধীশ্বরকে দেবরাজ বলা হয়। ইন্দ্রদেবতা উক্ত সকল দেবতার প্রধান। এই সকল দেবতার অধীনে আরও অন্যান্য অসংখ্য দেবতা আছেন। যথা, সাধ্যায়, বসু, আদিত্য এবং অপ্সরা, ইন্দ্রের সহিত; মরুৎ বায়ুর সহিত; যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর এবং কিন্নর কুবেরের সহিত বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছেন। এই সকল দেবতাদের মধ্যে কাহার কাহারও জান্তব রাজত্বের উপর আধিপত্য আছে, যেমন নাগ সকল সর্পের উপর, সুপর্ণ সকল পক্ষীর উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইন্দ্র, যম, বরুণ এবং কুবের পৃথিবীর চতুর্দ্দিক শাসন করিয়া মনুষ্যকে রক্ষা করিতেছেন।

এই সকল দেবতারা প্রকৃতিকে সাহায্য করিয়া জীব সকলকে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অসুরদের প্রকৃতি ঠিক ইহার বিপরীত। প্রকৃতির ধ্বংসকারী শক্তি সমূহকে তাঁহারা চালনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ক্রমবিকাশকে বাধা দিয়া থাকেন। তাঁহারা তমোগুণ প্রবল বলিয়া বাধা (resistance) প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাধা (resistance) প্রদান করেন বলিয়া বিশ্বের উন্নতি স্থির (steady) এবং স্থায়ী (durable) হইয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টির জন্য দেবতাদের ন্যায় তাঁহাদেরও প্রয়োজন আছে।

ব্যাসদেব দেবযোনি সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই ত্রিলোকীর মধ্যে জীব ও জন্তুগণের যেমন ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে এবং তাহারা যেমন এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ দেবগণেরও ভূরাদি সপ্তলোকের মধ্যে ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। সপ্ত লোকের মধ্যে যে লোকে দেবতাগণ যে নামে অভিহিত হন এবং যে লোকে তাঁহাদের যেরূপ স্বভাব ও শক্তি হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভূলোক এবং পাতালে দেবজাতীয় ও অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিংপুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মারক, অপ্সর, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড ও বিনায়কগণ বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে দেবতা ও মনুষ্য পুণ্যফলে যথাক্রমে দেবতা ও মানবজন্ম লাভ করিয়াছে। সুমেরু পর্ব্বত দেবগণের বিহারস্থান; তাঁহাদিগের সভার নাম সুধর্ম্মা, তাঁহাদিগের পুরের নাম সুদর্শন, প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত। ভুবর্লোকের অপর নাম অন্তরিক্ষ লোক; এখানে জ্যোতিঃবিশিষ্ট গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণ অবস্থিত। স্বর্লোকের অপর নাম মহেন্দ্র লোক। তথায় ছয় প্রকার দেবতা বাস করেন, যথা—ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী ও পরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী। ইহারা সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ, অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে উপভোগ করিতে সক্ষম, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য

যুক্ত, কল্প পরিমাণ ইহাদিগের আয়ুঃ কাল। ইহারা ঔপাধিক দেহ অর্থাৎ পিতামাতার শুক্র শোণিত ব্যতিরেকে উৎকট পুণ্যফলে দিব্য-শরীরধারী। মহর্লোকের অপর নাম প্রাজাপত্য লোক। তথায় কুমুদ, ঋভব, প্রতর্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ, এই পাঁচ প্রকার দেবজাতিবিশেষ বাস করেন। মহাভূত সকল ইহাদের বশীভূত অর্থাৎ ইহাদের অভিলাষ অনুসারে মহাভূতের পরিণাম হয়। ইহারা ধ্যানাহারী, ধ্যানমাত্রেই পরিতৃপ্ত, কল্পসহস্র ইহাদের আয়ুঃ। জন, তপঃ ও সত্যলোককে ব্রাহ্মলোক বলা হয়। জনলোকে চারিপ্রকার দেবজাতি বাস করে। ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর, ইহারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের প্রভু। পূর্ব্বোক্ত দেবগণ কেবল ক্ষিত্যাদিভূতের পরিচালক কিন্তু ইহারা ভূত ও ইন্দ্রিয় উভয়ের নিয়ামক। তপঃলোকে অভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর নামে ত্রিবিধ দেবজাতির বাস; ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি ইহাদের অধীন, ইহাদের ইচ্ছামত প্রকৃতিরও পরিণাম হয়। ইহারা যথোত্তর দ্বিগুণ আয়ুঃ। ইহারা সকলে ধ্যানমাত্রেই পরিতৃপ্ত, ঊর্দ্ধ অর্থাৎ সত্য লোকেও ইহাদের জ্ঞানের অবিষয় নাই। সমস্ত লোকে ইহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত। সত্যলোকে চারি প্রকার দেবতার বাস। অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহাদের গৃহবিন্যাস নাই, সুতরাং স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিজেই নিজের আশ্রয়। অচ্যুত দেবগণের উপর শুদ্ধনিবাস দেবগণের বাসস্থান, এইরূপে যথোত্তর ঊর্দ্ধে উহাদের বাসস্থান। ইহারা সকলেই প্রধান চালনায় সমর্থ, ইহাদের আয়ুঃকাল সৃষ্টিকালের সমান; সৃষ্টির বিনাশে অর্থাৎ মহা প্রলয়ের সময় ইহাদের নাশ হয়। অচ্যুতগণ সবিতর্ক ধ্যানে সুখী ও সংজ্ঞা সংজ্ঞিগণ অস্মিতামাত্র ধ্যানে নিরত। এই সপ্তলোক মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার মধ্যে এই সকল ভুবন অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, ধারণার অতীত অতি বৃহৎ সেই ব্রহ্মাণ্ডও প্রকৃতির একটী ক্ষুদ্র অবয়ব মাত্র। যেমন আকাশে খদ্যোত অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত।

পূর্ব্বে যে সকল প্রাকৃত দেবতাগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তাহাদের সাহায্যের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়ব্যাপার সম্পাদিত হয়। তাহারা ব্যক্তিগত দেবতা বিশেষ নহে, তাহাদিগকে বৈকারিক বা অধিদেবতা বলা হয়। সপ্তলোকবাসী দেবতাগণ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা আমাদের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সপ্তলোকবাসী দেবতাগণের মধ্যে এখন অনেক দেবতা আছেন, যাহাদের সহিত ত্রিলোকবাসী জীবগণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। এমন অনেক দেবতা আছেন, যাহাদের উপর মনুষ্যগণ অলৌকিক শক্তি প্রভাবে প্রভুত্বলাভ করিতে পারে, কিম্বা কর্ম্মবলে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে। শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, এই সকল দেবতার ভিতর কেহ কেহ মনুষ্যের পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। তাহারা মনুষ্যদিগকে আপনার সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করে। তাহারা চায় না যে, মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করুক। তাঁহারা যখন সন্তুষ্ট হন, তখন মনুষ্যদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করেন। তাঁহারা মনুষ্যদিগকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন যে, সেই বুদ্ধির দ্বারা মনুষ্যগণ ইষ্টলাভ করিতে পারে। এই সকল দেবতাগণ ক্রমবিকাশের সোপানে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

মনুষ্য যে কালক্রমে ক্রমবিকাশের সোপানে আরোহণ করিয়া দেবত্বপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সকল দেবতা ভিন্ন শাস্ত্রে মহর্ষি ও কুমার সৃষ্টির কথা উল্লেখ আছে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ—ইহাঁরা মহর্ষি নামে খ্যাত। ইহাঁদিগকে শাস্ত্র অমানব ( super-human) পুরুষ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ইহাঁরা অতীত কল্পে মোক্ষ লাভ করিয়া এই কল্পে সৃষ্টি প্রকরণের সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রলয় পর্য্যন্ত পৃথিব্যাদি লোকের ভাগ্য পরিচালিত করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মধ্যে, কোন কোন শাস্ত্রে সাতটীকে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং প্রচেতা, ভৃগু ও নারদকে ত্যাগ করা হইয়াছে। এবং কোন কোন শাস্ত্রে দক্ষ ও কর্দমকে ইহাদের সহিত গণনা করা হইয়াছে।

যাহাদিগকে প্রাকৃত কিম্বা বিকৃত সৃষ্টি বলা চলে না, এমন উভয়াত্মক সৃষ্টিকে কুমার সৃষ্টি বলে। সনৎকুমারাদি ঋষিগণ এই সৃষ্টির অন্তর্গত। ইহাঁরা দেবতাদিগের ন্যায় অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বদেহের ভিতর যাইতে পারেন। ইহাঁরা মৃত্যুসীমার বহির্ভূত। ইহাঁদের শক্তিবলে আমরা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারি। সনৎ আদি কুমারগণ এক কল্প হইতে অন্য কল্প পর্য্যন্ত সৃষ্টির অনুসরণ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

# সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। (১)

## উপক্রমণিকা।

সংস্কৃত সাহিত্য অতি বিস্তৃত। গ্রীক্ এবং লাটিন, এই উভয় ভাষার যাবতীয় সাহিত্য একত্র করিলেও সংখ্যায় উহা সংস্কৃতের সমকক্ষ হইতে পারে না। ইংরাজী ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে,তাহাতে প্রায় ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার বিভিন্ন-নামা হস্ত-লিখিত পুথির নাম-নির্দ্দেশ আছে। ইহা ব্যতীত ঐ সময় পর্য্যন্ত আরও বহু সহস্র গ্রন্থের আবিষ্কার হইয়াছে। পৃথক পৃথক বিষয়ে এত অধিক গ্রন্থ পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় লিখিত হয় নাই। ঐতিহাসিক চর্চ্চার প্রভাবে আমরা বুঝিতেছি যে, শুধু ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সমূহেই যে সংস্কৃত সাহিত্য আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, তিব্বত, চীন, জাপান, মধ্য আসিয়া, মঙ্গোলিয়া, এমন কি, সুপরিস্ফুট জ্ঞানালোকবর্জ্জিত সুদূর পূর্ব্ব উপদ্বীপ ( ইন্দো-চাইনিজ-পেনিন্সুলা ) পর্য্যন্তও একদিন সনাতন সংস্কৃত ভাষা আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। ঐ সমুদয় দেশে যে এক সময়ে সংস্কৃত ভাষায় বহুবিধ গ্রন্থ অধীত হইত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা ফলে, তাহা জ্ঞাত হইয়া আমরা যে শুধু স্তম্ভিত হইয়াছি, তাহা নহে, সংস্কৃত ভাষার বিরাট প্রসার দর্শনে বিস্মিতও হইয়াছি।

বিশেষ যত্নসহকারে এবং সতর্কতার সহিত এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক। কেননা—হিন্দুধর্ম্ম, মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং দিগম্বর মতাবলম্বী জৈনধর্ম্ম, পৃথিবীর

এই ত্রিবিধ বৃহৎ ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ এই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাদের মধ্যে, ঐতিহাসিকগণের মতে, হিন্দুদিগের বেদ, নেহাত কম হইলেও, ৩।৪০০ কি ৫০০০ বৎসরেরও প্রাচীন। এতদপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ এসিয়ার অসংখ্য অধিবাসীর ধর্ম্মের মূল। যদি গ্রন্থের প্রাচীনতা এবং লোকের উপর, বিপুল জনবাহিনীর উপর, উহার প্রভাব দেখিয়া বিচার করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যে, সংস্কৃত ভাষার আলোচনা অতীব প্রয়োজনীয়।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃতে লিখিত ও সংস্কৃতে ব্যাখ্যাত বলিয়াই যে শুধু সংস্কৃতের আদর এত অধিক, তাহা নহে। ভারতের বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা Art, অর্থাৎ কাব্য, নাটক, উপকথা, দর্শন, ইতিহাস, রীতিনীতি, আইন কানুন প্রভৃতি সমস্তই সংস্কৃতে বিরচিত। এই সমুদয় বিভিন্ন বিষয়ে ভারত-সাহিত্য একদিন, জগতের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ভারতের বিজ্ঞান শুধু পর্য্যবেক্ষণ (observation) দ্বারাই অনুশীলিত হইত। এখনকার ন্যায়, হাতে কলমে পরীক্ষা প্রণালী (experiment) প্রাচীন ভারতে ছিল না। তবে মুসলমান রাজত্বের প্রথমাবস্থায় যন্ত্রাদির সাহায্যে বিজ্ঞান আলোচনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ যে কত পূর্ব্বে, কখন এই দেশব্যাপী 'পসার' জমাইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, বহু অনুসন্ধান করিয়াও এখন পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারেন নাই। পণ্ডিচারীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার কর্ডিয়ার, বহু পরিশ্রমে, এ যাবৎ আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে প্রায় ৪০০ চারি শত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের সন্ধান করিয়াছেন। ভারতের আয়ুর্ব্বেদ বর্ত্তমানে ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ আলোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) যে কতদূর সমুন্নত হইয়াছিল, তাহা আমাদের পরম গৌরবভাজন বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় তদীয় রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভারতের অঙ্কবিদ্যা, যদিও বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য দেশের নানাবিধ আবিষ্কারের দ্বারা হীনপ্রভ হইয়াছে, কিন্তু তখন—সেই তত পূর্ব্বেও এই বিদ্যা ভারতবর্ষে যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। জ্যোতিষ বিষয়ে ভারতীয় মনীষিগণ প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার ক্রমশ উন্নতি বিধান করিতেছিলেন। 'বৃহৎ সংহিতা' এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণ, অনেক রকম জড় বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। কেবল দর্শন বা পর্য্যবেক্ষণ বলে, (observation) যতদূর অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাঁহারা তাহা হইয়াছিলেন। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহারা বড় বড় সিদ্ধান্তের অবতারণাও করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের কলা-বিদ্যা (Fine-Arts) ৬৪ ভাগে বিভক্ত, এবং ইহাদের প্রত্যেক ভাগেরই স্ব স্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহুবিধ গ্রন্থ আছে। নর্ত্তন, অভিনয়, বিদ্রূপ বা ভাঁড়ামো, অভিনয়ের সাজ সজ্জা নির্ম্মাণ, সাজঘর ও অভিনয় মঞ্চ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুবিধ গ্রন্থের আবিষ্কার হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্র ও চৌরশাস্ত্র বিষয়ক অনেক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এ সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। যদিও

উপরিলিখিত বিষয় সমূহে সংস্কৃত সাহিত্য যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ভারতের প্রকৃত গৌরবের কারণ ভারতের সেই দর্শন শাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র এবং ভাষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি। ভাষার কতদূর উন্নতি হইলে যে, ঐ সমুদয় কঠিন কঠিন বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ভাড়ামো মাকরামো প্রভৃতি 'খুটিনাটি' পর্য্যন্ত উহাতে লিখিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সংস্কৃত ভাষার এই সুবিস্তৃত গ্রন্থাবলীর কিয়দংশ মাত্র ভারতের এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের সুপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। অধিকাংশ এখনও অমুদ্রিত। পৃথিবীতে অপরাপর যত প্রাচীন ভাষা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা সংস্কৃতের প্রতি, বর্ত্তমানের পণ্ডিতগণের অনুসন্ধিৎসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, কেন না—আদিম আর্য্য জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হইলে, ভারতের প্রাচীন কালের জাতি, ধর্ম্ম, এবং সম্প্রদায়গত বিশেষ বিবরণ যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রাচীন ভারতের জাতীয় ভাষা সংস্কৃত বই গত্যন্তর নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যেক শাখার অর্থাৎ—বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, কল্পসূত্র, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র, কাব্য-নাটক, অলঙ্কার, কলাবিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়েরই প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত বিষয় সমূহের প্রত্যেকের সম্যক্ অনুশীলন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এমন একখানি পুস্তকের প্রয়োজন, যাহাতে ঐ সমুদয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং ঐ সকল শাস্ত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কেন না, তাদৃশ বিশ্বতোমুখ অভিধানের (Encylopedia) সাহায্য ব্যতীত, কোন ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন [illegible] পাত্রাছ-সারে—উক্ত কঠিন বিষয় বিশেষের আমূল আলোচনা অতীব দুরূহ। যদিও পরলোকগত, পরম বিদ্যোৎসাহী রাজা, স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি—এই দুই মহাত্মা সংস্কৃত ভাষায় দুই অতি বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ ঐ পুস্তকের দ্বারা কথিত অভাবের সম্পূর্ণ অপনোদন হয় নাই। কেন না, ভারতের প্রত্ন তত্ত্বের কোন কথাই তাহাতে নাই। আর সুবিপুল বৌদ্ধ এবং জৈন শাস্ত্র, তাহাত, এক প্রকার, উপেক্ষিতই হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক শাস্ত্রেরই যে জন্ম-বৃদ্ধি-অপচয় আছে, এ কথা আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ, একরূপ, অস্বীকারই করিতেন। কাজেই তাঁহাদের সঙ্কলিত গ্রন্থে ঐতিহাসিক ভাব (historic sense) দুর্লভ। অথচ আজ কালকার দিনে, কোনও বিষয় পড়িতে হইলে, অগ্রেই তাহার ইতিহাস জানা আবশ্যক; এ মত এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। এই আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষা-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিবার জন্য—সংস্কৃত ভাষা-বিষয়ক প্রত্নতত্ত্বের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, ইউরোপের ষ্ট্রাস্‌বর্গ নামক নগরে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রায় ৩০ জন বিশেষজ্ঞ Expert পণ্ডিত এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছেন। 'ভিয়েনার' বিখ্যাত অধ্যাপক 'বিউলার' ঐ গুরুতর কার্য্যের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার অভাব হওয়ায়, পণ্ডিত 'কিল্‌হরণ' ঐ কার্য্যের সম্পাদকতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে উক্ত গ্রন্থ প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল।

যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের বহুবিধ গ্রন্থ

মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি, এখনও, ভারতবর্ষের এবং ইউরোপের পুস্তকালয়-সমূহে যে অসংখ্য হস্ত লিখিত পুঁথি সংরক্ষিত আছে, তাহার তালিকা দেখিলে মনে হয়, সংস্কৃত সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা এখনও অনেক দূর। সবে তাহার সূচনা হইয়াছে মাত্র। এমন অনেক অমূল্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে—যাহার এক একখানির দ্বারা হয়ত বহু শত বৎসরের অমীমাংসিত, নিতান্ত প্রয়োজনীয় এক একটী গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। যথাস্থানে তাহার উদাহরণ দেখাইব।

ফলতঃ আমাদের দেশে যে প্রণালীতে সংস্কৃত অধীত হয়, তাহা অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের অনুকূল হইলেও ভারতীয় সাহিত্যের এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার জন্য তদপেক্ষা প্রকৃষ্টতর প্রণালীতে সংস্কৃতের অনুশীলন আবশ্যক।

সেই অতি পুরাতন সময়ের দিকে চাহিলে দেখিতে পাই, প্রাচীন আর্য্যগণের সেই অনুপম দেবভাষা, উদার ধর্ম্ম ভাবময় জীবন এবং সমুন্নত হৃদয়—অথবা এক কথায়—আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপিতামহগণের সেই সর্ব্বাঙ্গীন চরম উন্নতির অবস্থা, নানাবিধ ঝঞ্ঝাবাতে সে অবস্থা বিলুপ্তপ্রায় হইলেও, আমরা আর্য্য সন্তান, সেই লুপ্ত গৌরবে বক্ষ স্ফীত করা শ্লাঘার বিষয় মনে করি, সেই উন্নত অবস্থার পূর্ণ চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে, ভারতের সাহিত্য, প্রকৃতপক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্বে এবং সৌন্দর্য্যে গ্রীক সাহিত্যের পরেই উল্লেখযোগ্য। আর মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ (Human Evolution) জানিবার পক্ষে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের প্রথম অবস্থা গ্রীক-সাহিত্যের প্রথম অবস্থা অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন। ঐ সময়ের গ্রন্থে মানবসমাজের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তদপেক্ষা প্রাচীন কালের বিবরণ আর কোন ভাষার কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কাজেই মানব-সমাজের ইতিহাস জানিতে হইলে, উহার আশ্রয় লইতেই হইবে। সেই অতি প্রাচীন কালের জনগণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিপ্রকার মত পোষণ করিতেন, তাহা অতি স্পষ্ট রূপে বেদে কীর্ত্তিত আছে। সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'ভাষাতত্ত্বের' (comparative philology)র আবিষ্কার করিয়াছেন। আর বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনাই 'কুন্' ও 'মোক্ষমূলর' কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত (Comp. mythology)নামক শাস্ত্রের মূল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য নানাবিধ শাখা প্রশাখায় বহু বিস্তৃত হইলেও ইহার মহত্ত্বের প্রকৃত পরিচয়ের স্থল—ধর্ম্মগ্রন্থ এবং দর্শন শাস্ত্র সমূহ। প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে কেবল ভারতীয় আর্য্যগণই একটী সুমহান জাতীয় ধর্ম্ম (হিন্দু ধর্ম্ম) এবং একটী পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্মের (বৌদ্ধধর্ম্মের) সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি গ্রীসবাসিগণ কি ইটালীবাসিগণ, কি জার্ম্মানগণ—ইঁহাদের সকলেই একটা বিজাতীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইউরোপীয় (আর্য্যগণ) ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। আর ভারতে ঠিক তার বিপরীত। ভারতীয় আর্য্যগণ একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহাদের চিন্তা-স্রোতঃ প্রধানতঃ ধর্ম্ম-বিষয়েই প্রবাহিত হইত। জগতের অপর কোনও জাতিই ভারতবাসিগণের ন্যায় ধর্ম্মময়জীবন নহেন। ধর্ম্ম চিন্তায়—ধর্ম্ম আলোচনায় ভারতবাসীর প্রাণ পরিপূর্ণ। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ ও ঋষি-

কল্প পণ্ডিতগণ কতিপয় দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া,যুক্তি এবং চিন্তায় যে ভারত অদ্বিতীয়, তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বুঝিতে হইলে –সংস্কৃতের প্রগাঢ় আলোচনা আবশ্যক। এতদ্‌ব্যতীত, মানবের ধর্ম্ম এবং দার্শনিক চিন্তা কিরূপে প্রথমে আবির্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহা সংস্কৃতের আলোচনায় যত সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সেরূপ আর কোনও ভাষাতেই হইতে পারে না।

ভারতের যাহা কিছু আছে, ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, আচার, ব্যবহার, নৃত্য, গীত প্রভৃতি সমস্তই ভারতের খাটি নিজস্ব। ভারত-সাহিত্য কোনও অংশেই কোনও বিদেশীয়ের নিকট ঋণী নহে। যে দিন হইতে প্রাচীন আর্য্যগণ প্রকৃতির সমুচ্চ প্রাচীর হিমালয় দ্বারা পৃথক-কৃত শান্তিময় ভারত উপদ্বীপে প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে,যে আর্য্য সভ্যতা, আর্য্যভাব, ভারতে ক্ষিপ্রভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, আজও, সেই সভ্যতা, সেই ধর্ম্ম-ভাব—বিলুপ্ত হয় নাই। যখন খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রীকগণ, ভারতের উত্তর পশ্চিম ভূভাগ আক্রমণ করিয়াছিল,তখনও— সেই পৃথিবীর সভ্যতাসূর্য্যের প্রাতঃকালেও ভারত তাহার নিজের জাতীয় উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরূঢ় ছিল। তারপর পারস্য, গ্রীক্‌, শাকদ্বীপী ( Scythians ) এবং মুসলমান-গণ ক্রমাগত উপর্য্যুপরি ভারতবর্ষ আক্রমণ ও উৎপীড়ন করিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় আর্য্যগণের জাতীয় জীবন এবং জাতীয় সাহিত্য বিদেশীয়ের সম্পর্কে কলুষিত হয় নাই। প্রত্যুত—সমানতেজে, সমান ভাবে ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানময় সংস্কৃত সাহিত্য, তাহার নিজের পথে, বহুবিধ শাখা প্রশাখায়, ক্রমশঃ বিস্তার লাভই করিতেছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতে, ইংরাজ অধি-কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, যত প্রকার বিদেশীয় কর্ত্তৃকই ভারত আক্রান্ত হউক না কেন— কাহারও কোনও প্রকার আধিপত্য (influ-ence) ভারত-সাহিত্যের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভাগীরথীর স্রোতের ন্যায় ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য অবাধিত গতিতে চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে, ক্রমে ঐতিহাসিক চর্চ্চা এবং ভাষাতত্ত্বের আলোচনার দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের দর্শন, ইতি-হাস, সাহিত্য প্রভৃতি, ইংরাজীর সাহায্যে, লোকে অল্পাধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিতে লাগিল। ভারতবাসিগণ, বিদ্যা চর্চ্চার জন্য, জ্ঞান লাভের জন্য, পৃথিবীর নানাদেশে যাতা-য়াত করিতে লাগিলেন। নানা দেশের, নানা প্রকার ভাবের সহিত, ভারতের আদান প্রদান হইতে লাগিল। ক্রমে, দেশে, ধীরে ধীরে এক নূতন চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইল। এ দেশের কল্পনাকাননে, বিদেশের নানা প্রকার 'কলম' রোপিত হইল। ভারত-সাহিত্যের সেই অপ্রতিহত ভাগীরথী-প্রবাহ, এতদিন পরে, তাহার নিজের চির পরিচিত খাত ছাড়িয়া এবার এক নূতন পথে বাহিয়া চলিল।

সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হয়, উপরিউক্ত কারণে, ভারত ইংরাজ জাতির নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। ঐতি-হাসিকভাবে জাতীয় সাহিত্যের পঠন-পাঠন ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ছিল না। জাতীয় ইতিহাসের ততটা আবশ্যকতা প্রাচীন

ভারতে অনুভূতও হইত না। হইত না বলিয়াই—এখনও বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলবাস্তুর ঠিকানা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, কালিদাসের সময় লইয়া তিন চারি রকম সিদ্ধান্ত, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-শোভিত সেই সারস্বত সৌধের অস্তিত্ব একেবারেই 'সদসৎ সংশয়গোচর' !!

যাহা হউক—প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর নানাস্থানে আর্য্য জাতির বসতি থাকিলেও, ভারতীয় আর্য্যগণের ন্যায় অন্য কেহই একেবারে বিজাতীয়ের সম্পর্ক-রহিত হইয়া একটী খাটী জাতীয় সাহিত্যের গঠন করিতে পারেন নাই। আর কেবল মাত্র ভারতবর্ষ ও চীনদেশ সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই দুই দেশে, অন্যূন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভাষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সামাজিক এবং পারিবারিক নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, তাহাই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া, বর্ত্তমানের ভাষা সাহিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মে পরিণত হইয়াছে। এই সকলের জন্য কোনও ভিন্ন জাতির নিকট ভারত এবং চীন ঋণী নহে। ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও
শ্রীবনমালী কাব্যতীর্থ।

# যোগী সাঁজাল। *

(বরিশাল "সাহিত্য-সভা"র এক বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

"Let such teach others, who themselves excel,
And censure freely, who have written well."—Pope.
"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."—Gray.

পরিদৃশ্যমান্ আবর্ত্তনশীল জগতের উপর দিয়া কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র মহাত্মাগণ ইহার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়া গোপনে—নীরবে চলিয়া গিয়াছেন;—সে ইতিহাস কে রাখে? আমাদের মানব-প্রকৃতিগত ধর্ম্মই এইরূপ যে, দশটা না দেখিয়া শুনিয়া, পাঁচটা প্রমাণ না লইয়া, কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস করিতে চাহি না। সুতরাং ধর্ম্মাড়ম্বরহীন, প্রচ্ছন্নতাপ্রিয়, "সততং রহসিস্থিতাঃ" শুদ্ধসত্ত্বমহাত্মাগণ আমাদের লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তরালে রহিয়া যায়। সে সুরভির স্নিগ্ধগন্ধে সুরলোক মাতিয়া উঠে; কিন্তু আমাদের নাসারন্ধ্রে তাহা স্থান পায় না।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্ব ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তং স মে প্রিয়ঃ॥"
ইত্যাদি।

* প্রবন্ধের অনেক স্থলে আমাকে বাধ্য হইয়া অনেকের নাম ধামাদির বিষয় গোপন রাখিতে হইয়াছে। সাঁজালের জীবনী আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। কেহ এ সম্বন্ধে আমাকে (ঠিকানা—"কানন-কুটীর" কোচবিহার) যদি নূতন অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, কিম্বা এই প্রবন্ধের কোন ভ্রম প্রমাদাদি সংশোধন করিয়া দেন, তবে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব। লেখক।

মহাত্মা ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় মহাজনের সংজ্ঞা দিতে গিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ কতিপয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—“মহাজনের পাঁচটী লক্ষণ—

(১) আত্ম প্রশংসা চাহেন না।

(২) পরনিন্দা করেন না।

(৩) বুজরুকী দেখান না।

(৪) বিশ্বপ্রেম লাভ করিয়াছেন।

(৫) অভ্রান্ত জ্ঞান (শাস্ত্র ও মহাজনের বাক্যসহ যাহা ঐক্য) লাভ করিয়াছেন।

এই পাঁচটী লক্ষণযুক্ত মহাজন সাঁজাল।*

প্রবন্ধোক্ত সাঁজালের নাম পাঠকগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও, তিনি যে একজন সিদ্ধযোগী ছিলেন, উদ্ধৃত গোস্বামী মহাশয়ের বাক্য হইতেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকে হয়ত সাঁজালের "যোগী" আখ্যার সঙ্গে প্রবন্ধ-লেখককেও একটী বাতুল উপাধি দিয়া বসিবেন। তাই উল্লিখিত মহদ্বাক্য দুটীর সহিত সাঁজালের জীবনীর কতদূর সামঞ্জস্য আছে,তাহা দেখাইবার জন্য আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। অবশ্য এ কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, কোন এক ব্যক্তির, বিশেষতঃ যোগীর জীবনী লিখিতে হইলে অনেক ক্ষমতা ও যোগাড় যন্ত্রের প্রয়োজন। একবার “প্রবাসী”তেও ‡ কোন এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন—“সাধু মহাত্মাগণের জীবনী লেখার দায়িত্ব গুরুতর। তাঁহাদের চরিত্র এমনই বিচিত্র, এমনই পবিত্র যে বাহিরের লোকে, তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাঁহারা কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিহার করেন, কোন্ অমৃতপানে সঞ্জীবিত রহেন, কি অপার্থিব আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তাহা আমাদের ধারণাতীত। শুদ্ধসত্ত্ব মহাত্মাগণ কোন্ নৈসর্গিক শিক্ষা, কি গূঢ় সাধনার প্রভাবে দিব্য দৃষ্টিলাভ করিয়া জীব ও জড় জগতের মহা রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হন, এবং সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্দ্ধে সুখ ও দুঃখের অতীত দেশে অবস্থান করিয়া কোন্ চৌম্বক-শক্তিতে বিশ্বরাজ্য আপনার দিকে টানিয়া লয়েন, সাধারণের তাহা দুর্ব্বোধ্য। এমন কি অপার্থিব উপাদানে তাঁহাদের হৃদয় গঠিত হয় যে, তাহা কুসুম হইতেও কোমল এবং বজ্র হইতেও কঠিন বলিয়া মনে হয়; তাহা দয়া প্রেমে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিগলিত এবং মুহূর্ত্তেই আবার নির্ম্মমতার অটল অচলে পরিণত হইতে দেখা যায়। একদিকে যেমন তাঁহাদিগের বিরাট হৃদয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্থান পায়, অপরদিকে তেমনি সেই পূত হৃদয়ে এক অমৃত স্বরূপ অনন্ত পুরুষ ব্যতীত আর কাহারও স্থান হয় না।”

বহু চেষ্টা সত্বেও, সাঁজালের জীবনের অনেক কথা এ পর্য্যন্ত জানিতে সক্ষম হই নাই। তবে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠককে তাহারই কতক আভাষ দিতেছি। সাঁজাল সম্বন্ধে যখন যাহা সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহাও ভবিষ্যতে প্রকাশের বাসনা রাখি। এ বিষয়ে এবং প্রবন্ধের ভ্রম প্রমাদ সংশোধনের জন্য অনুগ্রাহক পাঠকবর্গেরও সহায়তা ভিক্ষা করিতেছি।

পূর্ব্ব বঙ্গ বিভাগান্তর্ভূত বাখরগঞ্জ জিলাধীন বানরীপাড়া গ্রামে সাঁজাল অবস্থান করিতেন। তাঁহার জন্ম তারিখ কিম্বা জন্মভূমি

* গোস্বামী মহোদয়ের কোন প্রিয় শিষ্যের “নোটবুক হইতে এ কথাটী এ স্থানে সঠিক উদ্ধৃত করা গেল।

‡ প্রবাসী—১৩১৩ শ্রাবণ (Vide) মাধবদাস বাবাজী।

সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। অনেক পলিতকেশ বৃদ্ধও সাঁজালকে বহুদিন হইতে একই ভাবে বানরীপাড়া অবস্থান করিতে দেখিয়াছেন। সাঁজালের জাতি সম্বন্ধেও এ পর্য্যন্ত সঠিক কিছু জানিতে পারা যায় না; অনেকের মতে তিনি মুসলমান প্রমাণিত হইলেও, আচার, ব্যবহার, এমন কি, সাধনাতে পর্যান্ত তাঁহাকে হিন্দুমতাবলম্বী বলিয়া প্রতীত হইত। প্রথমতঃ যখন তিনি বানরীপাড়া গ্রামে আবির্ভূত হন, তখন কোন সময়ে হয়ত হাতে খাড়ু,* পায়ে বালা এবং মস্তকে সিন্দুর পরিয়া এতদূর আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন যে, প্রায় সকলেই তাঁহাকে একটা পাগল ভাবিতেন। এখনও এমন দু একজন বৃদ্ধ জীবিত আছেন, যাঁহারা সাঁজালকে পাগল বলিয়াই জানেন। সাঁজাল কখনও কোনরূপ আত্ম প্রকাশ করিতেন না; বরং সর্ব্বদা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়া স্বধর্ম্ম সাধন করিতেন। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা নিম্নে কয়েকটী প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সাধনা,—সাঁজালের কার্য্যকলাপাদির দৃষ্টান্তে প্রথমতঃ অনেকেই তাঁহাকে মধুর রসের সাধক স্থির করিয়াছিলেন। প্রকৃতি-ভাবাপন্ন হইয়া ভগবানের ভজনা করাই মধুর ভাব। গোপবধূ রাধিকাও কৃষ্ণকে এই ভাবে সাধনা করিতেন। সাঁজালও বহুদিন পর্য্যন্ত মধুর রসের উপাসক ছিলেন। কালক্রমে তিনি "উৎসবাৎ উৎসবং স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" প্রবেশ করিয়া ভগবানের সহিত আত্ম-বিনিময় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কোনরূপ ধর্ম্মাড়ম্বর করিয়া ধর্ম্মভাব দেখান তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। গভীর নিশীথে যখন সারাবিশ্ব স্তব্ধ হইয়া থাকিত—যখন একের নয়ন সমক্ষে অন্যের ছায়া প্রতিভাত হইত না—তখনই অনুরাগী নয়ন খুলিয়া মধুরের মধুর, সুন্দরের সুন্দর, মনোরমের মনোরম—সেই বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তিটী সাধ মিটাইয়া দেখিয়া লইতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাঁজাল, কাহারও কাহারও মতে মুসলমান হইলেও উপাসনার পক্ষে তিনি হিন্দুধর্ম্মগত ছিলেন। হরিনামে ভক্তিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কোন স্থানে শাস্ত্র-কথন কিম্বা হরিনাম শ্রবণ করিলেই তাঁহার অশ্রু-পুলকাদি অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব * যুগপৎ উদয় হইত। মহাত্মা ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন তাঁহার শিষ্যবৃন্দের সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, বানরীপাড়া গ্রামে সাঁজালকে আর বহুদিন রাখিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু নাম কীর্ত্তন হয়, তাহাতে তাঁহার দারুণ পিপাসা মিটিতেছে না। তিনি চাহেন, ঐ নাম-সুধারসে ডুবিয়া থাকিতে, তিনি চাহেন, ঐ সুধা পান করিয়া আত্মহারা হইতে! কিন্তু হায়, ক্ষুদ্র শক্তি মানব কর্ত্তৃক তাঁহার এ তৃষ্ণা মিটিবে কেন? বস্তুতঃ সাঁজালের কায়া পরিবর্ত্তনের যে ইহা একটী অন্যতম কারণ, তদ্বিষয়ে অনু-মাত্রও সংশয় নাই।

আড়ম্বরহীনতা,—আড়ম্বরহীনতা সাঁজালের জীবনের প্রধান লক্ষ্যস্বরূপ ছিল। লোক ঘেঁষিয়া চলা এবং আপনার মহত্ত্ব প্রতিপাদন করা তাঁহার ধর্ম্মবিরোধী ছিল। কেহ তাঁহার

* নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে এবং পূর্ব্বতন সময়ের রমণী সমাজে প্রচলিত পায়ের অলঙ্কার বিশেষ।

* তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

নিকটে কোন উপদেশ শুনিতে চাহিলে, তিনি সকল বিষয়ে অজ্ঞ এবং "গুরু সত্য" শুধু এই কথা বলিতেন। সংসারের কোলাহলাদি তাঁহাকে কোনদিনই স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। সাঁজালের মৃত্যু বিষয়ক আশ্চর্য্য ঘটনাটী শুনিলে সকলেই তাঁহার প্রচ্ছন্নপ্রিয়তার প্রমাণ পাইতে পারিবেন।

অহিংসা,—সাধারণতঃ দেখা যায় যে,কোন স্থানে একটী মহাত্মার আবির্ভাব হইলেই একদল তাঁহার সপক্ষে ও একদল তাঁহার বিপক্ষে লাগিয়া থাকেন। চৈতন্য, যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ,পরমহংস প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মাগণের জীবনী আলোচনা করিলেই আমরা এ প্রমাণ পাইতে পারি। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার "ভক্তিযোগে" লিখিয়াছেন—"এসংসারে হিরণ্যকশিপুর অন্ত নাই। একটী বালককে যদি কিছুমাত্র ভগবৎপদে ভক্তি স্থাপনা করিতে দেখা যায়, অমনি তাহার পিতামাতা যাহাতে তাহার সেই দিক হইতে মতি ফিরাইয়া আনিতে পারেন, যাহাতে তাহার এই পূতিগন্ধময় বিষয়সুখে মন আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রাণমনে চেষ্টা আরম্ভ করেন। এইরূপ বিরোধী দলের অধিনায়কত্ব প্রায়ই লোলচর্ম্ম বৃদ্ধগণের (company of fathers and grandfathers) জীর্ণ স্কন্ধে পতিত দেখা যায়। আমাদের দেশের "সাবেকী" বৃদ্ধগণের প্রকৃতিই এই যে,তাঁহাদিগকে হাতে কলমে ধরাইয়া দিতে না পারিলে তাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহেন না; আর অবিশ্বাস হইল তো একেবারে গোঁড়া হইয়া বসিলেন। সাঁজালের সময়েও নব্য সম্প্রদায় তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু বৃদ্ধগণ কিছুতেই তাঁহার শ্রেষ্টত্ব স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না। সাঁজাল অস্পৃশ্য যবন; সুতরাং তাঁহার সংসর্গে ছেলেপুলে গুলি মাটী হইয়া যাইবে, বৃদ্ধ সম্প্রদায় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন পুত্রদিগকে কোন মতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন এথেন্স্‌বাসিগণ যে মতের প্রণোদনে সক্রেটীশের হস্তে তীব্র গরল খণ্ড প্রদান করিয়াছিল, য়িহুদিগণ যে ভাবে মাতিয়া যিশুর হস্ত পদে উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, বানরীপাড়ার বৃদ্ধ কতিপয় সেই ভাবে সাঁজালের প্রতি অবৈধ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সাঁজাল হয়ত উৎফুল্লচিত্তে ভাবিতেন—

"তেরি মেরিদোস্তি লাগল্ লোকসব বদনামীকিয়া।
লোকসব্‌কো বক্‌নে দিজে তুম্‌নে হাম্‌নে কামকিয়া।"

"But I say unto you, that ye resist not evil : but whosoever shall smite thee on thy right cheek turn to him the other also."

সাঁজাল হয়ত এই মহাবাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই সকল উৎপীড়ন, সকল জ্বালা নীরবে সহ্য করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাঁজালের উপর বৃদ্ধগণের জাতক্রোধ ছিল। সুতরাং একদিন তাঁহাকে পথে পাইয়া কতিপয় বৃদ্ধ "লগুড়মাদায়" তাঁহার পায়ের উপর সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, এবং "গুরু, ইহারা অবোধ, ইহাদিগকে সুমতি দাও" এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে, ভগ্নপদে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। এজন্য নব্যসম্প্রদায় ফৌজদারী করিতে প্রস্তুত হইলে, সাঁজাল তাঁহাদিগকে মিষ্টবাক্যে প্রবোধাদি দিয়া নিরস্ত করিলেন। অধিকন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কাহারও নাম প্রকাশ করিলেন না।

সামাজিকতা,— হিন্দুশাস্ত্রকারগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, সংসারবিরাগী

ঋষিরও সামাজিকতা থাকা একান্ত আবশ্যক। সামাজিকতা অর্থে এস্থলে দলাদলি, খাওয়া দাওয়া, আদান প্রদান ইত্যাদি বুঝিতে হইবে না। রাজা, প্রজার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করাই যোগীদের সামাজিকতা। যাঁহারা পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রমুখ মহাজনগণের ব্যবহার দেখিয়াছেন, তাঁহারই এবিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন। সাঁজাল সম্ভাবিত মুসলমান হইয়াও হিন্দুপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্যই যেন সকলের নিকট অতি বিনীত ভাবে, মহা অপরাধীর ন্যায় অবস্থান করিতেন। কোন সময়ে কেহ তাঁহার নিকটে গেলে অতি সসম্ভ্রমে তাঁহার যোগ্য সম্মান করিতেন। উচ্চ জাতির সংস্পর্শ রাখিয়া বা উচ্চাসনে উপবেশন করিতে কেহই তাঁহাকে কোন দিন দেখে নাই। নিজে সংসারের বাহিরে থাকিলেও অন্যের সংসারে বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেন না।

আহার, বিহার, শয়ন,—সাঁজাল প্রায়ই সকল বাড়ী বেড়াইয়া বেড়াইতেন। কেহ কোনদিন স্বচক্ষে তাঁহাকে আহার করিতে দেখে নাই। কেহ নিমন্ত্রণ করিলে, কিম্বা কোনরূপ বিলাস সামগ্রী দিতে চাহিলে তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতেন না। সকলের আহারাদি শেষ হইলে হয়ত হঠাৎ কোন বাড়ী উপস্থিত হইতেন, এবং খাদ্যাবশিষ্ট পচা, বাসি যাহা কিছু পাইতেন, তাহা টোপর করিয়া আনিয়া কুকুর বা কাককে বিলাইয়া দিতেন। বৃদ্ধ কতিপয় তাঁহার বিরোধী থাকিলেও বৃদ্ধা ও নব্যসম্প্রদায় তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন; এবং তাঁহার যোগমাহাত্ম্যে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং কোন বাড়ী উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে যথোচিত যত্ন ও আদর করিতেন।

বিহার সম্বন্ধেও সাঁজালের গতি অব্যাহত ছিল। যথেচ্ছভাবে সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং যথাসাধ্য পরোপকার করিতেন।

সাঁজালের প্রতিপালিত ৪।৫টী কুকুর ছিল। শয়নকালে কোনরূপ শয্যা ব্যবহার করিতেন না। একটী কুকুরকে উপাধান, একটীকে পার্শ্বসহচর, কোনটীকে বা ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিতেন। বানরীপাড়া ঠাকুরতা বাড়ীর সন্নিকটে খড়কুটা দ্বারা একখানি কুঁড়ে নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন। কোন দিন তন্মধ্যে, কোন দিন বা গাছতলায় পড়িয়া থাকিতেন। তাঁহার ভক্ত ঠাকুরগণ অনেক অনুরোধাদি করিয়া তাঁহাকে আপনাদের বৈঠকখানায় নিয়া আসিলেন। তদবধি সাঁজাল তাঁহাদের বৈঠকখানায়ই অবস্থান করিতেন। বৈঠকখানায় অবস্থিতিকালে যে পর্য্যন্ত সে গৃহে লোকজনের যাতায়াত থাকিত, সে পর্য্যন্ত একটী ছিন্ন কাঁথা দ্বারা আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। রাত্রি গভীর হইলে জাগ্রত হইয়া অনাবৃতাবস্থায় সমস্ত রাত্রি উপবেশন করিয়া কাটাইতেন। নীরব নিশীথে ভক্তের আরাধনার প্রকৃত তথ্য মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। সাঁজাল শীত, গ্রীষ্ম, মশা, মাছি কিছুরই বিভেদ জ্ঞান করিতেন না। বানরীপাড়ার জনৈক সম্ভ্রান্ত ঠাকুরতা বলিয়াছেন—কার্য্যগতিকে একদিন তাঁহাকে বৈঠকখানায় শয়ন করিতে হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহরের সময় মশার তাড়নায় জাগ্রত হইয়া মশারিটী ঝাড়িতেছেন, এমন সময়ে, অল্প অল্প জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলেন যে, ঘরের এক কোণে স্থির ও গম্ভীর ভাবে সাঁজাল আসন করিয়া বসিয়া আছেন।

অনাবৃতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া দু-তিন ডাকের পর উক্ত ভদ্রলোকটী যখন তাঁহাকে একখানি মশারি দিতে চাহিলেন, তখন সাঁজাল কতকক্ষণ তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বলিলেন যে—'তোমরা যদি এ সময়েও এভাবে বিরক্ত কর, তবে তোমাদের বাড়ী আর থাকিব না।' সেই হইতে কেহই কোনরূপে সাঁজালের আচার ব্যবহারে বাধা দিতেন না।

যোগমাহাত্ম্য (Miracle),—য়ুরোপীয় ধর্ম্ম ব্যতীত আমাদের হিন্দু ও মুসলমান কোন ধর্ম্মেই যোগমাহাত্ম্য (miracle)র এত ছড়াছড়ি নাই। এবং ধর্ম্মের জন্য এরূপ 'রাসায়নিক প্রক্রিয়ার' আবশ্যকতা, বোধ হয়, আজও ভারতে উপস্থিত হয় নাই। ভারতীয় মহাত্মাগণ প্রায়ই কোনরূপ মাহাত্ম্য দেখাইতে চাহেন না। প্রচ্ছন্নপ্রিয়তাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, লোক-হিতের জন্য সময়ে সময়ে এরূপ মাহাত্ম্য প্রদর্শনের প্রয়োজন হইয়া উঠিলেও,তাহা অতি গোপনে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা সাঁজাল সম্বন্ধেও এরূপ একটী দিনের ঘটনা অবগত আছি। বানরীপাড়া গ্রামে কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থের কলেরা রোগাক্রান্ত একমাত্র পুত্রের আসন্ন মৃত্যু অবস্থায় তাহাকে বাহির করা হইয়াছে। গৃহপ্রাঙ্গণ লোকপূর্ণ। চারিদিকে ক্রন্দনের অবিরল ধ্বনিতে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়া যায়। হঠাৎ সেই সময়ে সাঁজাল সেখানে উপস্থিত হইয়া রোরুদ্যমানা শোকমূহ্যা জননীকে ইঙ্গিতে নিভৃতে ডাকিলেন। এবং তাঁহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র বটিকা প্রদান করিয়া অবসন্ন পুত্রকে তাহা তৎক্ষণাৎ সেবন করাইতে আদেশ করিলেন। এবং কথা বলিতে বলিতেই হঠাৎ সাঁজাল অন্তর্দ্ধান হইয়া পড়িলেন। তদবধি চারিদিন পর্য্যন্ত অনেক খোঁজ করিয়াও কেহ সাঁজালকে বানরীপাড়া দেখিতে পাইলেন না। বলা বাহুল্য, চরমদশাগ্রস্ত শিশু সেই এক বটিকা সেবনেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত আমরা আরো একটী ঘটনা বলিব। বৃষ্টির ধারায় যখন চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়া যাইত, তখন হয়ত সাঁজাল একাকী তাঁহার পূর্ব্ব নির্ম্মিত কুঁড়ের মধ্যে বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ছাউনীবিহীন চাল হইতে যখন অন্যান্য স্থলে জলস্রোত প্রবাহিত হইত, তখন সাঁজাল কর্ত্তৃক অধ্যূষিত স্থানটুকুতে একবিন্দু বারি পতন হইত না।

বিশ্বপ্রেম,—যোগীদের প্রধানতম লক্ষণই বিশ্বপ্রেম। এই বিশ্বজনীন প্রেম-পীযূষধারায় মনপ্রাণ পরিপ্লুত না হইলে সাধনার সম্যক্ অঙ্গ পরিস্ফুট হয় না। যোগী সাঁজালের প্রেমও আত্মানাত্ম ছাপাইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। বানরীপাড়ার সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ বলিয়া থাকেন—"আমরা এতদিন সাঁজালের সঙ্গ করিলাম বটে; কিন্তু আলাপ ব্যবহারাদিতে কোন সময়ে তাঁহার মুখে একটীবার "আমি" বা "আমার" শব্দ শুনিতে পাই নাই।" সাঁজালকে প্রায়ই এই গানটী গাইতে শুনা যাইত—

"গুরুমোরগো * তরাও শমনে"—

এই "মোরগো" শব্দটীর মধ্যেই সাঁজালের পূর্ণ মাহাত্ম্য পূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নিজের সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহাব দৃক্পাত ছিল না। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি অতি

---

* মোরগো (গ্রাম্যভাষা) আমাদিগকে।

একপদ বিশিষ্ট উল্লিখিত "অন্তরা"টী ব্যতীত অন্য কোনরূপ পরিবর্দ্ধিত পদ তাঁহার মুখে শুনা যাইত না।

ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার কামনা উর্দ্ধে—অতি উর্দ্ধে—অত্যন্ত মহতী ছিল; সেখানে স্বার্থের গন্ধ ছিল না, আমিত্বের প্রসার ছিল না—সে কামনা হইয়াছিল জগন্ময়ী। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা এ ভাবেই আপনার কথা ভুলিয়া সারা জগতের মঙ্গল মাগিয়া ল'ন।

পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে যাতায়াত করা বড়ই কষ্টকর। এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ী যাইতে হইলে প্রায়ই নৌকা ব্যতীত চলা যায় না। এইরূপ বর্ষাকালে যখন গ্রাম্য রাস্তা ঘাটাদি জলে ডুবিয়া যাইত, তখন সাঁজাল একখানি ছোট ডিঙ্গি লইয়া ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় সকলকে পার করিয়া দিতেন। কখনও কখনও ছোট ছোট ছেলে মেয়েগণকে ঘাড়ে করিয়া তাহাদের গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া দিতেন।

মনুষ্য হইতে ইতর শ্রেণীতে পর্য্যন্ত তাঁহার সমান দয়া ছিল। মশা, মাছিতে দংশন করিলে কোনরূপে তাহাদিগকে বাধা দিতেন না। কুকুর প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীগুলির প্রতি তিনি যেরূপ আচরণ করিতেন, পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন। পল্লীগ্রামে অনেকেই জাল বা বড়্‌শী দ্বারা মৎস্য ধরিয়া থাকেন; আবশ্যকীয় বড় মৎস্য গ্রহণ করিয়া সকলেই ছোট ছোট মৎস্যগুলি পথপার্শ্বে ফেলিয়া রাখেন। হঠাৎ সাঁজালের চক্ষে তাহা পতিত হইলে তিনি ধীরে ধীরে—অতি কোমল ভাবে—সবগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া জলে ছাড়িয়া দিতেন। জলে পতিত কোন পোকা দেখিতে পাইলে তাহার উদ্ধার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এখানে আমরা আর একটী ঘটনা বলিব। বানরীপাড়ার কোন সম্রান্তবংশের দুটী বালিকা (এখন ইঁহারা বৃদ্ধা) একদিন পাঠশালা হইতে গৃহে ফিরিবার পথে একটী শুয়াপোকা দেখিতে পাইয়া একগাছি চুল দ্বারা উহার মধ্যদেশ নিষ্পেষণ করতঃ তামাসা দেখিতেছিলেন। সহসা সাঁজাল সে পথে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কাছ হইতে পোকাটী চাহিয়া লইলেন। অনেকেই জানেন যে, শুয়াপোকা গায়ে লাগিলে অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয়। সাঁজাল তজ্জন্য কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পোকাটীকে হাতের উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে দিতে চুলগাছি ছাড়াইয়া দিলেন; এবং যে পর্য্যন্ত উহা একটী গাছের সীমান্তে না পঁহুছিল, তাবৎ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দয়ার এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। "নারীধর্ম্মে"র বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বঙ্গ কবির মুখে বাহির হইয়াছে—

"মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা,
সে ত ক্ষুদ্র পিয়াসায় ছার,
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেইজন দেবতা আমার।"

সাঁজালকে আদর্শ নিয়া কোন কবি কবিতা লিখিলে তিনিও হয়ত বিশ্বপ্রেমের স্তম্ভে আজ লিখিতে পারিতেন—

মানবে যে ভালবাসে সসীম সে ভালবাসা,
বাসনায় জীর্ণ সে বয়ান,
ঘৃণিত ইতর জীবে যে লয় টানিয়া বুকে,
সেই বিশ্ব প্রেমিক মহান্!

মানবের ত্যাজ্য, সমাজের ঘৃণিত, ভগবানের রাজ্যে উপেক্ষিত, ইতর আখ্যাত বনের পশু পক্ষীকেও যিনি আদরে কোলে টানিয়া লয়েন, তাঁহার চেয়ে বিশ্বপ্রেমিক আর কে হইতে পারে?

অলৌকিক মৃত্যু,—ভগবানের নিয়মই এই যে, মহাত্মাগণ আমাদের কলুষিত নরলোচনের কাছে অদৃশ্য থাকিলেও পুণ্যবান-

দের গোচরে তাঁহাদের অস্তিত্ব চির বর্ত্তমান থাকে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত সাঁজাল সম্বন্ধে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বাক্য এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। একবার বানরীপাড়া-নিবাসী জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি কাশীর জনৈক স্বামীজির নিকট যোগাভ্যাস সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইতে গমন করেন। ভদ্র লোকটীকে দেখিয়া স্বামীজি কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলেন—"যোগ শিক্ষার জন্য মহাশয়ের এতদূর আগমন কেন?" ভদ্রলোকটী কিছু অপ্রতিভ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিলে তিনি পুনরায় বলিলেন যে—"সাঁজালের ন্যায় যোগী ভারতে দুটী আছেন কি না সন্দেহ।" ভদ্রলোকটী পূর্ব্বে বুঝিতেন না যে,পাগল সাঁজালের মধ্যে এতখানি রত্ন লুক্কায়িত আছে। ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু হায়, যোগী সাঁজাল ইতঃপূর্ব্বেই অমৃতময় যোগধামে গমন করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি আমাশয় রোগে কাতর ছিলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহার গুপ্ত সাধনা ধরা পড়িতে চলিয়াছে, যখন টুকাজীরাও হোলকারের মত বুঝিতে পারিলেন—

"আঃ এত্নে রোজ যিস্ ধনকো বিচ্
ছিপায়ে রাখা থা, ওহি ধন মেরা দেকাল আয়া।"

তখনই এ ভবধাম হইতে বিদায় গ্রহণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেদিন ১৩০২ সনের বৈশাখী পূর্ণিমা। চন্দ্রমাশালিনী মধু যামিনীর দ্বিপ্রাহরিক শুভ্র জ্যোৎস্নাস্রোতে সমস্ত জগৎ হাসিতেছিল। চম্পকময়ী যামিনীর সেই কোমল অঙ্কে গা ঢাকা দিয়া চন্দনযাত্রার স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া সাধু সাঁজাল অন্তর্দ্ধান হইলেন। তাহার পর একে একে অলক্ষিতে এগারটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। চন্দনযাত্রার সেই পূর্ণিমালোকে—সেই দ্বিপ্রাহরিক উচ্ছ্বাসে স্বর্গলক্ষ্মী অনেকবার হাসিয়াছেন; কিন্তু এগার বৎসর পূর্ব্বে লোমাঞ্চলক্ষ্যে যে উল্লাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বুঝিবা আজ পর্য্যন্ত তেমনটী আর হয় নাই। বানরীপাড়া স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু রজনীকান্ত গুহ ঠাকুরতা বি-এ মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন—"রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যখন এই অভাবনীয় দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, তখন আমাদের সকলের প্রাণেই দুঃখের পরিবর্ত্তে, কেমন একটা অজানা উল্লাস খেলিতে লাগিল; এবং কি আশ্চর্য্য, বিনা সংবাদে হঠাৎ কোথা হইতে একটী কীর্ত্তনের দল সুমধুর হরিগুণ গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল।"

সাঁজালের অন্তর্ধানের পূর্ব্বেই বানরীপাড়াবাসী কয়েকজন ভক্ত ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা লইয়াছিলেন। ৺গোস্বামী মহাশয়ের মতে তাঁহার প্রতি সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইয়াছিল। সাঁজালের তিরোধানের পর কায়স্থকুল প্রধান বানরীপাড়া গ্রামে মহা হুলস্থূল লাগিয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাজালের জাতি সম্বন্ধে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল না। সুতরাং সমাজের নেতৃবর্গের আদেশে কোন হিন্দুই তাঁহাকে সমাধিস্থ করিতে সাহসী হইলেন না। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণও, হিন্দু আচরণের জন্য তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিতে নারাজ হইলেন। উভয় পক্ষীয় এহেন বিসংবাদ হেতু মৃতদেহ যথাস্থানে পড়িয়া রহিল। পরদিন গভীর রাত্রে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ,শ্যামানাথ ঘোষ এবং শশীকুমার গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি কয়েকজন সাঁজালের ভক্ত তাঁহার মৃতদেহ একটা সিন্দুকে পুরিয়া এবং তন্মধ্যে মাটী

চাপা দিয়া মাথায় করিয়া চলিলেন। ভাঁটায় নদীর জল টানিয়া যায়। সুতরাং সিন্দুক কোন রকমে জাগিয়া না উঠে, তজ্জন্য উহা নদীর মধ্যদেশে ডুবাইয়া দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তৎক্ষণাৎই তাঁহারা সেই স্থানে লগি দ্বারা এবং নামিয়া অনেক তল্লাস করিলেন, কিন্তু কোথায়ও সে সিন্দুক বা তাহার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সাঁজালের কায়া নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মস্তকের কয়েক গাছি চুল এবং অঙ্গুলির কয়েকটী নথ রাখা হইয়াছিল। বানরীপাড়া "সাধন-ঘরের" পার্শ্বে ঐ স্মৃতি-চিহ্ন (relics of the saint) প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বানরীপাড়ার বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাঁজালের ভক্তমণ্ডলীর ইহা একটী ভক্তি ও শ্রদ্ধার তীর্থ বিশেষ।

যোগী সাঁজাল চলিয়া গিয়াছেন। তিনি গোপনে আসিয়াছিলেন, আড়ালে আড়ালে চলিয়া গেলেন। জগতে কেহ তাঁহার নাম জানিল না, কেহ তাঁহার জয় ঘোষণা করিল না, কেহ তাঁহার জন্য এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ফেলিবার অবসর পাইল না। তিনি চলিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু ঐ দেখুন, এখনও তাঁহার আত্মা আমাদের মঙ্গলের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের যদি চক্ষু থাকিত, তবে এখনও তাঁহার জ্যোতিষ্কপুঞ্জ দেখিতে পাইতাম, তবে এখনও দেখিতে পাইতাম যে—

"He passes to be king among the dead."

আমাদের চক্ষু কর্ণ থাকিলে কবির কথায় বলিতে পারিতাম—

"O'er rough and smooth he trips along,
And never looks behind
And sings a solitary song,
That whistles in the wind.'

আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বল থাকিলে আমরা কি উচ্চরবে, নির্ভীক-চিত্তে বলিতাম না যে—

"He passes to where beyond these voices
There is peace"—?

কিন্তু হায়, নির্জ্জীব প্রাণী আমরা, চিনিয়াও চিনিলাম না, বুঝিয়াও বুঝিলাম না, মহত্ব দেখিয়াও দেখিলাম না। পায়ে ঠেলিয়াছি আগে, এখনও শুধু আবিষ্টা, বিহ্বলা যশোদার ন্যায় বলিতে পারি—

"যতই বাছা কাঁদে বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্;
বল্লেম,—নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
তথন সর্ সর্ বলি' ফেলিলাম ঠেলে॥"

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

# শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির। (১)

করুণাময় জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখিয়া কে না মনে অবধারণ করিবে যে, জগতের সমস্ত কার্য্যাবলী কোনও এক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে? যেখানে সুরম্য উদ্যান শোভা পাইতেছিল, সেই স্থান মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, যেখানে দেদীপ্যমান তুঙ্গ-সৌধমালা-সুশোভিত-নগরী বিরাজিত ছিল, সেখানে বর্ত্তমান ব্যাঘ্র ভল্লুক ভয়-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্য রহিয়াছে, যে স্থানে উচ্চ গিরিরাজি-সুশোভিত অরণ্য প্রদেশ, সুবিস্তীর্ণ নগরী ও জনপদ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সে স্থান কাল-স্রোতে সমুদ্রগর্ভে নিহিত হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে সমুদ্র ও নদীগর্ভ হইতে নূতন ভূখণ্ড বাহির হইয়া উহাতে নূতন গ্রাম,

উদ্যান, নগর ও উর্ব্বরশস্যশালী-ক্ষেত্র সমূহ দৃষ্ট হইতেছে। পুনশ্চ যে জাতি একদা অদম্য সাহস, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দ্বারা বিজ্ঞান, শিল্প ও সমরনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল ও তৎকালীন সভ্যজগতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই জাতি বর্ত্তমান কাল-স্রোতে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত হইতেছে, এবং যে জাতি একদা বর্ব্বর ও অসভ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছিল, সে বর্ত্তমান জগতে গৌরবকেতন উড়াইয়া প্রধান শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আহা! এই কি প্রকৃতির নিয়ম!

এক সময় এই ভারত-ভূমি সভ্যতার অত্যুচ্চ সোপান আরোহণ করতঃ তদানীন্তন সমস্ত জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতীয় বীরের হুঙ্কার-শব্দে সমরক্ষেত্র ত্রস্ত হইতেছিল, ভারতীয় বাণিজ্যতরী মহোল্লাসে অতলস্পর্শ বারিধিবক্ষে ক্রীড়া করিতেছিল, আজি সে সমস্ত গৌরব, অনন্ত-কাল-স্রোতে বিলীন হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের মত প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু (যাহা হউক) ইতিহাস ইহার সত্যতা প্রমাণ করাইতে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান। ভারতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎকল যে উন্নত হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর্য্যেরা এই পুণ্যময় ভূমিকে বাস্তবিক স্বর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। যদিও কেহ কেহ এ প্রদেশকে অনুন্নত বলিয়া মনে করেন, তথাচ ইহা যে একদা ভারতাবতংশ ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। যদি কেহ প্রাচীন উৎকলবাসিদিগের বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবার হিন্দু-সমাজের পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত গৌরবধন ও দৃঢ়তার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীক্ষেত্রমন্দির দেখিয়া যাউন, যদি কেহ প্রাচীন উৎকলের শিল্পকুশলতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবার একাম্রকাননের (ভুবনেশ্বরের) অভ্রঙ্কষ মন্দির এবং কোণার্কে মর্ত্ত্য-বিরিঞ্চের অমরকীর্ত্তি অবলোকন করিয়া যাউন—এ সমস্ত দর্শন করিলে কোন্ নির্ম্মম ব্যক্তি বলিতে সাহসী হইবে যে, ইহা অসভ্য-জাতির বসতি ছিল? আধুনিক উৎকল অতি দরিদ্র হইলেও শ্রীক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর ও কোণার্কের কীর্ত্তিত্রয় যে উহাকে সম্মানিত করিতেছে এবং অনেকদিন করিবে, ইহা ধ্রুববচন। উড়িষ্যার ধন লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু মহাযশা অনঙ্গভীমদেবের, পুণ্যশ্লোক ললাটেন্দ্র কেশরীর ও মহামনা নরসিংহদেবের অনুপম কীর্ত্তি-সর্ব্বনাশী কালবক্ষে যে মনোহর চিত্রের সন্নিবেশ করিয়াছে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে। ইতিহাস চিরকাল ইহাদিগের যশোগীত গান করিতে থাকিবে।

বর্ত্তমান-যুগে কৃতবিদ্য ভারতীয় এবং তদিতর দেশীয় সকল ব্যক্তি পুরীমন্দিরের ইতিহাস জানিতে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। হইবারও কথা; কারণ বোদ্ধব্য বিষয় সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইলে জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। নির্ব্বাচিত বিষয় অতি গরীয়ান, সুতরাং মদীয় ক্ষীণ লেখনী হইতে নিঃসৃত উক্তি যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে আনন্দ প্রদান করিবে, ইহা দুরাশা মাত্র; তথাপি কয়েকটী বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে উক্ত বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে সাহসী হইলাম।

পুরীমন্দিরের ইতিহাসের সহিত উড়িষ্যার, এমন কি, হিন্দুধর্ম্মের ইতিবৃত্ত এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও তিরোভাবের বিষয় স্থানে স্থানে প্রসঙ্গভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

উড়িষ্যা ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ইহা উত্তর দক্ষিণে গঙ্গানদীর মুখ হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে বঙ্গোপসাগর হইতে মধ্যপ্রদেশস্থ রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মনুসংহিতা, মহাভারত, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার নাম লিখিত আছে। প্রমাণ সমস্ত লিখিতে গেলে প্রবন্ধ স্থূলকায় ধারণ করিবে, কিন্তু স্কন্দপুরান্তর্গত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য নামক পুস্তক হইতে এই শ্রীক্ষেত্র সম্বন্ধীয় কতিপয় বিষয় উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় সংক্ষেপে উহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উড্র-প্রদেশ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে প্রসিদ্ধ থাকিলেও পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ততপূর্ব্বে প্রকটিত হয় নাই বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ উক্ত গ্রন্থ সমূহে এই বিষয় বিশেষরূপে (যথারীতি) লিখিত আছে বলিয়া দেখা যায় না। কেবল শ্রীক্ষেত্রের বিষয় ক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল। "একজন জটিল সত্যযুগে বিষ্ণুভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া ভরতান্তর্গত বিষ্ণুক্ষেত্র সমূহের বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। তিনি অন্যান্য বিবরণের সহিত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের স্থূল বিবরণ প্রকাশ করিলেন। উড়িষ্যায় বৈতরণীনদীর নিকট হইতে ঋষিকুল্যা পর্য্যন্ত স্থান অতি পবিত্র; তন্মধ্যে পঞ্চক্রোশ অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্রের (বঙ্গোপসাগর) উত্তর তীরবর্ত্তী পঞ্চক্রোশ পুণ্যতর এবং তন্মধ্যে ক্রোশত্রয় পরিমিত দক্ষিণবর্ত্ত শাখাকৃতিকস্থান পুণ্যতম ও দুর্গম; অতএব লোকসঙ্গ-রহিত হইয়া বিশ্বাবসু নামে এক ব্যাধ তথায় বাস করে। উক্তস্থানের তৃতীয়াবর্ত্তে নীলাদ্রি নামক পর্ব্বতে নীলনীরদকান্তি নীলমণিময় মাধবমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। সুরগণ আপনারা বৎসরের মধ্যে অৰ্দ্ধসময় তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন, অপরার্দ্ধ উক্ত ব্যাধ পূজা করিয়া থাকে। এ অতি গোপনীয় এবং বিশিষ্ট পুণ্যময় স্থান। এই মূর্ত্তি সামান্য গুণশালী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি-গোচর হয় না, ইহার তুল্য পবিত্র বিষ্ণুমণ্ডল দ্বিতীয় নাই। আমি নিরন্তর তথায় বাস করি। যদি তুমি এই মূর্ত্তিকে দর্শন করিতে অভিলাষী হও, নিজের কোনও ব্যক্তিকে অগ্রে তথায় প্রেরণ কর। তিনি মার্গ নিরূপণ করিয়া নীল পর্ব্বত অবলোকন করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তুমি যাত্রা করিও।" তিনি ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে নীলাদ্রি গমনার্থ আদেশ করেন। তিনি জটিলের বচনানুসারে নীলাদ্রি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে উক্ত ব্যাধের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় দুর্গম মার্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। এবং উক্ত ব্যাধের সহিত মিত্রতা স্থাপন বশতঃ নীলমাধবের দর্শনও সুসম্পন্ন হয়। পরে তিনি ব্যাধের সহিত তদীয় কুটীরে ফলাহারাদি করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন। গভীর বিষ্ণুভক্তি বশতঃ পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বিষয় জ্ঞাত থাকায় বিশ্বাবসু সে সময়ে বিদ্যাপতিকে সরলভাবে কহিলেন, "মিত্র! পুনরায় আসিলে এ মূর্ত্তি ও এই পর্ব্বত আর তোমার নয়নগোচর হইবে না। এই ভূধর বালুকাদ্বারা প্রোথিত হইয়া যাইবে এবং এই মূর্ত্তি এ স্থান হইতে তিরোহিত হইবে; কারণ এস্থান অন্য মনুষ্যের উপস্থিত পর্য্যন্ত মাত্র বিদ্যমান থাকিবে।" ইদানীন্তন কোন কোন ব্যক্তি পর্ব্বতের কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া পার্ব্ব-

তীয় ভূমির বিষয়ে সন্দেহ করিয়া নীলাদ্রি শব্দের অর্থে এইরূপ মতভেদ উৎপাদন করিয়া থাকেন যে, "নীলমাধবের অবস্থিতি হেতু এই স্থানের নাম নীলাদ্রি হইয়াছে।" আরও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই স্থান মাধবের লীলা_ ভূমি বলিয়া ইহার নাম লীলাচল, নীলাচল নহে।" স্কন্দপুরাণ ও সূতসংহিতা অনুসারে নীল প্রস্তর সমূহ বিদ্যমান বলিয়া নীলাদ্রি এবং নীল প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রযুক্ত মাধবের নান নীল মাধব। এই অর্থদ্বয় উক্ত দুই গ্রন্থে সুস্পষ্ট-ভাবে উল্লেখিত আছে। পাঠকগণ উপরোক্ত মতদ্বয়ের কোন্‌টী যথার্থ (নিশ্চয়াত্মক) সহজে বুঝিতে পারিবেন। বিশেষ লেখা নিষ্প্রয়োজন। যথা,—বিদ্যাপতি স্বদেশে উপস্থিত হন, রাজা বিদ্যাপতির আগমন প্রতীক্ষায় এত উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, বিদ্যাপতির দর্শনমাত্র পদমর্য্যাদা ভুলিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাপতিকে আলিঙ্গন করিয়া আমূল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাপতি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলেন। রাজা উক্ত বিষয় শ্রবণমাত্রে মন্ত্রির উপর সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করতঃ পরিবার এবং প্রজাগণের সহিত রাজকোষ হইতে সমস্ত সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া অকস্মাৎ আগত মহর্ষি ভগবান নারদের সমভিব্যাহারে উৎকলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবন্তী রাজধানী ত্যাগ করিয়া কিছুকাল পরে উড়িষ্যার অন্তর্গত চর্চ্চিকা দেবীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। উক্ত স্থান মহানদীর তীরবর্ত্তী, সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় এবং স্থানটী স্বাস্থ্যকর। সেই স্থানে উড়িষ্যা রাজার সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। তথা হইতে আগমন করিয়া একাম্রকাননে (ভুবনেশ্বরে) অবস্থান করিলেন। এ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার মার্গ পরিষ্কৃত ছিল না। তদুপরে অরণ্য ও পর্ব্বতময় প্রদেশ থাকাতে গমনাগমনের পক্ষে অতি ক্লেশদায়ক ছিল। তথাপি দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া মহারাজ সেই মার্গে গমন করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন না। মার্গের মধ্যে মহর্ষি নারদের মুখ হইতে নীলমাধবের তিরোভাব এবং নীল পর্ব্বত বালুকাবৃত হওয়া শ্রবণ করতঃ রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।"নীলমাধবের তিরোধান হইলে দারুব্রহ্মরূপে ভগবান আবির্ভূত হইবেন," ইহা বলিয়া নারদ সান্ত্বনা করাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন আশ্বস্ত হন। অতঃপর মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দক্ষিণে নীলাম্বরধেয় বলদেব বিরাজমান। বিষ্ণুর বামভাগে সুদর্শনচক্র অবস্থিত; স্বপ্নে শ্রীজগৎ শ্রীজগৎপতিকে এইরূপ দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিদ্রা ত্যাগ করতঃ মহারাজ নারদ মহর্ষির নিকট সেই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি সে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ভগবান সেই রূপে এই স্থানে আবির্ভূত হইবেন এবং কল্য প্রাতঃকালে তুমি দারুরূপী ভগবানকে সাগরতীরে দেখিতে পাইবে।" তৎপর পরদিবস প্রাতঃকালে বারিধি স্নান করিতে যাইবার সময় বিল্বেশ্বরের নিকট শঙ্খচক্রাঙ্কিত এক বৃহৎ বৃক্ষ সমুদ্রতীরে সংলগ্ন দেখিয়া রাজা নারদকে এ ঘটনার সহিত স্বীয় স্বপ্নের সামঞ্জস্য নিরূপণার্থ প্রশ্ন করিলেন। নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন "যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলে, তাহা অদ্য সফল হইল। ভগবান এই বৃক্ষরূপে শ্বেতদ্বীপ হইতে আগমন করিয়াছেন, শীঘ্র উৎসব সহকারে ইঁহাকে যাত্রা করাও। নারদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট মহারাজ অত্যন্ত সমারোহে মৃদঙ্গাদি বাদ্য পুরঃসর সেই দারুব্রহ্মকে করাইয়া যজ্ঞবেদী-মধ্যে স্থাপন করিলেন।

যজ্ঞ-সমাপনান্তর নারদকে প্রশ্ন করিলেন, এই দারুতে কি প্রকার প্রতিমা নির্ম্মিত হইবে, এ বিষয় আজ্ঞা করুন। নারদ উত্তর করিলেন, ভগবানের বিচিত্র মাহাত্ম্য, তিনি নিজেই নির্ম্মাণ-কার্য্য-বিধান করিবেন, এ বিষয়ে ভাবিত হইবার কারণ নাই। ইতিমধ্যে আকাশবাণী হইল যে "মহারাজ! চিন্তিত হইবেন না; শিল্প-শাস্ত্রনিপুণ এক জন বৃদ্ধ বার্দ্ধকী আগামী কল্য সেই স্থানে উপস্থিত হইবে। সে প্রতিমা নির্ম্মাণ সুচারুরূপে অনুষ্ঠান করিবে। তুমি পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত প্রতিমা নির্ম্মাণ স্থান অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর চতুর্দ্বার বন্ধ করিবে। উহার চতুর্দ্দিক সর্ব্বদা বাদ্য ইত্যাদি ধ্বনির দ্বারা এরূপ শব্দায়মান করিয়া রাখিবে যে, কোনরূপে কেহ নির্ম্মাণ শব্দ শুনিতে পারিবে না। কারণ নির্ম্মাণ শব্দ যে শ্রবণ করিবে, সে বধিরাদি গুরুতর দোষে দূষিত হইবে।" আকাশবাণীর এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নারদ প্রভৃতি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং হৃষ্টমনে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিলেন। পরদিবস মহোৎসব সময় বৃদ্ধ বার্দ্ধকী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উক্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, দেখা গেল পূর্ব্বোক্ত বার্দ্ধকী অন্তর্হিত হইয়াছে এবং জগন্নাথ প্রভৃতি চতুর্দ্ধামূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ।

---

# দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সেবা।

১৩১৩ সালের জ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সেবা রূপ পবিত্র মহাযজ্ঞ শেষ করিয়া আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। কি জন্য জানি না, মাদারীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রিস্‌কো সাহেব, প্রথম অবস্থায়, বহুদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আমি ইচ্ছা করিয়াই সংবাদ পত্রে সেবা সম্বন্ধে কোন কথা লিখি নাই—কেন না, কথা বলা অপেক্ষা নীরবে কাজ করিয়া যাওয়াই অধিক সঙ্গত। আজ সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, এম-বি, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র, বি,এ, শ্রীযুক্ত নিরেন্দ্র নাথ সেন, এম,এ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র এম-এ, কলিকাতার বেঙ্গল-ফেমিন-রিলিফ কমিটীর সভ্যগণ ও ফরিদপুর সুহৃদসভার সভ্যগণকে এবং ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, এম-এ, মহোদয়কে ধন্যবাদ দিতেছি এবং কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করিতেছি; কেন না, তাঁহাদের অযাচিত ও অপরাজিত দয়া ভিন্ন এবারকার এই মহাযজ্ঞ কখনই সুসমাপ্ত হইত না। কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন পর্য্যন্তের চাউল দিয়া কার্য্য শেষ করিয়াছি, অর্থাৎ আসিবার পূর্ব্বে ১৫দিনের চাউল ও লবণ এবং অনেককে নূতন বস্ত্র দিয়া ১৭ই কার্ত্তিক কাজ শেষ করিয়া, কাঙ্গালীদিগকে চিড়া গুড় পেট ভরিয়া খাইতে দিয়া ও তৈলহীন মস্তকে নিজ হস্তে তৈল মাখাইয়া দিয়া ব্রত পরিসমাপ্ত করিয়া আসিয়াছি। ১৯শে কার্ত্তিক পিঞ্জরীর হাটে এই শেষ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। সে

দিনকার দৃশ্যের মত দৃশ্য দর্শন মানবজীবনে অতি অল্পই ঘটে। কোটালিপাড়ের শিক্ষিত অশিক্ষিত, আপামর-সাধারণ সর্ব্বশ্রেণীর লোক শেষ দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। বিধাতার চরণে আজ কোটী কোটী প্রণাম।

আমি কি একাকী এই ব্রত পালন করিতে পারিতাম? কখনই নয়। আমার সঙ্গে প্রায় ১৫০ স্বেচ্ছাসৈনিক সর্ব্বদা থাকিয়া কাজের সহায়তা করিতেন। ২০ ঘণ্টা হইতে ২৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চাউল বিতরণে লাগিত, ইহার মধ্যে আহার করা দূরে থাকুক, মল মূত্র ত্যাগ করিতেও উঠিতে পারিতাম না। এই সমস্ত সময় পালাক্রমে দলে দলে স্বেচ্ছাসৈনিকেরা আমার সাহায্য করিতেন। ক্লান্তি বা শ্রান্তি, মান বা অপমান, ক্ষুধা বা তৃষ্ণা, নিদ্রা বা শয়ন, তাঁহারা সকল ভুলিয়া যাইতেন। বর্ষার অবিরল বৃষ্টিধারা, সূর্য্যের প্রখর রশ্মি তাঁহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত, কেহ মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতেন না। অনেক সময় তাঁহারা নিজেরা নৌকা বাহিয়া লোক পার করিতেন, মাথায় বহিয়া চাউল আনিতেন; নিজেরা কুলি মজুরের মত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের পশ্চাতে বিধাতার কৃপা এবং সমগ্র লোকের আশীর্ব্বাদ গুপ্তভাবে থাকিয়া কার্য্য করিত। পিতা মাতারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সানন্দ চিত্তে ১০।১২ বৎসরের ছেলেদিগকেও এই কঠোর ব্রত পালন করিতে পাঠাইয়া দিতেন; কেহ কখনও বিরক্ত হইতেন না। এবারকার এরূপ দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের উৎসাহ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া অবাক্ হইতাম, ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম। তাঁহাদিগের ভালবাসা ও ভক্তি, এই দীন সেবকের চির সম্বল হইয়া রহিয়াছে। আজ তাঁহাদিগকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। লোকেরা বলিত, "বাবু এত টাকা লইয়া ডিঙ্গিতে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং নদীতে শয়ন করেন, কখন যেন দস্যুর হস্তে তাঁহার প্রাণ দিতে হয়।" এরূপ কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইত। আমি কে যে, আমাকে দস্যুরা স্পর্শ করিবে? আমি যে কাঙ্গালদিগের বিধাতার প্রেরিত দাসানুদাস—সেই কাঙ্গালেরা আমার শরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে? এত কৃতঘ্নতা কি দরিদ্রের বুকে বাস করে? ভাবিতাম, যদি তাহাই হয়, তাহাদের হস্তে মরিয়া স্বর্গে যাইব, আমি কখনও সতর্ক হইব না। বিধাতা সাক্ষী, দেশের অগণ্য নর-নারী সাক্ষী, কেহ আমার শরীর স্পর্শ করে নাই, কখনও কেহ আমার প্রতি তীব্র ব্যবহার করে নাই—কখনও স্নেহ বা দয়া করিতে কেহ কুণ্ঠিত হয় নাই। অবিশ্বাসীদের মুখে চুণ কালী পড়িয়াছে এবং বিশ্বাসের জয়পতাকা চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহা পরীক্ষায় এবার আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি।

ছয় মাসের মধ্যে দুই মাস, বোধ হয়, দুবেলা পেট ভরিয়া আহার করিয়াছি, ১॥ দেড় মাস, বোধ হয়, একবেলা খাইয়াছি এবং আড়াই মাস, বোধ হয়, নির্জ্জল উপবাস করিয়াছি। আমার বন্ধু ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় অল্প কয়েকদিন আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলিতেন "যেখানকার জল পান, তাহাই পান করেন? কি সর্ব্বনাশ!" খালের জলে, থালা, বাটী, গেলাস ধোয়া হইলে গরম জলে না ধুইলে সেই সব তিনি ব্যবহার করিতেন না। আমার সঙ্গে বীরেন ছিলেন, বীরেনও আমার ন্যায় করে বলিয়া বীরেনকে

তিনি তিরস্কার করিতেন। আমি মনে মনে হাসিতাম, ভাবিতাম, দরিদ্র-সেবা-কাজে যদি প্রাণ যায়—ধন্য হইয়া যাইব। যখন আহার জুটে না, তখন আমাকে গরম জল কে দিবে? জল কাদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আষাঢ় মাসে সমস্ত দিন পরিদর্শন কার্য্যে কাটাইলাম, পীড়া হইল না; বর্ষার অজস্র প্লাবণ শ্রাবণে মস্তকে ধারণ করিলাম, পীড়া হইল না; ঐ ক'মাস ক্ষুধা তৃষ্ণা কি বস্তু, মোটেই ধারণা ছিল না, তবুও পীড়া হইল না। ভাদ্র মাসে নূতন জলে ভাসিয়া বেড়াইলাম, পীড়া হইল না। আশ্বিন-কার্ত্তিকের পূতিগন্ধময় পচা জলে স্নান পান নির্ব্বাহ করিলাম, দেশের কত শত শত লোক জ্বরে পড়িল, কিন্তু এই দাসের পীড়া হইল না! বিধাতার অযাচিত কৃপা। অবিশ্বাসী লোকেরা তবুও তাঁহাকে অস্বীকার করে! আমি তাঁহার অজস্র কৃপায় আজও সঞ্জীবিত রহিয়াছি। তাঁহার চরণে আজ কোটী কোটী প্রণাম।

দরিদ্রদিগের সেবার সময় আমি সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাদিগকে "মা" সম্বোধন করিতাম, প্রথম প্রথম বোধ হয়, নীচজাতীয়া অস্পৃশ্যা মহিলাদিগের প্রতি এরূপ সম্বোধন শুনিয়া আভিজাত্য-ভাব পূর্ণ লোকেরা মনে মনে হাসিত, কিন্তু শেষে আমার প্রধান সাহায্যকারীরাও তাহাদিগকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। সেবা করিবার সময়ে আমার মনে হইত, বিশ্বজননী কাঙ্গালিনী মূর্ত্তিতে আজ আমার সমক্ষে উপস্থিত, আমি জীবন্ত ভাবে এবার মায়ের সেবা করিয়া ধন্য হইতেছি। তোমরা বল, তিনি অলক্ষিত, আমি এবার তাঁহার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। তাঁহার কৃপার জয় হউক।

আমি গত ৬ মাস স্বদেশী-আন্দোলন সম্বন্ধে নানা স্থানে ৫০টী বক্তৃতা করিয়াছি। বক্তৃতার সময় মনে হইত, আমার আব্দারের কথা শুনিবার জন্য যেন বিশ্বপিতা শ্রোতারূপে উপস্থিত। আমি যাহা দিয়া পূজা করিতাম, সকলেই তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিয়া চলিয়া যাইত। আমার কোন কোন বন্ধু বলেন, সে সকল জীবন্ত কথা লিপিবদ্ধ করিলে সুন্দর একখানি পুস্তক হয়, কিন্তু সে চেষ্টা কে করিবে? ৬ মাসের ইতিহাস এত সজীব ঘটনায় পূর্ণ যে, কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর উল্লেখ করিব, জানি না। সব ঘটনায় এবার এদীনের এই শিক্ষা হইয়াছে, বড় লোকেরা মান অভিমানসূচক আভিজাত্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রদের সহিত যদি একাত্মক হইতে না পারেন, তবে এদেশ কিছুতেই জাগিবে না। দরিদ্রদিগকে ভুলিয়া থাকিলে কখনও এদেশের মঙ্গল হইবে না। আভিজাত্য-ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে, নচেৎ কিছুতেই কিছু হইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে দেশ বড়ই উদাসীন। সুতরাং সকল আন্দোলন পণ্ড হইয়া যাইতেছে, কিছুতেই স্বদেশীগ্রহণ-ব্রত সফল হইতেছে না।

আমি প্রথমত ২টী কেন্দ্রে চাউল দিতাম, পিঞ্জরীর হাটে সোমবার, এবং ঘোনাপাড়ার হাটে শুক্রবার। আশুধান্য প্রচুর পরিমাণে হওয়ায় অল্প দিন পরেই ঘোনাপাড়ার সাহায্য বন্ধ করিতে পারিয়াছিলাম; পিঞ্জরীর কার্য্য কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

প্রথমত যাহাদিগকে চাউল দিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাদিগের অবস্থা ভাল হইলে আর দেই নাই। শেষ দিন পর্য্যন্ত নূতন নূতন লোক ভর্ত্তি করিতে হইয়াছিল, প্রথমে সকলকে টিকিট দিতে পারি নাই, পরিদর্শন শেষ হইলে সকলকেই টিকিট দিয়াছিলাম।

প্রথমত স্ত্রী পুরুষ সকলেই অবস্থানুসারে চাউল পাইত, শেষ কালে শত করা ৯৫ জন নিরাশ্রয় বিধবা ও স্বামিপরিত্যক্তা মহিলা ও পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকারা সাহায্য পাইত। বরিশালের গৌরনদী থানার বহু গ্রামের প্রায় ১০০০ লোক সাহায্য পাইয়াছে। শেষ সময়ে, এক মাসের কিছু অধিক কালের জন্য, বরিশালের নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবুকে লিখিয়া বাগদায় তাহাদের জন্য এক স্বতন্ত্র কেন্দ্র করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ কেন্দ্র সত্বেও বরিশালের যাহারা আসিত, তাহাদিগকে সাহায্য করিতাম। বরিশালের গ্রাম সকল পরিদর্শনের সময়ে সর্ব্বত্র সাহায্য প্রদান করিয়াছি। শেষ কালের অনেক সাহায্য আমি নিজ তহবিল হইতে দিয়াছি। যে কোন স্থলে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে সব স্থলে আমি নিজ তহবিল হইতে সাহায্য দিয়াছি। আমার নিজ গ্রামে ও বানরীপাড়ায় যে সাহায্য দিয়াছি, তাহা আমি অন্য কোন তহবিল হইতে দেই নাই।

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ, মুকসুদপুর, কোটালিপাড় ও মাদারিপুরের এক সীমা হইতে অন্য সীমাস্থ এক দিনের দূরবর্ত্তী ২২৫ গ্রামের ৮৭৬৬ জন লোক সাহায্য পাইয়াছে। ৬মাসের সাহায্যে,নিজের দান ও প্রাপ্ত কাপড়ের মূল্য বাদে, ৭৭২৫।৶৫ ব্যয় হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ, থিসটিক সোসাইটী,ফেমিন-রিলিফ-ফণ্ড, এণ্টি-সার্কুলার সোসাইটী ও প্রোসেসনপার্টি হইতে প্রাপ্ত ৪৬৯৩/৬, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় হইতে প্রাপ্ত ( ভদ্রলোকদিগের দান সহ। ২৩০০৲,এবং ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার তহবিল হইতে ৭৩২।৵০ মোট ৭৭২৫।৶৫। ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার দানের মধ্যে শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেব্যার ৫০৲, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের ১০০৲,কাজলিয়া গ্রামের ও পিঞ্জরী, কাশাতালী, দিঘিরপাড় ও গোয়ালন্দের প্রাপ্ত দান ও অন্যান্য প্রাপ্ত দানও যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা পিঞ্জরীতে অনেক পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম; ছাপরার শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস মহাশয় অনেক পুরাতন বস্ত্র ও কিছু নূতন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এবং শ্রীযুক্তা ফুল্লনলিনী রায় অনেক বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক নূতন বস্ত্রও তন্মধ্যে ছিল। বস্ত্রের হিসাব তহবিল-ভুক্ত হয় নাই। তবে যে বস্ত্র আমি টাকা দ্বারা কিনিয়া দিয়াছি, তাহা হিসাবভুক্ত হইয়াছে। নিজ তহবিলের টাকা ও বস্ত্রাদির মূল্য সহ বোধ করি ৯৫০০৲ ব্যয় হইয়াছে।

নিজে যাহা দান করিয়াছি, তাহা বাদেও ২৯৭।৵০ সুহৃদ্ সভার দুর্ভিক্ষ-তহবিলে দিয়াছি।

সুহৃদ্ সভার তহবিলে যে চাঁদা পাইয়াছি, এই সংখ্যার মলাটের পৃষ্ঠায় কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহা তুলিয়া দিলাম।

আমি যথারীতি হিসাব শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ও ফরিদপুর সুহৃদ্ সভায় দিয়াছি। দাতাগণের চরণে আজ কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করিতেছি।

নিজের কথা নিজে লিখিতে সঙ্কুচিত ও লজ্জিত, এজন্যই এপর্য্যন্ত কোন কথা কোন পত্রিকায় লিখি নাই। আমার সঙ্গে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় ১৩ই আষাঢ় হইতে

২৭শে ভাদ্র পর্য্যন্ত ছিলেন, তিনি কখনও কখনও সংবাদপত্রে কিছু কিছু লিখিতেন। জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, মুসলমানের সংখ্যা অর্দ্ধেক, খ্রীষ্টানের সংখ্যা দুই আনা এবং হিন্দুর সংখ্যা ছয় আনা। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য হইতে নমশূদ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীর লোক সাহায্য পাইয়াছে। অর্থের অনাটনে বহুবার বিশেষ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষগণের নির্ম্মম ব্যবহারে অনেক সময় বড়ই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অর্থ নিঃশেষ হইলে কয়েক বার কলিকাতা আসিতে হইয়াছিল। একবার ১২ দিন, একবার ৪ দিন অনুপস্থিত ছিলাম। অনুপস্থিতের সময়ে ২৫ জন সাহায্য-প্রাপ্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অনুপস্থিতের সময় যে কি যাতনা পাইতাম, একমাত্র সর্ব্বদর্শী বিধাতা জানেন। শয়নে স্বপনে কেবল দরিদ্রদের কঙ্কালময় মূর্ত্তি জাগিত—সব সময়ে তাহাদের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিত। কিন্তু বিধাতার কৃপায় সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল। শেষ সময়ে শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়দিগের ভিতরে বিধাতা অবতীর্ণ হইয়া কার্য্যবিধান না করিলে এই মহাযজ্ঞ শেষ হইত না। তাঁহাদের দয়ার কথা মনে হইলে চক্ষে জল আইসে। ভগবান তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুন।

কাজলিয়ার বন্ধুগণের সহৃদয় ব্যবহার জীবনে ভুলিব না। পশ্চিমপাড় ও উনসিয়ার ভলন্টিয়ারগণের সদয় ব্যবহার এ দাসের চিরসম্বল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জটাধর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলমাধব রায়, পণ্ডিত আশুতোষ তর্করত্ন, পণ্ডিত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, পণ্ডিত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন, এবং দেশের বহু পণ্ডিত এবং মহোদয় ব্যক্তিদের দয়া ও স্নেহ স্মরণে আমি সর্ব্বদা লজ্জায় মরিয়া রহিয়াছি। তাঁহারা আমাকে কত ভালবাসা দিয়াছেন, কত সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, নিম্নলিখিত পত্র সকল তাহার প্রমাণ। আমার নিজের প্রশংসা ঘোষণার জন্য নয়, মহৎ লোকদিগের মহত্ত্ব ঘোষণার জন্য অভিনন্দন-পত্র সকল এখানে তুলিয়া দিলাম, পাঠকগণ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাদের অনুগৃহীত নিজস্ব ব্যক্তি—আমাকে আদর করায় আপনাদেরও আদর করা হইয়াছে। এই অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি কত জনের কত দয়া দেখুন।

উপসংহারে শেষ দিনের কাঙ্গালীদের সভার কথা মনে সর্ব্বদা জাগিতেছে, সে স্বর্গীয় শোভা জীবনে ভুলিবার নয়। বাবুরা বলেন, এই দিনকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতি বৎসরে ১৯শে কার্ত্তিক পিঞ্জরীতে কাঙ্গালমেলা হইবে। কোটালিপাড়ের সর্ব্ব শ্রেণীর লোক সমবেত—কাঙ্গাল-কাঙ্গালিনীদিগের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—ডাক্তার মনোমোহন অভিনন্দন পাঠ করিতেছেন! সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্করত্নের চক্ষু জলে প্লাবিত—সকলের চক্ষে জলধারা, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—সে দৃশ্য ব্যাখ্যা করিতে পারে, এমন লোক জগতে নাই।

আর একটী কথা—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বরিশাল ও ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ দূর করিতে বিধাতার কৃপায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি যে পরিশ্রম, যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। শ্রীমান উপেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীমান

সত্যেন্দ্র মোহন সেন, দ্বিতীয় রমেশ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত কালীকুমার, কামিনীকুমার, রাজকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র, মদনমোহন, মনোমোহন, মতিলাল, ইঁহারা সকলেই বিধাতার কৃপায় এই মহাযজ্ঞের হোতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রায় ১২৫ জন স্বেচ্ছাসৈনিকের কঠোর পরিশ্রমে এই কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। বিধাতার জয়, স্বদেশ সেবার জয়, স্বদেশী আন্দোলনের জয়, বন্দে-মাতরম্ মন্ত্রের জয়। বন্দে মাতরম ধ্বনিতে সর্ব্বদা হাট প্রকম্পিত হইত, ঐ মন্ত্রে সকল অসম্ভব সম্ভব হয়, সকলের এই ধারণা হইয়াছিল। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।*

দীন সেবক
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

---

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কাঙ্গালদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহোদয়কে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র সকল দেওয়া হয়।

( ১ )

### বিদায়।

প্রবল ঝড়-বন্যার পর পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যেরূপ নিস্তব্ধতা পরিলক্ষিত হয়, বৃহৎ রাজসিক দুর্গোৎসবের পর প্রতিমা বিসর্জ্জন হইলে সেই বাড়ীর যে প্রকার শ্রীহীনতা দেখা যায়, প্রবল ঝড়ের প্রবল তুফানের পর স্রোতস্বিনীর জল যেরূপ নিষ্কম্প অবস্থায় থাকে, আজ আমাদের গরীবদেশের সেই অবস্থা কেন? কেহ কি বলিতে পারেন? দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের করালগ্রাসে পড়িবার সময় কে যেন কাহাকে, আমাদের কাঙ্গালদের জীবন রক্ষার জন্য, প্রতি ঘরের দ্বারে দ্বারে পাঠাইয়া দিয়া, বজ্রাহতের কাণের নিকট ঢাক ঢোল বাজাইয়া চৈতন্য সম্পাদনের ন্যায় মাভৈঃ মাভৈঃ রবে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন "ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আসিয়াছি। অন্নাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় আর মরিতে হইবে না। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে আর তোমাদিগকে পড়িতে দিব না।" এক দিকে দুর্ভিক্ষের করাল-মুখব্যাদান চেষ্টা, অপর দিকে তাহা সংযত করিবার উপায়। এক দিকে প্রবল সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তনের টান, অপর দিকে ইস্পাতের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলের গুণের টানে উজান কাটিয়া যাওয়া। এক দিকে বিষ-মাত্রায় অহিফেন ভোজনের পর বিভোর অচৈতন্য, অপর দিকে সুচিকিৎসক ষ্টমাক পাম্প দ্বারা বিষ বাহির করিয়া দিয়া সর্ব্বক্ষণ জন্য নিদ্রায় পড়িতে না দেওয়ার চেষ্টা। এক কথায়, এক দিকে প্রবল পরাক্রান্ত যমের অধিকার বৃদ্ধি, অপর দিকে নগণ্য একটী মানুষের যুদ্ধে পরাক্রান্ত রাজার পরাজয়। এক দিকে নিরাশার বিষাদমাখা ভীষণ মরুভূমি, অপর দিকে আশাবারির প্রবল প্রস্রবণ। এক দিকে দেবযুদ্ধে যমপুরী দর্শন, অপরদিকে একটী সামান্য মানুষের প্রতি-যুদ্ধে যমপুরী হইতে পুনরানয়ন। একদিকে দুর্দ্ধর্ষ বরপ্রাপ্ত রাক্ষস ইন্দ্রজিতের বিষম যুদ্ধ; অপর দিকে চতুর্দশ বর্ষ অনাগার-অনিদ্রা-সংযমশক্তি-প্রাপ্ত লক্ষণের হাতে পরাজয়। ভীষণ যুদ্ধ, ভীষণ অধ্যবসায়, ভীষণ পরাজয়। এ চিত্র দেখিবার জিনিষ, ভাবিবার বিষয়, চিন্তার বিকাশ-ভূমি। ইনি কে, চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনি ঈশ্বর-প্রেরিত দ্বাদশশিষ্যের একজন। ইনি সগরবংশ উদ্ধারকারী মহাত্মা ভগীরথ। আজ আমাদের গরীবদেশের কাঙ্গালদের পক্ষে বিজয়া দশমী। আজ আমাদের বিগত পাঁচ মাসের অযাচিত প্রতিমাখানি বিসর্জ্জনের পরের দিন বা দশহারা। পঞ্জিকা-

---

* ৪২৪ পৃষ্ঠায়—দুর্ভিক্ষের হিসাবে ভুলক্রমে অম্বিকা বাবুর নিকট হইতে প্রাপ্ত ২১০০৲ টাকার স্থলে ২৩০০৲ ছাপা হইয়াছে এবং সুহৃদ্ সভার দান ৯৩২।৵০ স্থলে ৭৩২।৵০ ছাপা হইয়াছে।

কার দেবীর আগমন ও প্রস্থানের ফল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। এখানে দুর্ভিক্ষ-পঞ্জিকার প্রতি পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, দেবীপ্রসন্নের বাষ্পীয় শকটে অযাচিত আগমন, ফল অন্নাভাবে মুমূর্ষুকে অন্নদান ও পুনরুত্থান ও ভগ্নাবশেষ পুরাতন নৌকায় গমন। ফল—অন্যূন ২০০ খানি গ্রামের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কাঙ্গালদের মুখে বিষাদের কালিমা লেপন। ভবিষ্যতে দ্বিতীয় বৎসরের নূতন বন্দে-মাতরম্ পঞ্জিকাতে এই অযাচিত আগমন ও প্রস্থানের ফল বিশদরূপে বিবৃত হইবে। কে তুমি? মানুষ না দেবতা? তোমার কথা বার্ত্তা, হাটা বসা, পোষাক পরিচ্ছদ, আলাপ ব্যবহার, চলন চালন, শয়ন উপবেশন, ভোজন অনশন, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আহার নিদ্রা, সুখ দুঃখের ইচ্ছায় বীতস্পৃহা দৃষ্টে মনে করিতেছি, ইহা বর্ত্তমান যুগে মানুষের কার্য্য নহে। কোনও ছদ্মবেশী দেবতার কার্য্য। আজ সেই প্রতিমা-রূপী দেবতা খানির অন্তর্ধান আশঙ্কায় প্রাণের মধ্যে কি অব্যক্ত যাতনা হইতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। তোমার সেবা-ব্রতের নিকট, "ফরিদপুর দুর্ভিক্ষ কমিয়াছে, আর সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না" প্রভৃতি গভীর মেঘের বজ্রপাত ও চতুর্দ্দিক হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় যে সকল বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তোমার অতুলনীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনে এবং নিষ্কাম ভালবাসা ও প্রেমের ঢেউতে সে সকল বাধা বিঘ্ন ভাসিয়া গিয়াছে। এবং তোমার অচল বিশ্বাসে, এক মাত্র বিঘ্ন-বিনাশন কাঙ্গালের ঠাকুরের দয়ায় সম্পূর্ণ নির্ভরতায় সকল আপদ বিপদ ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছে। এই বিদায়-কালীন বিসাদ-কালিমার মধ্যে, এই অমানিশার ঘোর মেঘাবৃত গগনে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় একটু সুখ আছে। তাহা কি? তোমার সেবা-ব্রতের সম্পূর্ণতা। আজ আমাদের প্রাণ যদিও তোমাকে ছাড়িতে প্রস্তুত না হউক, যদিও তোমার অদর্শন-জনিত কষ্টে কাঙ্গালদের প্রাণে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে, তথাপি বলিতে চাই যে, তোমার পবিত্র সেবা-ব্রতের (ব্রত-সমাপন দর্শনে পরিসমাপ্তির সুখে আমরা মরমে মরমে সুখী হইয়াছি।) তোমার অযাচিত ভালবাসা ও প্রেম দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। আগমন সময়ে প্রতি ঘরের দ্বারে গিয়া বলিলে, 'মাভৈঃ মাভৈঃ, আমি আসিয়াছি।' প্রস্থানকালেও আবার ঢোল ও ডেকড়া দিয়া বলিতেছ, "এখনও কি দুর্ভিক্ষ আছে? এখনও কি তোমরা অন্নাভাবে উপবাস কর? যদি তোমাদের পাছে পাছে দুর্ভিক্ষ গুপ্তভাবে বেড়িয়া বেড়ায়, জানিতে পার, তবে এস, আমি সেই সংক্রামক দুর্ভিক্ষের ম্যাদের তারিখ পর্য্যন্ত (৩০ কার্ত্তিক) তোমাদিগকে অতি সাবধানে ও সযতনে সংরক্ষিণী শক্তি দিয়া মন্ত্রপূত করিয়া যাইব, যাহাতে তোমাদের ত্রিসীমায়ও ঐ দুর্ব্বৃত্ত আসিতে না পারে।" মরি! মরি! কি নিষ্কাম ভালবাসা, কি নিষ্কাম-প্রেমের প্রস্রবণ তোমার হৃদয়-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। অবশ্য তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়াছ, তাহার আবার প্রশংসা কি? ইহা সত্যযুগের কথা। বর্ত্তমান-যুগে এ সংসারে যিনি কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম, তিনি মানুষরূপী দেবতা। মুখে অনেক কথা বলিতে ও বক্তৃতা করিয়া অনেকে লোক ভুলাইতে পারে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কজন লোক পাওয়া যায়? বাক্যবীর অনেক আছেন, এ-সংসারে কর্ম্মবীর কজন আছেন? তুমি এক-জন প্রেমিক কর্ম্মবীর; তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেখিয়া অনেক সময় আমরা অবাক্ হইয়া রহিয়াছি। কর্ত্তব্য প্রতিপালনে কোনও সময়ে তুমি শিশুর কোমল হাসি অপেক্ষা নরম; কোনও সময়ে বজ্র অপেক্ষা কঠিনতর। আমাদের উপরের দৃষ্টিতে, যেখানে তোমার দয়া বিতরণ আবশ্যক মনে করি নাই—সেখানে তোমাকে

কোমল শিশুর ন্যায় দয়া বিতরণে তৎপর দেখিয়া বিস্মিত অথচ আহ্লাদিত হইয়াছি; অপর দিকে আমাদের বাহ্য দৃষ্টিতে যেখানে তোমার দয়া আবশ্যক মনে করিয়াছি, সেখানে তোমার বজ্রের ন্যায় কঠিন হইতে কঠিনতর দয়া বিতরণের কার্পণ্য দৃষ্টে বিস্মিত অথচ দুঃখিত হইয়াছি। এক দেহে এরূপ হরিহরের গঠন,এক দেহে এরূপ সোণা-সোহাগার মিলন, একদেহে এরূপ অমানিশা-পূর্ণিমার সম্মিলন মর্ত্ত্যে অতুলনীয়।

তুমি একজন ভবিষ্যদ্বক্তা। মনে হয় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে তোমার নব্যভারতে কংগ্রেসের উপকারিতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলে,ভারত যে পর্য্যন্ত আত্ম নির্ভর করিতে না শিখিবে, যে পর্য্যন্ত স্বদেশ-দীক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ভারতকে শত শত কংগ্রেস নিদ্রা হইতে উঠাইতে সমর্থ হইবে না। সে সময় তোমার সে প্রস্তাব কেহ গ্রহণ করে নাই; সে চিন্তার বিষয়,ভাবিবার বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া সময় নষ্ট করিতে কেহ তখন প্রস্তুত হয় নাই। আজ যুগান্তর পরে সে কথা সকলের গ্রাহ্য হইয়াছে; সেই কথা বঙ্গে কেন, সমস্ত ভারতের বর্ত্তমান যুগের বিশেষ চিন্তার বিষয় এবং ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় জল্পনার বিষয় হইয়াছে। হাটে, ঘাটে, মাঠে, রণে, বনে, শ্মশানে, সকল স্থানেই সেই আত্ম-নির্ভরতার মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" শব্দে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া সকলের জল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য তোমাকে ঈশ্বর-প্রেরিত-দের লুক, যোহন, মথি, মার্ক প্রভৃতির ন্যায় একজন ভবিষ্যদ্বক্তা বলিতে ইচ্ছা হয়। দুর্ভিক্ষ দমন জন্য শুধু ফরিদপুর কেন, যে কোনও দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তোমার প্রথম জীবন হইতে অকুতোভয়ে সকল দেশকেই আপনার দেশ মনে করিয়া দুর্ভিক্ষ দমন করিয়াছ। সুতরাং দুর্ভিক্ষ দমন এবং কাঙ্গালদের সেবা ও পরোপকার জন্যই ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ দমন সম্বন্ধে যে তুমি মুক্তহস্ত ও সিদ্ধ পুরুষ, তাহা ভারতের সকল স্থানেই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। তুমি দুর্ভিক্ষরূপ মহামারী নিবারণের বহুদর্শী পুরাতন চিকিৎসক, সন্দেহ নাই।

শুভক্ষণে, কি কুক্ষণে,লর্ড কর্জ্জন আমাদের মাথায় বঙ্গবিভাগ রূপ কঠিন বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? যদি তাহার বজ্রপাতে বঙ্গ, বঙ্গ কেন,সমস্ত ভারত জাগিয়া থাকে, তবে শুভক্ষণ; অন্যথা ভারত অগাধ জলধি জলের নিম্নস্তরে চিরদিনের জন্য নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে কুক্ষণ বলিব নাত কি? তোমার সেবা-ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া, স্বদেশ-মন্ত্রে মাতো-য়ারা হইয়া বহু লোককে ঘরের বাহির হইতে দেখিয়া মনে আশা হইতেছে, দুঃখিনী মাতার সন্তানগণ জাগিলেও জাগিতে পারে। কর্জ্জনের বজ্র ক্ষেপণের শব্দে—আমাদের আর কিছু না হউক, সমস্ত ভারতের চমক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা অন্ধ ছিলাম,—জন্মা-বধি আমরা আপাত-মধুর-পরিণাম-বিষযুক্ত বিদেশী দ্রব্যে চক্ষে অঞ্জন দিয়া চক্ষুকে বিভোর তন্দ্রায় অভিভূত রাখিয়াছিলাম। কর্জ্জনের বজ্র নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যে বৈদ্যুতিক আলোর বিকাশ হইয়াছিল,তাহাতে আমাদের চক্ষের তন্দ্রা ঘুচিয়াছে। ঐ আলোতে আর কি দেখিলাম? আমরা হিন্দু,মুসলমান, খ্রীষ্টান যত জাতি ভারতে আছি,সকলেই এক মাতার গর্ভসম্ভূত, এক মায়ের স্তন্যপানে

বলিষ্ঠ। ঐ আলোতে আমাদের মজ্জাগত নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। পরস্পর ভাই ভাই বিশেষরূপে পরিচিত হইতে এবং সকলে এক-হাড়, এক-প্রাণ হইতে শিখিয়াছি; আপন পর চিনিতে পারিয়াছি। তোমার ন্যায় মাতার সুসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে পারিলে, ভাবী জীবন সুখে কাটাইতে পারিবার আশা করা, আমাদের অন্যায় হইবে না।

এখানে অনেক স্বদেশদ্রোহী, তোমার চক্ষের সম্মুখে, বিলাতী বস্ত্র, লবণ, চিনি খরিদ বিক্রয় করিয়া তোমার বুকে বেদনা দিতেছে, দেখিতে পাই। তাহা অনভিজ্ঞ অপরিণামদর্শিতার ফল। সময় হইলে তোমার নিজ হস্তের শাণিত বয়কট-অস্ত্র এ প্রদেশের স্বদেশ-দীক্ষার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে। আমাদের ম্যাক্‌সিম্ কামান, বন্দুক ও রেগুলেশন লাঠীর গুঁতো কিছুর প্রয়োজন নাই। একমাত্র শাণিত বয়কট-অস্ত্রের নিকট ঐ সকল অস্ত্র পরাস্ত ও হার মানিয়াছে। যে অস্ত্রের একটু খোঁচাতে এত বড় শ্বেতাঙ্গ বণিক সমাজের হৃদয় মধ্যে এক সময় খেলারাম তুলারাম করিয়াছিল এবং করিতেছে, সেই শাণিত বয়কট-অস্ত্রে এ প্রদেশের স্বদেশদ্রোহী নগণ্য কুলাঙ্গারগণ যে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া জীবন ভিক্ষা চাহিবে, তাহা বলা যাইতে পারে। সময় বুঝিয়া, তোমাকেই সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপসংহারে তোমাকে আমরা কি উপহার দিব? একমাত্র ভক্তি, শ্রদ্ধা ও চক্ষের জল ভিন্ন আমাদের গরীব দেশে আর কিছু নাই, যাহা তোমার উপযুক্ত হইতে পারে। তোমার স্বদেশ-প্রেমের আভাসে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, যদি আমাদের গরীব দেশের সকল লোকের পিতা মাতা কেহ থাকে, তবে তাহা তুমি। যদি কেহ বন্ধু থাকে, তাহা তুমি। যদি আত্মীয় হইতে আত্মীয় কেহ থাকে, তাহা তুমি। তুমি ভিন্ন এই গরীব দেশের জন্য কাঁদিবার, কি এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিবার লোক আর নাই। অসময়ে আমাদের তালাসের লোক আছে জানিয়া প্রাণ বড় আশ্বস্ত হইয়াছে। অবশ্য যে সকল মহাত্মাদের সাহায্যে আজ বহু সহস্র লোককে তুমি অযাচিত অন্নছত্র খুলিয়া ৫মাস কাল পর্য্যন্ত অন্নদান করিয়া গেলে, তাঁহাদের চরণে আমাদের শত শত নমস্কার এবং তাঁহাদের নিকটে আমরা চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। কিন্তু সমুদ্রে রত্ন আছে, তাহা আনিয়া দেয় কে? যদি তুমি তোমার পরিবার বর্গের ন্যায় মনে না করিয়া, দূর হইতে অভয় বাণী দিতে, তাহা হইলে ক্ষুধাতুর কাঙ্গালদের পেট ভরিত না। আমরা অকৃতজ্ঞ, তাই এখন পর্য্যন্ত তোমার একটী কথার ওজন বুঝিতে পারিলাম না; এখন পর্য্যন্ত আমাদের বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না; এখন পর্য্যন্ত আত্মসুখ হইতে পদমাত্র স্খলিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেছি। ইহাতে তোমার প্রাণে সময় সময় আঘাত লাগিতেছে বটে, কিন্তু কি করিবে? তোমার ঘরের লোক যদি অকর্ম্মণ্য হয়, তাহাকে কি কখনও পরিত্যাগ কর? এই ভরসায় আজ নির্লজ্জের ন্যায় তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, বিলাতী কাপড়, চিনি, লবণ, এক কথায় বলিতে গেলে বিদেশী দ্রব্য যে পর্য্যন্ত আমরা পরিত্যাগ না করিব, বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী বস্তু ব্যবহার না করিব, সে পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষে মরিতে দেখিয়া তোমার চক্ষের জল রাখিতে পারিবে না। তাই ভয় হইতেছে, এই হতভাগ্য দেশের জন্ত আরও কত কষ্ট সহ্য তোমাকে করিতে

হইবে। তোমার স্বদেশ-প্রেমের আভাসে আরও বুঝিয়াছি যে,কোটালিপাড়া,গোপালগঞ্জ ও বরিশাল জেলার অন্তর্গত পালরদী থানার কতক সাহায্য-প্রাপ্ত অনূন ২০০ গ্রাম যেন তোমার একখানি বাড়ী। অপিচ তুমি এখানে আসিয়া যে মহাযজ্ঞের আহুতি পূর্ণ করিয়া গেলে, সেই অসাধারণ ও দেব-যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর হোতা, তন্ত্রধারক সকলেই আমাদের নমস্য। অসংখ্য মৃতকল্প মনুষ্য-জীবনে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া দেওয়া তাহার ফল। যজ্ঞ-ক্ষেত্র এই ক্ষুদ্র নগণ্য গ্রামখানিও তোমার আগমনে পবিত্রতা লাভ করিল। যে নিষ্কাম প্রেমের হাট মিলাইয়া গেলে, তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। তুমি এই সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে শুনিয়া, ঐ দেখ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ এবং বালক বালিকাগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। দুই শত খানা গ্রাম জুড়িয়া ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিয়াছে। তুমি মহাপ্রাণ, প্রেমিক, সমস্ত প্রেম গুছাইয়া ভগবান তোমাকে মানব-রূপে সৃষ্ট করিয়াছেন। তাই প্রতি দুঃখিত কাঙ্গালের জন্য তোমার প্রাণ মুহুঃমুর্হু কাঁদিয়া উঠে। তুমি আদর্শ প্রেমিক, তাই অসংখ্য নর নারী তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘ জীবন জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। কবি বলিয়াছেন 'প্রাণ গলিলে নয়ন গলে,' দেখিলাম আমাদের জন্য সত্য সত্যই তোমার প্রাণ গলিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আমাদের জন্য তোমার হৃদয়ে একটী তারহীন টেলিগ্রাপের যন্ত্র থাকিবে। কোটালিপাড়া তোমার, ইহা যেন তোমার হৃদয় হইতে বিচ্যুত না হয়। আড়ম্বরে রাজ্যাভিষেক করিলে লোকে রাজা বলিয়া জানে। তুমি যে এখানকার অগণ্য নরনারীর হৃদয়-রাজ্য নীরবে অধিকার করিয়া গেলে, ইহা যেন তোমার স্মরণ থাকে। হইতে পারে, তোমার গুণে মোহিত হইয়া নানা প্রকারের মূল্যবান অভিনন্দন স্থানান্তর হইতে দিবে, কিন্তু আমরা গরীব, তাহা কোথায় পাইব? আমাদের হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও চক্ষের জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিয়া হৃদয়রাজ্যে বসাইয়া রাখিলাম,স্মরণ রাখিও। যতদিন থাকিব,তোমাকে যেন লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি। যে পরোপকার কঠোর মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, তোমার সেই ব্রতের সম্পূর্ণতা দেখিতে পাইয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আদর্শ জীবন দৃষ্টে, তোমার পদাঙ্ক অনুকরণ করিয়া ফরিদপুরে যেন শত শত দেবীপ্রসন্নের আবির্ভাব হয়। তাই দেব, আবার ভয়ে ভয়ে বলিতেছি,এখানকার দুর্ভিক্ষের আরম্ভ ও প্রশমনের যে চিত্র তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইল, সুদূর কলিকাতায় পৌঁছিয়া যেন তাহা ভুলিয়া না যাও। তোমাকে প্রাণের সহিত অভিবাদন ও প্রণাম করি। সকলে প্রাণ ভরিয়া বল,বন্দে মাতরম্।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীদিগের পক্ষ হইতে

তোমারই

শ্রীমনোমোহন দাস।

পিঞ্জরী।

(২)

আজি এই বিদায়ের দিনে, হৃদয়ের
কৃতজ্ঞতা জানাই কেমনে? কি ভাষায়,
কি ভাবে, কি ভঙ্গি হেন না পাই খুঁজিয়া,
আজিকার মনোভাব প্রকাশে যাহাতে।
মূর্খ, অজ্ঞ, ভাষা-বর্ণ-জ্ঞান-হীন, দীন,
আমরা সকলে। তবে যদি হৃদয়ের

অন্তঃস্থল করি উদ্ঘাটন ; যথা হনু
পুরাকালে যোগীর বাঞ্ছিত পূর্ণবক্ষ
শ্রীরাম মূরতি দেখাইল হৃদাসনে,
পারি আজি দেখাইতে তোমার মূরতি—
কৃতজ্ঞতা-গড়া।

কে তুমি, মানব তুমি,
তুমি কি মানব ? প্রত্যক্ষ দেবতা তবে
কি আর জগতে ? প্রাণদাতা, অন্নদাতা,
ভয়ত্রাতা তুমি এ দুর্দ্দিনে। দুরভিক্ষ
বিকট আকার, সঙ্গে পীড়া শতচর,
বাড়ী বাড়ী, ঘরে ঘরে, মানুষের প্রাণ
লয়ে খেলিত সে আপন উল্লাসে। শিশু
গুলি জঠর জ্বালায় "দে ভাত দে ভাত"
বলি মায়ের অঞ্চল ধরি বিলুণ্ঠিত
হইত ধরায়। নীহারের বিন্দু যেন
মায়ের নয়নে বিগলিত অশ্রুধারা।
মাতা রহিত নীরবে। নীরবে সহিত,
নীরবে হেরিত আপন নন্দন জ্বালা।
হায়রে ! বিদরে বুক কত অভাগীর
হৃদয়ের ধন, প্রাণের পুতুল আত্ম-
বিসর্জ্জন করিয়াছে, মায়ের সমক্ষে,
অসহায়, নিরাশ্রয়, না পারি সহিতে
জ্বালা, আহা ! দুর্ভিক্ষ-কবলে। কত জীর্ণ
শীর্ণ মৃত-কল্প-কঙ্কাল-দেহ, শায়িত
নিস্পন্দ কেহ, ছিল প্রতীক্ষায়, কখন্
জঠর জ্বালা জুড়াবে তাহার ; ছিড়িবে
সে মায়ার বন্ধন। হেনকালে তুমি, দেব !
কোন্ স্বর্গ হতে বীরেন্দ্র সহিতে, বীর
বেশে আসি হইলে উদয় ; খাল বিল
জল কাদা করি অতিক্রম প্রতিবাড়ী
ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিবস শর্ব্বরী দোঁহে,
অনিদ্রায় অনাহারে বাঁচাইলে শত
শত সহস্র পরাণ। আজি মোরা সবে,
তোমার পালিত, তোমার আশ্রিত, তব
দয়া-বিজড়িত-রক্ষিত জীবন নিয়ে
উচ্চরবে বলি বন্দে মাতরম্। বলি
সমকণ্ঠে জয় জয় দেবীপ্রসন্ন
নামের জয় ! এক হয়ে সবে গাহিব
মিলি "দয়ার সাগর দেব অবতার
তুমি সুসন্তান বঙ্গমাতার।" জয়
হউক তব নামের জয় যতদিন
ধরা বিলয় পায়। আমরা তব পূত
নামের মহিমা গাহিয়া গাহিয়া, বাকী
এ জীবন করিব ক্ষয়।

হে দেব ! তুমি
পিতা, পিতা নাই যার, তুমি মাতা, মাতৃ
হীন যারা ; তুমিই আশ্রয় নিরাশ্রয়
অনাথের ; অন্নদানে বাঁচাইয়া আজি,
বিদূরিলা শীত কষ্ট, লজ্জা নিবারণ
নব বস্ত্রদানে।

জগতের পিতা সেই
পরমেশ পাশে, কি আশীষ দেব !
মাগিব হে তব লাগি ! এই বর মাগি
জাগুক নিয়ত হৃদে মঙ্গল-কামনা,
পূর্ণ হোক চিরদিন মঙ্গল বাসনা।
আর মাগি, তব সনে, দিবা রাত্র থাকি
অনশনে, আমাদেরি তরে খাটিয়াছে
যাঁরা, তাঁহাদের লাগি, সবে এই বর
মাগি, তোমার আদর্শ, তোমার চরিত,
তাঁদের জীবনে হউক স্ফুরিত। তাঁরা
লভিয়া তোমার শিক্ষা, পাইয়া তোমার
দীক্ষা, হউক তাঁহারা তোমার মত।

তোমার রক্ষিত ও আশ্রিত
কোটালীপাড়া দীন দুঃখী কাঙ্গালীগণ।

---

(৩)

কে তুমি দেবতা বেশে, এ দুর্দ্দিনে হেন দেশে
দীনের ক্রন্দন-বাণী করিয়া শ্রবণ,
অবতীর্ণ সদাশয়, নাশিতে দীনের ভয়
তুমি কি সে দীননাথ দুর্দ্দিন ভরণ ?

হেরি বিশ্ব দুখ পূর্ণ, হয়ে অতি কৃপাপূর্ণ,
বিধাতার অবতার শুনিয়াছি আগে,
শ্রুত সে পবিত্র কথা, শ্রুত সে করুণা গাথা,
কেবল বিশ্বাস মূলে বদ্ধ অনুরাগে।
আজি কি তা দেখাইতে, দীনদৈন্য বিনাশিতে,
দরিদ্র পতিত দেশ করিতে উদ্ধার,
প্রেম বীরত্বের ছবি, নির্ম্মল প্রভাত রবি,
'দেব' রূপে অবতীর্ণ করুণা আধার।
ধন্য লো কোটালীপাড়া ধন্য আজি তুই,
যেই রত্ন বাঁধা ওই আঁচলে তোমার
ভূতলে দ্বিতীয় নাই, অতুল স্বর্গের ঠাঁই
দেবতাও পূজে বুঝি জানি ব্যবহার।
ধন্য এ দুর্ভিক্ষ তোর লাভের বাজার।
সত্য দেব তুমি নর নহ কভু, চরাচর
দেখে নাই কভু হেন নরের গঠন,
পূত করুণায় গড়া, পূত করুণায় ভরা
হৃদয় স্বর্গীয় প্রেম-সুধা-প্রস্রবন।
দেবতার উর্দ্ধে স্থান, সেই তব অধিষ্ঠান
ধরণী অযোগ্য তোমা করিতে ধারণ,
সংসারের কীটশ্রেণী, নীচ স্বার্থ অভিমানী,
যথা নিত্য হিংসা-বিষ করে বরিষণ।
আজি যদি এই দেশে, এদেশ পালক বেশে,
এ দুর্দ্দিনে না আসিতে তুমি গুণমণি,
শুনিত দূরেতে যারা, শ্মশান কোটালীপাড়া,
দারুণ দুর্ভিক্ষ-গ্রাসে নাহি এক প্রাণী।
ঘরে ঘরে শবস্তূপ, কি শ্মশান অপরূপ,
ভাবিতেও আজি যাহা শরীর শিহরে,
দেখিতে হইত তায়, রাশি রাশি ভেসে যায়
রাশি রাশি টেনে খায় শৃগাল কুকুরে!
বাঁচিয়া থাকিত যারা, তারাও হইত সারা,
পশে যবে দাবানল ঘোর বনান্তরে,
ক্ষুদ্রতরু তৃণচয়, পলকে পুড়িয়া যায়,
অর্দ্ধদগ্ধ করে যায় মহীরুহ বরে।
সেই দয়া প্রকাশিলে, অতুল অবনীতলে
মানবের শক্তি বলে না হয় সম্ভব,
রবে বিশ্ব যত দিন, কালে না হইবে লীন,
ছড়ায়ে ভূতল বক্ষে দুর্লভ সৌরভ।
আয় ভাই সবে মিলি, প্রাণের কবাট খুলি
'দেবীর' চরণরেণু লই শিরে তুলে,
পাবেনা এমন দিন, হবে না এমন দিন,
স্বর্গের দেবতা হেন উদিবে ভূতলে।
জয় দেবীপ্রসন্নের, জয় বঙ্গ-সন্তানের,
জাগিয়া উঠুক দেশ.গাও সবে জয়,
দেবোপম দীর্ঘজীবী, হউক মোদের 'দেবী,'
মাগি লও বর, দেবীপ্রসন্নের জয়!

কোটালীপাড়া হাই স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্র
শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী।
মদনপাড়, দেড়ানি বাড়ী।

---

( ৪ )

১। কে তুমি দেবতা, স্বর্গ পরিহরি,
লভিলে জনম ভারত মাঝে।
সুখ, বিলাসিতা, বিসর্জ্জন করি,
নিয়োজিত সদা দেশের কাজে।

২। দরিদ্রের দুঃখ করিতে মোচন,
আজি আগমন কোটালীপাড়ে।
দীন দুঃখী যত পেয়েছে জীবন,
তোমার করুণা-কটাক্ষ-করে।

৩। তাই ঘরে ঘরে সবে উচ্চৈঃস্বরে
করিছে তোমার মহিমা ধ্বনি।
তব যশোগীতি জলদ গম্ভীরে
ঘোষিবে ভারতে দিবস যামিনী॥

৪। তবসম বন্ধু কে আছে এমন
রক্ষিবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ করে।
শত শত লোক ত্যাজিত জীবন
হা অন্ন, হা অন্ন, হা অন্ন, ক'রে॥

৫। প্রতি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে
শবে স্তূপাকার হইত ধরা।

করাল কালের ভীম অত্যাচারে
শ্মশান হইত কোটালীপাড়া ॥

৬। অহো, কিবা, সেই দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
স্মরণ করিতে শিহরে কায় ;
নিত্য নিরন্তর কত নারীনর
ত্যজিত জীবন অন্নের দায় ॥

৭। বৃটীশ-শাসিত ভারত ভিতরে
বাজে দুর্ভিক্ষের বিজয় কাড়া ;
ধনৈশ্বর্য্য লুপ্ত বিদেশীর করে,
দলিত মথিত করিছে তারা ॥
নীরব আর্য্যের কোদণ্ড টঙ্কার,
নীরব দামামা, ডমরু ধ্বনি,
কাঁপিত যাদের বীর্য্যে চরাচর
সেবিত যাঁদেরে কমলা বাণী ॥
সেই স্বর্ণভূমে ঘোর হাহাকার,
পশিছে এ রব ত্রিদিব পুরে ;
তাই বুঝি ধাতা হইয়ে কাতর
প্রেরিছেন তোমা দরিদ্র তরে ॥

১০। দিগন্ত ব্যাপিয়া বাড়বাগ্নি প্রায়
জ্বলিছে ভীষণ দুর্ভিক্ষানল ;
তুমি বিনা হেন কে আছে ধরায়
এ ভীষণ বহ্নি করে সুশীতল ॥

১১। ক্ষুদ্রমতি মোরা অতি অভাজন
কেমনে করিব তোমার গান ;
ভুলিও না নাথ ! এই আকিঞ্চন
বিদায়েতে তব ব্যাকুল প্রাণ ॥

১২। মহিমা-মণ্ডিত প্রশান্ত মূরতি,
মহত্ত্বের গুণে জিনিলে ধরা,
তোমারে পাইয়ে আনন্দিত অতি
ধন্য হল আজি কোটালীপাড়া ॥

১৩ কুমুদ কহ্লার মল্লিকা মালতী
কোন ফুলে তোমা করিব পূজা ;
হৃদি-কুঞ্জ হ'তে প্রীতি-পুষ্প গাথি
দিব মালা গলে কাঙ্গাল-রাজা ॥

১৪। ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তি উপহার
করিনু অর্পণ তোমার পায়,
করিলে গ্রহণ দেব অবতার
পুলকে পূর্ণিত হইবে কায় ॥

কোটালীপাড়া উনশিয়া স্বেচ্ছা-
সেবক সম্প্রদায় ॥

---

( ৫ )

দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার।
অবিরত অন্নদানে, তুষিছেন দুঃখী জনে,
দয়ার আধার তিনি দয়ার আধার ॥
নর রূপে জন্ম ধরি, বিষ্ণু কিংবা ত্রিপুরারি,
আসিলেন দেবী বাবু সংসার মাঝার।
দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার ॥

দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার।
আসিলেন এ ভারতে, দুঃখীগণে বাঁচাইতে,
দেখিয়া তাঁহার দয়া লাগে চমৎকার ॥
মানুষে কি পারে এত, কত লোক শত শত,
সবাকেই দেন তিনি আশা যা যাহার।
দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার ॥

দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার।
পাইয়া অনেক ক্লেশ, আসিয়া মোদের দেশ,
লয়েছেন মাথা পাতি এই গুরু ভার ॥
অন্ন বস্ত্র করে দান, বাঁচালেন কত প্রাণ,
তাই বলি এই দেব স্নেহের আধার।
দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার ॥

দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার।
এসেছেন যত লোক, অনেকেরি অন্ন-শোক,
তা সবারে জিজ্ঞাসেন কি শোক তোমার,
পায়ে ধরি বলে, বাবু, মোরা সবে অন্নে কাবু,
দুটী অন্ন দিয়ে প্রাণ বাঁচাও আমার।
দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার ॥

দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার।
কারো বহে চখে পানি, কারো নাহি বস্ত্র খানি,

উর্দ্ধ মুখে চেয়ে সবে করে হাহাকার॥
প্রাণ যায় বলি কাঁন্দে, দেখে বুকে শেল বিঁধে
অন্ন দিয়া তা সবাকে করেন উদ্ধার॥
দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার॥

দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার।
করিয়া বহু'ল যত্ন, যোগাইয়া ধন রত্ন,
দিয়েছেন ভিক্ষুকেরে ডাকি বার বার॥
কে আছে আর এজগতে, দুঃখীগণে বাঁচাইতে
দেবী বাবু বিনে বল কেবা পারে আর।
দেবী বাবু এ ধরায় দেব-অবতার॥

শ্রীমতী কিরণবালা সেন গুপ্তা।
পিঞ্জরী।

---

( ৬ )

১। দেবীপ্রসন্ন ভবতে কিমিবাস্তি দেয়ং,
যৎ যৎ পুরা প্রথম দর্শনতো ন দত্তং।
ত্বয্যাগতে প্রমৃজিতং প্রসৃতং যদশ্রু
তৎ প্রস্থিতেন ভবতা প্রতি গৃহ্যতাং নঃ॥

২। চির-মেব হৃদি প্রতিষ্ঠিতা
তব মূর্ত্তি নহি বিস্মৃতা ভবেৎ।
অয়ি দেব! বয়ং ত্বয়া ক্বচিৎ
সুকৃতার্থাঃ সময়ে স্মৃতাযদি॥

৩। কাময়ে মহি সদা জগদীশং
পুত্রমিত্রযুতমেবমশেষং।
দেবীপ্রসন্ন মিহ দেব চরিত্রং
রক্ষ রক্ষ নিজ-সৃষ্টি বিশেষং॥

৪। যন্মাতৃ সেবা ব্রত দীক্ষিতাবয়ং
তদ্ দুঃখ হানির্ভবতা কৃতাদ্য।
তস্মাদিদং সেবকবর্গ জীবিতং
ত্বয্যর্পিতং যদ্ বিহিতং বিধীয়তাং॥

স্বেচ্ছা-সেবকানাং।
কোটালীপাড়া, উনশিয়া।

( ৭ )

১। ভবে ভবানীশ ভবেশ বেধাঃ,
স্থিতৌরমেশঃ প্রলয়ে হরস্ত্বং।
গুণানুরূপং তব রূপমেবং,
প্রবন্ধ বাচ্যং পুরুষং সুপায়াৎ।

২। বিদ্বল্ললাম ভুবি বিশ্রুত পূর্ণকামঃ,
বিশ্বোপকার ব্রত সর্বগুণৈক ধাম।
প্রাদেশ্য বঙ্গীয় সভাযদ্যৎ প্রদীপঃ,
কীর্ত্তি দিবং ব্রজতু তে সততং সুধীর॥

৩। আজন্মনঃ প্রতিদিনং যত মানএষ,
শক্তিং লভে নভবতামুপহার যোগ্যাং।
আজীবনং গুণকথা কথনায় কল্পে,
মদ্দেহমুত্তম যশস্তব পাণিপদ্মে॥

শ্রীরেবতীমোহন দেব শর্ম্মণঃ।
উনশিয়া।

( ৮ )

১

দেবীপ্রসন্নভবতা ভ্রমতাসমন্তাৎ।
দুর্ভিক্ষমৃত্যুমুখতঃ পরিরক্ষিতা যে
তেষামিমান্ প্রতিনিধীন্ অথ তান্স্বয়ঞ্চ
সর্ব্বান্কৃতার্থয়ঃকৃপাকার দৃষ্টিপাতৈঃ।

২

দেবীপ্রসন্নভবতা ভ্রমতাসমস্তাৎ
বীরেন্দ্রপ্রাণ সহিতেন নিরন্নদেশে
সন্তারণেন দুরতিক্রমগর্ত্ত বর্ত্ম
হাহাবিলোকিত চরামৃতকল্পলোকাঃ।

৩

দেবীপ্রসন্ন ভবতাভ্রমতাসমস্তাৎ
নারীজনান্ অহহ বস্ত্রবিহীনগাত্রান্
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ শিশুভিঃ প্রতিযাচিতান্নান্
দৃষ্ট্বাশ্রুভির্বসনমন্নমথাস্তবৃষ্টং।

দেবীপ্রসন্নভবতা ভ্রমতাসমন্তাৎ
পূর্ব্বং ত্রয়োদশশতেবতবঙ্গবর্ষে
কোটালিপাড় নগরীস্থিতসর্ব্বলোকাঃ
সংরক্ষিতাস্তবকৃতজ্ঞতমাশ্চিরায়।

৫

দেবীপ্রসন্নভবতা ভ্রমতাসমন্তাৎ
প্রত্যক্ষসিদ্ধমিতিহাসকথাপ্রমাণং
বীরপ্রসূতিরিতি ভারত ভূমিরেষা
রত্নপ্রসূরিতি চ সর্ব্বমথাগ্যদৃষ্টং।

৬

দেবীপ্রসন্নভবতা ভ্রমতাসমন্তাৎ
যুদ্ধং বিধায় সহকষ্ট শতেনবীর
প্রত্যক্ষমেব নমুদান দয়াদি ধীর-
ধর্ম্মঃ স্বয়ং প্রকটিতো বতদুর্দ্দিনেঽস্মিন্।

৭

দেবীপ্রসন্নভবতা ভ্রমতাসমন্তাৎ
দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বিষাদিত পূর্ব্ববঙ্গ—
কোটালিপাড় নগরী জনসঙ্ঘ এষঃ
শশ্বৎ পুরা নমুযথাগ্যকৃতঃকৃতজ্ঞঃ।

৮

দেবীপ্রসন্নভবতা ভ্রমতাসমন্তাৎ
উদ্যোগিনাসততমিত্থমসীমধৈর্য্যৈঃ
স্বেয়ং কদাপুনরপি প্রপতেদিদংবা
দুর্ভিক্ষ দুর্দ্দিন;মতোবিকরালমূর্ত্ত্যা।

৯

যাবন্নপোষণময়ছলতোঽথবঙ্গে
শস্যাদি শোষণমিদং বিদধ-দ্বিদেশী
বাণিজ্যশিল্পনিরতো নিজদেশ পুর্ত্তিং
সম্যগ্বিধাস্যতি বিমোহ্য চ বঙ্গপুত্রান্

১০

মাত্রাপ্রবোধিত তমোঽপিচ;বঙ্গবাসী
সুপ্তোত্থিতঃ পুনরমৌষধিম.প্রস্থপ্যাৎ
স্বাধীনশিল্পবিভবোঽথ বণিক্স্বয়ংস্যাৎ
দুর্ভিক্ষবারণ মহো ভবিতাতদৈব।

১১

যস্ত্বন্নসঙ্কটময়ে সবিধেনৃপস্য
দুর্ভিক্ষতো মনুজভীতিকরে শ্মশানে
তিষ্ঠেৎ;সহায় ইহ বান্ধব এবসস্যাৎ
তন্নোঽগ্রজঃপিতৃঃসমোঽস্তথবান্ধবস্ত্বং।

১২

যঃ প্রোষিতেপিতরি মাতুরনুজ্জয়ার্য্যো
জ্যেষ্ঠোঽনুজান্ বিপদিরক্ষতি ভাগ্যহীনান্
মাতৃস্তথাঽবিধসুতে করুণাধিকাস্যাৎ
জীবেতি মঙ্গলবচো ভবতি প্রকৃত্যা।

১৩

সূর্য্যঃ সদা তপতিচন্দ্র ইহা ভ্যুদেতি
ক্ষীণোতিধাবতি;পরংগ্রহ এষ সর্ব্বঃ
যস্যেচ্ছয়া স ভগবান্ পরদুঃখশান্ত্যৈঃ
দেবীপ্রসন্নকুরুতাৎ চিরজীবিনংত্বাং।

১৪

অস্মাকমেতদপি নাস্তি বচোবিভুত্বং
নৈবান্যথারজতকাঞ্চনসম্পদোবা
কেনাভিনন্দনমিদং ন তথাচবিস্ময়ঃ
মূর্ত্ত্যা হৃদন্তরচরীহিকৃতজ্ঞতেয়ং॥

কোটালিপাড়া জন-সাধারণ-কৃতজ্ঞতা-পত্রম্।

১

হে দেবীপ্রসন্ন! তুমি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া (অধিক কি নিজের শরীরের প্রতি পর্য্যন্ত দৃষ্টি না করিয়া) ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, হে মহাত্মন্! আজ সেই সকল ব্যক্তি তোমার চতুর্দ্দিকে (তোমাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত। (তাহাদিগের প্রতি) কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ কর।

অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হতভাগ্য এদেশবাসী ব্যক্তিবর্গের হাহাকার ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক যখন প্রতিধ্বনিত হইল, তখন মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ ও বীরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া দুরতিক্রমণীয় বিল প্রদেশীয় জল জঙ্গল গর্ত্তসমূহ সন্তরণাদি দ্বারা বহুকষ্টে অতিক্রমণ করিয়া যে মৃতকল্প লোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়াছ, হে দেবীপ্রসন্ন! তাহারা তোমার কৃপায় মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার পাইয়া আজ তোমার সমীপে উপস্থিত।

হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই দেশ ভ্রমণকালে ক্ষুৎপিপাসায় বিশুষ্ক-কণ্ঠ বালক বালিকাগণের অস্ফুটস্বরে অন্নযাচঞায় ব্যথিত-হৃদয়া বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণে অসমর্থ কামিনীগণের অশ্রু-বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অন্ন বস্ত্র দানে যাহাদিগের অভাব মোচন করিয়াছ, হে দেবীপ্রসন্ন! আজ তাহারা তোমার সমীপে উপস্থিত।

৪

হে দেবীপ্রসন্ন! তোমার এই কার্য্য অভিনব নহে—অতীত পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শত বঙ্গাব্দে এই কোটালীপাড়া নিবাসী ব্যক্তিগণ যখন ঘোরতর দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত হইতেছিল, তখন তোমারই যত্নে এবং তোমারই কৃপায় এদেশবাসী হতভাগ্য সন্তানগণ জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেজন্য চিরদিনই এদেশ তোমার নিকট কৃতজ্ঞ।

৫

হে দেবীপ্রসন্ন! তোমার অমানুষিক পরিশ্রম ও কার্য্য দর্শনে তোমাতে ত্রিবিধ বীরত্বই আমরা উপলব্ধি করিয়াছি; পরন্তু ইতিহাসাদি পাঠে বীরপ্রসূত রত্নগর্ভা বলিয়া ভারতভূমি চিরপ্রসিদ্ধ বলিয়া বুঝিয়াছি, তোমা হইতে আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।

৬

বলা বাহুল্য যে, প্রত্যহ শত শত কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া তুমি যুদ্ধবীর বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছ এবং অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়া দানবীর বলিয়া অভিহিত হইয়াছ এবং দারুণ দুর্ভিক্ষ জ্বালায় কাতর ব্যক্তিগণের অবস্থা দর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া দয়াবীর নামে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ।

৭

পুনর্ব্বার বলিতেছি, দুর্ভিক্ষ-জ্বালায় প্রপীড়িত ঘোর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন পূর্ব্ব বঙ্গবাসী এই কোটালিপাড়ায় আমরা সকলে বারম্বার তোমারই সাহায্যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, তাই বলি, তুমিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু ও বিপদের সম্বল, তোমাকে বারম্বার ধন্যবাদ।

৮।৯

হে দেবীপ্রসন্ন! তুমি আমাদের জন্য সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিতেছ, তোমায় অধিক বলিবার কিছুই নাই, তথাপি ভীত হইয়া বলিতেছি, পুনর্ব্বার যখন দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী বিশাল মুখ ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে, তখন যেন তোমায় এই মূর্ত্তিতে আমরা দেখিতে পাই, সেইজন্য তুমি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও, কারণ এই দেশে দুর্ভিক্ষপাতের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, যেহেতু কুটীল-নীতি-পরায়ণ দয়াধর্ম্ম-বিহীন স্বার্থপর বিদেশীয় বণিকদল আমাদিগকে পোষণ করার ছলে এদেশের ধন ধান্য প্রভৃতি অপহরণ করিয়া

সর্ব্বদা নিজদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে। যেরূপ দানব-শাসিত রাজ্যে দেবগণ ক্ষণকালের জন্যও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বাস করিতে পারেন নাই, আমরাও যতদিন এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য স্বাধীনতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিব, ততদিন এদেশের কল্যাণের ও সুখ স্বচ্ছন্দে বাসের সম্ভাবনা নাই এবং দুর্ভিক্ষও চিরসহচর থাকিবে।

১০

যদিও জননী অবোধ দীন হীন সন্তানগণের দুঃখ বিমোচনের জন্য আমাদিগের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়াছেন, তথাপি যদি আমরা দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অলসতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সর্ব্বদা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে অভিনিবিষ্ট না থাকি, তবে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই।

১১

অন্নসঙ্কটময় দুর্ভিক্ষে, রাজদ্বারে, রাজবিপ্লব সময়ে এবং পরম ভীতিকর শ্মশানে যিনি সহায় স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই অগ্রজ অথবা তিনিই পিতৃস্থানীয় পরম বান্ধব, অতএব আমরা অনুপযুক্ত হইলেও নিয়তই তোমাকে বান্ধব বলিয়া জানিতেছি।

১২

পিতা বহুদূরে বাস করিলে তৎপ্রতিনিধি স্বরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই অনুজদিগকে স্নেহ-মমতা সহকারে রক্ষা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য জননী সর্ব্বদাই সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন, সুতরাং আমরা সুদূর সমুদ্র-প্রান্তে অবস্থিত পিতৃস্থানীয় রাজার কৃপা-দৃষ্টির অধিকারী না হইলেও তুমিই বঙ্গজননীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া আমাদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় বিপদ হইতে রক্ষা করিলে, সুতরাং এজন্য জননী জন্মভূমি সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন।

১৩

যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ সমস্ত নিজ নিজ কক্ষায় অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে, যাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে সংসার-চক্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেই করুণাময়ের ইচ্ছায় আমাদিগের মঙ্গলবিধানের জন্য তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান থাকিবে।

১৪

আমরা দীন হীন, সুবর্ণরজত প্রভৃতি কোন সম্বল আমাদিগের নাই, সুতরাং স্বর্ণ-রজত-খচিত অভিনন্দন-পত্র দান করিতে অসমর্থ, এরূপ বাক্‌শক্তি কিছুই নাই যদ্দ্বারা তোমার তৃপ্তিবিধান করিতে পারি, অভিনন্দন পত্র সে ভাবে তোমার উপযুক্ত করিয়া দিতে হয়, তাহাও জানি না, সুতরাং আমাদের অন্তর্নিহিত মূর্ত্তিমতী কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিরাভরণা এই ক্ষুদ্র পত্রিকা তোমাকে প্রদান করিলাম।

কোটালিপাড়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা-পত্র।*

* অভিনন্দন-সমূহের সম্বোধনের বহু বিশেষণ-সম্বলিত কথা-গুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। স, স।

# ভারতে মুসলমান।

"ভিনি ভিডি ভিসি" "যাইলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম" জুলিয়স সীজরের এই প্রসিদ্ধ বচন, মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ জয় সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে, সাধারণতঃ লোকের এইরূপ ধারণা আছে। অর্থাৎ "মুসলমান ভারতে আসিল, আর অমনি অতি সহজেই ভারত অধিকার করিল, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু

বিশ্বাসটী নিতান্ত ভ্রমমূলক ; এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ-বিরুদ্ধ। আরবগণ মুসলমান ধর্ম্মের অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হইয়া, যখন দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, তখন তাহারা যেখানেই গিয়াছিল, তাহাদিগের বল সেখানেই পৌঁছিয়াছিল ; সেখানেই মুসলমানদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। তেজে, দম্ভে, গর্ব্বে, মুসলমানগণ, এক হস্তে কোরাণ অপর হস্তে তরবারি লইয়া, রণোন্মাদে দেশ বিদেশে ছুটিতে লাগিল। মহম্মদের ধর্ম্ম, হিন্দুদিগের নিবৃত্তি মার্গ বুঝিত না ; বেদান্তের "জগৎ-মিথ্যা" চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইত না, এবং গীতার নিষ্কাম যুদ্ধ প্রচার করিত না। ইসলাম ধর্ম্ম বলিত, যেখানে পার আত্মশক্তি বিস্তার কর, অপরের দেশ কাড়িয়া লও, পরাজিত জাতির ধন লুণ্ঠন কর, পরাজিত ব্যক্তিদিগের সুন্দরী বনিতা দুহিতাগণকে আত্ম সম্ভোগে নিযুক্ত কর। আর কাফেরগণ যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমাদিগের সহিত যোগ দিয়া, তোমাদিগের বল বৃদ্ধি করে ভাল, তাহাদিগকে হত্যা করিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু যদি মুসলমান না হয়, তাহাদিগের মুণ্ডপাত কর, শত্রুকুল নির্ব্বংশ কর। রণে জয়ী হইলে কামিনী কাঞ্চন লাভের সম্ভাবনা। রণে মরিলে ইন্দ্রিয়-সুখের সাগর পাইবে। সুতরাং মুসলমানগণ এই ধর্ম্মবলে অদম্য অজেয় দুর্দ্ধর্ষ শক্তিলাভ করিয়াছিল এবং মহম্মদের মৃত্যুর চারি শত বৎসর মধ্যে তাহাদিগের অর্দ্ধশশাঙ্ক-লাঞ্ছিত জয় পতাকা হিন্দুকুশ হইতে পশ্চিম আসিয়া, আসিয়া হইতে আফ্রিকা, আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ ইউরোপ—সর্ব্বত্রই জয় পতাকা পত পত উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

মহম্মদ, সমুদয় আরবদেশ জয় করিয়া, এমন সাহসী হইয়াছিলেন যে তিনি, রোমক সম্রাট হিবাক্লিটাস এবং পারশ্য দেশের সাহাকে, মহম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। এবং উভয়ই আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, ছাফ নারাজি জবাব দিতে সাহস করেন নাই।

মুসলমানগণ মহম্মদের মৃত্যুর পর সেই বৎসর মধ্যেই বিপুল পারস্য রাজ্য জয় করিল ; আট বৎসরের মধ্যে মিশর তাহাদিগের হস্তগত হইল ; ৮০ বৎসরের মধ্যে স্পেন এবং পর্তুগাল তাহাদিগের পদানত হইল। বর্ষার বন্যার ন্যায়, ঝঞ্ঝাবাত-তাড়িত-সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়, মুসলমানগণ ইউরোপকে প্লাবিত করিবার উপক্রম করিল। ফরাসি দেশের বর্গিগুয়ান প্রদেশ গ্রাস করিতে উদ্যত। তখন ফরাসি বীর চার্লস মার্টেল মহাসমরে মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া মুসলমান-বীরত্ব-প্রকম্পিত খ্রীষ্টিয়ান ইউরোপকে রক্ষা করিলেন। এই ঘটনা মহম্মদের মৃত্যুর ১০০ এক শত বৎসর পরে হয়। সুতরাং আমরা দেখিলাম, ইউরোপে মহম্মদের মৃত্যুর ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের শক্তি ও বিস্তার অব্যাহত, অদম্য, অনিবার্য্য, নিত্যবিজয়ী।

কিন্তু মুসলমান এই সময় ভারতবর্ষে আসিত ও তাড়িত হইত। মহম্মদের মৃত্যুর ১৫ বৎসর পর ওসমান বোম্বাই উপকূলবর্ত্তী থানা ও ব্রোচ নগর আক্রমণ করিয়াছিল। তৎপরে (৬৬২ এবং ৬৬৪ খ্রীঃ অঃ) সিন্ধুদেশ অধিকার করিবার জন্য মুসলমান চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই। ৭১১ সালে তরুণবয়স্ক কাসিম সিন্ধুদেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহার স্থায়ীফল হয় নাই। ৭৬০ খ্রীঃ রাজপুতগণ মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে নিষ্কাশিত

করিয়া, এবং ৮২৮ খ্রীঃ সিন্ধুদেশ মুসলমানদিগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া, নিষ্কণ্টকভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

তাহার পরবর্ত্তী তিন শত বৎসর মুসলমান ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা আসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দক্ষিণ ভাগ অপেক্ষা ভারতবর্ষকে কঠিন স্থান, ভারতবর্ষীয়গণ কঠিন-যোদ্ধা অনুভব করিয়াছিলেন। কেন না, তখন তাঁহাদিগের গৃহবিচ্ছেদ ছিল না, তখন রাজাদিগের মধ্যে ঐক্য ছিল। যুদ্ধের সময় নরপতিগণ পরস্পরকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দেশের শত্রুকে ঘরে ডাকিয়া আনিতেন না। তাই মহম্মদের মৃত্যুর ১০০ শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান ইউরোপকে কা'ত করিয়াছিল, খ্রীষ্টীয়ানকে পদদলিত করিয়াছিল। কিন্তু ১০০০ খ্রীঃ যবন ভারতে রাজত্ব করিতে পারে নাই। আর যখন ভারতে যবন তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, তাহাও আস্তে আস্তে। দাক্ষিণাত্যে তালিকট যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদিগের শক্তি এককালীন লোপ হয় নাই। এদিকে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দুদিগের শক্তি আবার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ভাল করিয়া দেখিলে, মুসলমানদিগের ক্ষমতা ভারতে কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী মাত্র (১৫৭৮—১৭৭০) স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার ভিতরেও অনেক স্থানে হিন্দু শাসন-কর্ত্তাগণ কর মাত্র দান করিতেন। এক সময় অতীত না হইতে হইতেই, এক দিকে রাজপুতগণ উত্থিত হইতেছে, অন্য দিকে মারহাট্টাগণ মুসলমান-শাসিত প্রদেশেও চৌথ আদায় করিতেছে, মুসলমানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, আবার উত্তর-পশ্চিমে বীর শীখগণ শনৈঃ শনৈঃ মুসলমানগণের স্পর্দ্ধা সঙ্কুচিত করিবার জন্য মস্তক তুলিতেছে। যে মুসলমানগণ ৮০০ আট শত বৎসর স্পেন দেশ শাসন করিয়াছিল, দুই এক শত বৎসর পরেই সেই মুসলমানদিগের হস্ত হইতে ভারতকে আবার ভারতবাসী হিন্দুগণের হস্তে দিবার জন্য বিধাতা যেন স্বর্গে পরওয়ানা লিখিতেছিলেন। না, ভারতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তখনও হয় নাই। যে গৃহ-বিচ্ছেদে তাহারা মুসলমানের করায়ত্ব হইয়াছিল, সে গৃহ-বিচ্ছেদ তখনও যায় নাই। কুলাঙ্গার কান্যকুব্জ জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরিকে হিন্দুর বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতে প্রবেশ করিবার জন্য যে নীচপ্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সে নীচপ্রবৃত্তি, সে পাপ ভারত হইতে যায় নাই। তাই বিধাতা যেন মুক্তির পরওয়ানা না লিখিয়া আবার বলিলেন "ভারত! যতদিন তুমি নিজের পায়ের শিকল নিজে গড়িবে, যত দিন নীচ ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় জড়িত থাকিবে, ততদিন তোমার স্বাধীনতা কিরূপ করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তুমি এবার শ্বেতাঙ্গদিগের অধীন হইবে।" আবার এক জন ভারতবাসীকে নষ্ট করিবার জন্য আর এক জন ভারতবাসী, বিদেশীদিগের সাহায্য লইল।

এটা প্রকাণ্ড ভ্রম যে—ভারত অতি সহজে মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। তবে মুসলমানগণ কিরূপে রণে এতাদৃশ বিজয়ী হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য। ইহা ইতিহাসের একটী প্রহেলিকা।

মহম্মদ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচিত্রভাবে রণোন্মাদ মিশ্রিত করিয়াছিলেন। অন্য সকল ধর্ম্ম ব'লে, বিবাদ করিও

না, জীব হিংসা করিও না, ক্ষমা করিও, ইন্দ্রিয় দমন করিবে, ইন্দ্রিয় দমন করিলেই জীবনে প্রকৃত সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ মিছা, ক্ষণস্থায়ী, দুঃখ-পরিণাম। এক কথায়, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম বৈরাগ্য বা নিবৃত্তি-প্রধান —সংযম সংযম—দয়া দয়া দয়া—মৈত্রী মৈত্রী। মুসলমান ধর্ম্ম তাহা নহে—তাহা ইন্দ্রিয় সম্ভোগের একটী বিচিত্র স্বর্গ রচনা করিয়া যুদ্ধে কেমন প্রবৃত্তি দিতেছে!

"যদি যুদ্ধে জয়ী হও, সুন্দরী-ললনা-সম্বলিত রত্নরাজি লাভ করিবে, আর যদি হত হও, স্বর্গভোগ করিবে।" এ কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন; এবং তাহা দ্বারা অর্জ্জুনকে রণে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্।" কিন্তু প্রভেদ এই:—গীতার যুদ্ধ নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে—যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়ং" "সঙ্গং ত্যক্তা" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কাজ করিতে হইবে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবর্ত্তনা দিবার সময়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "তোমাকে নিস্পৃহ হইতে হইবে, সমুদায় কাম্য বস্তু উপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে এই কর্ত্তব্য ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া শান্তি পাইবে। নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করিবে তাহাতে স্বর্গের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু পাইবে, মোক্ষ পাইবে।"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মের বীজ, সর্ব্ব কাম্য-বস্তু উপেক্ষা করা। মহম্মদের ধর্ম্মের বীজ, সর্ব্বকাম্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করা, ইহলোকে ও পরলোকে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু সম্ভোগ করা। মহম্মদ ইন্দ্রিয়সম্ভোগ্য স্বর্গ-ভোগাকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায়, প্রাকৃত জন-সাধারণকে আকর্ষণ করিয়া, উগ্র অদম্য যোদ্ধায় পরিণত করিয়াছিলেন। মহম্মদ বলিতেছেন—হে মুসলমান, তুমি যুদ্ধে হত হইলে, অমনি স্বর্গে প্রবেশ করিবে। সেখানে নির্ম্মল নির্ঝর মুখরিত রম্য-কাননে বিহার করিবে, মর্ম্মর-নির্ম্মিত মনোহর হর্ম্ম্যে বাস করিবে; স্বর্ণপাত্রে পরম উপাদেয়, অতি সুস্বাদু ভোজ্য দ্বারা রসনাকে নিত্য পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে। সুখসার দুর্লভ মদিরা পান করিবে এবং গোলাবী নেশায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র দেখিতে পাইবে, স্বর্গীয়া ললনা একটী নহে, দুইটী নহে—৭২টী হরিণ নয়না, কুসুমপেলব ফুল্লযৌবনা জ্যোতির্ম্ময়ী অমলা নিরুপমা কুমারী তোমারই সম্ভোগের জন্য, রূপের ও আবেশের তরঙ্গ তুলিয়া তোমার ইচ্ছাধীন থাকিবে। তোমার ইন্দ্রিয় শক্তি শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে। এবং পৃথিবীতে যাহা ক্ষণিক সুখ, তাহা সহস্র বৎসর ব্যাপী হইবে। এইরূপে চিরকাল, কাননে সুখময় ভোজনে, সুরা-সুরললনা-সেবনে, অনির্ব্বচনীয় চিত্ত-বিনোদনে স্বর্গভোগ করিবে। সাধারণ লোকে আর চাহে কি? সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দেও। যাঁহারা "উচ্চ শিক্ষায়" উন্নত হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, —তাঁহাদিগেরই আকাঙ্ক্ষা কি? ভাল খাইব, ভাল পড়িব, প্রকাণ্ড বাড়ী করিব, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড়জগতের যে সুখ ভোগ করা যায়, তাহা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিব। ধনলালসা ও বিপুল ধনোপার্জ্জনের জন্য ছুটাছুটীর অর্থ এই। সুতরাং মহম্মদের স্বর্গ, কি সাধারণ লোক, কি সুশিক্ষিত লোক—অধিকাংশ লোকের পক্ষে বড় মধুর মনোমোহন। এ কথা স্বীকার করা যায়, মুসলমানদিগের যে সকল জিতেন্দ্রিয়, সংযত বৈরাগ্যপরায়ণ মহোদয়গণ আছেন,

তাঁহারা এই স্বর্গ বর্ণনাকে রূপক মনে করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের ব্যভিচার ও রাসলীলাকে রূপক মনে করেন। কিন্তু যেমন বৈষ্ণবধর্ম্মে, তেমনি মুসলমান ধর্ম্মে, অনেকেই রূপক ব্যাখ্যাকে সমীচীন বা সঙ্গত মনে করেন না।

যাহা হউক, গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম, নিষ্কাম-ধর্ম্মযুদ্ধ সাধারণ লোকে বুঝে না এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যেও তাহা অতি অল্প লোক সংশয়-শূন্য ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সুতরাং ভগবদ্গীতা সাধারণ হিন্দুর সামরিকশক্তি, বলবীর্য্য, বৃদ্ধি করিতে পারে নাই—সাধারণ হিন্দুকে সন্ন্যাসী-যোদ্ধা, ত্যাগী অস্ত্রবীর করিতে পারে নাই। হিন্দুদিগের ধর্ম্মেও ইন্দ্রিয়-সেবার বাড়াবাড়ি আছে বটে, বৈবর্ত্তপুরাণে, ভাগবতে, গীতগোবিন্দে মদনপূজার ঢলাঢলি আছে বটে, কিন্তু এই উত্তেজিত আসঙ্গলিপ্সা যুদ্ধের সহায়তা করে না,বরঞ্চ পুরুষকে রমণী প্রকৃতি করে; কেমন এক কামনা-জর্জ্জরিত রাধাভাবে, মদালসের আলস্যে জড়ীভূত করিয়া অকর্ম্মণ্য করে—

চৌর্য্যবৃত্তি-তুষ্ট রতি-সুখ-সার-গতমভিসার করে। শব্দ না হয়, দেখা না যায়, অন্ধকারে লুকাইয়া বনে, বৃক্ষতলে বা অভিসারে যাও। যাহা কবি রাধা সম্পর্কে সখী মুখে বলিতেছেন, তাহা প্রত্যেক রাধাভক্ত লম্পট পুরুষ সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়—শব্দ না হয় "মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং" নূপুর-শব্দ হইলে লোকে জানিবে, তাহা ত্যাগ কর। ভাল শব্দ না হইল, আমি যে গৌরাঙ্গী, অন্ধকারে যদি আমাকে লোকে দেখিতে পায়, রাধার এই ভয়, সখী বলিলেন "নীলয় নীল নিচোলং" নীল বসন পরিধান কর। রাধার মনে ভয়, যে শব্দ না হইল, নীলাম্বরীতে সমুদয় দেহ ঢাকিলাম—কিন্তু অভিসার স্থানে যদি আলোক থাকে, তাহা হইলেও আমরা ধরা পড়িব। সখী বলিলেন, ভয় নাই চল সখী কুঞ্জম্; সতীনির "পুঞ্জম্"—আমি যে কুঞ্জে যাইতে বলিতেছি, যেখানে তোমার হৃদয়েশ তোমাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন,তাহা গাঢ় অন্ধকারে আবৃতা। ইহা যদিচ নারীর প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এই অবস্থায় পুরুষও তস্করের ন্যায়, লুকাচুরি করিয়া, শব্দ না হয়, দেখা না যায়, বন-কাতাড়ে অন্ধকারে, ভয়ে ভয়ে, ধর্ম্মরত্ন হরণ করিয়া থাকে। রাসলীলাতে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের চিত্র রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে রাসলীলা-মুগ্ধ ভক্তকে অস্ত্রচালনে সৌর্য্য বিকাশে উত্তেজিত করে না। বরঞ্চ তস্করের ন্যায় ভীরু করিয়া তোলে। মুসলমানের ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার তরঙ্গ উঠিয়া থাকে; কিন্তু সেই তরঙ্গশিরে মহম্মদশিষ্য তরবারি হস্তে, তরঙ্গের তালে কাম-সিক্ত-রণোন্মাদে নৃত্য করে। এই ধর্ম্মকে স্লেগেল বড়ই নিন্দা করিয়াছেন—

"Which (Islam) began and terminated in the most unbounded sensuality. In every other respect than the precepts of alms deed) this religion permits not only hatred and vengeance,in opposition to that Christian precepts so repeatedly inculcated, and so deeply engraven in our minds—the pardon of our enemies but it encourages and even commands irreconcilable hostility, eternal warfare, eternal slaughter, to propagate throughout the world a belief in this blood-stained prophet of pride and lust.„

কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। যে ধর্ম্মের এত শক্তি, যে ধর্ম্মে এত ভাল লোক জন্মিয়াছে, এবং ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাতে অবশ্য কোন ভাল গুণ আছে, যাহা হঠাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা কাম-লোভ ও জিগীষা ও জিঘাংসার অন্তরালে অবস্থিত আছে। শ্রীযুক্ত আমীর আলি Spirit of Islam পুস্তকে কতকটা

তাহা দেখাইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, কোন সূক্ষ্মদর্শী মুসলমান-বন্ধু মুসলমান ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস সমালোচনা করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন। ইহা কাম-লোভ দ্বারা যেমন একদিকে সাধারণ লোককে বাঁধিয়াছিল, তেমনি কতকগুলি গুণে ভাল লোককেও আকর্ষণ করিয়াছিল।

অতি মহৎ উদার ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা কার্য্যান্তরে লাভ করা যাইতে পারে, তাহা রাজপুত ও জাপানী দেখাইয়াছে। ধর্ম্মে উৎকর্ষ লাভ না করিয়াও বীর হওয়া যায়, তাহা ভ্যাণ্ডালস গথ ভিসিগথ,যাহারা রোমক সাম্রাজ্য নাশ করিয়াছিল, তাহারা দেখাইয়াছে। কোন ধর্ম্মের সহিত বীরত্বের কিরূপ সম্বন্ধ, ইহা ভাল করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে কেবল একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা নহে ; সেই গ্রন্থ হিন্দুর জীবনে উৎসাহ ও বল দিতে পারে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

---

# কাব্য ও সমালোচন। *

কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল, "বঙ্গবাসী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় "নেতা" অভিহিত একটী ব্যঙ্গ পদ্য বাহির হইয়াছিল। ঐ পদ্যটীতে কতকগুলি সঙ্কীর্ণভাব অপহাস্য রসে সিক্ত করিয়া, হাসির কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় দেশীয় প্রেম-বিহ্বল নেতাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আক্রমণের নখাঘাত রবীন্দ্রনাথের প্রসারিত কুঞ্চিত-কেশ-পুষ্ট মস্তকের উপর বার বার পতিত হইয়াছে। ঐ দিন দ্বিজেন্দ্র বাবুর কঠোর আক্রমণের জন্য ব্যথিত হইয়াছিলাম। অমার্জ্জিত অগভীর স্থূল-রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অধর যুগলে হাসির উৎস সৃষ্টি করিবার জন্য প্রতিভা-দীপ্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রবৃত্তি কেন জন্মাইল, ইহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই।

গত কার্ত্তিকের প্রবাসীতে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বঙ্গদর্শনের "কাব্যের প্রকাশ" নামক প্রবন্ধ-রচয়িতাকে আক্রমণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের গাত্রে তীব্র উপেক্ষা-উত্তপ্ত ঘৃণা, ঐকান্তিকী ঈর্ষা ও ভীষণ বাতুলতার শর নিক্ষেপ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনে যিনি "কাব্যের প্রকাশ"নামক প্রবন্ধটী বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আক্রমণ করিবার অধিকার দ্বিজেন্দ্র বাবুর ছিল, কারণ উক্ত লেখক আপন বক্তব্য সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। লেখক রুষ সাম্রাজ্যের ভূষণ স্বরূপ টলষ্টয়কে কবি বলিতে সম্মত নহেন, যেহেতু টলষ্টয় শৃঙ্খলে তাঁহার ভাবরাশিকে আবদ্ধ করেন নাই। যাহা প্রকৃত ভাব,তাহা ছন্দের মুখাপেক্ষা করে না—তাহা আত্ম-সৌন্দর্য্যের প্রভাত-মাধুরীস্নাত কিরণের

* কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় "সোণারতরীর" obscurity অর্থাৎ অস্পষ্টতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মত-বিরুদ্ধ। এটী ঠিক প্রতিবাদ নয়, তৃতীয় পক্ষের উত্তর। অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে পণ্ডিত যদুনাথ সর্ব্বকার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার ঐক্য নাই, যদু বাবুর অসঙ্গতি পরে দেখাইব।

ভিতর বসিয়া থাকে, Ruskin, St. Hilaire ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গদ্য কবিতা কোমল ভাব ও মাধুর্য্যে বিভূষিত। হায় বঙ্গদর্শন, আবার জাগিলে কেন,—হায়, রবীন্দ্রনাথ তোমার মধু-উগারিণী মুরলী-ধ্বনিতে বঙ্গদর্শনকে জাগাইয়া আবার ত্যাগ করিলে কেন? বঙ্গদর্শনের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার থাকিল, অদ্য আমরা সে বিষয়ে নির্ব্বাক থাকিব।

প্রবাসীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" নাম্নী অপূর্ব্ব কবিতার পেলব অঙ্গে অবিবেকী ডাক্তারের Lancet যে প্রকারে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলাল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ সমালোচক Lockhartও সৌন্দর্য্য-সুরভি-সঙ্গীতের আকর স্বরূপ Endymionকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, শুধু আক্রমণ নয়, সমালোচনের তীব্র কশাঘাত কবির রাজা Keats এর উপর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। শুধু Keats নয়, এই Lockhartই আবার টেনিসনের Lady of Shalott, Œnone এবং Lotos Eaters এর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। জেফেরী বায়রণকে এবং বায়ণ ওয়ার্ডসওয়ার্থকে আক্রমণ করিয়াছিলেন সমালোচকরূপ হিরণ্যকশিপু মনোমদ প্রহ্লাদ রূপ কবিতার উচ্চভাব সহ্য না করিতে পারিয়া চিরকালই গর্জ্জন করিয়া থাকেন। আমরা আজ Arnold এর ভাষায় বলিতেছি, The Rabindra Nath of poetry is the man of devout prayer to that Eternal Spirit that can enrich with all utterance an knowledge, and sense out his seraphim with the hollowed fire of his altar to touch and purify the lips of whom he pleases.

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপূর্ব্বতায় পূর্ণ, এমন বৈচিত্র্য, এমন সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ, এমন প্রয়োগ-কৌশল কোথাও খুঁজিয়া পাই না, তাঁহার কবিতা affects very little the concrete hearts of the real man. Wordsworth প্রকৃতির শিষ্য ছিলেন, শষ্পের শ্যামবিভায়, পুষ্পের কম্পনে, তটিনীর কুলুকুলু মধু বেদনায় তিনি প্রকৃতির ভাষা অধ্যয়ন করিতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ভাষা শিখিয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তিনি দক্ষতার সহিত প্রকৃতির ভাষা পুণ্য-বাঙলায় অনুবাদিত করিয়া আজ আমাদিগকে অনন্ত ধনের অধিকারী করিতেছেন। যাহা Keats ও Tennysonএ পাই নাই, তাহা রবীন্দ্রনাথে দেখিতে পাই। আমাদের মনে হয়, একদিন 'বান্ধব' সম্পাদক বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র ও কালিদাস যদি এক সময়েতে জন্মাইতেন ও উভয়ে যদি সংস্কৃত ভাষায় উপন্যাস রচনা করিতেন, তাহা হইলে 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ' ও বিষবৃক্ষের" কবি, কি শকুন্তলার কালিদাস, কাহাকে বড় বলিতাম, বুঝিতে পারি না।" Power of appreciation যাঁহার বহু কাব্য রসাস্বাদনে পুষ্ট হয় নাই, যাঁহার উপলব্ধি অগভীর, এইরূপ স্থূল-অনুভূতিবিশিষ্ট পাঠক রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিবে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু 'সোণার তরী' আদৌ বুঝেন নাই, তিনি রবিবাবুর ভক্তগণের নিকট বুঝিতে গিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোথাও বা "তাই-তো, তবে—কি ও—টা ও —ই রকম ও দুই একটা "ঢোক্," কোথাও "কদর্থ," কোথাও বা অতি পুষ্ট রকমের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিয়া "বিবাহ-বিভ্রাটের' ঝির ন্যায় সমালোচিকা সাজিয়া হা—হা হি—হি প্রভৃতি

উচ্চ হাস্যে সুলভ রসিকতায় ও দুষ্টব্যঙ্গ-রসাপ্লুত সম্মার্জ্জনী হস্তে বাহির হইয়াছেন। শ্রাবণ মাস, বর্ষাকাল। সময় প্রভাত। নদী-সৈকতে কোন অনুরাগিণী ভালবাসার সুধায় রূপ ও যৌবন-কুসুমকে সিক্ত করিয়া ডালা সাজাইয়া বসিয়া আছেন। আকাশে মেঘ। পরপারে মেঘের প্রতিবিম্ব তরুশিরে পড়িয়া বনের শ্যামশোভাকে অসিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে। এই সময় ভামিনী দেখিলেন, সোণার তরীতে আরোহণ করিয়া কে যেন গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছেন, অমনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ওগো, এ সেই বুঝি—দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন চিনি চিনি। অমনি বলিলেন,—

"ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে!
যেও যেথা যেতে চাও, যারে খুসি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোণার ধান কূলেতে এসে!"

নৌকা-আরোহী নিকটে আসিল, সুন্দরী তাহার হৃদয়ের শত আশা অনন্ত-প্রসারী প্রেম ও প্রেম-সুরভিত হৃদয় তাহাকে অম্লান বদনে দান করিলেন। রমণী আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়া যখন কাঙ্গালিনী হইলেন, তখনি দুর্ব্বলতা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল, অমনি রমণী বলিলেন, বঁধু, তোমায় সবই দিয়াছি, আর দিবার কিছু নাই—

"এখন আমারে লও করুণা করি।"

এ যে প্রতিদানের কথা, ভালবাসিতে চাও, ভালবাস, কিন্তু তোমার প্রাণের দেবতার নিকট প্রতিদানের অভিলাষ করিও না, রমণী আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়া যখনই প্রার্থিণী হইল, করুণার নিমিত্ত ভিখারিণী হইল, অমনি আরোহী তরী বাহিয়া চলিয়া গেলেন। অশ্রু নয়ন-পল্লব সিক্ত করিল না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল না। হৃদয়-দেবতায় এমন করিয়া আত্ম দান করিতে কেহ কি কখন দেখিয়াছেন?

বর্ষার মেঘ গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে, মেদুর পবন বহিতেছে, মাঝে মাঝে বিজলি হাসিয়াই মেঘের কোলে লুকাইতেছে। যক্ষের হৃদয়ে মিলনস্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই যক্ষ মধ্যে-ক্ষীণা শিখরি-দশনা নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু সোণার তরীর উপেক্ষিতা যখন বুঝি-লেন, তাঁহার দেবতা আর তাঁহার নয়, তাঁহার দেবতা অন্যের, তখন অর্পণেচ্ছু হৃদয়টী, যিনি প্রাণের প্রকৃত অধিকারী হইতেন, তাহারই চরণতলে অর্পণ করিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, আমি টেনিসন বুঝি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বুঝি, বাইরণ বুঝি, কিন্তু আমার দেশীয় ভাষায় লেখা সোণার তরী বুঝি না। আমার বোধ হয়, তিনি চেষ্টা না করিলে 'সোণার তরীর' সুন্দর অর্থ বাহির করিতে পারি-তেন, চেষ্টা করিতে গিয়াই নিজে এমন গল-দঘর্ম্ম হইয়াছেন, এবং পাঠককেও নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিয়াছেন। সুন্দর কবিতা ভাবের উৎস বিশেষ, ইহার উচ্ছলিত উৎসারিত উচ্ছ্বাস বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অপূর্ব্ব নবীনতার একটী নিবিড় সান্দ্র অতিভূ-গামী আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। কবিতার আনন্দ সৌন্দর্য্যের প্রাণ-স্বরূপ। এ আনন্দ কখন আমরা সহৃদয় রসজ্ঞ বন্ধুর সহিত উপ-ভোগ করি; কখন বা অতি গোপনে অতি বিজনে হৃদয়কে পবিত্র করিয়া, হৃদয়কে সুধার রসাস্বাদনে প্রস্তুত করিয়া প্রাণের স্বাদ মিটাই। কখন বা মোটা লোকের কাছে মোটা ভাবের অথচ বিন্যাস-কৌশল-খচিত কবিতা পড়িয়া তাহার অর্থ-পিপাসু বিষয়-

মণ্ডিত হৃদয় মধ্যে ছিন্ন মেঘ-স্থিত ক্ষীণ বিজলির ক্ষীণ বিচ্ছুরণের ন্যায় একটু উল্লাসের রেখা উৎপন্ন করি। শেলী একস্থলে বলিয়াছেন, ভাবময়ী কবিতা সৌন্দর্য্য ও রহস্যের চিত্ততোষিণী কারুতার সহিত শত আবরণে আচ্ছাদিত। ইহাকে বিবসনা করিবার নিমিত্ত, ইহার ইন্দ্রধনু-সদৃশ মনোহর কিরণের একখানি বসন উন্মোচন কর, দেখিবে, ইহা অপূর্ব্ব; আর একবার চেষ্টা করিয়া আর এক খানি আবরণ শিথিল কর, দেখিবে,অভূতপূর্ব্ব মাধুরী নব বর্ণে প্রতিভাত হইয়া বাহির হইতেছে। চিরদিন এইরূপ বিচিত্রতা তোমার হৃদয়ের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইবে। তথাপি কখন ইহার অন্ত পাইবে না।

বাস্তবিক যিনি কবিতার অমৃত উপভোগ করিতে চান, তাহাকে কবির পথ-প্রদর্শিনী চঞ্চলচরণা কল্পনার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে হইবে, যোগী যেমন আপনার স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিতে পারেন, কল্পনার অনুগত জন, সেই প্রকার, আপনার সূক্ষ্ম দেহকে তাহার অনুসরণে নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। কোন স্থানে sound of vernal showers তৃণদলে ক্লান্ত নয়নের উপর পরশের ন্যায় পতিত হইতেছে, কোন স্থানে চিরসুন্দরের পুলকের প্রস্রবণ বেহাগ রাগ আলাপ করিতে করিতে কিরণ রাজ্য অতি মৃদু পরিবর্ত্তন-সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিবেন। দ্বিজেন্দ্রলালও কবিতা লেখেন, গানও রচনা করেন। তাঁহার কবিতা পড়িবার সময় পোপের নিম্নলিখিত ছত্রটী মনে আসে—

Who says in verse what others in prose.

স্বীকার করি,তাঁহার গান পিনাক কোচের উপদেবতা ডিপুটী,খাজানা আইনের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ মুন্সেফ ও দেশীয় বিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী প্রাণীবিশেষের সান্ধ্য-সমিতিতে হাল্কা হাসির তরঙ্গ তুলিয়া থাকে। তাঁহার গান গুলির মধ্যে দুই একটী অতুলনীয়, কিন্তু অনেক গানই অসার। যাহা অসার, তাহা বহুদিন স্থায়ী হয় না। একদিন রূপচাঁদ পক্ষীর অনেক গীত উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল,সেই সকল জলবুদ্‌বুদ যেমন করিয়া বিস্মৃতির সলিল মাঝে লীন হইতেছে, দ্বিজেন বাবুর গানও ঐ প্রকারেই লয় পাইবে।

আমার একজন মনীষী বন্ধু সোণার তরীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই— "নিজের সকল কর্ম্ম অন্য একজনকে উৎসর্গ করিয়া নিজেকেও সেই ব্যক্তিকে উৎসর্গ করিবার নিষ্ফল চেষ্টা। সোণার তরী বহিয়া গেল, কর্ম্মহীন self পড়িয়া রহিল। লোকটী নিষ্কাম ধর্ম্ম বুঝে নাই, সেই জন্য তাঁহার এত আবেগ।" উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার তুলনা করিলে পাঠক একই প্রকার মীমাংসায় উপনীত হইবেন। সৌন্দর্য্যময়ী কবিতার মধ্যে একটী প্রচ্ছন্ন সংগীত অনাহত মুরলী ধ্বনিবৎ সর্ব্বদাই রণিত হইতেছে, শ্রবণ এ ধ্বনি শুনিতে পায় না,এ ধ্বনি শুনিবার অধিকার কেবল প্রাণের। মার্কিন কবি Poeর Raven বিধাতা-সৃষ্ট কার্কশ্য-উদ্গারী বায়স নহে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ন্যায় রঙ্গপ্রিয় কোন সমালোচক সেই সময় বর্ত্তমান থাকিলে Poeকে একটু অযথা লাঞ্ছিত হইতে হইত।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর সমালোচনস্থিত রসিকতা যেখানে উচ্ছলিত হইয়া আবর্ত্তময়ী হইয়াছে, সেই স্থানে একটু তৈল প্রয়োগ করা এই সময়ে একটু কর্ত্তব্য। দ্বিজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,

শ্রাবণ মাসে ধান্য কাটে না। সমালোচক মহাশয় চিচেষ্টারে গিয়া কৃষিবিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। এক দল লোক তাঁহাকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবেন—এপক্ষ তাহাতে আপত্তি করেন না। এক সময়ে কৃষ্ণনগর হাঁসপাতালে কলেরা দেখা দেয়। সাহেব প্রাতে আসিয়া, যাহারা মরিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে পুতিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া যান। মৃতব্যক্তিগণের মধ্যে একজন জীবিত ছিল, তাহাকেও পুতিয়া ফেলিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। সেই সময় সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আমাকে পুঁতিও না, আমি জীবিত আছি। বাহকেরা বলিল, বেটা তুই অবশ্যই মরিয়াছিস্, যেহেতু ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, তুই মরা মানুষ। এইরূপ বাহক প্রকৃতিক যদি কেহ থাকেন, তিনি বলিবেন, শ্রাবণ মাসে ধান কেহ কাটিতেই পারে না। রবি বাবু বড় মানুষ,সহরে থাকেন, ধান কাটা কবে হবে বা হয়,তাহা তিনি কি প্রকারে জানিবেন? দ্বিজেন্দ্র বাবু কম authority নন্। চিচেষ্টার ফেরৎ যেন বাঘ! রঙ্গপুর, দিনাজপুর,বগুড়া ও পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রাবণ মাসে আশু ধান্য কাটে। পুঁথিগত বিদ্যা কি ভয়ঙ্করী! আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ সাবধান হউন।

আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে কালিদাস গর্ভযুক্তা যুবতীর স্তনাগ্রের কজ্জল আভার সহিত বর্ষার জলদ মালার তুলনা দিয়া দারুণ গ্রীষ্মকে শৈত্যের শীকরে স্নাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কালিদাসের সময় দ্বিজেন্দ্র বাবু জীবিত থাকিলে অবশ্যই বলিতেন—"মেঘমালা জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তির দ্বিপ্রহর নিশায় দিগঙ্গনার কোলে আশ্রয় লইয়া কালিদাসকে মেঘদূত রচনা করিবার সাহায্যার্থে বসিয়াছিল। আমরাত কস্মিনকালে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে আকাশে বর্ষা মেঘের স্নিগ্ধ মাধুরী উপভোগ করি নাই। Exceptional instance লইয়া অকবি কাব্যের সূচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা, মেঘকে দূত করা কালিদাসের সংগত হয় নাই, কারণ স্বইচ্ছায় মেঘ গমন করিতে পারে না। তৃতীয় আপত্তি, মেঘ পুরুষ, যুবতীর কাছে পুরুষের দৈত্য নিতান্ত অসঙ্গত ও অরুচিকর।

"কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা"

এখানে বর্ষা অর্থে বর্ষাকাল নহে, বৃষ্টিধারা অর্থাৎ বর্ষনম্। ছোট ক্ষেতে কি ভারা ভারা ধান হয় না? ছোট ক্ষেতে অর্থ বিতস্তি পরিমাণ ভূমিখণ্ড নহে।

"চারিধারে বাঁকা জল করিছে খেলা।"

চারি ধারে জল বলায় দ্বিজেন্দ্র বাবু স্থানটীকে দ্বীপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। চারি দিকে জল বলিতে জল-বেষ্টিত ভূখণ্ড বুঝায় না, চারিধার শব্দের প্রয়োগ আছে, চারি কোণের উল্লেখ নাই—

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।"

প্রথম দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, কে যেন তরী বহিয়া গান করিতে করিতে আসিতেছে; তৎপরে কৃষক দেখিল, না তরী বহিয়া আসিতেছে না,পাল ভরে তরণী খানি আসিতেছে।

"পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসী মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা"

ছায়া শব্দটীর অর্থ সমালোচক মহাশয় বুঝেন নাই। ছায়া শব্দের বিবিধ অর্থ। আভিধানিক— হেমচন্দ্র ছায়া অর্থে তমঃ

ব্যাড়ি……… কান্তি

শ্রীধর-স্বামী……… শ্যামা

এবং অনেকে "ভীরু" আভীতি ভাবামুগ্ধা

অনাতপঃ ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিয়াছেন। কৃষক গ্রীষ্মকালে যে বটের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া ভুজা খায় ও "পার যদি জন্মে না ভাই বিস্কুদ বারের বারবেলায়" বলিয়া গান গায়, এ সে ছায়া নয়। রাস্‌কিন বলেন, "High art consists neither in altering nor improving nature" রবি বাবু যথার্থ চিত্রকরের ন্যায় শ্রাবণের চিত্রটী দিয়াছেন। তিনি গোলাপের অঙ্গে অটোডিরোজ অথবা পদ্মপর্ণে লোহিত রাগ সংযোগ করেন নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনাসন্ন আক্রমণে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। দ্বিজেন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন, রবি বাবুর কৃষকের জমিতে ধান হয় নাই, ধান হইতেও পারে না। কারণ সে জমি বন্ধ্যা। মেহেরুন্নেসা ও দৌতাত উন্নিসা সেলিমের ভগিনী। মেহের ও দৌলত তর্ক করিতেছে। সেলিম নিকটে বসিয়া আছেন। তাহাদের তর্ক শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "দেখ, তোরা আমার দুই বোন, আর আমি তোদের ভাই, কিন্তু রোজ রোজ আমার সামনে এমনি ঝগড়া করিস্ যেন আমি তোদের স্বামী আর তোরা দুই সতীন।" কি অপূর্ব্ব রুচি! অনেক রঙ্গভূমিতে প্রতাপসিংহের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সমালোচক চাঁড়ালের হাত দিয়া ঐ পুস্তক পুড়াইবার ব্যবস্থা করেন নাই। একটা কথা দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতে ভুলিয়াছেন, সোণার কি কখন তরী হয়? যদিও হয়, সোণার তরী কি কখন জলে ভাসে?

দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটী পড়িয়া অবধি তাঁহারই একটী হাসির গানের নায়ককে আমাদের বারম্বার মনে পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবু "সোণার তরীর" এমন সহজ শাদাসিদে অর্থটী ফেলিয়া, যে অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা "ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থকার চণ্ডীচরণেরই" উপযুক্ত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর কথায়, উক্ত চণ্ডীচরণ ধর্ম্মশাস্ত্রের এমন ব্যাখ্যা করিতেন, যাহাতে

"জলের মত বিষয় হ'ত ইঁটের মত শক্ত।

আমরা এতদিন জানিতাম না যে, চণ্ডীচরণ, দ্বিজেন্দ্র বাবুর স্বহস্তাঙ্কিত নিজ মূর্ত্তি।

বেণোয়ারীলাল গোস্বামী

## প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১৬। গুলবাহার। শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য চারি আনা, অন্তঃপুর প্রেস। অতি ক্ষুদ্র পুস্তক, কিন্তু ইহাতে গ্রন্থকার তাঁহার সুন্দর হৃদয়খানি ঢালিয়া দিয়াছেন। গুলের অন্তিম সময়ের শেষ উক্তি পাঠ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়।

১৭। স্মৃতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় প্রণীত, মূল্য ৴১০। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় বঙ্কিম বাবুর এ পুস্তক খানিও সুন্দর হইয়াছে।

১৮। সাধুজীবন—হেরম্বচন্দ্র। শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকাসহ; মূল্য ৶০। অতি সুন্দর জীবন-চরিত।

১৯। মা ও ছেলে নাথ গুহ মস্তফী প্রণীত, মূল্য ৴১০। এ

খানিও ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক, কিন্তু বড়ই সুচিন্তিত এবং চিত্তাকর্ষক। জাতীয় উত্থানের দিনে এরূপ সুন্দর পুস্তক যত প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। বিধাতা গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

২০। দূর্ব্বা। শ্রীশিবরতন মিত্র বিরচিত, মূল্য ৵০। ষোড়শপদী কবিতা সমূহে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পূর্ণ। কবিতাগুলি সুমিষ্ট এবং সুচিন্তিত।

২১। বর্ণমালা। শ্রীশিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৻৫। এখানি সচিত্র বর্ণমালার পুস্তক; মূল্য অতি সুলভ। সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আশা করি।

২২। নীতিগল্প। উগ্রকণ্ঠ মাঝি কর্ত্তৃক প্রণীত। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তৃত হইলে যে সুফল ফলে, এই পুস্তক তাহার উদাহরণ। ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি।

২৩। মুসলমান বৈষ্ণব কবি। চতুর্থ খণ্ড, শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল প্রণীত, মূল্য ।০। মুসলমান কবিদিগের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার দেশের প্রভূত উপকার করিতেছেন। জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধির দিনে ইহা সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আশা করি।

২৪। বঙ্গে যুগান্তর। জনৈক স্বদেশ-হিতৈষী বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৵০। পুস্তক খানি অতি সুন্দর হইয়াছে; একটী সঙ্গীত তুলিয়া দিলাম;—

বঙ্গ ভঙ্গে মন ভঙ্গ হওনা কখন,
করেরে সাধনা হবে বাসনা পূরণ।
জাতি ধর্ম্ম সব ভুলে, একতা-নিশান তুলে
কর সেবা মন সুখে মায়ের চরণ।
হইয়া মায়ের ছেলে, মাতৃদত্ত দ্রব্য ফেলে,
বিদেশীর দ্রব্য পেলে লয়োনা কখন।
কর আত্ম বলিদান, রাখরে মায়ের মান,
মাতৃ অর্থে পর পেট ক'রনা পূরণ।
দুখিনী মায়ের কথা, রেখরে হৃদয়ে গাঁথা,
আজ নহে কাল দুঃখ হবে বিমোচন।

২৫। কার্পাস চাষ। শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৶০। সচিত্র পুস্তক। কার্পাস-চাষ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা সুন্দর রূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের যুগে এরূপ পুস্তক প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হউক।

২৬। গৃহস্থালী—দ্বিতীয় ভাগ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কবিরত্ন সম্পাদিত, মূল্য ।৵০। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন, সে সকল কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারের সহিত সব বিষয়ের সম্বন্ধে আমরা একমত হইতে না পারিলেও, একথা লিখিতে পারি, পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

২৭। শিল্প ভাণ্ডার বা স্বাধীন জীবিকা। উপরোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত, মূল্য ।৵০। কি প্রক্রিয়ায় কোন্ জিনিস প্রস্তুত করিতে হয়, সংক্ষেপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুন্দর পুস্তক।

২৮। সচিত্র বয়ন-বিদ্যালয় বা তাঁত শিক্ষা। শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, মূল্য ৶০। এ খানিও সচিত্র। জাতীয় আন্দোলনের দিনে এরূপ সুন্দর পুস্তক ঘরে ঘরে পঞ্জিকার ন্যায় স্থান পাওয়ার যোগ্য। গ্রন্থকার দেশের প্রকৃত মঙ্গলের পথ খুলিয়া দিয়া দেশের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

---

# পরেশনাথ-দর্শন ও জৈন ধর্ম্ম।

আমরা কয়েক জনে শিবপুর কলেজের ছাত্র বরাকরের লৌহের কারখানা ও নিকট-বর্ত্তী পর্ব্বত সমূহ দর্শন করিবার জন্য গত বৎসর (১৯০৫) ১৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা গিরিধি ষ্টেসনে উপস্থিত হই। দারুণ শীত কালে কোথায় রাত্রি যাপন করিব, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। আমাদের মাল অব-তরণ করাইয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া চিন্তা করা যাইতেছিল। কেহ কেহ গিরিধির পরিচিত ভদ্র লোকের সন্ধান লইবার চেষ্টায় গমন করিলেন। আমরা ক্যারিং কোম্পানীর বাসায় যাওয়া স্থির করিলাম। সেখানে এক প্রকার রাত্রিটা অতিবাহিত করা গেল। পরদিন আহারান্তে বেলা বারটার সময় পরেশ-নাথ পর্ব্বত দর্শন করিবার জন্য পুস্ পুসে (push push) রওনা হইলাম। গন্তব্য পথ ১৮ মাইল। যাওয়া আসার পুস্ পুস্ ভাড়া ৬৲ টাকা। আমরা ৩।৪ জন করিয়া পুস্পুসে চড়িলাম। এখানে বলিয়া রাখি যে, আমরা পরেশনাথ পর্ব্বতে পার্শ্বনাথ দেবের বিগ্রহ দর্শন করিতে যাত্রা করি নাই। আমরা আমাদের কলেজ হইতে ভূবিদ্যা সংক্রান্ত (geological) জ্ঞান সংগ্রহের জন্যই গিয়া-ছিলাম। আমাদের অধ্যাপক মহাশয় বরাকর হইতে প্রায় ৫০ মাইল পথ বাইসিকেল-যানে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

পুস্ পুসের অভিজ্ঞতা এই আমার প্রথম। আমরা ৩ জন এক সঙ্গে যাত্রা করিলাম। আমাদের মধ্যে একজন বেশ "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষ-স্কন্ধঃ শালপ্রাংশুঃ মহাভুজঃ।" বাস্তবিক যেমন [illegible], তেমন বিশালবক্ষ। চালকেরা তাঁহাকে সর্ব্ব পশ্চাতে বসিতে বলিল। যান প্রথমে ধীর মন্থর গতিতে, পরে বেগে চলিতে লাগিল। কখনও বা রাস্তা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়াছে, কখ-নও বা নিম্নে গিয়াছে। আমরা বেশ গল্প করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। সকলের অগ্রে আমাদের যানকে লইয়া যাইতে পারিলে পুরস্কার পাইবে বলিয়া চালকদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলাম।

পথে মোহন প্রাকৃতিক-দৃশ্যের সমাবেশ দেখিলাম না; কিন্তু জানা আছে, কোন স্থান শস্য-শ্যামল না হইলেও তাহার এক প্রকার নগ্ন-সৌন্দর্য্য আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিলাম না। এ প্রদেশ বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইলেও হেথায় "নিত্যকল্যাণী বঙ্গ-জননী" "আম্র-বন-ঘেরা সহস্র কুটীরে" কিম্বা "দোহনমুখর গোষ্ঠে" বিরাজিতা নহেন। এখানে মায়ের কিছু কর্কশ ভাব, কিছু শ্রীহীনতা বর্ত্তমান। এখানে মাতা "প্রত্যূষে পূজার ফুল" ফুটান না, এমন কি, "মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারণ" করিয়া রৌদ্র নিবারণও করেন না; কারণ এ স্থানের ভূমিখণ্ড প্রস্তর ও বালুকাময় বলিয়া মায়ের অঙ্গ ধূসর, স্নিগ্ধ-শ্যামল নহে। উন্নতশীর্ষ, ঘনপত্রাবলী-বিটপী এখানকার ভূমিকে আবৃত করে না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শালবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আপ-নার দৈন্যভাবের জ্ঞাপন করিতেছে। আমি এ দৃশ্যের পক্ষপাতী নহি। রাস্তার দুই ধারে বরাবর আমলকী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিলাম, তাহাতে আমলকী ফলিয়াছে। আমাদের চালকেরা দৌড়াইয়া গিয়া আমাদের জন্য আমলকী পাড়িয়া আনিল। আমরা

তাহার মূল্য দিলাম। তাহাদিগকে বৃক্ষারোহণে অত্যন্ত নিপুণ দেখিলাম। আমরা আগ্রহের সহিত আমলকী সংগ্রহ করিলাম; কেন না, পর্ব্বতারোহণে তৃষ্ণা নিবারণ উপলক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই ১৮ মাইল পথ যাইতে মাঝে মাঝে দুই বার চালক পরিবর্ত্তন করিতে হইল। আমাদিগকে দুটী ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইল। একটীর নাম বরাকর। নদী পার হইবার সময় আমাদের দৃঢ়কায় বন্ধুটী, চালকদের সহিত, দ্বিগুণ বলে শকট চালনা করিতে লাগিলেন।

আমরা বেশ গল্প করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম; প্রথমে পরেশনাথ পর্ব্বত দূর হইতে কুহেলিকাবৃত বোধ হইতেছিল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই কুহেলিকাবরণ অপসৃত হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু তখনও বহুদূরে। অপরাহ্ণ হইয়া আসিল; বেশ শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। উষ্ণবস্ত্র দ্বারা শরীরকে আবৃত করিয়া আমাদের বেশ আরাম বোধ হইতেছিল। আমরা শকটের মধ্যে কোমল শয্যার উপর উষ্ণ বস্ত্রাবৃত হইয়া সুখে আসীন, আর কটিমাত্রবস্ত্রাবলম্বী দরিদ্র চালকেরা কয়েকটী পয়সার জন্য সামান্য ভারবাহী পশুর ন্যায় কয়েক ক্রোশ ধরিয়া শকট চালনা করিতেছে! এ বৈষম্য কেন, ভাবিতে লাগিলাম। আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া এ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কত নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়াছি। আপনারা হয় ত কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া এই gordian গ্রন্থিকে এক আঘাতে কর্ত্তন করিয়া ফেলিবেন। আমার কাছে ও ব্যাখ্যা তেমন পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয় না। সে সব কথা থাক্। আমি কিন্তু তাহাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিলাম। আর মাঝে মাঝে আমার বন্ধুদ্বয়কে আমার ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বলিয়াছি, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই পর্ব্বতটীকে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় কি দৃষ্ট হইতেছে। উহা যে পার্শ্বনাথজীর মন্দির, তাহা অনুমান করিলাম। পরে জানা গেল, আমাদের অনুমান যথার্থ।

ক্রমে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া সমস্ত ধরণীর উপর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল; তাহার সহিত কি একটা উদাস ম্লান ভাব হৃদয় দেশ ছাইয়া ফেলিল। সন্ধ্যার সময়কার প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার মধুর বোধ হইতেছিল। প্রকৃতি দেবীর শ্যামবস্ত্রাঞ্চলমণ্ডিত বপু সন্ধ্যার ধূসর বরণে কেমন স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল! প্রকৃতির উদাস ভাব দেখিয়া হৃদয়ের বিদ্রোহাগ্নি প্রশমিত হইয়া প্রাণও উদাস ভাব ধারণ করিল। মানুষের উপর অচেতন প্রকৃতির এত পরাক্রম! অচেতনই বা কে বলিল? সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ এক অখণ্ড চৈতন্যেরই ব্যাপ্তি বা একই ধর্ম্মাক্রান্ত জড়সংজ্ঞক পদার্থ, আমি ত এই বুঝি। ভাবিয়া দেখ, সমস্ত ধরণীর উপর সন্ধ্যা-কালিমা ছাইয়া পড়িয়াছে; গাছের মাঝে তখনও অন্ধকার জমাট বাঁধে নাই। আর উপরে মুক্ত, অনন্ত, উদার আকাশতল। এ বর্ণনার সামগ্রী নহে; চিত্রকরের অক্ষয় তুলিকাস্পর্শে এ সৌন্দর্য্য কতকটা প্রতিফলিত হইতে পারে।

আমরা কিয়ৎক্ষণ যাইতে যাইতে শুভ্র সৌধরাজী দেখিতে পাইলাম; সৌধগুলি পরেশনাথ পর্ব্বতের পাদদেশে। বুঝিলাম, এইবার আমরা গন্তব্যের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছি; [illegible]

কেরা তাহাই বলিল। যে পথ দিয়া আমরা আসিতেছিলাম, তাহাতে মনুষ্যের সমাগম বড় দেখিলাম না এবং পথের দুই ধারে জন সমাগমের চিহ্নও দেখা যাইতেছিল না। এইবার পূর্ব্বোক্ত সৌধরাজী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল। সম্মুখে বিশাল পর্ব্বতের হরিৎবর্ণ গাত্রদেশ আমাদের দৃষ্টি রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। আমরা যান হইতে অবতরণ করিলাম। যে স্থানে আসিয়াছি, তাহার নাম মধুবন; আর যে শ্বেত হর্ম্ম্যরাজীর কথা বলিতেছিলাম, তাহা জৈনদিগের মন্দির ও ধর্ম্মশালা। আমাদের কুলিটী আমাদের সঙ্গে লইয়া একটী বাটীর দ্বার দেশে আনিল। দ্বারের উপর বৃহৎ অক্ষরে লিখিত আছে "মধুবন বিশপন্থী বড় কুঠী।" আমরা বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। কুলিটী ভিতরে বাটীর অধ্যক্ষের নিকট সংবাদ দিতে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাঙ্গালীর ন্যায় একজন ভদ্র লোক আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

আমরা যে বাটীতে আসিলাম, তাহা জৈন ধর্ম্মের অন্যতম শাখা বিশপন্থী সম্প্রদায়ের মন্দিরান্তর্গত ধর্ম্মশালা, আর ঐ বাঙ্গালীবেশী ভদ্রলোকটী একজন গুজরাটী ভদ্রলোক; ইনি এই কুঠীর দাওয়ান বা কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনি আমাদিগকে, সাধারণ অতিথিদিগের থাকিবার জন্য যে সকল প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। ঘরগুলি বেশ, কিন্তু জানালার দ্বার নাই। ভয় হইতেছিল, সমস্ত রাত্রি পৌষের হিমভোগ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন; আমাদের মধ্যে একজন অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে একখানি পত্র আনিয়াছিলেন; পত্রখানি তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন "আসুন, আপনাদের স্থান অন্যত্র, আপনারা সামান্য "মুসাফের" নহেন।" বাহিরের বাটী হইতে এক প্রশস্ত দ্বার দিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। ভিতরেও প্রশস্ত অঙ্গন। ভিতরে আসিয়া এক দ্বারের নিকট আমরা সকলে পাদুকা পরিত্যাগ করিলাম। এতৎমর্ম্মে সেইখানে লেখা আছে। এইবার ধর্ম্মশালা হইতে মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়াছি। দ্বারে প্রবেশ করিয়া উত্তর দিকের এক অপ্রশস্ত সিড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিলাম; উপরে সুদীর্ঘ বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডা দিয়া আসিয়া আমরা একটী অত্যন্ত উচ্চ ও প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করিলাম। অধ্যক্ষ মহাশয় এই ঘরটী আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন; ঘরের মেজে সতরঞ্চী পাতা। ঘরের কোণে স্তূপাকারে লেপ রহিয়াছে। লেপগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এই ভয়ানক পার্ব্বত্য শীতে লেপগুলি আমাদের উপকারে আসিয়াছিল।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছারি-গৃহ নীচে; এই ঘরটী মন্দিরে যাইবার পথের ধারে। গৃহপ্রাচীরে জৈনদেবতাদের ছবি রহিয়াছে; আর গৃহভিত্তিতে একটী বাক্স প্রোথিত আছে, তাহাতে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে "গুপ্ত ভাংভার" অর্থাৎ গুপ্ত ভাণ্ডার। নিজের নাম অজ্ঞাত রাখিয়া যাঁহারা মন্দির ও ধর্ম্মশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই গুপ্ত ভাণ্ডারে দান করেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের সহিত অপ্রত্যাশিত ভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হইলাম। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলের হিন্দীজ্ঞানটা অল্প বলিয়া তিনি ইংরাজীতে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তিনি বলিলেন "আমি আপনাদের ভৃত্য

জানিবেন; যাহা প্রয়োজন বলিবেন, অবিলম্বে সাধিত হইবে। "আপনারা কি আহার করিবেন? লুচী না ভাত?" এই জনহীন পার্ব্বত্য প্রদেশে উপবাসের জন্ত আমরা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম। অন্যায় আবদার উচিত নয় বলিয়া ভাতের কথা বলিলাম। কেহ কেহ ইহাতে যেন অসন্তুষ্ট হইলেন। মানুষের কেমন স্বভাব, একটু দয়া পাইলে দয়াকে দাবীদাওয়ার অন্তর্গত করিয়া ফেলে। আমরা একটু বিশ্রাম করিলে অধ্যক্ষ মহাশয় পুনরায় আসিলেন। আমরা তাঁহাকে জৈনধর্ম্ম ও মন্দির সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন পুরাবৃত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

কাছারীর সম্মুখের পথের উপর ভারতেশ্বরীর মূর্ত্তি-মুদ্রিত রৌপ্য মুদ্রা প্রোথিত রহিয়াছে; প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডে ৫টী; কোণে ৪টী এবং মধ্যে একটী। অদূরে গৃহভিত্তিতে কোষবদ্ধ তরবারী লম্বমান,এবং একজন প্রহরী মুক্ত তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি ও আমার একটী বন্ধু রাত্রেই অধ্যক্ষ মহাশয়কে লইয়া মন্দির দর্শন করিতে চলিলাম। সম্মুখে লিখিত আছে যে, জৈন ও সংজাতীয় হিন্দু ভিন্ন মন্দির মধ্যে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। আমরা প্রবেশ করিয়া মন্দিরাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। উঠানের চারি কোণে চারিটী মন্দির ও সম্মুখের দালানে একটী বিগ্রহ রহিয়াছে এবং দালানের বাম কোণে আর একটী বিগ্রহ। বিগ্রহগুলি ঠিক বুদ্ধদেবের ন্যায়। তৎপরে জানা গেল, এগুলি জৈন তীর্থঙ্করদিগের। মন্দিরের চূড়া পিরামিড্ আকারের এবং চূড়াতল ষড়্ভুজবিশিষ্ট। অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে এবং জৈনধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ করিয়া যাহা জানা গিয়াছে, তাহা প্রবন্ধের শেষাংশে সন্নিবিষ্ট হইল।

কল্য প্রাতে কখন পার্শ্বনাথদেবের বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিতে হইবে, রাত্রে অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট তাহা জ্ঞাত হওয়া গেল। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, রাত্রি ৪টার সময় যাত্রা করিলে সমস্ত মন্দিরে পূজা সমাপন করিয়া অপরাহ্নে ফিরিতে পারা যায়। আমরা ঐ শীতের রাত্রির ৪টার নাম শুনিয়াই ত অবাক্। প্রত্যূষে যাওয়া হইবে, স্থির হইল। রাত্রি ৪টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে শুনা গেল যে, জৈন যাত্রীরা পার্শ্বনাথজী বা পরেশনাথজীর জয়োচ্চারণ করিয়া যাত্রা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বহির্গত হইলাম। আহার্য্য ও জল বহন করিবার জন্য দুটা কুলী লওয়া গেল। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের সঙ্গে তরবারীবাহী একজন সিপাহী দিলেন।

আমরা ঠিক যেন সমরাভিযানে বহির্গত হইলাম। প্রায় সকলের পায়ে বুট জুতা, মস্তকে হ্যাট, কিম্বা পাগড়ি; এবং আমরা সমর বিক্রমে সৈনিকের ন্যায় চলিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের রাস্তা সমতল নহে, তাহা বোধ হয় বলিতে হইবে না; এবং এই প্রকার পথে চলা যে কি প্রকার কষ্টদায়ক, তাহাও বলিতে হইবে না। পর্ব্বতের গাত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিষ্কার ও প্রশস্ত পথ উঠিয়াছে; এই প্রশস্ত পথ দৈর্ঘ্যে ৬ মাইল ডাক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং ডাকবাঙ্গালা হইতে মন্দিরের পাদদেশ পর্য্যন্ত পথ সঙ্কীর্ণ এবং দৈর্ঘ্যে ১ মাইল। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত পথ দৈর্ঘ্যে ৭ মাইল। ডাকবাঙ্গালার উপরে সাহেবদিগের গমনাধিকার

নাই। এই পর্ব্বতে কোন প্রকার জীব জন্তু শীকার করা নিষিদ্ধ।

আমরা এই প্রকার পথের যথাসম্ভব অনুসরণ না করিয়া পর্ব্বতের গাত্রদেশ বহিয়া দ্রুতপদ বিক্ষেপে শীঘ্র যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমাদের সৈন্যব্যূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সরল পথের অনুসরণ না করার ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে আমি এই প্রকারে শীঘ্র যাইবার আশায় পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া অবতরণ করিবার সময় এমন লতা গুল্মাচ্ছাদিত অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম যে, অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল এবং পুনরায় ফিরিয়া যাইয়া সরল পথের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

আমরা প্রাতে ৬॥ টার সময় পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিয়া প্রায় ৯টার সময় পর্ব্বত শিখরে মন্দিরের পাদদেশে আসিয়া পৌছিলাম।

পর্ব্বতারোহণে কষ্ট বোধ হইতেছিল, কেননা, ইহার পূর্ব্ব হইতেই কয়েক দিন ধরিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ ও পর্ব্বতারোহণ করা যাইতেছিল, দরিদ্র পা বেচারীর অবস্থা শোচনীয়। পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় পর্ব্বতারোহণ করিবার সময় কষ্ট হইলেও মাঝে মাঝে পর্ব্বত গাত্রস্থ স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি দেখিয়া নির্ম্মল কাব্যাস্বাদ উপভোগ করিতেছিলাম। আমরা বেশ গল্প ও মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। আমাদের চীৎকার পর্ব্বতে পর্ব্বতে আঘাত পাইয়া বিকট প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিতেছিল; কেহ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে অগ্রগামীরা "বন্দেমাতরং" বলিয়া চীৎকার করিতেন। তিনি বুঝিতে পারিতেন, কোথা হইতে চীৎকার আসিতেছে; তিনিও "বন্দেমাতরং" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া অগ্রগামীদিগের অনুসরণ করিতেন।

পথে যাইতে যাইতে দূর হইতে এক জল-প্রপাতের অশ্রান্ত গীতধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে পৌছিল। আমরা প্রায় সকলে সেখানে পুনর্মিলিত হইলাম। পার্শ্বনাথজীর মন্দির যে পর্ব্বত শিখরে স্থাপিত, তাহাতে গমন করিতে হইলে, মাঝে একটী অনত্যুচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থ উপত্যকায় চা উৎপন্ন হয়। আমাদের উপত্যকা দিয়া যাইতে হইল। সেই উপত্যকা হইতে উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কত উর্দ্ধে পার্শ্বনাথজীর মন্দির।

বলিয়াছি, প্রায় ৯ টায় পর্ব্বত শিখরস্থ পার্শ্বনাথজীর মন্দিরের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম; জুতা ও মোজা খুলিয়া উপরে উঠিতে হইল। তখন কোন যাত্রী ছিল না। যাত্রীরা নিকটস্থ পর্ব্বত-পৃষ্ঠ-সংলগ্ন যাবতীয় মন্দিরে পূজা সমাপ্ত করিয়া সর্ব্বশেষে এখানে আসিল।

আমাদের সঙ্গে মাপিবার ফিতা ছিল না; জরিপে অভ্যাস নিবন্ধন আমাদের প্রত্যেক পদ বিক্ষেপের মাপ নির্দ্দিষ্ট; ইহারই সাহায্যে মন্দিরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্দ্ধারণ করিলাম। দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ ফিট এবং প্রস্থ ২৮ ফিট; নীচ হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি ৭৮টী।

মন্দিরের উপর উঠিয়া চারিদিকে চাহিলাম, দেখিলাম, আকাশের অনন্ত নীলবর্ণ কতদূরে ধূসরবর্ণে পর্য্যবসিত হইয়াছে; এবং ক্রমে ক্রমে সেই ধূসরবর্ণ দিক্‌বলয়ে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। চারিদিকে ধূ ধূ, পূর্ব্বে প্রকৃতির বিশালতা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম; আজ দেখিলাম, প্রকৃতি শুধু সুন্দর নহে, প্রকৃতই বিশাল। চারিদিকে চাহিতে

নিজের ক্ষুদ্রত্ব কিরূপ পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হয়। দেখিলাম, এক শীর্ণদেহা স্রোতস্বতী অদূরে বিশাল সর্পের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; স্রোতস্বতীর নাম যমুনা; ইহাতে চর্ম্মচক্ষের জল দেখা যায় না, কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে জল নয়নগোচর হয়। নিকটে অনেকগুলি পর্ব্বতের চূড়া বা টিব্যা রহিয়াছে; ইহা দেখিয়া "বাল্মীকির জয়ের" কথা মনে পড়িল। সেই অভ্রংলিহ মন্দিরের উপর উঠিয়া বোধ হইল যেন অনন্ত নীলিমা-বিস্তারে ভাসিতেছি। যে মহাত্মার অর্থে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে,তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি অসাধারণ; আর যে সকল শ্রমজীবীর শরীর ক্ষয়ে ইহার ভিত্তি প্রোথিত হইয়াছে ও অভ্রভেদী সৌধ উঠিয়াছে, তাহাদের কথা কি বলিব না? ইতিহাস তাহাদের অখ্যাত অজ্ঞাত শোণিতপাতের কথা লিখে না; কিন্তু মন্দিরে উঠিলে সে সব কাহিনী যেন জলন্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহা না হইলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে কেন? মন্দিরের ভিত্তির প্রত্যেক প্রস্তরে, সোপানের প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডে তাহাদের কীর্ত্তি চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের মধ্যে দেখা গেল, এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর পরেশনাথ স্বামীর পদচিহ্ন রহিয়াছে; জৈনেরা বিশ্বাস করেন যে, ইহাই তাঁহার পদচিহ্ন; কিন্তু পদযুগল সাধারণ পদের ন্যায় নহে। দৈর্ঘ্যে সাধারণ পদ অপেক্ষা অল্প এবং প্রস্থে অধিক। সেই কৃষ্ণ প্রস্তরের চতুর্দ্দিকে দেবনাগরী অক্ষরে কি লিখিত রহিয়াছে দেখিলাম; দেখিয়া কৌতূহলের উদ্রেক হইল; সমস্ত পাঠ করিবার অবকাশ পাওয়া গেলনা,কেননা স্ত্রী যাত্রী আসিয়া পড়িল। যাহা পাঠ করিলাম, তাহা এই;—

"সংবৎ ১৮৪৯ মিতি মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথৌ বুধবারে শ্রীপার্শ্বনাথজি তস্য চরণ দাস:—" পূর্ব্ব হইতেই পাঠ করিতে আমাদের কষ্টবোধ হইতেছিল; দুইটী বালক সহ একজন জৈন যাত্রী আসিল; তাহারা প্রত্যেকে কুলি হইতে কিছু কিছু নৈবেদ্য দিয়া পার্শ্বনাথজীর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। আমরা তাঁহাকে পাঠ করিতে দিলাম; তেমন পারিলেন না। বলিলেন,১৮৪৯ সম্বতে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাই জানিবার বিষয়। ইহার অব্যবহিত পরেই পুরুষ ও স্ত্রী যাত্রী আসিয়া পড়িল। যাত্রীরা আমাদের দিকে সবিস্ময়ে চাহিতেছিল। একজন বৃদ্ধ মাড়োয়ারী যাত্রী জিজ্ঞাসা করিল "বাবুজী, আপনি কি জৈন?" বুঝিলাম যে জৈন শুনিলে অত্যন্ত সুখী হয়। বলিলাম "না জৈন নহি; হিন্দু; কিন্তু পার্শ্বনাথজীকে ভক্তি করি।" ইহাতে সে অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া বলিল "পার্শ্বনাথজী আপনাদের মঙ্গল করুন।"

পর্ব্বত-পৃষ্ঠস্থ মন্দির সমূহের কথা কিছু সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। পরেশনাথ পর্ব্বতের উপর চতুর্ব্বিংশতি মন্দির আছে; এবং এই পর্ব্বতে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে বিংশতি জন নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহাদের কথা পরে বলিব। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে জগৎশেঠ বংশের কোন আদি পুরুষ এই পর্ব্বতে তীর্থঙ্করদিগের নির্ব্বাণ স্থানের নির্দ্দেশক হিসাবে সামান্য পত্তন গাঁথিয়া যান। পরে ১৬২০ সম্বতে ধনপৎ সিংহজী নামক এক ধনশালী ব্যক্তি ঐ সকল স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুনর্ব্বার প্রায় ৬ বৎসর হইল, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রায় বদ্রিদাস মুকিম বাহাদুর উহাদের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন।

আমাদের সমস্ত মন্দিরগুলি দর্শন করিবার

অবকাশ ও সামর্থ্য ছিল না। কেবল মাত্র পার্শ্বনাথজীর মন্দিরেই যাওয়া হইয়াছিল; ইহা ইষ্টক ও সুরকীর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পর্ব্বতগাত্রস্থ মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দিরগুলি পর্ব্বতের পৃষ্ঠ-দেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; সমস্ত মন্দিরগুলি দেখিয়া আসা সময় ও শ্রম সাপেক্ষ, কারণ যদিও সকল মন্দিরগুলি পর্ব্বতগাত্রে, কিন্তু বলিতে হইবে না যে, পর্ব্বতগাত্র বলিলে এক সমতলভূমি বুঝায় না, মাঝে মাঝে অনেক চড়াই ও উৎরাই আছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ৪।৫টী বন্ধুর ১২।১৩টী মন্দির দেখা হইয়াছে; তাহার কারণ, ইঁহারা ভ্রান্তি নিবন্ধন প্রকৃত পথ হইতে অন্য পথে যাইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা পুনশ্চ আর একটী সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন, যাহা হইতে আমরা বঞ্চিত; পর্ব্বতের গাত্রে এক প্রস্রবণ আছে; আমার বন্ধুরা স্নানাহার করিয়া আসিয়াছেন।

পর্ব্বত-সংলগ্ন যাবতীয় মন্দিরে পূজা সমাপন করিয়া যাত্রীরা সর্ব্বশেষ পার্শ্বনাথজীর মন্দিরে আসিল। মন্দিরে যাইয়া পরেশনাথজী বা পার্শ্বনাথজীর পদচিহ্নের সম্মুখস্থ বেদীতে তাঁহার উদ্দেশে নৈবেদ্য রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। * তাহাদের ভক্তিবিহ্বল মন্ত্রোচ্চারণে কি এক ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার ভাব আছে, দেখিলাম; দেখিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। কেহ কেহ মন্দির প্রদক্ষিণ করিল। স্ত্রী পুরুষ সকলেই সুমিষ্ট স্বরে "পরেশনাথজী কি জয়" ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে লাগিল।

এক্ষণে জৈনধর্ম্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। জৈনেরা দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত, দিগম্বরী ও শ্বেতাম্বরী। দিগম্বরী সম্প্রদায় দুই অংশে বিভক্ত;—বিশপন্থী ও তেরপন্থী।

জৈন সম্প্রদায়

দিগম্বরী | শ্বেতাম্বরী

বিশপন্থী | তেরপন্থী।

আমরা যে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহা এই বিশপন্থী সম্প্রদায়ের; তেরপন্থী ও বিশপন্থীর মত-পার্থক্য পূজার অনুষ্ঠান লইয়া; বিশপন্থীরা বিগ্রহের সম্মুখে পুষ্প ও জাফরান্ অর্ঘ্য প্রদান করে, কিন্তু তেরপন্থীরা তাহা করে না। এই দুইদল প্রায় একশত বৎসর গঠিত হইয়াছে। দিগম্বরী সম্প্রদায়ের বিগ্রহ কোন প্রকার বস্ত্রাবৃত নহে, শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের বিগ্রহ বস্ত্রালঙ্কারাচ্ছাদিত। কলিকাতায় দুইটী সম্প্রদায়েরই মন্দির আছে। শ্যামবাজারের নিকটের মন্দিরটী দিগম্বরী সম্প্রদায়ের, আর রাজারবাগানের নিকটবর্ত্তী মন্দির শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের।

জৈনদিগের মতে অহিংসা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; জৈনধর্ম্মাক্রান্ত অনেকে চলিবার সময় সম্মার্জ্জনী দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হন, পাছে কোন কীট পদদলিত করেন; আবার জলপান করিবার সময় জল ছাঁকিয়া পান করেন এবং নাসিকা ও মুখদেশ সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করেন, পাছে বায়ুতে ভ্রাম্যমান কোন ক্ষুদ্র কীট মুখ-বিবর বা নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এ বিষয়ে জৈনেরা বৌদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর।

জৈনদের মধ্যে সকলেই বেণীয়া বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্গত; জৈনেরা ৮৪ শাখায় বিভক্ত। ইহাদের পুরোহিত পূজার সময়

* নৈবেদ্যের উপকরণ কাঁচা চাউল, জাফরাণ, লবঙ্গ, বাদাম, কিসমিস ইত্যাদি।

উপবীত ধারণ করেন। দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়,জৈনদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ আছে,তাঁহারা আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ব্রাহ্মণ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। আমাদের ধর্ম্মে যেমন ব্রাহ্মণের আসন সর্ব্বাগ্রে, উহাদের সেরূপ নহে।

জৈনেরা"সর্ব্বজ্ঞ বীতরাগের"পূজা করেন। বীতরাগের অর্থ যিনি রাগ বা অনুরাগ, দ্বেষ ও মোহ বর্জ্জিত। আত্মা যে অবস্থায় অনন্ত জ্ঞান,"অনন্ত দৃষ্ট,"অনন্ত সুখ ও অনন্ত শক্তি, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থায় উপনীত হয়েন, তাহারই আকাঙ্ক্ষা করেন। জৈনদের মতে আত্মা যখন নিম্নলিখিত অষ্টাদশ "দৌর্ব্বল্য" হইতে মুক্ত হয়েন, সেই অবস্থাই বাঞ্ছনীয়।

অষ্টাদশ দৌর্ব্বল্য—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, জরা, মরণ, রোগ, শোক, ভয়, বিস্ময়, রাগ, দ্বেষ, নিদ্রা, স্বেদ, মদ, মোহ, চিন্তা, ক্লেশ, রতি ( আকাঙ্ক্ষা )। এই মুক্ত অবস্থাই আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা; আত্মার এই পূর্ণ স্বভাব অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান এবং অনন্তকাল থাকিবে; আত্মা অনাদি, অনন্ত। জৈনশাস্ত্রমতে জীবাত্মা সর্ব্বদাই এই পূর্ণ অবস্থা বা পরমাত্মার অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে; জৈনেরা ইচ্ছা করেন, যাহাতে জীবাত্মা পরমাত্মার অবস্থা লাভ করে এবং এই অবস্থার প্রাপ্তি হইলে আর পতন বা স্খলন অসম্ভব। এক কথায় জৈনশাস্ত্রের উপদেশ বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, জীবাত্মাকে "বীতরাগ" হইতে হইবে; কারণ ইহা না হইলে পরমাত্মার গুণ বা শক্তি ( অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দৃষ্টি ইত্যাদি ) লাভ করা অসম্ভব। যে সকল মহাত্মা পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ দোষ হইতে মুক্ত হয়েন, জৈনেরা মন্দিরে ইঁহাদিগেরই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন; ইঁহারা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত; ইঁহারাই জগতে ধর্ম্মের পথ দেখাইয়াছেন। জৈনেরা বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক কল্পে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

১। ঋষভদেব।
২। অজিতনাথ।
৩। শম্ভুনাথ।
৪। অভিনন্দননাথ।
৫। সুমতিনাথ।
৬। পদ্মপ্রভু।
৭। সুপার্শ্বনাথ।
৮। চন্দ্রপ্রভু।
৯। পুষ্পদন্তনাথ।
১০। শীতলনাথ।
১১। শ্রেয়াংশনাথ।
১২। বাসপূজ্যনাথ।
১৩। বিমলনাথ।
১৪। অনন্তনাথ।
১৫। ধর্ম্মনাথ।
১৬। শান্তিনাথ।
১৭। কুন্তনাথ।
১৮। অর্হনাথ।
১৯। মল্লিনাথ।
২০। মনিসুব্রতনাথ।
২১। নমিনাথ।
২২। নিয়মনাথ।
২৩। পার্শ্বনাথ।
২৪। মহাবীরস্বামী।

পূর্ব্বোক্ত তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত চারিজন ভিন্ন সকলেই পরেশনাথ পর্ব্বতে মোক্ষ লাভ করেন।

| | মোক্ষস্থান |
|---|---|
| ঋষভদেব | কৈলাস পর্ব্বত |

| | |
|---|---|
| বাসপূজ্যনাথ | চম্পাপুরী (ভাগলপুর) |
| মহাবীর স্বামী | পাওয়াপুর (বিহারে) |
| নিয়মনাথ | গীর্ণার (কাটিয়াওয়াড়, জুনাগড়) |

রাজপুতনার অন্তর্গত আবুপর্ব্বতে ঋষ্যদেব ও পার্শ্বনাথ দেবের সুন্দর মন্দির আছে; ইহা প্রায় ৯ শত বৎসর পূর্ব্বে দশ শত খ্রীঃ নির্ম্মিত।

জৈনশাস্ত্রানুসারে ধ্যান মুক্তির প্রধান সোপান; ধ্যান বলিলে শুদ্ধ মনের একাগ্রতা বুঝায় না, কায় ও বাক্যের সংযমও বুঝায়। জৈনগ্রন্থানুসারে আত্মার পবিত্রতা সাধিত করিতে হইলে সাধকের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা এবং তীর্থঙ্করদিগের মহিমা কীর্ত্তন ও নাম জপকরা উচিত। বাক্ সংযম মুক্তির প্রধান সোপান; আসন মুক্তির দ্বিতীয় সোপান, আসন দ্বিবিধ (১) পদ্মাসন ও (২) কায়োৎসর্গাসন। দ্বিতীয় আসনে সাধককে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়; মুক্তির তৃতীয় সোপান চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন। মালা জপ ইহাতে বিশেষ সহায়তা করে। দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মতে ১১১টী গোলিকা লইয়া জপমালা গঠিত। ১০৮টী গোলিকার মধ্য দিয়া সূত্র প্রবেশ করাইবার পর, দুইটী শেষাংশ তিনটী গোলিকার মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয়। আধ্যাত্মিক অর্থে ১০৮টী গোলিকা মানুষের জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের নির্দ্দেশক।

উপরের তিনটীকে "রত্নত্রয়" বলে। উহারা নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের নির্দ্দেশক।

(১) "সম্যক দর্শন"।
(২) "সম্যক জ্ঞান"।
(৩) "সম্যক চরিত্র"।

সম্যক দর্শন—প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তঃস্থলে যে সার সত্য রহিয়াছে, তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

সম্যক—জাগতিক বস্তু সকলের সারসত্যের (ultimate reality)

সম্যক জ্ঞান।

সম্যক চরিত্র—যতি কিম্বা সংসারীর পক্ষে প্রকৃষ্ট ব্যবহার।

সম্যক চরিত্রের অন্তর্গত কর্ত্তব্য পাঁচটী:—

১। অহিংসা (৩) সত্যবাদিত্ব (৩) পরদ্রব্যাপহরণ না করা।

৪। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে পবিত্রতা ও সংযম।

৫। অন্যায় আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন।

আমাদের যেমন দেবে শ্রদ্ধা, জৈনদের তেমন "আগম" বা "জৈনসিদ্ধান্ত গ্রন্থে" বিশেষ শ্রদ্ধা। চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীই আগমের প্রচারক।

অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়াম্‌স্ ( Sir Monier Williams) তাঁহার "ভারতবর্ষীয় জ্ঞান" বা ( Indian Wisdom )গ্রন্থে জৈনদের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন; তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা মধ্বাচার্য্যের"সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ"হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে সাদৃশ্য বেদ অপ্রামাণ্য বিশ্বাসে; জৈনধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়; অধ্যাপক ল্যাসেন্ ও ওয়েবরের মতে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শাখান্তর মাত্র। অনেকের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংমিশ্রণে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি; আবার অনেকে বলেন যে জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষায়ও প্রাচীন (যথা কোলব্রুক্ এবং ষ্টিভেন্‌স্) যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্মে ও জৈনধর্ম্মে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জৈনদিগের মধ্যে যাঁহারা বীতরাগ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে তীর্থঙ্কর, বা জীনেশ্বর, বা অর্হৎ, বা সর্ব্বজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয়।

বৌদ্ধদিগের মধ্যেও যদি কোন মহাত্মা এই প্রকার বাসনা জয় করিয়া সার সত্যে উপনীত হয়েন, তাঁহাকে বুদ্ধ কহা যায়। জৈনদিগের মধ্যে যেমন ২৪ জন তীর্থঙ্করের উল্লেখ আছে, বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রেও ২৪জন বুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়। জৈনদিগের মতে কাল অনন্ত-কাল ধরিয়া চক্রগতিতে দুইটী কল্প ব্যাপিয়া ধাবিত হইতেছে; ১ম উৎসর্পিনী, ২য় অব-সর্পিনী। প্রত্যেক কল্পেরই ৬টী ক্রম আছে। প্রথম কল্পের প্রথম কালে সমস্তই অবিমিশ্র মন্দ। ৬টী ক্রম দেওয়া যাইতেছে।

১। অবিমিশ্র মন্দ।
২। মন্দ।
৩। মন্দ ও উত্তমের মিশ্রণ।
উত্তম ও মন্দের মিশ্রণ।
উত্তম অবস্থা।
অবিমিশ্র উত্তম অবস্থা।

অবসর্পিনী কল্পের প্রারম্ভে অবিমিশ্র উত্তম অবস্থা হইতে অবিমিশ্র মন্দ অবস্থায় শেষ হয়। প্রথম কল্পে মনুষ্যের আকৃতি ও পরমায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও দ্বিতীয় কল্পে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমরা এক্ষণে অবসর্পিনী কল্পের পঞ্চমস্তরে অর্থাৎ মন্দ অবস্থায় পৌছিয়াছি। দুইটী কল্পব্যাপী কালকে একযুগ বলে; জৈনদিগের মতে ২৪টী "জীন" বা তীর্থঙ্কর উৎসর্পিনী কল্পে ও ২৪টী অবসর্পিনী কল্পে জন্মিয়াছেন ও ২৪টী ভবিষ্যতে জন্মিবেন। বর্ত্তমান কল্পের প্রথম জীনের ৮৪ লক্ষ বৎসর পরমায়ু ছিল. এবং আকৃতি উচ্চে ৫০০ ধনু। দ্বিতীয়ের আকৃতি ও পরমায়ু ইহা অপেক্ষা ন্যূন। এইরূপে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী একশত বৎসর জীবন ধারণ করেন এবং চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী ৪০ বৎসর জীবন ধারণ করেন এবং তাঁহার আকৃতি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ছিল।

জৈন শাস্ত্র মতে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ জীব যাহা চৈতন্য স্বরূপ, আর এক ভাগ অজীব, যাহা জড় সংজ্ঞক। জীব আবার তিন ভাগে বিভক্ত—

১। নিত্যসিদ্ধ যেমন জীবেরা।

২। মুক্তমান যেমন বীতরাগ, বাসনা মুক্ত জীবেরা।

৩। বদ্ধাত্মা বা সংসারপাশবদ্ধ জীব।

বৌদ্ধেরা যেমন উপাসক ও শ্রমণ এই দুই শাখায় বিভক্ত, জৈনেরাও তদ্রূপ শ্রাবক ও যতি, এই দুই ভাগে বিভক্ত, শ্রাবকেরা সংসারী।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, জৈন শাস্ত্রের সংখ্যা ৫০। তাহা "সূত্র" বা "সিদ্ধান্ত" নামে অভিহিত। সূত্র বিভাগ দুইটী প্রণালী অনুসারে নিষ্পন্ন।

প্রথম :—

সূত্র

| কল্পসূত্র | আগম |
|---|---|
| (২খানি) | (৪৮খানি |

অথবা দ্বিতীয় :—

সূত্র

| অঙ্গ | উপাঙ্গ | মূলসূত্র | কল্পসূত্র | ছেত্তঃ |
|---|---|---|---|---|
| (১১খানি) | (১২) | (৪) | (৫) | (৩) |

| পয়ন্ন | নন্দীসূত্র | অনুযোগদ্বার সূত্র |
|---|---|---|
| (১০) | | |

এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা চারি ভাগে বিভক্ত :—

১। টীকা।
২। নির্য্যুক্তি।
৩। চূর্ণী।
৪। ভাষ্য।

মূলসূত্র ও ব্যাখ্যা লইয়া সূত্র"পঞ্চাঙ্গ সূত্র" নামে অভিহিত।

জৈনদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃতে ও মাগধী প্রাকৃত লিখিত, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-শালার অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন, তিন ভাষায় লিখিত।

১। সংস্কৃত।

২। মাগধী।

৩। হিন্দি।

জৈনেরা পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাস করেন।

জৈন তীর্থঙ্করদিগের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা অতীব কঠিন এবং কোন্ সময় জৈন ধর্ম্মের প্রথম প্রচার, তাহার নির্ণয় করাও অসম্ভব। তবে আমরা বহু পণ্ডিতগ্রাহ্য কয়েকটী সময়ের নির্দ্দেশ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

খ্রীষ্ট জন্মের ৫২৭ বৎসর পূর্ব্বে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী নির্ব্বাণ লাভ করেন; এবং "কল্পসূত্র" মতে পার্শ্বনাথস্বামী, মহাবীর স্বামীর ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ স্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাবিংশতি জন তীর্থঙ্কর কোন্ সময় আবির্ভূত হন; তাহা জৈনশাস্ত্রগ্রন্থ বা জৈন সাহিত্য হইতে নির্দ্ধারণ করা যায় না। এমন কি, জৈনসিদ্ধান্ত গ্রন্থে উঁহাদিগের কোন মতেরও উল্লেখ নাই। মহাবীর স্বামীর ৬০৯ বৎসর পরে অর্থাৎ ৮৩ খ্রীঃ অব্দে দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

# সংশয়বাদ। (শেষ)

নিরীশ্বরতা প্রতিপাদনশীল যুক্তিরও সংসারে অপ্রতুল নাই। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। পৃথিবীতে যাহা ঘটে, আস্তিকের মতে তাহা ঈশ্বরের সম্মতিক্রমেই ঘটে। কারণ ঈশ্বর সর্ব্বকারণের কারণ সর্ব্বশক্তিমান। সুতরাং জগতে যে সমস্ত অযথা অত্যাচার, যাতনা, মনঃপীড়া প্রভৃতি ঘটে, অবশ্য সে গুলি ঈশ্বরের সম্মতিক্রমেই ঘটে। কিন্তু তাহা হইলে, ঈশ্বর হয় নিষ্ঠুর, না হয় পরাধীন। নতুবা জগতের দুঃখ তিরোহিত হয় না কেন? ঈশ্বরকে পরাধীন বলা যায় না, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। পরাধীন ব্যক্তি কখনও ঈশ্বর-পদাভিরূঢ় হইতে পারে না। ঈশ্বর দয়াময় ও স্বাধীন হইলে জগতে দুঃখের অস্তিত্ব থাকিত না; সমস্তই মঙ্গলময়, আনন্দময় হইত। ঈশ্বরকে নিষ্ঠুরও বলিতে পারা যায় না। কারণ নিষ্ঠুরতা একটা জঘন্য ঘৃণিত গুণ। ঈশ্বরে তাহা কল্পিত হইলে ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাৎ হয়। যদি বল, ঈশ্বর দয়াময়ও নহেন, কিম্বা নিষ্ঠুরও নহেন, কেবল কর্ম্মফল দাতা মাত্র। যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করাই তাঁহার কার্য্য। কর্ম্মফল ও ঈশ্বরে প্রযোজ্য প্রয়োজন সম্বন্ধ স্বীকার ব্যতীত ঐ প্রকার ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে ঈশ্বর ও কর্ম্মফলেও প্রযোজ্য প্রয়োজক সম্বন্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পরস্পর পরস্পরের অধীন হইয়া পড়েন। সুতরাং ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন স্বীকার করিতে হয়। উহা কি ঈশ্বর-বিরোধী যুক্তি নহে! বিশেষতঃ আবার সেই অনবস্থা। যে দিক দিয়াই কেন যাও না—পরিশেষে অনবস্থা ব্যতীত আর

কিছুই আশা করা যায় না। এই সমস্ত ভাবিয়াই একজন দার্শনিক কবি বলিয়া গিয়াছেন ;—

"How can it be that Brahm
Could *make* a world and leave it *miserable*?
Since if, all-powerful, he leaves it so,
He is not *good*; and if not powerful
He is not God"

২। ঈশ্বরকে হয় ন্যায়পরায়ণ (just) না হয় করুণাময় (merciful) বলিতে হয়। একদা ( at once ) তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় বলিতে পারা যায় না। ন্যায়মার্গ অনুসরণ করিলে করুণার অসম্বন্ধ, ও করুণা মার্গ অনুসরণে ন্যায়ের অসম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে। দৃষ্টান্ত পাঠক ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। উক্ত গুণদ্বয়ের ক্রমিক বিকাশও ঈশ্বরে অসম্ভব। কারণ তাহাতে কারণান্তর অপেক্ষা করে ও অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরও বিরোধী হইয়া পড়েন।

৩। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি প্রবৃত্তিই অসম্ভব। কারণ প্রবৃত্তি (desire) অভাব মূলক। পূর্ণতা(perfection)ও প্রবৃত্তি একত্র থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ একটী প্রবৃত্তি হইতে একটী কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে, বিভিন্ন কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং প্রতি কার্য্যের জন্যই ঈশ্বর-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন change স্বীকার করিতে হয়। এই পরিবর্ত্তন অনিত্যতার পরিচায়ক। পরিবর্ত্তন বা বিকার সান্তের ধর্ম্ম, অনন্তের নহে। অনন্তের বিকার স্বীকারে অনন্তের হানি হয়। কারণ, বিকার কারণ সাপেক্ষ। যাহা অনন্ত, তাহার কারণ (তর্কের খাতিরে বলিতেছি) অনন্ত ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। তাহা হইলেই আবার অনবস্থা।

৪। ঈশ্বরকে নিরাকার ও নিরবয়ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু যাহা নিরাকার ও নিরবয়ব, তাহা আকাশের ন্যায় নিষ্ক্রিয়। তাহা হইলে সৃষ্টিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি বল, নিরাকার ও নিরবয়ব হইলেও ঈশ্বর আত্মার ন্যায় ক্রিয়াবান,—ইহাও ঠিক নহে। কারণ আত্ম তত্ত্বই জটিল।

৫। ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলা হইয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বশক্তিমান শব্দের অর্থ কি? তিনি কি পরস্পর-বিরোধী (contradictory) বাক্যদ্বয়ের দুইটীকেই এক অর্থে ও এক সময়ে সত্য করিতে পারেন? তিনি কি একটী ত্রিভুজের কোণ-ত্রয়কে একত্রে দুইটী সমকোণের অধিক প্রতিপন্ন করিতে পারেন? তিন কি দুইটী সরল রেখা দ্বারা একটী মাত্র স্থলকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন? তিনি কি ভাব পদার্থকে অভাবে পরিণত করিতে পারেন? তিনি কি আপনার মত আর একটী অনন্ত (infinite) পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি কি স্বসত্বা হানি করিতে পারেন? যদি বল পারেন, তাহা হইলে তর্কের মূল ব্যাপ্তির উচ্ছেদ হয়, কারণ "অসম্ভব" নামে কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ স্বসত্বা হানির শক্তি থাকিলে ঈশ্বরের অভাবও সম্ভব হইয়া পড়ে। আর যদি বল পারেন না, তাহা হইলে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন।

৬। জগৎকে ঈশ্বর-সৃষ্ট স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে অসীম অনন্ত বলা যায় না। কারণ, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জগৎ ঈশ্বরোপাদান পরিণাম বা ঈশ্বর-বিজাতীয় উপাদান পরিণাম? প্রথম পক্ষ স্বীকারে জগৎকেও নিরবয়ব বলা উচিত। কারণ নিরবয়বের পরিণাম কদাচ সাবয়ব হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকারে ঈশ্বরকে সসীম স্বীকার করিতে হয়। দুইটী সত্বা স্বীকার করিলে কোনটাই অনন্ত হইতে পারে না। একটী

অপরটীর প্রতিরোধক হইয়া পড়ে। একটীর সর্ব্বাত্মক ব্যাপকতা অন্যটীর অভাব-জ্ঞাপক। 'দুই' শব্দটাই সসীমতার বোধক।

কেহ কেহ বলেন, সাকারের সম্বন্ধেই উক্ত নিয়ম খাটে, নিরবয়বের সম্বন্ধে নহে। ইহা ঠিক নহে, কারণ যখন একটী সত্ত্বাই সত্ত্বান্তরের প্রতিরোধক, তখন নিরবয়ব সাবয়বের পার্থক্য কোথায়?

একাধিক ক্ষুদ্র সত্ত্বা পরস্পর অবিরোধী ভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু একটী ক্ষুদ্র সত্ত্বাকে অভাবে পরিণত করিতে না পারিলে অপর সত্ত্বার অনন্ত বিস্তার অসম্ভব ও অযৌক্তিক। সত্ত্বার অভাবও অসম্ভব। দুই এক হইবে, অথচ দুই দুইই থাকিবে, এ প্রকার কল্পনা মনের অগোচর।

কেহ কেহ বলেন, 'ঈশ্বর নাই' এই জ্ঞান হইতে হইলেই অধিকরণ রূপে ঈশ্বর সিদ্ধি হইয়া থাকে। কারণ একান্ত অভাব সম্বন্ধে উক্ত প্রকার জ্ঞানই হয় না। 'ঘট নাই' বলিতে 'ঘট' জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরিভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগীর বা অধিকরণের জ্ঞান আবশ্যক। যাহার অভাব সাধিতে হইবে, তাহাকে প্রতিযোগী বা অধিকরণ বলে। ঘটাভাব সাধ্যস্থলে ঘট প্রতিযোগী। সেই প্রকার 'ঈশ্বরোনাস্তি' ঈশ্বর-জ্ঞান-সাপেক্ষ।

এ উত্তরও সন্তোষজনক নহে। কারণ ধ্বংসাভাব পক্ষেই এ যুক্তির কার্য্যকরিতা, অন্যত্র নহে। জিজ্ঞাসা করি, প্রতিযোগী বা অধিকরণ ভাব পদার্থ বা অভাব পদার্থ? যদি বল, ভাব পদার্থ, তবে আবার তাহার অভাব কি? ভাবের কি কখনও অভাব হইতে পারে? যদি বল, অভাব পদার্থ, তাহার আবার অভাব কি? অভাবের অভাব ত ভাবের বোধক

কেহ কেহ বলেন, জগতের কারণ অবশ্যই জগদতিরিক্ত। কারণ, সেই কারণ জগদন্তর্গত হইলে জগৎ একবারেই সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ হইয়া থাকিত, ক্রমবিকাশশীল হইত না। বৃক্ষের সমুদয় কারণ বীজে নিহিত থাকিলে বীজ ও বৃক্ষ সমসাময়িক ( simultaneous ) হইত—বৃক্ষের ক্রমোৎপত্তি হইত না। বৃক্ষোৎপত্তি যেমন কারণান্তর সাপেক্ষ, জগদুৎপত্তিও তেমনি কারণান্তর সাপেক্ষ—সেই কারণই ঈশ্বর।

ইহাও গ্রহণযোগ্য উত্তর নহে। কারণ, জিজ্ঞাস্য জগদতিরিক্ত কারণ নিত্য বা জন্য? যদি বল নিত্য, ক্রমবিকাশ বা ক্রমিকোৎপত্তি (successive evolution) অসম্ভব। যদি বল,—জন্য, অনবস্থা। সুতরাং ইহাতেও ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না।

যাঁহারা অসীমতা ও চরমোৎকর্ষের জ্ঞানকে (idea of the infinite and the perfect) স্বভাবজ (intuitive) বলিতে চান, তাঁহাদিগকে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, জ্ঞানের (knowledge) এর তারতম্য অনুসারে ঐ ভাবেরও (ideaর‌ও) তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এবং ঐ ভাব ( idea) সকল মানুষের নাই, উহা বিদ্যা দ্বারা ও চিন্তা দ্বারা অর্জ্জিত হয় মাত্র।

এখন দেখা যাউক, কার্য্য কারণ ব্যাপারটা কি? কার্য্য কাহাকে বলে? ইহার দুইটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

১। প্রথম যাহার অভাব থাকে, পরে যদ্দ্বারা সেই অভাবের পূরণ হয়, তাহাকে কার্য্য বলে। অর্থাৎ যাহা ছিল না, হইল—যাহা এই প্রতীতির বিষয়, তাহাকে কার্য্য বলে।

২। যাহা অবয়ব সমুদয়ের মিলনে উদ্ভূত, তাহাকে কার্য্য বলে।

প্রথম লক্ষণটী সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য—উক্ত প্রাগভাব (prior non-existence) ভাবরূপী

বা অভাবরূপী? যদি বল ভাবরূপী, তাহা হইলে উক্তিবিরোধ দোষ(contradiction in terms)ঘটে। যদি বল অভাবরূপী,তাহা হইলে উৎপত্তি, সৃষ্টি প্রভৃতি কথাগুলি ঔপচারিক (figure-of speech) মাত্র হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় লক্ষণটী সম্বন্ধেও ঐ প্রকার বিকল্প উত্থাপন করা যায়। কারণ যাহা সাবয়ব, তাহা বস্তুতই প্রাগভাবে প্রতিযোগী।

আরও দেখ, যাহার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয়, স্বীকার করিলে, স্বীকার করিতে হইবে,কার্য্য ও কারণ পরস্পর সম্বদ্ধ। যদি অসম্বদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে অভিমত (definite) কার্য্যের পরিবর্ত্তে কার্য্যান্তরের উৎপত্তিও সম্ভব হইতে পারে। ঘট কারণ হইতে পটেরও উৎপত্তি হইতে পারে। ঘট কারণ হইতে ঘটেরই যে উৎপত্তি হইবে,তাহার নিশ্চয়তা (guarantee) কি? কেন এ প্রকার হয়? কারণ, কার্য্য অভাব পদার্থ, কারণ মাত্র সৎ বা ভাব পদার্থ। কার্য্যকে নির্দ্দিষ্ট বা বিশেষ করিতে হইলে কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকা চাই। ভাবে ও অভাবে কোন সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। সুতরাং কারণ কার্য্যকে determine করিতে পারে না। অভাব non-entity কখন বহু ও পরস্পর বিভিন্ন হইতে পারে না, কারণ অভাব নির্ব্বিশেষ পদার্থ। ঘটাভাব ও পটাভাবে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য মাত্র প্রতিযোগীতে—অভাবে নহে। সুতরাং অভাব কার্য্যবাদে ঘট স্থলে পটোৎপত্তির প্রতিবন্ধক কোথায়?

ভাব কার্য্যবাদ স্বীকারেও সুফল ফলিতে পারে না। কারণ ব্যাপার নিরর্থক হইয়া পড়ে। কার্য্য যদি নিত্যই হইল, কারণের অপেক্ষা থাকিল কোথায়? ভাব পদার্থ কারণ নিরপেক্ষ যেমন আকাশাদি। এ প্রকার ব্যাপ্তিও দেখান যাইতে পারে।

উক্ত প্রকার বিচারে দেখা গেল,কার্য্যকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। কার্য্য পদার্থটা অদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বড়ই রহস্যময় (mysterious)। যাহা রহস্যময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহা হইতে কোন অভিমত ফললাভ সুকঠিন।

কারণ পদার্থটাও ঐ প্রকার রহস্যময়—অনির্ব্বচনীয়। কারণের যে লক্ষণই কেন নির্দ্দেশ করনা, জিজ্ঞাস্য, কারণ স্বসমক্ষণে কার্য্যোৎপন্ন করে না, স্বপরক্ষণে কার্য্যোৎপন্ন করে? যদি বল স্বসমক্ষণে, তবে কার্য্যকে কারণ-ব্যাপার-পরবর্ত্তী বলিয়া উপলব্ধি করি কেন? যে মুহূর্ত্তে গুড়ুম করিয়া তোপ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আমি সেই মুহূর্ত্তেই উহা শুনিতে পাইলাম না কেন? বায়ুর গতি ও দূরত্ব নিবন্ধন এই ক্রমিকতা (succession) সংঘটিত হয়। ইহাও বলা যায় না। কারণ সেখানেও কার্য্য কারণ, নিয়ম বর্ত্তমান। ক্রমিকত্বের অবসর কোথায়?

যদি বল স্বপরক্ষণে, তাহাও ঠিক নহে। কারণ যাহা স্বসমক্ষণে কার্য্যোৎপত্তি করিতে অক্ষম, তাহা স্বপরক্ষণে কি প্রকারে কার্য্য উৎপন্ন করিবে? স্বসমক্ষণেই বা কেন কার্য্য উৎপন্ন করিতে পারে না—পরক্ষণেই বা কেন পারে? কারণান্তরের অপেক্ষায় অনবস্থা দোষ আবির্ভূত হয়। বিশেষত এখানে কারণ শব্দে কারণকলাপকেই বোধ করাইতেছে, কারণের একটী অংশকে বোধ করাইতেছে না। অর্থাৎ সমস্ত কারণগুলি বিদ্যমান থাকিয়াও যদি স্বপরক্ষণে কার্য্যের উৎ-

পত্তি করে,তবে বুঝিতে হইবে, উহা স্বসমক্ষণে কার্য্য উৎপন্ন করিতে অক্ষম। কিন্তু এই অক্ষমতা কেন? পরক্ষণেই বা কারণ শক্তি কোথা হইতে পাইল? ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, কারণ ব্যাপারটা বড়ই রহস্যপূর্ণ।

এক্ষণে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ব্যাপ্তির অভ্রান্ততা (infallibility) নির্ণয়ের উপায় কি? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন—অন্বয় ব্যতিরেকী যুক্তিই (the method of agreement and difference) ব্যাপ্তির অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু এ উত্তর অতি হেয়। দেখ, পুরোবর্ত্তী স্থলু সম্বন্ধে অন্বয় ব্যতিরেকে একটা সম্বন্ধের সাহায্য নির্ণীত হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপ্তি-নিহিত ভাবগুলি (সার্ব্বত্রিকত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি) উপলব্ধির উপায় কি?

যদি বল,যত দিন ব্যভিচার (exception) দৃষ্ট না হইবে, তত দিন ব্যাপ্তির অভ্রান্ততা অটুট থাকিবে। ব্যভিচারের অদর্শনই ব্যাপ্তির অভ্রান্ততার প্রতিপাদক। এ কথাও অযৌক্তিক। কারণ মানুষের জ্ঞানের একটা সীমা নির্দ্ধারিত নাই। যাহা তোমার আমার জ্ঞানে উদ্ভূত হইতেছে না, তাহা যে অপর কোন ব্যক্তির জ্ঞানে ভাসিতেছে না; তাহার প্রমাণ কি? ব্যভিচার তোমার আমার চক্ষে পতিত হয় নাই বলিয়াই কি বুঝিতে হইবে, ব্যভিচার একেবারেই অসম্ভব? যদি স্থল বিশেষের সম্বন্ধ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবিতাও উপলব্ধি করিতে পারিতাম,তাহা হইলে বুঝিতাম,উক্ত সম্বন্ধ—অবশ্যম্ভাবী (necessary), তাহার ব্যভিচার সম্ভবে না। কিন্তু অবশ্যম্ভাবিত্ব উপলব্ধির বিষয় নহে—কল্পনার বিষয়। সুতরাং ব্যাপ্তিকে একেবারে শঙ্কা-বিরহিত মনে করা প্রগল্‌ভতা মাত্র। যদি বল, ব্যাপ্তির সত্যতায় আশঙ্কা তর্ক দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাও ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ তর্কের মূল ব্যাপ্তি। সুতরাং আবার অনবস্থা। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে বহ্নি জন্য না হউক—এই প্রকার তর্ক অর্থাৎ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ লইয়া যে তর্ক উদ্ভাবিত হয়, তাহাই আশঙ্কা-নিবর্ত্তক। তর্ক জিনিষটা কি? তর্ক আর কিছুই নহে—সম্বন্ধের শঙ্কিত ব্যভিচার খণ্ডনের একটা পন্থা মাত্র। তবে সেই খণ্ডনটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ-ঘটিত। বাস্তবিক এ তর্ক একটা বাকজাল বিস্তার মাত্র। কারণ, যখন ব্যাপ্তি মাত্রেই সন্দেহ, তখন কার্য্যকারণ ব্যাপ্তিরই বা প্রাধান্য স্বীকার করিব কেন? কেহ বলেন, তর্কমূলক ব্যাপ্তিতে আশঙ্কা করিতে গেলে সেই আশঙ্কাই ব্যাপ্তির অভ্রান্তি প্রতিপন্ন করে। কারণ এখানে আশঙ্কাটা কি প্রকার? অন্যত্র অন্য সময়ে তাদৃশ বিষয়ে তাদৃশ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ কি না—আশঙ্কাটা এই প্রকার। এই 'অন্যত্র,' 'অন্য সময়', 'তাদৃশ বিষয়' প্রভৃতির জ্ঞান অনুমান মূলক। সুতরাং আশঙ্কাই ব্যাপ্তির সত্যতা প্রতিপাদক। আশঙ্কাতেও অনুমানের সাহায্য পাই। বিশেষত তর্কমূলক ব্যাপ্তিতে সন্দেহ করিলে স্বক্রিয়া-বিরোধ দোষ ঘটে। তৃপ্ত্যর্থে ভোজনে ও পরপ্রবৃত্তি হেতু বাক্য প্রয়োগে চেষ্টা এই সন্দেহের অমূলকতা প্রতিপন্ন করে।

এ প্রকার কথাও তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ প্রতিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার বিশ্বাসের বা ভাবানুবন্ধিতার উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যে জ্ঞান বহুবার একভাবে উদিত হইয়াছে, সে জ্ঞানে সহজাত বিশ্বাসটা কিছু দৃঢ় হয়। এই বিশ্বাস

লইয়াই লোক-ব্যবহার। তর্ক বল, ব্যাপ্তি বল, সমস্তই এই বিশ্বাস মূলক। কিন্তু এটা একটা বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ বিশ্বাসে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাতে উহাকে তুলিয়া প্রমার উপরে বসান যাইতে পারে। যাহাকে বলি, অবশ্যম্ভাবিতা (necessity) তাহা উহার অভ্যন্তরে নিহিত নাই।

এই বিশ্বাস শব্দটার প্রকৃত অর্থ ভাবানুবন্ধিত্ব (association of ideas)। এই বিশ্বাস প্রতি পলে টলিতেছে। জ্ঞানালোক প্রতি মুহূর্ত্তে এই বিশ্বাসকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছে। এ বিশ্বাসের উপর আস্থা কোথায়? যত দিন চলে চলুক— এইটী ভাবিয়াই লোকে এ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দেয়। পলকে এ বিশ্বাসের মূল উৎপাটিত হইতে পারে। বিশেষতঃ বিশ্বাস একটা মানসিক (subjective) অবস্থা। আর সম্বন্ধটা বৈষয়িক (objective)। বিশ্বাসের সম্ভাবই সম্বন্ধ-স্থিরতার কারণ, কি সম্বন্ধস্থিরতাই বিশ্বাসোৎপত্তির কারণ, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং তর্ক ও ব্যাপ্তি সমর্থন চেষ্টা নিষ্ফল। দার্শনিকদিগের মধ্যে পরস্পর এত মতভেদ দৃষ্ট হয় কেন? যদি ব্যাপ্তি, তর্ক পদার্থটা খাঁটি সত্য হইত, আর সকলেরই তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান পরিস্ফুট থাকিত, তবে এত মতভেদ লক্ষিত হইত না।

কেহ বলেন, ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ে সন্দিহান হইলেও যাহাতে পরলোকে ইষ্টলাভ হয়—এমন কার্য্য করাই বিধেয়। যদি ঈশ্বর ও পরলোক না থাকে, ক্ষতি নাই, কিন্তু থাকিলে তৎপ্রতি উদাসীন হওয়া নাস্তিকের অমঙ্গলকর। ইহা বাতুল প্রলাপ মাত্র। কারণ নিজজ্ঞান ও বিশ্বাস-মত সরলভাবে কোন বিষয়ের মননে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুরূপ চেষ্টা করিয়া যদি সন্দেহ দূরীভূত না হয়, দোষ আমার নয়। যদি ঈশ্বর থাকেন, আমার উপর অনুকম্পা করিবেন,—দেখিবেন, আমি সাধ্যানুসারে তাঁহাকে নির্ণয় করিতে ত্রুটী করি নাই। দেখিবেন, আমার চিন্তা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার ক্রোধের কোন কারণ নাই। অদূরদর্শীর ন্যায়, নিচাশয়ের ন্যায় এই সরল চিন্তাকে তিনি দোষ মনে করিবেন না। নিজজ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্ম ঠিক করিয়া তাহার অনুশীলন করাই মানবের কর্ত্তব্য। যাহার ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস আছে, তাহাকে সেই বিশ্বাস অনুরূপ কার্য্য করাই সঙ্গত। যাহার তাহা নাই, তাহাকে নিন্দনীয় মনে করা উচিত নহে। ধরিতে গেলে মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানিবার সাধ্য নাই—ভাবনার ফল সন্দেহ—অন্ধকার। অন্ধবিশ্বাস এ স্থলে কি করিতে পারে, জানি না। যাহার যেমন বিশ্বাস, তিনি তদনুরূপ আচরণ করুন—তাহাতে তিনি তৃপ্ত হইলেই হইল। তবে যথেচ্ছাচারিতায় বা সমাজের অমঙ্গলজনক আচরণে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। কিন্তু সন্দিগ্ধচেতার, যদি সে সরল হয়—তৃপ্তি দুর্লভ। অন্ধ বিশ্বাসের তৃপ্তিলাভে তাহার বাসনা নাই। স্তোক বাক্যে তাহার সান্ত্বনা লাভ হয় না। আস্তিকের ভাবনা কোথায়—চিন্তা কোথায়? যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখা যায়, তাহা নাস্তিক্যবাদ কর্ত্তৃকই প্ররোচিত।

"যদি ন স্যাৎ ন হানিঃ স্যাৎ অস্তিচেৎ নাস্তিকো হতঃ।"

বিচার-বিমুখ আস্তিকের এ বাক্যে সরল সন্দেহবাদীর মনে যেন কোন প্রকার ভীতির সঞ্চার না হয়। যতক্ষণ ঈশ্বর-বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ অন্ধবিশ্বাস পরিহার করা সর্ব্বথা যুক্তি-সিদ্ধ।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

# স্ত্রী জাতি ও পুরুষ।

"স্ত্রী পুং ভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে অচিহ্নিত * জীবকোষ কিরূপে দ্বি-চিহ্নিত হইল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধ "স্ত্রী পুংভেদের" পরিশিষ্ট রূপে গৃহীত হইতে পারে। স্ত্রী ও পুং ভেদের পর উভয়ের যে সকল আনুষঙ্গিক পার্থক্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমরা মূল প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, স্ত্রী-ডিম্ব গঠন-ক্রিয়ার ফল; সুতরাং পুষ্ট, অথচ স্থিতিশীল এবং অলস। পুংকীট ধ্বংস-ক্রিয়ার ফল; সুতরাং অপুষ্ট, অথচ চঞ্চল এবং কর্ম্মঠ। এ প্রভেদ মৌলিক। এক্ষণে স্ত্রী জাতি ও পুরুষ জাতির আনুষঙ্গিক পার্থক্য বিবেচনা করিতে হইলে এই মূল কথা মনে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় সকল পার্থক্যই সহজে বোধগম্য হইবে। এ প্রবন্ধে প্রধানতঃ মানব জাতির কথাই হইতেছে।

দেহ। প্রথমতঃ উভয়ের দেহ বিবেচনা করা যাউক। মোটামুটি বলিতে গেলে অনুন্নত জীবগণের মধ্যে পুরুষের দেহ ক্ষুদ্র, স্ত্রীজাতির বৃহৎ। কিন্তু উন্নত জীবগণের মধ্যে শ্রমাধিক্য ও অন্যান্য কারণ বশতঃ পুরুষের দেহ বৃহৎ; স্ত্রীগণের দেহ ক্ষুদ্র। ইহাদিগের মধ্যে পুরুষের হস্তপদ বড়, স্ত্রীগণের উদর ও কটি বড়। তাহার কারণ স্ত্রীগণের গর্ভধারণ। কিন্তু বাল্যকালে স্ত্রী দেহ পুরুষের দেহ অপেক্ষা অধিক বর্দ্ধনশীল। এই অধিকতর বৃদ্ধি স্ত্রী-লক্ষণ প্রকাশের ও গর্ভ ধারণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকে; পরে হ্রাস হয়। তখন হইতে তুলনায় পুংদেহই অধিক বর্দ্ধনশীল। মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ পুরুষেরই বড়; কিন্তু সম্মুখের ভাগ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম থাকা দেখা যায় না। কেশ, মস্তকে স্ত্রীজাতির বড়; মুখে বুকে এবং অন্যত্র পুরুষেরই অধিক। বর্ণ পুরুষেরই উজ্জ্বল। স্ত্রীগণের তদ্রূপ নহে। শ্রী স্ত্রীগণের অপেক্ষা পুরুষেরই অধিক।

চলন। স্ত্রীজাতির চলন মন্থর। তাহারা জোরে অথবা শীঘ্র হাঁটিতে পারে না। পদও ছোট। পুরুষের গতি দ্রুত ও সবল। কিন্তু স্ত্রীজাতির দেহ চতুষ্পদের ন্যায় সম্মুখ দিকে ঈষৎ হেলা; এই জন্য তাহাদের গতি ও অংশতঃ চতুষ্পদের ন্যায় ঈষৎ নত এবং অধোমুখ। * পুরুষের দেহ পিছের দিকে হেলা; সেইজন্য তাহার গতি উড়িবার মত উর্দ্ধমুখ।

ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া ভালরূপ বুঝা যায় নাই। তথাপি মোটামুটি ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীগণের ত্বক্ ইন্দ্রিয় পুরুষের অপেক্ষা প্রবল। সুতরাং তাহাদিগের স্পর্শ-অনুভূতি অধিক। চক্ষু ও নাসিকা সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। তবে আমি বোধ করি, চক্ষু স্ত্রী-জাতিরই অধিক দৃষ্টি-শক্তি সম্পন্ন। কর্ণের ক্রিয়া স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরই ভাল। রসনায় স্বাদ গ্রহণ বোধ হয় স্ত্রীজাতিই ভাল করিতে পারে।

কর্ম্মক্ষমতা। স্ত্রীগণের স্নায়ু প্রবল,

---

* If woman's body seems to be somewhat more reminiscent of the quadrupedal posture than man's, she has excellent reasons for it.

Ellis, man and woman P. 70.

পুরুষের পেশি অধিক সবল। সুতরাং স্ত্রীগণ অপেক্ষা পুরুষ কর্ম্মঠ এবং পুরুষের কর্ম্মক্ষমতা অধিক কাল স্থায়ী। স্ত্রীগণ শীঘ্র-কর্ম্মা, কিন্তু কর্ম্মক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী। স্ত্রীগণের দৈহিক ক্রিয়া সাধারণতঃ মৃদু; পুরুষের চঞ্চল।

পীড়া। স্ত্রীগণ কিছু দীর্ঘজীবী। পীড়া অনেক কম। কিন্তু হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি পীড়া স্ত্রীগণেরই অধিক। জড়-বুদ্ধিতা (idiocy) উন্মাদ, ইত্যাদি রোগ স্ত্রীগণের অধিক। পুরুষগণ অধিক বিকলাঙ্গ হয়; স্ত্রীগণ তাদৃশ হয় না। বিষ সেবনে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রায় সমভাবেই পীড়া উৎপাদন করে; তবে অহিফেন স্ত্রীগণকেই অধিক আক্রমণ করে, এবং বোধ হয় সুরা পুরুষগণের অধিক অনিষ্ট করে। স্ত্রীগণের রোগ-সহিষ্ণুতা অধিক।

নিদ্রা। স্ত্রীগণ অধিক নিদ্রালু; তথাপি তাঁহারা স্বপ্ন দেখেন, পুরুষ অপেক্ষা অধিক। তাঁহাদিগের স্বপ্নও পুরুষ অপেক্ষা অধিক সত্য হয়। স্ত্রীগণের সত্য-স্বপ্ন দেখা এত অধিকতর হইবার কারণ বোধ হয় তাঁহাদের অধিকতর চিত্তশুদ্ধি।

বুদ্ধি। স্ত্রীগণের অপেক্ষা পুরুষজাতি অধিক বুদ্ধিমান। কিন্তু কোন বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে স্ত্রীগণ যত শীঘ্র করিতে পারেন, পুরুষগণ তাহা পারেন না। স্ত্রীগণের বুদ্ধি যুগপৎ নানা বিষয়ে পুরুষের ন্যায় ব্যাপৃত হইতে পারে না।

ভাব। স্ত্রীগণ পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর ভাব-প্রবণ। প্রেম, স্নেহ, দয়া, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তি সকল স্ত্রীগণের অধিক প্রবল, এবং অধিক স্থায়ী। পুরুষের এ সকল বৃত্তি যেমন স্ত্রীগণের ন্যায় সহজে উৎপন্ন হয় না, তেমনি অধিক কাল স্থায়ীও হয় না। স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্য ভাব বিশেষ পরিপুষ্ট; তাঁহারা চিত্রাদি কলা বিদ্যার বিশেষ অধিকারী। স্ত্রীগণ সঙ্গীতে অধিক মত্ত হইতে পারেন। স্ত্রীগণের স্নায়ু যেমন অধিকতর উত্তেজিত হয়, তমনি শীঘ্রই অবসন্নও হয়। একারণ তাহাদিগকে যত সহজে অজ্ঞান করা যায়, পুরুষদিগকে তাহা পারা যায় না। মেস্‌মেরাইজ্‌,হিপ্‌নটাইজ্‌ করা(mesmerise) hypnotise) অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহাদিগকে যত বেশি "ভূতে ধরে," পুরুষকে তত নহে। প্রেত-লোক হইতে ইহ-লোকে আত্মা (spirit) আনিতে হইলে স্ত্রীগণকেই মধ্যবর্ত্তী (medium) করিতে হয়। ঐ আত্মা স্ত্রীদেহে সহজে আবির্ভূত হন।

ধর্ম্মভাব। স্ত্রীগণের ধর্ম্মভাব পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশি। তাঁহাদিগের বিশ্বাস অনেক দৃঢ়। তাঁহারা অধিকতর ভাবপ্রবণ, সুতরাং ধর্ম্মভাব অধিক হওয়া সহজেই বোধগম্য হয়। পাপী সংখ্যা মধ্যে, স্ত্রীগণ অপেক্ষা পুরুষের গণনাই অধিক। স্ত্রীগণের মধ্যে যে সকল দুষ্কর্ম্ম লক্ষিত হয়, তাহাও অনেক স্থলে তাঁহাদের ভাবপ্রবণতা হইতে উদ্ভূত। সেই জন্যই তাহার ভীষণতা পুরুষকৃত পাপ অপেক্ষা অনেক অধিক হয়।

স্ত্রী ও পুরুষের দেহ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইল, তাহার অধিকাংশই এক্ষণে বংশপরম্পরাগত হইয়াছে। মৌলিক প্রভেদ, পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে দীর্ঘকাল ক্রিয়া উৎপন্ন করায়, ফলও অনেক পরিমাণে বংশগত হইয়াছে। কিন্তু পুরুষের ব্যবহার এখনও পরিবর্ত্তিত হইলে, স্ত্রীগণের প্রকৃতি অন্যরূপ হইতে পারে। পুরুষ স্ত্রীদিগকে দীর্ঘকাল দাসীর ন্যায় রাখিয়াছে; এজন্য তাঁহাদিগের প্রকৃতিও স্ফূর্ত্তি

প্রাপ্ত এবং উন্নত হইতে পারে নাই। সভ্যাবস্থার অপেক্ষা অসভ্যাবস্থায় স্ত্রী পুরুষ অধিকতর সমধর্ম্মী, এবং সমভাবাপন্ন। উভয়ের প্রভেদ সভ্যাবস্থাতেই অধিক হইয়াছে। যদিও উভয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ বশতঃ কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য চিরদিনই থাকিয়া যাইবে, তথাপি আমার বিবেচনা হয় যে, স্ত্রীগণকে বল পূর্ব্বক কিম্বা কৃত্রিম স্নেহ বশতঃ অথবা সামাজিক অন্য কারণে পদদলিত করিয়া না রাখিলে, তাঁহাদিগের প্রকৃতিকে স্ফূর্ত্তি পাইবার অবসর দিলে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য অনেক বিদূরিত হইতে পারে। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা"; মনু বলিয়াছেন, নারীর পূজা করিলে দেবগণ তুষ্ট হন। এ অনুষ্ঠান এ পর্য্যন্ত মানব-সমাজে সম্যক রূপে কোন কালেই অনুষ্ঠিত হইল না। হইলে উভয়ের প্রভেদ অনেক হ্রাস হইত, সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

# কবিবর ৺ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। *

পদ্মিনী উপাখ্যান ও কর্ম্ম দেবী প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া রঙ্গলাল দেশ-বিখ্যাত হইয়া অমর হইয়াছেন। রঙ্গলাল দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা কাব্যের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছিল, কোন কোন কবি কাব্যের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাদের সরস কবিত্ব-শক্তি ও সুললিত রচনা-শক্তি অপথে চালনা করিয়া, কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল কাব্যের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীর অধঃপতনের পথ প্রসার করিয়া দিতেছেন। এরূপ কাব্য পাঠে সহৃদয় সাধু ব্যক্তির ঘৃণার ও লজ্জার উদ্রেক হয়। উদ্ধত-ইন্দ্রিয় নব্য যুবক ক্রমে অধঃপতিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মারা কাব্যের এই অসৎগতি ফিরাইয়া দিয়া বাঙ্গালা কাব্যকে পুনর্ব্বার সাধু-পথে আনিয়াছেন। পরবর্ত্তী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশধর রায় প্রভৃতি মহাত্মারা রঙ্গলালের প্রদর্শিত বর্ত্মের অনুসরণে কাব্য রচনা করিয়া ভাষার ও জাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। রঙ্গলালের পরবর্ত্তী বাঙ্গালা কাব্য সকল প্রায়ই সুরুচি-সম্পন্ন ও শিক্ষা-প্রদ হইয়াছে।

এই সাধু রুচির প্রবর্ত্তক রঙ্গলালের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। কৃতজ্ঞতা মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উপকারীর উপকার স্বীকার পূর্ব্বক তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হইলে সমাজে যে রূপ নিন্দিত হয়, জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা। কারণ ব্যক্তিসমষ্টির নামই জাতি।

প্রাচীন আর্য্য জাতি, ধর্ম্মে ও সুনীতিতে, চরিত্রবলে কোন জাতি হইতে ন্যূন ছিলেন না। তাঁহাদের সভ্যতা ও উন্নত ভাব এখনও মানব সমাজের আদর্শ স্থানে অবস্থিত আছে। আর্য্যদের পুরাণ শাস্ত্র ও তৎপরবর্ত্তী কাব্য,

* রাজসাহী সাহিত্য সভায় পঠিত।

নাটক, অলঙ্কার ও দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি সকলই ইহার প্রদীপ্ত প্রমাণ। আর্য্য কাব্য, আর্য্য দর্শন শাস্ত্র এখনও পাশ্চাত্য প্রভৃতি সভ্য দেশের শিক্ষা প্রদানে সমর্থ। সংস্কৃত কবিরা কাব্যের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। কাব্যের পাঠকগণ যাহাতে সাধু-চরিত্র হন, কাব্যে কোন রূপ অসদুপদেশ না থাকে, এবিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা ছিল। যাহাতে কাব্যের নায়ক নায়িকার চরিত্র লোকের অনুকরণীয় হয়, তাঁহারা সে বিষয়ে, যথোচিত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সমাজে আদর্শ স্ত্রী পুরুষ না পাইলে, তাঁহারা কল্পনা দ্বারা আদর্শ স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করিয়া কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে স্বামীর নিন্দাতে সতীর প্রাণত্যাগ ও সতীর মৃত দেহ গলায় লইয়া শিবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কেমন পবিত্র প্রণয়-জ্ঞাপক ও কেমন ধর্ম্মোপদেশ-প্রদ। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী চরিত কেমন পবিত্র ও আদর্শ; শিব, রাম, সত্যবান ও নল রাজার চরিত্র কেমন সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সকল নায়ক নায়িকার চরিত্র নিরন্তর সমালোচনা দ্বারা পাঠক পাঠিকার চরিত্র অবশ্যই বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইবার সম্ভাবনা। আলঙ্কারিকেরাও মহা কাব্য লক্ষণে নায়ক নায়িকার চরিত্র বিশুদ্ধ ভাবে লিখিতে হইবে, এইরূপ উপদেশে দিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণকার মহাকাব্য লক্ষণে বলেন ;—

সর্গবন্ধ মহাকাব্য তত্রৈক নায়ক সুরঃ।
সদ্বংশ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্ত গুণান্বিতঃ
ইত্যাদি।

যখন আমরা কাব্যে কি অপর গ্রন্থে কোন লোকের চরিত্র পাঠ করি, তখন তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাঁহার কার্য্য কলাপ না দেখিলেও কবি বা গ্রন্থকারের অনুগ্রহে তাঁহার কার্য্য সকল প্রত্যক্ষবৎ মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, পাঠকালে যেন ঐ সকল লোকের সহিত একত্র বাস করিতেছি, মনে এরূপ অনুভূতি হয়। সদ্ভাব পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ ও সৎসংসর্গে বাস একই কথা। তাহাতে চরিত্র বিশুদ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

"সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি"

বাস্তবিক সাধু-চরিত্র নিমিত্ত কাব্যের উপদেশ বিশেষ ক্ষমতাশালী। সৎকাব্য পাঠে পাঠক সচ্চরিত্র হয়, তাহাতে সামাজিক কু-রীতি দূর হইয়া সমাজ উন্নত হয়। এবং লোকের মনে ধর্ম্মভাবসঞ্চার হইয়া থাকে। কাব্যে অতি সুমিষ্ট কথায় অতি মহান দার্শনিক উপদেশ থাকে। এ নিমিত্ত কাব্য-প্রকাশ-কার বলিয়াছেন।

কাব্যং যশসেঽর্থ ব্যবহারবিদে কৃতে শিবেতর ক্ষতয়ে
সদ্যোপর নিবৃত্তয়ে কান্তা সম্মিতয়ে উপদেশ যুজে।

সাহিত্য-দর্পণকার বলেন—

ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং বৈচক্ষণ্যং কলাসুচ
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধু-কাব্য নিষেবনং।

সচরাচর কবিগণ সামাজিক অবস্থা দেখিয়া কাব্য লিখিয়া থাকেন। সমাজে যেরূপ রুচি, যে ভাবের প্রবলতা আছে, কাব্যেও প্রধানতঃ সেই সকল ভাবেরই অবতারণা থাকে। বাস্তবিক কাব্য সমাজের ইতিহাস বিশেষ। কাব্য পাঠে সমাজের অবস্থা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। বাঙ্গালীর সাহস বীর্য্য, স্বদেশ-প্রীতির ভাব যখন ছিল না, তখনকার কাব্যেও এ সকল বিষয়ের বর্ণনা নাই। যখন বাঙ্গালী আদি, হাস্য, করুণ, শান্তি, বৈরাগ্য, ভক্তি-রস ভালবাসিতেন, তৎকালের কাব্যও ঐ সকল রস অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। রাম-প্রসাদ সেন, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, কমলা-

কান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির গীতি কাব্য, ভারত চন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল প্রভৃতি শান্তি, করুণ, বৈরাগ্য ভক্তি-রস প্রধান কাব্যই ইহার উদাহরণ। এই সকল কাব্যে কুৎসিত আদি-রসের রচনা থাকিতে পারে না ও নাই।

যখন পুরাণ পাঠ ও পুরাণ শ্রবণের প্রথা প্রবল ছিল, তখনই কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম দাস, সাধারণের শিক্ষার্থ সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় পদ্য রামায়ণ ও মহাভারত প্রচার করিয়াছেন। ঘনরাম ত পৌরাণিক উপদেশ দিবার নিমিত্ত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ও মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ চণ্ডী লিখিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থ সদ্ভাবপূর্ণ। এই সকল দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উপ-কার হইয়াছে।

অন্নদামঙ্গল সাধু কাব্য হইলেও অন্নদা মঙ্গল রচনার অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালাতে কুৎসিত আদিরস-পূর্ণ কু-রুচি-জ্ঞাপক কাব্যের প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। এ সকল কাব্য অসৎ কাব্য। আলঙ্কারিকগণ উহা পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তি-বাস প্রভৃতির রামায়ণ মহাভারত প্রভৃ-তিতে আদিরস থাকিলেও তাহা পবিত্র ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক সমাজের অবস্থা অনুসারে কাব্যের অবস্থা হয়। যখন কু-রুচি-পূর্ণ অশ্লীলকাব্য গুলি প্রচার হয়, তখন বাঙ্গালীও হীন অবস্থা-পন্ন ছিল। তখন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোকে লিখা পড়া শিক্ষা করিতেন। এক শ্রেণীর লোকে টোলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষাতে কথা বর্ত্তা বলিতেন, বাঙ্গালা সংগীত শ্রবণ করিতেন। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা পুস্ত-কের সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপর শ্রেণীর লোকেরা বিষয় কার্য্য করিতেন, ইঁহারা পারসী অধ্যয়ন করিতেন ও বিষয় কার্য্যে অর্থাৎ আদালতে জমিদারী মহাজনী কার্য্যে, চিঠি পত্র, দলীল-দস্তাবেজ লিখিতে যে পরিমাণ বাঙ্গালা জানা আবশ্যক, ইঁহারা সেই পরিমাণেই বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেন। ইঁহাদের গণিত-শিক্ষা শুভঙ্করী অঙ্কেই শেষ হইত। তখন পূর্ব্বোক্ত কাব্য ব্যতীত বাঙ্গালায় পদ্য কাব্য বা কোন রূপ জ্ঞান-গর্ভ গদ্য গ্রন্থ ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা বর্ণমালা ও শুভঙ্করীর গণিতই বাঙ্গালা শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। ইঁহারা পারসীতে গণিত দর্শন প্রভৃতি প্রকৃত জ্ঞানকরী বিদ্যা-শিক্ষা করিতেন না। বাস্তবিক গণিত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা হয় না। প্রকৃত শিক্ষা না হইলে শিক্ষা দ্বারা চরিত্রবান্ হওয়া যায় না ও কোন সুখের প্রত্যাশা নাই। অবশ্য কাব্য-পাঠ বা শ্রবণ সময়ে অশিক্ষিতও সুখী হয়, কিন্তু তাহা সামান্য। উন্নত কাব্যের উন্নত ভাব গ্রহণ করিতে অশিক্ষিতের অধিকার নাই। প্রকৃত জ্ঞানই সুখের মূল। দার্শনিক দর্শনের, জ্যোতির্বিদ জ্যোতিষের, গণিতবিদ্ গণিতের সমালোচনেও কাব্য-পাঠের ন্যায় সুখী হন। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ীরা বিশুদ্ধ আমোদের পথ না পাইয়াই অনন্যোপায় হইয়া তাস, পাশা, দাবা খেলিয়া, দলাদলীর ঘোট করিয়া নানা রূপ অলীক কার্য্যে অবকাশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। কবির লড়াই, খেউড়, পাঁচালীর ছড়া প্রভৃতি শুনিয়া ও খেমটার নাচ দেখিয়া আমাদ ভোগ কারা হইত। বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা যে প্রচুর আনন্দ হয়, তৎকালের বিষয়ী-দের এরূপ জ্ঞান ছিল কিনা সন্দেহ। তাৎ-কালিক অধঃপতিত সমাজের রুচি অনুসারেই অশ্লীল, আদিরসাত্মক কু-রুচি-প্রদ কাব্য

হইয়াছে। অন্নদা-মঙ্গল রচিত হইবার পর হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ রুচি বিদ্যমান ছিল। এ কথা বলা অসঙ্গত নহে যে, ইংরেজের অনুগ্রহেই বাঙ্গলার প্রথমোন্নতি। মিসনরী সাহেবেরা খ্রীঃ ধর্ম্ম প্রচারার্থ বাঙ্গালায় বাইবেলের গদ্য অনুবাদ করেন; এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত ৺ রামমোহন রায় মহাশয় গদ্য গ্রন্থ প্রচার করেন। বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতাতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হয়। এই কলেজে অধ্যাপনা নিমিত্ত ৺ মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কৃত প্রবোধচন্দ্রিকা ও ৺ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত বেতাল-পঞ্চ-বিংশতি রচিত হয়। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মেরাও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ বহু গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এদিকে ইংরাজী বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হয়। তাহাতে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হওয়াতে, সংস্কৃত ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা হইতে অনুবাদিত নানা বাঙ্গালা গ্রন্থের রচনা হয়। এদিকে গবর্ণমেণ্টের যত্নে নানাস্থানে বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক হওয়াতে তাহার শিক্ষক নিমিত্ত প্রথমতঃ কলিকাতা, ঢাকা ও হুগলী নগরে তিনটী নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপিত হয়। এই সকল নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি নানা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের প্রচার হয়। ইহাতে বহুলোক শিক্ষিত হয় ও শিক্ষিত দলের রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়। তখন সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিতদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, পূর্ব্ববর্ণিত অন্নদামঙ্গল ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য গুলি ব্যতীত অন্নদামঙ্গলের পরবর্ত্তী কোন কাব্যেরই এরূপ ক্ষমতা ছিল না।

যখন কোন কু প্রথাতে সমাজ জ্বালাতন হয়, তখন সমাজে এরূপ কতকগুলি লোক পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ঐ প্রথার জ্বালায় অস্থির হইয়া, যাহাতে উহা না থাকে, সর্ব্বদাই তাহার কামনা করেন। বাঙ্গালা কাব্যের কুরুচি দূর হওয়া তৎকালীন অনেক শিক্ষিতের আন্তরিক ইচ্ছা হওয়াতে, তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রথমত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও পরে রঙ্গলাল উপস্থিত হন। কিরূপ প্রণালীতে কাব্য রচনা হওয়া উচিত, রঙ্গলাল পদ্মিনী উপাখ্যান রচনা করিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা কাব্য হইতে কুৎসিত কুরুচি-স্রোত উঠাইয়া দিয়া তাহাতে পবিত্র গঙ্গা-স্রোতের ন্যায় সুরুচিপূর্ণ স্রোত সংস্থাপন করিয়াছেন। রঙ্গলালের পরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান কবিগণ কাব্য রচনা করিয়া রঙ্গলালের সুরুচি-স্রোত আরও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। অতএব রঙ্গলালকে বর্ত্তমান কাব্যযুগের সুরুচির সৃষ্টিকর্ত্তা বলা অত্যুক্তি নহে। তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালী জীবনের আশা, উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সকলের প্রকৃত প্রবর্ত্তক।

কি নিমিত্ত পদ্মিনী উপাখ্যান রচিত হয়, গ্রন্থের ভূমিকাতে রঙ্গলাল তাহা কিয়ৎ পরিমাণ লিখিয়াছেন। 'যাহাতে সুরুচি পূর্ণ কবিতা রচিত হয়, কুৎসিত ঘৃণাকর কাব্য আর না হয়, এই নিমিত্তই পদ্মিনী উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। রঙ্গলাল শিষ্টাচারের অনুরোধে ইহার বেশী কিছু লিখেন নাই। পদ্মিনী উপাখ্যান পাঠে দেখা যায়, যাহাতে দেশে সৎকার্য্য বিস্তার হয়, যাহাতে দেশীয় লোক শিক্ষিত হয়, তাস পাশা প্রভৃতি খেলা ও কবির লড়াই প্রভৃতি শ্রবণ ও খেমটা নাচের আমোদ ভোগ

না করিয়া লোক পবিত্র পথে আমোদ ভোগ করে, যাহাতে দেশের লোক সুরুচি-সম্পন্ন হয়, তাহারা বল-বীর্য্য সম্পন্ন হইয়া সাহসী হয়, স্বাবলম্বী হইয়া দলাদলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে এক-প্রাণ হয়, তাহাদের আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ হয়, ক্ষুদ্র ঘৃণিত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জাতিগত স্বার্থের নিমিত্ত আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা করে, এ সকল বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পদ্মিনী উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। আর ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে বলিবে, এই গ্রন্থের রচনা সম্পূর্ণ গ্রন্থের নায়ক, নায়িকার পবিত্র চরিত্র সার্থক হইয়াছে। রাজপুত জাতির সাহস বীর্য্য প্রভৃতি গুণ বর্ণনা করিয়া, এবং কি হেতু তাহারা আলা উদ্দীনের নিকট পরাজিত হয়, কেন ভারত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া পরাধীন হয়, রঙ্গলাল পদ্মিনী উপাখ্যানে তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বল বল বল ধরাতলে, লোক-বল মাত্র ফলে,
সেই বলে যেই বলি, বলবান্ তারে বলি,
যদি বল প্রকাশে কৌশলে।
একতায় হিন্দুরাজগণ, সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ'
সেভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত। ইত্যাদি।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে ধরিবে পায় হে
কে ধরিবে পায়॥
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়॥
* * * *
অই শুন ঐ শুন ভেরীর আওয়াজ হে
ভেরীর আওয়াজ॥
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে
সাজ সাজ সাজ॥
চল চল চল সবে সমর সমাজ হে
সমর সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ হে
ক্ষত্রিয়ের কাজ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে
রাজপুতনার।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে
রুধিরের ধার॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহু বল তার।
আত্ম নাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার॥
কৃতান্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান হে
আমাদের স্থান।
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে
হইব শয়ান॥
কেবলে সমন সভা ভয়ের নিধান হে
ভয়ের বিধান।
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি সম বেদের বিধান হে
বেদের বিধান॥
পরহিতে দেশহিতে ত্যজিল জীবন হে
ত্যজিল জীবন॥
স্মরহ তাদের সব কীর্ত্তি বিবরণ হে
কীর্ত্তি বিবরণ?
বীরত্বে বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে
ক্ষত্রিয় নন্দন।
অতএব রণ-ভূমে চল ত্বরা যাই হে
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই॥

তিনি গ্রন্থ-সূচনাতে লিখিয়াছেন—

সকল নিরখিয়ে পথিকের চিত্ত।

মলিনতা মেঘ জালে হইল জড়িত ॥
মনে সে করেন চিন্তা কোথায় সে দিন।
যে দিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন ॥
অসংখ্য বীরের যিনি জন্মপ্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ-বিধি-বিধায়িনী ॥
এখন দুর্ভাগ্যে পর-ভোগ্যা পরাধিনী।
যাতনায় দীন যায় হয়ে অনাথিনী ॥

তিনি চিতোর নগর পতনের পর লিখিয়াছেন—

নিহত নিকুর শূর, পড়িল চিতোরপুর
হিন্দু সূর্য্য অস্ত-গিরি-গত।
দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ, রাজস্থানে সমাবেশ
তাপ তমস্বিনী পরিণত ॥
হিন্দুর প্রতাপ শেষ, যাহা কিছু অবশেষ
ছিল মাত্র চিতোর নগরে।
যথা ঘোর অমানিশা, তমঃ পূর্ণ দশ দিশা
আকাশে জলদ আড়ম্বর।
মেঘহীন এক দেশে, বিমল উজ্জ্বল বেশে
দীপ্তি দেয় তারকা সুন্দর ॥
অথবা তরঙ্গ রঙ্গ, জলধির অঙ্গ সঙ্গ
স্রোতে হয় তৃণ তিন খান।
তমোময় সমুদয় কিছু নাহি দৃষ্টি হয়
পরিক্লান্ত পোত-পতি-প্রাণ ॥
বিপদ বারণ হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু
প্রদীপ্ত আলোক শোভা পায়।
সেরূপ ভারত দেশে, স্বাধীনতা সুখ শেষে
ছিল মাত্র রাজপুতনায় ॥
কি হইল হায় হায়, সে নক্ষত্র লুপ্ত কায়
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল।

এ সকল রচনা কেমন সুন্দর ও অলৌকিক কবিত্ব শক্তি পূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য। ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার নিমিত্ত দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন ভীমসিংহের রাজধানী চিতোর নগর আক্রমণ করেন। ভীমসিংহ সংগ্রামে পরাজিত হন। চিতোর মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। পদ্মিনী, যবন হস্তে সতীত্ব বিসর্জ্জন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করিয়া, অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। পদ্মিনী উপাখ্যান এই প্রস্তাব অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ করুণ রস প্রধান, আনুষঙ্গিক বীর, বীভৎস, রৌদ্র প্রভৃতি অন্যান্য রসেরও বর্ণনা আছে।

এই কাব্যের নায়ক ভীম সিংহ, নায়িকা পদ্মিনী। রঙ্গলাল নায়ক নায়িকার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্নদামঙ্গলের পরবর্ত্তী ও রঙ্গলালের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের যে সকল বাঙ্গালা কাব্য আছে, কোন কাব্যেই নায়ক নায়িকার চরিত্র এরূপ বিশুদ্ধ ও পবিত্র দেখা যায় না। বাঙ্গালাতে রঙ্গলালই এই বিশুদ্ধ পথ দেখাইয়া দিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই কাব্যের রচনা সরল, মধুর ও প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট এবং স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। উপমা, উৎ-প্রেক্ষা, অর্থান্তর ন্যাস প্রভৃতি বহু প্রকার অলঙ্কার ইহাতে সুন্দররূপে সন্নিবিষ্ট আছে। এই গ্রন্থ সূচনাতে পথিকের চিতোর দর্শন, পুষ্করিণীর ঘাটে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন, পরে পদ্মিনীর বর্ণন, তাহার পরে চিতোর আক্রমণ প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা বিষয় লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগেই রঙ্গলাল অসাধারণ কবিত্ব ও অলৌকিক রচনা শক্তি দেখাইয়াছেন। ইহাতে বাহ্য ও অন্তর্জগতের বর্ণনা অতি সুন্দর আছে।

বাহ্য ও অন্তর্জগতই কবিদিগের বর্ণনীয় বিষয়। আত্মা, পরমাত্মা ও মানসিক বৃত্তি সমূহ ও আনুষঙ্গিক জড়-বিজ্ঞানই দর্শন শাস্ত্রের বিষয়। দর্শন শাস্ত্রের মীমাংসিত

বিষয় সমালোচনায় কাব্যও নির্লিপ্ত নহে। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, সূর্য্য, চন্দ্র, জীবদেহ প্রভৃতি বাহ্য জগত বর্ণনা যেমন কাব্যের বিষয়; শোক, মোহ, হর্ষ, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি অন্তর্জগতের বর্ণনাও কাব্যের একটী প্রধান বিষয়। মানসিক জগতের বর্ণনাই দার্শনিক ভাব। আলঙ্কারিকেরা আদি হাস্য প্রভৃতি রসের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক রসই দার্শনিক তত্ত্ব। যে কাব্যে দার্শনিক ভাব যত অধিক আছে, তাহা তত মনোহর। এইরূপ জড় জগৎ ও দার্শনিক ভাবের সহিত অসাধারণ কল্পনার প্রসার থাকিলে কাব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হয়। অর্থালঙ্কারে এই কল্পনার প্রসার অতি সুন্দর ভাবে আছে। অনেক স্থলে কল্পনাই অর্থালঙ্কার, যথা—

অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়।
বসুধা-বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়॥
জয়সিংহ-পুরী জয়পুর দেশ।
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ॥
কোন স্থলে মৃদু স্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর॥
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘু-পতি হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানুকরে করে অনিবার॥

রূপ বর্ণনাতে রঙ্গলালের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি যে ভাবে পদ্মিনীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নূতন ধরণের বলিতে হইবে। এইরূপ বর্ণনায় পদ্মিনী অসামান্য রূপবতী ও অতি সুশীলা ছিলেন, ইহা দেখাইয়াছেন। তিনি মুখ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও হস্ত পদাদি প্রত্যেক অঙ্গের পৃথকরূপে বর্ণনা করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনাতে পদ্মিনীর প্রত্যেক অঙ্গ সুন্দর, পদ্মিনী অসাধারণ রূপবতী, সুশীলা ও পরম পবিত্রস্বভাবা, প্রতীয়মান হইতেছে। যথা—

পতিরতা পতিরতা,　　অবিরত সুশীলতা
　　আবির্ভূতা হৃদ্-পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা,　　লতালজ্জাবতী যথা
　　মৃতপ্রায় পর পরশনে॥
থাকুক সে পরশন,　　পরমুখ দরশন
　　সহনীয় না হয় সতীর।
দৃষ্টি মাত্র সেইক্ষণে,　　সরমের হুতাশনে
　　দগ্ধ হয় কোমল শরীর॥
পদ্মিনীর পদ্মনেত্র　　বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র
　　ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতিপলে　　বঙ্কিম কটাক্ষ ছলে
　　চারিদিকে অমৃত সঞ্চারে॥
অতুলনা রাজকন্যা,　　ভুবনে ভাবিনী ধন্যা
　　অগ্রগণ্যা রূপসী সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ,　　কি বর্ণিব অপরূপ
　　বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে॥
কোন মূঢ় চিত্রকরে,　　পদ্মদেহ চিত্র করে
　　করিলে কি বাড়ে তার শোভা।
কিম্বা সেই কোকনদে,　　মাখাইলে মৃগ মদে
　　অতি সুখ লভে মধুলোভা॥
কষিত কাঞ্চন কায়,　　কিবা কার্য্য সোহাগায়,
　　কিবা কার্য্য রসানের ছটা।
হেন মূর্খ আছে কেহে,　　দিবে ইন্দ্রধনু দেহে
　　অভিনব রূপ রঙ্গ ঘটা॥ ইত্যাদি।

রঙ্গলাল দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে ও দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে, আমরা বর্ত্তমান রাজা ইংরেজ রাজের নিকটে কতদূর ঋণী আছি, যথা—

ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
　　ঘুমঘোর থাকিবে কি আর?

ইংরেজের কৃপা বলে, মানস উদয়াচলে;
জ্ঞান-ভানু প্রভার প্রচার॥

বাস্তবিকও জ্ঞান-ভানু অত্যল্প পরিমাণ আলো দিতেছে। রঙ্গলালের উপদেশ মতে কার্য্য হইলে জাতিগত দুর্দ্দশা অনেক লাঘব হয়। এখন যে স্বদেশীয় শিল্প দ্রব্যের ব্যবহার ও স্বদেশীয় বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, রঙ্গলালের উপদেশ ইহার অন্যতর কারণ। ঘুমঘোর একটু একটু কমিতেছে, লোকের চেতনা অনতিপরিস্ফুটরূপে দেখা যাইতেছে।

রঙ্গলাল ইংরেজী কাব্যের আদর্শে এই কাব্য লিখিয়াছেন, ভূমিকাতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ পাঠে দেখা যায়, তিনি সংস্কৃত জানিতেন, সংস্কৃত কাব্যের আদর্শেও তাঁহার গ্রন্থের অনেক কবিতা হইয়াছে, তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের উপদেশ মান্য করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এবং সংস্কৃত কবিরা তাঁহার নিকট বিশেষ আদৃত ছিলেন। তিনি গ্রন্থ সূচনায় লিখিয়াছেন—

দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস।
কাব্যে সেই রস কিবা করিল প্রকাশ॥
ইত্যাদি।

তিনি গ্রন্থের ভূমিকাতে সাহিত্য-দর্পণ হইতে কাব্যের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার কাব্যের নায়ক নায়িকার নির্ব্বাচন সাহিত্য-দর্পণের অনুমোদিত। কাব্যে যে সকল অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও সাহিত্য-দর্পণ-সম্মত।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে, আলঙ্কারিকের চক্ষে পদ্মিনী উপাখ্যান পাঠ করিলে ২।১ স্থলে দোষ দেখা যায়; কিন্তু সে দোষ অতি সামান্য। প্রায় সমস্ত গ্রন্থ গুণ-রাশি পূর্ণ, এই গ্রন্থ দ্বারা সমাজ কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে এ দোষ উল্লেখ করাই কর্ত্তব্য নহে। সমুদ্র পরিমাণ গুণ-রাশির নিকট অঙ্গুলিবদ্ধ ক্ষুদ্র বারি-বিন্দু-পরিমিত দোষ ধর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ এমন কাব্য নাই, যাহা একেবারে দোষ-পরিমুক্ত। সাহিত্য-দর্পণের দোষ-পরিচ্ছেদে কালিদাস প্রভৃতি মহা কবিগণের কবিতাও উঠিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, পদ্মিনী উপাখ্যান যেমন সাধু কাব্য, তেমন হিতোপদেশ, তেমন নীতি শাস্ত্র। উপরি উদ্ধৃত কবিতাগুলি বা পদ্মিনী উপাখ্যান আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন, রঙ্গলাল কিরূপ কবিত্ব শক্তি, রচনা শক্তি এবং দেশহিতৈষণা লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র মাহিন্তা।

---

# আছি সুখে।

(১)

বেড়েত আছি সুখে ঘরে ঢুকে
নেইক কিছু ভাব্‌না।
যেনরে চোরের গরু কাটছি সরু
গোয়াল ঘরেই জাব্‌না।

কি মজা! রাজার ধর্ম্মে ঝুঁকির কর্ম্মে
হইলে কেহ নিযুক্ত;
লভিতে উচ্চপায়া ওগো ভায়া,
চেঁচিয়ে মরা হুজুগ্‌ত।

নিয়ে কি ছুরি-ছোরা মর্ব্বি তোরা
কেটে গলা হস্ত বা ?
রাজারা তাইতে তেড়ে নিলেন্ কেড়ে
ছিল কিছু অস্ত্র যা।
কি জানি জাহাজ ডোবেই, সেইটি ভেবেই
কত্তে দেন্না বাণিজ্য ;
বাঁচাতে ধন-প্রাণ চেষ্টা পান্ ;
রাজার কি তা অনেয্য ?
নিয়েছে ক্ষেত্রি:রাজা শিরে বোঝা—
দেশ রক্ষার বিড়ম্বন ;
লইয়ে পুঁথি পাঁজি সুখে আছি
মোরা কজন্ বেরাহ্মণ্।
হাতেতে কাব্য-কলা লজিক্ খোলা,
কচ্চি স্বাধীন চিন্তা।
রয়েছি রাজার হালে ; রাজার তালে —
তাক্‌ধিনাধিন্ ধিন্‌তা।

তবে যে হাতে লক্‌ড়ি লাল পাগ্‌ড়ি
ধেয়ে আসে পশ্চাতে ?
করিয়ে নালিশ্ দায়ের কর্ব ফায়ের,
তখন:হবে পচ্‌তাতে।
যদিবা আইন ঘেঁটেও মেজিষ্ট্রেটেও
করে কোনো বজ্জাতি ?
করিব মোশন্ দাখিল্ কিম্বা আপীল ;
হারি জিতি লজ্জা:কি ?
যদিবা ঘুঁসি কিলে ফাটে পিলে ?
চালান্ হবে সর্‌কারি।
যদিবা ফেলে মেরে ? ভেড়ের ভেড়ে
খাবে জেলের তর্‌কারি।
মোরাত ছিনু খাসা ; খুঁচিয়ে বাসা
রাগিয়ে দেছে ভিমরুলে !
এবার ধুমছুটিয়ে হল্ ফুটিয়ে,
কোর্বো মজা হোম্‌রুলে !
যখনি মর্লে, মিণ্টো, পার্লেমেণ্টো,
হুকুম্ দেবেন্ চীৎকারে,
তখনি পুলীশ্ থানা— ফুলিশ থানা—
উড়িয়ে দেবো ফুৎকারে।
সকলে আইন মতে চেঁচিয়ে পথে
কাটিয়ে দেবো দিন্‌টা।
হবেনা কোনো সাজা ! বাজ্‌না বাজা—
তাক্‌ধিনাধিন্ ধিন্‌তা।

বল কি ? পাচ্চে হাসি ? বঙ্গবাসী
শুধুই করে বক্তৃতা ?
মোরা যে কত কার্য্য কচ্চি ধার্য্য,
দেখ্‌লি নে সে শক্তিটা ?
এবারে রাগের মাথায় কাজের কথায়
সপ্তকোটি ছুটেছি ;
সদলে মনের বলে দীর্ঘ হলে
ব্যগ্র ভাবে জুটেছি।
খুলিয়ে কাজের বাজার, একটি হাজার
প্রস্তাবনা রচেছি ;
প্রতিটি সমর্থনে ন দশ জনে
ভিজিয়ে কামিজ্ বকেছি।
মোরাত আর চাহিনে বাঁয় ডাহিনে,
চল্‌ছি রুখে সম্মুখে ;
এবারে চুক্‌ল লেঠা ; শত্রু বেটা
ঠাট্টা করে কোন্ মুখে ?
আর কে রাখ্‌বে চেপে ? চল্‌ছে ক্ষেপে
বঙ্গ-পুত্র-কন্যা রে !
এড়িয়ে হোঁচট্ খোঁচা ছুট্‌ব চোঁচা ;
দেশটা হবে হন্যারে !
সকলে কর্ম্ম-বীর তুল্‌ছে শির ;
ঘুচ্‌ল যত নিন্দা !
দেশটা হল তাজা ; বাজ্‌না বাজা—
তাক্‌ধিনাধিন্ ধিন্‌তা !

জেগেছে জাপান আদি বাদীর বাদী,
ভারত রবে ঘুমায়ে ?
সকলে কপাল ঠুকে শিঙ্গে ফুঁকে
জাগাও সুপ্ত ভূমি এ।

উচ্চরি' 'বন্দেমাতা' কাট্‌ব মাথা ;
কাজ কি গুলি-বন্দুকে ?
মোরা যে বীরের নাতি আর্য্যজাতি ;
চেনে নি কে হিন্দুকে ?
উহুহু ! মার্চ্চে বেদম্, ম্লেচ্ছ অধম,
হাতে নিয়ে কোঁৎকারে !
ওতে কি ধৈর্য্য টলে ? মন্ত্র বলে
ফেল্‌ব গিলে কোঁৎ করে !
ভরা সে ইলিশ্‌ মাছে গঙ্গা আছে,
হিম-গিরি উত্তরে,
দক্ষিণে ভারত সাগর ভারি ডাগর,
জানিস্‌ কিতা ধূর্ত্ত রে ?
কভু কি হেন দেশে ম্লেচ্ছ এসে
কত্তে পারে জাঁক্‌জারি ?
আরামে থাক শুয়ে পুণ্য ভুঁয়ে ;
যুঝে মরা ঝক্‌মারি।
বেটারা ছুটে ছুটে রক্ত উঠে
মর্‌বে ; যাবে চিন্তা।
আমরাই হব রাজা ! বাজ্‌না বাজা—
তাক্‌ধিনাধিন্‌ ধিন্‌তা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দির। (২)

তদনন্তর নারদ আদেশ করিলেন যে, এই মূর্ত্তিদিগের স্থাপনের জন্য প্রাসাদ আবশ্যক, সুতরাং বিশ্বকর্ম্মাকে শীঘ্র মন্দির নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হউক্‌। রাজা এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া মন্দির নির্ম্মাণের ভার দিলেন। বাহুবলার্জ্জিত অষ্টাদশ দ্বীপ হইতে পাথুরিয়া ( অর্থাৎ যাহারা প্রস্তর দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে উহাদিগকে ) আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোটী কোটী মুদ্রা বিশ্বকর্ম্মার নিকট সমর্পণ করিলেন, এবং মন্দিরের এক সহস্র হস্ত পরিমাণের উচ্চতা বিধান করিতে আদেশ দিলেন। ইহার তত্ত্বাবধানে স্বীয় তনয় ও মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিলেন। এই মন্দির সম্বন্ধে কাহারও কাহারও অনুমান এইরূপ যে, ইহা পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত হয় নাই ; কারণ অধুনা পর্ব্বতের কোন চিহ্ন এস্থলে দৃষ্টি হয় না। কিন্তু এই আপত্তি-সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, যেহেতু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে "নীলমাধবের পর এই স্থান বালুকা-রাশির দ্বারা প্রোথিত হইবে" ইহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; আর কালস্রোতে জলভাগ স্থলে ও স্থলভাগ জলে পরিণত হইতে পারে, ইহাও বিজ্ঞানানুমোদিত। বর্ত্তমান কালেও দেখা যায় যে, কূপখননকালে অতি গভীরবর্ত্তী নিম্ন প্রদেশেও সমাধি প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে। এ কারণ এই প্রাচীন কার্য্যের প্রারম্ভ কালে এই স্থান সমুদ্র-গর্ভে শৈলদ্বীপ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তদনন্তর এই স্থানটী যে "ত্রিকোণ দ্বীপ" (Delta) আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মন্দির শঙ্খনাভি দেশে সহস্র হস্ত পরিমাণে নির্ম্মিত ও নানাবিধ রত্নে মণ্ডিত হইল। মন্দিরের চতুষ্পার্শে বহুতর দেব দেবী মূর্ত্তি খোদিত ও মন্দিরাভ্যন্তরস্থ রত্ন-সিংহাসন নানা মণি মুক্তাদি দ্বারা খচিত।

এবং তৃতীয়াবর্ত্ত মধ্যস্থ আভ্যন্তর বেষ্টন ( ভিতরের বেড়া ) মধ্যে, শ্রীমন্দিরের অগ্নিকোণে কলুবট, তন্মূলে গণেশ ও মঙ্গলা দেবী, ইহাঁদের পশ্চিমে রোহিণী কুণ্ড, তৎপশ্চিমে

বিমলা দেবী, ইহাঁর উত্তরে সরস্বতী, তদুত্তর ভাগে লক্ষ্মী দেবীর মন্দির। শ্রীমন্দিরের ঈশান কোণে দ্বিতীয় বেষ্টন মধ্যে ঐ শান্যেশ্বর মহাদেব, স্নান মণ্ডপ, বৈকুণ্ঠ ও পাকশালা অবস্থিত। দ্বিতীয় বেষ্টন প্রাচীর এত উচ্চ যে, ইহা সাধারণ লোকের নিকট মেঘনাদ প্রাচীর বলিয়া অভিহিত। প্রত্যেক বেষ্টনের চতুর্দ্দিকে অত্যুন্নত দ্বার স্থাপিত। বেষ্টন মধ্যস্থ প্রত্যেক বিষয় এ প্রবন্ধে উল্লিখিত হয় নাই এবং যাহা লেখা হইয়াছে, তাহারও সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণও দেওয়া হয় নাই, কারণ এক এক পরিচয় এক একটী বৃহৎ আকারে পরিগণিত হইবে। অতএব আংশিক বিবরণ দিয়া সমগ্র বিস্তারিত বিবরণ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে দ্বিতীয়াবর্ত্তের বিষয় এস্থলে প্রদত্ত হইল।

এই আবর্ত্ত মধ্যে কপালমোচন, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়, অন্তর্বেদীর (অর্থাৎ শঙ্খাকৃতি ক্ষেত্র রূপ বেদীর) রক্ষার্থে অষ্টচণ্ডী, যথা—শঙ্খের পৃষ্ঠভাগে সর্ব্বমঙ্গলা (বটমঙ্গলা) বিমলা ইহাঁদের নাম তৃতীয়া বর্ত্তে দেওয়া হইয়াছে, অর্দ্ধাশনী, আলম্বা এই দেবীদ্বয় উত্তর দিকে অবস্থিতা। কালরাত্রি অর্থাৎ দক্ষিণ কালী, দক্ষিণ দিকের মরীচিকা এবং কালরাত্রীর পৃষ্ঠভাগে চণ্ডরূপা, শঙ্খের মূলে লোকনাথ, শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠ বিরাজমান। এই অষ্ট শক্তির এবং পঞ্চমহাদেবের বিবরণ বহু ঘটনা পূর্ণ। এই মন্দির ও প্রতিমাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নারদের সহিত স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দৌবারিক ব্রহ্মার নিকট যাইতে নিষেধ করায় রাজা দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইলেন এবং অনুমতি লইতে নারদ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সেই সময় ব্রহ্মার অবসর না থাকায় কিছুক্ষণ তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। পরে অবসর পাইয়া নারদ ব্রহ্মাকে প্রস্তাবিত বিষয় জানাইলে ব্রহ্মা রাজার প্রবেশার্থ আজ্ঞা দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ সভায় প্রবেশানন্তর ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক আসন গ্রহন করিলেন। সভাভঙ্গ পরে ব্রহ্মা রাজাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন "রাজন, তুমি বিষ্ণুভক্তাগ্রণী ও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, একারণ তুমি মনুষ্য দেহে এস্থানে আসিতে সক্ষম হইয়াছ। তুমি যে সময় টুকু অপেক্ষা করিলে, তার মধ্যে এক মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। তুমি যেহেতু এখানে আসিয়াছ, সে সকল এক্ষণে বিনষ্ট। ভূলোকে অনেকানেক রাজা হইয়া গিয়াছেন, তোমার নির্ম্মিত প্রাসাদ ও প্রতিমা সকল বিদ্যাপতি বংশীয় ও বিশ্বাবসু বংশীয়দিগের দ্বারা অধিকৃত। তুমি পদ্মনিধি, শঙ্খনিধি এবং নারদের সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠা সম্ভার আয়োজন কর। আমি দেবগণ, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত (প্রতিষ্ঠাস্থানে) শীঘ্রই উপস্থিত হইব। রাজা ব্রহ্মার এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাচিত তিনজনের সহিত মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, স্বকৃত মন্দিরে মাধব মূর্ত্তি বিরাজমান। তথাপি তিনি যজ্ঞ সম্ভার আয়োজন করিলেন। ইত্যবসরে দেবতাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে রাজা (ইন্দ্রদ্যুম্ন) মন্দিরের পশ্চিম ভাগে মাধব জীউকে রাখিয়া তাঁহার সেবায় যে সকল সেবক নিযুক্ত করিলেন, তাহারা গালমাধব রাজার নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিল। রাজা গালমাধবের রাজধানী সে সময় বিরজামণ্ডলে (Jajpore) ছিল। রাজা (গালমাধব) এই বিষয় শুনিয়া সসৈন্যে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন যে, নারদ মহর্ষি, দেবগণ এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সমাগত। তদ্দর্শনে গালমাধব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে তাঁহাদিগের নিকট হইতে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া তাহাদিগের সহিত প্রতিষ্ঠা কার্য্যে যোগ দিলেন। নারদের আদেশানুসারে কুণ্ড মণ্ডপশালা সকল প্রস্তুত হইল, নন্দি ঘোষ, তালধ্বজ ও পদ্মধ্বজ নামে স্বর্ণাদি বহুমূল্য রত্নময় নির্ম্মিত হইল। প্রতিমাদিগকে তদুপরি স্থাপন করত যজ্ঞভূমি হইতে যাত্রা করিয়া মন্দিরে উপস্থিত করাইলেন। যে দিবস হইতে এই রথে প্রভুরা আগমন করিলেন, সেই দিন হইতেই এই উৎসব রথযাত্রা বা গুণ্ডিচা যাত্রা নামে খ্যাত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা উপস্থিত হওত প্রতিষ্ঠা বিধি দেবতাদিগের সহিত সম্পূর্ণাবয়বে সম্পাদন করিলেন। ত্রৈকালিক ষোড়শোপচারে পূজাবিধি এবং দ্বাদশ যাত্রা, উপযাত্রা বিধি সকল যথারীতি সম্পন্ন করিতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে আদেশ লিখিয়া গেলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তদনুসারে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজাবিধি দৈনন্দিন করিতে লাগিলেন। ভগবানের সেবা কার্য্যে স্বয়ং ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং বিশ্বাবসু বংশীয় দয়িত ( অর্থাৎ ভগবানের প্রিয় ) এবং বিদ্যাপতি বংশীয়েরা (বর্ত্তমানে পতি, মহাপাত্র উপধি ভূষিত) নিযুক্ত ছিলেন। সেই রীতিই অদ্যাবধি প্রচলিত। অন্নপ্রসাদ সম্বন্ধে জাতিভেদ-জ্ঞান না রাখিয়া নির্ব্বিকার ভাবে তাহা গ্রহণ করা উচিত, ভগবানের এই আদেশ আছে। এতৎ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কথা পরে বিবৃত হইবে। পৌরাণিক মূল বিষয় লইয়া সংক্ষেপতঃ যাহা বর্ণিত হইল, সম্ভবতঃ তাহা কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট কপোলকল্পিত উপন্যাসের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, কারণ এই গ্রন্থের সহিত গ্রন্থান্তর তুলনায় বর্ণিত বিষয় সকল অসংলগ্ন প্রায় বোধ হইতেছে। দেখুন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের রাজা, কৃষ্ণ বলরাম সুভদ্রাদি দ্বার্গরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে, সে সময়ে কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ অসম্ভব হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতিতে এ স্থানের বিশেষ বিবরণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু সুবিচার পূর্ব্বক দেখিলে এই সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে হয় যে, দ্বাপর যুগে যে কেবল কৃষ্ণ বলরামাদির নাম ছিল ; অন্য যুগে ছিল না, এবিশ্বাস অমূলক। কারণ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম কেবল নরদেহধারী কৃষ্ণ বলরামের নাম নহে। কৃষ্ণাবতার পূর্ব্বে ইহা ভগবানের নামান্তর মাত্র ছিল। মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে, কৃষ্ণাবতার পূর্ব্ব ত্রেতাযুগের তারক মন্ত্রে কৃষ্ণ শব্দ দৃষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক অর্থ দেখিতে গেলে, এই শব্দ সকলের অর্থ ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কিম্বা দারুরূপী মূর্ত্তিত্রয়ের পূর্ণ ব্রহ্মের আবির্ভাব। কৃষ্ণ পূর্ণাবতার, সেই হেতু কৃষ্ণাবতার পরে দারুত্রয়ের নাম কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রা হইয়াছে, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। মহাভারতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের কোন উল্লেখ না থাকিলেও, বৈতরণী নদীর প্রাশস্ত্য এবং বিরজাঃ মণ্ডলের (Jajpore) বর্ণনা, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজার সত্যযুগে অস্তিত্ব, তৎকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের উৎপত্তি—প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ।

# স্বদেশী ভাব ও আকবর।

বৰ্ত্তমান স্বদেশীভাবের উচ্ছ্বাসের সময়, মুসলমানগৌরবরবি আকবরের জীবনচরিত, স্বদেশীভাবে আলোচনা করিলে, আমরা কি তথ্য শিক্ষা করিতে পারি? কেবল মুসলমানের মধ্যে নহে, পৃথিবীর ইতিহাসে আকবরের ন্যায় মহৎ, উদার, দক্ষ, সমদর্শী সম্রাট দুর্লভ। জগতে আর কোনও সম্রাট বিদেশীকে এমন স্বদেশীভাবে দেখিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তোডরমল, ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ এবং বীরবলকে আকবর, মুসলমান সাম্রাজ্যে, যে পদ, আধিপত্য, সম্মান ও ক্ষমতা দিয়াছিলেন, কোন বিদেশী সম্রাট্ কোন পরাজিত জাতীয় লোককে সেরূপ পদাদি দেন নাই। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, আকবরকে এক হিসাবে হিন্দুরাজা মনে করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়ম দি কঙ্করর, নর্ম্মণ্ডির লোক হইয়াও, ইংলণ্ডের রাজা হওয়াতে ইংলণ্ড পরাধীন হয় নাই। দ্বিতীয় জেমসের পরে ওলন্দাজ উইলিয়ম হলণ্ড হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া রাজা হওয়াতে, ইংলণ্ড পরাধীন হয় নাই। বার্ণাডট, (Bernadotte) চতুর্দ্দশ চার্লস নামগ্রহণ পূর্ব্বক, সুইডেনের রাজা হওয়ায় সুইডেন পরাধীন হয় নাই। বার্ণাডট কখনই ভাল করিয়া সুইডিস ভাষা শিখিতে পারেন নাই। ওলন্দাজ উইলিয়মও ভাল ইংরাজি বলিতে পারিতেন না। তথাপি তাঁহারা প্রজাগণ কর্ত্তৃক স্বদেশী রাজার ন্যায় গৃহীত হইয়াছিলেন। ফল কথা, কোন দেশে বিদেশী রাজা যদি স্বদেশী রাজার ন্যায় প্রজারঞ্জন করেন, তাহা হইলে রাজা বিদেশী হইলেও এক হিসাবে ঐ দেশকে স্বাধীন মনে করা যাইতে পারে। আফ্রিকা-নিবাসী সেপ্টিমস্ সিভিরস, এবং ডানিয়ুব তীরবর্ত্তীপ্রদেশাগত দক্ষ সম্রাটগণ রোমক সাম্রাজ্য শাসন করায় রোম স্বাধীনতাবিচ্যুত হয় নাই। নেপোলিয়ান কর্সিকাবাসী হইলেও নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফরাসি দেশ স্বাধীনতাচ্যুত হয় নাই।

আকবরের রাজত্বকালে, কি মুসলমান কি হিন্দু, সমান অধিকার, সমান স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। আকবর চিতোর, জয়পুর, বুন্দি প্রভৃতি স্থানের হিন্দু রাজপুত রাজাদিগের এবং প্রতাপাদিত্য, কেশব রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী রাজাদিগের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের দেশ নিজের শাসনের অধীন করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য; যে পরিমাণে তিনি হিন্দু রাজাদিগের স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলেন সেই পরিমণে তিনি হিন্দু স্বাধীনতার শত্রু রূপে পরিগণিত হইবেন, তাহাও সত্য। এমন কি, স্বাধীনতাপ্রিয় ভাবুক হিন্দু মনে করিতে পারেন যে, যে দিন আকবর, অমরকোট রাজভবনে, হিন্দু নরপতির আশ্রয়ক্রোড়ে, জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই দিনই রাজপুতানার বিশাল মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু, রাজস্থানের রাজলক্ষ্মীর ক্রন্দন ধ্বনির সহিত, ভারতের স্বাধীনতাদেবীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত, মিশ্রিত হইয়া, ভারতের চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় স্বাধীনতা-পূত পবিত্র-শোণিত-প্রবাহে যিনি রাজপুতানাকে সিক্ত করিয়াছিলেন, যিনি বঙ্গদেশের স্বাধীনতার আকাশে উদীয়মান (প্রতাপ) আদিত্যকে রাহুর ন্যায় গ্রাস

করিয়াছিলেন, তাঁহার সহস্র গুণ থাকিলেও, স্বদেশী হিন্দু—তাঁহাকে অমিশ্রিত প্রশংসা করিতে পারেন না। হিন্দুর স্বাধীনতা রত্ন হরণ করিয়া, পরে হিন্দুকে মস্তকে তুলিয়া তাহাকে সম্মান করিলেও, স্বদেশী হিন্দু স্বাধীনতা-নাশ-জনিত অশেষ ক্ষতি কখনই বিস্মৃত হইতে পারেন না—তাঁহার সুচারু শাসন প্রণালী, তাঁহার পক্ষপাত-শূন্য ন্যায়বিচার, হিন্দুদিগের প্রতি অচল বিশ্বাস, অগাধ শ্রদ্ধা, এবং অবিরাম আনুকূল্য আলোচনা করিয়াও, বিষাদ-শূন্য হর্ষ লাভ করেন না।

স্বাধীনতা নাশের জন্য যে ক্ষোভ তাহা যাইবার নহে। স্বীকার করি। আকবর মুসলমান না হইয়া যদি তিনি কোন হিন্দু রাজা হইতেন, তাহা হইলে হিন্দুর নিকট তাহা অমিশ্রিত আনন্দের কারণ হইত, সন্দেহ নাই। কল্পনা করুন, মানসিংহ অথবা, ভগবান দাস, অথবা রাণা প্রতাপ, অথবা তোডরমল আকবরের স্থান ও প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং আকবরের ন্যায় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন; অথবা কল্পনা করুন, যাহা ইতিহাস বলিয়া এতাবৎ-কাল পাঠ করিয়াছেন, তাহা ভুল। বস্তুতঃ আকবর মুসলমান রাজা নহেন, তিনি হিন্দু; তাঁহার নাম "অকুতোভয় বীর" ছিল; * তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে "অকুবীর" হয়—পরে আকবর বলিয়া প্রচলিত হয়। অমর-কোটে হুমায়ুন-মহিষী যে সময়ে একটী মৃত বৎস প্রসব করেন, ঠিক সেই সময় অমরকোটের রাজমহিষী এক পুত্র প্রসব করেন। কোন নারী প্রথমে মৃত বৎস প্রসব করিলে, পরেও উপর্য্যুপরি মৃত সন্তান প্রসব করে, এবং প্রসূতি মৃতবৎসা বলিয়া পরিত্যজ্যা হয়, সাধারণতঃ এই একটী সংস্কার আছে। তজ্জন্য হুমায়ুন-মহিষী ঐ মৃত পুত্রের কথা গোপন করিয়া, অমরকোট রাজের নবকুমারকে স্বকীয় পুত্র বলিয়া প্রচার করেন। হুমায়ুন তখন ও তৎপরবর্ত্তী কয়েক দিবস অমরকোটে না থাকাতে ঐ হিন্দু রাজ-পুত্রকে মুসলমান সম্রাটপুত্র বলিয়া প্রচার করার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

এই জন্যই যখন আস্কারি ভয়ে হুমা-য়ুন সস্ত্রীক পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন, তখন হুমায়ুনের স্ত্রী ঐ শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি নবকুমারের গর্ভধারিণী হইলে কখনই প্রাণ ধরিয়া তাহাকে শত্রু মুখে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে পারিতেন না। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে, আকবর জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে হিন্দু-জনকজননীর পুত্র। তজ্জন্যই তিনি ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে ও সহানুভূতিতে সততই হিন্দুর অনুকূল হইয়াছিলেন। হিন্দু রাজা চন্দ্রগুপ্ত বাহুবলে অন্য হিন্দুরাজগণকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষকে এক ছত্র তলে আনিয়াছিলেন,—অকবর তাহাই করিয়াছিলেন। আকবর হিন্দু-সন্তান ছিলেন বলিয়া হিন্দু রাজকন্যা বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং বিবাহ করিয়া-ছিলেন, এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে গো-হত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন; পলাণ্ডু বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং হিন্দু সন্ন্যাসিগণকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়াই সূর্য্যদেবকে পূজা করিতেন। ভগবান দাস

*যথা, হরি + কুল + ঈশ = Hari-cul—es = Hercules—কৃষ্ণ বা বলদেব See Tod's Rajasthan.

ও মানসিংহ কোন সূত্রে এই গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিয়া আকবরকে কন্যা দান করিয়াছিলেন। এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। বদৌনি লিখিয়াছেন, আকবরের হিন্দু আচার ব্যবহার তাহার হিন্দু পত্নী কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এ কথা আলোচনা করেন নাই যে, আকবর হিন্দু রাজ-কন্যাকে মহিষী করিতে কেন এত ভাল বাসিতেন। আকবরের জীবনে অনেক ঘটনা আছে, যাহাতে আকবর যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-সন্তান, উহা অনুমান বা কল্পনা করা যাইতে পারে। এক্ষণে, আকবর মুসলমান ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন, এই কথা যদি ক্ষণকালের জন্য বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে হিন্দু অবশ্য আকবরের কীর্ত্তিকলাপে অধিকতর আনন্দ লাভ করিতে পারেন। তাহার উপর যদি আরও কল্পনা করা যায়, আকবর যে হিন্দু-সন্তান, তাহা আকবর গোপন করিতেন না; তাহা তখন সকলেই জানিত। মুসলমানগণ তজ্জন্য অনেক স্থানে বিদ্রোহী হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই কথা জানিতেন। বদৌনি তাঁহার ইতিহাসে এই কথা লিখিয়া-ছিলেন বলিয়া তিনি তাহার ইতিহাস আক-বরের মৃত্যুর পরেও সহসা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। আকবরের মৃত্যুর পর মুসলমান সম্রাটগণের আদেশে আকবরের প্রকৃত জন্ম বৃত্তান্ত লোপ করা হইয়াছে। অমরকোটের রাজবংশের ইতিহাসে, আকবর যে অমরকোট রাজনন্দন, তাহা লিখিত আছে, এবং বদৌনি এবং আবলফাজুল লিখিত ইতিহাসের একটী প্রতিলিপি আকবরের জীবদ্দশায় পারস্য দেশে লইয়া যাওয়া হইয়া-ছিল। ঐ প্রাচীন গ্রন্থ পুনর্লব্ধ হইয়াছে। এবং জনৈক ফরাসি অন্বেষক সম্প্রতি মধ্য আসিয়াতে প্রোথিত গৃহে পুস্তকরাশি লাভ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুসলমান লিখিত উক্ত ইতিহাসের প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই তিনখানি গ্রন্থ মিল করিলে দেখা যায়, আকবর অমরকোট-নরপতি-নন্দন এবং এই কথা আকবরের সময় অনেকেই জানিতেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী সময়ের মুসলমান সম্রাট ঐ কথা একবারে লোপ করিয়া দেন। এবং লোপ করিয়া দেওয়া সহজ। কারণ আক-বর হুমায়ুন কর্ত্তৃক তাঁহার ঔরসজাত পুত্র বলিয়া গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিলেন।

উপরে যে কল্পিত বৃত্তান্ত লিখিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আকবরের জীব-নের দুই একটী প্রহেলিকার মীমাংসা হয়, কিন্তু হিন্দু! তুমি তাহাতে বিশেষ আহ্লাদিত হও কি? আকবর হিন্দু সন্তান ছিলেন, অথবা তিনি মুসলমান সন্তান ছিলেন, সেটা আমাদের তত আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের প্রধানত আলোচ্য বিষয় এই যে, হিন্দুদিগের সহিত তিনি কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং যে সকল হিন্দু তাহার শাসনাধীন হইয়াছিল, তাহারা কি পরিমাণ স্বাধীনতা-সুখঃও শান্তি লাভ করিয়াছিল। এক, দিকে মহাবেতঃ রাজপুত সন্তান, রাণা প্রতাপের ভ্রাতা, কিন্তু তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক হিন্দুদিগের উপর যদি অত্যাচার বা বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনও আমাদের প্রীতির পাত্র হইতে পারেন না। অপর দিকে, আকবর মুসলমান সন্তান হইয়াও যদি হিন্দুদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, এমন কি, উদার হিন্দুরাজার নিকট যে রূপ সদ্ব্যবহার আশা করা যায়, আকবর যদি সেই রূপে হিন্দু প্রজা পালন করিয়া

থাকেন; হিন্দুর ধর্ম্ম, অধিকার ও স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, মুসলমানদিগের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন,করিতেও স্বীকার ছিলেন, এবং মুসলমানদিগের বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভীত না হইয়া অটল ভাবে হিন্দুদিগের উন্নতির পথ মুক্ত রাখিয়াছিলেন, হিন্দু ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ, রাজা তোডরমলকে তাহার দক্ষিণ হস্ত এবং মুসলমান সেনাপতিগণকে তাঁহার বাম হস্ত রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন—এ কথা যদি সত্য হয়,তাহা হইলে আমরা আকবরের শাসনকে কেন হিন্দু সম্রাটের শাসন বলিয়া মনে করিতে পারি না? যাঁহার জন্ম হিন্দু রাজার আশ্রয়ে, যাঁহার পত্নী হিন্দু, যাঁহার পুত্রবধূ হিন্দু, যাঁহার প্রধান সেনাপতি হিন্দু, যাহার ধনসচিব হিন্দু, যাঁহার প্রধান মন্ত্রী হিন্দু, যিনি মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মহম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিয়া,হিন্দু যোগী-দিগের নিকট শিক্ষা লইয়া, প্রকারান্তরে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহাকে আমরা মুসলমান বলিব, না হিন্দু বলিব? তাঁহার মন্ত্রণাকে স্বদেশী বলিব, না বিদেশী বলিব?

যদি কোনও বিদেশী রাজা স্বদেশীয়ের সহিত এক প্রাণ হইবার চেষ্টা কখনও করিয়া থাকেন, তবে আকবর তাহা করিয়াছিলেন

রাজা যে জাতীয় হউন না কেন, তিনি যদি কেবল প্রজাদিগের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন, প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য নিয়ত সচেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শাসন স্বদেশী শাসন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায়। তবে বিদেশী রাজা ভাল হইলেও এবং স্বদেশীর মত,ভাল কার্য্য করিলেও, বিদেশীয় সংস্রবে অনেক স্থলে ভবিষ্যতে যে বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। হেগেল তাঁহার Philosophy of History তে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইতিহাসে মনুষ্যজাতির ক্রমোন্নতি দেখা যায়। (১) রাজা প্রথমে, স্বেচ্ছাচারী, যথা, আসিয়াতে। (২) তৎপরে, দেশের মধ্যে যাহারা প্রধান লোক, তাঁহারা সমিতি করিয়া রাজ্য শাসন করেন; কিন্তু সাধারণ লোক তখনও স্বাধীনতাচ্যুত; যেমন, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে। (৩) পরিশেষে, জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপনাদিগের মনোনীত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসন কার্য্য চালাইয়া থাকে। যথা, বর্ত্তমান সময়ের আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফরাসি, জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশের শাসন তন্ত্র। ইতিহাসে মনুষ্য জাতির স্বাধীনভাবের ক্রমোন্নতি হেগেল যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা স্বীকার্য্য হউক বা না হউক, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায়, ইতিহাস সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অসংশয়িত সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে যে, কোন জাতি স্বাধীনতা ব্যতীত বিশেষ উন্নত বা সভ্য হইতে পারে নাই।

স্বাধীনতা অথবা অধীনতা পশ্চাল্লিখিত কয়েক প্রকার হইতে পারে :—

যেখানে সাধারণ প্রজারা নিজের মনোমত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের দ্বারা শাসন কার্য্য চালায়।

২। যেখানে উচ্চশ্রেণীর প্রজারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের দ্বারা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করায়।

৩। যেখানে প্রজাদিগের স্বজাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বাহুবলে রাজা হইয়া স্বেচ্ছামত শাসন করেন। কিন্তু প্রজাদিগের অস্ত্র শস্ত্র থাকে। রাজা অধিক অত্যাচার করিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া অস্ত্র ধারণ

পূর্ব্বক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং অন্য কাহাকে রাজা করে।

৪। যেখানে কোন বিদেশী রাজা আসিয়া দেশ জয় করিয়া শাসন করেন, কিন্তু প্রজাদিগের অস্ত্রহীন করেন না। প্রজাদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিবার অধিকার দেন। সেখানে অত্যাচার অসহনীয় হইলে দেশীয় সৈন্য ও প্রজা বিদ্রোহী হইয়া বিদেশীয় রাজাকে তাড়াইয়া দিতে পারে। বিদ্রোহের ভয়ে এই শাসন তন্ত্রে প্রজাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে।

৫। যেখানে রাজা বিদেশী। প্রজাগণ অস্ত্রহীন, কিন্তু দেশীয়গণ হইতে বিদেশী রাজা অনুকূল ব্যক্তিগণকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করেন। সেখানেও প্রজাগণের কতক অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হয়।

৬। যেখানে রাজা বিদেশী সমুদয় সৈন্য বিদেশী। প্রজা নিরস্ত্র।

স্বাধীনতা বা অধীনতা এই ছয় শ্রেণীর মধ্যে, আবার প্রত্যেক শ্রেণীর কয়েকটী করিয়া শাখা আছে। চতুর্থ শ্রেণীর দুইটী শাখা:—(ক) রাজা বিদেশী, কিন্তু রাজা, নিজ মহত্ত্বগুণ, মহৎ স্বদেশী রাজার ন্যায়, প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। এবং প্রজারা স্বদেশী রাজার নিকট যে অধিকার, পদ, মান, সম্ভ্রম, ন্যায়বিচার প্রভৃতি সুবিধা পাইতে পারিত,বিদেশী রাজার নিকট তাহা পাইয়া থাকে। (খ) রাজা বিদেশী এবং প্রজারা পরাজিত বলিয়া, জেতৃ-জাতির সুবিধার জন্য, পরাজিত জাতীয় প্রজাগণকে উচ্চপদ, মান, সম্ভ্রম, স্বত্ব অধিকার প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত করা হয়। প্রজারা নিরস্ত্র ও নির্জীব না হইলে এইরূপ বিদেশী রাজার অথবা রাজবংশের অচিরাৎ পতন হয়। বলা বাহুল্য, আকবরের শাসন প্রণালী (ক) শ্রেণীর অন্তর্গত। এই বিদেশী রাজার শাসন প্রণালীর গুণ এত অধিক যে, ইহার তুলনায় অনেক স্বদেশী অধম রাজার শাসন প্রণালী হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ম্যাকিডোনিয়ানদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ভারতকে ম্যাকিডোনিয়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষে এমন এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাহা ভারতের বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত এত নিষ্ঠুরতার সহিত ভারত শাসন করিতেন যে, Justin বলিয়াছিলেন যে "after his victory Chandra Gupta forfeited by his tyranny all title to the name of liberator, for he oppressed with servitude the very people whom he had emancipated from foreign thraldom (Justin Mc. Crindle).

কিন্তু বিদেশী রাজা ভাল হইলেও ভাবী আশঙ্কা থাকে। কেননা,বিদেশী হইয়া স্বদেশীর সহিত পূর্ণ সহানুভূতি করিতে পারেন এরূপ মহাপুরুষ জগতে অতি বিরল। পৃথিবীতে অধিকাংশ জয়ী জাতি বিবেচনা করেন যে, জেতা ও জিত এই দুইয়ের মধ্যে খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ—অথবা প্রভু ও ক্রীতদাসের সম্বন্ধ, (বস্তুত প্রাচীনকালে জয় করিলে, জিত ব্যক্তিগণকে ক্রীতদাস করিবার প্রথা ছিল)—অথবা মনুষ্য ও পালিত পশুর সম্বন্ধ। তজ্জন্য যখন এক জাতি অপর জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহার দেশ অধিকার করে, এবং পরাজিত জাতির উপর অত্যাচার করে, তখন পরাজিত জাতির লোক, যদি ন্যায় ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের দোহাই দিয়া,সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে উদ্ধত জেতৃগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া থাকেন, "চুপ রহ! তরবারির বিচারে আমরা মুলুকের মালিক হইয়াছি;

শক্তি থাকে আমাদিগকে তাড়াইয়া দেও, নতুবা আমরা যাহা করি, তাহা চুপ করিয়া সহ্য কর।" * আর জেতৃগণের মধ্যে যাহারা গম্ভীর, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে নীরবে এই মনে করিয়া জিত জাতি কর্তৃক ন্যায় সঙ্গত প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া থাকেন যে, "পরের দেশ জয় করিয়াছি,পরের ধন লইবার জন্য, নিজের সুবিধার জন্য।" এই সাধারণ কথার উপর, এক্ষণে আবার কৃত্রিম পাণ্ডিত্য-জনিত (Survival of the fittest) বলিয়া একটা সাংঘাতিক ভ্রম, রাজনীতি ও সমাজ নীতির মধ্যে, প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি দুর্ব্বল, আমি বলবান্—সুতরাং তোমাকে আমার মারিয়া ফেলিবার অধিকার আছে। কেননা, জীবন রক্ষার জন্য জগতে জীবগণ নিয়ত সংগ্রাম করিতেছে, এই সংগ্রামে যে বলবান, সে বাঁচিয়া থাকিবে, যে দুর্ব্বল সে মরিবে—এই প্রকৃতির নিয়ম। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে,ইহা পশু প্রকৃতির নিয়ম, মানব প্রকৃতির নিয়ম নহে। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে সবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে নিজের সুবিধার জন্য মারিয়া ফেলিলে কেবল প্রকৃতির নিয়মানুসারে কার্য্য করা হয়। সুতরাং তাহাতে অধর্ম্মও নাই, প্রতিবাদের কোন কারণও নাই। চমৎকার!

উপরি উক্ত কথাগুলিতে বুঝা যায় যে, বিদেশী রাজা নিজে উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ হইলেও, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রজাগণের লাঞ্ছনায় ও বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই আকবর যে এত মহৎ ছিলেন, হিন্দু-গত প্রাণ ছিলেন, তথাপি যখনই ইতিহাসে পাঠ করি, তিনি কোন হিন্দু রাজাকে জয় করিলেন, তখনই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তখনই মনে হয়, ভবিষ্য অমঙ্গলের বৃদ্ধি হইতেছে, তখনই মনে হয়, হায়! জগতে বীরগণ ও নরপতিগণ এ কথা কবে বুঝিবেন, এ কথা কবে প্রচারিত হইবে যে, স্বাধীন জাতিকে পরাধীন করায় কোন গৌরব নাই। প্রকৃত গৌরব—পরাধীনকে স্বাধীন করা।

স্বীকার করি, এই আদর্শ দ্বারা বিচার করিলে আকবর কর্তৃক হিন্দুরাজগণের স্বাধীনতা হরণ নিতান্ত গর্হিত কার্য্য—অমার্জ্জনীয় পাপস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। যেমন তেমন জাতির স্বাধীনতা হরণ নহে—তাহারা এমন জাতি যে মরিবে সেও স্বীকার—তথাপি অধীন হইতে চাহে না। জগতে ক্ষুদ্র আয়তনে যাহা হয়, ক্ষুদ্র লোক তাহার মহত্ত্ব বুঝে না, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। একবার চিতোরের কাহিনী পাঠ করুন—জয়মল্ল ও পত্ত চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না, জীবন দিয়াও চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না—কিন্তু তাঁহাদের বীরত্বের কাহিনী পড়িলে, যেন জয়ী আকবরকে তুলনায় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। লণ্ডনডেরি (Londonderry) অবরোধ সময় দুর্গ রক্ষার জন্য যখন সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতেছিল, তখন তাহাদিগের পত্নী ও ভগ্নীগণ গোলাবৃষ্টির মধ্যে তাহাদিগের পশ্চাতে থাকিয়া জল বারুদ গুলি যোগাইতেছিল। দুর্জ্জয় জিগীষা চালিত আকবর যখন স্বয়ং বিপুল সৈন্য লইয়া চিতোর আক্রমণ করেন, তখন হিন্দু মহিলাগণ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উপর্য্যুপরি মোগল সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল কৈলবার রাজার বয়স ষোল বৎসর মাত্র।

* এই প্রবন্ধ লেখার পর—৪-১-০৭ প্রকাশিত টেলিগ্রামে দেখিলাম "It 'The Times' points out the folly of Dadabhai Naroji's claim to self-government like the colonies, since India has been won by the sword and is held in the last resort by the sword......

তাহার নাম পত্ত। পত্তের বীরগাথা পাঠ করুন,আর বীররসে আপ্লুত হইয়া হর্ষবিষাদে অশ্রু বর্ষণ করুন। রাজা বালক, কিন্তু যখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হইতেছে, তখন রাজপুত বালক ঘরে বসিয়া থাকিবে? তাহা হইতে পারে না। বালক যুদ্ধ করিবে, আর মাতা গৃহে নিরাপদে থাকিবেন,তাহাও হইতে পারে না। বালক এবং মাতা উভয়ে যুদ্ধে যাইবেন। বালক ও মাতা যুদ্ধে যাইবেন, নবোঢ়া চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা যুদ্ধ করিবে না, তাহাও হইতে পারে না। বালক ও বালিকা (পতি পত্নী), ও জননী তিন জনে যুদ্ধে নির্গত। বাঙ্গালী, একবার নয়ন ভরিয়া মানসনেত্রে দেখ—ঐ বালক রাজপুত যুদ্ধ করিতেছে, ঐ তাহার পার্শ্বে তাহার বালিকা পত্নী যুদ্ধ করিতেছে,আর পাশে জননী যুদ্ধ করিতেছেন —ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন। বালিকা গুলি মারিতেছে, শত্রুনাশ করিতেছে, রণক্ষেত্রে চামুণ্ডার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালক ও জননী ভীষণ ভাবে যুঝিতেছেন। ঐ মোগল-গুলি বালিকার কোমল দেহ বিদ্ধ করিল, হেলিয়া জননীর পাশে পড়িল, স্বর্গে চলিয়া গেল---ঐ---বালক ও জননী তাহার অনুগমন করিলেন। এই বীরত্বের তুলনায়, আকবরের ন্যায় মহাযোদ্ধাও মহাবীরও কেমন ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। হয়ত পাঠক এই কথাটা ভাল বুঝিলেন না। তাই একটা তুলনা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। খ্রীষ্ট ক্রুশে নিহত হইলেন। তাঁহার শত্রুগণ জয়লাভ করিল সত্য। কিন্তু সেই ক্রুশবিদ্ধ অসহায় লম্বমান দেহ দেখিয়া খ্রীষ্টকে কত বৃহৎ, কত মহৎ বলিয়া বোধ হয়; আর তাহার জয়ী উল্লাসী শত্রুগণকে কত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়।

আবার রত্নগড়ে দুর্গাবতীকে স্মরণ করুন। স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহার আর কোন অপরাধ ছিল না। তথাপি আকবরের সৈন্য তাহাকে আক্রমণ করিল। সৌন্দর্য্যে, গুণে, বীরত্বে যেন যথার্থই তিনি দুর্গা দেবী। কিন্তু এবার দুর্গা মহিষাসুরকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। এবার অসুর দেবতাকে পরাজিত করিল। দুর্গা, বাণের পর বাণে বিদ্ধ হইয়া, মা দুর্গার নিকট স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

বস্তুতঃ আকবর কর্ত্তৃক হিন্দু রাজগণের জয়, হিন্দুর পক্ষে, একটা নিতান্ত শোকজনক কাহিনী। যখন নেপোলিয়ন জীনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রুসিয়াকে পরাজিত করেন, তখন নাকি গেটে (Goethe) এবং Hegel হৃদয়ে আঘাত পান নাই; Hegel নাকি নেপোলিয়নকে জগতের আত্মা(world soul) মনে করিতেন। আমরা আকবরকে সেরূপ জগদাত্মা বা জগদ্‌গুরু মনে করিতে পারিনা; হিন্দুরাজগণের পরাজয় ও ধ্বংস-কাহিনী অবিচলিত চিত্তে পাঠ করিতে পারি না। যে রাজপুত পুরুষগণ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যে রাজপুত মহিলাগণ অপমানের হস্ত হইতে ত্রাণ পাই-বার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, স্বর্গ হইতে তাঁহারা অদ্যাপি আকবরের অকীর্ত্তি নরনারীহত্যা, ঘোষণা করিতেছেন।

কিন্তু আমরা যে উচ্চ আদর্শের দ্বারা আকবর চরিত সমালোচনা করিতেছি, আক-বরের সময়, বা এই সভ্য যুগেও তাহা প্রচ-লিত হয় নাই। এই কথা স্মরণ রাখিলে সমা-লোচনার তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া যায় এবং আকবরের গুণগুলি পরিস্ফুট হয়। আক-বরের উদারতা সভ্যজগতে অদ্যাপি দুর্লভ।

বৃটিশ শাসনে হিন্দু Commander in Chief হইবে, Governor, Lieutenant Governor হইবে, Finance Minister হইবে ; সে সময় এখনও অনেক দূরে। আকবরের রাজত্ব বৃটিষ জাতিকে উৎসাহিত করিতেছে—বলিতেছ "দেখ, আকবর হিন্দুকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাই তাঁর রাজত্ব এত দৃঢ়,এত গৌরবান্বিত, এত শুভপ্রদ হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব হিন্দুকে বিশ্বাস করেন নাই, তাই মোগল রাজবংশের পতন হইল।" ইংরাজ হলাণ্ড হইতে উইলিয়মকে ডাকিয়া রাজ্য দিয়াছিল, তথাপি প্রধান প্রধান ইংরাজ উইলিয়মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। আর, আকবরকে হিন্দুরা ডাকিয়া আনেন নাই,তথাপি আকবর যে যে হিন্দুকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করেন নাই। আকবর জীবন-চরিত বলে—"ইংরাজ ! তুমি হিন্দুকে বিশ্বাস কর ; তুমি ভারতে বিদেশী, তথাপি আকবরের ন্যায় স্বদেশীভাবে কার্য্য কর। তাহাতে তোমার ও ভারতবাসীর মঙ্গল হইবে। তোমার রাজত্ব ভারতে সুদৃঢ় হইবে।" যখন বৃটিশরাজ বলেন যে "দেখ ভারতবাসী ! আমরা তোমাদিগের এরূপভাবে শিক্ষা দিতেছি ও শাসন করিতেছি যে, তোমরা ক্রমে আবার একটী স্বাধীন বলবান্ জাতি হইতে পারিবে। তখন, তোমাদিগের রক্ষার জন্য, বৃটিশ সঙ্গীন ও বৃটিশ কামান আবশ্যক হইবে না ; তখন তোমরা নিজেই, কাবুলী ও রুষ প্রভৃতি জাতির সমকক্ষ হইয়া, আমাদিগের বিনা সাহায্যে, তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া, নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে"—তখন সে কথাটা বৃটিশ শাসনের কত গৌরবের কথা, কত গুণের কথা মনে হয়। তখন মনে হয়, ভগবানের বিধানে, পতিত ভারতের উদ্ধারের জন্য উহারা এদেশে প্রেরিত হইয়াছে। আর, যদি বৃটিশরাজ কোন অত্যাচার করেন, এবং প্রজাগণ তাহার প্রতিবাদ করেন,—এবং তাহার উত্তরে কোন উদ্ধত ইংরাজ দম্ভ করিয়া বলে, "তোমরা পরাজিত নিগার, আমরা জেতা ইংরাজ, আমাদিগের পদতলে তোমরা কেন না থাকিবে ?" —তখন এই বাক্য শুনিয়া কি ঘৃণা, কি লজ্জা, কি ক্ষোভ উপস্থিত হয় ! ইংরাজ দাসত্ব উঠাইয়াছিলেন তখন দেবতার কার্য্য করিলেন। রুষ সম্রাট তাঁহার প্রজাদিগের দাসত্বের কতকটা বিমোচন করিলেন, তখন রাজা যেন দেবতা। চ্যাটাম আমেরিকানগণের স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াস সমর্থন করিয়া বজ্রধ্বনিতে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা অদ্যাপি জগতে গৌরবের মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আর আকবর মোগল হইয়া, নবযুগের সভ্যতার আলোক না পাইয়াও, ভারতে বিদেশী শাসনকে যে স্বদেশীভাব দিয়াছিলেন, হিন্দুগণের গুণবত্তা, মহত্ব, অধিকার, স্বত্ব, স্বীকার করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে, জ্বলন্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া, বিদেশী শাসন-কর্ত্তাদিগকে শুভিতা শিক্ষা দিতেছে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।
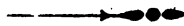
# পুত্র ও কন্যা

ইচ্ছামত পুত্র অথবা কন্যা লাভ করিতে পারিলে বহু পরিবার সুখী হইত। বহু সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত। পুত্র এবং কন্যা-প্রজনন ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারায় কত পরিবার নিয়ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে; কত পিতামাতা অশ্রু জলে সিক্ত হইতেছেন; কত পিতামাতা ভ্রাতা স্বহস্তে দেহ পাত করিতেছেন, তাহা মনে করিতেও শরীর অবসন্ন, হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। মানব অনন্য-উপায় হইয়া এত ক্লেশ, এত দুঃখ নীরবে সহ্য করিতেছে। সে জানে যে, এই মহা দুর্ব্বোধ্য দৈব ব্যাপারে তাহার কোনই সাধ্য নাই; এ স্থলে পুরুষকার ব্যর্থ, মানব-প্রযত্ন সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তাই সে সকলই সহ্য করে। কিন্তু প্রকৃতই কি মানব এ বিষয়ে কিছুই করিতে সক্ষম নহে? প্রকৃতই কি ইহা মানব প্রযত্নের সম্পূর্ণ বহির্ভূত? যিনি বলিয়াছিলেন, "পিত্র্যুরেতোঽতিরেকাৎ পুরুষঃ, মাতুরেতোঽতিরেকাৎ স্ত্রী" তিনি মানবের অক্ষমতা স্বীকার করেন নাই। যিনি বলিয়াছিলেন "যুগ্মে পুত্র বিজানীয়াৎ অযুগ্মে কন্যকাস্মৃতা" তিনিও মানবপ্রযত্নের নিষ্ফলতা ঘোষণা করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে জীব-বিজ্ঞানও হতাশ হইবার কারণ দেখিতেছে না। মানবের যুগান্তর-ব্যাপী ভূয়োদর্শন আশার বাণী লইয়াই তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। সেই বাণী শুনিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জীব বিজ্ঞান এখনও অনুন্নত। ইহারই মধ্যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ষ্টার্কওয়েদার সগর্ব্বে বলিতে পারিয়াছেন যে, "মানব চেষ্টা করিলে ইচ্ছামত পুত্র অথবা কন্যা লাভ করিতে পারে, কথা প্রায় নিশ্চিত রূপেই বলা যায়।" * আমরা স্বীকার করি যে, বিজ্ঞান এখনই এতদূর বলিলে অধিক বলা হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা স্বীকার করি না যে, বিবেচনা পূর্ব্বক বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া চলিলে মানব এ বিষয়ে একেবারেই অকৃতকার্য্য হইবে। বরং এরূপ করিলে অনেক সময় কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী-পুংভেদের সেই মূল সূত্র স্মরণ করিতে হয়। কিন্তু কিরূপে অচিহ্নিত † জীবকোষ স্ত্রীপুং চিহ্ন প্রাপ্ত হইল, তাহা মনে করিতে হয়। এই প্রভেদ চির দিন ছিল না; অসংখ্য প্রাণী অদ্যাপি জগতে বিদ্যমান, যাহাদের স্ত্রী-পুংভেদ নাই। পরবর্ত্তীকালে জীব নানা কারণে এই ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান কারণই,—কোষের পুষ্টিতা অথবা অপুষ্টিতা। অচিহ্নিত জীবকোষ প্রধানতঃ আহার সংযোগে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলেই স্ত্রী ডিম্ব উৎপন্ন হয়; এবং তাহার অপুষ্টিতা হেতুই পুংকীট সঞ্জাত হয়। ‡ ইহাই যদি

* I assert that it is perfectly possible to insure the sex of our offspring with something approaching to absolute certainty.--Stark Weather's Law of sex, p 8.

† A sexual.

‡ It must first be recognized that a number of factors co-operate in the determination of sex; but the most important of them may be more and more resolved into plus and minus nutrition! operating upon the parent, the sex elements, the embryo, and in some cases the larvæ.

স্ত্রী পুংভেদের মূল কারণ হইল, তবে এই কারণ যথাবিহিত পথে কার্য্য করিবার অবসর পাইলেই পুত্র অথবা কন্যা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। দম্পতির শারীরিক (ও মানসিক) অবস্থা; তাহাদিগের বয়স; গর্ভাধানের সময় ও স্থান; উত্তাপ, আলো, বংশ পরম্পরাগত ধর্ম্ম; ভ্রূণের কলল, বুদ্‌বুদ অথবা পিণ্ডাবস্থায় * পরিপোষণ;—ইত্যাদি নানা বিষয়ে মনোযোগ দিয়া পুষ্টিতা অথবা অপুষ্টিতা সংসাধিত করিতে পারিলেই যত্ন সফল হওয়া সম্ভব।

দেহ ও মন, এই দুই-এ মানুষের ধাতু †। ইচ্ছামত পুত্র অথবা কন্যা লাভ করিতে হইলে প্রথমে দম্পতির ধাতুর প্রতি মনোযোগ করিতে হয়। এই ধাতু এক্ষণে কালক্রমে অনেকাংশে বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য অনুপাতে পৃথিবীর নর-নারী সংখ্যা প্রায় সমানই থাকিয়া যায়। সভ্যাবস্থায় জন্ম মৃত্যুর সংখ্যায় পুত্রের আধিক্যই লক্ষ্য হয়; কিন্তু আয়ুষ্কালের দীর্ঘতা ইত্যাদি কারণে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্ত্রীগণের সংখ্যাই অধিক। তাহা হইলেও প্রকৃতি সাধারণতঃ উভয় সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন। এনিমিত্ত অনেক সময় দেখা যায় যে, এক পুরুষে পুত্র অথবা কন্যার সংখ্যা অধিক হইলে, দুই অথবা তিন পুরুষের সমষ্টি ফলে তাহা হ্রাস হইয়া যায়। এক পুরুষে পুত্রাধিক্য হইলে, পরবর্ত্তী পুরুষে কন্যার আধিক্য হয়; অথবা বংশের এক পুত্রাধিক্য হইলে অপর শাখায় কন্যাই অধিক হয়। আর, একবংশে কিম্বা শাখায় কন্যার আধিক্য হইলে পরবর্ত্তী বংশে কিম্বা শাখায় পুত্রের সংখ্যাই অধিক হয়। ইহাই প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা। * বংশগত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা অতি দুঃসাধ্য; দীর্ঘকালে যে গুণ অথবা দোষ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা তদ্রূপ দীর্ঘকালব্যাপী প্রযত্ন না করিলে পরিবর্ত্তন করিবার আশা করা যায় না। কিন্তু যদিও সম্যক পরিবর্ত্তন না করা যাউক, আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেও মানব সমাজ বিশেষ উপকৃত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে মনোযোগী হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বিবেচনা করিলে দুইটী কথাই মুখ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

(১) দম্পতির দেহ ও মনের অবস্থা;

(২) ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় পরিচর্য্যা।

এই দুই বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলেই (অন্ততঃ আংশিকরূপে) সফল হইবার

---

* * * Adverse circumstances, especially of nutrition, but also including age and the like, tend to the production of males, and the reverse conditions favouring females.—The Evolution of Sex P. 49.

* গর্ভাধানের পর এক রাত্রে কলল, সপ্তাহে বুদ্‌বুদ, অর্দ্ধ মাসান্তে পিণ্ড বলা যায়।

† এস্থলে আয়ুর্ব্বেদের অর্থ গৃহীত হয় নাই।

* আমার জামাতা শ্রীমান বীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরীর পিতামহের ৭ কন্যা, এক পুত্র; তাহার পিতার তিন পুত্র, কন্যা হয় নাই; কিন্তু তাহার এ পর্য্যন্ত তিন কন্যা, এক পুত্র। এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে, পিতামহের কন্যাধিক্য পিতার পুত্রাধিক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। আর বীরেন্দ্র নাথের কন্যাধিক্য তাহার পিতামহের সহিত তুলনীয়।

দীঘাপাতিয়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের চারি পুত্র, এক কন্যা; তাঁহার সহোদরা সুকবি শ্রীমতী ইন্দুবালার এ পর্য্যন্ত চারি কন্যা মাত্র। এস্থলে পুত্র শাখায় পুত্রাধিক্য ও কন্যাশাখায় কন্যাধিক্য লক্ষিত হইতেছে।

আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার উপায় কি?

এস্থলে একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এ কথাটী যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা নহে; কিন্তু এই কথা লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে উল্লিখিত উপায় আপনা হইতেই অবলম্বিত হইবে; সুতরাং অনেক সময় উদ্দেশ্য সিদ্ধি সহজ হওয়া সম্ভব। কথাটী এই ঃ—স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যিনি ক্ষীণ-ধাতু, অপত্য তাঁহারই ন্যায় হয়। এই কথাই অন্যরূপে বলিলে এইরূপে বলা যায় যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যিনি সবল-ধাতু, অপত্য তাঁহার বিপরীত হয়। এই সূত্র সকলে স্বীকার করেন না; কিন্তু আমি যতদূর অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাতে অনেকস্থলে এই নিয়মের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। এ সূত্র মধ্যে যে কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে, ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায়। এই সূত্র সত্য হইলে, ক্ষীণধাতু পিতার পুত্র জন্মিবে; এবং ক্ষীণধাতু মাতার কন্যা জন্মিবে; অথবা, সবল-ধাতু পিতার কন্যা জন্মিবে; সবল-ধাতু মাতার পুত্র জন্মিবে। এই নিমিত্তই পণ্ডিত টেরী বলিয়াছেন যে, "বালকেও পুত্র উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু কন্যা উৎপাদন করিতে আসল্ মানুষ আবশ্যক।" * উপরের লিখিত সূত্র স্বীকার করিলে দেখা যায় যে, স্বামীর ধাতু স্ত্রীর অপেক্ষা ক্ষীণ হইলেই পুত্র জন্মিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে, বৃদ্ধ স্বামী ও যুবতী ভার্য্যার পুত্র লাভের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, এইরূপ দম্পতির কন্যা অপেক্ষা পুত্রই অধিক জন্মিয়া থাকে। অন্নাভাবে শীর্ণ, দুশ্চিন্তায় ক্ষীণ, পরিশ্রমে ক্লান্ত দরিদ্রদিগের পুত্র সন্তানই অধিক। দুর্ভিক্ষ সময়ে অধিক সংখ্যক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পুত্র লাভ করিতে হইলে স্বামীর ধাতু ক্ষীণ হওয়া আবশ্যক।

এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে, এক দম্পত্তির কন্যা সন্তান হইতেছে; তাঁহারা কিরূপে পুত্র-মুখ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন, তাহাই অগ্রে আলোচনা করিব। তদ্বিপরীত ব্যবহার করিলেই কন্যালাভ হইতে পারে। যাঁহাদিগের কন্যা সন্তান অধিক হয়, সেই দম্পতির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, স্বামী বায়ু-প্রধান nervous temperament কর্ম্মঠ, তেজঃপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুগঠিত ও শ্রী-মান। তাঁহার পত্নী লঘুচিত্তা, শক্তিহীনা, রুগ্না অথবা স্থূলাঙ্গী। উল্লিখিত সূত্রানুসারে এইরূপ হইবারই কথা। এস্থলে স্বামীর ধাতু কিঞ্চিৎ নামাইতে হইবে, ও পত্নীর ধাতু কিঞ্চিৎ উন্নত করিতে হইবে। তবেই পুত্র লাভের সম্ভাবনা। স্বামীর বায়ু-প্রধান ধাতুকে শ্লেষ্মা প্রধান করিতে হইবে; এ কারণ তাঁহার আহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁহার স্বাস্থ্য যদিও মন্দ নহে, কিন্তু পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল, তাঁহার পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের শক্তি যৎকিঞ্চিৎ কমাইতে হইবে। তিনি যে স্থানে নিয়ত বাস করেন, সেই স্থান ত্যাগ করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাঁহার পক্ষে গ্রাম্য বায়ু অথবা পার্ব্বত্য প্রদেশের উচ্চ স্তরের বায়ুই ভাল; সহরের বায়ু তাঁহার ভাল নহে। তিনি মানসিক শ্রম ত্যাগ করিবেন, অধিক চিন্তা করা তাঁহার বিধেয় নহে। মানসিক শ্রমের পরিবর্ত্তে তাঁহার শারীরিক

* Any boy can beget a boy but it takes a man to beget a girl.—Secret of Sex P. 56.

শ্রম করা সঙ্গত। পরিষ্কার মুক্ত বায়ুতে অশ্বারোহণ, নৌচালন, ইত্যাদি শ্রমসাধ্য ব্যায়াম কার্য্য যে পরিমাণ তাঁহার শরীরে সহ্য হয়, সেই পরিমাণ নিত্যই করা উচিত। ইহাতে তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের শক্তি কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইবে। তাঁহার বায়ু দমন হইবে ও ধাতু কিঞ্চিৎ অবনত হইবে। অন্ততঃ দুই তিন মাস কাল যাহাতে মানসিক শ্রম কম হয় এবং শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার পক্ষে পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করা এবং পর্ব্বতের উপর উঠা নামা করা বিশেষ ফলপ্রদ। তাঁহার গভীর সুনিদ্রা হওয়া অতীব প্রয়োজন। সর্ব্ব প্রকার উত্তেজক আহার তাঁহার ত্যাগ করা উচিত। তিনি মৎস্য, মাংস, চা, মিষ্টি, ঘৃত, মাখন, ঘন দুগ্ধ ইত্যাদি যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিবেন। তৎপরিবর্ত্তে লঘুপাক উত্তম আহার দ্বারা যাহাতে ক্রমশঃ পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং দেহও সবল হয়, তাহাই করা বিধেয়। দেহ সবল হইলেই মস্তিষ্ক কিছু দুর্ব্বল হইবে। ইহাই তাঁহার আবশ্যক। তাঁহার শরীরকে দুর্ব্বল হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আর একটী বিশেষ গুরুতর কথা আছে—তিনি অন্ততঃ তিন মাস কাল পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। *

এক্ষণে তাঁহার পত্নীর সম্বন্ধে কিরূপ কর্ত্তব্য, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। স্বামীর যেমন শারীরিক শক্তি বাড়াইয়া মস্তিষ্কের শক্তি কমাইতে হইবে, পত্নীর তেমনই মন ও মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াইয়া শারীরিক শক্তি কমাইতে হইবে। † তাহা হইলেই পত্নীর হীন-ধাতু উন্নত হইবে, এবং পুত্র-লাভ করিবার সম্ভাবনা বাড়িবে। পত্নী অলস হইলে তাঁহাকে কর্ম্মঠ করিতে হইবে। নানা দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অল্প সংখ্যক দ্রব্য আহার করা তাঁহার পক্ষে ভাল। শীতল জলে স্নান, রক্ত সঞ্চালন, দেহ মর্দ্দন, ও শ্রমসাধ্য গৃহ কর্ম্ম করা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃশ বা লঘু হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহার রক্ত সঞ্চালনের বেগ বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার মস্তিষ্ক সবল, সুস্থ এবং পরিষ্কৃত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহার পক্ষে মনোযোগ সহকারে সরল গ্রন্থ সময় সময় পাঠ করা ভাল। তাঁহার মন প্রফুল্ল ও নিশ্চিন্ত রাখিতে হইবে। আহার কেবল দেহ ধারণোপযোগী হইলেই যথেষ্ট হইল। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, আলু, নারিকেল, অল্প সিদ্ধ ডিম, মৎস্য, মৎস্যের মস্তক, শম্বুক, গুগ্‌লী তাঁহার পক্ষে সুপথ্য। মৎস্য তাঁহার প্রচুর আহার করা সঙ্গত। চা ইত্যাদি পান করা দূষণীয়। ফস্‌ফরাস্‌-ঘটিত ঔষধ চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার করা উচিত। এইরূপ নিয়ম অন্ততঃ তিন মাস প্রতিপালন করা আবশ্যক। এই সময় তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নহে। * তৎপর নিয়মের অধীন থাকা অবস্থায় গর্ভাধান হইলে পুত্র লাভ হইবার সম্ভাবনা অধিক। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, রজোদর্শনের কিয়দ্দিবস পরে গর্ভাধান হইলে পুত্র লাভের সম্ভাবনা অধিক হয়। রজোদর্শনের অব্যবহিত পরে গর্ভাধান হইলে কন্যা জন্মিবার সম্ভাবনা অধিক হয়। † আর,

* Starkweather.

† A highly nourished ovum compare with one less favourably conditioned ... every probability will tend to a female. Geddes and Thomson, Law of Sex, P 49 50.

* Starkweather.

† Fertilization when the ovum is fresh

পুত্রেচ্ছুগণের পক্ষে, গর্ভাধান হইবার পর প্রসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গর্ভিণীকে অধিক পুষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। গর্ভাবস্থায় শ্রম-সাধ্য গৃহ কর্ম্ম করা নিতান্ত আবশ্যক; এবং আহার দেহ ধারণ উপযোগী হইলেই প্রচুর হইল।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অবস্থা ও সুবিধানুসারে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হয়। কিন্তু স্থূল কথা এই যে, পুত্রেচ্ছু পত্নীর ধাতু প্রবল করিবেন; এবং কন্যা-প্রার্থিগণ স্বামীর ধাতু প্রবল করিবেন। জীব-কোষের অবস্থা বিবেচনা করিলে এই মাত্র বলা যায় যে, পুংকীট অপুষ্ট ও স্ত্রী-ডিম্ব পুষ্ট হইলে উভয়ের সংমিশ্রণে পুত্র লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। আর, কন্যা লাভ করিতে হইলে তদ্বিপরীত অবস্থা হওয়া আবশ্যক। কন্যা-প্রার্থী, গর্ভিণীকে সাধ খাওয়াইতে ইচ্ছা করিলে গর্ভ সঞ্চারের এক মাস মধ্যে সাধ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অতীব জটিল, সন্দেহ নাই; এবং কোন রূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বর্ত্তমান সময়ে দুরাশার নামান্তর মাত্র। তথাপি উপরের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল যথাসাধ্য প্রতি-পালন করিলে অনেক সময় বাঞ্ছিত ফল লাভ হইতে পারে। বিজগণিতের ভাষায় বলিতে গেলে স্বামী > স্ত্রী = কন্যা।

স্ত্রী > স্বামী = পুত্র।

এই ভাবে সূত্রটী মনে রাখা সহজ। ইহাতে যে আধিক্যের কথা সূচিত হইল, তাহা স্বামী অথবা স্ত্রীর দেহগত, কোষগত, ভ্রূণগত এবং মনোগত ন্যূনাধিক্যের সমষ্টি ফল।

শ্রীশশধর রায়।

# বালযোগী ধ্রুব। (২)

এবম্বিধ অত্যদ্ভুত ভাবে যতই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হইতে লাগিল, বালযোগী ধ্রুবের অভ্যাস, অধ্যবসায়, বৈরাগ্য, প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস ও ভক্তি ততই সুদৃঢ় হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তিনি কঠোর তপপ্রভাবে এমন অসাধারণ তেজস্বী হইয়া উঠিলেন যে, অমিত ধৈর্য্যশালিনী মাতা বসুন্ধরা ভূমিকম্পের প্রবল বেগের ন্যায় চঞ্চলা হইয়া গেলেন। যে সকল সাধক অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মনে মনে ভাবি-তেন "আমাদের সমতুল্য সাধক ধরাতলে আর নাই" তাঁহারা বালক ধ্রুবের অপরিমিত তপস্যাবল দর্শন করিয়া লজ্জায় আপনাপন মস্তককে অবনত করিলেন এবং যে সকল যোগী ও ভক্তগণ আপনাদিগকে দিগ্বিজয়ী পুরুষ অথবা সম্পূর্ণ সামর্থ্যশালী সন্ন্যাসী বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, ধ্রুবের পূর্ণ পুণ্যতেজপুঞ্জে তাঁহা-দের দর্প ও দাম্ভিকতা খর্ব্ব হইয়া গেল। যাহারা বিদ্যা বা বিবেকের বৃথা মাৎসর্য্যে মত্ত ছিল, তাহারাও স্ব স্ব ক্ষুদ্র বিদ্যার হীনতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া কহিতে লাগিল, "অহো, আমরা কি নির্ব্বোধ! ধ্রুবের ব্রহ্ম-জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য ও তপোবলের তুল-নায় আমরা কত নিম্নতর অবস্থায় অবস্থিত!! যখন প্রখ্যাতনামা মহাযোগী, মহাপণ্ডিত ও মহাসাধক এবং পরম ভক্তবৃন্দ ধ্রুবের তুলনায় অধমাধম বলিয়া গণ্য, তখন আমাদের অধমত্ব

and vigorous, before waste has begun to set in, will tend to the same tendency; (that is to say tend to a female rather than to a male development).

যে অপার, তাহাতে আর সন্দেহ কি?" যাহা হউক, বালক ধ্রুবের তপপ্রভাবে পৃথিবী প্রকম্পিতা হইয়া উঠিলেন; তাঁহার অপ্রতিহত সাধন-সামর্থ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল কম্পনশীল ভাব ধারণ করিল। পবিত্র পুণ্যতেজের প্রবলতায় ধরিত্রী এমন চঞ্চলা ও চমকিতা হইলেন যে, জগদ্বাসীবৃন্দ তাহাতে ভয়ানক আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল; সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন ধ্রুবের তপস্তেজে দাহনশীল ভাব ধারণ করিতে লাগিল। পৃথিবীর কলুষে কলঙ্কিতা, কল্মষ-পরিপূর্ণা পৃথিবী, পুণ্যের প্রবলতায় অধীরা হইলেন; পাপেভরা বসুমতী ধ্রুবের অতুলনীয় পবিত্রতায় বারম্বার কম্পিতা হইতে লাগিলেন। ক্রমে লোক-পালগণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। সুতরাং দেবতা, লোকপাল প্রভৃতি ভগবান শ্রীহরির সমীপে উপস্থিত হইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন "হে প্রভো! আমরা এরূপ ঘোরতর তপস্যা আর কদাপি দর্শন করি নাই। পৃথিবীর প্রাণীপুঞ্জের শ্বাস-রোধ হইয়া যাইতেছে এবং তজ্জন্য মহাক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া ইহার যথাবিধি প্রতিকার বিধান করুন।" ভগবান কহিলেন "তোমাদের চিন্তা নাই, তোমরা সুস্থমনে স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ কর। উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব সুকঠোর তপস্যা দ্বারা আমার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বিপুলযশা বালযোগীর অসাধারণ পুণ্য-তেজে এবম্প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। যাহা হউক, তোমাদের চিন্তা নাই, আমি ইহার প্রতিকার বিধান করিব, তোমরা সন্তোষ সহকারে আপনাপন আলয়ে গমন কর।" পাঠকেরা এক্ষণে বুঝিয়া লউন, পাপে ও পুণ্যে কি প্রকার প্রভেদ? বুঝিয়া লউন, পুণ্য ও পবিত্রতার কি অসাধারণ সামর্থ্য! বুঝিয়া লউন, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের এমন অমিত প্রভাব, এমন প্রকৃষ্ট বিশেষত্ব, এমন সর্ব্ব-ব্যাপী মহত্ত্ব যে, পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক হিন্দু বালক এতাদৃশ তপস্যা সাধন করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার সমতুল্য দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই।

যাহা হউক, শ্রীহরি সমীপে দেবতা ও লোকপাল বৃন্দের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ভগবানের আসন টলিয়াছিল। ভক্তাধিক ভক্তের ধ্যানে, ভক্তপ্রবরের করুণ ক্রন্দনে, ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন? দয়াময় ভগবান স্বয়ং কহিয়াছেন "আমি সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপী, সমস্ত চরাচরে আমার সত্বা পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তথাপি একটী বিশেষ স্থল আমার অতীব প্রিয়। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আমার আসনরূপে বিবেচিত হইলেও, মদ্ভক্তের হৃদয়-সিংহাসন আমার অত্যন্ত প্রিয় আসন বলিয়া গণ্য। ভক্ত যে স্থলে আমার মহিমা কীর্ত্তন করেন, অথবা আমার ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, সেই স্থল আমার বিশেষ প্রিয়।" ভগবানের এই অনন্ত আনন্দোৎপাদক বাক্য, শান্তি-দায়িনী আশাময়ী কথা, কেবল হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ নহে, পরন্তু পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের শাস্ত্রসম্মত বাক্য। বর্ত্তমান কালের ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকগণ পাশ্চাত্য জাতি সমূহকে প্রায় সমুদায় বিষয়ে অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদেরই বাইবেল নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মগুরু যিশুখ্রীষ্টের উক্তি মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি কহিতেছেন,—"Where my disciple is there I am" এবং "Where they (the faithful disciples) assemble together in my name there I am."

প্রকৃত কথা এই, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান হরি ভক্তকে কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার নিজের সুপবিত্র মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত। ভক্তের অচ্ছেদ্য বিশ্বাস-রজ্জুতে ভগবান বাঁধা থাকেন; ভক্তের প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলে।

ভক্তি ভরে ডাক্ দেখি মন
কেমন হরি থাক্‌তে পারে।
দয়াময় নামে তিনি
বিদিত এই চরাচরে।
ভক্তের অধীন ভগবান
ভক্তের রাখেন মান।
ভক্তি ভরে শ্রীচৈতন্য
বেঁধেছিলেন প্রেম-ডোরে।
প্রহ্লাদ এই নামের বলে
মরে নাই অনলে জলে।
পান করি সে হলাহলে
অমর হলেন চরাচরে॥
ভক্তিভরে ডাক দেখি মন
কেমন হরি থাক্‌তে পারে॥

ভগবানের অসংখ্য নামের মধ্যে "ভক্তবৎসল" নাম অতীব প্রিয় ও মধুর। তিনি যেমন কৃপাসিন্ধু,তেমনি দীনবন্ধু; তিনি যেমন অনাথশরণ তেমনি পতিতপাবন ও জগৎজীবন; কিন্তু "ভক্ত-বৎসল" নাম তুল্য প্রিয়তর ও মধুরতর নাম আর নাই। যাঁহারা ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত চিত্ত সমর্পণ করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই পবিত্র ও পূর্ণময় পরব্রহ্মের ভক্তবৎসলতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের নিকটেই দীনবন্ধু ও কৃপাসিন্ধু ভগবান "বাঞ্ছাকল্পতরু" নামের সার্থকতা দেখাইয়া ভক্ত-প্রিয়তা-গুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ভগবান সুন্দর হইতেও সুন্দরতর; তিনি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য; তাঁহার শক্তি,জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল, ন্যায়, করুণা প্রভৃতির যেমন পরিমাণ বা তুলনা নাই,তেমনি তাঁহার সৌন্দর্য্যেরও পরিমাণ বা তুলনা হয় না। যে সকল হতভাগ্য নর নারীর আত্মায় রূপানুভাবিনী মনোবৃত্তি কিঞ্চিৎ মাত্রও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের চিত্তে এই সর্ব্বত্র বিস্তারিত রূপরাশির কণিকা প্রমাণ মহিমাও কখনও উপলব্ধ হইতে পারে কি? চিত্তশুদ্ধি না হইলে উপলব্ধির সম্ভাবনা কোথায়?

"ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহত প্রসাদে।
শুদ্ধেতু দর্পণ তলে সুলভাব কাশা—
(কালিদাস)

অর্থাৎ, দর্পণের স্বচ্ছতা যখন মলিন বস্তুর সম্পর্কে মালিন্যে আচ্ছাদিত হয়, তখন তাহাতে প্রতিবিম্ব পাত হয় না; কিন্তু সেই দর্পণই যখন নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, তখন তাহাতে অনায়াসেই প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। মানুষের হৃদয় দর্পণও যখন পৃথিবীর মলিনতায় আবৃত রহে, তখন হৃদয়ারাধ্য ও হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরও উহাতে অনুভূত হয় না; কিন্তু সেই হৃদয়ই যখন সাধনার প্রাসাদ দ্বারা শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্ম্মল ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন ঈশ্বর সততই উহাতে প্রতিবিম্বিত রহেন। জগতের আলোক-জনক সবিতা দেব ধরিত্রীর যাবতীয় সদসৎ পদার্থোপরে অংশুমালা বিতরণ করেন, কিন্তু মৃন্ময়পাত্র সূর্য্য কিরণে স্থাপিত করিলেও যেমন তাহাতে দিবাকরদীপ্তি প্রতিভাত হয় না, তেমনি সমুদয় মনুষ্য মধ্যে ব্রহ্মসত্ত্বা অবস্থিত হইয়াও মৃন্ময়পাত্রবৎ মলিন হৃদয়ে ঐ সত্ত্বা প্রতিবিম্বিত হইতে পায় না; স্ফটিকের ন্যায় পরিচ্ছন্ন পাত্র রৌদ্রে সংস্থাপিত করিলে তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, কারণ স্ফটিক

স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যে ব্যক্তি মলিনতা হইতে স্বতন্ত্র হইতে অসমর্থ হইয়াছে, তাহার বিশুদ্ধ হৃদয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপী সত্বা প্রতিবিম্বিত হয়,সুতরাং চিত্তশুদ্ধি মুখ্য উপাদান। 'The pure in heart shall see God" ইহাও খ্রীষ্টের মত। সূর্য্য কিরণে "আতস" নামক প্রস্তর রাখিয়া দিলে যেমন অংশু সমূহ সঙ্কর্ষিত হইয়া কেন্দ্রীভূত হয়, তদ্বৎ মলিনতা-পরিশূন্য বিশুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্মতেজ সঙ্কর্ষিত হইয়া কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিতি করে। আতস প্রস্তরের কেন্দ্রীকরণ শক্তিবলে এমন এক অসাধারণ তেজের উৎপত্তি হয় যে, ঐ প্রস্তরের নিকটে তুলা, শোলা, কাগজ, বস্ত্র প্রভৃতি উপস্থিত করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। নির্ম্মল হৃদয়ের কেন্দ্রীকরণ সামর্থ্য থাকায় তাহাতে এমন এক অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে যে, সেই শক্তি দ্বারা সাধক পুরুষ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া উঠেন এবং বিবিধ প্রকার অদ্ভুত শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। হিম ঋতুতে ভূগর্ভে অথবা গিরি-গুহায় বিষাক্ত উরগগণ যেমন তৎস্থানের যাবতীয় বায়ুকে সঙ্কর্ষণ করিতে পারে,নির্ম্মল-হৃদয় ব্যক্তি তাঁহার হৃদয়ের কেন্দ্রীকরণ শক্তির সহায়তায় সমুদয় জ্ঞান ও সমুদয় পদার্থ এবং সমুদয় কামনাকে সঙ্কর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। এই জন্য বেদান্ত কহেন, "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির পরে ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভ এবং ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইও। এই জন্যই যোগবিদ্যা-ভিজ্ঞ মহাযোগী পাতঞ্জল লিখিয়াছেন "অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরোধের নাম যোগ।" তাহা চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন কদাপি সম্ভব-পর নহে।

যাহা হউক, অতঃপর শ্রীহরি তাঁহার ভক্তাধিক ভক্ত বালযোগী ধ্রুবের সম্মুখে শুভাগমন করিলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। যে দিব্য সুন্দর মূর্ত্তিকে ধ্রুব হৃদয় মধ্যে নিরঞ্জন রূপে ধ্যান করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই সর্ব্ব-শক্তিমান প্রভু করুণাবশতঃ ভক্তের সম্মুখে সগুণ ( সাকার ) রূপে দর্শন দিলেন। বালযোগী শ্রীহরিকে সম্মুখে দেখিয়া যে স্তব করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম মূল ভাগবত হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ধ্রুব কহিলেন "হে পরাৎপর পরমেশ্বর! হে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ! হে সর্ব্বব্যাপী প্রেমনিদান! আপনি অনাদি ও অনন্ত, সুতরাং আপনাকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি। হে ভগবান! মনুষ্য মুক্ত বা যুক্ত হউন, আপনি সকলেরই উপাস্য॥ আপনার কৃত উপকার আমরা অকৃতজ্ঞের ন্যায় কেমনে বিস্মৃত হইতে পারি? হে প্রভো! যাহারা আপনাকে মুক্তি ভিন্ন অন্য উদ্দেশে পূজা করে, তাহাদিগের বুদ্ধি নিশ্চয়ই মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে। হে প্রভো! বিষয়-ভোগ দ্বারা যে সুখানুভাব হয়, মনুষ্য তাহা নরকেও ভোগ কবিতে পারে, কিন্তু হে অনাথ নাথ! আপনার পাদপদ্ম চিন্তা কিম্বা আপনার ভক্তদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া যে সুখ হয়, তাহাই প্রকৃত অখণ্ড সুখ এবং তাহাই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সকামী হইয়া সাধকেরা যদি দেবতা হইবার জন্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাতেও সুখ নাই, কারণ কালবশে বিমান ভগ্ন হওয়ায় দেবগণও পতিত হয়েন। হে অনন্ত! আমি ভক্তিভাবে প্রার্থনা করি,আমার ভক্তি নিয়তই আপনার প্রতিই উন্মুখী হউক এবং নির্ম্মল চিত্ত সাধুদিগের সাহচর্য্য করুক, তাহা হইলে

আমি আপনার গুণ-কথা রূপ অমৃত পানে মত্ত হইয়া অনায়াসেই সেই দুঃসহ দুঃখভূয়িষ্ঠ ভয়াবহ সংসার-সমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইব। হে পদ্মনাভ! যে সকল সাধুদিগের চিত্ত আপনার পদারবিন্দের সৌগন্ধেরই লোভ করে, যাঁহারা সাধুদিগের সাহচর্য্য লাভ করেন, তাঁহারা নিতান্ত প্রিয় এই দেহকে এবং দেহানুবন্ধী পুত্র কলত্র গৃহ ধন জনাদিকে গ্রাহ্য করেন না। হে দেবাদিদেব! আপনি মুক্ত, জীব বদ্ধ; আপনি শুদ্ধ, জীব মল-দূষিত; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, জীব অজ্ঞ; আপনি আত্মা, জীব জড়; আপনি মহৎ হইতে মহৎ, জীব সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; আপনি পবিত্র হইতে পবিত্রতর, জীব সমূহ পাপী হইতেও অধিকতর পাপী; আপনি সাক্ষী-স্বরূপ, জীবগণ বিকার-ভাব-সম্পন্ন; আপনি অনাদি অনন্ত, জীবের জন্ম ও মৃত্যু আছে, সুতরাং জীবের কি সাধ্য যে সম্পূর্ণরূপে আপনার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই জীব হইতে ভিন্ন। হে ভগবান! হে সচ্চিদানন্দ! যাঁহারা কামনাশূন্য হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ আপনাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে আপনার পাদপদ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভীষ্ট ফল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঠকদিগের বোধ হয় স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, ভক্তবৎসল ভগবান সগুণরূপে অর্থাৎ সাকারভাবে ভক্ত-প্রধান ধ্রুবের নিকটে উপস্থিত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। পাঠকপুঞ্জের মধ্যে যাঁহারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন, অথবা যাঁহারা মত বিশেষের অনুসরণ করিয়া পরমেশ্বরকে কেবল নিরাকার স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে নির্গুণ কখন সগুণ হয় না, তাঁহাদিগের মতিভ্রম সংশোধনের জন্য এস্থলে দুই চারিটী কথা (ব্যাখ্যারূপে) সন্নিবিষ্ট করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। হস্তীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে যেমন তাহার স্তম্ভের ন্যায় পদ, কুলার তুল্য কর্ণ, ক্ষুদ্র চক্ষু, বিপুল বপু এবং দীর্ঘ ও স্থূল দন্তের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়, অথবা "ইংলণ্ডে সপ্তম এডওয়ার্ড বাস করেন" বিশ্বাস করিলে যেমন ইহাও বিশ্বাস করিতে হয় যে, "ইংলণ্ডের সপ্তম এড-ওয়ার্ড ভারতের সম্রাট," তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে ঈশ্বরের গুণ সমূহে বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য, নতুবা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার আমাদের অধিকার থাকে না। ঈশ্বরের অপর নাম "সর্ব্বশক্তিমান"; সর্ব্বশক্তিমানত্ব তাঁহার একটী গুণ (attribute)। সর্ব্বশক্তিমান শব্দের অর্থ কি বুঝিয়া লইয়াছ? ধীরভাবে চিন্তা করিয়া সর্ব্বশক্তিমান শব্দের প্রকৃত ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কি সমর্থ হইয়াছ? যিনি সর্ব্ব (সকল) বিষয়ে শক্তিমান, তাঁহার নাম সর্ব্বশক্তিমান। এস্থলে সর্ব্বশব্দে "সমুদয়" বুঝায়, কিছুই বাদ যায় না। নাগেশ্বর নামক পণ্ডিত যদি একশত বিদ্যার্থীর মধ্যে ৯৮ জনকে শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু বাকী দুই জনকে শিক্ষা দিবার জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না, তাহা হইলে নাগেশ্বর পণ্ডিত সর্ব্ব-বিদ্যাচার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। পরমেশ্বর যদি সকল কার্য্যই করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু নির্গুণ হইয়া সগুণ অর্থাৎ নিরাকার হইয়া সাকার হইতে পারেন না, তাহা হইলে ভগবানের সর্ব্বশক্তিমানত্ব কোথায় রহিল? তাহা হইলে ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান কহিবার অধিকার তোমার কোথায় থাকে? (God is Omnipotent, All-powerful) সম্পূর্ণভাবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান।

সুতরাং ভগবান নির্গুণ হইয়াও গুণময় হইতে সমর্থ; নিরাকার হইয়া সাকার হইতে সমর্থ; ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে, যে কোন কারণে তিনি যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারেন, এইজন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান। স্বল্পমতিবিশিষ্ট লোকেরা একথা বুঝে না এবং বুঝিবার বিদ্যা বুদ্ধিও তাহাদের নাই; তাহাতেই "সাকার ভগবান" এই কথা শ্রবণ মাত্রেই অথবা বিগ্রহ পূজা দর্শন মাত্রেই সেই মতিভ্রষ্টগণ বাতুলের ন্যায় অর্থশূন্য প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে।

(ক্রমশ:)। †

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

## সংশয়বাদ। (৩) *

অদৃষ্ট—চিরকালই অদৃষ্ট (unknown), কখনও জ্ঞানে উহার অভ্যুদয় লক্ষিত হয় না। সুতরাং অদৃষ্টকে আত্মার গুণ বিশেষ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যদি বল, সংস্কার (impression) যেমন স্মৃতি উৎপন্ন করে, সেই প্রকার অদৃষ্টও ভোগ জন্মায়। সংস্কার যেমন আত্মার ধর্ম্ম (property) অথচ জ্ঞানের অগোচর, অদৃষ্টও ঠিক সেই প্রকার। স্মৃতি উৎপন্ন হইলে যেমন সংস্কার কল্পিত হইয়া থাকে, কর্ম্ম না করিয়া ফলভোগ করিতে দেখিলেও তেমনি অদৃষ্ট কল্পিত হইয়া থাকে।

ইহার উত্তর সহজ। সংস্কারটাই একটা আন্দাজী পদার্থ (guess-work), তাহার অস্তিত্ব এখনও সপ্রমাণ হয় নাই। সুতরাং একটী অনিশ্চিত কল্পিত পদার্থ দ্বারা অন্য একটী অনিশ্চিত পদার্থের কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক প্রথা। কে বলিল, স্মৃতির কারণ সংস্কার। সংস্কারকে আত্মাশ্রয়ী বলিলে, স্মৃতির প্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলা উচিত। সংস্কার বিদ্যমান, অথবা স্মৃতি নাই—কারণ বিদ্যমান অথচ কার্য্য নাই, একথা অযৌক্তিক। কারণান্তরের আশ্রয়ে কেবল অনবস্থা (regressions and infirmities) দোষের উৎস সৃষ্টি করা হয় মাত্র।

অদৃষ্ট স্বীকারের অপর হেতু কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ পরিহার চেষ্টা। আত্মাকে অনিত্য বলিলে সদ্যজাত শিশুর দুঃখাদির কারণ থাকে না। অর্থাৎ তাহার দুঃখাদি অকারণ জন্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা অসম্ভব। যাহা জন্য, তাহা কারণ পূর্ব্বক, এই ব্যাপ্তি বলে সুতরাং দুঃখাদির কারণ খুঁজিতে যাইয়া পরিশেষে অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়। এ যুক্তিরও তীক্ষ্ণতা অতি সামান্য। বাস্তবিক কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ পরিহার মানসে অদৃষ্ট স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কারণ প্রকৃত কর্ম্মের ফলভোগ অসম্ভব, একথা কে বলিল? সংসারে অকৃত কর্ম্মের ফলভোগ-দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কত নিরপরাধ ব্যক্তি বিনা অপরাধে দণ্ডভোগ করিতেছে। পক্ষান্তরে কত মহাপাতকী দণ্ডার্হ হইয়াও অপরাধের দণ্ডভোগ করিতেছে না। একজন খুন করিল, হয় ত কোন সাধুকে তাহার দণ্ডভোগ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইতে হইল। আবার দেখ, এক ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করিল,

* এই প্রবন্ধের শেষাংশ ভুলক্রমে এই সংখ্যা নব্যভারতের ৪৮৯ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে; পাঠকগণ অগ্রে এইটী পড়িয়া সেইটী পরে পড়িবেন। ন, স।

† এই প্রবন্ধ আগামী বারে সমাপ্য। লেখক।

অপর একজন তাহার ফলভোগ করিল। যদি বল, ইহাও জন্মান্তরীয় অদৃষ্ট নিবন্ধন—ইহা সুযুক্তি নহে, কারণ কৃতিত্ব ও ভোগের সমানাধিকরণ থাকা। তাহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রত্যক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ উভয় পক্ষই সমর্থন করে, সুতরাং ভোগ মাত্রই যে কৃতি জন্য, এ প্রকার ব্যাপ্তি আদৌ অস্বীকার্য্য। যদি বল, ইহজন্মই শেষ বা প্রথম জন্ম নহে; যদি পাপীকে ইহজন্মে সুখ ভোগ করিতে দেখি—দণ্ডভোগ করিতে না দেখি—পক্ষান্তরে যদি সাধু ব্যক্তিকে নিষ্পাপে দণ্ডভোগ করিতে দেখি—মনে করিতে হইবে, জন্মান্তরে ইহার ন্যায় বিচার হইবে। এ কথা বালভাষিতবৎ তুচ্ছ। কারণ ইহজন্মে যদি অবিচার সম্ভব হইল, পরজন্মেই যে সুবিচার হইবে, তাহার বিশ্বাস কি? ঈশ্বরের রাজ্যে যখন আবার অবিচার ঢুকিয়াছে,ঈশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া—প্রতিবিধানে সক্ষম হইয়া—তাহার নিবারণে চেষ্টিত হন নাই—তখন সে ঈশ্বরের সুবিচারে আর কাহার বিশ্বাস থাকিবে? ইহজগৎটা যে পাপপূর্ণ হইতেই হইবে ও পরকালটা যে ইহার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইতেই হইবে, এমন একটা বাধ্যবাধকতার ভাব কোথা হইতে আসিবে? যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছায় বিশ্বাসী, তাঁহারা সেইটী মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তাহাতে আমাদের কিছু আপত্তি নাই। কিন্তু চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া এমন একটা সুমেরু প্রমাণ বিশ্বাস-বটিকা গলাধঃকরণ করা আমাদের মত রোগীর সাধ্যাতীত।

জন্মান্তর সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা। জন্মান্তরীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার কি? ঈশ্বর, জীবাত্মা, না প্রকৃতি? যদি বল, ঈশ্বর, তবে ঈশ্বরেই তাহার ফলভোগ সম্ভব। যদি বল জীবাত্মা, তবে নিয়ত ফলভোগে বাধা কি? কল্য যে ফলভোগ করিবে, অদ্য তাহা ঘটে না কেন? যদি বল, সংস্কার ফলোৎপাদন বিষয়ে কালসাপেক্ষ, তাহাও ঠিক নহে। কারণ কাল ত নিত্য ও অখণ্ড। তাহার ক্ষণাদি ঔপচারিক বা ঔপাধিক। যদি বল, সংস্কার ফলোৎপাদন সম্বন্ধে ঈশ্বরেচ্ছা সাপেক্ষ, তাহাতেও উক্তবিধ আপত্তি বা দোষ থাকে। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্টে নিয়ন্তৃতার পরস্পরাশ্রয় দোষ সংঘটিত হইতে পারে। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ভাবে কর্ম্মফল দিতে পারেন না, কারণ পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষের সম্ভাবনা হইয়া উঠে; সুতরাং তাঁহাকে জীবের অদৃষ্টকে অপেক্ষা করিতে হয়। পক্ষান্তরে অদৃষ্ট জড়; ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এস্থলে অন্ধ পরম্পরা ন্যায় ব্যতীত অব্যাহতি পাওয়া সুকঠিন।

আরও দেখ, অদৃষ্ট কর্ম্ম জন্য। কর্ম্ম ব্যতীত অদৃষ্ট জন্মিতে পারে না। অদৃষ্ট অর্থেই জীবকৃত কর্ম্মফল। আবার অদৃষ্ট দ্বারা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। এই প্রবাহ বা ধারা (series) অনাদি (without a beginning) সুতরাং এ হিসাবে পুরুষকারের কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। গীতায় একটী শ্লোক আছে, তাহার মর্ম্ম কতকটা এরূপ। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" ইহার অর্থ এই—জীব নিজকৃত কর্ম্মফল দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে, অর্থাৎ অদৃষ্টই জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়। কাহার সাধ্য—ইহার বিঘ্ন ঘটায়! অদৃষ্ট-স্রোতে জীব ভাসিয়া যাইতেছে—কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে। ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নূতন অদৃষ্ট আর উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না—জীব যাহা কিছু করিতেছে, অদৃ-

ষ্টের বেগ (inertia) বশতঃ। যখন পুরুষকারের স্থলই থাকিল না—তখন নূতন অদৃষ্টের আরম্ভ হইবে কি প্রকারে? অদৃষ্টের দৈনিক লয় ও উৎপত্তি বুঝিবার উপায় কি? পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম এ হিসাবে নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়।

আর এক কথা। যাহা অনাদি তাহা অজন্য। যাহা অজন্য তাহা কারণ নিরপেক্ষ। দেখ, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের যে অভাব থাকে, সে অভাবটা অনাদি (without a beginning) অতএব অজন্য। যদি অজন্য, তবে অবশ্যই কারণ নিরপেক্ষ। যদি অদৃষ্ট ও কর্ম্মকে অনাদি বল, উহাকেও কারণ নিরপেক্ষ বলিতে হইবে। সুতরাং উহাদ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি দুর্ঘট। যদি বল, অদৃষ্ট ও জন্ম-প্রবাহটা অনাদি—তাহাও ঠিক নহে। কারণ প্রবাহের অনাদিত্ব কল্পনা ও অনবস্থা দোষ স্বীকার একই পদার্থ। যেখানে প্রবাহ কল্পনা, সেখানেই এই অনবস্থা দোষ দুষ্পরিহার্য্য। তবে অনবস্থা না বলিয়া অনাদি বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে—জ্ঞানাভিমান ভঙ্গভীতি মাত্র। যদি কোন একটা শব্দের প্রয়োগে আপনার অজ্ঞান ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায়—কোন মূর্খের সাধ সে শব্দের প্রয়োগে বিরত থাকে! যেখানে নিরুত্তর লজ্জাকর, সেখানে দুই একটা প্রকাণ্ড শব্দের প্রয়োগ চতুরের কার্য্য, সন্দেহ নাই। প্রবাহ কল্পনায় এরূপ ঘটে কেন? তাহার উত্তরে বলা যায়—কার্য্য কারণ সম্বন্ধের নিয়মই এইরূপ। যেখানে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ, সেখানেই ভাবনার স্রোত অনবস্থার দিকে ধাবমান। ভাবনা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, মন যখন অবশ হয়—তখন "অনাদি" শব্দটা প্রয়োগ করিয়া আমরা যেন কতকটা আশ্বস্ত হই। যাহা হউক, অদৃষ্ট শব্দটা বড়ই গোলমেলে।

আরো দেখ। জন্ম-কর্ম্ম-প্রবাহকে অনাদি স্বীকার করিলে তাহার কার্য্য জননোচিত শক্তিকেও অনাদি স্বীকার করা উচিত। তাহা স্বীকার না করিলে উক্ত প্রবাহ স্বীকারই নিরর্থক হইয়া পড়ে ও কারণান্তর স্বীকার করিতে যাইয়া আবার অনবস্থায় উপনীত হইতে হয়। যদি কার্য্যজননোচিত শক্তিকে অনাদি বল, তাহা হইলে ভোগের ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিভাগ নিরর্থক হয়। যে কারণে দুই বৎসর পরে আমার মৃত্যু হইবে, সে কারণ ত প্রবাহের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, প্রবাহও বর্ত্তমান, তবে অদ্য আমার মৃত্যু না হয় কেন? যদি বল, মৃত্যু আনয়নকারী ব্যাধি নাই, সুতরাং মৃত্যু হইতেছে না। সে কথাও ঠিক নহে। ব্যাধি এখন নাই কেন? যদি বল, অদৃষ্ট ব্যতীতও কারণান্তর সংঘটিত না হইলে কার্য্যোৎপত্তি হয় না—তাহাও ঠিক নহে। জিজ্ঞাসা করি, কার্য্য-কারণ প্রবাহটা আদিমান কি অনাদি? যদি বল, আদিমান, তাহা হইলে এক সময়ে উহার আরম্ভ হইয়াছে। যদি আরম্ভ স্বীকার কর, তাহা হইলে জন্ম-কর্ম্ম-প্রবাহকেও সাদি স্বীকার করা উচিত, কারণ উহা কার্য্য-কারণ রূপ ব্যাপক নিয়মের অন্তর্গত। যদি বল, কার্য্য কারণ প্রবাহ অনাদি, তাহা হইলে উক্ত কারণান্তর সংঘটন আপত্তি নিরর্থক।

কেহ কেহ অনবস্থাকে স্থলবিশেষে সদোষ ও নির্দ্দোষ মনে করেন, সেটা অবৈজ্ঞানিক, সন্দেহ নাই। যাহা দোষ, তাহা সর্ব্বত্র সকল সময়েই দোষ। তোমার আমার আবশ্যক মত সদোষ নির্দ্দোষ নহে। বীজ অঙ্কুর দৃষ্টান্তটী কেবল অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত মাত্র। অদৃষ্টও

সেই প্রকার অজ্ঞতার আচরণ। অদৃষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তে "অজ্ঞাত" শব্দটার ব্যবহারই ন্যায়-সঙ্গত। (ইহার পর ৪৫৯ পৃ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

---

# ক্রমবিকাশ। (৩)

## ঘ। মানব সৃষ্টি।

ইহাদের আহার সঞ্চার নিম্নগামী বলিয়া ইহাদিগকে অর্ব্বাক স্রোতঃ বলে। এই সর্গ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

(১) "রজোধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ।"
(ভাগবত—৩-১০-২৬)

অর্থাৎ এই জাতীয় জীবে রজোগুণই অধিক, এইজন্য ইহারা কার্য্যে তৎপর এবং দুঃখেও সুখ অনুভব করে।

(২) তে চ প্রকাশ বহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
তস্মাৎ তে দুঃখ বহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে॥
(বিষ্ণুপুরাণ ১-৫-২৬-২৭

অর্থাৎ ইহারা প্রকাশ-বহুল, তমোদ্রিক্ত ও রজোধিক। এইজন্য ইহারা দুঃখ-বহুল, ভূয়োভূয়ঃ কর্ম্মচারী, বহিরন্তঃ প্রকাশ ও সাধক। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে,—

"সাধকাঃ কর্ম্ম জ্ঞানাধিকারিত্বাৎ।"

অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্ম এবং সাধনা ও জ্ঞান দ্বারা জীবের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়াই মনুষ্যের উৎকৃষ্ট অধিকার।

(৩) তত্র প্রকাশবহুলা তমোদ্রিক্তা রজোধিকাঃ।
দুঃখোৎকটাঃ সত্ত্বযুক্তা মনুষ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
(কূর্ম্ম—পূর্ব্ব—৭ ১০)

অর্থাৎ, ইহারা প্রকাশ বহুল, তম-উদ্রিক্ত, রজোধিক, দুঃখোৎকট ও সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্য নামে কীর্ত্তিত।

সমুদয় জীব সকলকে মনু চারভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও স্থাবর। জীবগণের মধ্যে পশু, মৃগ, হিংস্র জন্তু, দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট জন্তু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্য—ইহারা জরায়ুজ, অর্থাৎ গর্ভকোষে জন্ম গ্রহণ করে। পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ এবং এবম্প্রকার স্থলজ নকুলাদি ও জলজ ভেকাদি—অণ্ডজ অর্থাৎ অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দংশ, মশক, যূক, মক্ষিক, মৎকুণ, ইহারা স্বেদজ এবং ইহাদের সদৃশ অপরাপর পিপীলিকাদি প্রাণিগণও উহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সমুদায় উদ্ভিদই স্থাবর। *

এখন মনুষ্য ও অপরাপর প্রাণিগণের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা অবগত হইতে হইবে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
জ্ঞানাং নরাণামধিকোবিশেষঃ জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিস্-মানঃ।"

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিতাহিত জ্ঞান লইয়াই মনুষ্য, পশু হইতে বিভিন্ন। যাহাকে যথার্থ মনুষ্য বলিতে পারা যায়, সেই হিতাহিত-জ্ঞান-সম্পন্ন জীবের কথা ভাগবতে এইরূপে উল্লিখিত আছে,—

"অর্যম্নো মাতৃকাপত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্রৈব মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা।

অর্য্যমা, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন আদিত্য। তাঁহার পত্নী মাতৃকা। তাঁহার পুত্র চর্ষণিগণ। এই চর্ষণিদিগের মধ্যেই ব্রহ্মা, মনুষ্য জাতির কল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীধর স্বামী উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে,—

"চর্ষ চঃ কৃতাকৃতজ্ঞান বস্তঃ। পশ্যন্তি কর্ম্মত্বেন

* মনুসংহিতা—১-৪২ হইতে ৪৬ শ্লোক।

নির্ঘণ্টাদাবুক্তেঃ। যত্র যেষু আত্মানুসন্ধান বিশেষণে মানুষী জাতিশ্চোপকল্পিতা।

অর্থাৎ কৃতাকৃত জ্ঞান-সম্পন্নকে চর্ষণি বলে। নির্ঘণ্ট অনুসারে চর্ষণির অর্থ বিচারশীল। চর্ষণি আদিত্য অর্য্যমার পুত্র। বিচারশীল মন লইয়াই আমাদিগের সহিত আদিত্য অর্য্যমার সম্বন্ধ। যখন আমরা বিচারশীল মন লাভ করিয়া থাকি, তখন আমরা চর্ষণি শব্দে অভিহিত হইতে পারি। সেইজন্য শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে,—"আত্মানুসন্ধান বিশেষণ মানুষী জাতিশ্চোপকল্পিতা।" এই আত্মানুসন্ধানের নাম আত্মজ্ঞান self-consciousness আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, স্থাবর অথবা তির্য্যকযোনিতে এই আত্মজ্ঞানের self-consciousness অভাব আছে। উহাদের অন্তরে চৈতন্য consciousness বর্ত্তমান আছে। এ বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় জীবন তরঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে কথিত হইবে।

আমরা পূর্ব্বে ব্রহ্মার চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি স্থাবরাদি যোনি সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাদিগকে বিষ্ণুপুরাণ "মানসাস্ত তাঃ" (১—৫—২৭) অর্থাৎ মানস সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিকে Ideal types of formsএর সৃষ্টি বলা হয়। দ্বিতীয় পুরুষ প্রাণ ও চিৎশক্তি দ্বারা ইহাদিগকে প্রকাশমান স্থূল সৃষ্টিতে পরিণত করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার কার্য্য যে কি, তাহা আমরা অবগত হইলাম। প্রথম জীবন-তরঙ্গ প্রভাবে বিশ্বের উপকরণ সমূহ এবং সুর, অসুর, খনিজ, উদ্ভিদ্, জন্তু এবং মনুষ্যের ideal types গঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মা ও তাঁহার সৃষ্টি কার্য্য সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"He out of the infinite capacity of his multitude of a vibratory powers, gives a certain portion to the matter of a particular system in a particular cycle of evolution. This capacity is stamped on matter by the Third Logos, and is ever maintained in matter by his life infolded in the atom. Thus is formed the fivefold field of evolution in which consciousness is to develop. This work of the Third Logos is usually spoken of as the First Life Wave."—*Studies in consciousness*, P. 31.

### দ্বিতীয় জীবন তরঙ্গ।

### ( SECOND LIFE-WAVE )

শিবপুরাণে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, যখন চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় অণ্ড উৎপন্ন হইল, তখন ব্রহ্মা সেই অণ্ডকে ঘনীভূত দেখিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বিষ্ণুধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশ বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তখন সেই স্থানে বিষ্ণু আবির্ভাব হইলে, তিনি বলিলেন যে "আমি এই অণ্ডকে জড়রূপ দেখিতেছি, অতএব আপনি ইহার প্রাণস্বরূপ হইয়া অদ্য ইহাতে চৈতন্যের সঞ্চার করুন।" ব্রহ্মা এই কথা বলিলে বিষ্ণু অনন্তরূপে সেই অণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রনেত্র, সহস্র চরণ বিশিষ্ট হইয়া একটী পুরুষের আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক সেই অণ্ড ব্যাপিয়া রহিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব মিলিত না হওয়াতে শরীর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্তর ভগবান বিষ্ণুর শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহার ভাবাভাব অবলম্বন করিয়া সমষ্টিময় ও ব্যষ্টিময় উভয়বিধ শরীরকে সৃষ্টি করে। এই ব্রহ্মাণ্ড সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত জলে শয়ান হইয়া থাকিলে পর, চৈতন্যদাতা পরমাত্মা বিষ্ণু অদৃষ্ট, চর্ম্ম ও স্বভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন।

সুতরাং আমরা অবগত হইতেছি যে, ভগবানের যে বিভাব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি (forms) সকল ধারণ ও পালন করিবার জন্য প্রাণ শক্তি এবং তাহার সহিত চিৎশক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেই বিভাবকেই বিষ্ণু আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাঁহা হইতে যে জীবন তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, তাহাকেই দ্বিতীয় জীবন তরঙ্গ বলা হয়। ব্রহ্মা সমুদয় প্রাণির জড়াত্মক ideal types প্রস্তুত অর্থাৎ মানস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সেই সকলের ভিতর প্রাণ ও সংবিৎ শক্তি প্রদান করিয়া উহাদিগকে জীবন্ত organised আকারে পরিণত করিয়া পালন করিতেছেন। দ্বিতীয় জীবন তরঙ্গ প্রভাবে বিভিন্ন আকার সমূহের ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে।

ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্।
বিবভাজাত্মনা ত্মান মেকধা দশধা ত্রিধা।" ৩-৫-৬

অর্থাৎ বিরাট ভগবান্ বিষ্ণু দৈবশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি প্রভাবে আপনাকে হৃদয়াবিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে একধা, ক্রিয়া প্রভাবে আপনাকে প্রাণ,আপন নাগ কূর্ম্মাদি দশবিধ প্রাণরূপ বৃত্তিভেদে দশধা এবং ভোর্ক্তৃশক্তি প্রভাবে আপনাকে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব ভেদে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ খনিজে ও উদ্ভিদে পুরুষের চৈতন্য কেবল প্রাণরূপেই প্রকাশিত হয়। পরে তিনি পশু ও পক্ষীর দেহবিশিষ্ট জীবে ইন্দ্রিয় জ্ঞান রূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়-গহ্বরে তিনি আপনাকে প্রকাশিত করেন। এই স্থলে ক্রমবিকাশের ক্রম উল্লিখিত হইয়াছে। খনিজ ও উদ্ভিজ্জে চৈতন্য, দশ প্রকার প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশ পায়; পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবে প্রাণরূপে এবং উভিন্ন অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবভেদে তিন প্রকার ইন্দ্রিয় জ্ঞান রূপে প্রকাশ পায়; কিন্তু মনুষ্যে চৈতন্য, ঐ দুই প্রকার অবস্থা ভিন্ন সংবিৎরূপেও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তৃতীয় ও দ্বিতীয় পুরুষ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"The materials prepared by the Third Logos are woven by the second Logos into threads and into cloths of which future garments --the suttle and dense bodies will be made. As a man may take separate threads of flax, cotten, silk—themselves combinations of a simple kind—and weave these into linens, into cotten or silk cloth, these cloths in turn to be shaped into garments by cutting and stitching, so does the Second Logos weave the maten threads, weave there again into issues, and then shape them into forms. He is the Eternal weaver, while we might think of the Third Logos as the Eternal chemist. The latter works in nature as in laboratory, the former as in a manufactory. These similes materialistic as they are, are not to be despised, for they are crutches to aid our limping attempts to understand. This weaving gives to maten its charac. teristics, as the characteristics of the thread differ from those of the threads .. ......We must think, then, of its Second Logos work as that of forming combinations which shew qualities, and so we semetimes speak of this work as the giver of qualities.

Studies in Consciousness, pp. 73, 74.

তৃতীয় পুরুষ হইতে আমরা আমাদের জীবনের অসংস্কৃত raw উপাদান সকল পাইয়াছি। তত্ত্ব ও তন্মাত্রাদি উদ্ভূত হইল বটে, কিন্তু উহাতে জীবসংস্থান হইবে না বলিয়া, দ্বিতীয় পুরুষ বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন লোক রচনা করিলেন। ইহার ফলে পূর্ব্বোক্ত অসংস্কৃত raw উপাদান সকলের ব্যবহারে আনিবার জন্য, আমরা কার্য্য করিবার ইন্দ্রিয়াদি রূপ যন্ত্রাদি এবং সুবিধা পাইয়াছি। প্রথম পুরুষ প্রতি জীবের আত্মারূপে বিরাজিত। দ্বিতীয় পুরুষ হইতে আমরা জ্ঞান consciousness পাইয়াছি, কিন্তু প্রথম পুরুষ

হইতে আররা আত্মজ্ঞান self-consciousness পাইয়াছি।

## তৃতীয় জীবন তরঙ্গ।

কূর্ম্ম পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,

"ততোদেবাসুরপিতৃন্ মনুষ্যাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুর্ভরবানীশঃ স্বমাত্মানম যোজয়েৎ।"
( পূর্ব্ব—৭—৩৮ )

অর্থাৎ ভগবান্ শিব, দেব, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্য,এই চারি জাতীয় জীব সৃষ্টি করিতে বাঞ্ছা করিয়া তাহাতে আত্মা যোজিত করিলেন। উক্ত চারি প্রকার আকৃতির সহিত জীবাত্মা যোজনা করা প্রথম পুরুষ মহাদেবেরই কার্য্য। তৃতীয় জীবন-তরঙ্গ প্রভাবে মনুষ্য জীবত্মা পাইয়াছে এবং আত্মজ্ঞান self-consciousnessলাভ করিয়াছে।

ভগবান্ জীবাত্মার বহনোপযোগী যতগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে একটীতেও সন্তুষ্ট হন নাই। যখন মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় মনুষ্য অসাধক নহে। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে, "কর্ম্ম-জ্ঞানা-ধিকারিত্বাৎ সাধকাঃ।" যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা এবং সাধনা ও জ্ঞানের দ্বারা আত্মরূপ অবগত হওয়াই মনুষ্যের উৎকৃষ্ট অধিকার। এই মানব শরীর ধারণ করিয়া অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করাই মনুষ্যের দ্বারা সম্ভবপর।

মনুষ্য যাহাতে অন্যান্য জীবের উপর নিজ মর্য্যদা স্থাপন করিতে পারে, এই জন্য ব্রহ্মা অনুগ্রহ সর্গ নামক পঞ্চমসৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহার দ্বারা মানবের প্রতি চারি প্রকারে অনুগ্রহ করা হইয়াছিল। যথা,—

"পঞ্চমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্ধা ব্যবস্থিতঃ।
বিপর্য্যয়েণাশক্ত্যা চ সিদ্ধ্যা তুষ্ট্যা সথৈবচ।
পদ্ম ও মৎস্যপুরাণ।

অর্থাৎ পঞ্চম সৃষ্টির নাম অনুগ্রহ সৃষ্টি। উহা চারি প্রকার; বিপর্য্যয়, অশক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টি।

অর্থাৎ, স্থাবরের বিপর্য্যয় বা বাধ, পশ্বাদির অশক্তি, মানবের সিদ্ধি, এবং দেবাদির তুষ্টি। এই চারি প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা মনুষ্য চারি প্রকার উপকার লাভ করিল। বৃক্ষাদি বাধ দ্বারা এবং পশ্বাদি অশক্তি দ্বারা বদ্ধ হওয়াতে তাহাদের উপর মানবের প্রাধান্য হইল। দেবাদির তুষ্টি আছে, কিন্তু মনুষ্যের সে তুষ্টি নাই; এই অতুষ্টিই মনুষ্যের মনে বৈরাগ্যের উদয় করিয়া দিল। তাহার ফলে মনুষ্য সাধন পথে অগ্রসর হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিল এবং মুক্তির অধিকারী হইল। এই প্রকারে মনুষ্য সর্ব্ব জীবের উপর আধিপত্য করিবার অধিকার পাইল।

মনুষ্য এখন যে আকারে রহিয়াছে, তাহা তাহার আদিম অবস্থার আকারের ন্যায়। বর্ত্তমান আর্য্যবংশ ( Aryan Race ) বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, মনুষ্য অন্যান্য আকারের এবং অন্যান্য বংশীয় হইয়াছিল। এই সকল বংশের মধ্যে দানব, দৈত্য এবং রাক্ষসের বংশই বিখ্যাত। মনুষ্য যখন দানব ও দৈত্য অকারেই পৃথিবীতে বাস করিত, তখন তাহার আদিম অবস্থা ছিল। সেই সময় তাহার আকৃতি অতি বৃহৎ ও অতি ভীষণ ছিল। এবং তাহার তখন এত সামর্থ্য ও বল ছিল যে,সে দেবতার সহিতও যুদ্ধ করিত। মনুষ্যের অপর এক আদিম জাতির নাম রাক্ষস ছিল। ইহারা কদাকার,নিষ্ঠুর,নর মাংসভোজী, এবং অসীম সত্যসম্পন্ন ছিল। ইহারা অনেক যাদুবিদ্যা অবগত ছিল। মনুষ্যের এই সকল আদিম জাতি বহুপূর্ব্বে পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।

দ্বিতীয় জীবন তরঙ্গ প্রভাবে মনুষ্য, জন্তু এবং উদ্ভিদের স্থূল শরীর অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ গঠিত হয়। তৎপরে মনুষ্য এবং জন্তুদের ভুবর্ল্লৌকিক (Astral) শরীর সম্পূর্ণ রূপে এবং উদ্ভিদের অর্থাৎ ঐ শরীর অঙ্কুর অবস্থায় গঠিত হয়। তৎপরে মনুষ্যের স্বর্ল্লোকীয় শরীর অর্থাৎ মনোময় কোষ গঠিত হয় এবং জন্তুদের ঐ শরীর ঈষৎ অঙ্কুর অবস্থায় গঠিত হয়। এই স্থলেই দ্বিতীয় জীবন তরঙ্গের বেগ প্রকাশিত হইয়া যায়। তৎপরে মহাদেব তৃতীয় জীবন তরঙ্গে মনুষ্যের মনোময় কোষের সহিত জীবাত্মা সংযুক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জীবন তরঙ্গ একত্রিত হইয়া মনুষ্যের কারণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কারণ শরীরে মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে ভোগ করিয়া থাকে।

জান্তব রাজত্বে এই তৃতীয় জীবন তরঙ্গের অভাব দৃষ্ট হয়। এই জন্য মনুষ্য ও জন্তুদের মধ্যে এত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জন্তুদের চেতনা সজ্ঞান (consciousness) আছে, কিন্তু মনুষ্যের আত্মজ্ঞান self-consciousness আছে। এই জন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

The human mind devolopes self-consciousness and is ready to complete the circle of evolution, to merge in the logos as a living, self-censcious eternal centre able to share the consciousness of God.

এই জন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য জাতিই কেবল মাত্র সাধক। তাহারা সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিজের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

তৃতীয় জীবন-তরঙ্গ প্রভাবে মনুষ্যের আত্মা বিভিন্ন কোষের দ্বারা আবৃত হইয়া বিভিন্ন লোক বা ভূমিতে কার্য্য করিয়া থাকে যথা

| যে লোক | যে কোষে কার্য্য করে |
| --- | --- |
| ভূঃ | অন্নময় প্রাণময় |
| ভুবঃ।<br>স্বঃ। | মনোময় |
| মহঃ | বিজ্ঞানময় |
| জন | |
| তপ | আনন্দময় |
| সত্য | |

যখন মনুষ্যের সংবিতের বোধ হয় না, তখন মনুষ্য সংবিৎ বজায় রাখিয়া এক ভূমি হইতে অন্য ভূমিতে এবং এক কোষ হইতে অপর কোষের সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ করিতে তাহার অসংখ্য জন্ম অতীত হয়, তৎপরে সে যখন ঐ ক্রমবিকাশের উচ্চ সোপানে নীত হয় তখন তাহার অদ্বৈত জ্ঞান জন্মে এবং সে তখন বুঝিতে পারে যে, একই ভগবান অনন্ত প্রকারে অনন্ত জবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানই মনুষ্যের ক্রমোন্নতির শ্রেষ্ঠ অবস্থার পরিচায়ক।

শ্রীআশুতোষ দেব।

# উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

## আত্মোপনিষৎ।

(প্রথম খণ্ড)

ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ত্রিবিধ প্রকার আত্মা, করহ বিচার;
বাহ্য আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা আর।
যাহে চতুর্ব্বিংশতি (১) আছে বিদ্যমান,

(১) ত্বক্, অস্থি, মাংস, মজ্জা, লোম, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, পৃষ্ঠবংশ, নখ, গুল্ফ, উদর, নাভি, মেঢ্র, কটি, উরু, কপোল, ভ্রূ, ললাট, বাহু, পার্শ্ব, শির, ধমনিকা, অক্ষি, শ্রোত্র—এই চতুর্ব্বিংশতিটী।

ছ'.অবস্থা (২)যার, বাহ্য আত্মা তার নাম।(৩)

ইতি প্রথম খণ্ড।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বাদশ যোগেতে (৪) যিনি হয়েন চালিত,
স্মৃতি আর লিঙ্গ (৫) রূপে যিনি পরিচিত,
পঞ্চবিধ (৬) স্বর যাঁর; আঘ্রাণ, শ্রবণ,
আস্বাদ গ্রহণ করি করেন মনন;
যিনি বোদ্ধা, যিনি কর্ত্তা, যিনি জ্ঞানময়;
যিনি পুরাণাদি (৭) চারি শাস্ত্রের বিষয়;
শ্রবণ, আঘ্রাণ, আর আকর্ষণ আদি
করিয়া সাধেন কর্ম্ম যিনি নিরবধি;—
অন্তরাত্মা তার নাম (৮) প্রকাশ অন্তরে,
বিশ্বলীলা তারই কর্ম্ম, তিনি কর্ম্ম করে।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড।

## তৃতীয় খণ্ড।

পরমাত্মা অক্ষর; বেদ বিধি মতে
তাঁহারে জানিতে হয় নির্ম্মল মনেতে
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সমাধি, যোগের
অনুষ্ঠানে নির্ম্মল করিবা মনের।
এই ভাবে মন শুদ্ধ হইলে মানব
বিশুদ্ধ মনেতে তাঁরে করে অনুভব।
বটকণা হ'তে যথা বটবৃক্ষ হয় (১)
শ্যামাক (২) তণ্ডুল হ'তে গুচ্ছ প্রকাশয়,
অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হ'তে সেই মত
হইয়াছে উদ্ভব নিখিল জগত।
কেশাগ্র শত-বিভাগ করিলে যেমন,
সেই মত পরমাত্মা না হয় দর্শন।
ইন্দ্রিয় যোগেতে তাঁরে প্রত্যক্ষ না হয়,
কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় হয় পরাজয়।
তাঁর নাহি জন্ম মৃত্যু, শোষণ, পচন,
নাহিক ছেদন, ভেদ, দাহন কম্পন।
তাঁর নাহি ক্রিয়া; তিনি সাক্ষী, গুণহীন,
তিনি আত্ম-সিদ্ধ, শুদ্ধ, নিষ্কল, প্রাচীন;
অখণ্ড, সু-সূক্ষ্ম, তিনি, তিনি নিরাকার;
নির্ম্মল, নিরভিমান; ভেদ নাহি তাঁর।
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-হীন তিনি,
অমনা,(৩) আকাঙ্ক্ষা শূন্য; তাঁরে বুঝে জ্ঞানী
অচিন্ত্য সে সর্ব্বব্যাপ্ত; তাঁহার চিন্তনে (৪)
অপবিত্র, কি অশুদ্ধ। (৫) হয় সেই ক্ষণে

(২) জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয়, নাশ—এই ছয়টী।

(৩) অর্থাৎ স্থূল দেহই বাহ্য আত্মা। ভাব এই যে, স্থূল দেহ আত্মার বাহ্য বিকাশ।

(৪) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, মোহ, কল্পনা, এই দ্বাদশটী।

(৫) চিহ্ন। বস্তু পদার্থের চিহ্ন দ্বারাই স্মৃতিবদ্ধ মূল হয়। ভাবেরও তাহাই।

(৬) উদাত্ত, অনুদাত্ত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত,—এই পঞ্চ স্বর।

(৭) পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র।

(৮) আত্মার বাহ্যবিকাশ দেহ, তাহা প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে। আত্মার যে অবস্থায় কর্ম্ম করে, এবং বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া সুখ দুঃখাদি বোধ করে; আত্মা যে অবস্থায় লিঙ্গ ও স্মৃতি যুক্ত; যে অবস্থায় ভাবময় (ধর্ম্মভাবও ইহার অন্তর্গত); যে অবস্থায় বুদ্ধি ও জ্ঞান যুক্ত; সেই অবস্থাকে অন্তরাত্মা বলে।

(১) জন্মে।

(২) তৃণ ধান্য, শ্যামা ঘাসের ধান।

(৩) যাহার মন নাই।

(৪) তাঁহার রূপ, কিম্বা উপাধি বিশেষ ভাবে চিন্তা করা যায় না; কিন্তু সর্ব্বব্যাপ্ত রূপে তাঁহার সত্ত্বা, তাঁহার অস্তিত্ব, মননের দ্বারা অনুভব করা যায়।

(৫) অপবিত্র—পাপাদি যুক্ত। অশুদ্ধ—চণ্ডালাদিবৎ।

—এই উপনিষদে জীবের দেহ ও মন ইত্যাদি সমস্ত আত্মার বিকাশ মাত্র, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সুপবিত্র, অতি শুদ্ধ, তাঁহার কৃপায়
পাপীর সে পাপ রাশি ভস্ম হ'য়ে যায়।
সর্ব্বভূত ক্ষর; সর্ব্বভূত মাঝে
কূটস্থ হইয়া যে জন বিরাজে,
নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পূর্ণ, পরমাত্মা তিনি;
অচিন্ত্য, তথাপি তাঁরে জ্ঞানে বুঝে জ্ঞানী।
তাঁরে জ্ঞানে বুঝে জ্ঞানী॥
॥ ওঁ তৎসৎ॥
ইতি আত্মোপনিষৎ সমাপ্ত॥

---

## তেজোপনিষৎ।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।

শিব, শক্তি, দুই তেজ; ইন্দ্রিয়ের অগোচর,
স্থূল, সূক্ষ্ম, গূঢ়, বিশ্বাতীত;
মহাফল লভে নর এ দুই শক্তির ধ্যানে।
এই শক্তি সর্ব্ব হৃদে স্থিত।
দুই শক্তি এক হ'য়ে প্রণব নামেতে খ্যাত,(১)
অতীব দুঃসাধ্য তা'র ধ্যান;
হৃদয়ে সাহস ল'য়ে অগ্রসর হও তাহে,
দুরারাধ্য নির্বিষয় জ্ঞান।
সে ধ্যানের নাহি শেষ, কত কষ্ট, কত ক্লেশ,
সে ধ্যান সহজ কভু নয়;
মুনী ও মনীষিগণ নাহি পায় দরশন,
সেই মহাধ্যান দুরাশ্রয়।
পরিমিত হিতাহার (২) সুসংযম, সদাচার,
শুদ্ধ হও হ'য়ে জিতেন্দ্রিয়;
ক্রোধ রিপু জয় কর, সঙ্গ-ইচ্ছা পরিহর,
তুচ্ছ কর প্রিয় ও অপ্রিয়।
অহংকার দূরে রাখ, অঙ্গে গুরুভক্তি মাখ,
বদ্ধ নাহি হও বাসনায়;
হউক কঠিন অতি, সেই ধ্যানে দৃঢ়মতি
ভক্তি লয়ে রত হও তা'য়।
বিষয়ে আশক্তি ছাড়ি, ধ্যানে মতি স্থির করি,
ভক্তি কর গুরু উপদেশে;
অনাশক্তি, ভক্তি, মতি,— এ তিনের সংহতি
ধ্যানে হ'বে সিদ্ধি অবশেষে।
এ কারণ যোগিগণ "ত্রিধামা" নামেতে এই
ধ্যানেরে করেন অভিহিত,
প্রণবের এই ধ্যানে ধেয় সেই ব্রহ্ম বস্তু,
এই সার জানিবা নিশ্চিত।
সেই বস্তু গূঢ় অতি, বিষ্ণুরও পরম গতি
এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আধার;
অব্যক্ত পরম সূক্ষ্ম ব্যোমরূপ (৩) সেই ব্রহ্ম,
সত্তা মাত্র তিনি সারাৎসার।

(১) প্রণব—অ, উ, ম এই তিন নাদ। ইহারা তিনে দুই, কারণ মাণ্ডুক্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, (উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ, ৬৫ পৃষ্ঠা)

"মকার যেমন শেষ, অ—উ—পরিণতি। সুতরাং ম-কার যদ্যপি অ-কার, এবং উ-কারের পরিণতি মাত্র হইল, তবে তিন অক্ষর দুই এ পরিণত হয়। এই দুই নাদ শিব, এবং শক্তি, এতদুভয়ের অনুতাপ। 'শিব এবং শক্তি' বলিতে আমি স্ত্রী এবং পুং ভাব বুঝি। এই ভাবেই প্রকৃতি ও পুরুষ অনুমিত হইয়াছে। এই দুই ভাবই সম্মিলিত অবস্থায় এক; এবং তাহা হইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, এই দুই ভাবের একটী কৃত সাম্যাবস্থাই মৌলিক অবস্থা; ইহার অসমতাতেই ক্রিয়া, সুতরাং জগৎ।

(২) হিতজনক আহার।

(৩) বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ (Lord kelvin, Prof. Lodge, Prof. Righi &c) সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এক অতীব সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপ্ত অব্যক্ত পদার্থ দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ। ঐ পদার্থের অব্যক্তাবস্থায় তাহার কোন কোন দেশে ঘূর্ণ পাকের ন্যায় চক্র (vertex motion) উৎপন্ন হইয়া সেই সকল দেশ ব্যক্ত রূপ হয়; এবং তখনই উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু পদার্থবৎ হয়। উহাই ক্রমে কারণাধীনে বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়। এই বস্তু পদার্থ প্রকৃতপক্ষে অ-বস্তুর (Non—matter, Righi) বিকাশ মাত্র। সুতরাং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এই সর্ব্বব্যাপ্ত অ-বস্তু পদার্থেরই ব্যক্তাবস্থা; এবং ব্যক্ত হইবার কারণ সেই ঘূর্ণগতি সেই অব্যক্ত পদার্থকে ব্যোম বলা যাইতে পারে।

বেদ সেই ব্রহ্ম-বাণী, সত্ব রজঃ তমঃ তিনি
ত্রিলোক উদ্ভব তাঁহা হ'তে,
অরূপ, নিষ্কল, শান্ত, নির্ব্বিকার, নিরন্ত
সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত তাঁ'তে।
উপাধি নাহিক তাঁর বাঙ্মনের অগোচর,
কোন শব্দ না প্রকাশে তাঁরে,
প্রকৃতির ভাবনায় তাঁহারেই ভাবা হয়, (১)
সেই ভাবে বুঝহ অন্তরে।
আনন্দ স্বরূপ তিনি, তাঁহার আনন্দ নাই—
চিত্তবৃত্তি কিছু নাই তাঁর;
অনাদি, অব্যয়,নিত্য, তিনি স্থির, তিনি সত্য,
অতীন্দ্রিয়, তিনি নির্ব্বিকার।
ব্রহ্মা তিনি,আত্মা তিনি, তাঁরে পরাৎপর মানি।
তিনি নিষ্ঠা, তিনি চিন্তাহীন;
তিনি এক, পরমাত্মা, ব্যোমরূপী মাত্র সত্তা,
অনলস, (২) কিন্তু উদাসীন।
তাঁহার নাহিক রূপ, নাহি ধ্যান, বিশ্ব-রূপ,
তিনি নহে ধ্যাতা, (৩) ধ্যেয় (৪)কভু;
তিনি কভু শূন্য নয়, (৫) শূন্যের অতীত হয়
মুক্তিদাতা; একমাত্র বিভু
অন্য কেহ নাহি,আর, পরাৎপর সারাৎসার,
তিনি তিন (৬) ভাবেরই অতীত;
মুনিগণ দেবগণ তাঁর চিন্তাতে মগন,
তিনি সত্য, সত্য তাঁহে স্থিত।
লোভ, মোহ, দর্প, ভয়, যে জন চঞ্চল হয়,
কিম্বা কাম, ক্রোধ, পাপ বহে,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্রীষ্ম, শীত, যেই হয় বিচলিত,—
ব্রহ্মতত্ত্ব-অধিকারী নহে।
স্বর্গসুখ অনুরক্ত, কামনা-কল্পনা (৭)শক্ত,
জাতি, কুল, মানে অভিমানী,
যিনি করে অনুক্ষণ মুক্তিগ্রন্থ আহরণ,
ব্রহ্মে নাহি জানে;সে অজ্ঞানী।
সুখ দুঃখ কিম্বা ভয়, মান অপমান হয়
যাহার নিকটে তুল্য জ্ঞান,
তিনি ব্রহ্ম জ্ঞান ধনে, অধিকারী হ'ন মনে,
অন্য জনে বৃথা অভিমান।
অন্য জনে বৃথা অভিমান॥
ওঁ তৎসৎ।

শ্রীশশধর রায়।

# আহ্নিক

## ভূমিকা।

হিন্দুজাতি ধর্ম্মগত প্রাণ। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সন্তান জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে জগদীশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পান ও তাঁহাকে স্মরণ করেন। এই জন্য আমাদের মধ্যে দৈনিক সকল কার্য্যোপলক্ষেই শ্লোক বা মন্ত্রাদি পঠিত হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রথা যে জীবনকে সুসংযত করিবার পক্ষে ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়াই হিন্দুকে দেবতাদি স্মরণ সূচক শ্লোক পাঠ করিতে হয়। সেইরূপ স্নান, আহার, যাত্রা, শয়ন

---

সুতরাং ব্যোমই ব্রহ্মাণ্ডের মূল। ইহা হইতেই এই শ্রুতির সর্ম্মার্থ উপলব্ধ হইতেছে।

(১) উপরে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মাণ্ড সেই সর্ব্ব ব্যাপ্ত অব্যক্ত কারণের ব্যক্তাবস্থা। সুতরাং প্রকৃতি ও ব্রহ্ম একই হইল। প্রকৃতিকে চিন্তা করিলেই তাঁহাকে চিন্তা করা হয়, প্রকৃতিকে বুঝিলেই তাঁহাকে বুঝা হয়।

(২) কারণ তিনি নিয়ত কর্ম্মী হইয়া ব্রহ্মাণ্ড লীলা করিতেছেন। এ অবস্থায় তিনি সগুণ।

(৩) ঈশ্বর বিষয়ে নানাবিধ সমস্যা অর্থাৎ মত পোষণ করে।

(৪) যিনি অন্যকে ধ্যান করেন।

(৫) যাহাকে ধ্যান করা যায়।

(৬) শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

(৭) জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিনি অবস্থা।

প্রভৃতি সকল কার্য্যেই জগদীশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি এবং তাঁহার করুণা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ দিবসে তিনবার কিছু কালের জন্য অন্য কার্য্য হইতে চিত্ত যথাসম্ভব অপসারিত করিয়া কেবল মাত্র ঈশ্বর চিন্তাদিতে নিযুক্ত থাকা বিহিত। এই প্রকারে কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করিলে মানুষের অহংজ্ঞান খর্ব্ব হয় এবং সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণার তীব্রতা সমধিক অনুভূত হয় না।

দুঃখের কথা, নানা কারণে হিন্দুর এই ধর্ম্মপ্রাণতা আজ কাল কিঞ্চিৎ অস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক কার্য্যেই যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে হয়, হিন্দু তাহা যেন ভুলিয়া যাইতেছেন। অনেকে নিত্যকার্য্য সন্ধ্যাবন্দনাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেছেন। যাঁহারা প্রাচীন প্রথা অনুসারে সন্ধ্যা পূজাদি করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের পক্ষে উহা অর্থহীন, প্রাণহীন বাহ্যিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থা কখনও শুভকর হইতে পারে না।

কি কারণে হিন্দুর মধ্যে নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শৈথিল্য ঘটিতেছে, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। কালক্রমে আমাদের দেশের ও সমাজের অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে। অনেক শতাব্দী ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্পর্শে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষণে আমাদের জীবনের রীতি নীতি ও অভ্যাস সমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিশ্বাসেরও যে একেবারে পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা নহে। এ অবস্থায় বহু শত কিম্বা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় প্রণীত পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি যে বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের সম্যক্ উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

যাহাতে অস্মদ্দেশীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে পূর্ব্বের সেই প্রস্ফুটিত ধর্ম্মপ্রবণতা ফিরিয়া আইসে, সেই মহান্ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রচারিত হইল। ইহার প্রণয়নে আমি অমিততেজা প্রাচীন পদ্ধতিকারগণের পদাঙ্ক যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়াছি। যাঁহারা সেই সকল পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষি ও মহাত্মগণ-নিবদ্ধ পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি অনুসারে নিত্যকর্ম্ম সকল অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি সম্পন্ন করেন, তাঁহাদিগকে এই পুস্তক লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বলা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে যাঁহারা সময়াভাব, ঔদাস্য, মতবৈষম্য অথবা বৈদিক ভাষা ও ভাব সমূহের দুর্ব্বোধ্যতা হেতু প্রাচীন রীত্যনুযায়ী নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহাদিগকে এই প্রবন্ধোক্ত সহজ পদ্ধতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

যাঁহারা আপনা হইতে কিম্বা অপরে বুঝাইয়া দিলে সংস্কৃতের অর্থ বুঝিতে পারেন, তাঁহারা সংস্কৃত শ্লোকই আবৃত্তি করিবেন। বালক বালিকারা এবং যাঁহারা সংস্কৃত বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা বাঙ্গলা কবিতা আবৃত্তি করিবেন। বলা বাহুল্য যে, দীর্ঘকালব্যাপী সংস্কারের ফলে আমাদের নিকট সংস্কৃতের কি যেন একটা মোহিনী শক্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেবার্চ্চনা বন্দনাদি কার্য্যে সংস্কৃত বাক্যাবলি বাঙ্গলা হইতে অধিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও চিত্তগ্রাহী বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে স্বকীয় জীবনে নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে অভাব অনুভব করিয়া, কোনও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার উপদেশানুসারে নিজের নিত্য ব্যবহারার্থ আমি এই কবিতাবলির প্রণয়ন করি। যাহাতে ইহা আমার ন্যায় গৃহস্থাশ্রমী

সাধারণ সংসারী লোকের পক্ষে উপযোগী হয়, তদ্‌বিষয়ে যত্নের ক্রটি করি নাই।

সমগ্র সমাজের সামান্য মাত্রও যে অভাব, তাহা মোচন করা বৃহৎ ও গুরুতর ব্যাপার। সে কার্য্য মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধ্য নহে। তথাপি উদাসীন থাকা অপেক্ষা যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত,এই ভাবিয়া আহ্নিক প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

## প্রাভাতিক (সংস্কৃত)।

প্রাতঃকালে যথাসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে শয্যার উপর উঠিয়া বসিবে। পরে গবাক্ষ পথে মুক্ত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নলিখিত স্তোত্র পাঠ করিবে। ঊষারাগ-রঞ্জিত পূর্ব্বগগনের দিকে চাহিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিলে ভাল হয়।

নমোস্তু তস্যৈ শতশঃ প্রভাতে
রাত্রৌ চিরং সুপ্ত মপেত সত্বম্।
দয়ার্দ্র-চিত্তা জননীব যাঙ্কে
যত্না দপাস্মাং বিপদাং শতেভ্যঃ॥

উন্মীল্য নেত্রে সহসা নিশান্তে
ঊষাং সুরম্যা মবলোকয়ামি।
তথা মহামোহ-তমোঽবসানে
অস্মাং মনঃ পশ্যতু মে প্রবুদ্ধম্॥ ২॥

তেজোন্বিতাং দীপ্ততরাং হি ভানোঃ
সুধাকরাং স্নিগ্ধতরাং শশাঙ্কাৎ।
শতক্রতো শ্চিত্রতরাং চ চাপাৎ
বিশ্বেশ্বরীং প্রীতিময়ীং প্রফুল্লাম্॥৩॥

দদাতু সা সর্ব্ব শুভাকরা হ্যা
নন্দ-স্বরূপা চরণাশ্রয়ং মে।
বর্দ্ধন্তু মে ভক্তিনতোত্ত মাঙ্গে
আশীর্ব্বচ স্তন্দয়িতাঃ সুপুত্রাঃ॥৪॥

প্রহ্লাদ সীতা জনক ধ্রুবাদ্যাঃ
মৈত্রেয্যনিন্দ্যা শুভদা চ গার্গী।
ব্যাসাত্রি-পুণ্যাশ্রম যাজ্ঞবল্ক্যাঃ
শুকো রসজ্ঞোঽচ্যুত বীর ভীষ্মঃ॥৫॥

তৈলঙ্গযোগী শ্বর-ভাস্করর্ষিঃ
দেবেন্দ্র-ভক্তো যতি-কেশবশ্চ।
প্রসাদ-সিদ্ধঃ সুমনস্বি-রামঃ
কর্ম্মীশ্বরঃ সংযমি-রামকৃষ্ণঃ॥ ৬॥

প্রাভাতিকৈ র্গন্ধবহৈ স্তদীয়া
দিগ্‌ব্যাপিনো মঙ্গল-পুণ্য-ভাবাঃ।
উদ্দীপকাঃ পূর্ব্ব-শত-স্মৃতীনাম্
বিশন্তু চিত্তং মম জীবয়ন্তঃ॥ ৭॥

স এব দেশো ভুবনেঽদ্বিতীয়ঃ
তচ্ছোণিতং পূততমং ধমন্যাম্।
সাক্ষী স এব প্রথিতঃ পুরাণঃ
কালঃ, কথং মে চরিতং ন তদ্বৎ॥ ৮॥

অতীতকীর্ত্তির্বিমলা প্রদীপ্তা
যথা ভবে দর্দ্দিত জন্মভূমেঃ।
ভবিষ্যদাশা সফলা চ তস্যাঃ
তথা প্রবৃত্তির্নিয়তং মমাস্তু॥ ৯॥

মাত স্তবাঙ্ঘ্রিং মনসা ভি বন্দে
পিত, গৃহাণাধম পুত্র ভক্তিং।
গুরো, পদান্তে তব দীন শিষ্যঃ
পূজ্যাঃ সখায়ঃ সুহৃদো নতিং বঃ॥ ১০॥

জলে স্থলে যে নিখিলে ত্রিলোক্যাং
দেবাশ্চ দেব্যো হৃদধিষ্ঠিতা যে।
হরন্তু বিঘ্নঞ্চ শুভং নয়ন্তু
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

## প্রাভাতিক (বাঙ্গলা)।

প্রভাতে সহস্র বার তাঁর পায় নমস্কার
কোলে লয়ে স্নেহে যিনি মায়ের মতন,

করেছেন রক্ষা মোরে,　নিশায় ঘুমের ঘোরে
ছিনু যবে মৃত প্রায় হয়ে অচেতন।

সহসা নয়ন খুলি　　নিশা শেষে মুখ তুলি
ঊষার কোমল আভা নেহারি যেমতি
তেমতি কবে রে প্রাণে,　মহামোহ অবসানে
সেই বিশ্ব-জননীর হেরিব মুরতি।

সে রূপের দীপ্ত ভায়,　শত সূর্য্য লাজ পায়
কোটিচন্দ্র জিনি তায় ঝরে সুধা রাশি,
বিচিত্রতা হেরি তার,　ইন্দ্রধনু মানে হার
প্রীতিময়ী সমুজ্জ্বল মুখে মৃদু হাসি!

সর্ব্বশুভ বিধায়িনি!　আত্মানন্দ স্বরূপিনি!
অধীন কাতর সুতে দাও মা চরণ,
মোর ভক্তিনত শিরে,　করুন বর্ষণ ধীরে
আশীর্ব্বাদ তব প্রিয় পুত্র কন্যাগণ!

জনক প্রহ্লাদ ভক্ত,　ধ্রুব হরি অনুরক্ত
মৈত্রেয়ী অনিন্দ্যা গার্গী জনক দুহিতা,
অত্রি ব্যাস যোগক্ষম,　যাজ্ঞবল্ক্য পুণ্যাশ্রম
ভীষ্ম, শুক—মূর্ত্তিমান শৌর্য্য, পবিত্রতা।

মহাত্মা তৈলঙ্গ মুনি,　ভাস্কর অশেষ গুণী
প্রসাদ প্রেমিক সিদ্ধ, রামকৃষ্ণ যতি,
দেবেন্দ্র ঋষির সম,　জ্ঞানী বাম অনুপম
ঈশ্বর, কেশবচন্দ্র—কর্ম্মী, ধর্ম্মমতি।

বহে মন্দ গন্ধবহ,　তাহার হিল্লোল সহ
পুণ্য আত্মা উচ্ছ্বসিত ভাব অগণন,
শত স্মৃতি জাগাইয়া,　পশুক আমার হিয়া
সৃজুক উন্নত দৃপ্ত নূতন জীবন।

সেই দেশ—ভাবি মনে—　অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে
সেই শোণিতের ধারা বহেত ধমনী—
সেই কাল মহাপ্রাণ,　সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান
কেন বা জীবন মোর　হবে না তেমনি।

দুর্দ্দশায় মগ্ন ঘোর,　জনম ভূমির মোর
অতীতের কীর্ত্তি যাহে হয় সমুজ্জ্বল,
ভবিষ্যৎ আশাচয়,　যাতে তার পূর্ণ হয়,
এ হেন জীবন বিনা জীবন বিফল।

মাগো করযোড় করি,　প্রণমি তোমায় স্মরি
এ অধম পুত্র পিতঃ দিতেছে ভকতি,
গুরো হের কৃপাবলে,　দীন শিষ্য পদতলে
আত্মীয় সুহৃদ্‌গণ লও সবে নতি।

অন্তরীক্ষে জলে স্থলে,　ব্যাপি বিশ্ব ভূমণ্ডলে
হৃদয়েও রাজিছ যে দেব দেবীগণ,
সব বাধা বিঘ্ন হরি,　মঙ্গলে জীবন ভরি
মম সুপ্রভাত সবে করহে এখন!

## স্নান। (সংস্কৃত)

যে নদী, পুষ্করিণী, কূপ বা উদ্ধৃত জলে স্নান করিবে, তাহার দর্শনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্নানের শেষ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি পাঠ করিবে।

জ্বরতি তপতি দেহো মুহ্যমানোন্তরাত্মা
শময়তি বত তাপং কোধুনা জীবয়েৎ কঃ।
অমৃতময় মনিন্দ্যং দেবতেতি প্রসিদ্ধং
জলমিদ মপরূপং জীবনাখ্যং ব্রজামি ॥ ১ ॥

মলিন রজসি ধাবন্ কণ্টকাকীর্ণ মার্গে
শিশুরিব পরিখিন্নো মাতরং প্রেমপূর্ণাম্।
পরম করুণ দেবী মাগতঃ শান্তয়েহহং
শিশির-বিশদ-তোয়া ধিষ্ঠিতাং শুদ্ধরূপাং ॥২॥

তবহি জননি! দেহাহ্লাদনস্পর্শ এষঃ
বিশতি কর সহস্রং রোমকূপেষু গূঢ়ং।
ইদমনুপল মাত্রং সর্ব্বমালিন্য-শোধি
অয়মম মতি সৌখ্য-দ্যোতকো রোমহর্ষঃ ॥৩॥

জগদঘহর-বিশ্ব-প্রাণদে পুণ্য-গঙ্গা-
প্রবলতর-তরঙ্গে নর্ম্মদা-বীচি-ভঙ্গে।

মৃদুগতি যমুনাযাঃ স্বচ্ছ নীলাম্বু রাশৌ
বহুনদগত-সিন্ধৌ নির্ম্মলে ব্রহ্মপুত্রে ॥৪॥

সরিতি সরিতি চৈষাং রত্নসূ ভারতানাং
ঋষিভি রমিত-সত্ত্বৈ স্তংত্বমেবাম্ব দৃষ্টা।
গলিত নয়নধারৈঃ পূজিতা কীর্ত্তিতোচ্চৈঃ
বিপদি, মরণ কালে চাশ্রিতা শুদ্ধভক্ত্যা ॥৫॥

বসতি হৃদয়গে মে বাহ্যিকাদ্দেহ-পঙ্কাৎ
শতগুণ মতি ঘোরং পাপ মাত্মন্যদৃশ্যম্।
জনয়তি হৃদি পীড়াং দুর্ব্বিষহ্যাং সমন্তাৎ
হর হর সদয়ে তৎ স্নাপযাদ্যাম্ব চিত্তম্ ॥৬॥

অধিবসসি যথা ত্বং ভীমদাবাগ্নি-শান্ত্যৈ
অসিত জলদ সত্ত্বং সর্ব্বদিক্ষু প্রবৃত্তম্।
ভগবতি বস তোয়ে দেহ লিপ্তেঽত্র তদ্বৎ
হৃদয় দহন মেতচ্ছাম্যতু স্পর্শ মাত্রাৎ ॥ ৭॥

বিমল-সলিলধারা-পাত-সুস্নিগ্ধ-দেহঃ
বিগত-নিখিল-খেদঃ শান্তচিত্তশ্চ শৌচাৎ।
সকল-সুখনিদানাং সর্ব্বলোকাভিরামাং
অগণিত-জগদম্বাং ভক্তিনম্রোঽহ মীড়ে ॥৮॥

## স্নান (বাঙ্গলা)।

জ্বলিছে সকল দেহ আত্মা মুহ্যমান্,
কে ঘুচাবে এই তাপ কে বাঁচাবে হায়!
জলের শরণ লই—অমৃত সমান—
দেবতা বলিয়া লোকে পূজা করে যায়।
পরিষ্কার স্বচ্ছ শীত—স্নিগ্ধ পরশন
ধরায় অপর নাম যাহার জীবন!

এ ত জল জড় নহে—দেখ তার মাঝে
অপরূপ সমুজ্জল, মুখে মৃদু হাসি,
পরম করুণাময়ী দেবী-মূর্ত্তি রাজে
শান্তি আশে তাঁরি পাশে উত্তরিনু আসি।
কণ্টক ধূলিতে পূর্ণ পথে শ্রান্ত হয়ে
শিশু যথা মার কাছে আসেরে পলায়ে।

এই তব স্পর্শ, মাগো তনু, আহ্লাদন,
তোমার সহস্র কর প্রতি লোম কূপে,
এক অনুপল মাত্রে করিলে শোধন
সব মলা পবিত্রতা-বিধায়িনী-রূপে;
হের মাগো তব পূত অদৃশ্য পরশে
প্রতি অঙ্গ রোমাঞ্চিত হতেছে হরষে।

বিশ্ব-বাসি-পাপনাশী বিশ্বের জীবন
জাহ্নবীর কল কল তরঙ্গ হিল্লোলে,
নর্ম্মদার বীচিভঙ্গে, জলদবরণ
মৃদুগতি যমুনার সলিল কল্লোলে
বহু শাখা পরিপুষ্ট সিন্ধুর হাসিতে,
সুনির্ম্মল ব্রহ্ম-পুত্র সলিল রাশিতে,

রত্ন-প্রসূ ভারতের আরো কত শত
সরিতে তোমারে মাগো আর্য্য-ঋষিগণ
দেখিতেন দিব্য-দৃষ্টি-বলে অবিরত
পূজিতেন ভক্তি-স্রোতে ঢালি প্রাণ মন,
উচ্চৈস্বরে গাহিতেন সদা তব জয়
অন্তকালে লইতেন তোমারই আশ্রয়!

হৃদয়বাসিনি, তুমি জানত আমার
শারীরিক মালিন্যের কত গুণ হায়
মলিনতা আছে হৃদে—ভীষণ আঁধার—
দুর্ব্বিষহ কষ্টে যার প্রাণ যায় যায়;
দয়াময়ি কৃপা করি নাশ সে সকল
শরীরের সঙ্গে হোক চিত্তও অমল!

ভীষণ দাবাগ্নি যবে পরশে অম্বরে
করিবারে মহারণ্য ক্রোধে ভস্মসাৎ;
নিবিড় জলদ সত্ত্বে দিগ্ দিগন্তরে
থাকি তুমি অবিশ্রাম কর ধারাপাত!
তেমতি এ স্নান জলে করি অধিষ্ঠান
বিষম হৃদয়-জ্বালা কর মা নির্ব্বাণ।

বিমল শীতল নীরে সুস্নিগ্ধ শরীর
জড়তা নাহিক এবে—শান্ত শুদ্ধ মন

সংসার বিক্ষোভ হতে হইয়ে সুস্থির
নমি বিশ্ব-জননীরে করিয়ে স্মরণ
যাঁর পবিত্রতা গুণে বিশ্ব চরাচর
পবিত্র উজ্জ্বল রম্য অনিন্দ্য সুন্দর!

(ক্রমশঃ) শ্রীজ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ।

# সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। (২)

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যত রকম ভষায় লিখিত সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। প্রাচীন ইজিপ্‌টে বা আসেরিয়ায় যে সকল বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থাদির আবিষ্কার হইয়াছে, সে সমুদয়ও প্রাচীনত্বে ভারত-সাহিত্যের সমকক্ষ নহে।

কৃত্তিকা-নক্ষত্রে সূর্য্যের স্থিতি বা ভোগ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যায়, তদনুসারে গণনা করিলে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে বেদাদি শাস্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। যাহা হউক, প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক সাহিত্যের পরই বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্যের নাম নির্দ্দেশ করা উচিত। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুত্থান হয়; সুতরাং ইহাও কম প্রাচীনতার পরিচায়ক নহে। দেশের চরম উন্নতির সময় ব্যতীত তথায় একটা নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে পারে না। মানুষের যখন কোনও দিকে কোনও প্রকার আপদ্ বিপদ থাকে না, দেশে সুদীর্ঘকাল শান্তি বিরাজ করে, যাহাতে হৃদয় অনুদার হয়, সঙ্কীর্ণ হয়, এরূপ কোনও কিছুই যখন সমাজে না থাকে, তখনি সমাজে এবং সামাজিকগণের প্রাণে ধর্ম্মোন্মাদ দেখা দেয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব কালে ভারতের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বৈদিক সময় এবং বৌদ্ধ সময়ের পরই পাণিনির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যত রকম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থ অধুনা বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেন না, যাস্কের নিরুক্ত এবং বেদের প্রাতিশাখ্য গুলিকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বলা যায় না। অনেকে বলেন— খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনির আবির্ভাব হয়। মহামতি গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের মতে, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্বে, পাণিনি ভারত-ভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই পাণিনি আবার স্বকীয় ব্যাকরণ গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ জন বৈয়াকরণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেবও যে আট জন আদি শাব্দিকের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাণিনি ষষ্ঠস্থানীয়। আবার কাতন্ত্র-ব্যাকরণে, প্রচলিত অচ্, অন্ প্রভৃতি সংজ্ঞাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলা হইয়াছে। এই অচ্ অণ্ সংজ্ঞা কিন্তু পাণিনির নিজের আবিষ্কার নহে। তিনি মহেশ্বর বা মহেশ নামক পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণের নিকট হইতে উহা ধার করিয়াছেন। অতএব পাণিনির বহু পূর্ব্বেও যে ব্যাকরণ লিখিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণিনি, বলিতে গেলে, প্রাচীন বৈয়াকরণগণের সর্ব্ব কনিষ্ঠ। এই পাণিনিই বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের। এখন দেখুন, সংস্কৃত ভাষা কত প্রাচীন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জগতে যত প্রকার প্রাচীন সাহিত্য আছে, সেই সকলের মধ্যে, ভারত সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেই সকল প্রমাণের দুই একটী মাত্র লিপিবদ্ধ হইল।

ঋগ্‌বেদ সংহিতার অতি প্রাচীনতর অংশ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে,ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম-সীমান্তে,পঞ্চনদে এবং কাবুল রাজ্যে কুহ্বা পর্য্যন্ত প্রথমতঃ বসতি করিতেন। তার পর ঐ ঋগ্‌বেদেরই অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে দেখি,—ক্রমে ক্রমে ঐ আর্য্যগণের সংখ্যার যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা পূর্ব্বাভিমুখে সরস্বতী নদী অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী পর্য্যন্ত আসিয়া বসতি-বিস্তার করিলেন।

আবার তৎপরবর্ত্তী মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে অবগত হই যে, হিন্দুস্থান-বিজেতা আর্য্যগণের মধ্যে কালক্রমে মহা আত্ম-বিরোধ ঘটিয়াছিল। হিন্দুস্থানে তাঁহাদের আধিপত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, যখন তাঁহারা ক্রমে ভারতের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন তৎতৎপ্রদেশবর্ত্তী অনার্য্যগণের সহিতও আর্য্যদিগকে যথেষ্ট বিবাদ বিসংবাদ করিতে হইয়াছিল। রামায়ণ গ্রন্থ ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ভারত সম্বন্ধে গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে, খ্রীষ্ট জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্বের যে লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়, ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনার পূর্ব্বে একবার তাহা দেখা উচিত।

সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য্য নরপতি চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩১২ অব্দে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। চব্বিশ বৎসর কাল, অপ্রতিহত-প্রভাবে, রাজত্ব করিয়া, তিনি পরলোক গমন করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে, পারস্যের তদানীন্তন অধিপতি সিলিউকসের সহিত, তাঁহার বহুবার বিরোধ সংঘটন হয়, কিন্তু প্রতিবারেই সিলিউকস পরাজিত হয়েন, এবং শেষে চন্দ্রগুপ্তের মিত্রতা-প্রয়াসী হইয়া, তাঁহাকে নিজের দুহিতা দান করিয়া বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ করেন। সুচতুর সিলিউকস্ এই সময়ে, ভারতবাসীদিগের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইবার জন্য মেগাস্থিনিস্ নামক একজন গ্রীক্ পণ্ডিতকে পাটলীপুত্রে (পাটনায়) রাজসভায় প্রেরণ করেন। উক্ত গ্রীক্ পণ্ডিত পাঁচ বৎসর কাল চন্দ্রগুপ্তের সভায় উপস্থিত থাকিয়া, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ পুস্তক বিলুপ্ত হইলেও খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর আরিয়ান্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের পুস্তকে ঐ মেগাস্থিনিস্ গ্রন্থের অনেক স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা ঐ সকল পুস্তক হইতেই প্রথম প্রথম জানিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিসের পূর্ব্বে অন্য কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন নাই। ঐ গ্রন্থের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, সেই প্রাচীনকালে যখন মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ্ ছিলেন, তখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব সমস্ত হিন্দুস্থান ছাইয়া ফেলিয়াছিল। দেশ ব্রাহ্মণ-প্রধান ছিল। আর—পেরিপ্লাসের সময়েও দক্ষিণাপথের প্রান্ত পর্য্যন্ত শক্তি উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নানাবিধ দুর্দ্দান্ত বন্য জাতিপূর্ণ এই অসীম ভূভাগে কত শত সহস্র বৎসরের চেষ্টার ফলে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহা কে বলিবে?

যখন খ্রীঃ পূঃ ২৩৭ অব্দে মহাবীর আলেক্‌জেন্দর (সেকন্দর) দিগ্‌বিজয় বাসনায় ভারতে উপস্থিত হয়েন, তখন, তিনিও সিন্ধু নদের তটবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে বৈদিক ধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুত্থান দেখিয়া গিয়াছিলেন। ভারত তখনও জ্ঞান বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে গৌরবিত ছিল।

যাহা হউক—কাব্য,স্বরবিদ্যা (phonetics) আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি (আইন) আচার,ব্যবহার এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে ভারত সাহিত্যের কলেবর সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইলেও, এমন কি—ঐ ঐ বিষয়ের কতিপয়ে, গ্রীক্ সাহিত্যের অগ্রণী হইলেও, ভারত-সাহিত্য ইতিহাস বিষয়ে কিন্তু বড়ই দুর্ব্বল। ভারত সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস নানা অবান্তর উপায়ে জানিতে হয়। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যও এ বিষয়ে আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারে না। সংস্কৃত-গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অধিকাংশেরই আবির্ভাব কাল, তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থের ভাষা, লিখন-প্রণালী, অপরাপর গ্রন্থের কোনও কোনও বিষয়ের উল্লেখ (quotation) এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রভৃতি দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুমান করিয়া লইতে হয়। তাঁহারা কে কোন্ সময়ে, কোন্ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—কোন্ দেশ তাঁহাদের প্রতিভালোকে আলোকিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কে কোন্ বংশ পবিত্র এবং উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনাবলীই বা কিরূপ ছিল—ইত্যাদি বিষয়ে, কৌতূহল-নিবৃত্তি করিবার কোনও সহজ উপায়ই নাই। কোন গ্রন্থে হয়ত পরিচ্ছেদ শেষে, কবির পরিচয়কালে তাঁহার পিতার নাম মাত্র পাওয়া যায়। আবার কোথাও বা কোনও বিশেষ ঘটনার বা বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনায় কবির পরিচয় অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থকার সম্বন্ধে, প্রত্যক্ষরূপে কোনও বিষয় জানার উপায় নাই। মাত্র কতিপয়স্থলে ইহার ব্যত্যয় দেখিতে পাই। যেমন ভবভূতি।

ইতিহাস বিষয়ে ভারত-সাহিত্যের এই যে ন্যূনতা, এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহার দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি।

১মতঃ—প্রাচীন ভারত অতিশয় শান্তিময় ছিল। যে সমুদয় ভয়ঙ্কর আপদ্ বিপদে, যুদ্ধবিগ্রহাদিতে, দৈব বা পার্থিব দুর্ব্বিপাকে দেশের তদানীন্তন শোচনীয় অবস্থা চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকে—শত সহস্র বৎসর অতীত হইলেও মানব-হৃদয়ে যে অবস্থার ভয়ঙ্করী-মূর্ত্তি জাগরূক থাকে, কালের অক্ষয় ফলকে, অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত থাকে, প্রাচীন-ভারতে সেরূপ কোনও বিশেষ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটে নাই। শান্তির সুখময় অঙ্কে ভারত নিদ্রিত ছিল। তাই তখন ইতিহাসের ততটা প্রয়োজনও হয় নাই।

বস্তুতঃ কোনও ব্যক্তির জীবনে যে সকল বিশেষ বিশেষ আপদ্ বিপদ ঘটে, তাহার আদ্যোপান্ত যেমন মনে থাকে, সেই বিপদের সময়, দিন-ক্ষণ-পল-বিপল পর্য্যন্ত যেমন চিত্তে অঙ্কিত থাকে, কৈ সম্পদের কথা কি ততটা মনে থাকে? যে চলিয়া যাওয়ায় তোমার সুখের সংসার অন্ধকার হইয়াছে—তাহার সেই শেষ দিন তোমার দগ্ধ হৃদয়ের গুপ্তস্থলে যেমন লেখা আছে, প্রতিক্ষণে তোমার মনে পড়ে, তাহার সেই প্রথম সমাগম-রূপী সম্পদের কথাটা তেমনি ভাবে কি নিয়ত মনে জাগে! হয়ত ভাবিয়াও স্থির করিতে পার না!! শান্ত প্রকৃতি সন্ন্যাসী রূপের কথা,

কালে হয়ত লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু সেই দৃপ্তসিংহ নাদির সাহের নাম ভারতবাসী কখনও ভুলিবে না। তাই নাদির সাহ তাহার সমকালবর্ত্তী ইতিহাসের প্রধান স্তম্ভ বা উপজীব্য। আর সন্ন্যাসী-রূপ উপেক্ষিত। প্রাচীন-ভারতে দীর্ঘকাল শান্তি বিরাজিত ছিল, সুখের তন্দ্রায় ভারত বিভোর ছিল, তাই ইতিহাসের ততটা প্রয়োজন উপলব্ধই হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকদিগকে যেমন, পারস্ত-দেশ-বাসিগণের সহিত দীর্ঘকাল কলহ করিয়া, রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া, জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব স্থাপন করিতে হইয়াছিল, প্রাচীন রোমের অধিবাসিগণকে যেমন সেই ভয়ঙ্কর 'পিউনিক'যুদ্ধে শব-দেহের পিরামিড গাঁথিয়া, জাতীয় জীবনের ভিত্তি বন্ধন করিতে হইয়াছিল, ভারতীয় আর্য্য-গণকে, সেইরূপ, কোনও জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া নিজেদের সত্ত্বা স্থির করিতে হয় নাই। শান্তিপ্রিয় আর্য্যগণ, অতি শান্ত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সংসর্গে তৎ তৎ সময়বর্ত্তী অপরা-পর জাতিও শান্তিময় জীবন-ভোগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিশেষ ঘটনার ইতি-হাসোচিত উৎকট ঘটনার সম্ভাবনাই হয় নাই। "ছেয়াত্তুরের মন্বন্তর" বা "নির-নব্বুয়ের ধাক্কা" বলিলেই শিহরিবার কোনও কারণ তখনকার লোকের ছিল না। ওরূপ বিষয়ে লোকের অভিজ্ঞতাই জন্মিত না। কাজেই অতি প্রাচীন কালে ইতিহাস লিখি-বার আবশ্যকতা হইত না।

২য়তঃ—প্রাচীনকালে শাস্ত্রাদির পঠন, পাঠন বা লিখন বিষয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণগণে-রই অধিকার ছিল। তাঁহারা ধর্ম্ম লইয়াই মাতিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই গ্রন্থাদি লিখি-তেন। ইতিহাসের দিকে তাঁহাদের ততটা খেয়াল ছিল না। বস্তুতও প্রাচীন-ভারতে বিদ্যার চর্চ্চা বা শিক্ষা একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই হস্তে ছিল। অপর বর্ণের উহাতে অধিকার ছিল না। অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতই দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের অনুকূল শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতেন। যে সমুদয় ক্রিয়া-কলা-পের অনুষ্ঠানে মানুষের মনের বল বৃদ্ধি পায়, সমাজ-দেহ সুগঠিত ও সুদৃঢ় হয়, সাত্ত্বিক-ভাবে মন প্রাণ ভরিয়া যায়, সুতরাং সংসার-যাত্রা সুখে—শান্তির সহিত নির্ব্বাহিত হয়, সেই সকলের বিধান করাই তাঁহাদের জীব-নের প্রধান ব্রত ছিল। কি ধর্ম্ম গ্রন্থ, কি কাব্য নাটক প্রভৃতি—সমুদয়েরই মূল উদ্দেশ্য ঐ এক। মানুষের বা সমাজের, যে কার্য্যে অধঃপাত নিশ্চিত, তাহা প্রাচীন মনস্বিগণের আলোচ্যই ছিল না। তবে সাধু-চরিত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য, হয়ত প্রসঙ্গত কোথাও দু একটা অসাধু চিত্র অঙ্কিত করিতেন মাত্র। বড় বড় মুনি ঋষির—বড় বড় রাজা মহা-রাজের আদর্শ-চিত্র সম্মুখে ধরিয়া তাঁহারা সমাজ-শিক্ষা দিতেন। ইহলোক অপেক্ষা পর-লোকের ভাবনাই তাঁহারা অধিক ভাবি-তেন। নশ্বর মানবদেহকে, তাঁহারা, লোকা-ন্তরে অবিনশ্বর দেব-দেহ প্রাপ্তির সোপান মনে করিতেন। এ জগতের যাহা কিছু, সকলই অসার অসত্য মায়াময়, সত্য বলিতে একমাত্র ধর্ম্ম, ইহাই তাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল। আর এই মন্ত্রই তাঁহারা স্বতঃ পরতঃ প্রত্যক্ষ পরোক্ষরূপে সকলকে শিক্ষা দিতেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে এই ভাবই অধিক। ঐহিক অপেক্ষা পারত্রিক বৃত্তান্তই বেশী। তাই প্রাচীন আর্য্যগণের গ্রন্থাদি

বর্ত্তমান প্রণালীতে ইতিহাস চর্চ্চার ততটা সাহায্য করিতে পারে না। তাঁহারা মাত্র ঐতিহাসিকের চক্ষে কিছু দেখিতেন না বা লিখিতেন না। তাঁহারা আচার্য্যের পবিত্র ও সমুচ্চ-মঞ্চে অধিরূঢ় হইয়া তত্ত্বজ্ঞের চক্ষে—ধর্ম্মোপদেশকের চক্ষে জগত দেখিতেন এবং ধর্ম্মভাবময় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতেন। ইতিহাসের ধার ততটা ধারিতেন না।

এই পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্য কারণে প্রাচীন ভারত সাহিত্যের ইতিহাস, পুরাবৃত্ত বিবরণ প্রভৃতি যথাযথরূপে নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। এমন কি, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহের কালাদি নির্ণয় সম্বন্ধে কোনও কথা বলা অতি সাহসের কর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

চিন্তাশীল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ, বৈদিক-যুগের যথার্থ বিবরণ বা কাল নিরূপণ প্রভৃতি, এ পর্য্যন্ত যত কিছু করিয়াছেন, সত্য বলিতে কি, সে সকলই আনুমানিক। প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রারম্ভ কখন কত পূর্ব্বে হইয়াছিল, কোন সময়কে ভারত সাহিত্যের প্রথম স্তর ধরা সঙ্গত—ইত্যাদি নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তবে ভাষার তারতম্য ও লিখন প্রণালী দেখিয়া এবং বর্ণিত বিষয়ের পূর্ব্বাপর সমালোচনা করিয়া কোন মতে কতকটা স্থির করা যাইতে পারে মাত্র।

আমরা অভিনিবেশ সহকারে সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে দেখিতে পাই যে, কতগুলি গ্রন্থ একই প্রকার ভাষায়, একই প্রকার বিষয়ে এবং একই প্রকার প্রণালীতে লিখিত। আবার আর কতগুলির ভাষা অন্য ধরণের। তাহাদের বিষয়ও অন্যরূপ এবং লিখিবার প্রণালীও স্বতন্ত্র। এই সমুদয় দেখিলে মনে হয় যে, এক এক সময়ে অর্থাৎ দুই এক শতাব্দী ধরিয়া একই রকমের একই ধরণের গ্রন্থাদি বিরচিত হইত। তারপর সেই সময়ের গ্রন্থকর্ত্তাগণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কালের পরিবর্ত্তনে ক্রমে ভাষার সুতরাং সাহিত্যের স্রোতও অন্যদিকে বহিয়া যাইত। এইরূপে ক্রমে ভাষা এবং লিখন প্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিত। যে কোন বিষয় ধরিয়াই ইহা বুঝা যাইতে পারে। যথা স্মৃতি-শাস্ত্র। স্মৃতি সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ পাই "কল্পসূত্র"। যেমন গৌতম-সূত্র, বৌধায়নসূত্র, গোভিলসূত্র, কাত্যায়নসূত্র প্রভৃতি। ঐ সময়ের যত কিছু গ্রন্থ,সে সমস্তই প্রায় সূত্রাকারে গ্রথিত। তারপরই স্মৃতি সম্বন্ধে যত গ্রন্থ পাওয়া যায়, সকলই প্রায় শ্লোকে রচিত। দুই একখানিতে আবার শ্লোকও আছে,সূত্রও আছে। অর্থাৎ ঐ ঐ গ্রন্থে প্রাচীন নবীন—দুই দিকেরই মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। শ্লোকে যেমন মনু-যাজ্ঞবল্ক্য নারদ সংহিতা প্রভৃতি, আর শ্লোক এবং সূত্রে যেমন বিষ্ণু বশিষ্ঠ সংহিতা প্রভৃতি। ইহাই শেষ নহে, এর পর স্মৃতিশাস্ত্রে যাহা দেখি, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত আরও বদ্ধ-মূল হয়। দেখি কতগুলি গ্রন্থ এমন আছে, যাহাদের উপজীব্য হইল ঐ ঐ সূত্র এবং সংহিতা সমূহ। এই গুলির নাম "নিবন্ধ"। এই সকল গ্রন্থের প্রণেতৃগণ সূত্র এবং সংহিতা হইতে স্ব স্ব মতের পরিপোষক প্রমাণাদির উদ্ধার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা এবং বিচার করিয়া—কি আচার কি ব্যবহার—প্রত্যেক বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেমন হেমাদ্রি, নির্ণয় সিন্ধু, বিবেক গ্রন্থ, গদাধর পদ্ধতি, অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি। স্মৃতিশাস্ত্রের এই যে প্রধান তিন প্রকার অবস্থা, ইহা যে তিনটী পৃথক পৃথক সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা অতি সহজেই

অনুমেয়। "স্মৃতিশাস্ত্র" শীর্ষক অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশের বাসনা রহিল।

যাহা হউক—এইরূপে, ভারতের যাবতীয় সাহিত্যেরই কাল সম্বন্ধে একটা না একটা স্তর বা থাক্ ঠিক করা যাইতে পারে। এই 'থাক্' গুলির কোনটা হয়ত ১০০ বৎসর লইয়া, কোনটা বা ২০০ বৎসর লইয়া, কোনটা তদপেক্ষা আরও অনেক বেশী সময় লইয়া, বহু শতাব্দী লইয়া সংগঠিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—বৈদিক সময়ের মধ্যে এই প্রকার দুইটী থাক আছে। অর্থাৎ সমগ্র বৈদিক সময়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ দুই থাকের মধ্যেই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের এ প্রকার বলিবার হেতুও যথেষ্ট আছে। বৈদিক সাহিত্য প্রস্তাবে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

যাহা হউক, বৈদিক সাহিত্যের এই দুই থাকের প্রত্যেক থাকই বহু শত বৎসর ব্যাপী। ঐ দুইএর ২য় থাকের শেষ সময় খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর পরে কিছুতেই হইতে পারে না। কেননা, বেদের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সিদ্ধান্ত গুলিও যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সময়ে বর্ত্তমান ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এবম্প্রকার স্থির হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ বৎসরে বুদ্ধদেব পরলোক গমন করেন। খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীকে বৈদিক সময়ের ২য় থাকের শেষ সীমা বলিয়া ধরিলেও, উহার প্রথম থাকের প্রারম্ভ কাল যে কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীই ভারতে বৈদিক সাহিত্যের প্রথম প্রাদুর্ভাব কাল। বর্ত্তমান সময়ে এ সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতের গৌরবস্থল, বর্ত্তমান মনীষিবৃন্দের অগ্রণী পণ্ডিতপ্রবর বালগঙ্গাধর তিলক তদীয় বৈদিক চর্চ্চামূলক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বেদের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ তিন হাজার বৎসরের কম হইতেই পারে না। আবার অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে, বৈদিক সাহিত্যের প্রারম্ভ কাল খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দী।

যাহা হউক, এই তিন মতই জার্ম্মানদেশের বোন নগরীর বিচারদক্ষ অধ্যাপক য়্যাকধি (Jacdhi) অস্বীকার করেন। তিনি বলেন—অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদের প্রথম প্রচার হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের এই মত বিরোধে উদাসীন থাকিয়া এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, যে কোনরূপেই দেখা যাউক না কেন—বৈদিক সাহিত্য যে, ইউরোপের গৌরব হিমাদ্রি গ্রীক্ সাহিত্যেরও অতি পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বেদের চর্চ্চা ব্যতিরেকে যেমন বেদের কাল নির্ণয় অসম্ভব, অন্য কোন প্রকারে উহার কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, ভারতের অন্যান্য সাহিত্যের সময় নির্দ্ধারণে কিন্তু ঠিক তেমনটী হয় না। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ভারত সাহিত্যের কোন্ অংশ কখন বিরচিত হইয়াছিল—তখনকার গ্রন্থকর্ত্তাই বা কে কে ছিলেন, ইত্যাদি বিষয় তৎতৎ গ্রন্থ হইতে ও অন্যান্য নানা উপায়ে কতকটা জানা যায়। বৈদেশিকগণের ভারতাগমন বৃত্তান্ত প্রভৃতি ঐ সমুদয় উপায়ের অন্যতম। খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে আলেকজেন্দর ভারতে আইসেন। ইহার পরে অপরাপর অনেক গ্রীক্ ভারতে আসিয়াছিলেন—তন্মধ্যে মেগাস্থিনিস সর্ব্ব প্রধান (খ্রীঃ পূঃ ৩০০)। ইহার

কয়েক শতাব্দী পরে তিনজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীন দেশীয় পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে ফাহিয়ান ৩৯৯ খ্রীঃ অব্দে, হিউএন্‌থসঙ ৬৩০-৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'ইসিঙ' ৬৭১-৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তাঁহাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাঁহারা নিজেরাই লিখিয়া গিয়াছেন। উহা অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ইংরাজী ভাষায় ঐ সমুদয় কাহিনী যথাযথরূপে অনুবাদিতও হইয়াছে। ঐ সকল অনুবাদ পাঠে, ভারতের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা ও ধর্ম্মের অবস্থা যে কি প্রকার ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে জানা যায়। সে সময়ের বৌদ্ধধর্ম্মের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিবরণ ঐ সমুদয় গ্রন্থে অতি বিশদ-রূপে লিখিত আছে। ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক অনেক অত্যাবশ্যক বৃত্তান্ত ঐ সকল অনুবাদিত ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায়। বিশেষতঃ হিউএন্‌থসঙ তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে তাঁহার সমকালবর্ত্তী কতিপয় প্রথিতনামা কবির সম্বন্ধে কতক ইতিবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঐ কবিগণ যে ৬৩০—৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা স্থির। হিউএন্‌থসঙ কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঐ কবিগণের সময় ব্যতীত, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন গ্রন্থকারের নির্দ্দিষ্টকাল বলা বড়ই কঠিন। তবে মাত্র তিন জন জ্যোতির্ব্বিদ তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁহারা যে, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ঐ সকল জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বুঝি যে, তাঁহাদের কেহ ৫ম কেহ বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। পূর্ব্বোক্ত চীন পর্য্যটকত্রয়ের প্রথম দুইজনে, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলবাস্তুর যে সকল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সূত্ররূপে ধরিয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কপিলবাস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে যতকিছু প্রধান পুরাতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে এটীও অন্যতম।

তারপর মুসলমান রাজত্ব সময়ের, ভারতের সর্ব্বপ্রকার ইতিবৃত্ত জানিবার পথই অতি সুপ্রশস্ত। কেননা ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরব-ভাষার গ্রন্থকার আলবেরুণি ভারতের এক অতি বিস্তৃত বিবরণগ্রন্থ লিখিয়া যান, ঐ পুস্তকের নাম "ভারত"।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল বা অতিপ্রাচীন কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি প্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, ইহা সবিস্তারে জানিবার আর একটী উপায়—পুরাতন শিলা-লিপি-পাঠ। বর্ত্তমান সময়ে যতপ্রকার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, তাহা সমস্তই হয় কোন প্রস্তর-স্তম্ভে, নতুবা কোনও পর্ব্বতগাত্রে খোদিত এবং সে সমস্তই সেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা অশোকের সমকালীন। রাজা অশোক, তদীয় অধিকৃত দেশ বা জনপদ সমূহের যেখানে যে কীর্ত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই প্রস্তরস্তম্ভে বা শিলাফলকে, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল শিলালিপি বা অনুশাসন তৎ‌তৎ‌ কালের ইতিহাস জানার পক্ষে বড়ই অনুকূল। সুতরাং অনুশাসন সাহায্যে দূরাবৃত্ত-জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে, যিনি অনুশাসনাবলীর একপ্রকার প্রতিষ্ঠাতা, ভারতের সেই গৌরবরবি অশোকের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অসঙ্গত হইবে না।

খ্রীঃ পূঃ ২৯২ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। তিনিও ২৮ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার তিন পুত্র—সুসীম, অশোক ও বীতশোক। অশোক যৌবনে

অতি দুরন্ত ছিলেন। এই জন্য তাঁহার চরিত্র শোধন মানসে রাজা বিন্দুসার তাঁহাকে সুদূর তক্ষশিলার শাসনভার অর্পণ করেন। সুসীম মগধেই থাকেন। বিন্দুসারের প্রধান মন্ত্রীর নাম রবি গুপ্ত। তাঁহার চরিত্র অতি সাধু ছিল। এ দিকে আবার সুসীম স্বকীয় চরিত্র-চাপল্যে অশোকের উপরে উঠেন; তাই প্রবীণ মন্ত্রী রবি গুপ্ত সুসীমকে তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত করিয়া অশোককে রাজধানীতে আনয়ন করেন। এই সময়ে, খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ অব্দে, বিন্দুসারের মৃত্যু হওয়ায়, রবি গুপ্ত অশোককেই মগধেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন।

অশোক আসমুদ্র বিস্তীর্ণ বিরাট মগধ-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও নিজের উৎকট রাজ্যলিপ্সা মিটাইতে পারেন নাই। প্রায় তিন বৎসর ঘোরতর যুদ্ধের পর, তিনি বঙ্গ-সাগরের তীরবর্ত্তী কলিঙ্গদেশ জয় করেন। কলিঙ্গের রাজগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। কলিঙ্গবিজয়ের পর হইতেই ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনু-রাগ জন্মে। অচিরেই তিনি ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। অশোক যৌবনে অতি দুরন্ত ছিলেন বলিয়া, সাধারণে তাঁহার 'চণ্ডাশোক' আখ্যা হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতেই তদীয় চরিত্র অতি উদার হও-য়ায়, তিনি 'ধর্ম্মাশোক' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সুশীতল অঞ্চলে যে অশোক আবাল্য বর্দ্ধিত, সেই অশোক, বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার ৬ বৎসর পরেই, যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বত্র প্রচার হয়, তৎপক্ষে বদ্ধ-পরিকর হয়েন। তাঁহার প্রাণসম প্রিয় পুত্র মহেন্দ্র ও বড় আদরের কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধভিক্ষু সাজাইয়া ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সুদূর সিংহল দ্বীপে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে মগধরাজধানী পাটলীপুত্র নগরে সুপণ্ডিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের এক অতি বিরাট সভা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পর, সবে আর দুইবার মাত্র ঐ প্রকার সুবৃহৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সভা হইয়াছিল। অশো-কের সময়ে ঐ ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। সেই সভায় বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাব-তীয় গ্রন্থাদিই বিশেষ নিয়মসহকারে শ্রেণী বিভাগ পূর্ব্বক পালি ভাষায় লিখিত হয়। এই সভার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক বিবিধ নিয়ম ও শাস্ত্র প্রভৃতি অতি বিশৃঙ্খল ছিল। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের ভূয়ঃ-প্রচার-বাসনায় অনেক বৌদ্ধভিক্ষু পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরণ করেন, তাঁহার প্রেরিত প্রচারকগণের মধ্যে কতিপয় গ্রীকেরও নাম পাওয়া যায়।

ধর্ম্মের বহুল প্রচার এবং মনুষ্য ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাই অশোক, রাজত্বের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। ভারতের নানাস্থানে —কোথাও বা পর্ব্বতগাত্রে, কোথাও বা প্রস্তরস্তম্ভে—তাঁহার অনেক সদুপদেশপূর্ণ অনুশাসন পাওয়া যায়। সেই অনুশাসনগুলি এমনই ভাবে লিখিত যে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ের সাধুবৃত্তি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। খৃঃ পূঃ ২৫৯ অব্দ হইতে ২২২ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। অশো-কের রাজত্ব কালে, তদীয় সুবিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে কোথাও কোনও প্রকার অশান্তি ছিল না। সুদূর কাটিবার রাজ্যের অন্তঃ-পাতী গিরনার্ বা গিরিনগর হইতে উড়িষ্যার ধৌলি উপত্যকা পর্য্যন্ত, এবং কাবুল নদের উত্তর তটবর্ত্তী কপুর-দি-গিরি, (Kapur-di-Giri) হইতে খালসি পর্য্যন্ত সুবিশাল ভূভাগ অশোকের অনুশাসন মালায় অলঙ্কৃত। ঐ সমস্ত অনুশাসনই আবিষ্কৃত, পঠিত এবং

অনুবাদিত হইয়াছে। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে একটী প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে খোদিত একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে; তাহা পাঠে জানা যায় যে, ঐ স্তম্ভ অশোক রোপণ করিয়াছেন। উহার গাত্রে লেখা আছে যে, "এই স্থানে ভগবান বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন।" তাই তাঁহার জন্মভূমির স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এই স্তম্ভ প্রোথিত হইল।" অনুশাসনাবলী-শীর্ষক প্রস্তাবে উহাদের কতিপয় প্রদর্শিত হইবে।

প্রাচীন সময়ে, ভারতে যে লিখিবার প্রণালী ছিল, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ এই সকল অশোক অনুশাসন মালা। পুরাকালে ভারতে লিখিবার নিয়ম ছিল কি না, এ সম্বন্ধে বহুকাল হইতে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে নানাপ্রকার মত-ভেদ চলিতেছিল; কিন্তু সম্প্রতি অধ্যাপক বুলার এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন-স্থাপত্য-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্লকের, অক্ষর বিদ্যা-বিষয়ক গবেষণার ফলে ঐ পূর্ব্বোক্ত গণ্ডগোল একপ্রকার মিটিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে আর কোন নূতন রহস্যোদ্‌ঘাটন না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হইবে।

অধ্যাপক বুলার বলেন যে,—খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে 'আরামিক' অক্ষরে ভারতের সিমেটিক লিখন প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে দুই প্রকার অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে খরোষ্ঠী নামক অক্ষর খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী পর্য্যন্ত গান্ধার প্রদেশে, অর্থাৎ পূর্ব্ব আফ্‌গানস্থানে ও উত্তর পঞ্চনদে চলিত ছিল। ঐ খরোষ্ঠী অক্ষর পূর্ব্বোক্ত "আরামাইক' অক্ষর হইতে গৃহীত। আরামাইক অক্ষর যেমন দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে লিখিত, ঐ খরোষ্ঠীও ঠিক সেইরূপ দক্ষিণ হইতে বামে লিখিতে হইত। ইহাতেই অনেকটা বুঝা যায় যে,—খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর 'আরামাইক' অক্ষরই তা'র একশত বৎসরের পরবর্ত্তী খারোষ্ঠীর মূল। ইহা ছাড়া 'ব্রাহ্মী' নামে প্রাচীন ভারতের আর এক প্রকার অক্ষর ফলকাদিতে পাওয়া যায়। বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে মনে হয় যে, এই ব্রাহ্মী লিপিই পুরাকালে ভারতের সকল জাতির প্রধান ব্যবহার্য্য অক্ষর ছিল। বস্তুতঃ ভারতের জাতীয় অক্ষরই "ব্রাহ্মী লিপি।" কেন না, পরবর্ত্তী সময়ে ভারতে যতপ্রকার বর্ণমালা প্রচলিত দেখা যায়, প্রায় সে সকলই 'ব্রাহ্মী' লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই 'ব্রাহ্মী' অক্ষর বামদিক হইতে ক্রমে ডাইনের দিকে লিখিত হইত। বর্ত্তমান কালের অপরাপর অক্ষরও তাহাই হয়।

কিন্তু একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে,—প্রাচীন কালে, যখন 'ব্রাহ্মী' অক্ষর সর্ব্ব প্রথম ভারতে প্রচলিত হয়, তখন উহা ডান দিক হইতে ক্রমে বাম দিকেই লিখিত হইত। কেন না, খৃঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীর একটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ঐ মুদ্রায় খোদিত অক্ষরমালা ক্রমে দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে লিখিত। ডাক্তার বুলার অনেক প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যীশুখ্রীষ্টের প্রায় ৮০০ আট শত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতের ঐ ব্রাহ্মী লিপি সর্ব্বপ্রথম ভারতাগত বণিকগণ কর্ত্তৃক মেছোপোটামিয়া হইতে আনীত হয়। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ আরও বলেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীরও পূর্ব্বেকার ভারতীয় সাহিত্যে যখন এমন কোন শব্দ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না, যাহাতে বুঝা যায় যে, তৎপূর্ব্বেও

ভারতে লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে এদেশে লিখন-প্রণালীর প্রচলন ছিল না। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সাহিত্যে কোনও বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেই কি 'তাহা তৎপূর্ব্বে ছিল না,' এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা সমীচীন? ভারতের অধিকাংশ সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও স্থলেই মুসলমানদের কোন কথার উল্লেখ নাই, তাই বলিয়া কি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ভারতে মুসলমান বিজয় আদৌ হয় নাই?

যাহা হউক, যদিও বহুকাল হইতে ভারতে লিখন-প্রণালীর প্রচলন হইয়াছে, নানা ভাষায় নানা প্রকার গ্রন্থ বহুকাল যাবৎ লিখিত হইয়া আসতেছে, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান সময়েও শাস্ত্রাদি বিষয়ক অনেক কথা অনেক শাস্ত্রীয় সাম্প্রদায়িক বার্ত্তা মুখে ২ আয়ত্ত করিতে হয়। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে সম্প্রদায় বিশেষের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। কোথাও তাহার কোনও লেখা পড়া নাই। যেমন 'নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের এই মত'—'মিথিলার এই মত' ইত্যাদি। বিশেষতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় উপদেশই উপদেষ্টার মুখ হইতে শিখিয়া লইতে হয়। উপদেশকর্ত্তা উপদেশ-দান কালে কোনও পুথিপাজির নাম করেন না, আজ কাল যদিও সকল শাস্ত্রই খবরের কাগজ ও বটতলার অনুগ্রহে মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি কোনও পূজাপার্ব্বণে যাঁহারা ছাপার পুঁথি ব্যবহার করেন, তাঁহারা ততটা সম্মান-ভাজন হয়েন না। যাঁহারা মুখে মুখে ধর্ম্ম কার্য্য করিতে বা করাইতে পারেন, তাঁহাদের আদর এখনও অসাধারণ। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, লেখা অপেক্ষা স্মৃতিই প্রাচীন ভারতে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উপায় ছিল। এমন কি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণও মনে করেন যে, তাঁহাদের কবিতা বই ধরিয়া পড়া অপেক্ষা স্মরণ পূর্ব্বক আবৃত্তি করাই তাঁহাদের পক্ষে সমধিক শ্লাঘার বিষয়। এ প্রবৃত্তি ভারতীয় মনীষিবৃন্দের মজ্জাগত। ক্রমে অন্য প্রস্তাবে আসিয়াছি। যাহা হউক, অশোকের অনুশাসনাবলীর অক্ষরমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, লিখন-প্রণালী ভারতে নূতন নহে। বহুপূর্ব্ব হইতে, সেই খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে উহা প্রচলিত। কেননা, অশোক-অনুশাসনের অধিকাংশ অক্ষরেরই নানা আকার দেখা যায়। এক খানিতে একটী অক্ষর যে ভাবে লিখিত, অন্য আর এক খানিতে হয়ত তাহা অন্য আকারে, কোনও সাদৃশ্যই নাই—এমন ভাবে লিখিত। এই প্রকারে কোনও কোনও অক্ষরের প্রায় ৮।১০ প্রকার ভেদ দেখা যায়। তারপর বুলার প্রভৃতির মতই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলেও, বিদেশ হইতে আনীত মাত্র ২২টী সিমেটিক অক্ষর ৪৬টী ব্রাহ্মী অক্ষরে পরিণত হইতে যে কত সুদীর্ঘসময়ের আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সম্পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা, ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক, অন্ততঃ খ্রীষ্টের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পাণিনির ব্যাকরণে এই বর্ণমালাই পরিগৃহীত হইয়াছে। এবং এখন পর্য্যন্তও উহাই প্রচলিত। ইউরোপের বর্ণমালার সহিত তুলনা করিলে, এই বর্ণমালার বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ইংরাজীতে এমন কতক গুলি ধ্বনি আছে, যাহার কোনটাই একটী বর্ণ দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। যথা চ(ch)। আবার এমন অনেক বর্ণ আছে

যাহারা নিষ্প্রয়োজন, যেমন c q ইত্যাদি এতদ্ভিন্ন একই বর্ণ নানা ধ্বনি প্রকাশ করে। যেমন a, এই অক্ষরটীর অগত্যা পাঁচটী উচ্চারণ আছে। এই দোষ গুলি সংস্কৃতে বর্ণমালায় একেবারেই নাই। সংস্কৃত যত গুলি ধ্বনি, ঠিক ততগুলি বর্ণ। আবার বর্ণমালার পাঠক্রমও অতি যুক্তিযুক্ত। প্রথম সমান বর্ণ, তারপর সন্ধ্যক্ষর। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে প্রথমে কণ্ঠ্যবর্ণ, পরে তালব্যবর্ণ, তৎপরে মূর্দ্ধণ্যবর্ণ, পরে দন্ত্যবর্ণ, সর্ব্বশেষে ওষ্ঠবর্ণ। তারপর অর্দ্ধস্বর য-র-ল-ব। তৎপরে উষ্মবর্ণ। প্রত্যেকবর্গে আবার প্রথমে অঘোষ অল্পপ্রাণ, পরে অঘোষ মহাপ্রাণ, ঘোষবত্ অল্পপ্রাণ, ঘোষবত্ মহাপ্রাণ ও অনুনাসিক। কি সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণী-বিভাগ !!! আজ ২৫০০; আড়াই হাজার বৎসরেও ইউরোপ এতদূর অগ্রসর হইতে পারিল না!

খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পাণিনির গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, তদনুসারে লিখিবার বর্ণমালা যে ঐ পাণিনির সময়েরও বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, একথা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা পাণিনিকে খ্রীঃ পূঃ ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর লোক বলেন, তাঁহাদের মতে, ভারতে লিখিবার রীতি যে ঐ ঐ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, ইহা স্থির। খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীর অনুশাসনাবলীর "ব্রাহ্মী" অক্ষরমালা আবার দুই প্রকার, অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের অনুশাসনে এক প্রকার, আর উত্তর ভারতের অনুশাসনে এক প্রকার। একই ব্রাহ্মীলিপি দুই বিভিন্ন প্রণালীতে লিখিত। উত্তর ভারতে যতপ্রকার প্রাচীন অক্ষরমালা প্রচলিত ছিল, প্রায় সে সমস্তই ঐ উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত। ঐ সকল অক্ষরমালার মধ্যে নাগর বা দেবনাগর অক্ষরই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কেননা প্রায় অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থাবলীই নাগরাক্ষরে লিখিত। যত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর একখানি অনুশাসনের সমগ্র অংশই নাগরাক্ষরে খোদিত। উহার পূর্ব্বেকার, নাগনাক্ষর খোদিত কোনও অনুশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐরূপ যত প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর একখানি গ্রন্থ নাগরাক্ষরে লিখিত। ঐ সময়ের পূর্ব্বে যে নাগরাক্ষরে কোনও গ্রন্থ লিখিত হইত, ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ ভারতে যে ব্রাহ্মীলিপি প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে প্রায় পাঁচ প্রকার অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ঐ সমস্ত অক্ষরই বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী ভূভাগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কানাড়া এবং তেলগু প্রদেশে ঐ সকল অক্ষরই প্রচলিত।

যে সকল পদার্থে প্রাচীন কালে গ্রন্থাদি লিখিত হইত, তাহা তত দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে বলিয়াই খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হস্ত লিখিত পুঁথি অতি কম পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে হয় তালপত্রে, না হয় ভূর্জ্জপত্রে গ্রন্থাদি লেখা হইত। ভারতের উত্তর পশ্চিম ভূভাগে বোধ হয় প্রথমতঃ ভূর্জ্জপত্রে লেখা আরম্ভ হয়। কেননা, ঐ স্থানে হিমালয়ের সমস্ত পাদদেশ ভূর্জ্জবনে আবৃত। এত অধিক ভূর্জ্জত্বক্ ভারতের অন্য কোনও স্থানে পাওয়া যায় না। তারপর ভূর্জ্জপত্রে লিখন-প্রথা ক্রমে ক্রমে মধ্য পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ভারতেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যত প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে— তন্মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, উহা খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হয়।

ইহা ব্যতীত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে খরোষ্ট্রী অক্ষরে লিখিত পালিভাষার যে গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে—উহাও ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এবং অতিশয় প্রাচীন।

যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্ব হইতে যে, ভারতে ভূর্জ্জপত্রে গ্রন্থাদি লিখিত হইত, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা "কুইণ্টস কারটিউয়াসের" (Quintus Curtius) নির্দ্দেশানুসারে বুঝিতে পারি যে, ভারতবাসীগণ, সেই আলেকজেন্দরের ভারতাগমনের সময়েও ( খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ) লিখিবার জন্য ভূর্জ্জপত্র ব্যবহার করিতেন। তার পর মধ্যকালবর্ত্তী সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদির বহু স্থলে ভূর্জ্জপত্রের প্রচলন বিষয়ে অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র, ভূর্জ্জত্বচঃ কুঞ্জর বিন্দুশোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধর-সুন্দরীণাং অনঙ্গলেখ ক্রিয়য়োপযোগম্

খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর ঐতিহাসিক আলবেরুণিও তদীয় সমকালবর্ত্তী গ্রন্থাদি যে ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হইত, তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাই, কোনও লেখা অক্ষয় করিবার মানসে ভূর্জ্জপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে তাহা অতি-অল্প। এখনও দীক্ষাদাতা ইষ্টদেব, ভূর্জ্জপত্রে উপাস্য দেবতার চক্রাদি অঙ্কনপূর্ব্বক, শিষ্যের মঙ্গলোদ্দেশে তাঁহাকে 'কবচ' দিয়া থাকেন। সুতরাং যতদূর জানা যাইতেছে, তাহাতে বুঝিতেছি যে, খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত, ভারতে, ভূর্জ্জপত্র লিখনের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

তালপত্রে লিখিত যে সমুদয় পুরাতন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে লেখা হয়। ঐ পুঁথি খানি জাপানের রাজকীয় পুস্তকালয়ে অদ্যাপিও সযত্নে রক্ষিত আছে। বিলাতের বোড্‌লিয়ান পুস্তকাগারের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু কর্ত্তৃপক্ষ ঐ জাপান দেশস্থ পুঁথির একখানি ঠিক প্রতিলিপি লইয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে যখন চীনপর্য্যটক হিউএনথসঙ ( হিউএনৎসঙ ) এদেশে আসেন, তখন তিনিও ভারতের অনেক স্থলে পুঁথির জন্য তালপত্রের বহুল প্রচার দেখিয়াছিলেন।

কেবল উপরিউক্ত দুইটী প্রমাণই প্রাচীন কালে তালপত্র প্রচলনের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, আমরা এতদপেক্ষা প্রাচীনতর সময়ে ভারতে তালপত্র ব্যবহারের নিদর্শন পাইতেছি। কিছুদিন হইল তাম্রফলকে খোদিত একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ঐ ফলক খ্রীঃ ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে বই পরে কোন ক্রমেই লিখিত হইতে পারে না। উক্ত তাম্রফলক, ঠিক একখানি তালপত্রের পুঁথির পাতার আকারে নির্ম্মিত, দেখিলেই মনে হয় যেন, সম্মুখে কোনও তালপত্রের পুঁথির পাতা রাখিয়া ধীরে ধীরে তদীয় প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তালপত্রে লিখিত পুঁথির আদর্শ জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার অনুকরণ করা অসম্ভব। এতদ্দ্বারা খ্রীঃ ১ম শতাব্দীরও পূর্ব্বে যে তালপত্রের পুঁথির প্রচলন ছিল, ইহা সহজেই স্বীকার্য্য।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও
শ্রীবনমালী কাব্যতীর্থ।

# বন্দে মাতরম্ মন্ত্র, ডেমক্রেসি ও দারিদ্র্য-সমস্যা।

"Father starving, mother naked and we hungry."

"One of my friends who had been lecturing in England delivered a lecture on the grievances of India. A man from the audience came and asked him how many of them there were. The lecturer replied, 30 crores. The inqueier replied, then you do not deserve anything. That is the attitude with which an English workman looks at the question. B. Tilak, New India, 12 Jan. 1907.

১৩০১ সালের বৈশাখ সংখ্যা নব্যভারতে প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম—"তিনি দল বাঁধেন নাই, অথচ তাঁহার অনুগত দল বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিয়াছে; তিনি নেতৃত্ব করেন নাই, অথচ সমগ্র সমাজ অলক্ষিতভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। মহা মহা পণ্ডিতেরা আজ তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছে। কালে যখন এ প্রভাব আরো বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য-প্রভায় এদেশ আলোকিত হইবে, তাঁহার জন্মভূমি মহাতীর্থে পরিণত হইবে। তখন দলে দলে লোক গগন কাঁপাইয়া "বন্দে মাতরং" মহা সঙ্গীত গাইবে, এবং মাতৃ পূজার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর এবং অক্ষয় প্রতিভার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবে। স্বদেশ প্রেম, নিষ্কাম ধর্ম্ম যখন বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিবে, তখন ঘোরান্ধকারের মধ্যে প্রতিভার অবতার "বঙ্কিমচন্দ্র" উজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিবেন।"

১৩০২ সালের বৈশাখ সংখ্যা নব্যভারতের যুগান্তর প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, "জনসাধারণের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতি কখনও উন্নত হয় নাই। এদেশের জনসাধারণ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কারে আজিও নিমজ্জিত। এই জনসাধারণের উন্নতি ভিন্ন এ দেশের উদ্ধার নাই। সাম্যানলে আভিজাত্য ভাব পোড়াইয়া, এদেশের অসংখ্য দরিদ্রের জীবন গঠন করিতে হইবে।"

এই দুটী প্রবন্ধই জাতি নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বোধ হয়, ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার পূরণের জন্য, এতদিন পরে, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের সর্ব্বত্র আদর হইতেছে।

ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা অতি কঠিন সমস্যা। এই সমস্যার সম্যক পূরণ না হইলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব।

১৩১১ সালের নব্যভারতে ভারতে দুর্ভিক্ষ নামক প্রবন্ধে ভারতের ঘোরতর দারিদ্র্য বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

"সার রবার্ট গ্রিফিন দেখাইয়াছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা লোক সংখ্যার অনুপাতে ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। তাঁহার প্রদত্ত তালিকা এই—

| দেশ | মোট আয় | সঞ্চিত ধন | লোক সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | কোটী পাউণ্ড | কোটী পাউণ্ড | লক্ষ |
| বৃটন | ১৭৫ | ১৫০০ | ৪.২০ |
| কানেডা | ২৭ | ১৩৫ | ৬০ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ২১ | ১১০ | ৩৫ |
| ভারতবর্ষ | ৬০ | ৩০০ | ৩০০০০ |

তাঁহার মতে ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটী অধিবাসী সম্বৎসরে যত টাকা উপার্জ্জন করে, বৃটনের চারি কোটী তিন লক্ষ লোকে কেবল খাদ্যপেয় সংগ্রহের জন্য তত টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। ১৮৮২ খ্রীঃ লর্ড রিপণের রাজত্বকালে লর্ড ক্রোমার স্থির করেন, ভারতবাসীর আয় ৪৬৮০০ লক্ষ পাউণ্ড, লোক সংখ্যা ২৫৩৭৩৩৫০০। গড়ে প্রতি জনের বার্ষিক আয় ১পা, ১৬ শিলিং অর্থাৎ ২৭৲ টাকা।

১৮৯৮ খ্রীঃ ভারতবাসীর আয় ৪২৮৮·৫৬৮৫০ টাকা, বা গড়ে বার্ষিক আয় ১৮৵ হইয়াছিল, ১৯০১ খ্রীঃ ২৮৯৯৫৯৯১৯ পা বা জন প্রতি ২৫৲ টাকা ছিল, ডিগবী একথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন ও গ্রিফিনের মতে এক্ষণে ভারতবাসীর বার্ষিক আয় জন প্রতি ৩০৲ টাকা। ৩০৲ টাকা হইলে দৈনিক ⁄৪ পাই পড়ে। ঐ সামান্য আয়ে আহার, পরিচ্ছদ, রাজস্ব সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।" নব্যভারত ১৩১১—১৯৪, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

এই আয়ে প্রতি জনকে কত রাজস্ব দিতে হয়, দেখুন—

| দেশ | বার্ষিক আয় | দেয় রাজস্ব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ইংলণ্ড | ৩৬০ | ৩০ | ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি পাউণ্ড দশ ১৫ টাকা হিসাবে গণনা করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। |
| ইউনাইটেড ষ্টেটস্ আমেরিকা | ৩৪০ | | |
| ফ্রান্স | ২৯০ | ৩৪ | |
| জর্ম্মাণি | ১৮৫ | ২৫ | |
| ইটালী | ৭৫ | ১৩ | |
| স্পেন | ৬৫ | ২০ | |
| জাপান | ৬০ | ৪ | |
| ভারতবর্ষ | ২০ | ৪ | |

লর্ড কার্জ্জনের হিসাব মতে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় গড়ে ৩০৲ টাকা ধরিলে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর আয়ের ১১·৪ ভাগ রাজস্ব স্বরূপ দিতে হয়। নব্যভারত, ১৩১১—২৩২ ও ২৩৩ পৃষ্ঠা।

ইহা বাদে লবণ কর, আয় কর ও অন্যান্য নানা প্রকার কর আছে। তাহা বাদে আমদানি রপ্তানির তালিকা দেখুন—

| প্রদেশ | আমদানি | রপ্তানি |
|---|---|---|
| | কোটী টাকা | কোটী টাকা |
| ইংলণ্ড | ৪২৭ | ৩৩২ |
| জর্ম্মাণি | ২৪১ | ২৪২ |
| ফ্রান্স | ২০২ | ১৮১ |
| আমেরিকা | ১৪৮ | ১৫৬ |
| হল্যাণ্ড | ১০ | ৯ |
| তুরস্ক | ১৬ | ১২ |
| ভারতবর্ষ | ৮০ | ৯৮ |
| মিসর | | ১০ |

কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে গোধন রক্ষা ও পালন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চামড়া রপ্তানির মূল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিবেন, কিরূপে গোবংশ ধ্বংস হইতেছে।

| | কোটী টাকা |
|---|---|
| ১৮৯৮-৯৯ | ৭·৪৩ |
| ১৮৯৯-১৯০০ | ১০·৪৬ |
| ১৯০০-১ | ১১·৪৬ |

নব্যভারত ১৩১১—৪১৩, ৪১৭ পৃষ্ঠা।

অন্য দিকে সামরিক ব্যয় ও বিলাতের ব্যয়, কমপেনসেসন ব্যয় প্রভৃতিতে ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে।

"রাজস্বের অনুপাতে রুশিয়ার সামরিক ব্যয় শতকরা ২৩, ফ্রান্স ২৫·৯, জর্ম্মাণি ২৪, ভারতবর্ষের শতকরা ৩২। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের অনুপাত দেখুন—

| বিভাগ | য়ুরোপীয় | দেশীয় |
|---|---|---|
| বন বিভাগ | ২২ | ২ |
| চুঙ্গি | ৩১ | ১ |
| সর্ভে | ১৩ | ০ |
| পুলিস | ১০৩ | ৬ |
| টেলিগ্রাফ | ৭৫ | ৪ |

যে সকল কর্ম্মে বার্ষিক আয় হাজার টাকার উপর, ঐ কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১৭ কোটী টাকা ব্যয় করেন, ইহার মধ্যে ১৪ কোটী ইংরাজ কর্ম্মচারী পাইয়া থাকে।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে হোম চার্জ্জের জন্য ৫ কোটী টাকার অধিক ব্যয় হইত না, ১৮ বৎ-

সর পূর্ব্বে এইজন্য ১৮·০ কোটী টাকা ব্যয় হইত, এক্ষণে ব্যয় হইতেছে ৩০ কোটী। গত ৩০ বৎসরে বার্ষিক গড়ে ৩ কোটী পাউণ্ড হিসাবে ৯০ কোটী পাউণ্ড বা ১৩৫ কোটী টাকা ভারতবর্ষ হইতে চির-নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই জন্যই এদেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ—নিত্য প্রাণীক্ষয়।" নব্যভারত ১৩১১—৪৯৯ ও ৫০১ পৃষ্ঠা।

বহুদিন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সহবাসে থাকিয়া এবার আমাদের মনে দুটী কথা জাগিয়াছে—প্রথম কথা "বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে" নিম্ন শ্রেণীর লোক সকল প্রমত্ত হইল না কেন? আমি গোপনে থাকিয়া কত বার শুনিয়াছি, তাহারা "বন্দে মারতম্" শব্দের কত কদর্য্য অর্থ করিয়াছে এবং কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছে। অন্যকথা এই, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অর্থগতআভিজাত্য ভাব দিন দিন বাড়িয়া উঠিল কেন? এক সময়ে ভাবিতাম, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের নিম্ন শ্রেণী উন্নত হইলে, জাতীয় একতা-বলে অর্থগতআভিজাত্য ভাব বিদূরিত হইবে এবং সকল ভাই ডেমক্রেসিতে একপ্রাণ হইয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে ডেমক্রেসিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ কাল অর্থগত আভিজাত্যাভিমানের পথে অগ্রসর হইতেছেন। এক জনও দেখি না, যিনি ডেমক্রেসির কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন। টাকার খাতির দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কে কত চাঁদা দেয়, তাহার হিসাবে আজ কাল মনুষ্যত্ব ও সাধুত্ব গণিত হইতেছে। আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন আমার এক জন কৃতবিদ্য বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, "যখন তোমার বেতন ৫০৲ টাকার উপরে উঠিবে, তখন আর আমাদের সহিত তুমি কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না, কেননা, তখন তোমাকে আভিজাত্যভাব গ্রাস করিবে।" বার্দ্ধক্যে পৌঁছিয়া বুঝিতেছি, একথা বড়ই সত্য। কত কাঙ্গাল বন্ধু ধনী হইয়া ধনীর দল পুষ্ট করিয়াছেন, সংখ্যা করা যায় না। দেশের দুঃখী শ্রেণী, দরিদ্র শ্রেণীর কথা ভাবিবার লোক আজ কাল বড় একটা দেখি না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় থিস্‌টিক্ কন্‌ফারেন্সে বলিয়াছেন—

"Up to this time, with the exception of one or two cases, the Brahmo Samaj has neglected the masses; and has mostly confined its attention to the educated classes."

ব্রাহ্মসমাজ যে নিম্ন শ্রেণীকে ভুলিয়া রহিয়াছে, কেবল তাহা নহে; ব্রাহ্মসমাজ দৃষ্টান্তের দ্বারা দিন দিন আভিজাত্যের পূজা এই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। নচেৎ শাস্ত্রী মহাশয় যে সভায় উপরোক্ত মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, ঐ সভার রিসেফসন্-কমিটীর সভাপতি রূপে ময়ূরভঞ্জের মহারাজার নামে শোভিত হইত না; এবং তিনি নিমন্ত্রণ-কার্ডে "মহারাজা অব্ ময়ূরভঞ্জ—প্রেসিডেণ্ট" বলিয়া স্বাক্ষর করিতে লজ্জিত হইতেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা কয়েকটা টাকা ব্রাহ্মসমাজে দিয়াছেন, অমনি ব্রাহ্ম মহলে তিনি অদ্বিতীয় লোক বলিয়া পূজিত হইতেছেন। মহারাজারা ভাল লোক, তাহা জানি, কিন্তু তাঁহারা যে পৌত্তলিক নহেন, একথা এখনও বুঝা যাইতেছে না। আভিজাত্যাভিমানের আকর্ষণ ভিন্ন তাঁহাদের সম্মান-প্রাপ্তির আর কোন অধিকার ছিল না। দেশের শিক্ষিত লোকের মতি গতি, অলক্ষিত ভাবে, ব্রাহ্ম সমাজকে অর্থগতআভিজাত্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজকে নীতি, চরিত্র, ও ধর্ম্মভাব

হইতে বিচ্যুত করিয়া অর্থ-মূলক আভিজাত্যে দীক্ষিত করিতে পারিলেই ব্রাহ্মসমাজ-নাশের বীজ রোপিত হয়, সাধারণের এই বিশ্বাস। প্রদর্শনী-কমিটীর সভাপতি হইলেন, দ্বারভঙ্গের মহারাজা, প্রদর্শনী খুলিলেন, রাজপ্রতিনিধি। সুতরাং কংগ্রেসের অনুকরণে গঠিত থিস্‌টিক্‌ কন্‌ফারেন্সের রিসেফসন্‌ কমিটীর সভাপতি হইলেন ময়ূরভঞ্জের মহারাজা! কুচবেহার,ময়ূরভঞ্জ, বর্দ্ধমান, এখন ব্রাহ্মসমাজের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় হইয়াছেন। দেখিতেছি, ইম্পিরিয়ালিজম্‌ ইংলণ্ডকে এবং অর্থগত আভিজাত্য ভারতকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

ম্যাট্‌সিনির জীবনব্যাপী সাধনার পরেও যখন ইতালীতে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী এবং ডেমক্রেসি প্রতিষ্ঠিত হইল না, তখন ম্যাটসিনি বলিয়াছিলেন "Itally profaned by monarchy" তিনি দেখিবেন না।* কিন্তু আমরা শিক্ষিত হইয়া,স্বদেশীর ধূয়া ধরিয়া ও "বন্দে মাতরম্‌" শব্দে দিক কাঁপাইয়াও, ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজা মহারাজাদিগের পা চাটিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছি এবং নিম্নশ্রেণীকে দিন দিন আরো ভুলিয়া যাইতেছি!! কি দুঃখের কথা। এই স্থানে নমঃশূদ্রশ্রেণীর সম্বন্ধে ১৯০৬খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রচার নামক মাসিক পত্র হইতে এই টুকু না তুলিয়া দিয়া পারিলাম না।

"ফরিদপুর অঞ্চলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সংখ্যা বড় কম নহে। গত লোক গণনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমগ্র ফরিদপুরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫,৭০,০০০। তন্মধ্যে নমঃশূদ্রের সংখ্যা ৩,২০,০০০। অন্যান্য হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা নমঃশূদ্রদিগের সংখ্যা অনেক অধিক। সুতরাং নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণই ফরিদপুর অঞ্চলের মেরুদণ্ড ও শক্তিস্বরূপ; আর নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণের উত্থানেই ফরিদপুরের উত্থান, এবং তাঁহাদের পতনেই ফরিদপুরের অধোগতি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একদেশদর্শিতা এবং অত্যাচারে এতদিন নমঃশূদ্র সম্প্রদায় নিস্তেজ ও হীনপ্রভ হইয়াছিলেন, তাঁহারা এতদিন অতি হীন অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু ব্রীটিশাধিকারে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ তেজঃসম্পন্ন এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন, এবং তাঁহারা ক্রমশঃ সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভে অগ্রসর হইতেছেন। নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণ স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক। তাঁহারা যে পরম কল্যাণকর সমাজ-সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও যে তাঁহারা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়, তাঁহাদের এই প্রশংসনীয় কার্য্যের গতি রোধ করা কাহার সাধ্য?

নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণের, বিশেষতঃ নমঃশূদ্র নেতাগণের সম্মুখে ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা সমুপস্থিত। এই পরীক্ষায় তাঁহাদিগকে জয়লাভ করিতে হইবে। এই পরীক্ষায় যখন তাঁহারা জয়লাভ করিবেন, তখন ব্রহ্মণ কায়স্থ জাতীয় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সহিত সমবেদিতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহারা সাম্য ও স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়াইতে সমর্থ হইবেন; বরং তাঁহাদের অপেক্ষা আরও উচ্চ আধ্যাত্মিক বেদিতে দণ্ডায়মান হইয়া,তাঁহারাই আবার ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের শিক্ষাগুরুর সম্মানিত আসন পরিগ্রহ করিবেন। ইহা কি সম্ভব? ঈশ্বররাজ্যে অসম্ভব কি আছে? নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণের ভিতরে যে জ্বলন্ত অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় প্রধূমিত হইতেছে, তাহা একদিন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, নমঃশূদ্র জাতি অগ্নিময় হইয়া উঠিবে। তখন জগৎ দেখিতে পাইবে, ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া, যে উন্নতিশীল জাতিকে এতদিন পদদলিত করিয়া আসিতেছিলেন, আজ স্বর্গীয় অগ্নির সংস্পর্শে সেই জাতি কেমন শিক্ষায়, সভ্যতায় ও ধর্ম্মে আদর্শ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে!

বলিতেছিলাম, উন্নতিশীল নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণের সম্মুখে ঘোর অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। এ পরীক্ষা কোথা হইতে আসিতেছে? প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; দ্বিতীয়তঃ, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক; এবং তৃতীয়তঃ, গৃহ-শত্রু। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পূর্ব্বপুরুষগণ নমঃশূদ্র জাতিকে হিন্দু জাতির অতি নিম-

* A Memoir by E. A. V. Page 16.

দূরে রাখিয়াছিলেন. সেই নমঃশূদ্র জাতির শিক্ষিত যুবকগণকে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুদিগের সহিত সম আসনে সন্নিবেশিত দেখিয়া, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এক্ষণে ঈর্ষানলে জ্বলিতেছেন, এবং তাঁহাদের প্রতি প্রতিনিয়ত বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে আবার পদতলে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অসার যুক্তিতর্ক ও কুটিল শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আর নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণের জ্ঞানোজ্জ্বল বিবেক পরাভব মানিতেছে না। এক দিকে শিক্ষিত নমঃশূদ্র যুবকগণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দলবদ্ধ হইয়া, মুক্তকণ্ঠে মহোল্লাসে সাম্য ও স্বাধীনতার গীত গাহিতেছেন, আর ঈশ্বরের নিকট কাতরভাবে স্বজাতির মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, অন্য দিকে নিরাশহৃদয় ক্ষুব্ধপ্রাণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছেন! তাঁহারা অভিসম্পাত করিতেছেন করুন; চিরকালই তাঁহারা উন্নতিশীল জাতিকে অভিসম্পাত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অভিসম্পাতে উন্নতিশীল নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণের কোন ক্ষতি হইবে না. তাঁহাদের জাতীয় উন্নতির গতিরোধ কিছুতেই হইবে না। খ্রীষ্ট বলেন, "ঈশ্বর যাহার সপক্ষ, তাহার বিপক্ষ কে হইতে পারে? উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুগণ শিক্ষিত নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণকে রাজদ্বারে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান দেখিয়া,তাঁহাদিগকে "বয়কট" করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কোথায় তাঁহারা উদীয়মান নমঃশূদ্রদিগের উন্নতিদর্শনে উল্লাস করিবেন, তাঁহাদের উন্নতিতে শ্লাঘা করিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহাদিগকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাই কি উচ্চ শিক্ষার সুফল! ইহাই কি স্বদেশ প্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ!! নমঃশূদ্র জাতির বহির্ভূত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কারণ এদেশে এ সব ব্যবহার সম্ভব। কিন্তু নমঃশূদ্র জাতির অন্তর্ভূক্ত শিক্ষিত নমঃশূদ্রগণ কোন্ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের স্বজাতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উন্নতির সম্মুখে বাধা প্রদান করিতেছেন? এই সকল গৃহশত্রুর ব্যবহারে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। কিন্তু আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, আমরা যে জগতে বাস করি, তাহাতে "ইকোয়িতীয় বিহদা কিম্বা বিভীষণের অভাব নাই।"

এবার দুর্ভিক্ষের সময় এদেশের শিক্ষিত শ্রেণী নিম্ন-শ্রেণীর জন্য মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন,সে কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অর্থ সাহায্য করা ভিন্ন এদেশের কয়জন নেতা দরিদ্রদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন? দূর হইতে অর্থ সাহায্য করিলেই তাহাদের উন্নতি হইবে না; তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদিগকে জাগাইতে হইবে, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। রক্ষার উপায় কোথায়? জাগাইতে কে চেষ্টা করিতেছেন? তাহাদের শিক্ষার উন্নতি এবং চরিত্রের উন্নতির জন্যই বা কে চেষ্টা করিতেছেন? আমাদের দেশের আত্ম-সম্মান-সর্ব্বস্ব শিক্ষিত-দল, চিরদিনই নিম্নশ্রেণীকে ভুলিয়া রহিয়াছেন।

গত ২২ বৎসর জাতীয় মহাসমিতি বসিতেছে। বৎসরান্তে ইংরাজ-শাসন-নীতির সমালোচনা এবং আবেদন-নিবেদন ভিন্ন মহাসমিতি আর কোন কাজ হাতে নিতে পারিলেন না! প্রতিনিধিগণের যাতায়াত ব্যয় ও পোষাক-পরিচ্ছদ সমেত প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর ব্যয় হইতেছে, কিন্তু সকলই যেন ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ! কেন না, সাজাইয়া গোজাইয়া যত কথা বল, সবই মুহূর্ত্তে ইংরাজেরা উড়াইয়া দিতেছেন! নারোজীর এত সারপূর্ণ কথাও টাইমস্ উড়াইয়া দিয়াছেন! তবুও নেতারা বলেন, আবেদন নিবেদনে এখনও ফল ফলিবে! এতদিন পরও ভিক্ষা-নীতির কুহেলিকা! শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ বলেন—

"We may be called political mendicants but I will give you one illustration that

will go home to you: If you had a starving mother at home and no money to buy bread to save her life, is there a man in this vast assembiy who would be ashamed to beg for it and if so shall we be ashamed to do the samething for our common mother, the land that gave us birth. ?"

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এ কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে,"ভিক্ষানীতি ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়, কুন্তী সন্তানদিগকে ভিক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।" কিন্তু একটী কথা তিলক বলেন নাই,—ভিক্ষা করিয়া মাকে খাওয়ান ভাল, না,নিজে খাটিয়া উপার্জ্জন করিয়া খাওয়ান ভাল? কেহ ভিক্ষা না দিলে কি মাতাকে মরিতে দেখিবে? ইংরাজ এতদিনেও ভিক্ষা দিলেন না, মা মৃত্যুমুখে, তবুও নিজে কিছু করিবে না? অর্থগতআভিজাত্য-পিপাসু দল নেতৃত্ব পাইলে তাঁহাদের মুখে যাহা শোনা সম্ভব, এতদিন কেবল তাহাই শুনিলাম!

জন ব্রাইট বিশ বৎসর গ্লাডোষ্টোনের দলের সেবা করিয়া শেষে মিসর-সমরের সমস্যা পূরণের গোলে গ্লাডোষ্টোনের মমতা ছাড়িলেন। গ্লাডোষ্টোন তবুও ক্ষান্ত হইলেন না। গ্লাডোষ্টোন আইরিশ-হোম-রুল দিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, তবুও পারিলেন না। তাহার দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু তবুও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। এবার ব্যানারম্যান, মরলি-প্রমুখদল এডুকেশন বিলকে যে জাতির দ্বারা আইনে পরিণত করিতে পারিলেন না,ঘোর ইম্পিরিয়ালিজম ও আভিজাত্যাভিমানের উপাসক সেই জাতির নিকটই আমাদের সমস্ত আশা নাকি সংন্যস্ত, মাকে বাঁচাইবার জন্য সেই জাতিরই পা চাটাব্রত ধরিয়া থাকিতে হইবে! তবুও সন্তান নিজে কিছু করিবে না! এমন নির্লজ্জ মাতৃভক্ত সন্তান কেহ কখনও কোন দেশের ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন কি?

এদেশকে জাগাইতে হইলে নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, সব গেল, নিম্নশ্রেণী মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িল, তবুও আবেদন নিবেদন অবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার চেষ্টা! এই যে দেশে মহা ধুমধাম করিয়া ইক্‌জিবিসন বসিল, কয়জন কাঙ্গাল-গরিবকে ডাকিয়া তাহাদিগকে তোমরা কল কারখানা দেখাইয়াছ? যাহা কিছু করিয়াছ, তাহা বিদেশী সয়তানগণ দেখিয়া শুনিয়া তোমাদের সব শিখিয়া লইবে; কিন্তু যাহাদের জন্য ইক্‌জিবিসন—তাহাদিগকে ডাকিয়া ত একবারও দেখাইলে না! জাতীয় একতার মিলন-ভূমি কংগ্রেস বলিয়া গেলেন—"The boycott movement is inaugurated in Bengal was and legitimate." কথা শুনিয়া বুঝিলাম,এক অঙ্গের আঘাতে অন্য অঙ্গ ক্ষতিবোধ করিবেন না। শুনিয়া অঙ্গ শীতল হইল! ইহাকেই বলে জাতীয় একতা! এক এক সময়ে এক এক অঙ্গকে দুর্ব্বল করাই ইংরাজ-নীতি। স্বতন্ত্রীকরণ বা বিভেদ-নীতিই ইংরাজ-শাসনের বর্ত্তমান মূলমন্ত্র। তাঁহারা আজ বঙ্গ, কাল বম্বে, পরশ্ব মান্দ্রাজ—এই রূপ এক এক অঙ্গ ধরিয়া দুর্ব্বল করিবে। প্রাদেশিক প্রশ্নে যদি সমগ্র ভারতের সহানুভূতি না থাকে, কংগ্রেস থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি? দুঃখের বিষয় এই, এ কথা বুঝিবার লোক মিলে না। গোবরডাঙ্গায় গত বৎসর ৪টী চিনির কারখানা নূতন খুলিয়াছিল, বৌণ্টি-ফেড চিনির সহিত যোগ্যতা করিতে না পারিয়া ফেল হইয়াছে। ফেল হইবেই ত, Boycott ভিন্ন দেশের মৃত কারবার জাগিবে কিরূপে? ইহাকেই নাকি বলে জাতীয় একতা। কিন্তু আমাদের দুঃখে

ভারতের অন্যান্য দেশের লোকের চক্ষে জল নাই ; শুনিয়া বেশ শিক্ষা হইল। তাঁহারা বলেন, ইংরাজ ভারতের সকল অভাব দূর করিয়া দিবেন। ইংরাজ গত শত বৎসরে ভারতের কি করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা না বুঝেন,এবং যাঁহারা পৃথিবীর দাস ব্যবসায় তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া মহাভ্রান্তি। ইংরাজ শোষণ-নীতির দ্বারা এদেশকে কিরূপ সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, ডিগবি সাহেবের পুস্তক খানি পড়, বুঝিতে পারিবে। শোষণের যাহা বাকী আছে, অচিরাৎ তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। কিছু বিলম্ব কর—তবেই দেখিবে, তাঁহারা কিরূপ অভাব দূর করেন। ইংরাজ বলেন, "ভারতবাসী চায় কি ?—hewers of wood and drawers of water"—ভিন্ন আর কি হইতে চায় ? বড় আস্পর্দ্ধার কথা — ভারতবাসী আবার ধর্ম্মঘট করে ? দেখি কিসে তাহারা মানুষ হইতে পারে ?"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যে জাতির লোকেরা দরিদ্র ভারতকে অহিফেন ও চা-পানে মত্ত করিবার জন্য ইউল কোম্পানিকে পাণ্ডা খাড়া করিয়াছেন, নীলের ন্যায় পাটের দাদন দিয়া ধান চাষ বন্ধ করিয়া সকলকে অন্নহীন করিবার জন্য গুপ্তচর খাড়া করিয়াছেন, এবং ধান ক্ষেত হইতে উঠিবা মাত্র দাদন দ্বারা তাহা আত্মসাৎ পূর্ব্বক রপ্তানি করিয়া, ধান চাউলের বাজারকে চড়াইয়া দিয়া, অনাহারে মারিয়া লোকদিগকে দুর্ব্বল করিতেছেন, সেই জাতির পা চাটিতে হইবে! বলিতে লজ্জা হয়, "নিত্য দুর্ভিক্ষ ভিন্ন ভারত শাসনের নাকি অন্য উপায় নাই ;—ভাষাভেদ, জাতিভেদ, প্রদেশ-ভেদ ভিন্ন একতার হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।"—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যাঁহারা কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহাদিগের পা চাটিয়া মাকে বাঁচাইতে হইবে, এই হইল তাঁহাদের নীতি !! তাঁহারা বড় বড় লোক, তাঁহাদের বড় বড় মাথা,তাঁহারা বড় বড় জ্ঞানী, তাঁহাদের সহিত আঁটিয়া উঠে সাধ্য কাহার ? তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিলে মাতার মৃত্যু অপরিহার্য্য। সমগ্র দেশ এখন কি করে, দেখিবার দিন উপস্থিত।

১০ই মাঘের সঞ্জীবনীতে ( ১৩১৩) পাটের চাষের উপকারিতা দেখাইয়া কোন গবর্ণমেণ্ট-গুপ্তচর একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"১৯০০ সালে ৩২৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, গত বৎসর প্রায় ৪২৫ লক্ষ মণ উৎপন্ন হইয়াছে। * * সত্য সত্য কি পাটের চাষ দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধি করিতেছে ? সমগ্র বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ৫৯০৫৮৯০০ একর, তন্মধ্যে ৩১৯০০০০ একর জমীতে ১৯০৫ সনে পাট চাষ হইয়াছিল। পাটের জমীর পরিমাণ কর্ষিত জমীর শতকরা কিঞ্চিতাধিক ৫ ভাগ মাত্র।" পাট যে জমীতে হয়, ধানও সেই জমীতে হয়, পাটের চাষ বৃদ্ধি হইলে ধানের চাষ যে কমিবে, তাহা অপরিহার্য্য। ঐ কর্ষিত জমীর মধ্যে চা অনেক জমীতে হয়। পাট ও শোন বঙ্গে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মদেশ বাদে, ধান্য ও প্রধানতঃ বঙ্গে উৎপন্ন হয়। সুতরাং পাটের চাষ বৃদ্ধি হইলে ধান্যের চাষ যে হ্রাস হইবে, তাহা অপরিহার্য্য। তিনি লিখিয়াছেন, "কোটালীপাড়ে পাট হয় নাই।" একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ৬ মাস ঐ অঞ্চলে পাটের সময়ে থাকিয়া আসিয়াছি। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত জমীতে পাট হইয়াছিল। কৃষকের ঘরে ধান থাকিলে আহার মিলিত, কিন্তু

টাকা থাকিলে জমীদার, মহাজন ও বিলাসিতার হস্ত হইতে বাঁচাইয়া দুর্ম্মূল্যে চাউল কিরূপে কিনিতে পারিবে? ফলে অনেক গৃহেই হাহাকার! এবার ইংরাজের উত্তেজনায় পাট চাষের বৃদ্ধি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে আরো হইবে। এজন্য বঙ্গের দুর্ভিক্ষ যাইয়াও যাইতেছে না। বিশেষতঃ নানা বিদেশী কোম্পানী চাউল কিনিয়া ফেলিতেছেন; ধান চাউলের আমদানির সময়েই বাজার দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। দেশকে রক্ষা করার উপায় কি? পাটপাতা খাইলে দগ্ধ উদর পূরণ হয় না,—হইলে কথা ছিল না, কিন্তু তাহা হয় না।এদিকে পাটপচা জলের দ্বারা ম্যালেরিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। অনাহার ও ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে কে দেশ রক্ষা করিবে?

আমরা কত বৎসর ধরিয়া লিখিতেছি, দারিদ্র্য-সমস্যা ভারতের প্রধান সমস্যা। ভারতকে জাগাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে নিম্নশ্রেণীকে অশিক্ষা, ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা করিতে হইলে, সহরে সহরে, জেলায় জেলায় সবডিবিসনে সবডিবিসনে, থানায় থানায়, কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। মহাজনদিগের টাকায় টাকা সুদের দৌরাত্ম্যে নিম্নশ্রেণী অবসন্ন ও ম্রিয়মান; তাহারা স্ফূর্ত্তিহীন—দিন দিন দুর্ব্বল ও নির্জীব হইয়া পড়িতেছে। দিন দিন তাহারা মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহাদের মধ্যে এখন কেবল দারিদ্র-সমস্যা নিবদ্ধ হয়—ক্রমে ক্রমে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীকেও দারিদ্র্য-সমস্যা গ্রাস করিতেছে। কেবল যে নিম্নশ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, তাহা নহে, গত দশ বৎসরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সংখ্যাও অনেক হ্রাস হইয়াছে। তাঁহারাও স্ফূর্ত্তিহীন, দুর্ব্বল হইয়া জনন-শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। দারিদ্র্য-গ্রাসে ভারতের সকল উন্নতির স্রোত বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এই সমস্যার পূরণ না হইলে, হাজার চেষ্টাতেও দেশ রক্ষা পাইবে না। বলিতেছিলাম, থানায় থানায়, সবডিবিসনে সবডিবিসনে ও জেলায় জেলায় যে কৃষিব্যাঙ্ক হইবে, তাহা কালে কেন্দ্র-সমিতিতে পরিণত হইবে এবং সেখান হইতে জন-শিক্ষার বন্দোবস্ত হইবে এবং ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া সাধারণের চরিত্রের উন্নতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করা হইবে। এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে স্বদেশানুরাগের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া জাতীয় একতায় সকলকে বদ্ধ করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ কার্য্যের সুফল দুই চারি বৎসরে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু এখনই কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। নচেৎ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

লর্ড মিণ্টো যে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা ভাল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। সে দিকে চাহিয়া না থাকিয়া সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা সর্ব্ব প্রযত্নে করা উচিত।

ইংরাজ-বর্গীর চেষ্টা,দুর্ভিক্ষ এদেশকে চিরকালের জন্য গ্রাস করিয়া থাকুক। দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে এদেশকে রক্ষা করিতে স্বদেশভক্তের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। সদা বয়কট ভিন্ন এই পরাধীন দেশকে রক্ষা করার আর অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই। বিদেশী মাল স্বদেশের নামে যাহারা বিক্রয় করিতেছে, তাহাদিগকেও বয়কট করিতে হইবে। বিদেশী রাজার শোষণ কার্য্য অবাধে চলিয়াছে এবং চলিবে, কেহ তাহার স্রোত রোধ করিতে পারিবে না; কিন্তু

বাণিজ্যের পথ দিয়া যে শোষণ কার্য্য চলিতেছে, তাহার স্রোত বন্ধ না করিতে পারিলে কিছুতেই দেশ রক্ষা হইবে না। এই শোষণ কার্য্য রোধ করার পক্ষে বয়কটই এক মাত্র অমোঘ ঔষধ।

গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন, কিছু সময় অতীত হইলেই আন্দোলনকারীদিগের উত্তেজনা কমিয়া যাইবে, তখন বঙ্গ-বিভাগের সুফল ফলিবে; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে ভেদনীতিতে সকলে অভ্যস্ত হইবে। গবর্ণমেণ্ট অন্য উপায়েও সে কার্য্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কাহাকেও উপাধি দ্বারা, কাহারও পুত্রকে ডেপুটীগিরি বা অন্য চাকরী দিয়া, কাহাকেও কৌন্সিলের সদস্য পদ দিয়া এবং জমীদারদিগকে টেনান্সি-আইন-সংশোধনের প্রলোভনে ভুলাইয়া পক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কোন কোন স্থলে শুধু গায়ে হাত বুলাইয়া কার্য্য সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকার জঙ্গি লাট এই মন্ত্রে কার্য্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। লর্ড মিণ্টোও এই মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া, স্বদেশভক্তের মধ্যে ভাল মন্দের (true and fals) বিচার তুলিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতিকে হাত করিতেছেন। কুটুম্বিতার খাতিরে যোগেশচন্দ্রের দলে সুরেন্দ্র নাথ না আসিয়াই পারেন না। সুতরাং কংগ্রেস-মণ্ডপে বয়কট সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইলেও, যে সুরেন্দ্রনাথ বয়কটের প্রধান প্রতিপোষক, সেই সুরেন্দ্রনাথও নীরব রহিলেন; এবং বঙ্গের এক বৎসরের কার্য্যকে তীব্র সমালোচনার হস্তে জীবন ত্যাগ করিতে দেখিয়াও স্পন্দহীন রহিলেন। আমাদের মনে হয়, বয়কট প্রস্তাবকে এরূপে উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইতে দিয়া, নেতারা ভাল করেন নাই। যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ঐ প্রস্তাব প্রস্তাবই নয়। উহাতে আরো অনিষ্ট হইয়াছে, ইংরাজেরা হাসিতেছে। বঙ্গের মৃত্যুতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহানুভূতি পাওয়া গেল না, সকলে বয়কট-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন না, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। ২২ বৎসরের পরিশ্রম ও সাধনার ফলে এইরূপ জাতীয় একতার শিক্ষা পাওয়া গেল,—মান্দ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশ আমাদের দুঃখে উদাসীন। কাজেই আমরাও তাহাদের দুঃখে উদাসীন থাকিব। কংগ্রেস-ভগীরথ কিরূপ জাতীয়-একতা-গঙ্গা ভারতে আনিতেছেন, সকলে স্থির ভাবে একবার অনুধাবন করুন।

দুর্ভিক্ষে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবর্ষে প্রাণ হারাইতেছে, কংগ্রেসে তাহার একটী কথাও নাই; শতকরা ৯৫ জন লোক অশিক্ষার মহান্ধকারে নিমজ্জিত, সে সম্বন্ধে কংগ্রেসে একটুও কাজ করিবেন না; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংকোচ-নীতিতে কি সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কাজ করিবেন না। কোন কাজ হাতে নিতেই তাহাদের দারুণ ভয়; অথচ নাকি ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে। কি আকাশ-কুসুম রচনার চেষ্টা! যাহা আশু প্রয়োজন, তাহার কোন কাজেই কংগ্রেস হাত দিবেন না; তবে করিবেন কি?—নিত্য নৈমিত্তিক গলাবাজি, আবেদন নিবেদনের কুহক এবং ভ্যাবা-গঙ্গারামের বাধুনি-গদ্,-অমুকের জয়, অমুকের জয়, অমুকের জয় কীর্ত্তন। ২২ বৎসরের কংগ্রেসী-শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস লইয়া ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

দীর্ঘকাল মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে, নিম্নশ্রেণীর

পৌণে ষোল আনা লোক স্বদেশী-আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন। তাহারা বলে, আপনারা যখন আমাদের মঙ্গল যখন চান না, তখন আমরা আপনাদের দলভুক্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন কেন হইবে? তাহারা বলে, মহাজনদের অত্যাচার হইতে কবে আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন? তাহারা বলে, জমীদারদের শোষণ-তাড়না হইতে কবে আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন? তাহারা বলে, বারমাস যে আমরা চৌকীদার হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের নানা প্রভুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হই, তাহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কবে আপনারা আমাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন? আন্দুল এবং আসানসোলের লোকেরা বলে, অত্যাচারিত হইয়া সামান্য সাহায্যও যখন স্বদেশভক্ত নেতাদের নিকট পাইলাম না, তখন আর কি কুহকে ভুলিব? তাহারা বলে, নিজেরাই যদি অত্যাচারে অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিলাম, তবে কিসের মায়ায়, দেশ জাগিল বা ডুবিল, সে চিন্তায় যোগদান করিব? তাহাদের কথার কি সদুত্তর আমরা দিতে পারি, বল ত? নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা, উদ্ধার এবং উন্নত করার জন্য এপর্য্যন্ত আমরা কিছুই করি নাই।

প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র-ভগীরথ বঙ্গদেশ উদ্ধার করিবার জন্য "বন্দে মাতরম" মন্ত্ররূপ গঙ্গা অবতরণ করাইয়া গিয়াছেন। এত দিন পর, উহার কার্য্য আমাদিগের উপর আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহার বিরোধী, কাজে কাজেই জমীদারগণও বিরোধী; কাজে কাজেই পা-চাটা দলের অনেকে মনে মনে বিরোধী। এত বিরোধী শক্তির মধ্যেও আশার বাণী নিত্যই আমরা শুনিতেছি। আজ না হউক, এক দিন এই মন্ত্র ভারতকে একপ্রাণতায় মাতাইবে। কংগ্রেস দ্বারা তাহা হইবে না। মাতৃ-হত্যাকারী অসুরের দ্বারস্থ হইয়া যাহারা মাতাকে রক্ষা করিবার জন্য পা চাটিতে যায়, শুনিয়া রাখ, তাহাদের দ্বারা এই মন্ত্র অজেয় শক্তি লাভ করিবে না। সাবধান, এই সকল ভণ্ডদের কণ্ঠে এই মন্ত্র যেন আর উচ্চারিত না হয়। যাহারা দুকূল রাখিয়া চলিতে চায়, তাহাদের দ্বারা এদেশের কোন কার্য্য হইবে না। যাঁহাদের নীতি—মাছও ধরিবেন কিন্তু এক বিন্দু কাদাও গায়ে লাগিতে দিবেন না, তাঁহাদের দ্বারা কিছু হইবে না। যাঁহারা এই মহামন্ত্রের অকৃত্রিম পরিপোষক—তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইবে, বরার্ট এমেটের ন্যায় জীবনের পর জীবন পাত হইবে, তবে মহাত্মা রাজনারায়ণের অমৃতময় কথা জয়যুক্ত হইবে। "ভয়ে ভয়ে চাই, ভয়ে ভয়ে যাই, গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই" এই যাঁহাদের ব্যবসা স্বদেশভক্ত, তুমি সময় থাকিতে তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াও। দাঁড়াইয়া নিভৃতে দিবা রাত্রি ক্রন্দন কর, এবং মায়ের নিকট প্রার্থনা কর—"এই মন্ত্র যেন ডেমক্রেসিকে এই ভারতে জাগাইতে পারে।" তোমাদের সাধন হউক ডেমক্রেসি, ভজন হউক ডেমক্রেসি; আহার পান হউক—ডেমক্রেসি। প্রতিজ্ঞা কর—নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা করিবে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য জীবন পাত করিবে, তাহাদের উন্নতির জন্য সর্ব্বস্ব দান করিবে। যদি মায়ের কৃপায় মায়ের সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে পার, তবেই দেশ রক্ষা হইবে, নচেৎ কিছুতেই কিছু হইবে না।

"পিতা অনাহারে ক্লিষ্ট, মাতা উলঙ্গ, আমরা ক্ষুধার্ত্ত'—এই কয়টী কথা লিখিয়া

একবালক লাট কর্জ্জনের নিকট কর্ম্মচ্যুত পিতার জন্য আবেদন করিয়াছিল, শুনিয়াছি, ঐ কথা শুনিয়া কর্জ্জন ৫০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বালকের পিতার চাকরী দিয়াছিলেন। হায়! এ দেশের কত পিতা অনাহারে ক্লীষ্ট, কত মাতা উলঙ্গ এবং কত শিশু অভুক্ত! কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করিতে কেহই চেষ্টিত নন্। এমন নির্ম্মম দেশ আর কুত্রাপি নাই। যে দেশের লোক এত নির্ম্মম, মাতার দরিদ্র সন্তানদের প্রতি এত উদাসীন, এত নিশ্চেষ্ট ও অলস এবং সদা সুষুপ্তিতে থাকিতে ভালবাসে, তাহারা কি অধিকার পাইবার অধিকারী? কে তাহাদিগকে রাজ সিংহাসনে বসাইয়া দিবে? বাজি পোড়াইয়া ইক্‌জিবিসনে অর্থ নষ্ট করা হয়, নানারূপ বাজে আমোদে ব্রাহ্মসমাজের টাকা ব্যয় করা হয়, ইহার প্রতিবাদ করিলে তদুত্তরে লোককে বলিতে শুনিয়াছি, স্বদেশী জিনিস, ও স্বদেশী আমোদে দোষ কি? যে পরিশ্রমের পরিণাম ভস্ম বা শূন্য, সে পরিশ্রম ( labour ) ব্যর্থ-পরিশ্রম (inproductive) তাহা করিতে কখনও লোককে উৎসাহিত করা উচিত নয়। বিশেষতঃ যে দেশের মাতারা উলঙ্গ, সে দেশে কি বৃথা অর্থ ব্যয়িত হইতে দেওয়া উচিত? যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে দেশে কোন হৃদয়বান লোক থাকিলে, তিনি কখনও বৃথা অর্থ নষ্ট হইতে দিতে পারেন না। কিন্তু এদেশের নেতারাও কত অপব্যয়ে, কত বিলাসিতায়, কত বৃথা আমোদে,—কত অর্থ বৃথা ব্যয় করেন! কিন্তু দরিদ্রের জন্য দশটী পয়সা দিতে সর্ব্বনাশ হইল, মনে করেন! কি দুঃখের কথা! আমাদের মনে হয়, দারিদ্র্য-সমস্যার পূরণ না হইলে, এদেশের সকল স্বদেশ-প্রেমিকের শোকবস্ত্র পরিধান করা উচিত।

কথায় কথা বাড়িয়া যায়—এক ফরিদপুর জেলার ৫৭০০০০ লোকের মধ্যে ৩২০০০০ নমশূদ্র। তাহাদের মধ্যে অনেকে আজ কাল শিক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে মাথা তুলিতে দিতে অনেক কৃতবিদ্য অনিচ্ছুক! কোটালিপাড়ে একজন শিক্ষিত নমশূদ্র দরিদ্র-সেবায় আমাদের সহায়তা করিতেন, তিনি এক বিছানায় বসিতেন বলিয়া কত লোক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতেন! আমি শুনিতেছি, আমার প্রদত্ত কিছু কিছু অধিকার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এখন তাঁহাকে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে! নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি যে দেশে এরূপ ঘৃণা, সে দেশকে রক্ষা করিবে কে? ৺ গোরাচাঁদ দাস মহাশয় বরিশালের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তিনি জীবিত কালে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমার টাকা আছে, আমাকে নয় আপনারা সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমার দরিদ্র-আত্মীয় কুটুম্বকে গ্রহণ করিবেন কি?" সুবিখ্যাত বাবু উমাচরণ দাস মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন, "একদিন কোন হিন্দু-সমাজের কুল-তিলক উইলসনের বাড়ীর খানা আমার হাতে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও হাত স্পর্শ করিয়া নহে, শূন্য হইতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন! যে দেশের আভিজাত্যাভিমান নিম্ন-শ্রেণীকে এত হেয় ও অস্পৃশ্য করিয়াছে, সেই দেশ জাগিবে, মনে করেন?" অনেক ভাবিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু বড়ই কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু ইহাও ঠিক কথা, যে, নিম্নশ্রেণীর উদ্ধার ভিন্ন এদেশের মঙ্গল নাই। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র এই কঠিন সমস্যা

পূরণ করিবে—সকল ভাইকে এক ঠাঁই করিবে, আশা করিতেছি। আজও অনেক স্বদেশ-সেবক কাপুরুষতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা জানি। আজও অনেক লোক অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছেন, তাহাও জানি। জানি, আজও আমরা জীবন-মরণ-ব্রত গ্রহণ করিয়া অটল, অচল এবং নির্ভীক হইতে পারি নাই। জানি, আজও আমরা উঠিতে, শুইতে, বসিতে নানা বিভীষিকা দেখিয়া ভীত,সঙ্কুচিত এবং কম্পিত হইতেছি ; কিন্তু বিধাতার কৃপায় ক্রমে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে নির্ভীক এবং অবিচলিত হইতে পারিব, আশা করি। কাজ করিতে করিতে শক্তি জন্মিবে ;—প্রহার, অত্যাচার এবং নির্য্যাতন সহ্য করিতে করিতে শরীর শক্ত হইবে, মন শক্ত হইবে, ভয় বিভীষিকা কাপুরুষতা চলিয়া যাইবে। আমাদের ভ্রাতারাই আমাদের শত্রু, তাঁহারাই ইংরাজের গুপ্তচর, তাঁহারাই আমাদিগকে লাঞ্ছিত ও দারিদ্র্য-পীড়িত করিবার জন্য ব্যস্ত—এ সকলই জানি। নেপোলিয়ন যখন এল্‌বা হইতে পুনঃ ফ্রান্সে প্রবেশ করেন, সামান্য সৈনিকেরা তাঁহার প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের দেশের কৃতবিদ্য গোয়েন্দারা ও স্বদেশ-ভক্তদিগের প্রতি সেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছেন না, ইহা বড়ই মর্ম্মপীড়াদায়ক, সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমাদের সম্মুখে উনবিংশ শতাব্দীর অদ্বিতীয় স্বদেশ-ভক্ত, ডিমক্রেসির নেতা ম্যাটসিনির পূত-জীবনালোক সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা ভীত হইব কেন ? আজীবন নির্য্যাতন, কারাবাস ও নির্ব্বাসনের কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি ব্রত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না, সে কথা এই দুর্দ্দিনে সর্ব্বদা আমাদের জপমন্ত্রের ন্যায় স্মরণ এবং তাঁহার কীর্ত্তিত ডেমক্রেসি-সাধন-ব্রত লইয়া দিবা রাত্রি দরিদ্রদের জন্য খাটিতে খাটিতে জীবনপাত করিতে হইবে। এই এক মহাকাজ সাধিত হইলে, আর কিছুই অসাধ্য থাকিবে না। বিধাতার কৃপা অকৃত্রিম স্বদেশ-ভক্তদিগের মস্তকে বর্ষিত হউক, এবং তাঁহার পুণ্যময় নাম স্মরণ করিতে করিতে আমরা দুর্জ্জয় সাহস এবং নির্ভীকতার রাজ্যে চলিয়া যাই। তাঁহার অজস্র কৃপায় স্নাত হইয়া সকলে গগন কাঁপাইয়া বল—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের জয় হউক, মাতৃ-ভূমির দুর্দ্দিন দূর হউক, এবং দরিদ্রেরা জাগরিত,সুশিক্ষিত ও উন্নত হইয়া মাতৃ-সেবার মন্দিরে সম্মিলিত হউক।

# পরলোকগত মহাত্মা চন্দ্রকান্ত সেন।

জগতে এক একটী জীবন যেন সৌন্দর্য্য ও কোমলতার জন্য সৃষ্ট, পবিত্রতার আদর্শ, ধর্ম্মের প্রতিভায় উজ্জ্বল, কিন্তু এই জীবন-সংগ্রাম-পূর্ণ সংসারে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা ও প্রতারণার কেহ নহে। তাহাদের বিমল প্রতিভা যাহার উপর পতিত হয়, তাহাকেই সুন্দর করে, এবং পবিত্রতায় বিভূষিত করে। আজি তদ্রূপ একটী জীবনের উল্লেখ করিব।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন আমি পবিত্রতার আদর্শ কোন যুবা দেখিতাম না, অধিকাংশ চঞ্চল ও দুর্ব্বলচিত্ত, যাহাদের সংসর্গ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার্য্য, তখন একটী শুভ সম্মিলনে আমার চিত্ত নূতন পথে ধাবিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আমি তাহার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

এক্ষণেও সেই দিনের স্মৃতি হৃদয়ে আছে, যেদিন কণ্টকময় সংসারের মধ্যে আমি একটী স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ দেখিয়াছিলাম, মরুভূমি মধ্যে সুপেয় প্রস্রবণ-ধারা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমি গ্রামের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কোথায় যাইব,ভাবিতেছিলাম, কোন স্থানে আমি পড়িবার সুবিধা না পাইয়া একটী বন্ধুর পরামর্শে বরিশাল নগরে গমন করিলাম। তথায় উল্লিখিত মহাত্মার সহিত আমার সম্মিলন হয়। কবিরা শুভমুহূর্ত্ত কল্পনা করিয়া থাকেন, যদি তেমন একটী মুহূর্ত্ত জীবনে কখনও হইয়া থাকে, সে তাহাই, কারণ সেই মুহূর্ত্তের স্মৃতি আমার হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত থাকিবে। আমি যখন গৃহ-কর্ত্তার নিকট পরিচয় দিলাম, এবং তাঁহার কৃপায় তাঁহার বাসায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলাম, তখন ধীরে ধীরে একটী কিশোর-বয়স্ক বালক আমার নিকট আগমন করিলেন, তাহার মধ্যে পল্লীগ্রামের সরলতার সহিত এমনি একটী মধুর ভাব জড়িত ছিল, যাহা অন্য কোন জীবনে দেখিলাম না! আকৃতি মধুর, যেন মনে হয়, ভগবান যাহাদিগকে জগতে পবিত্রতা ভূষণে বিভূষিত করিবেন, তাহাদের আকৃতিও তেমনি মনোহারী করিয়া দেন। আমি দেখিলাম, তিনি আমার নিম্ন-শ্রেণীতে পড়িবেন, তাই ভক্তি না করিয়া স্নেহ করিলাম। এবং প্রকৃত বন্ধুতা কাহাকে বলে,জানিলাম। চন্দ্রকান্ত জগতে সম্পন্ন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,কিন্তু এজন্য দুঃখ কাহাকে বলে, জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় দরিদ্রগণের সহিতই অবস্থান করিত, ও দরিদ্রগণ তাহার নিকট প্রকৃত সহানুভূতি প্রাপ্ত হইত। যৌবনে যে সমস্ত দোষ মানব-চরিত্রকে কলঙ্কিত করে, তাহার কিছুই তাহাতে ছিল না, বেশী হাস্য পরিহাস, পরনিন্দা, ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার সে চরিত্রে দেখি নাই। সে স্থির, ধীর, শান্ত, সরল, সংসর্গে যে আসিত, তথা হইতে সাধুভাব লইয়া যাইত। যখন পড়াশুনার আলাপ হইত না, তখন অনুরূপ সদ্বিষয়ের আলাপই তাহার সহিত হইত। সহরের সমস্ত বালক তাহার সহিত কথোপকথন যেন একটী আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিত। আমরা এক ভাবে অভ্যস্ত ছিলাম। সকল অবস্থার লোকের সহিত সহানুভূতি ছিল না, কিন্তু যে শ্রেণীর লোক তাঁহার নিকট আসিত, তাঁহার সহিত মনের কথা বলিয়া আনন্দিত হইত। এমন সর্ব্বজন-প্রিয় ও সকলের সমাদৃত যুবক আমার চক্ষে বড় পড়ে নাই। জীবনে কখনও তাহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখি নাই। অথবা তাহাকে কেহ তিরস্কার কি তাহার সহিত কুব্যবহার করিলেও তাহার হৃদয়ে কোন বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। প্রতিযোগী ছাত্রগণের সহিত তাহার যেমন মধুর ব্যবহার দেখিয়াছি, এমন কোথাও দেখি নাই। তাহাদের প্রতি ঈর্ষা কি বিদ্বেষ করা দূরে থাকুক, আমি তাহাদের প্রশংসাই তাহার মুখে শুনিতাম। জলদিকার আলি নামক একটী মুসলমান যুবক তাহার সমপাঠী ছিল, কোনবার চন্দ্রকান্ত প্রথম হইতেন, কোনবার জলদিকার প্রথম হইতেন, অঙ্কে ও সাহিত্যে উভয়ের নম্বর প্রায় একরূপ হইত, এই জলদিকার তৃতীয় শ্রেণীর শেষ ভাগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, চন্দ্রকান্ত তাহার জন্য কত আক্ষেপ করিয়াছেন যে, যে জগৎ একটী প্রকৃত প্রতিভান্বিত ছাত্র হারাইল। পাঠ বিষয়ে চন্দ্রকান্ত অতি মনোযোগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন, কোন বিষয়ে শিক্ষককে প্রতারণা করা বা দুষ্ট বালকদের

অবলম্বিত কোন চালাকী করা কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। সকলেরই বাবুগিরির দিকে একটু আসক্তি থাকে, কিন্তু তাহার পিতার প্রদত্ত ভাল বস্ত্র কি জুতা ব্যবহারে তাহার অতিশয় অনিচ্ছা ছিল, আমাদের ন্যায় মলিন বস্ত্র পরিধান করিতে পারিলেই যেন সুখী হইতেন। আমি তাহাদের আশ্রিত থাকিয়াই দেড় বৎসর পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলাম। আমার প্রতি তাহার অতিশয় ভক্তি ছিল, এবং চিরদিন একটী প্রাণের টান তাহার জন্য অনুভব করিতাম। যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ করিয়া বরিশাল হইতে বাড়ী চলিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে চন্দ্রকান্ত স্কুলে থাকায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সেই দিন জানিলাম, প্রিয়-বিরহ কাহাকে বলে। আমার সমস্ত পথে যেন তাহারই স্মৃতি জাগরিত হইতে লাগিল। এমন পবিত্র ভাব জীবনে আর কাহার জন্য হয় নাই।

আবার যখন চন্দ্রকান্ত পরীক্ষা প্রদান করিয়া কলিকাতা আসিলেন, দুই বৎসর পরে উভয়ে আবার মিলিত হইলাম। চন্দ্রকান্ত বরিশাল থাকিতেই এক ঈশ্বরের উপাসনায় আনন্দবোধ করিতেন, কখনও কখনও আমি তাহার এমন ভক্তিভাব দেখিয়াছি যে, অবাক্ হইয়াছি। তাহার এক জ্ঞাতি পিতামহ তাঁহাকে যোগ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কলিকাতায় আসিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্রের বিমল প্রভাব আমাদের উভয়ের উপরে পড়িল, চন্দ্রকান্ত যে আদর্শ খুজিতেছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলেন। উপাসনা ও শ্রদ্ধা ভক্তিতে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। এবং পূর্ব্বকথিত বৈরাগ্য তাহার এতদূর ছিল যে, তাহার পিতা তাহাকে অধিক টাকা পাঠাইলে তিনি বলিতেন, আমার এতদপেক্ষা কম হইলেও চলিবে। সাংসারিকতা সে চরিত্রে আমি কখনও দেখি নাই। একটী ভৃত্যের হস্তে তাহার সমস্ত ব্যয়ের ভার ছিল, সেই ভৃত্য তাঁহাকে যাহা দিত, তাহাতেই তাহার আনন্দ। আমি কখনও তাঁহাকে তাহার প্রতি রাগ করিতে দেখি নাই, অতি বিরক্ত হইলে বলিতেন, "সনাতন কি করেছ ?" এইমাত্র। ক্রমে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এম্-এ ও আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এবং ভবানীপুর অবস্থান করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলেন, আমিও মেডিকেল-কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলাম। সেই অবধি উভয়ের বিচ্ছেদ হইল।

বলিয়াছি, চন্দ্রকান্ত সংসারের জীবন-সংগ্রামের কঠোর গুণ-নিচয়ে অনভ্যস্ত, বিশেষতঃ পরনিন্দা তাহার চরিত্রে একেবারেই দেখি নাই। তাই তিনি ব্যবসায়ে মধ্যম অবস্থায় কালযাপন করিতেন। তাহার জীবন যে দিকের উপযুক্ত, সেদিকে তিনি যান নাই, তাই জগতে অতিশয় উচ্চস্থান লাভে তিনি সক্ষম হয়েন নাই। পরে অকালে তিনি ভীষণ জ্বর বিকারে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। এই কয়েক বৎসরে যতবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, ততবারই তাহার সেই শৈশবের মধুর গুণাবলী দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। সংসারের প্রভুত্ব কি বিষয়ানুরাগ সে হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। শেষকালে ধর্ম্ম বিষয়ে আমার সহিত তাহার একটু ভিন্নতা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে অসম্প্রদায়িক ছিলেন, এবং সকল ধর্ম্মেরই প্রশংসা ভিন্ন কোন ধর্ম্মের নিন্দা তাহার মুখে শ্রবণ করি নাই।

তাহার জীবনে যেরূপ সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা

দেখিয়াছি, এমন আর কোথাও দেখি নাই। কখনও কোন মিথ্যা ব্যবহার বা অসাধুতা করা তাহার জীবনে প্রয়োজন হয় নাই, একথা অনেকে বলিতে পারেন। কিন্তু জগতে উচ্চ পদ ও উচ্চস্থান লাভের জন্য লোকে কতই না হীন উপায় অবলম্বন কর। সেরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যাহা ধর্ম্ম পথে দণ্ডায়মান: হইয়া জীবনের গতি পাপ পথে পরিচালিত করে, তাহা তাহার জীবনে ছিল না। ভ্রম ক্রমেও তিনি সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই।

আর একটী গুণ তাহার মধ্যে দেখিয়াছি। পরনিন্দার ন্যায় আনন্দজগতে নাই,এরূপ যেন আমাদের এক শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তাহার চরিত্রে পরনিন্দা কখনও দেখি নাই। এরূপ লোক কি প্রকারে আইন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হয়, আমি তাহাই মনে মনে একটী সমস্যা মনে করিতাম। আমি জগতে আর দুই একজন ভিন্ন পরনিন্দা-বিমুখ লোক দেখি নাই।

অহঙ্কার, আমি বড়, আমি শ্রেষ্ঠ, কিম্বা আমি, আমার, এভাবও তাহাতে দেখি নাই, চিরকাল সকল ভার অন্য হস্তে প্রদান করিয়া নির্লিপ্ত সংসারীর ন্যায় তিনি জগতে বিহার করিতেন। তাঁহার পিতামহের উপদেশ ছিল, অসার লইয়া আন্দোলন করিও না,সাংসারিক জীবনও তাহার সেইরূপ ছিল, এমন কি, মৃত্যুর পরে তাহার অর্থাদি কোথায় গেল, কেহ জানে না।

চন্দ্রকান্ত কয়েকটী অনাথ শিশু ও অল্পবয়স্কা স্ত্রী রাখিয়া জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, জীবনে সাধু সহবাস তীর্থ, যে তীর্থস্থান আর প্রাপ্ত হইব না। কিন্তু আমাদেরও জীবনের শেষ অঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেদিন দূরে নহে, যেদিন সংসারের এই কঠোর রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া সেই অনন্ত রাজ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, সেই স্থানে আমার হৃদয়-নিহিত সেই পবিত্র প্রীতি তাহাতে মিলিত করিয়া আমরা ভেদাভেদবিরহিত হইয়া ভগবানের চরণে জীবন-কুসুম সমর্পণ করিব, ভগবান অবশিষ্ট জীবনে সেইরূপ পবিত্র ভাব প্রদান করুন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

---

# রাষ্ট্রতন্ত্রে দেশ নেতৃত্বের প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠা।

"Sincerity is the end and beginning of things, without it there would be nothing. To recognise that there is a tide in the affairs of men and in the face of difficulty not to fear is the valour of sage" Confucius.

If they are of a strong character and break their fetters, they become a mark for the society which has not succeeded in reducing them to commonplace, to point out with solemn warning as "wild" "erratic" and the like; much as if one should complain of the Niagara River for not flowing smoothly between its banks like a Dutch canal. John Stuart Mill.

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্তভাগে দুইটী পংক্তি আছে:—

যস্য দেবে পরাভক্তি যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ভগবদ্‌ভক্তিমূলক জ্ঞান যেমন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে সহানুভূতি প্রয়োজন, তেমনি আমাদের আহার, বিহার, আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন-রচিত সমাজের প্রকৃতিগত অবস্থা

আলোচনা করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক অনুভূতি এবং অনুবর্ত্তন প্রয়োজন, কারণ এ কথা যেন আমরা কিছুতেই ভুলিয়া না যাই, সমাজের শোণিত-ধারা দু একজনকে আশ্রয় করিয়া আছে, এমন নহে, সমাজের প্রত্যেক অণু মানবকে প্লাবিত করিয়া চিরকাল ছুটিয়াছে।

নানাদেশে নানা ইতিহাস রচিত হইয়াছে, হয়ত কিছুটা লিপিবদ্ধও হইয়াছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিই হউক কিম্বা এই বিচিত্র সৃষ্টির মোহ আকর্ষণই হউক—যে কোন কারণ মানুষকে চিরকাল বর্ত্তমানের রূপরস্যানুপূর্ণ বিচিত্র সত্বার দিকে টানিয়া রাখিয়াছে, অতীতের শত জীর্ণ কণ্টকজালরচিত কথা সে দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করে না। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য অতীত এবং বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া অনাগত এবং আগত ভবিষ্যতের জন্য ব্যক্তিকে এবং সমাজকে তৈয়ার করা।

এই খানেই বিচার, বিবেচনা, আগ্রহ, আশা ও কল্পনার ইতিহাসের সূত্রপাত, কারণ মানুষের ভিতর সনাতন এমন একটা পিপাসা-প্রবাহ রহিয়াছে, এমন একটা আকুল অতৃপ্তি রহিয়াছে, যাহা তৃপ্তিকে চিরকাল ক্ষুদ্র এবং মূল্যহীন করিয়া রাখিয়াছে,—প্রাণী জগতে এইখানেই মানুষের বিশেষত্ব। নাবিকের ন্যায় সে ক্ষেপণী হাতে লইয়া চলিয়াছে—চারিদিকের বিচিত্র কল্লোলমুখর নানা ঘাট, শ্যামল-স্বচ্ছ মাঠের শ্রেণী, বাঁশের বন, ধূসর কুটীর যাহা চোখে পড়িতেছে, তীব্রগামী তরীর গতি এই সমস্তকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছায়ায় পরিণত করিয়া ফেলিতেছে, মাঝির মন এই চঞ্চল ইতিহাসের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তরী অগ্রবর্ত্তী হইতেছে, মন ছুটিয়াছে, পশ্চাতের স্মৃতিমধুর চিত্র-শ্রেণী, পার্শ্বের দৃশ্যকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে এবং সমগ্র মিলিয়া অনাগত দৃশ্য সম্বন্ধে এমন এক মরীচিকা সৃজন করিতেছে যে, হয়ত যথার্থ জগতে তাহা উপলব্ধি করা সহজ নহে। সহজ নহে বলিয়াই তাহাকে সহজ করিয়া তোলার আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষাকেই জাগ্রৎ সত্যে পরিণত করাই মানুষের ( mission ) মিশন্। মনীষীগণ চিরকাল তাহা করিয়া আসিয়াছেন।

কাজেই শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-শরীরে একটা চেতনা এবং মত্তত্তা আসে—ইহাকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া এবং সম্মান করিয়া আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে চলিতে হইবে। কারণ এই অব্যক্ত শক্তি মানুষের জিনিষ নহে—ইহার স্ফুটবিকাশ অবশ্যম্ভাবী,—ইহা ভগবানের দান। ভগবদ্-প্রেরিত এই অশরীরী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, সমাজময় হইয়া উহার কল্পনা, কামনা চরিতার্থ করিয়া তৃপ্ত হয়।

সমাজ-কলেবরে শিক্ষার ব্যাপ্তির আতিশয্য হিসাবে এই চেতনা এবং মত্ততার স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। চেতনা যখন স্বচ্ছ ভাবে এবং মত্ততা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অভিনিবেশে পরিণত হয়, তখন সুষুপ্তি জাগরণে পরিণত হয় এবং ভাব জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের বহুমুখী স্বার্থ রক্ষণের অধিকারী হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছে—কাজেই কোন বিশেষ বিষয়ে একের চেতনা যেরূপ তীব্র, অন্যের তেমন নহে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন সমাজ কোন কালের জন্য একেবারে সুপ্ত থাকে, স্বচেষ্টায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং

আত্ম-বিভূতির দিকে একেবারে নজর রাখে না।

যেখানে সমাজ কোন বিশিষ্ট অভিযান-পথে অগ্রসর হইয়াছে, সেখানে কর্ম্মপথের অন্য শাখার দিকে উহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই,—কাজেই অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সরল কথাও জটিল হইয়া পড়ে,—নির্ম্মল রজত-দেহা স্রোতস্বিনীকেও কণ্টক-গুল্ম-পূর্ণ অরণ্যের আঁধার পথ দিয়া যাইতে শোনা গিয়াছে এবং দেখা গিয়াছে। আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

সমাজে আর একটা বিষয় অত্যন্ত কৌতূহলজনক। সামাজিক অনেক আন্দোলন, সমাজ-শরীরের অনেক বিবর্ত্তন, সময়ের সঙ্গে বাহিরের স্বরূপ পরিত্যাগ করে—কিন্তু যথার্থ অন্তর্প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জন্য স্থূলতঃ যাহাকে একেবারে বিভিন্ন দেখা যায়, প্রকৃত পক্ষে হয়ত তাহা একই পদার্থের রূপান্তর মাত্র। এই জন্য সাময়িক বিচারে হয়ত যাহাকে নিতান্ত সভাজনোচিত বলা হইতেছে,ভিতরে হয়ত তাহা নহে এবং কার্য্যেও হয়ত উহার অসভ্যতা প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। যেমন ব্রিটীশ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণের লম্ফঝম্ফের প্রবৃত্তি, অসংযত বাক-চর্চ্চা, কিম্বা ফরাসী মন্ত্রীর Duel যুদ্ধ, স্বর্ণ-খচিত অট্টালিকার চাকচিক্যের মাঝেও হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত করে।

অথবা পরোক্ষে ইহাও বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান সভ্যতাও নূতন প্রণালীতে আদম ও ইভ কিম্বা মর্কটের বংশধরগণকে অক্ষতভাবে লালন পালন করিতেছে। কাজেই প্রাচীনকালের সবলতা এবং দুর্ব্বলতার ইতিহাস-তরঙ্গ এখনও বহিতেছে, প্রকৃতি এক হইলেও আকৃতি বিভিন্ন হইয়াছে মাত্র। বর্ত্তমানে যাহারা মানুষকে একেবারে spirit or spiritual being, বা দেবতা বলিয়া সভা সমিতিতে করতালি পাইতে চাহেন,তাহাদের কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবার প্রবৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া আসে।

যে সমস্ত প্রবৃত্তি হইতে উপরোক্ত ব্যাপার ঘটে,তাহা সমাজ বিশেষে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, দেখা যাইতেছে। Sir Henry Maine এর Patriarchal যুগ হইতে এই বর্ত্তমান শতাব্দীর আশ্চর্য্যজনক যুগ পর্য্যন্ত—যে যুগে Monarchy, Republic, Democracy প্রভৃতি অসংখ্য রাষ্ট্রতন্ত্র উঠিয়াছে—মানুষের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের ছবির রঙ তেমন পরিবর্ত্তন হয় নাই, দেখা যাইতেছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতি নানারূপ আলোক হইতেও সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মাত্র সাতটী রঙ পাওয়া যাইতেছে। হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্র হইতেও কালিদাসের ষট্‌জ সংবাদিনী রাগিণী মাত্র পাওয়া যাইতেছে। হস্তনিষ্পেষিত সলিলের ন্যায় কিছুতেই এই সমস্ত প্রবৃত্তি ধরা পড়িতেছে না।

কবি গুরু গেটে এক জায়গায় বলিয়াছেন :—

"It is not given to the world to be contented ; the great are not such that there will be no abuse of power ; the masses are not such that in hope of gradual improvement they will be contented with a moder ate condition. Could we perfect human nature, we might also expect a perfect state of things ; but as it is there will always be a wavering hither and thither ; one part must suffer while the other is at ease, envy and egotism will be always at work like demons and party-strife will be without end.

তথাকথিত জ্ঞানের বিভূতি হইলেও মানুষ সামান্য বিষয়েও হাসে, কাঁদে, উত্তেজিত কিম্বা অবসন্ন হয়। জ্ঞানের ভাণ্ডার

তখন লাইব্রেরীতে সুপ্ত থাকে, কিম্বা মস্তিষ্কের কোন অন্ধকার-গুহায় লুক্কায়িত থাকে। এজন্য মোটামুটি সাধারণ মানুষের প্রকৃতি প্রায় অপরিবর্ত্তিত থাকে। অবশ্য স্থান, কাল, অবস্থা মাত্র স্থূলতঃ যে কিছু পরিবর্ত্তন আনয়ন করে।

সমাজ-শরীরে মৌলিক প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ কাজেই অবস্থাভেদে বিভিন্নপথে স্ফুট হয়। যখন অবস্থার যথার্থ বিপর্য্যয় ঘটে, জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়, তখন আমরা অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব যে নবরাজ্যে পদার্পণ করি, তাহা হয় ত পৃথিবীর পক্ষে নূতন নহে, এজন্য নিজের বর্ত্তমান ইতিহাসকে নিতান্ত অসাধারণ মনে না করিলে কিছু অন্যায় করা হয় না।

রাষ্ট্রনৈতিক চিত্রগুপ্তের খাতায় এই জাতির পাপ পুণ্যের কথা কি আছে, জানি না, এই জাতির অধঃপাতের সীমা নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে কি না, তাহাও জানি না। তবে ধর্ম্মনৈতিক এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য খাতায় পুণ্যের হিসাব বেশী পাওয়া যাইতে পারে, বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এইজন্য কথাবার্ত্তায়, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য-প্রদেশগুলিতে ভ্রমণকালে আমরা পরস্পরের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন করিবার সময় ভুলিয়া যাই। তালবৃক্ষে এবং ধান্যবৃক্ষের দৈহিক উৎকর্ষ বিচারে পরস্পরের মৈত্রীর কোন সম্ভাবনা নাই।

জানি না, আমাদের কপালে ধর্ম্মরাজের হস্তাক্ষর বেশী আছে বলিয়াই সহসা সহস্রে সহস্রে দুর্ভিক্ষে মহাপ্রস্থান করি কি না।

একটা জাতিকে অধ্যয়ন করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্য বিভিন্ন বিন্দু-মাত্র সাম্যবিহীন কোন জাতির ইতিহাসরূপী দূরবীক্ষণ দিয়া দেখা। এই দূরবীক্ষণের আয়নায় কেবল রূপসী বিম্বমতীর কনক-মূর্ত্তিই ভাসিয়া উঠে, অসুন্দর আমাদের মূর্ত্তি উঠে কৈ? এই অল্পদিন পূর্ব্বে সকলেই Free trade বা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিল, কারণ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ অনুভূত দৃশ্য বা স্বাধীন স্বতন্ত্র যথার্থ বস্তুমূলক চিন্তা কাহারও মনে স্থান পায় নাই, কেবল পাশ্চাত্য থিওরী রচনাকারী ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত পোলিটিক্যাল ইকনমি-ওয়ালাদের পিয়ানোর মোহনধ্বনি আমাদের হাটের মাঠেও বাঁশির আওয়াজকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল।

এখনও সাতসমুদ্র তেরনদী পারের উনপঞ্চাশৎ বায়ু ইংরাজী ভাষায় দ্রুতদৈনিক পত্র রচনাকারীগণের মস্তিষ্কে ঘুরিতেছে। এই ঘূর্ণিবাত্যায় দেশ, বিদেশ, ভাষা, ভাব, গিরি, নদী, জগতের যাবতীয় পদার্থ কেলিডোসকোপ (Kaleedoscope,) এর ন্যায় কখনও আলোক কখনও আঁধারে শতবর্ণে প্রকাশিত হইতেছে—কোনটা দেশের, কোনটা বিদেশের ভাবিবার সময় নাই, প্রত্যহ কল টিপিয়া, ঘুরাইয়া এক একখানি নূতন আশ্চর্য্য প্রদীপ বাহির করা দরকার।

আমাদের প্রাদেশিক সমিতির ইংরাজী ভাষা এখনও আমাদের মাথা হেট করিয়া দেওয়া! পথে বিপথে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা, অসম্ভব ইডিয়ম (Idiom) অসম্ভবতর ভঙ্গী যে প্রহসনের বাজার দেশের শ্মশানবক্ষে খুলিয়াছে, আমাদের যথার্থ জীবনের সহিত তাহার অসামঞ্জস্য, কেন যে তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ ধিক্কার দেয় না, বুঝিতে পারিনা। এই সমস্তের ভিতর দিয়া কি আমরা আমাদের গ্রাম্য কৃষকের ঘরকন্নার কথা বুঝিতে পারিব? সে যেমন

ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টের ধার ধারে না, তেমন তোমাদেরও চাহেনা। ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার ছাড়া তোমাদের নৈতিক অত্যাচারও কি কম? আমি মনে করি, বিলাতের Labour-party'র ন্যায় আমাদের দেশেও Farmer-party কিম্বা এইরূপ কোন party পাঁচ দশ বৎসরের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইবে।

মফঃস্বলের উপর কলিকাতার অস্বাভাবিক এবং বর্ত্তমান সময়ে মূল্যহীন প্রভাব যেরূপ জাতীয় স্বাস্থ্যের প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া তাহা অতি স্বল্পকালের বাষ্পের ন্যায় দূরীভূত হইবে, তেমনি দেশের যথার্থ হৃদয় হইতে যাহারা দূরে আছে, তাহাদের আস্ফালন অধিককাল স্থায়ী হইতেই পারে না। ইহা আশ্চর্য্য নহে, যে সমস্ত নেতা গভর্ণমেণ্টের নিকট নিজকে representative of the peopleবলিয়া আত্ম ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা নিজের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন না করিলে হঠাৎ কোন মুহূর্ত্তে, ভগবান্ করুন এমন দিন সমীপবর্ত্তী হউক—দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের নিম্নে স্বরচিত সিংহাসন বাষ্পীভূত হইয়া গেছে—তাঁহাদের অজ্ঞাতে দেশ তাঁহাদিগকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছে।

তখন যাঁহারা নেতা হইবেন,তাঁহাদিগকে বাঙ্গালাতে ভাবিতে হইবে—বাঙ্গালাতে,এমন কি,কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলিতে হইবে—বাঙ্গালা ভাষায় চিঠি লিখিতে হইতে—এমন কি—কি সর্ব্বনাশ! বাঙ্গালা-প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় বক্তৃতা দিতে হইবে।

তখন বাঙ্গালাভাষার পত্রসম্পাদকগণ ইংরাজী কাগজের এডিটরগণ হইতে অধিক সম্মানিত হইবেন। এবং কলিকাতায় কোন ইংরাজী কাগজ বাহির করিয়া Stead সাহেব বা Bryan সাহেবের সার্টিফিকেট হাতে করিয়া কাঁদিয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেও স্বদেশী দরবারের চাপরাশীর পদও পাইতে পারিবেন না!

আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি—স্বদেশের ভবিষ্যতে আমার আস্থা আছে,এজন্য অসত্য, অসরল, অসুন্দর ভাব-বিপর্য্যয়কে ধিক্কার দিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইতেছি না। দেশ জাগ্রত হইতেছে, দেশের যুবকগণকে পল্লীর দিকে আহ্বান করিতেছি। সম্প্রতি যে ক্ষেত্রে করতালি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় আসিতেছে, সে পথের পথিকদের, গর্ব্বিত, উন্নত, উচ্ছ্রিতশির স্বদেশের অগ্নিনেত্রের জ্যোতিতে ভস্মসাৎ হইতে হইবে।

পাশ্চাত্য দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া আমাদের দেশ ধরা পড়িতে পারে না। নেহাৎ শুক্লকেশ লোকও নিজের চোখে দেশকে না দেখিলে—দেশের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য সাধন না করিয়া, দেশকে অধ্যয়ন না করিলে বিপ্রলব্ধ হইবেন। ভুল চেষ্টা হইবে, তাহা একেবারে বালকোচিত। ভিন্ন সমাজের বার্দ্ধক্য দেশীয় সমাজের জ্ঞানরাজ্যে প্রমিশরী নোট রূপে চলিতে পারে না। পাশ্চাত্য সাপের আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া দেশের নগ্ন চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইতে হইবে।

যে সমস্ত ইংরাজী বড় বড় কথা চোখ্ ধাঁধাঁইয়া দেয়, তাহা বাদ দিলে দেশের প্রশ্নগুলি অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিবে।

অবশ্য ইংরাজী,ফরাসী এবং জর্ম্মণ,অন্ততঃ এই তিনটী ভাষা ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জ্ঞান পরিপুষ্টির সহায়তা করে। এই তিনটী ভাষা যে তিনটী রাজ্যের বার্ত্তা আমাদিগকে জ্ঞাপন করে, তাহা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু নিজের কার্য্যের জন্য নিজের রাজ্যকে এই তিনটী রাজ্যের অন্তর্গত মনে করিলে কার্য্যক্রমই ব্যর্থ হইল।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নের মধ্যে দেশের অনেক ব্যক্তির আত্মসম্মান জ্ঞান এবং আত্ম-শক্তি উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পল্লীকে সম্মান না করিলে পল্লী হইতে মনুষ্যত্ব জাগ্রত করা সহজ হইবে না।

এরিষ্টটাল্ তাঁহার Politics বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়ছেন। (১) Monarchy, ২) Aristocracy, (৩) Democracy বা Commonwealth.

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রজা-সাধারণের বা সমাজের এক বিষয়ে মাত্র বাধাবাধকতা আছে—তাহা হচ্ছে রাজস্ব-দানে। আমর বলিয়া থাকি, অন্যান্য সকল বিষয়ে দেশকে আমরা চালাইতেছি, অর্থাৎ আমরা একরূপ supplementary গবর্ণমেণ্ট। ইংরাজী কাগজ পত্রে আমরা যাহা বলি, তাহা লক্ষ লক্ষ কৃষকদের অন্তরের প্রতিধ্বনি না হউক, আমরা তাহাদেরই হইয়া বলিয়া থাকি। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরাজেরাও বলে, তাহাদের কথাবার্ত্তা ভারতের স্বাধীন পরাধীন নৃপতি-বৃন্দের এবং জমীদারদের কথার প্রতিধ্বনি। এই বাঙ্গালা বিভাগ সম্বন্ধেও ইংরাজ বলিয়া-ছিল, তাহাদের পক্ষে দেশের বড় বড় জমী-দারগণ রহিয়াছে—আর কৃষকেরা অপোগণ্ড বালক, ইংরাজী শিক্ষা পায় নাই—নাম দস্ত-খত করিতে জানে না, তাহাদের আবার একটা সুখ দুঃখ কি ?

এই হেঁয়ালীর কারণ কি ? উভয় পক্ষে একই শ্রেণীকে দাবী করিয়া বসিয়া আছে। সেই শ্রেণী কাহারও দিকে বেশী দৃক্‌পাত করিতেছে না।

মোট কথা, দেশের তথা-কথিত নেতারা ত্রিশঙ্কুরাজ্যে এক aristrocratic oligarchy তৈয়ার করিয়া বসিয়া আছেন—যে বিদ্যুৎ "হাওয়া গাড়ী" এবং "হাওয়া পাখা" এক জায়গায় চালাইতেছে, তাহা হয়ত অন্যত্র বজ্ররূপে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রজা-সাধারণের দুঃখ দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় লইয়াছে কে ?

অন্যথা প্রজাশক্তি পশ্চাতে থাকিলে উহার তীব্রশক্তি কথা কাটাকাটির জন্য অপেক্ষা করে না।

যথার্থ Demosএর প্রতি সম্মান আমদের দেশে জাগে নাই—অথচ 'Demos' "সাধারণ" "Mass" প্রভৃতি শব্দ-ধ্বনিত করিয়া সকলে এক প্রহসন সৃজন করিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিব।

রেলগাড়ীতে অনেকে তৃতীয় শ্রেণীতে যান—অবশ্য বর্ত্তমান নেতাদের মধ্যে কাহা-কেও তৃতীয় শ্রেণীতে চলাফেরা করিতে তেমন দেখি নাই। তাঁহারা সমুচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করেন, নচেৎ সাধারণ লোকের গন্ধ অথবা থিওসফিষ্টদের animal magnetism তাঁহাদের ফুস্‌ফুসের রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া দূষিত করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে যান, সমান টাকা ব্যয়পূর্ব্বক যে সব চাষা-শ্রেণীর বা মুটে-শ্রেণীর লোক দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের প্রকোষ্ঠে উঠে, তাহাদের উপর কিরূপ ব্যবহার করেন, কাহারও অবিদিত নাই, হয়ত একটী প্রকোষ্ঠে যথেষ্ট স্থান থাকি-লেও ইহাদিগকে সেই প্রকোষ্ঠে উঠিতে দেওয়া হয় না। কারণ হয়ত বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজত্বের এবং এইরূপ নেতাগণের নেতৃ-ত্বের কালে তাহাদিগকে গুরুতর অর্দ্ধকৃচ্ছ্র-তার ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছে—হয়ত কাপড়খানি ধূলি-ধূসরিত, দুগ্ধফেন-শুভ্র নহে, পয়সা হয়ত সে খরচ করিতে পারে

নাই। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা যেমন সাহেবদের গাড়ীতে উঠিতে চাহে না, ইহারাও তেমন ভদ্রলোকদের (!) গাড়ীতে উঠিতে চাহে না—সেটা যেন একটা মস্ত অপরাধ! ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুকম্পার পরিবর্ত্তে ঘৃণা এবং নাসাকুঞ্চন দেখিয়া, শরীর শিহরিয়া উঠে। বর্ত্তমান লেখক অনেক সময় তর্ক কলহ করিয়া এই সাধারণশ্রেণীর লোককে ভূমানন্দের পার্শ্বে উপবেশন করাইয়াছে।

কেহ বলিতে পারেন, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন লোকের সঙ্গে যাতায়ত করা কি ডাক্তারী শাস্ত্রের মতের অনুকূল? আমি কলির ডাক্তারী শাস্ত্র অপেক্ষা ভগবানের শাস্ত্র, স্বদেশের শাস্ত্র, অনেক উচ্চতর মহত্তর জিনিষ মনে করি। এই শাস্ত্রে তোমার ভাইকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিবার কথা আছে—তাহাকে কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করার কথা নাই। তাহার প্রধান কারণ, মানুষ কেবল বাহিরের জিনিষ নহে—যাহাকে দেখিয়া তোমার নাসাকুঞ্চন, অন্তর্জগতে হয়ত তুমি তাহার পদতলে বসিবার যোগ্যও নহে। তাহা ছাড়া, সমাজে মানুষকে সমাজ হইতে ভিন্নভাবে দেখা যায় না। প্রত্যেকেরই যেমন ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রহিয়াছে, তেমন সামাজিক অস্তিত্বও তদপেক্ষা উজ্জ্বলতরভাবে রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকই সমাজের প্রতিনিধি-রূপে রহিয়াছে—সে সমাজকে represent করিতেছে। কোন মানুষকে অপমান করা শুধু তাহার পরিবারকে অপমান করা নহে, তাহা পরোক্ষে মানবত্বকে অপমান করা। এটা এত গুরুতর অপরাধ যে, কোন দণ্ডই এই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত নহে।

এই জন্য নৃপতির শাসন-দণ্ড সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে। এইজন্য সমাজে নরহত্যা করা এবং অরণ্যে নরহত্যা করা একটু তফাৎ। একদিকে ব্যক্তির স্বকীয় এবং সামাজিক অস্তিত্ব, উভয়কে হত্যা করা হয়, অন্যদিকে তাহার ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে হত্যা করা হয়। একদিকে তুমি সমাজে পাপের বীজ রোপণ কর, অন্যদিকে তুমি নিজে রসাতলে যাও মাত্র।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে রাজার শাসন বেশী দূরে যাইতে পারে না, আইনের দংষ্ট্রাতে অনেক কিছু আসে না—এই জন্যই সামাজিক ন্যায়, নীতি, ধর্ম্মের প্রয়োজন। নিজের সকল কথা ধর্ম্মের জাগ্রত নেত্রের দৃষ্টিতে পড়ে।

একজন ইংরেজকে হত্যা করিলে সমগ্র ইংরেজজাতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে কেন? কারণ সেখানে হত ব্যক্তির মাত্র ব্যক্তিগত অস্তিত্ব লইয়া কথা হয় না—সেই হত্যার অপমান সমগ্র ইংরেজের মুখে কলঙ্ক মাখিয়া দেয়। হত-ব্যক্তি সেখানে ইংরাজের প্রতিনিধিরূপে ভাসিয়া উঠে।

একটু ব্যাপকভাবে দেখিলে কোন ব্যক্তির অপমানে যে মানবত্বকে অপমান করা হয়, বলিলাম, তাহা একান্ত অনুভবযোগ্য জিনিষ। সংসারকে রহস্যজনক বলিলে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যজনক। বহু বৎসর পূর্ব্বে মনীষী ভাবুক কার্লাইল হইতে এই কথার যে গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি পাইয়াছিলাম, তাহা এখনও মনে জাগিতেছে:—

> There is but one temple in the universe and that is the body of man. Nothing is holier than that high form. Bending before men is a reverence done to this revelation in the flesh. We touch heaven when we lay our hand on a human body.

মানুষের মধ্যে বিধাতা অক্ষয়, অনন্ত শক্তির বীজ রোপণ করিয়াছেন—একটা মানুষকে দেখিয়া কি তাহার বিরাটত্ব আত্মাকে স্তব্ধ করিয়া দেয় না?

তার্কিক বলিতে পারেন, আমার অতটা বুঝিবার শক্তি নাই—আমাকে রেলগাড়ীতে তাড়াতাড়ি যাইয়া কলিকাতায় পৌছিতে হইবে এবং গোলদীঘিতে একটা বক্তৃতা দিতে হইবে—আমার অতটা ভাবিবার সময় নাই।

এই সব কথায় সম্পূর্ণ বোঝা যায়, যথার্থ দেশের সহিত সাধারণের সহিত ইহাদের কোন হৃদ্য সম্পর্ক নাই।

ঠিক বিপরীত এক শ্রেণীর লোক দেশে জাগিয়া উঠিবে, তাহারা মাত্র moderatesও নহে, "extremists"ও নহে—পূর্ব্বেই বলিয়াছি labour-party বা farmer-party তাহার এই নূতন শ্রেণীর lords দের ধিক্কার দিয়া commoner রূপে mass কে বা সাধারণকে শিক্ষা দীক্ষায়, সম্মানে আশ্বাসে, নিবিড় ভক্তিতে এবং প্রেমে গঠন করিয়া তুলিবে। ইহারা যদি গাড়ীতে চড়ে, তবে উহার ঘোড়া খুলিয়া কেহ টানাটানি করিতে পারিবে না! সাধারণের মাতৃভূমি জননীরূপে রুদ্ধকণ্ঠে, আকুল আকাঙ্ক্ষায় এই শ্রেণীর উত্থান কল্পনা করিয়া নত নেত্রে অপেক্ষা করিতেছেন।

বস্তুতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভান যাঁহারা করেন, তাঁহারা অত্যন্ত অসরল—কিছুকাল না হয় অপরিষ্কার ভাইয়ের পার্শ্বে বসিলেন, কিন্তু নেহাৎ যদি দরকার হয়, বাড়ীতে গিয়া নিজের কাপড়খানি ছাড়িলেই কিম্বা নিজকে disinfect করিলেই ত চলে! এই সমভূমিতে কিছুকাল উপবেশন, জাতীয় জীবনে, এমন কি, ধর্ম্মগত জীবনেও কম শিক্ষার জিনিষ নহে। এই কিছুকালেও যদি আমরা সকলে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, চাষা, মুটে-মজুর সমমাতৃকত্ব, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন উপলব্ধি করি, সেটা কি কম কাজ হইল, কম শিক্ষা হইল?

নিতান্ত আধুনিক আর একটী উদাহরণ দিব।

সম্প্রতি বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীতে দুইটী শ্রেণী বিভাগ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে ইহা ছিল না, এক গাড়ীতেই সকলকে যাইতে হইত। বৈদ্যুতিক-যান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে—বলিতে লজ্জা হয়, কলিকাতার বাঙ্গালীদের নেতাদের (?) দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে এক কোলাহল উঠে। নিলর্জ্জতার সহিত সকলে বলিতে লাগিল, সাধারণ লোকের সহিত উপবেশন করা অসম্ভব, ইহাতে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। কোন বিখ্যাত পত্র একেবারে এক general proposition প্রবন্ধরূপে লিখিয়া বসিল—"কে সাধারণ মুটে মজুর শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বসিতে চাহিবে? এজন্য একটী second class গাড়ী খোল।"

বিধাতার প্রশান্ত নেত্রেও বোধ হয় তখন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ mass এর হাতে এখন যেমন, তখনও তেমন কোন সংবাদপত্র ছিল না, নচেৎ এই বাবু-শ্রেণীর নেতাদের এবং তাহাদের পরপুরুষগণের বিরুদ্ধে তীব্র বয়কট ঘোষণা করা অন্যায় হইত না।

ফল কি হইয়াছে? সাহেবদের বিরুদ্ধে যেমন ভদ্রলোকদের re-action, তেমনি ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে মুটে মজুরদের re-actionও উপস্থিত হইয়াছে। সময় ও সুবিধা পাইলে বাবুদের চূড়ান্ত অত্যাচার করিয়া ক্ষান্ত হয়। কোন ক্ষমতা হাতে পাইলে সেখানে সামান্য মাত্র সম্মান করে না—সম্মান দূরে থাকুক, যেরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণ করে, তাহা কাহারও মুখরোচক হয়, মনে করি না। রেলওয়ে, ষ্টীমার প্রভৃতিতে মুটে মজুরদের ব্যবহার ইহার দৃষ্টান্ত।

সমাজের মধ্যে এইরূপ অন্তর্কলহ বাঞ্ছনীয় নহে।

আমাদের দেশে manual labour এর প্রতি এখনও সম্মান জাগে নাই। জাতি-ভেদই ব্যবসায়-ভেদে পরিণত হওয়াতে সমাজে নিম্নস্তর-রূপে পরিচিত সমাজের প্রতি কেহ সম্মান দেখায় নাই। এজন্য বহুপূর্ব্বে ক্রমশঃ আমাদের অন্যান্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের ঔৎকর্ষ্য তুলনায় ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্প কলা ক্ষীয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই manual labour এর প্রতি সম্মান জাগান আমাদের দেশে একটা গুরুতর কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশ এ বিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যবান। সেখানে যে জুতা ক্রস্ করে, তাহার প্রতিও কেহ অসম্মান করিতে পারে না। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পক্ষে সেলাই কার্য্য নিন্দনীয় ছিল না। Peter the Great ও সূত্রধরের কার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সাধারণতঃ সেখানে সকলেই কোন কোন হাতের কাজে কৃতী, দেখা যায়।

এ কথা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নহে, আমেরিকাতে স্কুল এবং কলেজে manual training সম্প্রতি compulsory করা হইতেছে, কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, ইহাতে সাধারণের ও ছাত্রের ধীশক্তি বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশে চাকরীর প্রতি সম্মান এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সব কিছুর প্রতি অবহেলার ইতিহাসের কথাও বিশেষ পুরাতন নহে। জাতীয় অধঃপাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা মাত্রেই লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নৈতিক অবনতির পরিচয় যে কোন ক্ষমতা পাইলেই তাহার অপব্যবহার করা,—চাকরীতে ব্যক্তি বিশেষের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধা দেয় এবং নৈতিক ভিত্তি সবল না থাকাতে তাহার অপব্যবহার সর্ব্বত্র অফিসে, ষ্টেশনে, গুদামে সম্ভব, এজন্য চাকরীর প্রতি প্রলোভন এবং উহার শোচনীয় ফল!

কিছুকাল পূর্ব্বে স্বদেশী-আন্দোলনের খরতর স্রোতের সময় আমি ষ্টীমার যোগে "কুতুবদিয়া" নামক সমুদ্রবেষ্টিত শ্যামল-সুন্দর দ্বীপে যাইতেছিলাম। সেই ভ্রমণ-কাহিনীর সব কথার মাঝে একজন শ্রদ্ধেয় মুসলমান ভদ্রলোকের কয়েকটী কথা আমার এখনও মনে জাগিতেছে।

চাকরীর কথায় তিনি বলিলেন—দেখুন, সম্প্রতি ভারতের রাজত্বের ষোল আনার মধ্যে সাহেবরা দশ আনা এবং হিন্দুরা ছয় আনা চালাইতেছে—হিন্দুরাও একরূপ ছয় আনা রাজা, হাকিম আমলা প্রভৃতি সকলেই হিন্দু!

কি আশ্চর্য্য ধারণা! তিনি মনে করেন, তাঁহারাই শাসিত এবং কার্য্যে হিন্দুরাই শাসনকর্ত্তা, কারণ সাহেবদের সংখ্যা অতি যৎসামান্য!

আমি এই মুসলমান ভদ্রলোকের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, আমরা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরাধীন ভৃত্য, সাহেবরাই যথার্থ রাজা, অন্যান্য সকলেই গোলাম। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও ততটা সফল হইলাম না।

কারণ, ইঁহারা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, হিন্দু ডেপুটির হুকুমে অনেকে জেলে যাইতেছে, তাহার কথায় পুলিস প্রহরীরা ব্যস্ত, তখন হিন্দুরা রাজা নয় ত কি?

চাকরীর প্রতি এইরূপ অযথা অন্ধ সংস্কারমূলক শ্রদ্ধা শোচনীয়, সন্দেহ নাই এবং

ঐ মুসলমান ভদ্রলোক যদি যথার্থ বিশ্বাস করেন,হিন্দুরা এক হিসাবে রাজা,তবে তাঁহার পক্ষে একটু হিন্দুবিদ্বেষ হওয়া বিচিত্র নহে।

এই সমস্ত ভাব সম্পূর্ণভাবে উৎপাটন করা প্রয়োজন এবং কায়িক শ্রম-মূলক অর্থোপার্জ্জন অর্থাৎ manual labour এর প্রতি শ্রদ্ধা বিস্তার করিতে হইবে। যখন তাহা সম্মানিত হইবে, তখনই Demos বা সাধারণের প্রতি সম্মান জাগিবে। সম্প্রতি তাহা হয়ত একেবারে নাই, কিম্বা পুঁথিতে নিবদ্ধ, নচেৎ গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদনের এবং ক্রন্দনের কালে উচ্ছ্বসিত হইয়া কেবল ভাষায় মাত্র প্রকাশিত হয়। দেশে কেবল সম্প্রতি মাত্র Democracy'র মুকুল ফুটিয়া উঠিতেছে। সমগ্র দেশ সাগ্রহ নেত্রে ইহার বিপুল ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাজস্বদান ছাড়া বর্ত্তমান রাজা এবং প্রজার মধ্যে অন্য কোন সাম্য নাই,থাকিতেও পারে না এবং থাকিবেও না। সাহেবদের টেনিস্‌কোর্টের বাহিরের কাঁটা-জাল, ক্লাব হাউসের সযত্নরক্ষিত পর্দ্দার আবরণ সুতীক্ষ্ণ তরবারীর ন্যায় সাদা এবং কাল মানবের থাকে দুশ্ছেদ্য অন্তরাল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। ঐ হাউসের ভিতরে, Ball Dance চলিতেছে এবং God save the Kingর ব্যাণ্ড বাদ্য সাহেবদের মাথার টুপি উড়াইয়া নিতেছে। বৈদ্যুতিক আলোক নির্ঝরের ন্যায় ড্রেপারী, কার্পেট, রৌপ্য এবং স্বর্ণখচিত ফিটিংএ, কর্ণিসে, "Ich Dien" পতাকায়, শ্বেতমর্ম্মরের উজ্জ্বল মূর্ত্তির উপর, ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়, স্বর্ণ মন্দিরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ সমুদ্রের উপর ঐ শ্বেতদ্বীপের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের মূর্ত্তি ভাসিতেছে মাত্র, অন্য কোন সম্পর্ক ত দেখিতেছি না।

কাজেই প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধি আমাদিগকেই হইতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এইজন্য ইহাদের প্রতি সম্মান প্রয়োজন, এবং ইহাদেরই ব্যক্তিগত অস্তিত্ব গৌরবান্বিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। একদিকে প্রজা সাধারণের আত্মশক্তি এবং আত্মসম্মান জ্ঞান যেমন প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে,অন্যদিকে আমাদিগকেই প্রেমে, ভক্তিতে,ইহাদের সদ্যজাগ্রত শক্তিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

ইহাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি যখন সম্মান জাগিবে,তখন দেখিতে পাইব, আমাদের হ্যাটটী খুলিয়া পড়িতেছে, কোটের উৎকৃষ্ট কাট্ (cut) এবং ঘড়ি চেনের ঔজ্জ্বল্য, সার্কাসের Buffoon এর কাপড়ের ন্যায় হাস্যজনক হইয়া পড়িতেছে। যাহা গুরু গম্ভীরভাবে আজ গ্রহণ করিতেছে, এক সময় কৌতুকের জন্য তাহা প্রয়োজন হইবে।

অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন, আমি প্যাণ্টকোটকে নির্ব্বাসিত করিতে বলিতেছি। সপ্তম এডওয়ার্ড যেমন Scotland এ গিয়া হাইলেণ্ডার্সের পোষাক পরিধান করিয়া আনন্দিত হন, আমরাও হয় ত চাষার, কুলির পোষাকের মধ্যে এশ্বর্য, আনন্দের উৎসবের যথেষ্ট উপাদান পাইব।

আমাদের এই মৌন মূক জন সাধারণের জীবনে যে প্রবেশ করে নাই, তাহাদের সঙ্গে এক গ্রামে অন্ততঃ বৎসরে কিছুকাল যাহারা বাস করে নাই, তাহারা নেতা হওয়া দূরের কথা,সামান্য প্রতিনিধি হওয়ারও যোগ্য নহে। জনসাধারণ জাগ্রত হইলে পল্লবগ্রাহী নেতা এবং নেতৃত্ব ঝরিয়া পড়িবে। এখনও কিছু সুবাতাস বহিতেছে, দেখা যায়।

এজন্য যথার্থ নেতা মফঃস্বলের লোকের মধ্যে রহিয়াছে।

William Digby মহাশয় তাঁহার Prosperous British India নামক গ্রন্থে কলিকাতা,বোম্বাই,এলাহাবাদ প্রভৃতি সহরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃটিস উপনিবেশ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত উপনিবেশে মাত্র যাহারা থাকিবেন,তাহাদিগকে Britisher ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

দুর্ভাগ্যক্রমে সংবাদপত্রগুলি কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হওয়াতে এ পর্য্যন্ত মফঃস্বল এবং পল্লী একেবারে অনাদৃত রহিয়াছে। কংগ্রেস প্রভৃতিতে মফঃস্বলের লোককে আধিপত্য করিত বড় একটা শোনা যায় নাই। কেবল এইবার মাত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় কংগ্রেস-কমিটির সভ্য হইয়াছেন। ইহাও তাঁহার অখণ্ড স্বাধীনতার পুরস্কার স্বরূপ আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির সহিত সমানধর্ম্মী হওয়ায় তাঁহাকে প্রাচীন কলিকাতার নেতৃগণ স্বীকার না করিয়া পারে নাই।

আমার মনে হয়,যথার্থ প্রজাতন্ত্রের সূচনা এই মাত্র দেশে আরম্ভ হইতেছে। ইহার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে একথা সকলেই নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিবে যে, মফঃস্বলের সহিত, গ্রাম্য জীবনের সহিত যাহার কার্য্যগত সম্পর্ক নাই, সে নেতা নহে। তখন দেশ বর্ত্তমান সুলভ এবং স্ব নির্ব্বাচিত অস্বাভাবিক নেতার পরিবর্ত্তে যথার্থ নূতন নেতা গঠন করিয়া তুলিবে। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি পত্রে ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং পল্লবগ্রাহী হঠাৎসম্ভ্রান্ত নেতার পরিবর্ত্তে, হয়ত দরিদ্র, দীন হৃদয়বান্ নেতার প্রতিষ্ঠা চিরকাল দেখা গিয়াছে।

শুধু বড় কথার জোরে, কিম্বা পত্রিকার বাহবায় কোন জাতির ইতিহাসে নেতা গঠিত হইতে দেখা যায় নাই। কেবল স্বাধীন, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুশৃঙ্খলিত, ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ইংলণ্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সংবাদ পত্রের তৈয়ারী নেতা অন্য কোন পরাধীন, হৃতসর্ব্বস্ব দারিদ্র্য জীর্ণ স্থানে মঞ্জরিত হইয়া উঠিবে না।

ব্যক্তিগত সংবাদপত্রের করতালি দ্বারা উচ্ছ্বসিত হালফ্যাসানের নেতা দ্বারা "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং জাতীয় বীর্য্য এবং মনুষ্যত্ব প্রখর হইয়া উঠিবে না। ছেলে ভুলান ছড়ায় দেশকে ভুলাইবার সময় বোধ হয়, অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। যেদিন দেশ কর্ম্মের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবে, সেদিন নেতাগণকে প্রয়োজন হইলে মাথা পাতিয়া দিতে হইবে—উপমার ভাষায় বলিতেছি না, নিতান্ত সোজা কথায় বলিতেছি। হায়! হায়! বর্ত্তমান সময়ে সাহেবদের সামান্য ভ্রূকুটিতে যাঁহাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়, একটী স্বাধীন তেজস্বী বক্তৃতার পরে সাহেবকে পাঁচবার সেলাম করিতে হয়, তাড়াতাড়ি লর্ড মিণ্টোকে আনিয়া প্রদর্শনীর নহে—জাতীয় হৃদয়ের সিংহদ্বার খুলিতে আহ্বান করা হয়—তাঁহাদের গতি হইবে কি?

হইতে পারে, এই নূতন নেতৃগণ অনর্গল ইংরাজী নাও বলিতে পারে, কিন্তু এম্-এ বি-এল উপাধীধারী বড় বড় উকিলগণকে, বারিষ্টারগণকে, বিলাতফের্ত্তাগণকে বাধ্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে হইবে—তাহাই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীর ইতিহাসে বরাবর তাহা হইয়া আসিতেছে। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে, যাহারা জাতির সমগ্র হৃদয় নিজের মধ্যে ধারণ করিতে পারে নাই—তাহাদের পক্ষে নেতা হওয়া সম্ভব নহে।

কিন্তু তাহা বলিয়া এই কৃষক-শ্রেণী হইতে সেইরূপ নেতৃগণের উদ্ভব আমি অসম্ভব মনে করি না।

এতদিন রাষ্ট্রতন্ত্রে নানা কার্য্য জাগ্রত এবং জীবন্ত ছিল না, এজন্য কতকটা তামাসা, কতকটা দৃশ্যরূপে কার্য্যগুলি চলিত। অনেকে বড় বড় কথা বলিতেন—কেহ ঠাট্টা করিত, কেহ বা উপেক্ষা করিত, এইরূপে কংগ্রেস প্রভৃতি বহু পরিমাণে চিত্র-শালিকায় পরিণত হইত। ভবিষ্যৎও নিবিড়-কৃষ্ণ আকাশে ছায়াপথের ন্যায় ছিল; ব্রীটিশ মহিমা মাত্র শশধররূপে বিরাজ করিত।

বালকদের কল্পনাও আরব্যোপন্যাসের প্রাসাদের ন্যায় এক রাত্রে হঠাৎ আকাশের শেষ সীমা স্পর্শ করিত।

এবারের অত্যাচারে উৎপীড়নে দেশ-কৃত্যের সাধনা সমগ্র সন্দেহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে। যেখানে সাধনা, দুঃখ, সেখানে বিশেষ কোন সারবান্ জিনিষের অস্তিত্ব কল্পনা করা আশ্চর্য্য নহে। দেশ সেই জন্য ইহার অন্তরালের অনন্ত ধ্রুব সত্যকে উপলব্ধি করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। রাশি রাশি স্বদেশী-পণ্যবীথীর মাঝে আমি টাকা পয়সা স্বর্ণ রৌপ্যের ঝঙ্কার যতটা দেখি না, ততটা দেখি, একটী ভাবের অভিনব স্ফূর্ত্তি এবং বিরাট ভবিষ্যৎ! বাহিরের জিনিষ এই সীমার মাঝে আসিতে পারে না, এই ভাবের অস্তিত্ব কর্ত্তৃভাবক বা positive, ইহার চতুর্দ্দিকে রচিত পরিখার ভিতরে বিদেশী বহু খোষা-মোদেও প্রবেশ করিতে পারে না।

স্থূল কথা, দেশ এবার আপনার স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছে।

দেশে যখন কোন একটা ভাব বা আদর্শ জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন শক্তি কাহারও নাই। শুধু নামের জোরে তথাকথিত ক্ষণস্থায়ী সাময়িক নেতারা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন ঠিক, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র ফল হইবে না।

ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেওয়াও অনাবশ্যক মনে করি। আরব-ভূমির সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং বিস্তৃতির ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে।

এমন কি, একেবারে অত্যন্ত সহজ কথায় মাঝেও ঘোরতর মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। যখন ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জুন দিবসে বর্ত্তমান মার্কিন-রাজ্যে Richard Henry কংগ্রেস হলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তখন কত আপত্তি উঠে:—

That the united colonies are and ought to be free and independent states and their political connection with Great Britain is and ought to be dissolved.

ইতিহাস লিখিতেছে:—

Upon this resolution there sprang up at once an earnest powerful debate. It was opposed principally on the ground that it was premature. Some of the best and strongest advocates of colonial rights spoke and voted against the motion which at last was adopted only by a vote of seven states in its favour to six against.

ইহার পরে, যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতার পর এই ঘটনাকে উল্লেখ করিয়া বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ John Adams বলিয়াছিলেন:—

It will be celebrated by succeeding generations as the great anniversary festival. It ought to be solemnised with pomp and parade with shows, games, sports, guns, bells, bonfires and illuminations from one end of the continent to the other from this time forth for evermore.

কোন আপত্তি, কোন বাধাবিঘ্ন যথার্থ ভাবের বিকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উহাকে ব্যর্থ করিতে পারে না।

বর্ত্তমান জর্ম্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা

প্রিন্স বিস্মার্কের জীবনেও উপরোক্ত উক্তির অভ্রান্ত সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিসমার্ক চিরকালই স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদী বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রায় চারি বৎসর পর্য্যন্ত বজেট্ (Budget) ছাড়া শাসন করিয়াছিলেন তিনি Poland এর বিরুদ্ধে রুসিয়াকে সাহায্য করেন। সমগ্র দেশবাসী তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিল। অষ্ট্রীয়ার পরাজয়ের পর জর্ম্মন রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই absolute শাসন-পরায়ণ মন্ত্রীই নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে সর্ব্বসাধারণকে ভোটের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাই বিপ্লববাদীদের দাবী ছিল। ক্রমশঃ তিনি যে Nationalist Partyদের বিরুদ্ধে চিরকাল দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারই নেতৃত্বভার তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। সোসিয়ালিষ্টগণের দাবী পূরণার্থও তিনি অনেক আইন পাশ করেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে, কোন জাতির কিম্বা ব্যক্তির তীব্র অনুভূতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান অসম্ভব। সেই স্রোত কিছুকাল পঙ্করুদ্ধ হইলেও দ্বিগুণ মত্ততার সহিত অগ্রসর হইতে থাকে।

সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি দেশে কর্ত্তব্য কার্য্য না হউক, কর্ত্তব্যবুদ্ধি বহু পরিমাণে জাগ্রত হইয়াছে—এজন্য, শুধু কথার দিন চলিয়া গেছে। কাজেই আজ যদি লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তথা-কথিত নেতাদের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করে, তবে ঐক্যের হানি হইল বলিয়া চীৎকার করিলেও কোন ফল হইবে না। কারণ, কয়েকটা লোকের মস্তিষ্ক-সঞ্জাত খেয়ালকে বরাবর পোষাপাখীর ন্যায় দুধ কলা জোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা শাস্ত্রে লিখে না।

বর্ত্তমান নব জাগ্রত দেশের প্রধান কর্ত্তব্য, মানুষ চিনিয়া লওয়া। এই অবস্থায় বহু পরীক্ষায় সোণার ন্যায় যাহারা অকলঙ্ক থাকিতে পারিবেন, বিপদকালে তাহাদের হাতে দেশ আপনার কল্যাণের ভার রাখিতে পারে—নচেৎ দেশের যথার্থ বিপদকালে অনুপযুক্ত লোকের হাতে কার্য্যভার থাকিলে দেশের সমগ্র ভবিষ্যৎ পণ্ড হইবে। বিপদকালে সমালোচনাও চলেনা, তর্কও চলেনা, তখন কয়েকটা লোকের কথায় সকলকে চলিতেই হয়।

সম্প্রতি এমন কোন বিপদ ঘনীভূত হয় নাই, যেজন্য বিচার বিবেচনাকে স্থগিত রাখিতে হইবে।

সম্প্রতি কাগজ-পত্রে যাঁহারা আত্ম-ঘোষণা করিতেছে, এমন কি, প্রথিতনামা হইয়াছেন, তাঁহারাও এই পরীক্ষায় বাদ পড়িবেন না। Bridge এর লৌহ খণ্ডের সামর্থ্য এবং দাঢ্য যেমন সেতু-রচনার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিতে হয়, তেমন 'আসল' 'নকল' 'গিল্‌টি' 'মেকি' সমগ্রকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কাহার শক্তি কতটা, কে কতদিন পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারে, কে যথার্থ হৃদয়বান্, বিপদে কে অশ্লথ-বাহু হইবে, দেশ ক্রমশঃ তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। এমত অবস্থায় কান্নাকাটি উঠে কেন? দেখা যাইতেছে, ঐক্য সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাই অনেকের নাই। সভ্য গভর্ণমেণ্ট মাত্রেই দল-ভেদ রহিয়াছে, কিন্তু বিপদের সময়, কার্য্যের সময় অর্থাৎ কথাবার্ত্তা ছাড়া—সকলে এক।

অনেকের ভয়, দেশের ভবিষ্যতের জন্য যতটা নহে, নিজের ক্ষমতা হ্রাস, popularity র উপর ছায়াপাতের জন্য ততটা দেখা যায়। স্বদেশপ্রেম অনেক স্থলে খাঁটি নহে—আত্মপ্রশংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার

সুযোগ বন্ধ করিলে, অনেক প্রেমিকই রেল-ওয়ে আফিসে কিম্বা মার্চেণ্ট আফিসে চাকরীর জন্য লালায়িত হইবে। উপরোক্ত বক্তব্যটী কেবল স্কুল ছাত্রের পক্ষে নহে, সকলের পক্ষে খাটে। রাষ্ট্রতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে বিলাসিতার দিন চলিয়া গেছে। আকাশ জুড়িয়া মেঘ ঘনীভূত হইতেছে। চরিত্রের মহত্ত্ব,যাহারা দেশকে অভয়বাণী দিয়া,দেশের সমগ্র হৃদয় নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া,বিপদে বজ্র শিরে ধারণ করিয়া চলিতে পারিবে, তাহারাই ভবিষ্য নেতা হইবে। বিশ বৎসর কি এক বৎসর ন্যাশনাল কংগ্রেসে তাহারা যোগদান না করিয়া থাকিলেও, কংগ্রেসমঞ্চে তাহারা কোন বক্তৃতা না দিলেও, তাহাদের নেতৃত্বের কোন হানি হইবেনা—দেশ মেস্মেরিত (mesmerised)জীবের ন্যায় তাহাদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে চলিতে থাকিবে। তাহাদের উচ্চ আহ্বানের মূর্চ্ছনায়, জমীদার সোফা হইতে উঠিয়া বসিবে, উকিল মক্কেল ফেলিয়া দৌড়িবে, কৃষক লাঙ্গল ফেলিয়া ছুটিবে। Robert Browning এর Pied Piper of Hamelin এর ন্যায় তাহাদের অভয়মন্ত্র দেশকে আশ্বস্ত ও পুলকিত করিয়া তুলিবে।

হায় তখন ভগ্নদূতের ন্যায় তথাকথিত নেতাগণের কি দশা হইবে। এত কালি কলম খরচ, এত কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতারূপ নেতৃত্বপদের দাবীর সার্টিফিকিট কোথায় যাইবে? এত constitutional agitation এর জন্য বাড়াবাড়ির কথা কোথায় যাইবে? যখন গ্রামে গ্রামে যুবকগণ ছুটিয়া আসিবে এবং শিক্ষা দীক্ষা বিস্তৃতির জন্য নগ্নপদে, ছিন্নবসনে,রৌদ্রাতপে ঘুরিবে,তখন তাহাদের প্রতিভার অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে কে? কলিকাতার সংবাদপত্রে নাম উঠে নাই বলিয়া কি তাহাদের কেহ চাপিয়া রাখিতে পারিবে? তখন কলিকাতার কোন যুবক কি বৃদ্ধ কেবল কয়েকটা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিয়াছে বলিয়া কি তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করিবে?

তখন মফঃস্বলে মফঃস্বলে সংযোগ সাধিত হইবে। তখনকার সাম্য, মৈত্রীর ভাব বিভিন্ন হইবে। যুবকেরা নানাস্থান হইতে আসিয়া মিলিয়া কার্য্যের সূত্রপাত করিবে। কর্ম্মক্ষেত্রের নানা সুবিধা অসুবিধা আলোচিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট যেমন মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতিকে অবস্থা, সুযোগ এবং প্রয়োজন বুঝিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিবর্ত্তন করেন, প্রজাদের দিক হইতেও কর্ম্মীগণের স্থানান্তরে পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা যাইবে। তখন বরিশাল,চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহের যথার্থ কর্ম্মীরা অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় পরিচিত হইবে, এবং দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, এবং স্থানীয় সঙ্কীর্ণতা-সুলভ বাহাদুরী, পরিত্যাগ করিয়া, যথার্থ দেশের দোষ দুর্ব্বলতার স্থান সন্ধান করিয়া উহার প্রতিবিধানে যত্নবান্ হইবে।

কারণ, যত গর্ব্বই করা যাক্ না কেন—আমি জানি, প্রত্যেক প্রধান ডিষ্ট্রীক্ট নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা চতুর মনে করে,—বাঙ্গালীর ইতিহাস সর্ব্বত্র সমান। বাঙ্গালীর গুণ যাহা, তাহা যেমন সর্ব্বত্র রহিয়াছে, দোষ যাহা,তাহাও সর্ব্বত্র রহিয়াছে। সংবাদপত্রের আড়ম্বরে জয়ী হওয়া সহজ, কিন্তু জাতির হিসাবে জয়ী হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। দেশকৃত্যের সহিত যাহাদের একটু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহারা আশা করি, আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

পূর্ব্বে স্থানান্তর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা একটু প্রস্ফুট করিয়া বলা

প্রয়োজন। যদি ডিষ্ট্রীক্টের সঙ্কীর্ণতা আমরা ভুলিয়া যাই—ইহা কার্য্যক্রম কিছু অগ্রসর না হইলে হইতে পারে না, অর্থাৎ দেশকৃত্যের জন্য বিজ্ঞাপন দিবার যুগ অতিক্রম করিলে ইহা সম্ভব হইবে—তবে রিজলিউশন পাশ করিবার জন্য নহে, কার্য্যক্রমের সুবিধা অসুবিধা নির্ণয়ের জন্য দেশ-কলেবরের কর্ম্মীদের মাঝে মাঝে দেখা দেবার প্রয়োজন হইবে। হয়ত কোন একটা বিশেষ প্রণালীতে কার্য্য অগ্রসর হওয়ায় কোন স্থানে প্রচুর সফলতা দেখা গিয়াছে, তখন সেই প্রণালী অধ্যয়ন করিবার জন্য নানাস্থান হইতে কর্ম্মীগণ যাইবেন। হয়ত একস্থানে অসুবিধা, বিপদ, প্রতিকূল অবস্থা এবং বেশী যে সাহায্য প্রয়োজন, সমবায় প্রয়োজন হইবে—তখন বিচার বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যের জন্য লোক নির্ব্বাচিত করা প্রয়োজন এবং সেখানেও অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্থানান্তর হইতে ত্যাগপরায়ণ, নির্ভীক কর্ম্মীকে প্রেরণ করা প্রয়োজন, করতালির জন্য নহে, কার্য্যের জন্য।

এবার বরিশালে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অবস্থা দেখা যাইবে, আমি বিশ্বাস করি। যতদূর বোঝা যাইতেছে, ভবিষ্যতের কার্য্য বহু পরিমাণে বিপদসঙ্কুল। এমত অবস্থায় যাহারা নিজের মাথা দিতে প্রস্তুত আছে, তাহারাই কার্য্য করিতে পারিবে। এরূপ লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান করতালীর সময়ে বড় বেশী নহে। উদাহরণ দিব? বোধ হয় না দেওয়াই ভাল। দেশের বিগত দুর্ব্বলতার কথা বারবার স্মরণ করিয়া লাভ নাই।

কার্য্যের ভিতর দিয়াই যথার্থ নেতা গঠিত হইবে, আত্ম প্রশংসার ভিতর দিয়া নহে। যতই অস্থিরতা প্রকাশ করা হউক না কেন, যথার্থ নেতৃপ্রকৃতি মানব আপনাআপনি ফুলের ন্যায় ফুটিয়া কানন উজ্জ্বল করিয়া দিবে—সুদীর্ঘ বৃক্ষ বহু বৎসরের তপস্যাও তাহা লাভ করিতে পারে নাই। নেতৃগণ ভগবানের তেজঃ নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখে, এজন্য তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রতিভার সম্মুখে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নত হইতে হয়। হিংসা দ্বেষ বেশী কিছু করিতে পারে না।

অনুপযুক্ত লোকের হাতে গুরুভার পড়ায় আমাদের দেশে ভাল কাজের উপর লোকের একটা অতিরিক্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেছে। যাহাদের উপর দেশ বিপদের সময় নির্ভর করিতে পারে না, এমন লোকের হাতে দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের কাজ রহিয়াছে। অবশ্য অধিককাল ইহা থাকিতে পারে না—ইতিমধ্যেই অনেকের চরিত্র বাহির হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোলাহল করা নিষ্প্রয়োজন, প্রাকৃতিক নিয়মে ইহারা কিছুকালের মধ্যে অন্তর্হিত হইবে।

অথচ উপযুক্ত লোকও ভগবান আকাশ হইতে তৈয়ার করিয়া পাঠান না। দেশের কাজ করিতে হইলে প্রচুর সাধনা প্রয়োজন। সাধারণের ভক্তি কেবল কথার জোরে বা দু একটা তামাসা সৃজনকারী বক্তৃতায় হয় না। বক্তৃতার যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও কেবল ঐ উপায়ে দেশে স্থায়ী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যাইতে পারে না। আমাদের জনসাধারণ আর যাহাই হউক না কেন, অন্ততঃ নির্ব্বোধ নহে, একথা আমি বেশ জানি।

আমাদের কার্য্য মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রিত করা—আমাদের দেশের ব্যাধি বহু পরিমাণে মানসিক ব্যাধি, নিজের প্রতি অবিশ্বাস, hypochondria! এই মনকে নিয়ন্ত্রিত করা সোজা নহে, ইহা এমন জড় পদার্থ নহে যে,

ইচ্ছামত যাহা ইচ্ছা, তাহা করা যায়। দিন দিন পল পল নিজকে অধ্যয়নে, কার্য্যে, চরিত্রের ঔদার্য্যে বিনয়ে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। সামান্য চাকরীর জন্যও যদি দশ বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হয়, তবে বর্ত্তমান দেশকৃত্যরূপ গুরুতর কার্য্যে কিরূপ অভিনিবেশ প্রয়োজন, কল্পনা করা যাইতে পারে। সর্ব্বথা চাঞ্চল্য এবং লঘুতা ত্যাগ করিয়া, তপস্বীর ন্যায় এই দেশকৃত্যের আশ্চর্য্যের সোপানে আরোহণ করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার প্রলোভনকে, আত্ম-ঘোষণার প্রবৃত্তিকে পদতলে চূর্ণ করিতে হইবে।

দেশের মধ্যে ভবিষ্যজ্ঞান এত সুদৃষ্ট হইয়াছে যে, চোখে ধূলি দিয়া নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার দিন চলিয়া গেছে। বাহিরের কঞ্চুক ভিতরের দুর্ব্বলতাকে গোপন করিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্বে এরিষ্টটালের উল্লিখিত বিভাগে Oligarchyর উল্লেখ আছে। তিনি দেখাইয়াছেন, Oligarchyর অধঃপতিত অবস্থা aristocracy. এই অবস্থা কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। যতদিন বহির্সমাজ নির্ব্বাক, মূক, ক্ষমতাহীন থাকে,ততদিন ইহার প্রভুত্ব, তারপর ইহার তিরোভাব। এই কথাটী স্বীকার করিলে নেতৃত্ব সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার বিবাদের শেষ হইবে।

পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, একেবারে নির্ব্বিবাদে কাহারও নেতৃত্ব পদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এক দল লোক চিরকালই বিপক্ষাচরণ করিয়া আসিয়াছে। কেবল এক প্রকার নেতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হয় নাই,তাহা হচ্ছে সামরিক নেতা বা সেনাপতি; কারণ তাহার প্রত্যক্ষ ক্ষমতা দেখাইবার শক্তি আছে। হাতে কলমে অতি সহজে নিজের ক্ষমতা আর কেহই দেখাইতে পারে নাই।

আরও দেখা গিয়াছে, যাহারা আহারে বিহারে নিজকে পক্ক বিবেচনা এবং নিজকে নেতা কল্পনা করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছেন, হঠাৎ সাধারণ অনাদৃত সমাজ হইতে কেহ উঠিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রের সামনে তাহার শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছে। বুয়র যুদ্ধে ওয়াটারলু-বিজয়ী (ইংরাজ নাকি এই রূপ নিজকে ভাবে) ইংরাজ সেনাপতিগণ রৌপ্যের এবং স্বর্ণের মেডেল, রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নববিবাহিত জামাতার ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল—হয়ত ভাবিয়াছিল, এত মেডেল দেখিয়া, এরূপ সুন্দর ইউনিফরম্ (uniform) দেখিয়া বুয়রেরা নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। যখন দেখিতে পাইল, বুয়রেরা Waterloo সম্বন্ধে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া, কৃষকের জাতি কিনা?—তাহাদিগকে রক্তবর্ণ ফড়িংএর ন্যায় গতাসু করিতে আরম্ভ করিয়াছে,তখন হুকুম হইল, খাকী পরিধান কর—মেডেল ছাড়, হাম বড় ভাব ছাড় এবং শিষ্ট স্কুল ছাত্রের ন্যায় হুকুম মত যুদ্ধ কর।

অবশ্য ইহা যুদ্ধ সম্বন্ধে কথা। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্য-নেতাকে এইরূপ অতীতের অন্তঃসারশূন্য অবস্থাকে পরাজয় করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে।

ভক্তিস্রোতে চৈতন্য যখন বাঙ্গালাদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, খ্রীষ্ট যখন জগতে peace and good will প্রচার করিতেছিল ,তখন ধর্ম্মের ব্যবসায়ী পাদরী অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকগণ কিরূপ কোলাহল তুলিয়াছিল, কাহারও অজ্ঞাত নহে। জ্ঞান প্রচারের জন্য সক্রেতিশকে বিষপান পর্য্যন্ত করিতে

হইয়াছিল। সক্রেতিশ ঘোরতর পাপী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ আরও দেখা যায়, ভগবানের জগতে নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, এম-এ, বি-এ এর কাগজের ফর্দ্দ বুকে ঝুলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় নাই। জগতের নেতৃগণকে Wrangler বা বারিষ্টার, উকিল বা "Sir" হইতে হয় নাই। এই জন্য এই সব থাকা একান্ত প্রয়োজন নহে, একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। কাজেই "ও আবার কি নেতা? বি-এ পাশ করে নাই" ইত্যাদি কথা একেবারে বালকোচিত। জগতের পরীক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে যে পাশ করিতে পারিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিতে সমাজ বাধ্য, ইচ্ছা হউক, না হউক, তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র কোন বিশেষ sect এ নিবদ্ধ, সেখানে সহজে সেই sect বা স্বনির্ব্বাচিত দলের বাহিরের লোককে আসিতে দেওয়া হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে সহজে যাহা হইতে পারে, এমত অবস্থায় তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে। যথার্থ Democracyর উপর সমগ্র কর্ত্তব্য কার্য্যকে দাঁড় না করাইলে চিরকালই সঙ্কীর্ণতা ষড়যন্ত্র প্রভৃতি চলিবে। তখন জোর করিয়া নেতা রচনা করা যাইতে পারিবে না। কেবল অর্থশালী কিম্বা সুবিখ্যাত আইনব্যবসায়ী বারিষ্টার হইলেই অমনি কেহ নেতা হইয়া বসিতে পারিবে না—এইরূপ অদ্ভুত নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও হয় নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রের সমগ্রকার্য্য জাতীয় শৈশবে যে কেহ করিতে পারে, তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টি কাহারও থাকে না; কিন্তু যৌবনে তাহা সম্ভব নহে।

James Bryce নামক বিখ্যাত গ্রন্থকার "American commonwealth"এ আমেরিকার Democracyর দৃঢ়তার কতকগুলি কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কৌতুহলজনক। যাহারা সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের সাধারণ লোকের ক্রমঃবিবর্দ্ধমান ক্ষমতা সহ্য করিতে পারিতেছেন না, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা উহার প্রতি একটু দৃক্‌পাত করিলে আমার অনেক বক্তব্য সংক্ষেপ হইয়া আসিবে। তিনি সাতটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার স্থায়িত্বের উপাদান, সাধারণের স্বকৃত বলিয়া আইনের প্রতি সম্মান, কোন সাধারণ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা, রাজকর্ম্মচারীদের নিকট যথাসম্ভব কম চলাফেরা করা, অর্থাৎ আইন আদালতে যখন তখন না যাওয়া এবং আত্মশক্তিতে নিজকে চালিত করা, ধনী দরিদ্রে, ছোট বড়তে কোনরূপ সঙ্ঘর্ষের অভাব, সময়ে সমগ্র জাতি পশ্চাতে বলিয়া অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন, স্বাধীনতার অপব্যবহার না করিয়া ভ্রাতৃভাব জাগান—ইত্যাদি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সমস্তের মূলে একমাত্র আশ্রয় সমগ্র জন-সাধারণ—প্রেসিডেণ্টের পদও সেখানে জুতাব্রুসওয়ালার পাওয়া অসম্ভব নহে। সাধারণ যেখানে প্রথম এবং শেষ বিচারক, সেখানে কাহারও কোন হা-হুতাশ থাকার কারণ নাই।

আমাদের দেশকৃত্যেও সেইরূপ সাধারণের election বা selection নির্ব্বাচন দরকার। জাতীয় সমিতির constitution বা গঠন দরকার, প্রাদেশিক সমিতির কন্‌ষ্টিটুশান দরকার, এমন কি, ডিষ্ট্রীক্ট এসোশিয়েশন প্রভৃতিরও রীতিমত গঠন থাকা প্রয়োজন, যাহাতে প্রত্যেক কার্য্য খামখেয়ালীর উপর না হইয়া যথার্থ বিচার বিবেচনার নিয়ম

দিয়া ভোট হয়। দেশের জনসংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া সে দেশ সম্বন্ধে সমগ্র বক্তব্য শুনিয়া তবে তৎসম্পর্কে কিছু নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। বিহার, উৎকল এবং আসাম তাহা হইলে এবার কংগ্রেস-কমিটির সভ্যপদ-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইত না।

কন্‌ষ্টিটিউশনের অভাবে, দেশের সহিত ঘনিষ্ট জ্ঞানের অভাবে, National Council of Education এর ডিষ্ট্রিক্ট হিসাবে ফেলোর সংখ্যা নির্দ্ধারণ বিরক্তিজনক, এমন কি, অপমানজনক হইয়াছে। এসব কে করিতেছে? যাহারা করে, তাহারা সমগ্র বাঙ্গালা দেশটা একবার বেড়াইয়া দেখিয়াছে কি? তবু নিজেদের ডিষ্ট্রীক্টের প্রতি অনুগ্রহ এবং অন্যান্য ডিষ্ট্রিক্টকে নিগ্রহ কেন? ঐ কৌন্সিলের সভ্যগণের পদেও অনেক অপোগণ্ড সদ্য উত্তীর্ণ বালককে দেওয়া হইয়াছে, দেশের সর্ব্বত্র যে সব বিদ্বান্ রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে খোঁজ করা কেহ দরকার মনে করে নাই।

সমগ্র কার্য্য পূর্ণ আলোকে দেশের সকলকে আহ্বান করিয়া আরম্ভ করা দরকার, একথা আশা করা বোধ হয় অন্যায় নহে। যতদিন ইহা হইবে না, এইরূপ Universal suffrage প্রচলিত হইবে না এবং কার্য্যাদি স্বনির্ব্বাচিত দল বাঁধিয়া চলিবে, ততদিন কোন কার্য্যকে সম্মান করিতে দেশ বাধ্য নহে—তবে যদি করে, সেটা উদারতা-প্রসূত, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। বর্ত্তমান লেখক কংগ্রেস প্রভৃতির অভ্যর্থনা-কমিটীর কার্য্যে, সবজেক্টস কমিটী প্রভৃতির কার্য্যে কেবল হৈ হৈ রব, কোন শৃঙ্খলা, দেশের বিরাট ভবিষ্যতের উপযোগী কোন সংযম দেখে নাই, একথা বলিলে আশা করি, কেহ খড়্গহস্ত হইবেন না; কারণ সময় আসিতেছে, যখন আদ্যোপান্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইলে, কোন কাজ একটী পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। দেশ জাগিতেছে মাত্র—যখন জাগিবে, তখন কেবল ক্রীড়াতে মুগ্ধ হইবে না।

ইংরাজ লেখক Frederic Harrison এক জায়গায় বলিয়াছেন, দেশের যাবতীয় কার্য্য ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে যতটা হয়, কমিটির এবং এশোসিয়াসনের নামে ততটা হয় না। প্রাচীন কালে সব কাজ মহাপুরুষের প্রভাবে হইয়াছে, Charlemagne, হারুণ-অল-রশিদ, নেপোলিয়ান, ক্রমওয়েল প্রভৃতি নিজের প্রতিভায় সমগ্র দেশকে চালাইয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ পত্রের যুগেও যে ইহা একান্ত সত্য, তাহা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তবে যেখানে কন্‌ষ্টিটিউশন আছে, সেখানে ব্যক্তিগত প্রভাব কাজ করিবার সুবিধা পায়।

কাজেই প্রশ্ন হইতেছে, নিজের এবং প্রতিভা দ্বারা কাহারা বাঙ্গালা দেশকে চালাইতেছে?

ইহার উত্তর যাঁহারা পাইতে চান, তাঁহারা মফঃস্বলে এবং পল্লীতে পর্য্যবেক্ষণ করুন। দেখিতে পাইবেন, প্রদেশিক সমিতিতে যাহারা চলাফেরা করিতেছে, তাহারা যথার্থত দেশনেতা নহে। ইহাদিগকে নেতা মনে করা ভুল।

গ্রামে গ্রামে, ডিষ্ট্রিক্টে ডিষ্ট্রিক্টে, অক্লান্তকর্ম্মী নির্ম্মলচরিত্র যুবকগণ রহিয়াছেন। দু'চার জন কোথায়ও বা একজন প্রত্যেক গ্রামকে চালাইতেছে—প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টকে চালাইতেছে। দেশ আপনাআপনি ইহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ইহাদের পথে চলিয়াছে এবং চলিবে। চিরকাল নেতৃত্বের জন্য কোন স্বীকারপত্র দিতে হয় নাই। যে

সকলের সঙ্গে মিলিয়া, আশা দিয়া, ভাবা দিয়া নিজের প্রতিভায় দেশকে নিয়া ছুটিতে পারে, তুমি স্বীকার কর বা না কর—সে-ই দেশ-নেতা। সে মতামতের অপেক্ষা করে নাই, এবং করিবে না। সে কর্ম্ম চাহে এবং কর্ম্মের তরঙ্গে সমগ্র দেশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—তোমার সমালোচনা ভাসিয়া যাইবে এবং ব্যর্থ হইবে।

যাহার মহত্তর উদ্দেশ্য রহিয়াছে, যে নিবিড় স্বদেশপ্রেমিক, সে সামান্য সমালোচনায় বিচলিত হইবার লোক নহে—কেবল দুঃখমাত্র প্রকাশ করিতে পারে।

যাহারা এই ভাবে কর্ম্মের পথে, সাধনার পথে দেশকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহারাই নেতা—জোর করিয়া বড় উকিল কিম্বা বড় বারিষ্টারকে নেতা ঘোষণা করিলেও, কিম্বা কোন জমীদারকে সেই পদের উপযুক্ত বলিয়া কোলাহল করিলেও, প্রকৃতির নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইবে না। বড় বড় উকিল বারিষ্টার দেশের নেতা কিছুতেই নহে, ছোট ছোট গরীব লোকগুলিই দেশকে চালাইতেছে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতে উকিল নেতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ উকিল হইলেই যে দেশকে চালাইবার উপযুক্ত, একথা কোন শাস্ত্রে পাই নাই।

অবশ্য কেহ কেহ আছেন, যাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডিষ্ট্রীক্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে, যাঁহার নাম গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হয়, প্রতি গ্রামে প্রতি কুটীরে যিনি দেবতার ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত, এমন লোকের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে বেশী নহে। কোন কোন ডিষ্ট্রীক্ট এ বিষয়ে ভাগ্যবান্ হইতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এইরূপে জনসাধারণের সহিত যাহারা সংলগ্ন, তাহারা সম্মান পায়না। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় ইংরাজী কাগজে লিখিলে যদি মান্দ্রাজ, বম্বে, এলাহাবাদ, লাহোরে তাহার সমালোচনা হয়, দেশের শোচনীয় অবস্থা—তিনিই বড় লোক নামে কীর্ত্তিত হন।

কার্য্যের ক্ষেত্র যথার্থ কার্য্যের হিসাবে ক্ষুদ্র করিতে হয়, অন্ততঃ ষোল সতের লক্ষ লোকের বেশী করায়ত্তে রাখা ঠিক নহে। কিন্তু এইরূপ করিলেই সম্মান বেশী পাইবার পরিবর্ত্তে একেবারে না পাইবার যোগাড় হয়। বর্ত্তমান অদ্ভুত সংবাদপত্র-যুগের এই আর একটী ফল।

সম্মান বেশী না পাওয়া অর্থ হচ্ছে দেশ সেই কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অন্ধ থাকা এবং তাহার অনুকরণ-যোগ্য মনে না করা। দেশে সাহিত্যের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন, বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বতোমুখী ব্যবহার, প্রভৃতি বিষয় রীতিমত আন্দোলন প্রয়োজন। সম্প্রতি কয়েক খানা কাগজের উচ্চরবে দেশ ভুলিয়া আছে।

এ প্রশ্ন আমার অনেক সময় মনে আসে যে, দশ লক্ষ গ্রাম্য লোক, গ্রাম্য জমীদার, গ্রাম্য বণিক যাহার মৃত্যুতে বিচলিত হয়, সে যথার্থ দেশ-নেতা, কি যাহার মৃত্যু দেশের একটী চাষাও জানেনা, অথচ পাঁচ সাত খানা ইংরাজী কাগজে, হয় ত তাহা ভারতের নানা স্থানের হইতে পারে—তাহার বিবরণ বাহির হয়, সে দেশ-নেতা? যে জীবন্ত দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ-জড়িত বহুমুখী স্বার্থদ্বন্দ্বমুখর সামাজিক জীবনের উপর নিজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, সে বড়, না যে কিয়দ্দিন কয়েকটা লোকের মাঝে—হয়ত তাহারা এসিয়ার নানাস্থানেও থাকিতে পারে, নিজের নাম প্রচার করিয়াছে, অথচ যাহার

মৃত্যু কথা একটী পল্লীগৃহস্থ, কিম্বা কৃষক পরিবার সন্ধ্যার কুটীর কোণে রক্ষিত মাটীর প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে বসিয়া ঘরকন্নার কথার সঙ্গে জড়িত করে নাই, সনাতন সামাজিক জীবনের উপর যে ছায়াপাত করিতে পারে নাই, তাহার প্রতি কোন কালে আমার শ্রদ্ধা তেমন জন্মে নাই। চিরকালই আমি তাহাদিগকে ঘুঁড়ির ন্যায় বিবেচনা করিয়াছি। এই বিচারে আমাদের বহু তথাকথিত নেতার নেতৃত্ব লোপের সম্ভাবনা।

অথচ Gladstone বা বিসমার্ক কিম্বা প্রাচীন যুগের Wallace বা শিবাজী প্রতি গৃহে, প্রতি দুষ্প্রবেশ্য হৃদয়ের অন্তরালে পূজিত হইয়া আসিতেছে। খাঁটী এবং মেকী নেতার মধ্যে এই প্রভেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল বার্নিশ-করা নিখুঁত প্রণালী যথেষ্ট নহে। কেবল কয়েকটা লোকই দেশকে জীবন দিয়া চালাইতেছে এবং এই প্রণালীর ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালন করিয়া সমস্ত শরীরে কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতেছে।

দেশের জীবনকে যাহারা অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে, তাহাদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ। নদীবক্ষে জোয়ার অস্বীকার করিয়া স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা চালাইলে প্রবীণ কর্ণধারও নৌকা অগ্রসর করিতে পারিবে না।

দেশে কোন বিষয়ে যদি তীব্রভাব জাগে, ভয় দেখাইয়া উহা হইতে বিরত করিবার চেষ্টা বৃথা। বরং যাহাতে ফলাফলের জন্য জনকে তৈয়ার করা যায়, তৎপ্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। বিপদ আলিঙ্গন করিতেই হইবে, উদ্ধার নাই, একথা যেন সর্ব্বদা মনে রাখি। দেশকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করা অন্যায় এবং সেই চেষ্টার সুফলও জন্মিবে না।

অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে, আমাদের দেশে তাহা ঘটিতেই পারে না, এ ভাব দেশে বিস্তৃত করা হইতেছে কেন? দেখা গিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যেও চতুর্দ্দিকের আব হাওয়া দেশের মাঝে বিপ্লব তুলিয়াছে। নিতান্ত শান্তজাতি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে এবং ইতিহাসের অধ্যায় পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে।

কিছুই অসম্ভব নহে। এজন্য অহরহ শিহরিয়া উঠা নিষ্প্রয়োজন।

শিহরিয়া উঠার কারণও যে নাই, তাহা নহে। এই বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে দেশ এত কম পরিচিত যে, অতীতের সহিত কোন ঘনসম্বন্ধ অনুভব করে না। যে ভারতবর্ষের ইতিহাস স্কুল-ছাত্রদের পাঠ্য, তাহাও ইংরাজরচিত বলিয়া তাহাতে বাঙ্গালাদেশের কথা নিতান্ত যৎসামান্য রহিয়াছে। কাজেই রাজপুতদের কীর্ত্তি, মহারাষ্ট্রীয়দের শৌর্য্যের বিবরণ মাত্র আমরা পাই, বাঙ্গালীর কোন কীর্ত্তি আমরা পাই না। ভুলিয়া গিয়াছি, কেবল একটা কথা, প্রত্যেক ইতিহাসে থাকে,—লক্ষ্মণ সেনের তথাকথিত পলায়ন।

বাল্যকাল হইতে এই মিথ্যা-রচিত দুর্ব্বলতার কথা বাঙ্গালী জাতির নৈতিক চরিত্র সামান্য দুর্ব্বল করে নাই। নিজের জাতিকে নিজে এত গালাগালি, বোধ হয়, ভারতের কোন জাতি করে না। এই স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে দেশের কার্য্য মাত্রই উপহাসের বিষয় ছিল, এবং বাঙ্গালীর "চম্পটে পারিপাট্য" "লক্ষ্মণ সেনের কচুবনে পলায়ন" প্রভৃতি লিখিয়া অনেকে প্রচুর হাস্য সংগ্রহ

করিতে পারিতেন। সে হাস্য বাঙ্গালীর সম্মিলন হইতে উঠিত, সাহেবের ক্লাব হাউস হইতে নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে কি? এই উক্তির অসারতা প্রমাণ করিতে পুঁথিপত্রের উল্লেখ না করিয়া এই মাত্র বলিব যে, সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাগুলি অধ্যয়ন করিলেও বাঙ্গালী মাত্রেরই শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিবে। আমাদেরই প্রপিতামহগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে কি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা দেখা কেবল মাত্র আমাদের অনুগ্রহ করিয়া অধ্যয়নের উপর নির্ভর করিতেছে।

এই ইতিহাসের সহিত বর্ত্তমান নেতৃপদবীতে আরূঢ়গণের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের inspiration বিলাত হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া আসে।

এই ইতিহাস-অধ্যয়নে মুসলমানদের আমরা কখনও যেন ভিন্ন জাতি বিবেচনা না করি। মুসলমান বিজেতারা এদেশকে মাতৃভূমি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এই দেশকেই ধনরত্নে, ভাস্কর্য্যে, কারুকার্য্যে, মণিমুক্তায় নৈশ আকাশের ন্যায় খচিত করিয়া গিয়াছিলেন। মুসলমানদের যেমন হিন্দুসৈন্য ছিল, হিন্দুদেরও মুসলমানসৈন্য ছিল। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ এদেশে কখনও হয় নাই। এই মুসলমানদের রাজত্বের সময় দেশের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। একটী সহরের কথা উল্লেখ করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারি না। অনেকে আগ্রাকে (Agra) কেবল তাজমহলের জন্য বিখ্যাত মনে করেন। কিন্তু :—

"The Agra of the sixteenth century was a walled city of twenty six miles circumference of 106 mosques, 80 serais, 800 public baths, 15 bazars and a population of 600,000 inhabitants. It was, says Fitch, a great and populous city, superior to London, well-built of stone and having fair and large and large streets. Travels of a Hindu.

এই বাঙ্গালাদেশের মুর্শিদাবাদও ঐশ্বর্য্যে লণ্ডন অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল।

ধর্ম্মগত সমরের যেখানে অভাব, সেখানে হিন্দু মুসলমান প্রশ্নের অনেক কথা সহজ হইয়া আসিবে। ইউরোপে একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত Peter the hermitএর প্ররোচনায় crusades নামক যে সমস্ত ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল, এসিয়ার পক্ষে তাহা একান্ত নূতন এবং জঘন্য। স্বয়ং Pope ১০৯৫ খ্রীঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। জর্ম্মণীর Conrad III, ফ্রান্সের Louis VII, ইংলণ্ডের Richard I, প্রভৃতি মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে সাতটী Crusadeএর যুদ্ধেও ইউরোপ এসিয়াকে পরাজয় করিতে পারে নাই।

কাজেই দেখা যাইতেছে, যেখানে ধর্ম্মগত কোন বিপ্লব ঘটে নাই, সেখানে কেবল মাত্র রাজাদের মধ্যে, সেনাপতিদের যদি যুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহা Civil war মাত্র, তাহা কোন দেশে হয় নাই? স্বাধীনতা, রাজ্য-বিস্তৃতি, অর্থ প্রাপ্তির জন্য সৃষ্টির আরম্ভ হইতে চিরকাল যুদ্ধাদি হইয়াছে—ইহাতে সম্প্রদায়গত কোন প্রশ্ন উঠে না।

হিন্দু ও মুসলমান অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাঙ্গালার ইতিহাসে রহিয়াছে। একই আলোক, একই জল, একই বাতাসের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মুসলমান জমীদারী প্রভৃতি বাঙ্গালী বহু শত বৎসর পর্য্যন্ত দেশের সহিত জড়িত হইয়াছেন—কেহই পেন্সন্ প্রাপ্ত হইয়া তুরস্ক-রাজ্যের প্রতি ধাবিত হন না। এই জন্য বাঙ্গালাদেশকে যাহারা মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দু মুসলমান না বলিয়া বাঙ্গালী বলিতে হইবে।

যাহারা বিলাত হইতে বোম্বাই করা আদর্শ দেশের ঘাড়ে চাপাইতে চাহেন, তাহারা এই বাঙ্গালীর ইতিহাসের সহিত কোন শোণিত-স্পন্দন অনুভব করেন না। নেহাৎ বিলাতী ফ্যাশনে একটা Cromwell কিম্বা Wellington প্রয়োজন বলিয়া জরা-জীর্ণ পুস্তক হইতে প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। একথা ভুলিয়া যান, বর্ত্তমানের হিন্দুমুসলমানপূর্ণ বাঙ্গালা জাতিকে উদ্ধার করা এবং উত্তোলন করা ও রকম দু'একটা লোকের কাজ নহে। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বেষ ঘনীভূত করা হয়।

এই বাঙ্গালার ইতিহাসের কত যুদ্ধ, কত ঘটনা হইতে প্রচুর স্বাস্থ্য এবং শক্তির উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি। সপ্তদশ শতাব্দীর শোভাসিংহ এবং উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁর যুক্ত-চেষ্টা-প্রসূত বিদ্রোহের কোন কথা কাহারও মনে আসে না। ইহারা যখন জগৎরাম এবং নুরউল্লাকে পরাজিত করে, তখন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ কোথায় ছিল? এই শোভা সিংহ, জগৎরামের পিতা কৃষ্ণরাম, ইহারা ত হিন্দু জমীদার এবং তালুকদার ছিল। কে বলে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানেরা যুদ্ধ করে নাই এবং মরিতে জানে নাই? তারপর উদয়নারায়ণের যুবাদি, গিরিয়ার যুদ্ধ, উড়িষ্যা বিজয়, কাশিমবাজার অবরোধ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাপার হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উপর শ্রদ্ধা না না হইয়া পারে না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, দুই শত বৎসরের কথা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে দেশ ভুলিয়া গেছে। আমার মনে হয়, ইংরাজ-সংস্পর্শে ইহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ক্ষতি। আমাদের সভা সমিতি, কথাবার্ত্তা, পারিবারিক জীবনে এ সব কথা উঠে না। কেবল ঐ লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের কথাই প্রত্যেক বাঙ্গালী বালক জানে।

যে প্রণালীতে বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাস রচিত হয়, তাহা নিতান্ত দূষণীয়। সকলেই একটী বিষয় স্বতঃসিদ্ধ ধারণা করিয়া বই লিখিতে আরম্ভ করে। সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষটা তথা-কথিত হিন্দুর দেশ। ভারতের ইতিহাসে ইহাকে অনেক সংঘর্ষ সহ্য করিতে হইয়াছে। আর্য্য, গ্রীক্, ফিনিসীয়, দ্রাবিড়ীয়, সেমিটিক, মঙ্গোলীয়, ইরাণীয় প্রভৃতি নানা জাতির নানা সংঘর্ষে ভারতবর্ষ জগতের পক্ষে এক অভিনব রাজ্যরূপে গঠিত হইয়াছে। কোন ধর্ম্মের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে ভারতবর্ষ কিছুতেই স্বীকার করিবে না। জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম আসিয়া ইহার উপর পড়িয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন সভ্যতার মন্থন হইতে ভারতবর্ষ জগৎকে কোন্ অমৃত দান করে, তাহা এখনও কেহ বলিতে পারে না।

এদেশে হিন্দু মুসলমান উভয়ের তুল্য অধিকার রহিয়াছে—যে অর্থে ইহা হিন্দুর দেশ, সেই অর্থে ইহা মুসলমানেরও দেশ, একথা বিশ্বাস করিলে বর্ত্তমান ইতিহাস লিখার প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু বালকেরা যেমন উপরোক্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া বিবেচনা করে, দেশটা তাহার, তেমন মুসলমান বালকও অলক্ষ্যে বিবেচনা করে দেশ তাহাদের নহে, তাহা তাহাদের নহে, এজন্য আরব্য, পারস্য, তুরস্ক ভূমির প্রতি তাহারা উন্নেত্র থাকে এবং নিজেদের বংশাবলীর ইতিহাস ঐ সমস্ত স্থান হইতে আকর্ষণ এবং আহরণ করিতে চেষ্টা করে।

এজন্য অনেকেই বাঙ্গালা লিখিতে চাহে না, বলিতে চাহে না।

ইউরোপে যেমন দেশের স্বত্ব-স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হইয়াছে, এদেশেও যুদ্ধ হইয়াছে, তবে উভয়ের ইতিহাস পড়িলে দেখা যাইবে লিখিবার প্রণালী কত বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা আনিল কে? ইংরাজ-লেখক?

তাহা যদি হয়, তবে আমরা উহার অনুকরণ করিয়া জাতি-বিরোধের সূত্রপাত করি কেন?

দেশের যথার্থ ভবিষ্য আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইতিহাস না লিখিলে জাতি গঠিত হওয়া অসম্ভব। ইতিহাস পাঠ্য হওয়ার উদ্দেশ্যই ভবিষ্যতে আমাদিগকে তৈয়ার করিবার জন্য। সব ছাড়া আর একটা বিষয় এই সমস্ত ইতিহাসে আছে, যাহা দেশকে দুর্ব্বল করিতেছে, তাহা হচ্ছে ভগবান্ যেমন বাইবেল শাস্ত্রের মতে জগতে আলোক আনয়ন করে, ইংরাজ এদেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছে। এই শান্তি শব্দের অর্থ আমি বুঝি না।

বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালী বালক যদি দেশের সমস্ত ইতিহাস হইতে নিজের চরিত্রের উপাদান সংগ্রহ করিত, তবে বর্ত্তমান রাষ্ট্র নৈতিক ইতিহাস বিভিন্ন হইত। হিন্দু ও মুসলমান দেখিতে পাইত, একত্রে এক সমর ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিপক্ষের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিতে হইয়াছে। বস্তুত জীবন্ত ইতিহাস রচনা দেশে একান্ত দরকার।

কারণ, কালের স্রোতঃ বহু পরিমাণে ফিরিয়াছে। এসিয়ায় যে সুবাতাস বহিতেছে, তাহা ভারতের বক্ষের উপর দিয়া যাইতেছে। শুষ্ক অরণ্য শস্যশ্যামল হইয়া উঠিতেছে, কঠিন ভূখণ্ড উর্ব্বর হইয়া গেছে।

এসিয়ায় এই জাগ্রত অভিযান ভারতবাসীকে আনন্দ দিতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, অসুস্থের পক্ষে আনন্দ সম্ভব নহে। সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইতে বেশী বিলম্ব হয় না।

যাহারা বিবেচনা করে, জাপান আমাদিগকে হাতে করিয়া টানিয়া উন্নতি পথে লইয়া যাইবে, এমন কি, স্বাধীনতা দিবে, তাহারা ভ্রান্ত। অক্ষম জাতির প্রার্থিতব্য জগতে কিছু নাই—উহা ঘৃণার পাত্র। যে পর্য্যন্ত আমরা স্বচেষ্টায় জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের কোন দাবীতে, কোন আবেদন ইংরাজ কেন, জাপানও কর্ণপাত করিবে না। মাংসখণ্ডপ্রার্থী, কঙ্কাল-শরীর কুক্কুর চিরকালই ধিক্কৃত হয়।

বর্ত্তমান উন্নতিশীল সময়, এসিয়ার অভ্যুত্থানের সময় আমাদের অত্যন্ত সঙ্কটের অবস্থা, এজন্য নেতৃগণের নিতান্ত দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন।

কারণ যদি চীন জাগ্রত হয়, তবে প্রবুদ্ধ চৈনিক শক্তির বিপুল ধাক্কা ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইবে। সে মুহূর্ত্তে কি আমাদিগকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া আবার চীনের পদানত হইতে হইবে?

জাপানের শক্তি এবার যেরূপ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে এসিয়াতে উহার বিস্তৃতি অনিবার্য্য দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর কোন শক্তি ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না।

সম্প্রতি ইংরাজের এক লক্ষ সৈন্যের পরিবর্ত্তে যদি জাপানের এক কোটি সৈন্য ভারতের মানচিত্রের উপর তাঁবু ফেলে, তবে আমরা কি কখনও মাথা তুলিতে পারিব? কিম্বা চীনের পাঁচ শত কোটি সৈন্য যদি ইংরাজকে দূর করিয়া স্থায়ী রাজধানী নির্ম্মাণ করে, তবে আমাদের উপায় হইবে কি?

ইংরাজের স্বদেশ দূরে বলিয়া যে সমস্ত অসুবিধা রহিয়াছে, চীন ও জাপানের তাহা নাই। এজন্য তাহাদের হাত হইতে আমাদের উদ্ধার নাই।

দশ বার বৎসরের মধ্যে কিম্বা বিশ বৎসরের মধ্যে হইলেও এসিয়াতে একটা বিপুল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের সময় মেষ-প্রকৃতি কোন জাতির কোন কথা কেহ শুনিবে না। চীন, জাপান, ইংরেজ, এমন কি পারস্য, আফগানিস্থান উপরোক্ত বিপ্লবের পরে সন্ধির নেতৃত্ব করিবে। তখন ভারতবাসী আবেদনের থালা লইয়া কাহার মুখের দিকে চাহিবে? এবং এইরূপ অপদার্থ, মেরুদণ্ডবিহীন লোকপুঞ্জের শক্তিবিহীন, মূল্যবিহীন কথা শুনিবে কে? সিংহ ব্যাঘ্রের হৃতপশুর মাংস বিভাগ কালে কোন্ সাহসে মেষ আসিয়া বলিবে, আমার এক টুকরা মাংস চাহি?

দেশের যথার্থ নেতৃগণকে ভবিষ্যৎ দেখিয়া চলিতে হইবে। চিরকাল ইংরাজ এই দেশে থাকিবে, কিম্বা থাকিতে পারিবে, এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তাব যেন কর্ত্তব্যকে কণ্টকিত করিয়া না তোলে! দু'এক বৎসরেও এসিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক জগতে বিপুল বিপর্য্যয় একান্ত সম্ভব, একথা যেন কেহ না ভুলি।

একথা না ভুলিলে যাঁহারা ভগীরথের ন্যায় দেশকৃত্যের স্রোত জাতির শৈশবে আনয়ন করিয়াছেন, ঐরাবতের ন্যায় তাঁহারা যেন ইহার প্রতিকূলে না দাঁড়ান। চেষ্টা বিফল হইবে, কারণ জাতিগত আন্দোলনের মূলে ভগবানের অঙ্গুলি সংকেত রহিয়াছে, একথা যেন আমরা বিশ্বাস করি।

ভবিষ্যতে যথার্থ যাঁহারা নেতা হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে জাতির সমগ্র ভাব শরীরী হইয়া উঠিবে। দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে তাহারা কেন্দ্রীভূত করিবে। হিন্দু, মুসলমান,—সে কাহারও হইবে না, অথচ সকলেরই হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া যে ভবিষ্যত গঠন করিতে জানিবে না—তাহার নেতৃত্ব অসম্ভব।

যে Demosকে—সাধারণকে এতদিন অবজ্ঞা করা গিয়াছে, সে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজের নেতাকে চিনিয়া লইবে। কেবল কংগ্রেসের সভাপতিত্বের সার্টিফিকেট যথেষ্ট হইবে না। কারণ কর্ত্তব্য ভবিষ্যতে রহিয়াছে; ভবিষ্যতের বিচার ভবিষ্যতের কার্য্য দ্বারায় স্থির হইবে।

পৃথিবীর কোন ইতিহাসে এ সমস্ত কথা নূতন নহে, একথা যেন কেহ না ভুলেন। এজন্য যদি গুরুতর কর্ত্তব্য এবং আদেশ স্কন্ধে লইতে অস্বীকার করেন, দেশ তাহাকে অস্বীকার করিবে। ফরাসী কবি Rouget De L'isleএর বিখ্যাত marseillaise কবিতার দুইটী লাইন মনে আসিতেছে, তাহা দেশের নেতৃগণের জন্য উদ্ধৃত করিতেছি:—

Your children wives, and Grandsires hoary
Behold their tears and hear their cries!

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

# ভারতে ব্রিটিশ শান্তি।

( PAX BRITANNICA. )

শ্রীরামের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে হারিয়া রাবণ বড় খেদেই বলিয়াছিল, "মরিয়াও না মরে রাম এ কেমন বৈরী।" যুদ্ধে যাহাকে বিনাশ করিলাম, সে যদি আবার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে তাহার সঙ্গে আটিয়া উঠা দায়। আমাদেরও সেই দশা উপস্থিত। ইংরাজ মোহরূপ শত্রুকে যতবারই কেন বিনাশ করি না, সে নূতন রূপ ধরিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। ইংরাজ এ দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছে, এ গর্ব্বে ইংরাজ যত না গর্ব্বিত, আহাম্মক আমরা তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেশী মুগ্ধ। ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিতে ভারতের ধনপ্রাণ যে পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ বেশী আপদযুক্ত হইয়াছে, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্যরূপে পরিণত হইলেও, অন্ধ আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। এ দেশে মুসলমানগণ আমাদের উপর অত্যাচার করিত, ইংরাজ আসিয়া আমাদিগকে সে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে, এই মিথ্যা কথা ইংরাজ আমাদিগকে শিখাইয়াছে এবং আমরাও অবলীলাক্রমে তাহা গলাধঃকরণ করিতেছি। একবার ভাবিয়া দেখিতেছি না যে, কথাটার মধ্যে বিন্দুমাত্রও সত্য নাই। আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা তো ইংরাজ-প্রেমে একেবারেই মুগ্ধ। যে ইংরাজের ভারতবর্ষে রাজত্ব করিবার প্রধান দাবী তাহার স্বকপোলকল্পিত মুসলমানের জাতীয় একটা মিথ্যা কলঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ইংরাজই নাকি মুসলমানের বন্ধু! আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ এ কথাটা একবারও অনুধাবন করিয়া দেখিতেছেন না। ইহা অদৃষ্টের এক মহাবিদ্রূপ। হিন্দুদিগকে মুসলমানের অত্যাচার হইতে ইংরাজ রক্ষা করিয়াছে, ইহাই ইংরাজের উপর এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার একমাত্র মিথ্যা কল্পিত অবলম্বন। অথচ মুসলমানগণ অতিকৃতজ্ঞতা ভরে সেই ইংরাজের চরণেই অবনত।

যাহা হউক, এই যে কথাটা যে, ইংরেজ আমাদের দেশে অরাজকতার স্থানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ইহার মধ্যে কি বিন্দুমাত্রও সত্য আছে? যে সময়ে এ দেশে অরাজকতা ছিল, সে সময়ে ও সে অবস্থায় সর্ব্বদেশেই অরাজকতা থাকে ও ছিল। যে অবস্থায় রাজায় প্রজায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই, সে অবস্থায় সর্ব্বত্রই অরাজকতা বিদ্যমান ছিল, যে সময়ে ইংরাজ ক্ষিপ্ত-কুকুরের ন্যায় তাহার রাজার মস্তক চূর্ণ করিয়াছিল, সে সময়ে যদি ভারতের সম্রাট্ তাহার প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াও থাকেন, তবে সেটা তিনি মুসলমান বলিয়া হিন্দুর উপর করেন নাই, উহা কালধর্ম্মে এবং অবস্থার জন্য হইয়াছিল। সে অবস্থায় হিন্দুরাজাও হিন্দুপ্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছে, খ্রীষ্টান-রাজাও খ্রীষ্টান-প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং মুসলমান-রাজাও মুসলমান-প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছে। এটা কেবল ভারতবর্ষের বিশেষ কলঙ্ক নহে এবং হিন্দু মুসলমানের একটা জাতিগত বিসম্বাদের দৃষ্টান্তস্থল নহে। ইংরাজ যখন প্রবঞ্চনার পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন ভারতে

একটা মহা রাজপরিবর্ত্তনের সময়, সে সময়ে অরাজকতা কিয়ৎপরিমাণে অনিবার্য্য। জগতের সকল জাতির ইতিহাসই ইহার প্রমাণ-প্রদর্শন করিবে, তবে সবদেশেই কিন্তু ইংরাজের সাহায্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সব দেশেই অরাজকতা আসে, অরাজকতা চলিয়া যায় এবং আপনাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া গিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, বিদেশীর অধীনতা গ্রহণ করিতে হয় না। ভারতের ভাগ্যেই কেবল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা কেন? আর ইংরাজের যে সুশাসন, সে তো একটা মস্ত মিথ্যা কথা। কেন না, দেড় শত বৎসরের শাসনের পরেও যদি ইংরাজের এ দেশে থাকিবার এই মাত্রই অজুহাত হয় যে, সে চলিয়া গেলে আমরা আপনারা পরস্পর মারামারি করিয়া উৎসন্ন যাইব, তবে ইংরাজ এতদিন এ দেশের কি উপকার করিয়াছে? এর পরও যদি আমাদিগকে মারামারি কাটাকাটি করিয়াই শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে হয়, তবে সে কাজটী আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। আর দেরী করিলে ইংরাজের অনুগ্রহে আমাদের সে শক্তিও লোপ পাইবে। কিন্তু ব্যাপারটী ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। এই দেড় শত বৎসরে কত 'অসভ্য' জাতি সভ্য-জনোচিত স্বায়ত্বশাসন লাভ করতঃ গর্ব্বভরে জগতে মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান হইল, আর বর্ব্বর ইংরাজের বর্ব্বর-শাসনে ভারতবাসী আজ বন্য পশু হইতে আত্মরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামান্য অস্ত্র হইতে বঞ্চিত। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা জগতের ইতিহাসে আর আছে কি?

একটী গল্প মনে পড়িল। এক জন স্থূলবুদ্ধি কৃষকযুবক তাহার কাকার সঙ্গে দুপ্রহর রৌদ্রের সময় মাঠে ঘাস কাটিতে গিয়াছিল। কাস্তেখানা রৌদ্রে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে কাকা বলিল যে, উহার জ্বর হইয়াছে এবং জলে চুবাইলে জ্বর সারিয়া যাইবে। যুবক দেখিল যে কথাটা ঠিক। জলে চুবান মাত্রই জ্বর ছাড়িয়া গেল। সে জ্বর ছাড়াইবার এক উৎকৃষ্ট পন্থার সন্ধান পাইল। এমন সময়, তাহার নব-শিক্ষিত বিদ্যার পরিচয় দিবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল। সে বাড়ী যাইয়া দেখে যে,তাহার শিশু-কন্যার জ্বর হইয়াছে, অমনি সে স্ত্রীকে বলিল, "আমার কাছে দাও, আমি এক মুহূর্ত্তে উহার জ্বর ছাড়াইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে কন্যাকে ঘাটে লইয়া গিয়া জলে চুবাইয়া ধরিল,সুতরাং তাহার আশানুরূপ ফল ফলিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্বর ছাড়িয়া শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গেল। সে তখন স্বীয় বিদ্যার সফলতায় এত অধীর হইয়া গিয়াছে যে, তাহার আর কিছু ভাবিবার অবসর হইল না। দ্রুতপদে ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, "এই নাও তোমার মেয়ে, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।" স্ত্রীতো কন্যাকে হাতে লইয়া দেখে যে, তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, "এ করেছ কি, এ যে মরিয়া গিয়াছে।" তখন কৃষক-নন্দন স্বীয় বিদ্যার সফলতায় গর্ব্বভরে বলিয়া উঠিল, মরেছে মরেছে, তাতে কি? জ্বরতো ছেড়েছে!" এই কৃষক-নন্দনের জ্বর ছাড়ার যুক্তি আর ভারতে ব্রিটিস-নন্দন কর্ত্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠার যুক্তি, একই শ্রেণীর অন্তর্গত। দেশ যে ধনে প্রাণে সারা হইল, তাতে কি? জ্বরতো ছেড়েছে, দেশে সুশাসনতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? দেশের লোক না খেতে পেয়ে লক্ষ লক্ষ মরিতেছে, অথচ দেশ নাকি সুশা-

সিত এবং এই শাসনেই নাকি আমাদের মোক্ষপথ খুলিয়া যাইবে! আমাদের কর্ত্তারা যে ভাবে কথা বলেন, তাহাতে মনে হয় যেন গোটা কয়েক তথা-কথিত শিক্ষিত লোকই সমস্ত ভারতবর্ষ। তাহা না হইলে ইংরাজ-রাজত্বে এই যে দু চারজন শিক্ষিত লোক অন্তঃসারবিহীন উচ্চ গলায় রাজনৈতিক অধিকারের বিষয় বলিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, ইহাকেই একটা মস্তজাতীয় সম্পত্তি মনে করিবেন কেন? এবং ইহাকেই ইংরাজ-রাজত্বের একটা বিশেষ দান বলিয়া গ্রহণ করতঃ বিদেশীর পদতলে মস্তক পাতিয়া দিবেন কেন? এখানে প্রথম কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই অধিকার যাহারা ভোগ করিতেছে, তাহারা এই মহা ভারত-সমুদ্রে এক গণ্ডূষ জল মাত্র। এই গণ্ডূষ জলের মিষ্টতায় সমগ্র সমুদ্রজলের লবণাক্ততার দোষ চলিয়া যায় না। যে কুশাসনে দেশের কোটী কোটী লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন্মৃত হইয়া পড়িতেছে এবং লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর করাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে, সেই কুশাসনকে মুষ্টি-মেয় লোকের উপভোগ্য বাক্যের স্বাধীনতা-রূপ মোয়ার লোভে সমর্থন করা নিতান্তই অর্ব্বাচীনতার কার্য্য। দ্বিতীয় কথা এই, আমরা কি বাস্তবিকই এই স্বাধীনতা পাইয়াছি? এই যে স্বাধীনতার ভান, ইহা আমাদের জন্য নহে, ইংরাজের উপকারের জন্য। প্রজার মনের ভাব না জানিয়া বিদেশী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রাজ্য চালান অসম্ভব, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যেখানে মুষ্টিমেয় বিদেশী ৩০ কোটী লোকের উপর আধিপত্য করিতেছে। ইংরাজের জানা দরকার, প্রজামণ্ডলী কি ভাবিতেছে, তাহাদের আকাজ্ঞা কি। নতুবা সে এক দিনও রাজ্য চালাইতে পারে না। আজ যদি দেশের নেতারা এক স্থানে একত্রিত হইয়া দেশের জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তাহা গোপনে নির্দ্ধারণ করিয়া চলিয়া যান, বক্তৃতা করিয়া নিজদিগকে ক্লান্ত না করেন বা নিজেদের নির্দ্ধারণ জগৎকে না জানান, তবে আর কংগ্রেসের সভাপতিকে হাটু গাড়িয়া বসিয়া কর্জ্জনকে অনুরোধ করিতে হইবে না যে, তুমি কংগ্রেসের মন্তব্যগুলি গ্রহণ কর, মিণ্টো স্বয়ং সভাপতির সহিত দেখা করিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিবেন এবং আগামী বৎসর 'গবর্ণমেণ্ট হাউসে' কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইবেন। আর তা যদি না হয়, তবে বাক্যের স্বাধীনতা তো দূরের কথা, চিন্তার স্বাধীনতাও কাড়িয়া লইবে, পর বৎসরের গুপ্ত মন্ত্রণা সভা পুলিষ নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া দিবে। ইহার প্রমাণ, আমরা স্বদেশী আন্দোলনে যথেষ্ট পাইয়াছি, আমাদের বাক্যের স্বাধীনতার মূল্য কত, তাহা ফুলার সাহেব বিশেষ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বাক্যের স্বাধীনতা যতদিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ততদিন কিছু গোল হয় নাই, কিন্তু যেই সর্ব্বসাধারণকে এই স্বাধীনতার অংশ ভাগী করিবার জন্য স্বদেশী আন্দোলন আয়োজন করিলেন, অমনি পুলিষ রেগুলেসন্ লাঠির জোরে সভা ভাঙ্গিয়া দিল। যতক্ষণ বাক্যের স্বাধীনতায় ইংরাজের সুবিধা, ততক্ষণ তোমার স্বাধীনতা, কিন্তু যখনই তুমি ইহাকে তোমার প্রকৃত স্বাধীনতার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে, অমনি উহা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কংগ্রেস যতদিন কংগ্রেসে আবদ্ধ, ততদিনই বাক্যের স্বাধীনতা, কিন্তু আজ যদি কংগ্রেস গ্রামে প্রবেশ করিয়া অশিক্ষিত চাষাকে তাহার রাজনৈতিক অধিকারের কথা শিক্ষা

দিতে আরম্ভ করে, যে কথা নৌরাজী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন এবং যাহা "Extremist" মহোদয়েরা এই পাঁচ বৎসরাধিক কাল বলিতেছেন, তবে ইংরাজ রাজত্বের এই মহিমা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, তাহার চিহ্নও থাকিবে না। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আবার যে আমরা এই হৃত ধন ফিরিয়া পাইয়াছি, তাহা মর্লীর দয়ায় নয়, ইংরাজ রাজত্বের মহিমায় নয়, কিন্তু স্বশক্তির প্রয়োগে। মর্লী ইংরাজ বাচ্চা, তিনি জানেন, স্বাধীনতার সংগ্রাম এক বার আরম্ভ হইলে তাহার শেষ কোথায়। তাঁহার দেশের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। তাই, বরিশালে যখন ৫০০০ লোক পণ করিয়াছিল যে, দেশের জন্য মরিব অথচ মারিব না, তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে,এই পণ 'মারিয়া মরিব' এই সঙ্কল্পে পরিণত হইতে অধিকক্ষণ লাগে না, তাই বরিশালের রক্তদানের পরে কর্ত্তারা আপনাদের মূর্খতার ফল বিনাশে তিলার্দ্ধও দেরী করিলেন না। প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নহে, প্রজার ভয়ে। এই প্রজার ভয়ের উপর যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা, আর যা কিছু, তাহা স্বাধীনতার ভান মাত্র।

ইংরাজের কি গুণে মুগ্ধ হইয়া যে আমাদের কর্ত্তারা আসল কথাটা চাপা দিয়া ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করিতেছেন, তাহা আমরা একেবারেই বুঝিতে অসমর্থ। ইংরাজের Pax Britannica তো ভ্যামপায়ার বাদুরের পাখার বাতাস। এখনও ঘুম ভাঙ্গিতেছে না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম "মরিয়াও না মরে রাম এ কেমন বৈরী।" জাগিয়া উঠে,একটু চক্ষু মেলি আর বলি "চাই স্বরাজ।" কিন্তু কি যে দৈব বিড়ম্বনা, আবার মোহ আসে, আবার তন্দ্রা আসে, তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলি, "under British protectorate" নিদ্রার ঘোর না হইলে কি, স্বপ্নাবস্থা না হইলে কি মানুষ এরূপ অসম্বদ্ধ কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিন দিতে পারে? যেন একটা আস্ত কাঁঠালের আমসত্ব, Swaraj under British protectorate !!!

বৃথা সে কল্পনা, তাহাতে হবে না,
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।

এবারকার কন্‌গ্রেসে বয়কট মন্তব্য লইয়া কর্ত্তারা কি না ঢলাঢলি করিলেন? অন্য প্রদেশের না হয় একটা ওজুহাত আছে, বাঙ্গালীর ওজুহাত কোথায়? যাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, তাহারা বয়কটকে বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দাঁড় করাইতে সম্মত হইলেন কিরূপে? ১৭ই অক্টোবরের ঘোষণা কি বিদ্রোহ ঘোষণা নহে? নূতন পতাকার উত্থান যদি বিদ্রোহের চিহ্ন না হয়, তবে সে চিহ্ন কোথায় মিলিবে? তবে, আমরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করি নাই, এবং বুয়ারদের মত একটা ultimatum দিই নাই। তার কারণ এই যে, দেশ একেবারে অস্ত্রশূন্য, নতুবা ফিরিঙ্গী এত দিন লোহিত সাগর পার হইবার পথ পাইত না। ইংলণ্ডাধীশের অনুমোদিত কর্জ্জন সাহেবের চিরপোষিত এবং পার্লামেণ্টের উচ্চ শিখর হইতে "settled fact" বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত এই বঙ্গভঙ্গ যে আমরা স্বীকার করিতেছি না, ইহা অপেক্ষা বিদ্রোহী প্রজারা রাজার আজ্ঞা আর বেশী কি অগ্রাহ্য করিবে? তবুও আমাদের কর্ত্তারা মনে করিতেছেন যে, একটা মিষ্ট কথার জোরে ইংরাজকে ভুলাইয়া কার্য্য হাসিল

করিবেন। ইহাতে আমাদের বুদ্ধি আর ইংরাজের মূর্খতা, এ দুইএর উপরই আমাদের একটা অতিরিক্ত বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়। আমাদিগকে এখন ইংরাজের বন্ধুত্বের মায়া কাটাইয়া উঠিতে হইবে। আমাদের একটা ধ্রুব বিশ্বাসে পরিণত হওয়া কর্ত্তব্য যে, ইংরাজ স্বইচ্ছায় কখনও আমাদের যাহা মঙ্গল, তাহা আমাদিগকে দিবে না। দু একজন ইংরাজের হৃদয়ে সদাকাঙ্ক্ষা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু দোকানদারের সমস্ত জাতিটা স্বীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের মঙ্গলে মনোযোগী হইবে, ইহা নিতান্তই অসম্ভব কথা। আইরিশদের সম্বন্ধে গ্লাডষ্টোনেরই সদাকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না, আমরা তো "কোথাকার কে।"

আমাদের মুক্তি আমাদিগকেই সাধন করিতে হইবে, নতুবা নির্ব্বাণ সহস্র গুণে শ্রেয়।

বাঙ্গালী এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, কি যে জীবন মরণ কার্য্যে সে হাত দিয়াছে। তাই এখনও খেলা খেলির ভাবই চলিতেছে, দুদিন কার্য্য করিয়া দুদিন বিশ্রাম চলিতেছে। এক কথাতেই উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, আবার এক কথাতেই একেবারে বসিয়া পড়িতেছে, তাই ভগবানের করুণায় পুলীসের গুঁতায় আবার উঠিতেছে, মূর্খ গবর্ণমেণ্ট ভগবানের হস্তের যন্ত্ররূপে বাঙ্গালীকে কল্যাণ পথে লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী তুমি ভুলিও না,—

অবসর নাহি আর হাসিবার কান্দিবার,
দুখিনী জনমভূমি মা আমার, মা আমার।

যাহার মা রাজরাণী হইয়াও দৈব দুর্ব্বিপাকে, প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনায় দাসী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার কি হাসিবার কান্দিবার সময় আছে? এ ব্রত উদ্যাপন না করিয়া মরিবারও অধিকার নাই। মনে কর, কঠোর কার্য্য সম্পাদন করিয়া গরুড় তাহার মায়ের দাসীত্ব মোচন করিয়াছিল, তোমাদিগকেও, "ঘোর সিন্ধু-নীরে, ভূধর শিখরে, গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, বায়ু, উল্কাপাত, বজ্র শিখা ধ'রে" মায়ের উদ্ধারের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, সামান্য বয়কটে এলাইয়া পড়িলে চলিবে কেন? দশ জনের দুর্ব্বলতা দেখিয়া ঢিল দিলে চলিবে না, বরং দশ জনের দুর্ব্বলতা যাহাতে কাটাইয়া উঠিতে পার, সেই জন্য তোমাকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, কেন না, ব্রত উদ্যাপন ছাড়া গত্যন্তর নাই— নান্য পন্থা বিদ্যতেয়নায়।

লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতার কলঙ্কভার তাহা মিথ্যাই হউক আর সত্যই হউক, বহন করিয়া এই সাতশত বছরে বাঙ্গালী একেবারে মরমে মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণসেন এক ব্যক্তি মাত্র। তাহার কলঙ্ক ভার লাঘব করিবার জন্য বীর-কেশরী প্রতাপ জন্মিয়াছেন, সীতারাম ও কেদার রায় জন্মিয়াছেন, কিন্তু এবার যদি এই জাতীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষিত না হয়, তবে আর বাঙ্গালীর নাম ধরা মাঝে থাকিবে না। বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জল যদি বঙ্গদেশকে ধুইয়া ফেলে, তবুও সে কলঙ্ক-কালিমা দূর হইবে না। এখনই পশ্চিম বঙ্গের কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা বঙ্গমাতাকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই আবার বলি ভাই, সাবধান—

অবসর নাহি আর হাসিবার কান্দিবার,
দুখিনী জনমভূমি মা আমার, মা আমার!

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী।

# সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। (৩)

তার পর কাগজের কথা,—মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই ভারতবর্ষে কাগজের প্রথম প্রচার হয়। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে এদেশে যে কাগজ প্রচলিত ছিল, ইহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ সময় হইতেই কাগজে গ্রন্থাদি লেখা বহুলরূপে আরব্ধ হয়। কাগজে লেখা যত প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম অংশে গুর্জ্জরদেশে লিখিত হয়। উত্তর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কালী দিয়া লিখিবার প্রণালী অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং তাল পত্র অপেক্ষা কাগজ কালী দিয়া লিখিবার পক্ষে অনুকূল, এইজন্য কাগজ প্রচলনের পর তথা হইতে তালপত্র এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। গ্রন্থাদি যত কিছু. সে সমস্তই কাগজে লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

কিন্তু দক্ষিণ ভারতে অদ্যাপিও কি গ্রন্থাদি লিখন, বা, কি পত্রাদি লিখন—সর্ব্ব বিষয়েই তালপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মুখ্য কারণ এই যে, ঐ দেশে কলমের পরিবর্ত্তে, তীক্ষাগ্র লৌহশলাকা ব্যবহৃত হয়। ঐ শলাকাদ্বারা বেধ করিয়া—খুটাইয়া খুটাইয়া অক্ষরপাত করিতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, তালপত্রের পুথির বা ভূর্জ্জত্বকের পুথির মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া সূত্রের দ্বারা তাহা গাঁথিয়া রাখা হয় বলিয়াই পুস্তকের নাম "গ্রন্থ"।

কোনও প্রকার পশুর চর্ম্ম বা ঐরূপ অন্য কোনও পদার্থ অপবিত্র বোধে, প্রাচীন ভারতে, লিখিবার আধার উপকরণ রূপে, কখনও ব্যবহৃত হইত না। প্রাচীন অনুশাসন প্রভৃতি, চিরস্থায়ী করিবার মানসে, প্রায়শই তাম্রফলকে লিখিত হইত। ঐ সমুদয় তাম্রফলক, তৎ তৎ সময়ে প্রচলিত, হয় তালপত্রের,—নাহয় ভূর্জ্জপত্রের আকারে নির্ম্মিত হইত।

একটী অতি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপে(Mound) এমন কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—যাহার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতেও ভারতে কালীর বহুল প্রচার ছিল। ইহা ছাড়া নিয়ারকস (Nearchos)এবং কুইণ্টাস্ কারটিয়াস্ (Quintus Curtius)র নির্দ্দেশানুসারে, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেও যে ভারতে কালীর প্রচলন ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে। এতক্ষণে বুঝিলাম যে, বহু পূর্ব্ব হইতে কালী কলম এদেশে চলিয়া আসিতেছে। তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র বা কাগজ, ইহাদের উপরে খুব শক্ত কলম—অনেক সময়েই বাঁশের কলম ও কালী দিয়া, বহুকাল যাবত্ এদেশে পুথি প্রভৃতি লেখা হইতেছে। দক্ষিণ ভারতে আবার তালপত্রের উপর প্রথমতঃ লৌহশলাকা সাহায্যে অক্ষরপাত করিয়া পরে, তদুপরি, কালী লেপিয়া দেওয়া হয়, তার পর উহা মুছিয়া ফেলিলে অপরাপর অংশ সাদা হওয়ায়, লিখিত অংশ বেশ সুস্পষ্ট হয়।

ভূর্জ্জপত্রে বা তালপত্রে অথবা কদাচিত কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষর বিশিষ্ট লেখকের দ্বারা পুথি লেখাইয়া, উহা সযত্নে রক্ষা করা ভারতের বিদ্বন্মণ্ডলীর প্রধান ব্রত ছিল। অনেক

দেবমন্দির, সন্ন্যাসিগণের আশ্রম, রাজার প্রাসাদ বা চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে হস্তলিখিত গ্রন্থ—বিগ্রহের ন্যায়, যত্নের সহিত রক্ষা করা হইত। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহেই কিছু না কিছু পুথি থাকিত। কেন না, বর্ত্তমান সময় হইতে ২।৩ পুরুষ পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা চর্চ্চাই মুখ্য কর্ম্ম ছিল। এখনও ভারতের অনেক স্থলে রাজন্যবৃন্দের রাজধানীতে আমরা, নানাপ্রকার, অমূল্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ পুস্তকালয় দেখিতে পাই। এই সেদিন পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পুস্তকালয় হইতে বহুবিধ মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থের এক তালিকা বাহির হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ত্রিবস্কুর, জয়পুর, কাশ্মীর, আলোয়াড়, বিকানীর, নেপাল, কুচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশের নরপতিগণ এখনও অতি যত্নে, প্রাচীন, হস্তলিখিত পুথির পুস্তকালয় রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের ঐ ঐ পুস্তকাগারে অনেক লুপ্ত রত্ন লুক্কায়িত আছে। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে ধারানগরীর অধিপতি, পরম বিদ্যোৎসাহী, সুপ্রসিদ্ধ, ভোজরাজা, তদীয় রাজধানীতে এক অতি বিপুল পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। কেননা দেখিতে পাই,—খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা বাণভট্ট, তদীয় পুস্তকালয়ে, দুষ্পাঠ্য হস্তলিখিত পুথি পড়িবার জন্য এক জন পাঠক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক,আমরা এখন—সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সংস্কৃত ভাষাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—বৈদিকভাষা এবং লৌকিক ভাষা। বৈদিক ভাষার মধ্যে আবার কতিপয় স্তর বা থাক্ (stage) দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অতিপ্রাচীন সময়ের বৈদিক ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া যদি ধীরে ধীরে ক্রমে পরবর্ত্তী কালের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, ক্রমে কালপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক-ভাষারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যতই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী কালের বৈদিক গ্রন্থাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, ততই বোধ হয়—যেন, বৈদিকভাষা, তাহার বৈদিকত্ব ছাড়িয়া ক্রমে আসিয়া লৌকিকে পরিণত হইয়াছে।

অনেকে আবার বলেন—বেদের প্রাচীনতম অংশের ভাষা ও বৈদিক ঋষিদিগের সমসাময়িক সাধারণ লোকের কথোপকথনের ভাষা—এ দুই ঠিক এক ছিল না। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, বেদে এমন অনেক শব্দ পরস্পর পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, যে সমুদয়ের কোনটী ভাষার প্রথম অবস্থার, কোনটী বা মধ্যবস্থার, আবার কোনটী বা ভাষার শেষাবস্থার শব্দ। তবে বৈদিক ঋষিরা নিজে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা অনেকটা বেদেরই মতন ছিল। কেবল কতগুলি, তৎকালে অপ্রচলিত, তদপেক্ষাও প্রাচীনতর কালের শব্দ এবং মাত্র পদ্যে ব্যবহৃত কতগুলি পদই বৈদিক ভাষার সহিত মিশিয়া উহাকে, ঋষিদিগের কথ্য ভাষা হইতে পৃথক করিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে—সেই সুদূর বৈদিক সময়েও বেদের ভাষা জাতি বিশেষের ভাষা ছিল। সর্ব্ব সাধারণের ভাষা ছিল না। বৈদিক ভাষাকেই যদি সাধারণের ভাষা [illegible] বলিয়া শ্রেণী-বিশেষের ভাষা বলিতে হয়, তবে লৌকিক সংস্কৃতকে কি বলিব?

লৌকিক সংস্কৃত গ্রন্থের যে ভাষা, তাহা কখনই সর্ব্বসাধারণের ভাষা ছিল না। কেবলমাত্র পণ্ডিতেরা—ব্রাহ্মণেরা উহার ব্যবহার করিতেন।

বৈদিক-ভাষা ও লৌকিক-ভাষার ব্যাকরণে খুব বেশী তফাৎ নাই। বেদের 'লেট' লকার লৌকিকে চলে না। আর 'সে সেন' প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় একেবারেই লোপ পাইয়াছে; লৌকিকে কেবলমাত্র 'তুমের' প্রয়োগ হয়। নামপ্রকরণ ধরিতে গেলে, কতকগুলি বৈকল্পিক পদের অভাব লৌকিকের বিশেষত্ব হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া লৌকিক সংস্কৃত আর তত বেশী বদলায় নাই। পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণে ভাষাকে সংযত করিয়া অনেকটা বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

বৈদিক ব্যাকরণ এবং লৌকিক-ব্যাকরণ অনেকটা এক রকম হইলেও বৈদিক-শব্দমালা ও লৌকিক-শব্দমালায় অনেকটা তফাৎ। অনেকগুলি বৈদিক শব্দ লৌকিকে একেবারে ব্যবহৃতই হয় না। কতগুলি অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। আবার—আর কতগুলি সম্পূর্ণ নূতন শব্দ, প্রাচীন শব্দের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সমাজের নিম্নস্তর হইতেও যে কতগুলি শব্দ লৌকিক সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছিল—তাহা নিশ্চিত। তবে লৌকিক-সংস্কৃতে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহারা বস্তুত খুব প্রাচীন, কিন্তু বৈদিক-সংস্কৃতে উহাদের প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়া উহাদিগকে আধুনিক বলিয়া ভ্রম হয়।

বৈদিক ভাষা হইতে, কিরূপে ক্রমে ক্রমে লৌকিক-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

পাণিনি কতগুলি নিয়মসহকারে ঐ লৌকিক ভাষাকে যে ভাবে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন—আজ প্রায় অগত্যা ২৩ শত বৎসর যাবত লৌকিক-ভাষা প্রায় সেই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। তত বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই ভাষাই ক্রমে 'সংস্কৃত' নামে আখ্যাত হইতে লাগিল। যদিও এই সংস্কৃত শব্দটী কোনও প্রাচীন ব্যাকরণে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু অতি প্রাচীনতম রামায়ণে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

দেশের সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহিত, তাহার নাম 'প্রাকৃত,' আর অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সমাজে যে ভাষার প্রচলন ছিল, তাহার নাম "সংস্কৃত"। সংস্কৃত কথাটীর অর্থ হইল 'যাহার সংস্কার করা হইয়াছে, যাহা মলহীন করা হইয়াছে।

যখন পাণিনি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ভাষা ক্রমে সাধারণে অপ্রচলিত হইয়া পড়িল—তখন সাধারণ লোকে, আর ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে না। পাণিনির 'গণ্ডি' অতিক্রম করিয়া, সাধারণে যে ভাষায় কথোপকথন করিত, ঐ নূতন ভাষাই প্রাকৃত (vulgar) নামে পরিচিত এবং সাধারণ লোকের ভাষাকে 'প্রাকৃত' বলিত বলিয়াই, তদানীং সাধারণে অপ্রচলিত (কেবলমাত্র পণ্ডিতবোধ্য) প্রাচীন গ্রন্থাদির ভাষাকে 'সংস্কৃত' (refined) বলিত। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিরচিত প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ কাব্যাদর্শেও এই ভাবে 'সংস্কৃত' ও 'প্রাকৃত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর বৈয়াকরণ 'যাস্ক' হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তনকালের বৈয়াকরণেরা প্রায় সকলেই এই 'সংস্কৃত' ভাষাকেই 'ভাষা' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, তাঁহাদের সময়ে 'সংস্কৃত' কথোপকথনের ভাষা ছিল। পতঞ্জলি এই ভাষাকে লৌকিক

আখ্যা দিয়াছেন। লৌকিক-শব্দের অর্থ যাহা লোকে—অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণে ব্যবহৃত হয়।

পাণিনি নিজেই, তদীয় ব্যাকরণে এমন সূত্র গ্রন্থন করিয়া গিয়াছেন—যে সকল সূত্র, কথোপকথনের ভাষা ভিন্ন অন্যত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। 'দূরাহ্বান' "প্রত্যভিবাদ" প্রভৃতি স্থলে স্বরাপ্লুত হয়, একথা পাণিনিই বলিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে যে, কথোপকথন ব্যতিরেকে দূরাহ্বান বা প্রত্যভিবাদনের সম্ভাবনা কোথায়? আবার সংস্কৃত যে কেবল পুস্তকের বা পণ্ডিত-সমাজেরই ভাষা ছিল, তাহার আর একটী প্রমাণ এই—'যাস্ক এবং পাণিনি অনেকস্থলে, পূর্ব্ব ও উত্তর প্রভৃতি দিগ্‌ভেদে সংস্কৃতেরও কিছু কিছু ভেদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাত্যায়ন দেখাইয়াছেন যে, দেশভেদে ভাষারও বিভিন্নতা হয়। আবার পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন যে, কতগুলি বিশেষ বিশেষ দেশে কতগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে সংস্কৃত যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের কথোপকথনের ভাষা ছিল—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এ ভাষায় কাঁহারা কথোপকথন করিতেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে—ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই এই 'সংস্কৃতে' কথোপকথন করিতেন। পতঞ্জলি ইঁহাদিগকে "শিষ্ট" অর্থাৎ সাধুভাষা-প্রযোক্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজের বাহিরেও সংস্কৃতের ব্যবহার হইত। পতঞ্জলির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন (Headgroom) অন্য একজন বৈয়াকরণের সহিত 'সূত' শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বিচার করিতেছে।

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে ভাষার যে বিভাগ ব্যবস্থা দেখা যায়, তদনুসারে বেশ বুঝা যায় যে, শুধু ব্রাহ্মণ নহে—ব্রাহ্মণেতর জাতিতেও সংস্কৃতে কথোপকথন প্রচলিত ছিল। নাটকাদিতে আবার ইহাও দেখি যে, যাহারা সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত না—তাহারা কিন্তু সংস্কৃতে কথিত কথা বেশ বুঝিতে পারিত। আবার অভিনয় কালে সাধারণ সামাজিকগণও অবশ্য সংস্কৃত বুঝিতে পারিতেন। পুরাণাদি যখন আবৃত্ত হইত, তখনও সাধারণ শ্রোতৃবর্গ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং পুরাকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত যে কথোপকথনের ভাষা ছিল—ইহাতে সন্দেহ নাই। এবিষয়ে নূতন তর্কের অবতারণা অনাবশ্যক।

খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব, শিক্ষিত-সমাজের ভাষা উপেক্ষা পূর্ব্বক সাধারণের তদানীন্তন যে ভাষা ছিল, সেই ভাষাতেই তদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর অধিকাংশ গ্রন্থাবলীই, তৎকালবর্ত্তী জনসাধারণের ভাষায় রচিত। এই ভাষা যে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মস্থান মগধদেশেরই ভাষা—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের জন-সাধারণের এই যে ভাষা—ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে—ইহাতে যেখানে যেখানে সংযুক্তবর্ণ আছে—তাহা প্রায়ই এক বর্গের বর্ণদ্বয়ের যোগে নিষ্পন্ন। যেমন সংস্কৃত ভাষায় 'সূত্র' শব্দের সংযুক্ত ত্র অংশ ত এবং র এর যোগে উৎপন্ন। আর এই জন-সাধারণের ভাষায় ঐ সূত্র শব্দ সুত্ত হইবে। অর্থাৎ ত এবং 'র' এর সংযোগের পরিবর্ত্তে 'ত' এবং 'ত' এরই সংযোগ হইবে। এইরূপ সংস্কৃতে 'ধর্ম্ম' শব্দ-এই ভাষায় হইবে 'ধম্ম'।

আবার সংস্কৃতে যে সকল শব্দ ব্যঞ্জনান্ত—এই ভাষায় তাহার অনেকেই স্বরান্তরূপ ধারণ করে। যেমন—সংস্কৃতে 'বিদ্যুৎ' শব্দ এই ভাষায় হইবে বিজ্জু।

এই পালি ভাষা—অতি বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রচলিত। পালি ভাষা—সর্ব্বপ্রথমে কোন দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহা অদ্যাপিও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। মগধেশ্বর অশোকের নানাবিধ প্রস্তর-স্তম্ভ এবং অনুশাসনাদিতে এই পালি ভাষায় বাক্যাবলী খোদিত আছে। সুতরাং এই ভাষা যে খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল, তাহাতে আপত্তির কারণ নাই। কেন না,অশোকের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ২৫৯-২২২ অব্দ পর্য্যন্ত। এই পালি ভাষা খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে সিংহল দেশে সর্ব্ব প্রথম প্রচারিত হয়। দ্বীপবাসিগণের বর্ত্তমান ভাষারও মূল এই পালি ভাষা।

বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব বশতঃ অশোকের সময়ে বা রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই মধ্যভারতের প্রায় সকল, রাজকায় আদেশ, অনুশাসন, দলিলপত্র প্রভৃতি, বৌদ্ধদিগের তদানীন্তন ভাষায় লিখিয়া তাম্রফলকাদিতে রক্ষিত হইত। এই ভাষার নাম প্রাকৃত। যদিও দেশে সংস্কৃত চলিত ছিল, কিন্তু সাধারণ জন-সমাজে ইহার তত প্রসার ছিল না। তাই এই সময়ে কয়েক শতাব্দী যাবত প্রাকৃতের প্রভাব একটু বেশী পরিলক্ষিত হয়। অনেক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অনুশাসনাদিতে আবার সংস্কৃত কবিতাবলীরও উল্লেখ আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, দেশে যখন যে ভাষাই আবির্ভূত হউক না কেন—সংস্কৃতের একটা ধারাবাহিক গতি কোন সময়েই প্রতিহত হয় নাই। বরং সকল ভাষাতেই সংস্কৃতের অল্প বিস্তর আধিপত্য প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রাচীন পুথি পাজি দেখিলে মনে হয় যে, ঐ ঐ সম্প্রদায়, তাহাদের সমকালীন বহুজন-সমাজে প্রচলিত ভাষাতেই ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রচার করিত। সংস্কৃতের প্রতি তাহাদের তখন ততটা লক্ষ্যই ছিল না। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের প্রায় যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদিই প্রাকৃতে এবং দিগাম্বর জৈনদিগের গ্রন্থাবলী সংস্কৃতে লিখিত। অধ্যাপক উইলসন বলেন—বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদির ভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত। যখন আলেক্জেণ্ডারের সহিত গ্রীকগণ ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও দেখিয়াছিলেন যে, প্রাকৃত সাধারণ জনবাহিনীর কথিত ভাষা। পর্ব্বত গাত্রে খোদিত অশোকের যে সমুদয় অনুশাসনে আণ্টিওকাস্ ( Antiochus ) এবং অন্যান্য গ্রীক্ নরপতিগণের নামোল্লেখ আছে,উহাদের ভাষাও এক প্রকার প্রাকৃত।

ব্যাক্‌টেরিয়ার গ্রীক্ ভূপতিগণের প্রায় যাবতীয় মুদ্রাতেই প্রাকৃত ভাষায় লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক,বৌদ্ধ এবং জৈনগণ কালক্রমে সংস্কৃত ভাষায় যতই অভিজ্ঞ হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের মজ্জাগত প্রাকৃত ভাষায়, ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে, সংস্কৃত ভাষার অনেক অংশ—বিভক্তি-বচন-প্রভৃতি সংযুক্ত হইতে লাগিল। যখন সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল,সে সময়ে প্রাকৃত যেরূপ খাটি 'প্রাকৃত' ছিল, সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভের পর তাহার সে আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সংস্কৃতের সহিত মিলিয়া প্রাকৃত অন্য আকার ধারণ করে।

এই পরিবর্ত্তিত প্রাকৃত ভাষা মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়। 'ললিত-বিস্তর' প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ ভাষার নিদর্শন

অনেক 'গাথা' আছে। এই জন্য অনেকে আবার ঐ ভাষাকেই 'গাথা' ভাষা বলেন। কিন্তু ইহাকে ও প্রকার গাথা নামে অভিহিত করা সমাচীন নহে,—যেহেতু বৌদ্ধদিগের অনেক গদ্যগ্রন্থও এই মিশ্রিত ভাষায় লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, এই কৃত্রিম মিশ্র ভাষা সংস্কৃত এবং পালি—এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ঐ গাথা ভাষায় পরিণত হইয়াছে—আবার ঐ গাথা-ভাষা ধীরে ধীরে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পালি দাঁড়াইয়াছে,—তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত ভাষায় ঠিক নহে।

প্রাচীন অনুশাসনাবলীর আলোচনা ফলে অবগত হওয়া যায় যে, কি প্রকারে সংস্কৃত ভাষা ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের উপরে স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদের ব্যবহার্য্য ভাষাকে বিতাড়িত করিয়াছিল। মথুরায় যে সকল জৈন অনুশাসন আছে, তাহাদের ভাষায় তিনটী স্তর দেখিতে পাওয়া যায়,যথা—১ বিশুদ্ধ-প্রাকৃত,২ সংস্কৃত-ভাবাপন্ন প্রাকৃত, ৩ বিশুদ্ধ-সংস্কৃত। এই তিন স্তরের মধ্যে বিশুদ্ধ-প্রাকৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিশুদ্ধ-সংস্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা নবীন। বৌদ্ধদের অনুশাসনাবলীতেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। কেন না—তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অনুশাসনে বিশুদ্ধ-প্রাকৃত, মধ্যবর্ত্তী কালের অনুশাসনে সংস্কৃত-ভাবাপন্ন প্রাকৃত আর অপেক্ষাকৃত আধুনিক অনুশাসনে বিশুদ্ধ সংস্কৃত।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের অনুশাসনাবলীতে ( জৈন ভিন্ন ) বিশুদ্ধ-সংস্কৃতেরই একাধিপত্য। যদিও ঐ সকল সংস্কৃতের মধ্যে প্রাকৃতের কিছু কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু তাহা এত অল্প যে, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এইরূপে সংস্কৃত ভাষা ক্রমে বৌদ্ধদিগের সাহিত্য হইতে তাহাদের মিশ্রিত ভাষাকে তাড়াইয়া দিল। এইজন্যই আমরা হীনজান বৃদ্ধদের যে সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহা প্রায়ই সংস্কৃতে লিখিত। অবশ্য এই সংস্কৃত এবং কালিদাসাদির ব্যবহৃত সংস্কৃত—এই দুএর শব্দাবলী ঠিক এক প্রকার নহে। কেন না বৌদ্ধ সংস্কৃতে অনেক প্রাকৃত শব্দ আছে।

চীন দেশীয় পরিব্রাজক "ইউ এন্ থসঙ' স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা—বিচার প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন হইত। কালক্রমে জৈনদের উপরেও সংস্কৃতের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল। কিন্তু জৈনগণ প্রাকৃতকে একেবারে ত্যাগ করিলেন না। প্রাচীনকালে—সেই বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্বে,সংস্কৃতের যে বহুল প্রভাব ছিল, তাহা বৌদ্ধযুগে একটু মন্দীভূত হইলেও, এই ভাবে ক্রমে পরে, মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভকালে সংস্কৃত তাহার লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইল। সংস্কৃত ভাষার এই পুনরভ্যুত্থানেও কিন্তু প্রাকৃত তাহার নিজের কতকটা প্রভাব—কতকটা চিহ্ন রাখিয়া গেল। অনেক প্রাকৃত শব্দ সংস্কৃতে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রাকৃতের প্রাচীনতম অবস্থাতেও অর্থাৎ অশোকের পালিভাষায় লিখিত অনুশাসনাদিতে এবং বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাচীন সাহিত্যে আমরা—উহার ( প্রাকৃতের ) দুইটী ভেদ দেখিতে পাই—পূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত প্রাকৃত, আর পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত প্রাকৃত। বলা বাহুল্য যে, এই দুই দেশের প্রাকৃতে পরস্পর অনেক পার্থক্য আছে।

খ্রীঃ ১ম শতাব্দী হইতে ১০ শতাব্দী পর্য্যন্ত কালকে প্রাকৃতের মধ্যমাবস্থা বলা যাইতে পারে। এই সময়ের প্রাকৃতকে আবার চারি প্রকারে বিভাগ করা যায়। যথা:—১। সিন্ধুনদ-বিধৌত প্রদেশ সমূহে—'অপভ্রংশ'। ২। মথুরার চতুর্দ্দিকে—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে 'শৌরসেনী'। পূর্ব্বে যে, পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত প্রাকৃতের কথা বলা হইয়াছে,—তাহাই কালক্রমে এই দুই ভাষায় পরিণত হইয়াছে। গুর্জ্জরী (গুজরাটী) 'অবন্তী' (পশ্চিম রাজপুতানী) মহারাষ্ট্রী (পূর্ব্ব রাজপুতানী) এই তিনটী ভাষা শৌরসেনীরই অবান্তর ভেদমাত্র। ৩। মাগধী মগধ অর্থাৎ বিহার প্রদেশের ভাষা)।

৪। অর্দ্ধ মাগধী (বারাণসী অঞ্চলের ভাষা)। উপরি লিখিত পূর্ব্বভারতে ব্যবহৃত প্রাকৃতই কালক্রমে এই দুইটীতে অর্থাৎ মাগধী এবং অর্দ্ধমাগধীতে পরিণত হইয়াছে।

এই যে চারি প্রকার প্রাকৃতের কথা বলা হইল, নাটকাদিতে ইহাদেরই বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহারাই আবার, বর্ত্তমান সময়ে, ভারতে প্রচলিত সমস্ত ভাষার জনয়িত্রী স্বরূপ। কেন না—অপভ্রংশ হইতে, 'সিন্ধী' 'পশ্চিম পঞ্জাবী' এবং কাশ্মীরী; শৌরসেনী হইতে পূর্ব্ব পঞ্জাবী, হিন্দী এবং গুজরাটী; মাগধীদ্বয় হইতে মরাঠী ও বাঙ্গালা উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল ভাষা খ্রীষ্টীয় দশম [illegible]তে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহাদের ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন রকমের। সংস্কৃতের ন্যায় বিভক্তির ভূরিব্যবহার ইহাতে নাই। ইংরাজি ভাষায় যেরূপ বিভক্তির কাজ স্বতন্ত্র শব্দ (preposition) দ্বারা সাধিত হয়, এই সকল ভাষায়ও অনেকটা তদ্রূপ। এই সকল ভাষায় সংস্কৃতমূলক অনেক গ্রন্থাদি আছে। সম্প্রতিও ইংরাজ রাজত্বে অনেক ইংরাজি গ্রন্থাদির ভাব গ্রহণ করিয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের তেলুগু, কানারি, মলায়লম্ এবং তামিল হইতে অনার্য্য দ্রাবিড়ভাষা। আর্য্যভাষা ইহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই সত্য, পরন্তু ঐ সকল ভাষাতেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে, এবং ঐ সকল ভাষায় গ্রন্থাদিও সংস্কৃতের আদর্শে লেখা হইয়াছে।

যাহা হউক—এ সমুদয় বিষয়ের 'তন্ন তন্ন' করিয়া আলোচনা করিবার সময় এ নহে, বা এ প্রবন্ধ হইতেও পারে না। ক্রমে প্রসঙ্গ বশতঃ যখন যে প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, যে যে সংশয়ের আবির্ভাব হইবে, আমরা যত দূর পারি, তাহার সমাধান করিতে যত্ন করিব। এক্ষণে—ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের শীর্ষস্থান—জগতের আদি গ্রন্থ, 'বৈদিক সাহিত্য' বিষয়ে প্রথমতঃ আলোচনা করা যাউক। ক্রমশঃ।

শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

# উদ্বোধন।

নবীন যুগের উষার আলোকে,
হের চৌদিকে চাহিয়া ;
সবাই ছুটেছে উন্নতি-মুখে,
আশার তরণী বাহিয়া।
ভীম আলোড়নে আলোড়িত ধরা,
ঘুচিয়া গিয়াছে জগতের জড়া,
বিশ্বব্যাপিনী রাগিণী মুখরা
কেমনে উঠেছে গাহিয়া।

আপনা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ,
ভাষা, ইতিহাস আদি—
মাজিয়া ঘষিয়া উঠাইছে সবে,
যত্নে কোমর বাঁধি।
কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পোন্নতি—
করিতেছে সবে অবিরাম গতি।
হায় মা ভারত! একি দুর্গতি!
আজিও আমরা কাঁদি!

আত্ম বলেতে বিশ্বাস নাহি,
এমনি অবোধ মোরা!
হস্ত থাকিতে, হস্ত বিহীন,
চরণ থাকিতে খোঁড়া!
শুধু কেঁদে বলি—"আমরা অধম,
বীর্য্য-বিহীন, হীন-বিক্রম,
কি আর করিব, সকলি করম।"
এই শুধু দেশ জোড়া!

জড়তা ঠেলিয়া, উঠ একবার,
চেয়ে দেখ চারি দিক ;—
উড়িয়া, আসামী, বেহারী, বাঙ্গালী,
মারাঠি, পাঞ্জাবী, শিক!

তোদের দীনতা হীনতা হেরিয়া,
হাসিতেছে সবে "টিট্‌কারি" দিয়া ;
রুশিয়া, জাপান, ফিনিস, শিরীয়া,
ঘৃণায় কহিছে—ধিক্!

ত্রিশ কোটী মোরা ভারত সন্তান,
যাট কোটী হাতে নাকি—
মায়ের দীনতা ঘুচাইতে নারি,
মুছাইতে নারি আঁখি?
আমরা কি সেই আর্য্যতনয়?
যাঁহারা আসিয়া, শুধু গুটিকয়,
এ ভারত-ভূমি করেছিল জয়—
অসুর-শোণিত মাখি?

মোরা নহি কভু ক্ষুদ্র অধম—
রুদ্র আমরা অতি।
হস্তীর মত, স্বীয় বিক্রমে—
অন্ধ আপনা প্রতি!
একতার তারে বাঁধিয়া হৃদয়,
স্বদেশের কাজে ছুট' নির্ভয়,
বিশ্বের হবে—মহা বিস্ময় ;
হেরিয়া মোদের গতি!

দেখরে চাহিয়া পূর্ব্বেতিহাস—
থর্ম্মাপালির রণে ;
কেমনে রোধিল "জেরাক্সিসের"
অগণ্য সেনাগণে?
"লিউনিডাসের" ত্রিশত সৈন্য—
কেমনে আপনা দেশের জন্য,
জগতে হইল ধন্য ধন্য?
দেখহ ভাবিয়া মনে।

কর হে স্মরণ পূর্ব্ব-কাহিনী,
"কাণির" সমর ফল ;
সৈন্য শূন্য করেছিল যবে—
বীরবর "হানিবল"!
মৃত-প্রায় সেই ইতালী তখন,
কোন দৈব-বলে করিল গঠন—
স্বল্পদিবসে, পূর্ণ নূতন,
সুবিপুল সেনা-দল ?

আবার অজেয় সেই হানিবলে,
"জামা" সমরাঙ্গনে,
পরাজিল যবে, আফ্রিকা-জয়ী
"সিপিউ" বিষম রণে ;
কোন মহাবলে হ'য়ে বল-বতী,
দিয়েছিল যত কার্থেজ-সতী,
অস্ত্রের তরে—কেশ সংহতি,
অঙ্গের আভরণ ?

যেই আমেরিকা ছিল এক দিন
বৃটণের পদানত,
শিল্পবিহীন, বাণিজ্য-হীন,
অধম জাতির মত ;—
উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে,
চিনিটুখু হতে, সূচীটী পাইতে,
বৃটনের দ্বারে হইত যাইতে,
সে আর কহিব কত !

সেই আমেরিকা, দেখরে আবার—
সহিতে না পারি শুল্ক কর-ভার,
কেমনে রোষিল সিংহি-আকার,
নাশিতে হৃদয়-ক্ষত !—
সেই আমেরিকা, চেয়ে দেখ আজ ;—
স্বদেশের তরে করিল কি কাজ,
স্তম্ভিত করি সভ্যসমাজে—
সাধিয়া কঠিন ব্রত !

যবে দুর্জ্জয় জর্ম্মন সেনা,
সম্পদময়ী "পারী"
করি অবরোধ, মহা বিক্রমে
ধন লুণ্ঠিল তারি ;
শূন্য হইল অস্ত্র আগার,
ধনভাণ্ডারে কিছু নাহি আর,
অন্ন যুটে না করিতে আহার,
সে দুখ কহিতে নারি !
সেই মৃত-প্রায় ফরাসী আবার,
কেমনে পাইল চেতনা সঞ্চার,
কেমনে করিয়া স্বদেশ উদ্ধার—
জগতে হইল জারী !

নহে বেশীদিন,—যোহান্সবর্গে
লইয়া কণক-খনি,—
কৃষি-জীবী সেই "বুরের" বিক্রম—
দেখহ হৃদয়ে গণি !
সিংহ সমান বৃটিশের সাথে,
কেমনে নাচিল রণ-উন্মাদে,
নখর দন্ত উপাড়ি অবাধে—
ঘোষিল বিজয়ধ্বনি ! *

দেখনি সে দিন, ক্ষুদ্র জাপান
রুদ্র রুশীয়গণে—
কেমনে মথিল, লঙ্ঘি জলধি,
ভীম দুর্জ্জয় রণে ?
জন্মভূমির হিতের লাগিয়া,
জাতীয় হৃদয় উঠিলে জাগিয়া,
বিঘ্ন বিপদ যাইবে ভাগিয়া—
ভীষণ আবর্ত্তনে।

আর ঘুমায়ো না, হও অগ্রসর—
হৃদয়ের অনুরাগে ;

* বুর যুদ্ধে, বুর-জাতি পরাজিত হইলেও তাহারা বিজয়ী অপেক্ষা সমধিক যশস্বী হইয়াছেন।

বক্ষ হইতে তপ্ত রক্ত—
ঢেলে দাও যত লাগে!
স্বদেশের তরে ধাও দ্রুতগতি,
ঘুচুক অচিরে মায়ের দুর্গতি,
সবে মিলে দাও পূর্ণ আহুতি—
মাতৃ পূজার যাগে!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

# কবিওয়ালা। (৮)

## রামানন্দ নন্দী

যে সময়ে বঙ্গদেশ কবি গানোচ্ছ্বাসে পরিপ্লাবিত, ধনীর বিভবময় সৌধ অট্টালিকার সমুজ্জ্বল কক্ষ হইতে দরিদ্রের তৃণপত্রাচ্ছাদিত জীর্ণ কুটীরের প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাবময়, উচ্ছ্বাসময় ও রহস্যময় কবি-সংগীত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, কবি গানের সেই সুবর্ণযুগে যে সকল মহাত্মা গাওনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে, তাঁহাদের অধিকাংশেরই জন্মস্থান কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে ছিল। ফরাসডাঙ্গা, চন্দননগর, ২৪-পরগণা প্রভৃতি স্থান ও জেলা বহুতর প্রসিদ্ধ কবিওয়ালকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয় স্তন্য-সুধা দানে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। ঐ সকল স্থান রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়, তৎকালে তত্তৎ স্থানের লোকের মন কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হইত। কারণ অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ ও যশ অর্জ্জন করিতেন এবং কলিকাতাতেই তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। বহুতর স্থান হইতে তাঁহাদের নিকট বায়না উপস্থিত হইত। কাজেই অর্থ ও যশের কুহকে পড়িয়া অনেকেই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন।

এখন যে মহাত্মার কথা লিখিব, তিনি আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত নিতাই দাস বৈরাগীর (নব্যভারত. জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১২ সাল, ১০৩ পৃষ্ঠা) শিষ্য ছিলেন। নিত্যানন্দ বা নিতাই দাসের হাতেই ইনি 'মানুষ' হন।

চব্বিশ পরগণার মোতালক বারাসত মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটী থানার অধীন রাহুতা নামক গ্রামে কবিওয়ালা রামানন্দ নন্দী অনুমান ১১৮০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাহুতা গ্রামে বাগ্দেবীর বীণার তান বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এক সময়ে বহু সুকণ্ঠ-পিকবর কাব্য-কুঞ্জে বসিয়া মধুর ঝঙ্কার করিয়া গিয়াছেন। কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের বংশীধর ও ধরণীধর পোদ এবং রজক জাতীয় চণ্ডীচরণ ধোবী রাহুতা গ্রামেই জন্ম লাভ করেন। ইহাঁরাও উৎকৃষ্ট কবি-সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। এই সময় রাহুতা গ্রামের নাম অতি দূরবিশ্রুত ছিল, নানাস্থান হইতে অসংখ্য ব্যক্তি এই সকল কবিদের সঙ্গীত-সুধা পান করিতে আসিত। তৎপর রামানন্দের সুযশ প্রচারিত হইলে বহু ওস্তাদি দলের কবিওয়ালরাও তাঁহার নিকট আসিয়া গান বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন।

রামানন্দের পিতার নাম আনন্দচন্দ্র নন্দী, জাতি কায়স্থ। রামানন্দের বিদ্যালয়ে শিক্ষা অতি অল্পই হইয়াছিল, গৃহে থাকিয়াই যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিক্ষা করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী কথা এই যে, সে সময় লেখাপড়া শিখিবার এরূপ সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। অর্থশালী ব্যক্তিগণের পুত্রেরা প্রায়ই বিদ্যালয়ে যাইতেন না, গৃহ-শিক্ষক রাখিয়াই বিদ্যা শেষ করিতেন। এদিকে নিঃস্ব ব্যক্তির পুত্রের বিদ্যাশিক্ষাও আকাশ-কুসুম।

অধিকন্তু তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় পাড়ায় পাড়ায় স্কুল কলেজ পাঠশালা ছিল না। তখন একটী গ্রামে একটী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার আশ-পাশের ১০। ২ খানি গ্রামের বালকবৃন্দ প্রত্যহ ৫।৬ ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া তথায় পড়িতে আসিত। রামানন্দও এই ভাবেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরে রামানন্দ প্রসিদ্ধ ভট্টপল্লীর কেশব দাস নামক এক ব্যক্তির কন্যা সৌদামিনী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। সৌদামিনী অতিশয় পতি-পরায়ণা ছিলেন। পতি কুক্রিয়াশক্ত বলিয়া তিনি তিলার্দ্ধের জন্যও তৎপ্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইতেন না। সর্ব্বদাই স্বামীর পদানুগতা সেবিকা ভাবে তাঁহাতেই অনুরক্তা থাকিতেন।

অতঃপর রামানন্দ ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বপ্রথম নিতাই দাসের কবির দলে প্রবেশ করেন; সে সময় তাহার বয়স প্রায় ২২।২৪ বৎসর। এই দলে থাকিয়াই তিনি সঙ্গীত রচনায় সুদক্ষ এবং ব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষা, দীক্ষা, কৌশল ও নৈপুণ্য লাভ করেন। নিতাইকে তিনি গুরুর মতন ভক্তি করিতেন। উত্তর কালে তিনি পৃথক্ দল বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবিসংগ্রামে গুরুকে পরাজিত করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন এবং অনেক সময় কৃতকার্য্যও হইতেন।

রামানন্দ ৪।৫ বৎসর নিতাই দাসের দলে থাকার পর নীলুঠাকুর, ভবানী বেণে প্রভৃতি জন কয়েক কবিওয়ালার দলে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করেন। তৎপর তিনি নিজেই পৃথক্ কবির দল বাঁধিয়া গাওনা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তিও হইয়া উঠে। পূর্ব্বোক্ত নীলুঠাকুরই নিতাই দাসের কাব্যগুরু।

বড়ই দুঃখের বিষয়, রামানন্দের সঙ্গীতগুলির আর উদ্ধার হইল না। অতি সামান্য কতিপয় গান মাত্র দুই একজন প্রবীণ ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ। রামানন্দের রচিত একটী 'আগমনী' গানের কিয়দংশ,—

আধ আধ মৃদু স্বরেতে,
ঈশানী পাষাণীকে কয়।
শিবের দৈন্যদশা শুনে, ক্ষুণ্ণ মা দুখিনী,
ক্ষুব্ধ যে পিতা হিমালয় * * * *

রামানন্দের স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না; তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করিতেন এবং বেশ্যাশক্তও ছিলেন। এ দোষ তৎকালের অধিকাংশ ভদ্রলোকেরই ছিল। শ্রীকৃপণ্ডিতগণ যেমন বেশ্যালয়ে মিলিত হইয়া সদালাপ করিতেন, রামানন্দের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশের দেশীয় সমাজে তদ্রূপ প্রকাশ্য ভাবে বেশ্যার সহিত আমোদ প্রমোদ ও মদিরা পান প্রভৃতি চলিয়া আসিতেছিল। ইহাতে কাহাকেও সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইত না, বরং দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের ইহাই তৎকালে প্রধানতম উপায়রূপে পরিগণিত হইত। রামানন্দ কবি-গানে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সমস্তই এই সব কুক্রিয়াতে ব্যয়িত করিয়া মৃত্যুকালে স্ত্রী পুত্র কন্যাগণকে একরূপ পথে বসাইয়া চলিয়া যান। তাঁহার মদ্যপানের আসক্তি এতই প্রবল ছিল যে, শুনিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুর সময়েও তিনি মদের বোতল বগলে করিয়া তাহা হইতে মদ ঢালিয়া পান করেন। তৎসম্বন্ধে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামানন্দ কবির লড়াইতে গুরু নিতাইকে পরাজিত ও অপ্রতিভ করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেকে বলিতে পারেন, ছাত্রের ইহাই উপযুক্ত গুরু-দক্ষিণা! কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহাতে গুরুর আনন্দ বই নিরানন্দ হইবার কোন কারণ নাই। ছাত্র যদি গুণ-গরিমায় গুরু হইতে উচ্চ স্থান অধিকার করে, তবে তাহা প্রধানতঃ গুরুরই অধিক শ্লাঘার ও আনন্দের কথা।

নিতাই প্রথমতঃ ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। জন্মস্থান চন্দননগরেও তিনি ঐ ভাবে বিচরণ করিতেন। তাই এক সময়ে কবি-সংগ্রামে রামানন্দ গুরুকে বলিলেন,—

নিতাই দাস বৈরাগী, বাজাতো ডুগ্‌ডুগি,
আর চন্দন-নগরে ভিক্ষা কর্ত্তো,
তুম্ব বেঁধে কাঁধেতে—
আমরা ম'রে যাই লজ্জাতে।

গুরু নিতাই উত্তর করিলেন,—

আমি ভিক্ষা ক'রে খাই, তাতে লজ্জা নাই, কিন্তু রামানন্দের মত ·········(অশ্লীল)

আণ্টনি ফিরিঙ্গি প্রস্তাবে (নব্যভারত, ১৯৪ খ্রীঃ, ১৩১১ সাল) আমরা বলিয়াছি যে, গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার দলে বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন। গোরক্ষনাথ 'আগমনী, ও 'সপ্তমী' গান রচনায় অতি সুদক্ষ ছিলেন। একবার দুর্গোৎসবের সময় চুচুঁড়ায় এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে আণ্টনি কবি গাহিতে উপস্থিত হইলে, গোরক্ষনাথ সম্বৎসরের বেতন চুকাইয়া না পাইলে সপ্তমী গান দিবেন না, বলিয়া জিদ্‌ ধরেন। তাহাতে সাহেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দল হইতে বাহির করিয়া দেন। তৎপর হইতে



গোরক্ষনাথ নিজেই এক কবির দল বাঁধেন। একবার গাওনা করিতে তিনি রাহুত গ্রামে গেলে, রামানন্দ তাঁহার প্রতিদ্বন্দী রূপে দণ্ডায়মান হন। গোরক্ষ গান ধরেন,—

একবার ডাক্‌রে কোকিল! ডাক্‌ কুঞ্জ ঘিরে।
অনেকদিন তোর কুহুস্বর শুনি নাইরে পিকবর!
তাই সাধছি এত বিনয় করে। ইত্যাদি

রামানন্দ ধরতা দিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণ অভাবে রয়েছি নীরবে,
শ্রীকৃষ্ণ না এলে ডাকতে বলো না!
এখন কর্ণে কুহুধ্বনি, হবে বজ্রধ্বনি,
শ্রীপতি বিনে শ্রীমতী প্রাণে বাঁচবে না॥

ইত্যাদি*

গোরক্ষনাথ ফিরিঙ্গির দল হইতে বিতাড়িত হন। রামানন্দ তাহাতে ঠেস্‌ দিয়া

* কোকিলকে ডাকিতে সাধা লইয়া কবিওয়ালারা বড়ই মাথা ঘামাইয়া গিয়াছেন! অনেকেই কবি-লড়ায়ের সময় কোকিলকে ডাকিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতেন, আবার প্রতিপক্ষ হইতে তাহাকে নীরব থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হইত। মধুসূদন কানের রচিত এই ভাবব্যঞ্জক ঝিঁঝিট তালে গেয় গান আছে;—

হে কোকিল! বসে তমালে,
ডেকো না আর কৃষ্ণ বলে।
ঐ কোন্‌ সুখের গান, নাই দুঃখ-জ্ঞান,
প্যারীর যে যায় প্রাণ পড়ে অকূলে।
ভ্রমিতেছেন প্যারী বনে বিপিনে,
শুনে কুহুধ্বনি করে হুহুধ্বনি,
শুনে ধনীর ধ্বনি আমরা বাঁচিনে।
দেখ কাঁদে অলিকুল হইয়ে ব্যাকুল,
কাঁদিতেছে শুক মনের অসুখে,—
কাঁদে সখীগণ হইয়া অজ্ঞান,
তুমি সদা গান কর কি সুখে?
আমরা যত ব্রজ নারী, শ্রীহরি বিহনে মরি.
সুদন বলে ভজলে হরি, পাওয়া যায় অন্তকালে।

একটী গান ধরেন, তাহাতে বলেন যে, তিনি আণ্টুনির বি‍বির ঠোক্‌না খেয়ে পালিয়ে গঙ্গাপারে এই রাহুতা গ্রামে আসিয়া স্বর্গে উঠিবার কীর্ত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গোবরা পোকার পাখ্‌না ছিঁড়ে গেছে, উড়িবার শক্তি নাই, অথচ তাঁহার 'ভ্রমরা' হইবার অভিলাষ তিরোহিত হয় নাই। গানটী অসম্পূর্ণ, যতদূর পাওয়া গিয়াছে, উদ্ধৃত হইল,—

এক বাহাদুরী কাঠ, এই খানেতে পুঁতে,
রাউতা গাঁ—গঙ্গা পারেতে,
তাহার উপর চড়্‌য়ে তরে,
স্বর্গে যাবার পথ দেখায়।
নূতন এক কীর্ত্তি করি ভাই,
মেলিয়া বিবির ঠোক্‌না খেয়ে,
ওর পাখ্‌না ছিঁড়ে গিয়েছে,
গোরক্ষ গোব্‌রে পোকা,
আজ ভ্রমরা হতে এসেছে॥ * * *

রামানন্দ দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। গতাসু হইবার সময়ে তাঁহার দুইটী পুত্র, দুইটী কন্যা ও এক পত্নী বর্ত্তমান ছিল। কবির বংশ লোপ হয় নাই, রাহুতা গ্রামে তাঁহার বংশীয় লোক এখনও বাস করিতেছেন।

রামানন্দের মৃত্যু অতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। 'বঙ্গবাসী' পত্রে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—"দুর্গোৎসবের সময় কোন স্থানে তিনি কবি গাহিতে গিয়াছিলেন, সেই স্থানে কঠিন জ্বর হয়। ভাটপাড়ায় তাহার শ্বশুর বাড়ী। রাত্রিতে তিনি ভাটপাড়ায় আসিয়া পৌছিলেন। তিনি সুরাপান করিতেন। প্রাতঃকালে মদ্যপান করিতে করিতে তাঁহার শ্বশুরকে বলিলেন,—"আজি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইবে। আর বিলম্ব করিব না, শীঘ্র বাড়ী গিয়া ঠাকুর মহাশয়দের পদধূলি ও প্রসাদ লই, তাহার পর মূলাযোড়ের ঘাটে গিয়া মা গঙ্গার জলে প্রাণ ঢালিব।" এই বলিয়া রামানন্দ রাহুতার বাটীতে আসিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তাঁহার শ্বশুর পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন,—কিন্তু কে তাহা শুনে? শ্বশুর পাল্কি বেহারা আনিয়া দিতে চাহিলেন, তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই। বগলে মদের বোতল,—রামানন্দ আপন মনে বাটী চলিলেন। তাঁহার শ্বশুর অনুপায় দেখিয়া, সঙ্গে দুই জন লোক দিলেন। বেলা প্রায় দুই প্রহর। রামানন্দ রাহুতার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। "শীঘ্র ঠাকুর মহাশয়দের ডাকো, শীঘ্র ঠাকুর মহাশদের প্রসাদের ব্যঞ্জন আনো, আমি শীঘ্র মূলাযোড়ে গিয়া মায়ের পুণ্য সলিলে প্রাণ ঢালিব"—এই বলিয়া রামানন্দ বাটীতে মহা কোলাহল তুলিলেন। কত লোক তামাসা দেখিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে ছুটিল, কত লোক চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে জন্মের মত রামানন্দকে একবার দেখিয়া লইতে চলিল। ব্রাহ্মণেরা প্রায় সকলেই উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসকেরা নাড়ী টিপিয়া বলিলেন,—"হাঁ সত্যই বটে, মৃত্যুকাল নিকট, মাতলামির কথা নয়।" সকলে পাল্কি বেহারা ডাকিয়া দিতে চাহিলেন, রামানন্দ কাহারো কথা শুনিলেন না। বাম হস্তে পান-পাত্র, বগলে মদের বোতল, দক্ষিণ হস্তে ব্যঞ্জন। রামানন্দ মদ্যপান করিতে করিতে মূলাযোড়ে চলিলেন। রাহুতার ইতর ভদ্র অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। তিনি গঙ্গাতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দাঁড়াইলেন, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল।" আশ্চার্য্য ব্যাপার নয় কি? ঘোর মদ্যপায়ীর

হৃদয়েও যে এরূপ গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি এবং সর্ব্বোপরি দেবভক্তির বিকাশ হইতে পারে, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। কিন্তু যত নব কৌতুকাবহ, অলৌকিক ঘটনা তাহা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়,—অন্যত্র বিরল। অতীতযুগে ভারতাকাশে এমন এক একটী ধ্রুবতারার উদ্ভব হইয়াছিল, যাহার আলোক-রশ্মিতে সমগ্র ভুবন উদ্ভাসিত, চমৎকৃত, বিস্ময়যুক্ত হইয়া থাকিত। রামানন্দও ভারত-গগনের একটী ধ্রুবতারা, অনুমান ১২৬০ বঙ্গাব্দে আমরা তাহা ভগীরথীর পূত সলিলে চিরদিনের তরে বিসর্জ্জন দিয়া আজ কেবল পুণ্যময় স্মৃতি টুকুর আদর করিতেছি।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

# বালযোগী ধ্রুব। (৩)

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তাধিক ভক্ত ধ্রুবের ঐকাকিঙ্কী-ভক্তিময়ী প্রার্থনা এবং অবিচল-বিশ্বাসময় স্তবে পরিতুষ্টি লাভ করিয়া মৃদুমধুর হাস্যে কহিলেন "হে ধ্রুব! হে বালক-যোগী ধ্রুব! তুমি আমার পরম ভক্ত, সুতরাং অতীব প্রিয়। আমি সন্তুষ্ট-চিত্তে তোমাকে বর দান করিলাম; তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি, সুতরাং তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহা সিদ্ধ করিলাম। এ কাল পর্য্যন্ত কোন যোগী যে অনির্ব্বচনীয় সুখময় স্থান, যে দেবদুর্লভ মহান স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই সমুজ্জ্বল স্বর্গপদ আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ যে স্থানে সংলগ্ন রহিয়াছে, যাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, যাহা অনন্ত বিশুদ্ধ আনন্দের আকর, যে স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, কশ্যপ, মুনি, ধর্ম্ম, সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও অত্যুজ্জ্বল তারকাগণ নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে, আমি স্বর্গধামের সেই বিশেষ গণনীয় স্থান তোমাকে প্রদান করিলাম।' মেধীবদ্ধ পশুযূথের ন্যায় কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াও দেবতাগণ বিনষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তোমার ঐ বাসস্থান বিনষ্ট হইবার নহে। তোমার স্থান সদা অচঞ্চল ও সদা নিশ্চিত। ঐ স্থানের নাম ধ্রুব-লোক; তোমার ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিশ্বাসের কীর্ত্তি-স্বরূপ স্বর্গের ঐ বিশেষ স্থান তোমারই নামানুকরণে অনন্তকাল পর্য্যন্ত কথিত হইতে থাকিবে।" ভগবানের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিয়া বালক-যোগী ধ্রুব নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ধ্রুব ক্ষত্রিয়-সন্তান সুতরাং ক্ষত্রিয়জনোচিত তেজ ও শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং রাজকুমার বলিয়া দেহের কমনীয়তা-জনিত জ্যোতি অতি অপূর্ব্বভাবে তাঁহাতে প্রতিভাত হইতেছিল। কঠোর-তপস্যা জন্য তাঁহার বপু ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দেহের সৌন্দর্য্য ও কোমলতা ক্ষীণ হইয়া যায় নাই; অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তেজে তাঁহার সমগ্র বদনমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় ভাবে প্রভূত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। ধ্রুব তখন বয়ঃক্রমে বালক; বাল্যাবস্থায় যোগীবেশ অতীব অপূর্ব সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া দৃষ্ট হইত। সেই বালযোগী মূর্ত্তির শোভা দর্শন করিলেই সকলের মনে স্নেহ ও সহানুভূতির উদয় হইত। ভক্তবৎসল ভগ-

বানও বালক ধ্রুবের শোভনীয় যোগী-রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত চিত্তে মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে পুনরপি কহিলেন "হে ভক্ত। তোমার মঙ্গল হউক। তোমার কামনা সিদ্ধ হইল, তোমার কঠোর তপস্যা ভঙ্গ হউক; তুমি স্বগৃহে পিতামাতা সমীপে প্রত্যাগমন কর; তুমি বহুবর্ষ কাল পর্য্যন্ত ঐহিক সুখ ভোগ করিয়া চরমে আমারই কৃপায় অমর-বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইবে।" এই কথা কহিয়া গরুড়ধ্বজ নারায়ণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ধ্রুব তাঁহার জনক উত্তানপাদের প্রাসাদাভিমুখে প্রয়াণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি কি নির্ব্বোধ, হায়! আমি কি অধম! বিমাতার বাক্য-বাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতেই আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ভগবানের কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলাম এবং যাহাতে আমার পিতা রাজা উত্তান-পাদের সিংহাসনাধিরোহণ করিতে পারি, তজ্জন্য আমার ঐহিক বাসনা বলবতী ছিল ভক্তবৎসল ভগবান বুঝি সেই কারণে আমাকে সর্ব্বপ্রথমে আমার ঐহিক কামনা সিদ্ধির আশীর্ব্বাদ দান করিয়া পরিশেষে অখণ্ড সুখাত্মিকা মুক্তির আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন আমি আদিতে প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণতা-জনিত বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবৎধ্যানে প্রবৃত্ত হই নাই, এই জন্য আমি ভগবানের অতীব প্রিয় হইয়াও পুনরায় সাংসারিক অনিত্য সুখ-কূপে প্রবিষ্ট হইতে চলিলাম। মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মফল-ভোগী, সুতরাং আমিও সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অবশ্য অধীন।" ধ্রুব এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। প্রকৃত কথা এই, যদিও প্রথমাবস্থায় তিনি ঈশ্বর পরায়ণতাজনিত বৈরাগের বশবর্ত্তী হয়েন নাই, যদিও প্রথমে তীব্র ক্রোধে, বিদ্বেষে ও বিশেষতঃ বিমাতার দুর্ব্বাক্যে ও গর্ভধারিণী জননীর অপ্রীতি এবং অনিচ্ছাময়ী অনুজ্ঞায় অরণ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পরিণামে পরম বৈরাগ্য, অমিত বিশ্বাস ও অনির্ব্বচনীয়া ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মায়াময় সংসারে অনেক সাধকের, অনেক ভক্তের ও অনেক জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাথমিক অবস্থা প্রায় এইরূপ। অনুসন্ধান করিলে সহজেই জানিতে পারা যায়, বহুল প্রধান প্রধান যোগী, যতি, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তপস্বী প্রভৃতি প্রথমাবস্থায় সংসারিক দুর্দ্দৈব বশতঃ হরিপদে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; কেহ স্ত্রী পুত্রের কৃতঘ্নতা দোষে, কেহ বন্ধু বা জ্ঞাতির অকৃতজ্ঞতায়, কেহ আত্মীয় কুটুম্বের বিশ্বাসঘাতকতায়, কেহ মাতা পিতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে কেহ বা কোন প্রকার শোক, লজ্জা, অভিমান, বিপদ, রোগ, আশঙ্কা, অপমান প্রভৃতির জন্য, কেহ বা কঠোর দারিদ্র্য-দুঃখ-জনিত অসহ্য অসুবিধায়, কেহ বা পারিবারিক-অশান্তিতে, অথবা রাজার অত্যাচারে, কেহ বা অন্যবিধ কারণে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, কিম্বা পরিব্রাজক-ব্রত অবলম্বন করিয়া অনাথ-নাথ হরির শরণাগত হইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় শুদ্ধমাত্র প্রকৃত তীব্র বৈরাগ্যের বশে অতি অল্প সংখ্যক লোকেই ভগবানকে ধ্যান করেন। যাহা হউক, যে কোন কারণই বিদ্যমান থাকুক, ভক্তবৎসল ভগবান পদে যদি বাস্তবিক ভাবে ভক্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই নিরুপায়ের উপায় পরমেশ্বর ভক্তের মনো-

বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেন। যে কোন কারণই বিদ্যমান থাকুক, প্রকৃত বিশ্বাস, ভক্তি ও বৈরাগ্য জন্মিলে, যে কোন ব্যক্তি ভক্তবৎসল ভগবানের পদারবিন্দের মধুপানে অধিকারী হইতে পারেন এবং বাঞ্ছাকল্পতরু জগদীশ্বর ভক্তের মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ করিতে বিমুখ হয়েন না! পাষাণবৎ কঠিন-হৃদয়-সম্পন্ন ঘোরতর অধমপাপী যদি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও পরমারাধ্য পরমেশ্বরের পরম প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সমুদয় সভ্যজাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে; পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে ভগবানের এই উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীশ্রীমৎভগবৎগীতায় ভগবান পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, "দস্যু, তস্কর, অধম, এমন কি ঘোরতর পাপী হইতেও অধিকতর পাপী মানব যদি আমার (ঈশ্বরের) অনুগত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও দুস্তর ভবসাগর পার হইয়া যাইতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই।"

যাহা হউক, ধ্রুব তাঁহার পিতার রাজধানী সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মহারাজা উত্তানপাদ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বহুল গজ, অশ্ব, উষ্ট্র, রথ, পতাকা, সারথী, পুষ্পমালা, সুগন্ধ দ্রব্য এবং সেনাদল ও প্রধান প্রধান অমাত্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধ্রুবের যথাবিধি আদর ও অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বাল-যোগী ধ্রুবের অসাধারণ তপস্যা ও বিপুল কীর্ত্তির কথা সমস্ত দেশ প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নগরবাসীগণ পরমানন্দে ধ্রুবের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রমণীগণ শঙ্খধ্বনি ও উলু উলু ধ্বনিতে দিকদিগন্ত মাতাইয়া তুলিল। নগরের সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব তোরণ, পতাকা ও পুষ্পদ্বারে শোভিত হইয়াছিল; বালক বালিকারা করতালি দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণ ও সাধুগণ "ধ্রুবের মঙ্গল হউক" কহিয়া আশী-র্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রাজপুরোহিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে নিযুক্ত হইলেন। মহারাজা উত্তানপাদ সত্যসত্যই পুত্র-বিরহে কাতর হইয়া উঠিয়াছিলেন; আদিতে যদিও তিনি ধ্রুবের বিমাতার স্নেহের অতীব বশবর্ত্তী হইয়া নিন্দিত স্ত্রৈণ পুরুষের ন্যায় ধ্রুবের অবমাননা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অপরাধের যথোচিত প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও সম্মানে ধ্রুবকে আলিঙ্গন করিলেন। পিতাপুত্র মধ্যে পুনরায় প্রকৃত পিতা-পুত্র ভাব জন্মিল। ক্রমে ক্রমে ধ্রুব পিতৃদেবের এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন যে, রাজ্য-বাসী প্রজাপুঞ্জ ও প্রধান প্রধান পুরুষদিগের সহিত সৎ পরামর্শ করিয়া, রাজা মহাশয় পুত্র ধ্রুবকে সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক নির্জ্জন বনে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, অতঃপর ধ্রুব রাজ্যশাসন কালে শিশু-মারের কন্যা ভ্রমিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অনেক পাঠক পাঠিকা বিবেচনা করিতে পারেন, যোগীবর ধ্রুবের সংসারে প্রবেশ, বিবাহ, পুত্রোৎপাদন ও রাজ্য শাসন যেন অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। যাঁহাদের মনোমধ্যে এবম্প্রকার সংশয়ের উদয় হয়, তাঁহারা এই প্রবন্ধের প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত বৃথা পাঠ করিয়াছেন। প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ সৎবুদ্ধি সহ মনোনিবেশ

করিলেই পাঠকেরা এ কথার মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবেন।

রাজা উত্তানপাদের প্রথমা স্ত্রী শ্রীমতী সুরুচির পুত্র উত্তম বিবাহ করেন নাই। তিনিই ধ্রুবের বিমাতা-পুত্র ছিলেন। উত্তম এক অরণ্য অভ্যন্তরে মৃগয়া করিতে গিয়া যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন; এই শোকে সুরুচিও প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ধ্রুবের বিমাতার অপরাধের এতদিনে প্রায়শ্চিত্ত হইল; ইতিপূর্ব্বেই সুরুচির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছিল, ইতিপূর্ব্বেই তাহার বৃথা গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল, রাজা উত্তানপাদ ইতিপূর্ব্বেই তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এবারে তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত ঘটিল। ধ্রুব তাঁহার বিমাতা ও বিমাতা-পুত্রের মৃত্যু সম্বাদ শ্রবণ করিয়া রাজোচিত ধর্ম্মানুসারে, ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত বিধানমতে, যক্ষ সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গমন করিলেন। যক্ষের রাজধানী কোথায়, পাঠকদিগের তদ্বিষয়ে কৌতূহল নিবারণ জন্য, মূল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যক্ষরাজ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে লিখিত আছে, "রাজকুমার ধ্রুব ক্রমাগত উত্তরমুখে গমন করিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া এক পুরী দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তথায় অসংখ্য শিবানুচর ও গুহ্যকগণ অবস্থিতি করিতেছেন। মহাবাহু ধ্রুব সেই পুরীর নিকট উপস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন; তাহাতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল এবং যক্ষকামিনীগণ চমকিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর সেই শঙ্খ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রধানতম যক্ষ যোদ্ধাগণ বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইল।"*

আমি অনেক সময়ে লিখিয়াছি, বর্ত্তমান সিমলা শৈলের স্থান বিশেষ একদা যক্ষরাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইংরাজেরা অপভ্রংশে উহাকে (Jacko Hills) যেকো পর্ব্বত কহিয়া থাকে। তথাকার প্রাচীন পার্ব্বতীয় লোকেরাও ইহাকে যেকো পাহাড় বলে। যক্ষ শব্দের অপভ্রংশে যেকো শব্দ ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, অনেক প্রকার উপদ্রবের পর, ধ্রুব যক্ষগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন। এই সংগ্রামে যে সকল অস্ত্র প্রয়োজিত হইয়াছিল, তাহার নাম শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে, তদ্যথা—লৌহমুখ মুদ্গর, খড়্গ, প্রাস, শূল, টাঙ্গি, শক্তি, দ্বিধার খড়্গ, বিচিত্র পক্ষশর, ভল্লাস্ত্র, মায়া, নারায়ণাস্ত্র প্রভৃতি।

মহা সমরের সমাচার পিতামহ মনুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ধ্রুবকে এই যুদ্ধের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। অনেক কথা কহিয়া মনু মহোদয় কহিলেন "হে পুত্র! যে ব্যক্তি মহতের প্রতি উপেক্ষা, নীচের প্রতি কৃপা, সমানের সহিত মিত্রতা এবং সকল প্রাণীতে অভিন্নভাব প্রকাশ করে, সকলের আত্মা স্বরূপ শ্রীহরি সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রসন্ন থাকেন। ভগবান সুপ্রসন্ন হইলেই মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক গুণ সমূহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, সুতরাং গুণকার্য্য স্বরূপ লিঙ্গশরীর হইতেও মুক্ত হইয়া সুখময় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে পুত্র! ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য উদ্ভাবন করা সহজ নহে। ভগবান অব্যক্ত, সুতরাং অপ্রমেয়। তিনি অভক্ত ও অবিশ্বাসী এবং সংশয়বাদীর পক্ষে মৃত্যু স্বরূপ, কিন্তু ভক্তদিগের সম্বন্ধে তিনি অমৃত ও অমরত্ব। তুমি

* শ্রীমদ্ভাগবত। হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। (বাঙ্গালানুবাদ। ২০১ পৃষ্ঠা) কলিকাতা, ১৩০৬ সাল।

এক্ষণে সর্ব্ব প্রথমে যুদ্ধে হত ও আহতগণের জীবন দান করিয়া ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম কর। তোমার পক্ষে সাংসারিক কার্য্য সমূহ প্রায় শেষ হইয়াছে, তুমি ভগবানে পুনরায় তন্ময় হও। এইবারে তোমার মুক্তির অবস্থা উপস্থিত।" মনু মহারাজা ধ্রুব কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া প্রস্থান করিলে পর ধ্রুব যক্ষরাজকে নবজীবন দান করিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ও তপঃ-শ্রেষ্ঠ যক্ষ ধ্রুবকে আশীর্ব্বাদ দিয়া কহিলেন, "শ্রীহরিপদে তোমার সুমতি সম্বর্দ্ধিত হউক।" যক্ষের শুভাশীর্ব্বচন সভক্তি শিরোধার্য্য করিয়া ধ্রুব তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পুত্র যথোচিত বয়ক্রম ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে ধ্রুব তাহাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কেবল হরিপদে চিত্ত সমাধান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাসে অতীব অপূর্ব্ব, অতীব অসাধারণ এবং অত্যন্ত বিস্ময়োৎপাদক। মহাযোগী ও বিপুলকীর্ত্তি ধ্রুবের পবিত্র জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক অতিশয় অদ্ভুত। ভগবৎগীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা কখন অসত্য হইতে পারে না; আমার বদন-বিনিসৃত বচন চিরকালই নিশ্চয় ও যথার্থ।" ব্রহ্মবাক্য (শাস্ত্রবাক্য) এবং পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা যে সত্বরে বা বিলম্বে পরিপূর্ণ হয়, ধ্রুবের জীবন তাহার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান তাঁহার ভক্তবৃন্দকে কেমন প্রিয়তর ভাবিয়া থাকেন, কেমন অসাধারণ কৃপাবর্ষণ করিয়া থাকেন, কেমনে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন, ধ্রুবের জীবন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরমার্থ সাধকজনগণ পরিণামে কিরূপ অত্যুচ্চ পবিত্র স্থানাধিকার করিতে সমর্থ হয়েন, কিরূপে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত পরাজয় করিয়া জীবন্মুক্তাবস্থায় স্বশরীরে ত্রিদিব ধামে প্রয়াণ করিতে পারক হয়েন, ধ্রুবজীবননাটকের শেষাঙ্ক তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। শ্রীমৎ ভাগবত শাস্ত্রে লিখিত আছে, পরমারাধ্য পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া অতীব পুলকিত অঙ্গে এবং দ্রবীভূত হৃদয়ে ধ্রুব দেখিলেন, নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দশদিক সমুজ্জ্বল করিয়া নভোমণ্ডল হইতে এক বর্ণনাতীত শোভাময় বিমান সমাগত হইতেছে। এই অত্যন্ত সুন্দর বিমান নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহাতে দুই চতুর্ভুজ শ্যামবর্ণ তরুণবয়স্ক দেবশ্রেষ্ঠ হস্তস্থিত গদায় ভর দিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাদের অরুণবর্ণ নয়ন যুগল পদ্মের ন্যায় অতি মনোহর ভাবে দৃষ্ট হইতেছিল। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, সুন্দর কিরীট, বলয়, অঙ্গদ, কুণ্ডল প্রভৃতি দেখিয়া ধ্রুব বুঝিলেন, তাঁহারা শ্রীহরির কিঙ্কর। শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যান-পরায়ণ ধ্রুব, শ্রীহরির নামোচ্চারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। পরমেশ্বরের প্রিয় কিঙ্করগণ ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে রাজন্! তোমার জয় হউক, তোমার মঙ্গল হউক। আমরা যাহা কহিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে নরনাথ! ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের অনন্তকাল কল্যাণেচ্ছু, ভক্তগণ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। ভক্ত হইয়া সাধক হইলে তাঁহারা ভগবানের প্রিয়তর হয়েন, আর যাঁহারা যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানী, তাঁহারা তাঁহার প্রিয়তম। তুমি যোগীবর হইতেও উচ্চতর, তুমি সমস্ত জীবন শ্রীহরির চরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়াছ; শ্রীহরি ভক্তের কামনা অপূর্ণ রাখেন না, তিনি প্রতিশ্রুত বাক্য প্রতিপালন করিতেও পরা-

মুখ হয়েন না। তোমাকে তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা পরিপূর্ণ হইবে। ঈশ্বর ফলদাতা, তিনি মানবগণকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন; অদ্য তোমার পুণ্যময় পবিত্র জীবনের সাধু কর্ম্মাবলীর পূর্ণ ফল তোমাকে প্রদত্ত হইবে। হে নরনাথ! তুমি পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঘোরতর তপস্যা ও ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা জগতের আত্মাস্বরূপ দেব দেব শ্রীহরিকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলে; বহির্জগৎ ভুলিয়া অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তুমি সেই পরমাত্মাকে পরম পূজনীয় ভাবে ধ্যান করিয়াছিলে; তুমি আহার, নিদ্রা, পরিচ্ছদ, বিলাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া গহন বনে শীত, রৌদ্র, বর্ষা, হিম প্রভৃতিকে তুচ্ছ করিয়া; সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প ইত্যাদির ভয় না করিয়া; রাজপ্রাসাদ, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুখ, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদিকে উপেক্ষা করিয়া, প্রাণের প্রাণ ভগবানকে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করিয়াছিলে, এই অনন্যসাধারণ তপস্যা জন্য শ্রীহরি আমাদিগকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন; আমরা তাঁহার কিঙ্কর, এই বিমানে তুমি আরোহণ কর, আমরা তোমাকে এই উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বিমানে বসাইয়া জগদীশ্বরের শ্রীচরণ সমীপে লইয়া যাইব। এই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্যই আমরা এস্থলে সমাগত হইয়াছি।" অতঃপর ধ্রুব পবিত্র জলে স্নান করিয়া নিত্য মাঙ্গলিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক মুনিগণকে প্রণামকরতঃ এবং আশ্রম ও বিমানকে প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীহরির কিঙ্করগণকে প্রণাম পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিলেন। দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও প্রণব সমূহ হইতে সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হইতে লাগিল; গন্ধর্ব্বগণ শ্রুতি-মধুর সঙ্গীতে দিকসমূহ প্রমোদিত করিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে কুসুম বর্ষণ হইতেছে দৃষ্ট হইল। স্বর্গীয় বিমান শূন্য পথে অনেক দূর গমন করিলে পর ধ্রুব দেখিলেন, অগ্রবর্ত্তী এক সুন্দর রথে তাঁহার গর্ত্তধারিণী সুনীতি স্বর্গধামে গমন করিতেছেন। পাঠক মহাশয়েরা এক্ষণে বুঝিয়া লউন, যদিও সুনীতি সুচরিত্রবলে স্বর্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপদের তিনি অধিকারিণী ছিলেন না। বিষ্ণুধাম নামে স্বর্গের যে অত্যুচ্চ লোক আছে, তথায় সুনীতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এতাদৃশ সৌভাগ্য কেবল কুলপাবন পুত্রের গুণে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুণ্যবান পুত্রের গুণে পিতৃকুল ও মাতৃকুল এতদুভয় কুলই গৌরবান্বিত ও সৌরভান্বিত হইয়া উদ্ধার হয়েন। পণ্ডিতপ্রবর চাণক্য লিখিয়াছেন, শত শত তারকা যে জ্যোতি বিস্তার করিতে পারে না, এক চন্দ্র অপূর্ব্ব জ্যোতি বিস্তার করিয়া তমহরণ করেন। তদ্রূপ শত শত মূর্খ, অবাধ্য ও অসচ্চরিত্র পুত্রগণ মাতৃকুল বা পিতৃকুলের কোন উপকারেই আসে না, পরন্তু এক মাত্র কুলপাবন পুত্র পিতামাতার মুখোজ্জ্বল করেন।

ধ্রুব এইরূপে ত্রিলোক ও সপ্তর্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া তদূর্দ্ধে অবিনশ্বর বিষ্ণুপদে আরোহণ করিলেন। বিষ্ণুপদ স্বীয় তেজ দ্বারা প্রদীপ্ত হইতেছিল। উহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য লোক সকল উহার অমিত তেজ দ্বারাই প্রতিভাত হইয়া থাকে। যাহারা প্রাণীগণকে দয়া না করে, তাহার কখন ঐ পদ প্রাপ্ত হয় না। যাঁহারা দিবারাত্র প্রাণীগণের মঙ্গলসাধন করেন, তাঁহারাই উহাতে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা শান্ত, সমদর্শী, শুদ্ধস্বভাব, সকল প্রাণীর মনোরঞ্জক এবং যাঁহার শ্রীহরির প্রিয়পাত্র, তাঁহারাই কেবল অনায়াসে ঐ পদে আরোহণ করিতে পারেন। যাহা হউক,

উত্তানপাদ-তনয় কৃষ্ণ-পরায়ণ ধ্রুব পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রিলোকের সমুজ্জল চূড়ামণি স্বরূপ হইয়া যে দিব্য স্থান লাভ করিলেন, জ্যোতিশ্চক্র সেই পদে বদ্ধ হইয়া মেধীবদ্ধ বৃষভের ন্যায় সর্ব্বদা ভীষণ বেগে ভ্রমণ করিতেছিল। উহা চরাচরে ধ্রুবলোক নামে প্রখ্যাত। ঐ অপূর্ব্ব স্থানে চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোকের প্রয়োজন নাই, পরম ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় কৃপাবলে তাঁহার সত্বাই ঐ স্থানের দিবা ও রাত্রির আলোক। তথায় সর্ব্বরী নাই, অশুদ্ধতা নাই, যাহা কিছু দেখ, তাহাই জ্যোতির্ম্ময়, তাহাই পবিত্রতাময় এবং তাহাই মধুরতা ও মনোহারিত্বের আকর। ঐ পরম পদে ধ্রুব উপস্থিত হইলে মর্ত্ত্যধাম হইতে নারদ ঋষি প্রজাপতিদিগের যজ্ঞস্থলে বীণাবাদন করিতে করিতে কহিলেন, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন ক্ষত্রিয় যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, কোন ব্রহ্মদর্শী পুরুষ যে গৌরব ও সৌরভ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, ভক্তিগুণ-দ্বারা ধ্রুব তাহা সমাধা করিয়া, ত্রিসংসারে অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন।

পাঠক মহাশয়! পরম পবিত্র ধ্রুবচরিত্র সমাপ্ত হইল। এরূপ কুলপাবন পুত্র, এরূপ মহাযোগী, এবম্প্রকার ভক্তাধিক ভক্ত ও এতাদৃশ চরিত্র, সনাতন আর্য্য হিন্দু জাতিতেই সম্ভব এবং সেই জন্যই হিন্দুর ইতিহাসে এরূপ চরিত্রের সংখ্যা অগণ্য। সমস্ত জগতের জ্ঞান ও ধর্ম্মকে একত্র করিলে যাহা না পাওয়া যায়, এক হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাপেক্ষা শতগুণে সহস্রগুণে অধিক জ্ঞান ও অধিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, ধ্রুব শব্দের অর্থ নিশ্চয়। নামে যেমন "ধ্রুব" কার্য্যেও তেমনি ধ্রুব, বিশ্বাস ও ভক্তিতেও তিনি তদ্রূপ ধ্রুব। ধ্রুবের পরমেশ্বর-ভক্তি সদা সর্ব্বদা ধ্রুব, শ্রীহরিতে তাঁহার বিশ্বাস অত্যন্ত নিশ্চয়। তাঁহার মন নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় সুস্থির, হরিভক্তিতে তিনি সমস্ত জীবন নিশ্চল ও সুদৃঢ়। ইহারই নাম প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রকৃত ভক্তি। সূর্য্যোদয়ে যাহাদের হরিভক্তির উদয় হয় এবং পশ্চিম-প্রান্তে দিননাথের অস্ত গমনাবস্থা দর্শন করিবার পূর্ব্বেই সেই ভক্তির লোপ হয়, তাহারা হরিভক্তির মর্ম্ম জানে না; সুখকরী দশায় যাহারা পরমেশ্বরপরায়ণ হইবার ভান করে এবং কিঞ্চিৎ দুঃখকর অবস্থাকে দর্শন করিয়াই যাহারা "ঈশ্বর নাই, ধর্ম্ম নাই, সকলই মিথ্যা" বলিয়া ব্যাকুল হয়, তাহারাও প্রকৃত বিশ্বাসী নহে। ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রকৃত ভক্তি জন্মিলে তাহা আর যাঁহাদের হৃদয় হইতে কোন প্রকারে লুপ্ত হয় না, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যাঁহারা শ্রীহরিকে একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত। ইহাঁদের মানস-সরোবরে শ্রীহরির পদকমল সদা সর্ব্বদা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া বিরাজ করেন। ধ্রুবের হরিভক্তি তদ্বৎ ছিল, সুতরাং ভক্তজনোচিত পুরস্কার তিনি অর্জ্জন করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন।

এই ঘোরতর নিরানন্দময় নিরাশার দুর্দ্দিনে, বিবেক-বিপর্য্যয় বশতঃ এই ঘোরতর ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ বিভ্রাটের অপকালে, যদি আমরা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া পবিত্র ধ্রুবচরিত্র অধ্যয়ন করি, তাহা হইলে অসংখ্য অতি-উৎকৃষ্ট উপদেশের মধ্যে নিবিড় অমারাশি-সমন্বিতা রজনীতে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকার ন্যায়, একটী আনন্দময়ী আশার আলোকে স্নিগ্ধ-প্রাণ হইতে পারি। যে অসাধারণ সামর্থ্য-শালী জাতির পঞ্চবর্ষ বালকেরা পর্য্যন্ত এতা-

দৃশ অমিত অধ্যবসায়, অনির্ব্বচনীয় হরিভক্তি, অতুলনীয় মহত্ব, অবর্ণনীয় তেজ এবং দেবোপম ধর্ম্মপরায়ণতা দেখাইতে পারে, যে জাতির শিশুগণ পর্য্যন্ত এবম্প্রকার অটল অচল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব রূপে পরিণত করিতে পারে এবং পরিণামে পরাৎপর পরব্রহ্মকে পর্য্যন্ত সুদৃঢ় ভক্তিরজ্জুতে বন্ধন করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে সমর্থ হয়, সে জাতির নাম পৃথিবীর ইতিহাস হইতে লুপ্ত হওয়া কি সম্ভবপর? সেই জাতির পবিত্রা মাতৃভূমির নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অপনোদিত হওয়া কি অসম্ভব হইতেও অসম্ভব নহে? যে জাতিতে মহাযোগী, বালযোগী, ভক্তাধিক ভক্ত, আদর্শ সাধক ধ্রুবের জন্ম, সেই শাশ্বত হিন্দুজাতি ধরাধাম হইতে লুপ্ত বা গুপ্ত হইতে পারে না। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরের অতীব প্রিয় এবং পরমেশ্বর স্বয়ং ইহার রক্ষক ও পালক। (:) মুসলমানের কোরাণ ও শাণিত কৃপাণবলে যে বিক্রমী হিন্দুজাতির আর্য্যধর্ম্ম লোপ পায় নাই; বৌদ্ধ ও জৈনের পরাক্রমে যাঁহারা দমিত হয়েন নাই; নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, মতিভ্রষ্ট ও হিন্দুবিদ্বেষী নবনব সমাজ বা সম্প্রদায়ের অনাচারে যে প্রাচীন ও প্রবল হিন্দু জাতি মুহূর্ত্তকাল জন্যও বিচলিত হয়েন নাই, অথবা সমগ্র জগদ্ব্যাপী খ্রীষ্টানদিগের এবং পাদ্রীপুঙ্গের অগণ্যাগণ্য কৌশল, ছলনা, প্রলোভন ও পরাক্রমে যে ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুজাতি কুবের নামক ভুবনবিখ্যাত বটবৃক্ষের ন্যায় সুস্থির, অটুট ও অচল আছে, ভাবিয়া দেখ, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কত দূর সারবান, কতদূর শ্রীতেজপূর্ণ এবং কত সুদৃঢ়!! পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও হিন্দুধর্ম্মের কণামাত্র ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। সমস্ত জগৎ যদি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় (তাহাও অনেকবার হইয়াছে) তথাপি হিন্দুধর্ম্ম যেমন আছে, তেমনই থাকিবে, ইহা নিশ্চয় হইতে নিশ্চয়তর। পৃথিসৃষ্টির প্রাক্কালে (আদিতে) একই ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, তাহাই সনাতন ও শাশ্বত হিন্দুধর্ম্ম; ক্রমে দেশ-কাল-পাত্র-প্রভাবে, যুগ-যুগান্তরে, অন্যান্য ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া পৃথিবীতে নানাবিধ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। একই হিন্দুজাতি হইতে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি এবং একই হিন্দুধর্ম্ম হইতে জগতের সমুদয় ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, পরিণামে এই সমুদয় শ্রেণী ও সম্প্রদায়, এই সমুদয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম, এই সমুদয় জাতি ও উপজাতি, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রভাবে পরাজিত হইয়া, নদ নদী সমূহ যেমন গিরিগাত্র হইতে নির্গত হইয়া, সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতে করিতে অবশেষে মহাসাগরে পতিত ও সম্মিলিত হইয়া নাম ও উপাধি লুপ্ত হয়, তদ্বৎ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-জাতিতে সমুদয় জগৎ একত্রিত হইয়া সেই আদি মূল ধর্ম্মের গৌরব ও সৌরভ রক্ষা করিবে। সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

[ ] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের বহু নামের মধ্যে "সনাতন ধর্ম্মরক্ষক" নামটী অতীব মধুর। লেখক

# পঙ্কোদ্ধার।

"এ ত কথার কথা নয়রে ও ভাই! ভাবের কথা নয়,
জীবনে দেখা'তে হবে যুগান্ত প্রলয়।"

সেদিন জনৈক অতি সম্ভ্রান্ত-বংশ-সম্ভূত পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক বাঙ্গালী জেলার-কালেক্টর বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শার্দ্দুল মানে ত শেয়াল ?" পাঠক আর কি চা'ন ? ভারতোদ্ধারের আর কয়দিন বাকী, এইবার হিসাব করিতে বসুন। মাগো বসুন্ধরে! দ্বিধা হও মা! তোমাতে প্রবেশ করিয়া এ কালামুখ লুকাই। যম ভুলিয়া আছে, শীঘ্র ত এ পোড়ারমুখ দাহন করিবার অবকাশ দিবে না, কাজেই মাতা ধরিত্রী বিদীর্ণা হইয়া ক্রোড়ে স্থান না দিলে, আর এ হতভাগার উপায় নাই।'

উক্তরূপ সুসন্তান বঙ্গমাতার ক্রোড়ে বিরল নহে ; ব্যাঘ্রকে শৃগাল না বলুন, কিন্তু মাতৃ-ভাষায় দুই ছত্র লিখিতে গলদঘর্ম্ম হয়, এরূপ স্বদেশবৎসল আমাদের হোম্‌রা-চোম্‌রা নেতাদের মধ্যে অনেকেই। ইঁহারা গৃহিণীর সহিত প্রিয়সম্ভাষণ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে মাতৃ-ভাষা ব্যবহার করেন না, করিতে পারেন না, করিতে জানেন না ; হয়ত গৃহিণীকেও "মাইডিয়ার" "মাইডারলিং" বলিয়া সম্বোধন করিতেই বেশী রাজী। ইহার কারণ বেশী দূরে খুঁজিতে হইবে না ; ইহারএকমাত্র কারণ মাতৃ-ভূমির জন-সাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের প্রকৃত সহানুভূতি সমবেদনা নাই, তাহাদের দুঃখ অনুভব করিতে উঁহারা চাহেন না, হৃদয়ের অপ্রশস্ততা-বশতঃ তদুপযুক্ত শক্তিরও অভাব ; কাজেই তাহা সম্যক বুঝিবার ও দূর করিবার মাতৃ-ভাষা-চর্চ্চা-রূপ উপায় অবলম্বনে পরাঙ্মুখ। দেশের আপামর-সাধারণে কিরূপ ভাবিতেছে, তাহাদের অভাব কি, আকাঙ্ক্ষা কি, দৌড় কত দূর ইত্যাদি প্রকৃষ্ট রূপে পর্য্যালোচনা করতঃ তাহাদের শক্তির সাহায্য গ্রহণে অভিলাষ থাকিলে, তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার ইচ্ছা থাকিলে তবে ত ওদিকে নজর পড়িবে ; নচেৎ শুধু লোক দেখান যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের নিকট কালীঘাটের চণ্ডীপাঠের মত মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত আর কি আশা করা যাইতে পারে ? যদি কেহ বলেন, উক্ত গুণধরগণের ঐ গুণগুলি যে নাই, তাহা কে বলিল ? "সন্ন্যাসী চোর না, দ্রব্যে ঘটায়," মাতৃ-ভাষার প্রতি এরূপ বিজাতীয় উদাসীন্যই তাহার সম্যক্ প্রমাণ। কে কোথা কবে শুনিয়াছে যে, দেশীয় ভাষা, দেশীয় সাহিত্য জলাঞ্জলি দিয়া কোন জাতি পৃথিবীতে উন্নত পদবী লাভ করতঃ গণ্যমান্য হইয়াছে ? জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া জনকতক তথাকথিত শিক্ষিত মাতব্বর লোক লম্বা লম্বা বিদেশী বচনের বুক্‌নি ঝাড়িতে পারিলেই যদি দেশোদ্ধার হইত, তাহা হইলে উহা নিতান্ত সস্তার সামগ্রী, সন্দেহ নাই ; কেন যে এতদিন অসম্পন্ন রহিয়াছে, ইহাই দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয়। তাহা যখন অসম্ভব, তখন সেই জন-সাধারণকে লইয়া উঠিতে গেলে তাহাদের সহিত প্রাণের ঘনিষ্ঠতা চাই, বুক চিরিয়া তাহাদিগকে হৃদয়ে আসন দিতে হইবে ; পরন্তু সে একপ্রাণতার সত্তা যদি

কোথায়, যেখানে তাহাদের ভাষায় অনভিজ্ঞতা?

মাতৃ-ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদেশীয় রাজ-ভাষার প্রতি অযথা সমাদর আমাদের অধঃপতনের যে একটী প্রধান কারণ, তাহা বোধ হয় আজ কাল অনেকেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহারই ফলে জাতীয়-বিদ্যামন্দিরের পত্তন। আশা করা যায়, ক্রমে উহা উন্নত হইয়া দেশের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবে।

দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা ভাবিতে যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়, প্রাণ সর্ব্বদা ধড়ফড় না করে, চক্ষের জলে অনবরত বুক না ভাসিয়া যায়, এরূপ নেতৃবর্গের দ্বারা যে কখন কোনই কাজ হইবে না, ইহা বলা বাহুল্য। এরূপ নেতাদের কথা অনেক সময় বিরলে ভাবিয়াছি, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কোথাও কিছু বলিবার ইচ্ছা হয় নাই; "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল" বিবেচনা করিয়া এতকাল নীরবেই ছিলাম। বিশেষ মনে হইত, চালাইবার লোক কোথায় যে নেতার আবশ্যক? "যেমন উনুনমুখো দেবতা তেমনি ঘুঁটের নৈবেদ্য," আমরা যেমন কাঁসারী-পাড়ার সং, আমাদের পরিচালকগণেরও তেমনি ঢং, যৎ-যেন-যুজ্যতে হইয়া বেশ সুন্দর চলিতেছে, টীকাটিপ্পনীর প্রয়োজনাভাব। কিন্তু বর্ত্তমানে যখন প্রকৃত স্বদেশ-সেবকের দল গণনার মধ্যে আসিয়াছে, তখন উপযুক্ত নেতার নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং কিছু বলিতে হয়।

আমাদের এই বয়সে কত দিকে, কত রকম নেতার উত্থান পতন দেখিলাম; এক জনও শেষ পর্য্যন্ত সমান ভাবের দলের সম্মান ভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। ছোট-খাটো দল লইয়া বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন, যাই দল পুষ্ট হইল, অমনি নেতার পতন, কেউ মানে, কেউ মানে না। ইহার একমাত্র কারণ, সরল প্রাণে কায়মনোবাক্যে কেহ কখন নেতৃত্বের ব্রত গ্রহণ করেন নাই। কোন বিষয়ে নেতা হইবার তিনিই উপযুক্ত, যিনি এক ধ্যানে এক জ্ঞানে কেবলমাত্র সেই বিষয়টীকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া রাখেন; উপরে ঈশ্বর, নীচে তিনি ও তাঁহার উদ্দেশ্য, এই তিনটী ব্যতীত চতুর্থ পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার নিকট অবিদ্য-মান, জাগরণে, শয়নে, স্বপনে তিনি আর কিছুই দেখেন না, আর কিছুই ভাবেন না। এবম্প্রকারের নেতা ভিন্ন সংসারে কোথাও কোন কাজ উদ্ধার হয় নাই, হই-বার নহে। আজ যদি আমাদের মধ্যে এমন একজনও পাওয়া যাইত, যিনি কোন প্রকার স্বার্থ বা করতালির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অকপটচিত্তে প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত দেশের লোককে জাগাইতে যত্নবান হইতেন, তাহা হইলে হিমালয় উৎপাটিত হইত, আকা-শের চাঁদ খসিয়া পড়িত, দেশোদ্ধার ত সামান্য কথা!

উল্লিখিত-রূপ অনন্যচিন্তাযুক্ত নেতার আত্মাভিমান অসম্ভব। তিনি দেশের দীন-দুঃখীর সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। জন সাধারণের মর্ম্মপীড়ায় এতই পীড়িত যে, নিজেকে কোন বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিতে তিনি কখনই পারেন না। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তা কাঙ্গালের, আর্ত্তের, বিপন্নের, অস-হায়ের। তিনি দিবারাত্রি হা-হতোস্মিরবে কাঙ্গালেশ্বরকে স্মরণ করিয়া বিপদভঞ্জনের

দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া কর্ত্তব্যের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার সভা নাই, সমিতি নাই, বক্তৃতা নাই, আড়ম্বর নাই। তিনি মানুষ-টানা গাড়ী চা'ন না, ফুলের মালা চা'ন না, অভিনন্দন চা'ন না, বাহাবা চা'ন না, সামান্যআদর অভ্যর্থনারও তোয়াক্কা রাখেন না;—গভীর বেদনায় তাঁহার প্রাণ অস্থির, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য সেবা, সাহায্য, উদ্ধার। তাঁহার জমীদারী নাই, তেজারতী নাই, বারিষ্টরী নাই, ওকালতী নাই, ডাক্তারী নাই, ব্যবসায় নাই, বাণিজ্য নাই, পদ নাই, মর্য্যাদা নাই। তাঁহার আছে সুদীর্ঘ হস্ত কর্ম্মের জন্য, আছে প্রশস্ত হৃদয় প্রেম বিলাইবার জন্য, আছে অবনত মস্তক ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য। তিনি অবতার ন'ন, তিনি দেবতা ন'ন, তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জীব ন'ন, তিনি প্রতিভাশালী পুরুষ ন'ন; তিনি মাতৃপূজক, তিনি ভ্রাতৃ সেবক, তিনি স্বদেশবৎসল, তিনি মহাব্রতধারী যোগী। এক কথায় তিনি সত্যের জীব, মিথ্যা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রেম সত্য, সরলতা সত্য, জীবের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা সত্য, জগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সত্য, পারার্থপরতা সত্য; অপ্রেম মিথ্যা, কপটতা মিথ্যা, পরাধীনতা মিথ্যা, অকল্যাণ মিথ্যা, স্বার্থপরতা মিথ্যা। বিধাতার আশীর্ব্বাদে, স্বদেশ-সেবকদিগের একাগ্রতার বলে, আমাদের সৌভাগ্যে যদি এবম্বিধ জীবের আবির্ভাব হয়, তবেই এই হতভাগাদের উদ্ধার সম্ভব, নচেৎ সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে, আসরে নামিয়া গান গাওয়া আর ঘটিবে না। নেতার একটা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে এতই প্রবল তড়িচ্ছক্তি প্রবাহিত হইবে যে, তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক "মাভৈ" "মাভৈ" রবে জ্বলন্ত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করতঃ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেঃ—তবে ত তিনি নেতা!!

মুখে আমরা বলি যে, ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীকরণ জন্যই আমাদের চেষ্টা, কারণ কথাটা খুব লম্বা চৌড়া; বলিতে ভাল, শুনিতে ভাল, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাটে না। বক্তৃতাদিতে কতরকম তালিকা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া থাকি, দুর্বিসহকর-ভারাক্রান্ত ভারত-প্রজার কত অভাব, কত ক্লেশ, কি রূপ ভীষণ দৈন্য, দেশময় দুর্ভিক্ষ, মহামারীর কি ভয়ানক প্রাদুর্ভাব! যাহাদিগকে শুনাইবার জন্য এসকল প্রচারিত হয়, তাহারা ত উহা আদৌ গ্রাহ্য করে না, কাণে ঠুসি দিয়া বসিয়া অহোরাত্র কেবল আপন গোণ্ডাই গণিতেছে; তবে এ চীৎকারে ফল কি? যাহাদের জন্য এই ওকালতী করা হইতেছে, তাহারা যদি উহার মর্ম্মগ্রহণ করতঃ জাগরিত হইয়া আমাদের সহিত একপ্রাণ হয়, সেইটাই আসল কাজ; পরন্তু সে উদ্দেশ্য সাধনের কি কোন চেষ্টা হইয়াছে বা হইতেছে? কংগ্রেস-মণ্ডলে, প্রদর্শনী-প্রাঙ্গনে বা অন্য কোথাও কি এমন কিছু করা বা দেখান হয়, যাহাতে দুঃখী বিপন্ন ভাইগুলি বুঝিতে পারে যে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য আমরা ব্যাকুল ভাবে যত্ন পাইতেছি? ঘোর অদৃষ্টবাদী সেই মূর্খ ভ্রাতাদিগকে তাহাদের দুর্দ্দশা, তাহার মূলীভূত কারণ এবং তাহা হইতে উদ্ধারের উপায়াদি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদানের কথন কোন চেষ্টা করা হইয়াছে কি? বিগত কন্‌গ্রেসে মহামান্য দাদাভাই নৌরোজীর শ্রীমুখ হইতে এ বিষয় প্রথম প্রস্তাব শুনা গেল; কিন্তু সে দিকে কিছু কাজ করিবার

চেষ্টা কি আরম্ভ হইয়াছে বা হইবার আশা আছে? বিষম পরিতাপের বিষয় যে, এই মোটা কথা বলিবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া জরাগ্রস্ত দাদাভাইকে আসিতে হইল; বহুপূর্ব্বে ইহা আমাদের গভীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত ছিল। প্রায় দশ বৎসর হইল নব্যভারতে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; তদনুসারে বর্ত্তমান লেখক কয়েকটী বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে অনেক কাঠ খড় ব্যয় করিয়া প্রধান নেতা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-লাভ করতঃ পরামর্শ করে; তিনি মুখে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, তাঁহার কথাগুলিতে রস মাত্র ছিল না, সমস্তই ভাসা ভাসা, কাজেই জল্পনা কল্পনা সমূহ বানের জলে ভাসিয়া যায়। বাঁড়ুয্যে সাহেব স্বর্গে গিয়াছেন, দাতাভোক্তা লোক ছিলেন, নানাদিকে বিস্তর খ্যাতি লাভ করতঃ ইহ-লোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সহিতও এক দিন কথা হয়:—যে সকল "পোলিটিকাল প্রিভিলেজ" জন্য এত লড়াই করিতেছেন, তাহা ভোগ করিবে কে? দেশের নিম্নশ্রেণী ত দুর্ভিক্ষে মহামারীতে পালে পালে জমালয়ের দিকে ছুটিতেছে, মধ্য-বিত্তগণ গ্রাসাচ্ছাদনের অনাটন বশতঃ কঙ্কাল-সার, নিধন প্রাপ্তির পথে থরতর বেগে ধাব-মান। যখন ঐ রাজনৈতিক স্বত্বগুলি করা-য়ত্ত হইবে, তখন তাহার ফলভোগ করিবার কেহ থাকিবে না, আপনারা জন কয়েক ভিন্ন।—সই কথা শুনিয়া তিনি যে ভাবে যে রূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আর পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব না, উহাতে হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ প্রভৃতি শব্দাড়ম্বর সহকারে আমরা যতই কেন আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া চীৎ-কার করি না, আমাদের মনের আসল কথা কি? আমরা কেবল চাই গোলামী—সাম্রাজ্যের বড় বড় রাজপদগুলি। ঐ মোটা মোটা সব চাকরী যে শ্বেতাঙ্গের একচেটিয়া, ইহাই আমাদের চক্ষুশূল, ঐ গুলি পাইলেই দেখ কন্‌গ্রেস এক প্রকার বন্ধ। তারপর মরুক চাষারা, জাহান্নমে যাউক শ্রমজীবীর দল, আমাদের রস্তা! আমাদের ছে'লেরা বড় বড় চাকরী পাইবে, থলী ভরিয়া ঘরে টাকা আনিবে, খুব নবাবী করিবে, দেশের লোকের উপর হুকুম জারী করিবে (১) পুত্রবধূ-গণ হীরামুক্তার অলঙ্কারের ভারে জেলখানার বেড়ীপায়ে কয়েদীদের মত হাঁটিবে, কো-ম্পানির কাগজে লোহার সিন্ধুক বোঝাই হইবে, আর দুঃখ কি রহিল!

বৃদ্ধেরা বলিতেন, বোধ হয় এখনও কোন কোন বৃদ্ধ আওড়াইয়া থাকেন, "যেমন তেমন চাকরী দুধ ভাত।" চাক্‌রী, চাক্‌রী, চাক্‌রী, সর্ব্বত্রই এই কথা। এই যে জাতীয় শিক্ষা-লয় হইয়াছে, এতৎ সম্বন্ধে বড় ছোট সকলেরই জিজ্ঞাস্য, "ইঁহাদের ছাত্রেরা ত সরকারী চাক্‌রী পাইবে না, তবে আর কি হইল?" দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমরা যত চাক্‌রী না পাই, ততই যে ভাল, এ কথা সহজে কেহ বুঝিতেছেন না। সবজজ, মুন্সেফ, ডিপুটী,

---

১) এই দেশের লোকের উপর হুকুমজারীর উচ্চাভিলাষ অনেকটা সর্ব্বনাশের কারণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বলে "হুকুমৎ" না থাকিলে মান সম্ভ্রম থাকে না। এই এক শ্রেণীর উপর অপরের আধি-পত্য করিবার লালসা পরিত্যাগ না করিলে আমাদের কল্যাণ নাই। ইহারই দোহাই দিয়া যে বিদেশীয়েরা আমাদিগকে পদদলিত করিতেছে, সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

জজ, মেজেষ্টর, ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি চাকরদিগের সহিত আলাপ করিলেই জানা যায়, তাঁহারা কোথায়। ঐ সকল চাকর প্রভুরা দেশের দীন দুঃখীদের কথা ত ভুলিয়াও মুখে আনেন না, ওদিকে খেয়াল ত আদবে নাই, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উপরওয়ালা হাকিমদের আলোচনা ভিন্ন অন্য কোন সংবাদই রাখিতে চাহেন না। সুতরাং ঐ সকল লোক দুঃখিনী ভারতমাতার সম্বন্ধে মৃত; আঃ! শুধু মৃত নয়, শটিত শবের কার্য্য করিতেছেন, নিজেরা ত কখন পরিবারের গণ্ডীর বাহিরে চিন্তা করবেনই না, অপরকেও নিজেদের বুদ্ধি প্রদানে যত্নবান। উঁহাদের গলিত দেহের দুর্গন্ধে দেশের বায়ু ভয়ানক দূষিত হইয়া নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি উৎপাদন করিতেছে; উঁহাদের সংশ্রবে পড়িয়া বহু উদ্যমশীল যুবক উৎসাহহীন হইয়া পথভ্রষ্ট অবস্থায় উঁহাদের সঙ্গে নাশের দিকে যাইতেছেন।

চাকরদের ব্যাধি সংক্রমণ দ্বারা যে দেশের জমীদার ও স্বাধীন ব্যবসায়ী উকীল ব্যারিষ্টর প্রভৃতি মহাপ্রভুগণকে গ্রাস করিতে বসে নাই, এমন কথা বলা যায় না। উঁহাদেরও অধিকাংশ রাজপুরুষদিগের পদলেহনকারীর দলে নাম লিখাইতে লজ্জা বোধ করেন না, এবং পারিবারিক গণ্ডীব বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অক্ষম। এই শ্রেণীর মধ্যে যে কতিপয় প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করা আমাদের সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু তদ্ব্যতীত আর সকলে যে চাকরদের অপেক্ষা কোন অংশে ভাল, তাহা কি প্রকারে বলি? ইঁহারাও হুকুমজারীর উদ্দেশে অনাহারী পদমর্য্যাদায় জন্য লালায়িত, ইঁহারাও হুজুরদের কথায় উঠেন বসেন, তাঁহাদের প্রীত্যর্থ দেশের লোকের ক্ষতিকর কার্য্যে যোগ দিতে দ্বিধা করেন না, তবে চাকর অপেক্ষা ইঁহারা কম কিসে?

দেশীয় নৃপতিবৃন্দ যেমন রেসিডেন্টের হস্তের ক্রীড়নক মাত্র, জমীদারগণ তেমনি জেলার কালেক্টরের ভয়ে থরহরি কম্পমান, কমিশনর লাট সাহেব ত দূরের কথা। এ ক্ষেত্রে দীন দুঃখীর কথা, ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা ভাবে কে? প্রবল-প্রতাপান্বিত মহামনা প্রশস্ত-হৃদয় অকুতোভয় বরোদাধীশ্বরের* কার্য্যকলাপ এই ঘোর অমাবস্যায় অন্ধকারে আমাদের আশার আলোক। অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যেশ্বরগণ এবং দেশের বড় বড় জমীদারগণ কি তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না! তাঁহার যেমন পদ, যেমন ক্ষমতা, যেমন হৃদয়, তেমনি পাহাড় উড়াইতেছেন, আমাদের স্বচ্ছল জমীদারগণ ত উইটিবিও সরাইতে পারেন। কোন্ সহৃদয় জমীদার তাঁহার রাইয়তবর্গের উন্নতিকল্পে সামান্য ব্যয় বা চেষ্টা করিতেছেন? আমরা যদি আমাদের আশ্রিত মুখাপেক্ষীদিগের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা না দেখাই, বৃটীশরাজ কেন তাঁহার আশ্রিত অধীন আমাদিগকে হাত ধরিয়া তুলিবেন? এ ত মোটা কথা, যেমন করিতেছি, তেমনি পাইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রাজনৈতিক সংসার যেন খেলাঘরের ঘরকন্না হইয়াছে,

---

* অবশেষে এতটা হইবে, জানিতে পারিলে সুরেন্দ্রনাথকে ডিস্‌মিস্ না করিয়া বঙ্গের ছোটলাটের গদিতে বসান হইত; এবং মহলার রাওকে পদচ্যুত না করিয়া দিল্লীর তক্ত দেওয়া হইত, এখন হাত কামড়াইলে আর হল কি? "ভুক্তে পশ্চাত্তি বর্ব্বরাঃ।"

ছেলেরা যেমন ছোট ছোট হাঁড়িকুঁড়ি, হাতা-বেড়ী, বাসন কোসন লইয়া নকল গৃহস্থালী করে, আমরাও ঠিক তাই করিতেছি; সুতরাং আমাদের ম্যাট্‌সিনী গারিবাল্‌দিও সেইরূপ জুটিয়াছে, উঁহাদিগকে লইয়া আমরা কত মধুর স্বপন দেখিতেছি, কত আশার কথা শুনিতেছি। খেলাঘরের খেলায় ত পেট ভরে না, ক্ষুধা পাইলেই ছেলেরা আহারের জন্য মায়ের কাছে দৌড়ায়; কিন্তু আমাদের মত গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত শিশুদের দেখিতেছি, ক্ষুধোধই নাই; আমরা ত পাকা হরিতকী খাই নাই যে, এ জন্মের মত জঠর জ্বালা নিবৃত্তি পাইয়াছে? তবে ক্ষুৎপিপাসার অভাব কেন পরিলক্ষিত হয়? ও! আমরা যে সম্মোহন জ্বরাক্রান্ত, জ্বরভোগ কালে ত ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিবারই কথা। তাই আমরা কেবল ধূলা খেলাতেই মত্ত; নকলেতেই মুগ্ধ, আসলের খোজ নাই।

আজব জায়গা ভারত, এখানে বন্ধ্যাও পুত্রবতী হয়, মূকেও গান করে এবং তাহা শুনিয়া বধির "বাহবা" বলিয়া হাততালি দিয়া নৃত্য করে। এদেশে যাহার এক ছটাকও রাজ্য নাই, কেবলমাত্র সাধারণ প্রজার অপেক্ষা বেশী পরিমাণ জমী রাখেন, এবং প্রত্যক্ষ ভাবে রাজসরকারে কর প্রদান করেন, তিনিও রাজা। শুধু রাজা? কেউ মহারাজা! কেউ রাজাধিরাজ! যেন আমাদের ভাষায় বাক্যাদির কোন প্রকার আভিধানিক অর্থই নাই, যা'র যা' ইচ্ছা থা'কে, তাই বলিয়া ডাকিলেই হইল! আমাদের দেশের যেমন মা বাপ নাই, জবরদস্তের হাতে খেলার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, মাতৃভাষাটাও কি সেইরূপ অসহায় পিতৃ মাতৃ হীনের মত যা'র তা'র হাতে যথেচ্ছ ব্যবহার পাইবার জিনিষ? ভাষার প্রতি অত্যাচারের কথা কি বলিব? —সসাগরা সদ্বীপা বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরা ভিক্টোরিয়াও মহারাণী, "কাশী নরেশের" মহিষীও মহারাণী, কাশিমবাজারের জমীদার-পত্নী স্বর্ণময়ীও মহারাণী; ভাওয়ালপুরের স্বাধীন নরপতিও নবাব, বঙ্গবিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব অধিপতির বংশধরও নবাব, ঢাকার গনীমিঞাও নবাব, আবার আবদুল লতিফ খাঁও নবাব। যে রাজ্যে এরূপ ব্যবস্থা, সেখানে আমেরিকার সম্বাদপত্রবিহীন সম্পাদকের মত দলশূন্য নেতার বা অভাব হইবে কেন? আমরা একজন নেতার জন্য কাঁদিতেছি, দেশে আজকাল অসংখ্য নেতা সমন্তাৎ ধাবমান। পরন্তু "গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে কোই।" ঐ সকল নেতার পশ্চাদ্গমন করে, এমন অনুচর পাওয়া যায় না, ইহাই দুঃখের বিষয়। চালাইবার লোক পান না, সুতরাং কাজের অভাবে ইঁহারা নানাস্থানে আসর জমাইয়া পরস্পরে গালাগালি করিতেছেন, এক অপরের মতামতের ছিদ্রানুসন্ধানে রত, এই কার্য্যেই ইঁহাদের নেতৃত্বের পর্য্যবসান। ভাল, যাহার যেমন বিদ্যাবুদ্ধি, ক্ষমতা, হৃদয়, তাহাকে তদনুসারে মত প্রচার করিতে দিলে ক্ষতি কি? গ্রামে আগুন লাগিলে যেমন তত্রত্য দলাদলীও তখনকার মত সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া অগ্নিনির্ব্বাণে পরিশ্রম করে, তদ্রূপ, এই ভীষণ রাজনৈতিক দাবানল মধ্যে আমাদেরও কি কর্ত্তব্য নয়?

আপাততঃ পুরাতন দাদাভাই-পন্থী ও নূতন ধর্-মার্-পন্থী দুই দলে বিসম্বাদ চলিতেছে। বৃদ্ধের দল প্রবীণের ন্যায় বাপু, বাছা, দাদা ভাই বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কার্য্যোদ্ধারে প্রয়াসী; নবীন যুবকের দল

চোরকে চোর বলিতে প্রস্তুত, তস্কর-বাবা বলিতে চাহেন না, ডাকাইতকে ডাকাইত বলিয়া ডাকেন, দস্যু-ধর্ম্মাবতার বলিয়া সম্বোধন করিতে ষোল-আনা নারাজ। নবীনের মতে মিষ্ট কথার দ্বারা ন্যায়ের দোহাই দিয়া কোন কাজ পাওয়া যাইবে না, কারণ চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, অতি পুরাতন ও সমীচীন নির্দ্দেশ; তদনুযায়ী ধর্ম্মকথা ত্যাগ করিয়া ভয়প্রদর্শন ভিন্ন কোনই লাভের আশা নাই; সুতরাং জবরদস্তী ব্যতীত কিছুই হাসিল হইবে না। বৃদ্ধেরা স্বাভাবিক সাত পাঁচ ভাবিয়া বহুগণনার পর কাজ করেন, যাহাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, এইরূপ তাঁহাদের চেষ্টা, যুবকগণ অত অগ্রপশ্চাৎ ভাবেন না, কারণ তাঁহাদের মস্তিষ্ক যৌবনের তেজে উষ্ণ, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বল শীতলতা এখনও তাহা হইতে অনেক দূরে। অবশ্য সকলই স্বীকার করিতে হইবে যে, হঠকারিতা নিন্দনীয় এবং অশুভফলপ্রদ, পরন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীতে যেখানে যখন যাহা কিছু অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাহা যুবকের আবেগময় মস্তিষ্কেরই দ্বারাই হইয়াছে। দেখা যাউক, দাদা-ভাই-পন্থীই বা কি করেন, ধর্-মার্-পন্থীর দ্বারাই বা কতদূর হয়। কিন্তু যেরূপ সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একটা উৎকৃষ্ট কিছু না করিতে পারিলে যে কোন ফল পাওয়া যাইবে, এমন ত বোধ হয় না। তবে ঈশ্বরের কৃপায় সব হয়, যদি প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি উভয়ের কল্যাণ হেতু রাজাকে সুমতি দিতে পারেন।

উপসংহারে আবার বলি, আমাদের মধ্যে কেহ কি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন, "এক-কোটী টাকার বিনিময়েও আমি স্বদেশ-বৎসলতা বিক্রয় করিতে পারি না; লাট্‌গিরি পদ তুচ্ছ করিয়া আমি ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনে ব্রতী থাকিব; 'ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং' আমার জপতপ, আমি অধর্ম্ম, অন্যায়, অত্যাচার নিবারণে কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারি না; কোন পার্থিব শক্তি আমার মুখ বন্ধ করিতে পারে না, আমার হাত ধরিয়া রাখিতে পারে না, আমি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেশের দুঃখ ঘোষণা করিব, ক্লিষ্ট বিপন্ন ভ্রাতৃবর্গের সেবা সাহায্যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিব; ঈশ্বর আমার সহায়! আমি মানবীয় সকল প্রকার শক্তিকে তৃণবৎ উপেক্ষা করি!" এই ত্রিশ-কোটীর মধ্যে এমন যদি কেহ থাকেন, আসুন, আমরা তাঁহার চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে নেতার পদে বরণ করিব, এবং তাঁহার আদেশে উত্তালতরঙ্গসমাকুল অপার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিব, দেখি পারে পঁহুছি কি অতল জলে প্রাণ হারাই। মা জগদম্বা আমাদিগকে রক্ষা করুন! শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

# ভূপ্রদক্ষিণের পত্র।

(১)

S. ARUA.
10·10 06
Lat 31. 4s Long. 33²s.

সাগর হইতে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা অনেক দিনই পাইয়া থাকিবে। সাগরের পরে আরো ১৬ ঘণ্টা আমাদের জাহাজ ষ্টিমার টানিয়াছিল। কালীচরণ বাবুর নাতির জন্য যদি এবার সাগর হইতে Diamond Harbourএ ফিরিয়া যাইতে না হইত, তাহা হইলেই সাগরে আসিয়াই Steamer আমাদিগকে ছাড়িয়া দিত। এরূপ ১৬ ঘণ্টা বেশী টানাতে Captain বলিল, আমাদের ১০ দিনের রাস্তা এগিয়ে গেল। সুতরাং আমাদের ২ দিন লোকসান হওয়ায় ৮ দিন লাভ হইল। মন্দ হইতে ঈশ্বর মঙ্গল আনিয়া দেন, তাহার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে ইহা একটী। ৪ সেপটেম্বরে হাওয়া আমাদের বিপরীত দিকে বহিতে লাগিল, তাহাতে আমাদের প্রায় ১০০ মাইল পথ ফিরিয়া যাইতে হইল। ইহাও কাপ্তেন বলে, ঈশ্বর-প্রেরিত—"That wind is a God-send" ইহা না হইলে হয়ত আমাদিগকে ঝড় তুফানের মধ্যে পড়িতে হইত, আমরা তাহা হইতে নিস্তার পাইলাম, Bay of Bengal উত্তীর্ণ হইলাম।

Steward বৃদ্ধ বাঙ্গালী মুসলমান, আমি ডাকিলে মহাশয় বলে উত্তর দেয়, ভুলে সাহেব বলিয়া ফেলিলে উলটিয়া লয়, আমাদের খাওয়া দাওয়ার বেশ যত্ন লয়। সকালে ৬টার সময় দুধ বিস্কুট ডিম ও ফল খাই। রোজ এক টিন করে ফল দু তিন বারে খাই, তাহার দাম ১৲ টাকার কম নহে, আপেল পোয়ার পিচ প্রন্ প্লম প্রভৃতি ফল থাকে। কাপ্তেন সাহেবের বাতাবি লেবু বড় প্রিয়, ৬০।৭০টা লেবু কিনিয়া আনিয়াছে, তাহা break-fast ও Dinnerএ খাওয়া হইয়াছিল, এখন তাহা ফুরাইয়াছে। ১০টার সময় Break-fastয়ে মাংস মাছ, দেশীয় রুটী, তরকারি থাকে, আমি ভাত খাইনা, প্রায় ১৷৷ পোয়া ডাল খাই। ২ টার সময় Tiffin আমি একলা খাই। একটা মাংস, খিচুরী ও মাছের তরকারি, মাছ টিনে preserve, Salmon, Mackeral, Sprat, Herring, Sardin, মাছের তরকারি টাটকা মাছের মতনই লাগে। তার পর ৬৷৷টারসময় Dinner, soup, meat, vegetable, pudding এবং fruit. এরূপ সাদাসিদে খাইয়া আমার শরীর এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর ইচ্ছায় ভালই আছে।

আমরা দেড় মাসের পর (৯ অক্টোবরে) স্থলের মুখ দেখিলাম। দক্ষিণ আফরিকার পূর্ব্বধারে দিয়া ও Madagascar নিম্নে দিয়া যাইতেছি। পাঁচ সাত দিনে বোধ হয় Cape of good-Hope অতিক্রম করিব। Captain বলিল, এবার অন্যবারের চেয়ে ৮৷১০ দিনের রাস্তা এগিয়ে আসিয়াছি। Captainকে যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে ভাল লোক বলিয়াই বোধ হয়। আমার খাবার দিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য আছে, আমি বড় কিছু খাইনা, তাহাতে সে অসুখী, সে বলে "খাদ্য ভাল নহে, তাই তুমি কিছু খাও না।" যখন হাওয়া থাকে না, সে বলে, "whistle Doctor, whistle, ডাক্তার শিস দিয়া হাওয়া আন।" এখন দক্ষিণ

আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া যাইতেছি, এখানে ঝড় তুফান প্রায় কখনও হয় না। ইহার নামই প্রশান্ত মহাসাগর হওয়া উচিত ছিল। যাহাকে আমরা এখন প্রশান্ত মহাসাগর বলি ত হাতে বিলক্ষণ ঝড় তুফান সময়ে সময়ে দেখা যায়।

অল্প হাওয়াতেই সকলে পাল খাটাইতেছে। তাহাতেই ১৫০ হইতে ২০০ মাইল প্রতিদিন যায়, কিন্তু আজ তিন, চার দিন একেবারেই হাওয়া নাই। আমরা যত শীঘ্র যাইব মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইল না। বোধ হয়, তিন মাসের মধ্যে Trinidadএ পৌঁছিব, এই তিন মাসের মধ্যেই আমরা সকল ঋতু, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, সম্ভোগ করিতে করিতে চলিতেছি। আমরা এক্ষণে St. Helenaয় ৬০ দিনে আসিয়া পৌঁছিলাম, আমাদের পূর্ব্বে যে জাহাজ আসিয়াছে, সে ৭২ দিনে পৌঁছিয়াছিল।

(২)

Port of Spain, Trinidad.
The 4th Dec. 1906.

আমরা ৫৫ দিনে সেণ্ট হেলেনা পৌঁছিয়াছিলাম, সেখানে নেপোলিয়নের নির্ব্বাসন-স্থান ও সমাধিস্থান দেখিলাম। উভয়স্থানের মধ্যে প্রায় ৩ মাইল ব্যবধান। যেস্থানে তিনি সর্ব্বদা বেড়াইতেন ও বিশ্রাম করিতেন, সেই স্থানেই তাঁহার সমাধিস্থান হইয়াছে। এখানে একটী ঝরণা আছে, সেই ঝরণার জল তিনি পান করিতেন। আমিও এক গ্লাস জল লইয়া পান করিলাম। সর্ব্বসমেত ৯০ দিন Trinidadএ আসিতে লাগিয়াছে। ২৪শে নভেম্বরই কুলি সকল নামিয়াছে এবং আমি সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছি। আজ আট দিন আমি সহরে একটী ভাল হোটেলে বাস করিতেছি, রোজ ৯৲ টাকা দিতে হয়। থাকা ও খাওয়া অতি উৎকৃষ্ট। কম টাকার হোটেলও আছে। মান রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া এখানে থাকিতে হইয়াছে। সহরটী নিতান্ত ছোট নয়, বড় বড় ইংরাজদের দোকান, কলিকাতা হইতে কম নহে। চাঁদনি, বড় বাজার ও চিনেবাজারের মতন দোকান একখানাও দেখিলাম না। সহরটী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, অধিক বৃষ্টি হইলেও কোথাও জল দাঁড়ায় না, সবই চৌরঙ্গি। ইলেকট্রিক ট্রাম গাড়ী আমাদের প্রথম-শ্রেণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ট্রামগাড়ী করিয়া সহরের চতুর্দ্দিকে গিয়াছি। সকল স্থানই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটীর, অধিকাংশ এক তালা। Savana বলিয়া একটী গোলাকার প্রশস্ত মাট সহরের ৪ মাইল দূরে, তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর অট্টালিকা, পশ্চিম পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বত, যাহারা বায়ু সেবন করিতে চায়, তাহাদের জন্য ইহার চতুর্দ্দিকে একটী ট্রামগাড়ী অপরাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। এখানে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতির ক্রীড়া প্রত্যহ হইয়া থাকে। এই মাটটী প্রায় ৫০ বিঘা ব্যাপী।

এক জন কুলি মাসে ২০৲ টাকা উপায় করে, কিন্তু সে অতি অল্পই জমাইতে পারে, ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপ অপেক্ষা এস্থান দুর্ম্মূল্য। শতকরা কাপড় ধোয়াইতে ২০৲ টাকা লাগে, সুতরাং একখানা রুমাল ধোয়াইতে যাহা লাগে, তাহাতে দুখানা নূতন রুমাল কেনা হয়। সেই জন্য রুমাল ধুইতে দিই নাই।

এ দ্বীপটী ৫৫ মাইল দীর্ঘ এবং ৪০ মাইল প্রস্থ। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বস ইহা আবিষ্কার করেন। সেই হইতে ১৭৯৭ সাল অবধি ইহা স্পেনের অধীনে থাকে, তৎপর বৎসর হইতে ইহা ইংরাজের হস্তগত হয়। প্রতি বৎসর

প্রায় ৬৪,০৫,০০০, টাকার ৪,২০,০০০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত ১,৩৬,০৫,০০০ টাকার কোকা ২,৫৫,০০০ টাকার নারিকেল,৭,৫০০ টাকার কাফি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সহর হইতে ৫৫ মাইল দূরে La Brea নামক স্থানে দুইটী পিচের হ্রদ আছে। তাহা হইতে গভর্ণমেণ্টের বাৎসরিক ৩৬০,০০০ টাকা আয় হয়। ৪০ মাইল ট্রেণে ও ১৬ মাইল ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমি প্রাতে ৭ টার সময় গিয়া রাত্রি ৭॥০ টার সময় ফিরিয়া আসি। চারিদিক শ্বাস-রোধকারী গন্ধকের বাষ্পে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের সূর্য্যের প্রখর তেজ মস্তকের উপর করিয়া এবং কালিময় উত্তপ্ত পিচের উপর দাঁড়াইয়া অভাগা শ্রমজীবীরা কার্য্য করিতেছে। তাহারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কিছুই জানে না; তাহাদের নিকট দিন নাই,রাত নাই, জীবন নাই, মৃত্যু নাই,সুখ নাই,দুঃখ নাই,ভাল নাই মন্দ নাই, অনবরতই খাটিতেছে। প্রতিদিন ২৪০০০ হাজার মণ পিচ তুলিতেছে ও গলাইয়া পিপে বোঝাই করিতেছে। এখানে সভ্য জগতের বর্ত্তমান যুগের আকাঙ্ক্ষা ও কীর্ত্তি জাজ্বল্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এখানে অর্থের জন্য পৃথিবীর অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চলিতেছে। মানুষ তাহার জীবিকা নির্ব্বাহার্থে অতি অস্বাস্থ্যকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছে।

পিচ হইতে উৎকৃষ্ট মানজক নামক আর এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়, উহা পিচ অপেক্ষা চতুর্গুণ মূল্যবান; ভূগর্ভে অতি লুক্কায়িত ভাবে থাকে, তুলিতেও খরচ অধিক, প্রত্যেক কুলির রোজ ২৲ টাকা।

জাহাজে যে ৯০ দিন ছিলাম, তাহার প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় দু তিন ঘণ্টা করিয়া ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিয়াছি। আরাধনা সূত্রে সর্ব্বশক্তিমূলং শব্দটী যোগ করা আবশ্যক মনে হয়। উহার ধারা (order)ও পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। আমি উহাকে এইরূপ করিয়া লইয়াছি।

সৎচিদেকমদ্বৈতমনন্তং ব্রহ্ম।
সর্ব্বশক্তিমূলং সুন্দরমানন্দমমৃতং
যদ্বিভাতি শান্তং শিবশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

অপাপবিদ্ধ শব্দটী না থাকিলেও হয়। পৃথিবীতে আনন্দই সব, দুঃখ সমুদ্রে এক বিন্দু জলের ন্যায় মনে হইয়াছে।

এখনকার প্রার্থনা ও উপাসনা তাঁহার স্বরূপকে আত্মস্থ করা অর্থাৎ নিজ আত্মার অংশ করা।

(৩)

S. S. Ryndam from New York
to Rotterdam
Via Bologne
The 19th Dec. 1906.

আমরা ৫ ডিসেম্বর মারাভাল নামক ষ্টিমারে Trinidad ছাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর New York পৌঁছি। ইতিমধ্যে যত ষ্টিমার চড়িয়াছি, তাহার মধ্যে এই ষ্টিমার উৎকৃষ্ট। New-York পৌঁছিবার ২।৩ পূর্ব্বে খুব শীত পড়িয়াছিল। সকল কেবিনে গরম বাষ্পের ধুয়ার পাইপ ছিল, সুতরাং কোন কষ্ট হয় নাই। Saloon ছাড়া একটী Drawing-room, একটী Smoking room ছিল। Landon এর জাহাজ ২ পূর্ব্বে ছিল না, তাই Bologne এই জাহাজে যাইতেছি, খরচ কম বই বেশী নহে। এ জাহাজখানি আবার Maraval হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট, আমি একটী স্বতন্ত্র cabin পাইয়াছি। আজ সকাল ৭টার সময় New-York ছাড়িয়াছে। কাল রাত্রি ৬টার সময় জাহাজে উঠিয়াছি। কাল রাত্রে যেরূপ

শীত গিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। গায়ের কাপড় যথেষ্ট আছে,তথাচ আজ আর বিছানা হইতে উঠিব মনে করি নাই। কিন্তু উঠিয়া আর তত শীতবোধ হইতেছে না। অবশ্য ডেকের উপর বেশ শীত। এ জাহাজে Austrian, French, Dutch, English, German, প্রভৃতি সকল প্রকার যাত্রী আছে। নানা প্রকার বুলির কোলাহল সর্ব্বদাই কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। এক বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারিতেছি না। এখন New-Yorkএর কথা দুই একটা লিখি।

বোম্বে যেমন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থিত,New York সহরের কিয়ৎ অংশ সেইরূপ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ,তাহাকে Manhattan কহে। যখন জাহাজ তীরের নিকটস্থ হইতে থাকে,তখন দূর হইতে ইহাই দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার মনোহর দৃশ্যের সহিত বোধ হয় পৃথিবীর কোন সহরের তুলনা হয় না। তৎপরে যখন আমরা সহরের দক্ষিণ পথে অবতীর্ণ হই এবং সহরের ঈষৎ আভাস পাই,তখন যেন অনন্তের মধ্যে কোথায় বিলীন হইলাম, এক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রসে পূর্ণ হইলাম। অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী প্রাসাদ সকলের অদ্ভুত গঠন প্রণালী দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। কি বলিব, কি লিখিব, ভাষা নাই, রচনা-শক্তি নাই। কবির কল্পনা এখানে পরাস্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে এই সকল প্রাসাদের সৃষ্টি হয়। ইহা New Yorkর ধনীভূত বাণিজ্য ব্যবসায়ের ফল। ক্রমশ বর্দ্ধনশীল বাণিজ্য ব্যবসায়ীদের আফিস ঘরের অভাবেই এইরূপ উন্নত গৃহ সকলের প্রয়োজন হইয়াছে। ১৪।১৫ তালা বাড়ীর ত সংখ্যা নাই। অনেক ২০ হইতে ২৫ তালা বাড়ী দেখিয়াছি। ৩০ তালা বাড়ীরও অভাব নাই। ৪০ তালা গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে। এইরূপ উন্নত গৃহ সকলে ২।৩ হাজার ব্যবসায়ীদের স্থান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ২।৩ শতের অধিক ব্যবসায়ীদের স্থান হইত না। এরূপ গৃহ সকল কিরূপে নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইল, তাহা এক গূঢ় প্রহেলিকা। দুইটী উপায়ে এই সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে। এত তালা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া কার্য্য করিতে হইলে দুই দিনেই লোকের শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইত। তাই প্রথম উপায় passenger elevator কলে উঠা নামা উদ্ভাবিত হইয়াছে। দ্বিতীয় Steel-cage-system ইস্পাতেরখাঁচার ন্যায় গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ হাবড়ার পোল বা অন্য কোন লোহার পোল যেমন লোহার কড়ি জুড়িয়া তৈয়ার হয়,ইহাও সেইরূপ, পরে যদি সমস্তটা দাঁড় করান যায়, তবে একটা অনেক তালার বাড়ী তৈয়ার হইতে পারে। উহার চারিদিকে লোহার পাতের দেয়াল দিলে বাড়ী হইতে পারে। আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে দেয়ালের উপর প্রত্যেক তালায় ভার পড়িয়া থাকে, কিন্তু এখানে এই নূতন প্রকার গৃহ নির্ম্মাণের কৌশলে দেয়াল সকল কেবল জল বায়ুর প্রবেশ-পথ রোধ করে। প্রথমে ইস্পাতের কাটামটা তৈয়ার করে,পরে দেয়াল দেয়, কখন উপর তালা হইতে দেয়াল দিতে আরম্ভ করে। পুরাতন উপায়ে ৮।১০ তালার অধিক হইতে পারে না। কিন্তু এই নূতন প্রণালীতে ৪০ তালা গৃহ হইতে কোন বাধা নাই। এই প্রকার গৃহের খরচ প্রত্যেক cubic foot বর্গফুটে কেবল মাত্র ১৵৯, পুরাতন প্রণালীতে খরচ ১৫্ টাকা। ইহাতে আর এক সুবিধা, ইস্পাতে কড়ি ও খিলান, এবং পাথর ও ইটের ছাদে আগুন লাগিতে পারে না। এই সকল গৃহ একদিকে যেমন

আকাশের দিকে অতি উচ্চে উঠিয়াছে, অপর দিকে ইহার বনেদের গভীরতা অল্প নহে, কোন কোন স্থানে ১০০ ফুট নিম্ন পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। Manhattan life-building ১৮ তালা, ৩৫০ ফিট উচ্চ; ৫৫ ফিট গভীর। ইহাই এইরূপ গৃহের প্রথম সৃষ্টি। ইহাতে ৪৫০০০০০ টাকা নির্ম্মাণের খরচ, আর ৪৫০০০০০ টাকা জমির মূল্য।

আমেরিকান জাতির যে সকল চরিত্র গুণে United Statesকে বর্ত্তমান সভ্য জগতে প্রধান স্থান অধিকার করিতে সমর্থ করিতেছে, এই নগর সেই সকল গুণের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত স্থল। নিউইয়র্ক নগরের অদ্ভুত প্রসারণে ইহার আকর্ষণ পর্য্যবসিত হয় নাই। কিন্তু এখানে অসংখ্য অসংখ্য ব্যবসা ও কার্য্য, সাহসিক কল্পনা ও কার্য্যকারীতা শক্তি এই মহানগরীতে স্থান পাইয়াছে এবং উহাতেই এ নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

বাস্তবিক এ নগরের বর্ণনা করিতে হইলে অভিধানে বিশেষণের যত আতিশয্য আছে, তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। আয়তনে ইহাই জগতের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান নগর, লোক সংখ্যায় ইহা দ্বিতীয়। ইহার দীর্ঘ প্রস্থে, ভূমির নিম্নে, উপরে ও শূন্য তলে রেলওয়ের পোল, ট্রাম,বস,অটোমোবাইল দ্বারার গ্রথিত। এক মাইল যাইতে ৵১০, আর ১৬ মাইল যাইতেও ৵১০। শূন্য তলের রেলওয়ে দিয়া ও ট্রামে দিয়া সমস্ত সহরটীতে বেড়াইয়া আসিয়াছি। Broadway বলিয়া যে রাস্তা, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, উহা সহরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত ১৫ মাইল দীর্ঘ, ইহাতে ৩০০০ হাজার গৃহের নম্বর দেখিয়াছি। ইহার দুই পার্শ্ব হইতে মধ্যে মধ্যে রাস্তা (at right-angles) গিয়াছে, পূর্ব্ব দিকে ২৬২টা ও পশ্চিম দিকে ২৬২টা রাস্তা আছে। মধ্যে মধ্যে ইহার সমান্তরাল (parallel) উত্তর দক্ষিণে রাস্তা গিয়াছে, তাহাকে Avenue কহে। সহরটী ৬ মাইল প্রস্থ। ইহাতে যে সকল পার্ক আছে, তাহাও বিস্তীর্ণ এবং তাহা রাখিতে খরচও অধিক। আমেরিকার অন্যান্য স্থানে বা ইয়ুরোপেও এরূপ নাই। Fifth Avenue ও River-side Drive, যেখানে গাড়ী সকল ও মোটারকার যত দ্রুত বেগে দৌড়াইতে চাহে, অবাধে তাহা পারে। এ দুই রাস্তায় বড় বড় ধনী লোকের বাস। হোটেল ও ভাড়াটে ঘরের সংখ্যা নাই, তাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দতারও অভাব নাই। উহাদের বিকাশ ক্রমশ চলিতেছে। দিনের পর দিন তালার উপর তালা উঠিতেছে। নূতন নূতন সুখের উপায় সংযুক্ত হইতেছে। চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য সেই সঙ্গে দেখা দিতেছে। সহরের কার্য্যকারিতার নিদর্শন, কয়েকটী সংখ্যা (figures) দেখিয়াই কিয়ৎ পরিমাণে ধারণা হইবে। পোষ্ট আপিস ১,০০,০০,০০০ মেল বা চিঠি পত্র প্রতি দিন নানা স্থানে পাঠাইয়া থাকে। পোষ্ট আফিসের বাৎসরিক আয় ৩,৬০,০০,০০০ তিন কোটী ষাট লক্ষ টাকা। রাস্তার উপর দিয়া যে রেল যায়, তাহাতে প্রতি বৎসর ৪৫,২০,০০,০০০ কোটী লোক যায়, New York Stock Exchangeর প্রতি দিন ৩০,০০,০০০ ষ্টক ওসেয়ার হস্তান্তর হয়। Maravalএ আসিবার সময় একজন New York Life Insurance কোম্পানির ইন্‌স্পেক্টরের সহিত আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার নিমন্ত্রণে তাঁহাদের আফিস দেখিতে যাই। আফিসটী ১৫ তালা, কেবল নীচের একতালা ভাড়া দেওয়া আছে, আর সব তালা কোম্পানির

কাজে ব্যবহৃত হয়, আর একটী ৬ তালা গৃহে ইহার মুদ্রাযন্ত্র আছে, ২তালা ভিন্ন সকলেই ইহার কার্য্য হয়। ইহার টাকা কড়ি রাখিবার জন্য একটী লোহার সিন্দুক আছে, ১৫ ফিট লম্বা, ৮।৯ ফিট চওড়া। ইহার দুটা দরজা আছে, বাহিরের দরজা ২৫০ মণ ভারি, কিন্তু কলবলে সহজে দেওয়া যায়, একটা কল আছে, তাহাতে দম দেওয়া হয়, তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টার পূর্ব্বে খোলা যায় না। যেমন চাবি দিতে হয়, তাহাও আছে।

আমি Elevator করিয়া ১৩ তালা পর্য্যন্ত যাই, পরে দুই তালা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠি। উহার ছাদ হইতে সমস্ত সহরের দৃশ্যটী দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

এই অদ্ভুত মহানগরীর শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কয়েকটী প্রধান প্রধান স্মরণ-যোগ্য বিষয় লিখিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইব।

১। New York Brooklyn Bridge. ইহা উচ্চে ১৩৫ ফিট, সুতরাং ইহার উপর হইতে অতি বৃহৎ Steamersও একটা খেলিবার নৌকার মতন দেখায়। ইহা ১৮৭০ সালে আরম্ভ হয়, ১৮৮৩ সালে খোলা হয়, ১৩ বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়, ৪৫০০০০০০ টাকা খরচ পড়ে। পরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনে আরো ১৮০০০০০০খরচ হয়। এ শ্রেণীর যত প্রকার পোল আছে, তাহার মধ্যে ইহার স্থান তৃতীয়। উনবিংশ শতাব্দীর ইহা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইহা ১৫০৫ ফিট নদীর দুই পার্শ্ব যোগ করিয়াছে ইহা ৫৯৪৯ ফিট লম্বা। সর্ব্বসমেৎ ৬৫৩৬ ফিট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া লোক যাতায়াত করে। দু পার্শ্বে দুইটী রেলের রাস্তা, তদ্ভিন্ন Trolly car, Tram carএর গাড়ীর রাস্তা আছে। ইহার উপর পশু প্রাণী মানব নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য যে কত যাতায়াত করে, তাহার সীমা নাই। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩৪০০০০০০ লোক গাড়ীকরে যাতায়াত করে, ৩১৯৬০০ লোক পদব্রজে যায়। প্রত্যেক বৎসরই শত করা ১১।১২ করিয়া ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। Central Tark. আমি Tramএ উঠে ইহার এক পার্শ্ব দিয়া যাইয়া অপর পার্শ্ব দিয়া আসি। ইহা ৫৯নং Street হইতে ১১০নং ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত, পশ্চিমে ৫ম Avenueইহতে ৮ম Avenue পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং দেড় মাইল প্রস্থ। ইহার ২৬৩৭ বিঘা জমিতে বন উপবন, উদ্যান, মাঠ, হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি সকলই আছে। পৃথিবীর আমোদ-উদ্যানের মধ্যে ইহা অতি মনোহর ও সুন্দর। ইহার মধ্যে ৯½ মাইল গাড়ীর রাস্তা, ৫½ মাইল অশ্বারোহীর পথ, এবং ২৮½ মাইল পদব্রজের পথ। ইহার এক পার্শ্বে Metropolitan Museum of Art গৃহ, ইহা গভর্ণমেণ্টের নহে, একটী কোম্পানির দ্বারা ১৮৭০ সালে স্থাপিত হয়। ইহাতেArchitectural, Sculptural, ব্রঞ্জের ঢালাই করা নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি, painting প্রভৃতি নানা প্রকার চারুকার্য্য আছে। Egyptian Obelisk একটী পূর্ণ উন্নত প্রস্তর খণ্ড, ৭০ ফিট উচ্চ তলার ৭¾×৭¾ ফিট। ওজন ২২৪০০০ সের বা ৫৬০০ মন। একটী প্রশস্ত সুদীর্ঘ বায়ু সেবনের পথ "Mall আছে, উহা একটী হ্রদে শেষ হইয়াছে, হ্রদে সিঁড়ির দুই পার্শ্বে নানা প্রকার ফল ফুল ও পক্ষীর খোদিত চিত্র আছে। দুইটী উন্নত সুন্দর ঝরণাও আছে। ইহার মধ্যে পানীয় পরিষ্কার জল সংরক্ষণ পুষ্করিণী (আবৃত) আছে, তাহাতে

৫,৯০,০০,০০০০০ সের জল থাকে। ইহা ৪২৯ বিঘা জমি অধিকার করিয়াছে। ২০ ক্রোশ দূর হইতে এই জল আনীত হয়। এই পুষ্করিণীর উপর বেড়াইবার স্থান। আমাদের Wellington squareএর জলের পুষ্করিণী হইতে কত গুণ বৃহৎ, ইহাতেই বুঝিতে পারিবে। তৎপরে চিরিয়াখানা বা Menageri, ইহাতে পশু পক্ষী সরীসৃপ সকলই আছে, হস্তি, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, জলহস্তি, টাপির হরিণ, Elk,বানর,ইগল,অসট্রিচ,কুম্ভির প্রভৃতির অভাব নাই। ইহারই সন্নিকটে American Museum of natural History, ইহাতে আমাদের Museumএর মত সকল দ্রব্য আছে।

৬০০০০ প্রকার পক্ষী, ২০০০০ প্রকার স্তন্যপায়ী পশু, ৩০ ০০০ প্রজাপতি আছে, ৫০০ প্রকার কাষ্ঠ এবং ১৫০০ প্রকার গৃহ নির্ম্মাণে প্রস্তর আছে।

৩। নদীতীর পথ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা অতি প্রশস্ত পথ। ঘোড়ার গাড়ী এ পথে অবাধে ইচ্ছামত দৌড়াইতে পারে। এ পথে Grants Tomb, Columbia University, Cathedral of St. John. ইহা ৭২ নং ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়া ১৩০ নং ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহা ৩ মাইল বিস্তৃত। ইহা এক প্রকার পার্ক বলিলেই হয়,একপার্শ্বে রাজপ্রাসাদ সকল, অপর দিকে নদীর দৃশ্য অতি মনোহর। New-York অনাথ-আশ্রম ৭৩ নং হইতে ৭৪ নং ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার জমি ২৫,৮০,০০০৲ টাকায় ক্রয় করা হয় এবং গৃহ (রাজপ্রাসাদ) ৬০ টাকায় নির্ম্মিত হয়। ৮৯ নং ষ্ট্রীটে,সৈন্য ও নাবিকদের স্মৃতিচিহ্ন আছে।

৪। Grants Tomb.ইহা একটী প্রশস্ত গৃহের উপর একটী মন্দির, গৃহটী উচ্চে ৭২ ফিট,৯০ ফিট দীর্ঘে ও প্রস্থে,ইহার চূড়া সমুদ্র তীর হইতে ২৮০ ফিট। General Grant ১৮৮৫ সালে মৃত হয়েন, তাহার মৃত শরীর দেখিতে ৩০০০০০ লোক আসিয়াছিল,৯০০০০ হাজার লোক চাঁদা দিয়াছিল ১৮০০০০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল।

এই সকল অঙ্কে figures) আমিরেকার বৃহত্ব বা মহত্বের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়,আর অধিক এখন লিখিব না, মুখে বলিব।

(৪)

Rotterdam.
30 Dec. 1906.

নায়াগারার বিষয় এখন কিছু বলি। ১৫ তারিখে (December) নায়াগারা তীর্থে গমন করি। রাত্রি ৮ টার সময় Pullman car এ চড়িয়া ৫০০ মাইল অতিক্রম করিয়া পরদিন প্রাতে ৮টা ১০ মিনিটে নায়াগারা Stationএ পৌঁছিছি। পুলম্যানকারের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম। ইহাকে ইন্দ্রভবন বলিলে বোধ হয় অতিরিক্ত হয় না। Sitting room,smoking room drawing room, labotatory, W. C. সকলই অতি পরিপাটী সকল স্থানেই মকমলের গদি ও কোচ। গাড়ি চড়িবার এক ঘণ্টা পরে চাকর আসিয়া সকলের বিছানা করিতে লাগিল। বসিবার ঘরে সমুখ-সমুখি বসিবার যে গদি ছিল,তাহাই একটী বিছানায় পরিণত হইল এবং তাহার উপর আর একটী বিছানা হইল, আমাদের দেশের রেলে যেমন Hanging bed থাকে,উপরের বিছানাটীসেইরূপ স্থানে। পরদা দিয়া এক একটী বিছানা যেন স্বতন্ত্র ঘর হইল, কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ রহিল না, বিছানা রাজাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। পরদিন প্রাতে

আবার ঐরূপ গাড়ী চড়িয়া ফিরিয়া আসি। নিউইয়র্কে Niagra fall Station এ নামিয়া একটী ল্যাণ্ডক্সুড়ি চড়িয়া নায়গারা ফল দেখিতে যাই। বাস্তবিক ইহা pleasure tripই বটে। NewYorkএর বাসায় থাকিলে এত সুখ ঘটিত না। কিছু কষ্ট হয় নাই এবং দুই রাত এক দিন অতি সুখেই কাটাইয়াছি।

নায়াগারা সকল কালেই অতি অদ্ভুত দৃশ্য, কিন্তু শীতকালে ইহার সৌন্দর্য্যের ও গাম্ভীর্য্যের পরাকাষ্ঠা। আমাদের ভাগ্যে গ্রীষ্মের শেষ ও শীতের প্রারম্ভের যুগপৎ দৃশ্য দর্শন ঘটিয়াছে। এ সময়ে শত শত জলপ্রপাত জমিয়া বরফ হইয়া দুই পার্শ্বের পর্ব্বত শ্রেণীর উপর ঝুলিতেছে, মধ্যে মধ্যে জলস্রোত পর্ব্বত হইতে নামিতেছে। Bayard Taylor সকল সময়েই নায়াগারা দেখিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন—

> "I was not impressed by the sublimity of the scene, nor even by its terror but solely by the fascination of its wonderful beauty. With each succeeding visit Niagra has grown in height, in power, in majesty, in sublimity but in winter I have seen its climax of beauty." Once witnessed it in winter, always treasured as one of memory's choice legacies.

নায়াগারা ফল-এর দুইটী দিক আছে, এক দিক আমেরিকার অধিকারে, অপর দিক Canadaর অধিকারে। উভয় রাজ্যে নায়াগারার উপর দিয়া কয়েকটী পোল আছে। আমরা একটী পুল দিয়া Canadaয় গিয়া অপর পুল দিয়া ফিরিয়া আসি, প্রত্যেক পুলের ট্যাক্স ১৲ টাকা করিয়া। আমেরিকার Niagra fall ১৫৯ ফিট উচ্চ এবং ১০০০ ফিট প্রস্থ। Canadiaর fall যাহাকে Horse-shoe ফল বলে, ১৬৫ ফিট উচ্চ, ২৪০০ ফিট প্রস্থ এবং ২০০ ফিট গভীর।

ক্রমে ক্রমে আমরা ইহার এই কয়েকটী দৃশ্য দেখি।

১। সমগ্র দৃশ্য, আমেরিকা ফল বাম্ পার্শ্বে, Canada fall, দক্ষিণ পার্শ্বে।

২। American fall, ১৫৯ ফিট হইতে জল নামিতেছে, ½ মাইল প্রস্থ, প্রত্যেক মিনিটে ১৫০০০০০০০ ঘন বর্গ ফিট জল ছুটিয়া চলিতেছে।

৩। Horse-shoe fall, এখানে ১৬৫ ফিট হইতে জল পড়িতেছে, ২৪০০ ফিট প্রস্থ, ২০০ ফিট গভীর। আমেরিকা-ফল হইতে ১০ গুণ জল প্রত্যেক মিনিটে ছুটিয়া চলিতেছে।

৪। গেটে দ্বীপ পুল। এখানে জল অতি দ্রুতবেগে ছুটিতেছে।

৫। Three sister-islands.

বৃক্ষ-লতা-সমন্বিত তিনটী সুন্দর ক্ষুদ্র দ্বীপ।

৬। Whirpool Rapids দ্রুতগামী আবর্ত্ত (ঘূর্ণ জল) ৩০০ ফিট প্রস্থ, ঘণ্টায় ৪০ ক্রোশ স্রোত ছুটিতেছে।

৭। Niagra Gorge—যে মহাশক্তি শত শত বৎসর ধরিয়া অপব্যয়িত হইতেছে, তাহার ফলে এক মহা গভীর গহ্বর হইয়াছে, ইহা ২০০ ফিট গভীর, ইহা Whirpool rapids শেষ হইয়াছে, জল এখানে আবদ্ধ নাই, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, স্রোত কিছু কমিয়াছে।

৮। কেনেডা হইতে American fallর দৃশ্য।

৯। Horse-shoe-fall ক্যানাডা হইতে।

১০। Rapids—Inclined Rail.

১১। Horse-fall নিম্ন দেশের দৃশ্য সুড়ঙ্গ পথে ১০০ ফিট, নিম্ন ভূগহ্বরে ৯০০ ফিট সুড়ঙ্গ পথ।

১১। Power house শক্তিগৃহ,এখানে নায়াগারার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিয়া ২৯ মাইল পর্য্যন্ত যত কল কারখানা ও Tram car চালাইতেছে। ভূমির উপর হইতে ইহা ১৭৭ ফিট নিম্ন। ১৩৫ ফিট পর্য্যন্ত নিম্নে আমরা নামিয়াছিলাম, উহা জমির নীচে ১২ তালা গৃহ।

১২। Prospect point.

১৩। Old and suspension bridge.

১৪। Table rock.

১৫। Queen Victoria Magra falls Park.

১৬। Hermits Cascade.

১৭। Terapine rocks.

১৮। Biddle stairs.

১৯। Green island.

২০। Lime Island.

যদি New York সহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাকি, অবাক হইয়া থাকি, Niagra fall দেখিয়া বাক্যহারা, মন-হারা ও আত্ম-হারা হইয়াছি। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে আমাতে আমি ছিলাম না, আমি যে কোথায় ছিলাম, বলিতে পারি না। তৃতীয় দৃশ্যের কাছে গিয়া আমার চৈতন্য হইল, আমার মুখ ফুটিল, আমি গাহিলাম—

মহানন্দে হের গো সবে চ'লে শ্রান্তিহারা নায়াগারা
জগত পথে পশু প্রাণী রবিশশি তারা
তাঁহতে যাবে জড়জীব মানব প্রবাহ।
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম সৃজন ধারা,

আমার ইচ্ছা হইল, রবীন্দ্র বা পরলোক হইতে হেমচন্দ্র আসিয়া এই দৃশ্য দেখে এবং ইহার কবিতা ও গীত রচনা করে।

তাহার পর whirpool যখন দেখি, তখন দেবতারা যে সমুদ্রমন্থন করিয়াছিল, তাহারই কথা মনে পড়িল। ইহাই Niagra gorge; একটী ১০।১১ বৎসর বালক আমাদের ইহা দেখাইয়াছে, তাহার মুখে খই ফুটিতেছিল, সে অতি সুন্দর করিয়া ইহা বর্ণনা করিল। এই স্থান একজন জমা লই-য়াছে, সে একটী গৃহ এমন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে যে, গৃহের মধ্যে দিয়া না যাইলে ইহা দেখিবার উপায় নাই, দেখিবার মূল্য ১॥০ টাকা।

তৎপরে rapids দেখি, এ স্থানও ঐরূপ গৃহ দ্বারা লুক্কায়িত,দেখিতে ১॥০ টাকা দিতে হয়। তবে এখানে রেলে করিয়া Inclined rail ২০০ ফিট নিম্নে নামিয়া, দেখিতে হয়। রেলের দুই পাশে ক্ষুদ্র সিঁড়ি আছে। রেলে চড়িয়া যখন শড়াৎ করিয়া গড়িয়া নীচে যাই, তখন মনে একটু ভয় হইয়াছিল। সেখানে জল ঘণ্টায় ২০ ক্রোশ বেগে ছুটিতেছে। একজন ইংরাজ ১১ বৎসর পূর্ব্বে সাঁতার দিয়া পার হইবে মনে করিয়া ইহার দুই মাইল দূর হইতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করে, এই খানে তাহার মৃত্যু হয়। এখান হইতে ৮ মাইল দূরে তাহার মৃত শরীর পাওয়া হয়।

তাহার পর একটী পোল পার হইয়া আমেরিকা হইতে কানাডায় আসি। ভিক্টোরিয়া পার্কের মধ্য দিয়া Horse-shoe-fall এর সন্নিকটে পৌঁছি। নিম্নে যে স্থানে Horse-shoeর জলপ্রপাত বেগে পড়িতেছে, তাহা দেখিবার জন্য একটী ৯০০ ফিট লম্বা,ভূমির ১০০ ফিট নিম্নে একটী সুরঙ্গ-পথ, পর্ব্বত কাটিয়া কেবল মাত্র দুই বৎসর হইয়াছে। উহার উপরে একটী দোকান ঘর,তাহার মধ্য দিয়া যাইতে হয়,প্রবেশ মূল্য প্রত্যেকের ১॥০ টাকা। ইহা দেখিলে সম্পূর্ণ

ভিজিতে হয়, সুতরাং Waterproof এর প্যাণ্ট, কোট, জুতা টুপি পরিয়া যাইতে হয়। আমাদিগকে সংসাজাইয়া দিল। বুটের উপর রবারের জুতা পরিলাম। Red Indianর সাজ বা Iceland-বাসীর সাজ সাজিলাম। আমার তখন বালক বালিকাদের সেই গানটী মনে পড়িল "কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি ছোট মানুষটী।" এইরূপ সাজিয়া উহার বিচিত্র শক্তি ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসিলাম, পরে উপরে আসিয়া Horse-shoe-fall এর অতি সন্নিকটে যাইয়া উহার শোভা ও বিস্তৃতি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। শেষে আর একটী পোল পার হইয়া আমেরিকা-ফলের সন্নিকটে আসিয়া ঐরূপ দেখিলাম। যদিও দিন বেশ পরিস্কার ছিল, বরফ পড়ে নাই, তথাচ অতি ঠাণ্ডা এবং ভূমির উপর বরফ জমিয়া গিয়াছিল, বৃক্ষসকলের শাখা সকল বরফে আবৃত ছিল।

নায়াগারা ফল এক দিনে এক সময়ে দেখিবার জিনিস নহে। আমাদের সময় নাই, কি করি, তাই কয়েক ঘণ্টা (৭ ঘণ্টা) মধ্যে দেখা শেষ করিলাম। ইহাকে সূর্য্যালোকে চন্দ্রালোকে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সকল সময়েই দেখিতে হয়। ঝড় তুফানে ও প্রকৃতির শান্ত অবস্থায় দেখিলে তবে ইহার মহিমা কিছু বোঝা যায়। ইহাই পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান দৃশ্য। এখানে অবিশ্রান্ত অপরিমেয় শক্তির সহিত সৌন্দর্য্য ও মহত্ব একত্র মিশ্রিত হইয়াছে। অনন্তের আভাস এখানেই পাওয়া যায়। ইহার মহা দর্শন ও ধর্ম্ম Religion (ধর্ম্ম কথাটা ঠিক Religionএর প্রতিশব্দ নহে) অতি অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। আলমোরার উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়া বলিয়াছিলাম যে, উহারা নিস্তব্ধে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছে। নায়াগারা উচ্চ স্বরে তাহাই করিতেছে। ইহার ন্যায় উন্নত, হৃদয়-স্পর্শী উপদেশ (Sermon) কখন কোন আচার্য্য বা প্রচারক প্রচার করিতে পারে নাই। ইহা অনবরত একই ভীষণ গভীর গর্জ্জনের সহিত অভ্রান্তস্বরে বলিতেছে "আমি তাঁহারই সৃজিত, তাঁহা হইতেই আমি এই মহাশক্তি পাইয়াছি, তাঁহার নিকট আমার কার্য্যের পরিচয় দিতে চলিয়াছি।"

এইরূপে নায়াগারা দেখিয়া যখন ষ্টেসনে ফিরিয়া আসি, তখন দেখি, আরো ১॥ ঘণ্টা কাল গাড়ী ব্যবহার করিতে পারি। গাড়োয়ানকে দেখাইবার উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইতে বলাতে সে বলিল, সব দেখাইয়াছি আর কিছু বাকী নাই। কিন্তু গাড়ীর অধিকারীর মুখ থেকে Power house বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছিলাম, Power house যে কি, তখন তাহার কিছু বুঝিতে পারি নাই। গাড়োয়ানকে ঐখানে লইয়া যাইতে বলিলাম, সে অতি বিরক্তির সহিত অগত্যা সেখানে লইয়া গেল। উহা না দেখিলে নায়াগারা ফল দেখা অসম্পূর্ণ থাকিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানেই নায়াগারা শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিয়া নানা কল কারখানায় ব্যবহার করা হয়। ইহা শক্তি-বৃক্ষের চারা, কালে যখন ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, ইহা বিকশিত হইবে, তখন U. S. এর ঘোর পরিবর্ত্তন হইবে। আমরা Review of Reviewsএতে ইহার বিষয় কিছু পড়িয়াছিলাম।

এইরূপ পার্থিব বিষয়ে Niagra শক্তিকে ব্যবহার করিলে এই অপূর্ব্ব স্বাভাবিক দৃশ্যের ক্ষতি হইবে, ইহারই আশঙ্কা সমগ্র জগৎ করিয়াছে। যে পরিচালক আমা-

দিগকে সকল দেখাইয়াছিল, তাহাকে প্রথম প্রশ্নে এই আশঙ্কারই কথা ছিল। সে বলিল, ও আশঙ্কা কল্পনা মাত্র। পুষ্করিণী হইতে এক চামচে জল লইলে যেমন তাহার কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ নায়াগারার জল-স্রোতের কিয়দংশ লইলে কিছুই ক্ষতি হইবে না। বর্ত্তমানে আমরা কেবল শতকরা ৪ ভাগ জল লইয়া থাকি, ইহার কত জল যে বৃথা অপব্যয়িত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন এই শক্তি-গৃহের কথা বলি। এই গৃহে যে দর্শনী আদায় হয়, তাহা হাঁসপাতালে দেওয়া হয়, সে অর্থ কেবল এই গৃহের পীড়িত কর্ম্মচারীদের জন্য ব্যবহার হয়। Niagra-নদীতে প্রতি সেকেণ্ডে ২২২৪০ বর্গ ফিট(cubic feet) জল ছুটিতেছে। ৩০০ফিট উচ্চ হইতে এই জল পড়াতে ইহার ৭৫০০০০০ অশ্বশক্তি (horse-power) উৎপন্ন হইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই শক্তিকে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহারই কল্পনা হয়। Niagra-fall-power-company ও তাহাদের Engineerদের অসীম কার্য্যকরী শক্তি, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সাহসের এখানে বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর ইহার জমি ক্রয় করা হয়। তখন Niagra-fall নগরের লোক সংখ্যা ১০০০০ ছিল, আজ এই শক্তির প্রভাবে ইহা ৩০০০০ হইয়াছে, তাহার কারণ কল কারখানার নূতন সৃষ্টি। কানাডাতে একটী ও ইউনাইটেড ষ্টেট নায়াগারাতে দুইটী শক্তি-গৃহ আছে। নদীর উপর হইতে একটী নিম্ন স্থানে প্রণালীতে(Intake canal) ইহার জল নীত হয়। উহা হইতে শক্তি-গৃহের বহির্গৃহে(Inlet chamber)কয়েকটী পাইপের মুখে নীত হয়। এই গৃহে প্রবেশ-মুখে লোহার বেড়া আছে, তাহাতে বরফ ও জঞ্জাল কিছুই যাইতে পারে না। পাইপ হইতে এই জল একটী বৃহৎ নল(ব্যাস ৩৮ইঞ্চ) দিয়া জমির ২০০ ফিট নিম্নে পতিত হয়। সেখানে চাকা আছে, উহা এই জল-প্রপাতে ক্রমশ ঘুরিতেছে, উহাতেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে।

১৮৯৫ সালে প্রথমে এই শক্তি কারখানায় ব্যবহার হয়, কলকারখানা ভিন্ন ট্রাম গাড়ী চালান, রাস্তা, ঘর, বাড়ী বৈদ্যুতিক আলোতে আলোকিত করা ও এখন কানাডার একটী হোটেলে ইহার দ্বারা রন্ধন হয়। শীতকালে গৃহ উত্তপ্ত হয়।

Buffalo নগর নায়াগারা হইতে ৩৫ মাইল দূরে। তাহার প্রত্যেক Trolly and Tram Car এই শক্তিতে চালিত হয় এবং উহার রাস্তা সকল বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হয়। আর নায়াগারা কলের সন্নিকটে অনেক কারখানা ও দোকানে ইহার শক্তি ব্যবহৃত হয়। আজ ২০০০০০ অশ্বশক্তি ইহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। গত বৎসর শীতকালে নায়াগারা ফলের উপর হইতে জল লইবার পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য এক মহা আন্দোলন হয়, তাহাতে কোম্পানিরা পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়াছে, নতুবা ইহার শক্তি আজ দ্বিগুণ হইত।

প্রত্যেক শক্তিগৃহে ১২টী করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক কল Dynamoআছে, প্রত্যেকটী মিনিটে ২৫০ বার ঘুরে, প্রত্যেকটীর কলের ওজন ৭৫ টন বা ৭৫ × ২৮ মণ এবং ৫০০০ হইতে ৫৫০০ অশ্ব-শক্তি উৎপন্ন হয়। আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড যেমন শরীরের সকল স্থানে রক্ত সঞ্চালন করে (পম্পের ন্যায়)সেইরূপ, এই সকল কলে ২০০০০০ সের তেল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

পাইপ দ্বারা দিবসে ১২ বার সঞ্চালিত হয়। এই কল সকলের গতির সীমা অন্য কল দ্বারা সাধিত হয়, তাহাকে Governors বলে। এখানেই নায়াগারা বর্ণনা শেষ।

যে জাহাজখানি করিয়া France যাইতেছি,তাহা অতি উৎকৃষ্ট, বলিয়াছি। S. S. Ryndameলম্বায় ৬৫৩ ফিট,প্রস্থে ৬৯ ফিট। কেবিনের দুই পার্শ্বে জাহাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেড়াইবার রাস্তা। Saloon ছাড়া Saloonএর উপর পুরুষদের বসিবার স্থান,তাহার উপর স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থান (কুটীর ভাল সাটিনের গদি পাতা। প্রতিদিন স্নানের জন্য একখানি করিয়া নূতন তোয়ালে ও একখানি করিয়া নূতন সাবান। সেই রূপ কেবিনেও প্রতিদিন নূতন তোয়ালে, টেবিলে নূতন Napkin। শীত বলিয়া আমি এখন প্রতিদিন গরম জলে স্নান করি। খাওয়া দাওয়ার ত কথা নাই, সুখ ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

# ত্রিপুরাবিজয়ী শমশের গাজী।

১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের উপর দিয়া যে ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছিল, যে দুর্জ্জয় আকস্মিক শক্তিতে ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, যে ভীম বলীয়ান ঘূর্ণায়মান বায়ুর পাকে পতিত হইয়া ত্রিপুরেশ্বর শুষ্ক কদলী পত্রের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছিলেন, যে ভীষণ বিপদ পাতে ত্রিপুরার রাজবংশ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, যে বিপদ-তরঙ্গে পতিত হইয়া যুবরাজ কৃষ্ণমণি কখন অনাহারে, কখন ফল,মূলাহারে,কখন বা দগ্ধ মৃগমাংস ভক্ষণে, কখন বা অসভ্য কুকিদিগের কদর্য্য আহারে উদর পূরণ ও বন্য পশুর ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত ভারত-ইতিহাসের এক অধ্যায় বলিতে হইবে। আজ "নব্যভারতের" পাঠক ও পাঠিকাগণকে তাহা উপহার দিতেছি।

ত্রিপুরেশ্বরের অধীনে নাছির মহম্মদ চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি, পরগণে দক্ষিণ শিকের জমীদারী সত্ব ভোগ করিতেন। উক্ত জমীদারের কয়েকটী পুত্র ও দয়া নাম্নী এক কন্যা ছিল। পুত্র কন্যাগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত নিজ বাটীতেই একটী মোক্তব স্থাপন করিয়া শিক্ষার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শমশের নামক এক অতি সামান্য ভিক্ষুকের পুত্রও উক্ত জমীদারের সন্তানদের সহিত এক মোক্তবে বিদ্যা শিক্ষা করিত। অল্পকাল মধ্যেই শমশের স্বীয় অধ্যবসায় গুণে শিক্ষা বিভাগে একজন যশস্বী ছাত্র হইয়া উঠিল। জমীদার-পুত্রগণ কিছুতেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিল না। তখনকার রাজ ভাষায় শমশের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া অতঃপর অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল এবং অল্পকাল মধ্যেই বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া একজন খ্যাতনামা বীর বলিয়া পরিচিত হইল। নাছির মহম্মদ চৌধুরী একজন গুণজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। শমশেরের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে এক কুত-ঘাটের তহশীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তখন ভারত-

বর্ষের শাসন-প্রণালী অন্য রূপ ছিল। "যার লাঠী, তার মাটী" এই বাক্যের সম্পূর্ণ প্রতিপত্তি ছিল। তজ্জন্য জমীদারগণকেও সাধ্যানুযায়ী সৈন্য-সামন্ত রাখিতে হইত। কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলেই অধীনস্থ জমীদারগণ স্বীয় প্রভুকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে যুদ্ধ-তরী ও সৈন্য দ্বারা সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিতেন। জমীদারের প্রধান সেনাপতিকে "মীরশালার" উপাধী প্রদান করা হইত। এমতাবস্থায় দক্ষিণ শিকের জমীদারকেও, অনেকগুলি যুদ্ধসামগ্রী ও সৈন্য-সামন্ত রাখিতে হইয়াছিল। তহশীলদারী কার্য্যে শমশের বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করায় নাছির মহম্মদ চৌধুরী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া "মীরশালারের" পদে উন্নীত করিলেন। এই সময় শমশেরের আত্মীয়ের মধ্যে সাহু নামক এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার সহচর হইল। লোকে এই সাহুকে "সাহু ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত। শমশেরের ন্যায় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ছিল না, কিন্তু সে একজন দৈত্যের ন্যায় অলৌকিক বলশালী ছিল। তাহার সমকক্ষ বলবান পুরুষ তখন আর কেহ প্রায়ই ছিল না।

আশৈশব একত্র বাস, এক বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিবন্ধন নাছির মহম্মদ চৌধুরীর পুত্র কন্যাগণের সহিত শমশেরের বিশেষ ভালবাসা জন্মিয়াছিল। এদিকে নাছির মহম্মদ চৌধুরীও শমশেরের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া জানিতেন। কিন্তু শমশেরের ভালবাসা নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিল না। সে প্রভু-কন্যা দয়ার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের এক নিভৃত কক্ষে অতি সংগোপনে পোষণ করিতেছিল। দরিদ্র ও হীন ব্যক্তির সন্তান বলিয়া এতদিন অবৈধ ও অপ্রকল্প বাক্য প্রকাশ করিবার সাহস করিতে পারে নাই। এখন কিন্তু প্রভুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ও মীরশালারের পদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

জমাদার নাছির মহম্মদ চৌধুরী শমশেরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাহার যৌবন-দৃপ্ত পূর্ণ কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া কোন শিক্ষিতা মহিলার সহিত শমশেরের বিবাহ দিতে অভিলাষী হইলেন এবং নিজে তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তদীয় দেওয়ান বসির মহম্মদকে শমশেরের মতামত জিজ্ঞাসা করিবার আদেশ করিলেন। দেওয়ান বসির শমশের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। শমশের অধোবদনে নির্ব্বাক রহিল, কোন উত্তর করিল না। দেওয়ান বসির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শমশের তখন যেন উন্মাদের ন্যায় হইয়া বলিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি অন্য কোথায়ও বিবাহ করিব না, যদি চৌধুরী সাহেবের দুহিতা দয়াকে বিবাহ করাইতে পারেন; তবে বিবাহ করিব। আমি দয়ার হস্তপ্রার্থী।" দেওয়ান বসির অবিলম্বে শমশেরের এতাদৃশ অন্যায় অভিলাষের কথা চৌধুরী সাহেবকে জ্ঞাপন করিলেন। এতদ্‌শ্রবণে চৌধুরী সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং তদ্দণ্ডেই শমশেরকে বধ করিয়া তাহার শির সম্মুখে আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ভূপতির আদেশ শমশেরের কর্ণগোচর হইল, সুতরাং সে ত্বরিত পদে সাহু ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া পরিবারবর্গসহ পলায়ন করিল। শমশেরের পলায়নবার্ত্তা চৌধুরী সাহেব অবগত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সৈন্য প্রেরণ

করিলেন। শমশের যখন মুহুরী নদী অতিক্রম করিয়া ফরইয়া গ্রামে উপস্থিত হইল, সেই সময় নাছির মহম্মদ চৌধুরীর প্রেরিত সৈন্যগণ তাহাকে আক্রমণ করিল। তখন শমশের ও সাদু ভিন্ন তাহাদের সহিত অন্য লোক জন ছিল না। কিন্তু শমশের ও সাদু অসংখ্য শত্রুসৈন্য দর্শনে ভীত না হইয়া এমনি ভীম বেগে বিপক্ষকে আক্রমণ করিল যে, সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নাছির মহম্মদের সৈন্যবৃন্দ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। শমশের ও সাদু পরগণে বেদরাবাদে গিয়া কচুয়াগ্রামে নুরমহম্মদ তালুকদার নামক একজন প্রতাপশালী লোকের আশ্রয়ে পরিবারবর্গসহ বাস করিতে লাগিল। কিন্তু নাছির মহম্মদ চৌধুরী তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে দিলেন না। তাঁহার প্রেরিত সৈন্যগণ গিয়া প্রায়ই শমশের ও সাদুকে আক্রমণ করিত, কিন্তু স্বয়ং বিধাতা যাহার সহায়, কাহার সাধ্য তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করে। প্রত্যেক আক্রমণেই জমীদারের সৈন্যগণ শমশেরের নিকট পরাজিত হইতে লাগিল।

একদা নিশীথ সময়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শমশের নির্জ্জনে একাকী বসিয়া দয়ার মোহিনী মূর্ত্তি ধ্যান করতঃ চক্ষুজলে বক্ষঃ ভাসাইতেছিল। দয়ার চিন্তায় তন্ময় হইয়া দয়া লাভার্থ দয়াময়কে ডাকিতেছিল। ইতিমধ্যেই অকস্মাৎ একজন সাধু পুরুষ আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া শমশেরকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। শমশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে পাইল, একজন জ্যোতির্ম্ময় সাধু পুরুষ একটী লোহিত বর্ণের প্রকাণ্ড অশ্ব পৃষ্ঠে নিষ্কাষিত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান। শমশের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই সেই সাধু পুরুষ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হস্তস্থিত তরবারি ও আরোহিত অশ্ব শমশেরকে প্রদান করিয়া, বলিলেন, "শমশের! চিন্তা পরিহার কর! তুমি চাকলে রোসনাবাদের অধিপতি হইবে, তজ্জন্য তোমাকে এই তরবারি ও অশ্ব প্রদান করিলাম। আরাকানের মগরাজ এই তরবারি সৈয়দ সোলতানকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। আমি তাহার উত্তর পুরুষ বলিয়া এই বহুমূল্য তরবারি দীর্ঘকাল যাবত আমার নিকট আছে। অদ্য হৃষ্টচিত্তে তোমাকে ইহা প্রদান করিলাম। ইহার দৈবশক্তি বলে তুমি সর্ব্ব যুদ্ধেই জয়ী হইবে। নাছির মহম্মদ চৌধুরী তোমার হাতে নিহত হইবে। দয়া তোমারই ভোগ্যা। ত্রিপুরেশ্বরের সহিত তোমাকে বারংবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু পরিণামে তোমার জয় অনিবার্য্য। অদ্য হইতে তোমাকে সম্মানিত গাজী আখ্যা প্রদান করা হইল।"

সাধু পুরুষের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া শমশের আরও সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। অল্পকাল মধ্যেই অনেক গুলি দুর্দ্দান্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল। সাদুকেও গাজী আখ্যা প্রদান করিয়া প্রধান সেনাপতি পদে বরিত করিল। একদা রাত্রি যোগে শমশের সসৈন্যে দক্ষিণ-শিকে প্রবেশ করিয়া নাছির চৌধুরী ও তাহার পুত্রগণের প্রাণ বিনাশ করিয়া পরগণে দক্ষিণ শিক অধিকার করতঃ দয়াকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিল। ত্রিপুরেশ্বর এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কয়েক দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হওয়ার পর উভয় পক্ষে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শমশের দক্ষিণ শিকের জমীদারী সনন্দ গ্রহণ করিল। ইহার তিন বৎসর পর মেহেরকুল নামক একটী পর-

গণাও শমশের গির্জা ইজারা লইলেন। ক্রমেই তাহার ধনৈশ্বর্য্য আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মহারাজ বিজয় মাণিক্য পরলোক গমন করিলেন। এই সুযোগে শমশের গাজী ত্রিপুরেশ্বরের রাজকর বন্ধ করিয়া স্বয়ং চাকলে রোসনাবাদের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিল। যুবরাজ কৃষ্ণমণি অনেকবার শমশেরের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক বারই শমশেরের দুর্দ্দান্ত প্রতাপের নিকট পরাস্ত হইলেন। শমশের বহু সংখ্যক বলবান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ ও অধিকার করিল। যুবরাজ কৃষ্ণমণি প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক রাজধানী আগরতলায় আসিয়া অতি দীন ভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

শমশের গাজী ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিয়া পার্ব্বতীয় প্রজাগণের নিকট কর আদায়ের নিমিত্ত উজির রামধন বিশ্বাসকে প্রেরণ করিল, কিন্তু পার্ব্বতীয় অসভ্য এবং রাজভক্ত রিয়াং ও কুকিগণ শমশেরকে কর দিতে সম্মত হইল না। তখন শমশের গাজী এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিল। উদয় মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্মণ মাণিক্য আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক এক সাক্ষী গোপাল রাজা রাখিয়া পার্ব্বতীয় প্রজাগণকে কর দিতে বাধ্য করিল। প্রত্যেক পরগণায় একজন শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিল। শমশের শুধু ত্রিপুরা অধিকার করিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছিল, তাহা নহে, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের জমীদারদিগকেও কর দিতে বাধ্য করিল। অর্থাভাব হইলে সময় সময় ধনীদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া লুটপাটও করিত। ইহাই শমশেরের জীবনের কলঙ্ক ব'লতে হইবে।

শমশেরের দুর্দ্দান্ত প্রতাপে বঙ্গভূমি মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল, তখন সগর্ব্বে শত্রুবেশে শমশের গাজীর সম্মুখস্থ হয়, তেমন ব্যক্তি কেহ বঙ্গদেশে ছিল না। বঙ্গের ভাগ্যাকাশেও তখন দুর্ভাগ্যের কালমেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। বঙ্গলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগের পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন। বিচক্ষণ ও পরম জ্ঞানী নবাব অলিবর্দ্দিখাঁর পরলোক গমন, নবাব সিরাজদৌল্লার রাজভার গ্রহণ, নিমকহারাম মিরজাফর, রাজা রাজবল্লব সেন ও জগৎ শেট প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মকলহ, যুদ্ধবিগ্রহ ও নবাব সিরাজদৌল্লার অধঃপতন, বিদেশীয়ের আধিপত্য ইত্যাদি নানা দুর্ঘটনায় সকলেই ব্যস্ত, সুতরাং ত্রিপুরার শমশের গাজীকে দমন করিবার উপযুক্ত পাত্র তখন কেহ ছিলেন না। ত্রিপুরেশ্বর অনেকবার সানুনয়ে মুর্শিদাবাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু সময় গতিকে কোন সুফল হইল না। যুবরাজ নিরুপায় হইয়া কাছাড় ও মণিপুর রাজ্যে গিয়া সৈন্য সংগ্রেহের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময় প্রবল প্রতাপান্বিত আলিজা মীরকাসিম বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্টিত হইলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দুঃখের অবস্থা বর্ণন করিলেন। নবাব মীরকাসিম যুবরাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ত্রিপুরার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করতঃ সনন্দ প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বে শমশের গাজীকে ধৃত করিয়া নবাব সন্নিধানে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত মির্জ্জা আলিবেগের নেতৃত্বে একদল

সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবাবের সৈন্য ত্রিপুরার সীমায় উপস্থিত হইলেই শমশের গাজী তাহাদের গতিরোধ করিল। উভয় দলে ভীষণ সংঘর্ষণ উপস্থিত হইব। কিন্তু সমশেরের ক্ষিপ্রকারিতায় নবাব-সৈন্য পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। নবাব মীরকাসিম ইহাতে আরও উত্তেজিত ও রাগান্বিত হইয়া ২টী কামান সহ বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক শমশেরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবার শমশেরের সৌভাগ্য-তপন পশ্চিমাকাশে বিলম্বিত হইল। নবাবের প্রেরিত সৈন্যগণ ভীম ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়া শমশেরের সৈন্য সমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাকে বন্দী:করতঃ নবাব সমক্ষে উপস্থিত করিল। মৃত্যুকালে মানুষের যেমন বিকার উপস্থিত হয়, শমশেরেরও তাহাই হইয়াছিল। মীরকাসিম শমশেরকে বলিলেন "শমশের, তুমি যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে প্রভু বলিয়া মান্য কর,তুমি প্রাণ ভিক্ষা এবং পরগণে দক্ষিণ শিক ও পরগণে মেহেরকুলের জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।" কিন্তু শমশের তাহা স্বীকার করিল না, বলিল, "সিংহ হইয়া দুই দিন জীবিত থাকাও শ্রেয়, কিন্তু শৃগাল হইয়া সহস্র বৎসর জীবন ধারণ করাও নিতান্ত ঘৃণার বিষয়। প্রাণ যায়, সেও ভাল,তথাপি বিধর্ম্মীকে প্রভু বলিয়া মান্য করিব না।" এতাদৃশ বাক্যে মীরকাসিম মহা কুপিত হইলেন এবং শমশের গাজীকে তোপের মুখে বন্ধন করিয়া প্রাণ দণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে নবাবের আদেশ প্রতিপালিত হইল। যুবরাজ কৃষ্ণমণি "মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য" আখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শমশের গাজী হীন বংশজাত হউক,দস্যু হউক, ডাকাইত হউক, কিন্তু সে বহু গুণসম্পন্ন ছিল। তাহার সাহস ছিল,তেজ ছিল, বিক্রম ছিল, উৎসাহ ছিল, একাগ্রতা ছিল, শক্তি ছিল, বস্তুতঃ মানুষের যাহা যাহা থাকিবার প্রয়োজন, তাহা প্রায় সমস্তই ছিল। তবে এহেন উদ্যোগী, সাহসী,শক্তিশালী পুরুষের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম, ও ভীষণ অপমৃত্যু কেন হইল? কেন শমশের আজ দস্যু বলিয়া বিঘোষিত হয়? তাহার কারণ আর কিছুই নহে। সে নিজের বুদ্ধির দোষে আত্মহারা হইয়া প্রভুর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল; প্রভু কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল; আশ্রয়দাতার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। অবশেষ আত্মশ্লাঘা-রূপ বর্ব্বরতায় তাহার এহেন অপমৃত্যু ঘটিল। কিন্তু তাহার অন্তিম বাক্য নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে, যথা "সিংহ হইয়া দুই দিন জীবিত থাকাও শ্রেয়।" শমশের গাজী যে প্রণালীতে রাজ্য-শাসন আরম্ভ করিয়াছিল,তাহাতে তাহাকে একজন বিচক্ষণ নরপতি বলা যাইতে পারে। প্রজাদের পার্শী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত শমশের অনেক গুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল। বিনা ব্যয়ে দরিদ্র বালকগণ তাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিত। আগন্তুকদের অবস্থানের জন্য রাজ্যের সর্ব্বত্রই অনেক গুলি সরাই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে থাকিবার ও আহারের সুন্দর বন্দোবস্ত থাকিত। অনেকগুলি গুণবান হিন্দু ও মুসলমানকে ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর ইত্যাদি নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিল। তাহার অধিকার হইতে ধান চাউল ইত্যাদি শস্য অন্য অধিকারে রপ্তানী হইতে পারিত না। বাজারের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একটি মূল্য তালিকা বাজারে লটকাইয়া দেওয়া

হইত। সেই নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য কেহ গ্রহণ করিতে পারিত না। এই সমস্ত শাসন-সুশৃঙ্খলায় শমশেরকে শুধু দস্যু ডাকাইতও বলা যায় না। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়

শ্রীসৈয়দ নুরুল হোসেন

# বিধবা রমণী।

(কোন একখানি পুস্তক পড়িয়া) (১)

আর পাপিয়ার বুলি—
পিয়ার ত নাহি লাগে।
কুহুরবে—উহু মরি!
কি ভয় পরাণে জাগে॥
শুক শারিকার গীতি
মহাভীতি পরকাশে।
হুরু হুরু করে হিয়ে
দয়েলের মৃদুভাষে॥
কুররী করুণ স্বরে
পরাণ ফাটিয়ে যায়।
কাকলী লহরী বেগে
শোকের লহরী ধায়॥
মরাল ময়ুর রবে
আকুলিত হয় মন।
জাগিয়ে পূরব স্মৃতি
করে আরো উচাটন॥

মলয় বাতাসে হয়
উদাস হতাশ প্রাণ।
চন্দনের গন্ধে দেহ
করে যেন আনচান॥
সান্ধ্য-সমীরণে শেল
বিঁধে এই পোড়া বুকে।
অনুকূল ছিল যারা
প্রতিকূল এবে দুখে॥
সুধার আধার চাঁদে
উগরে গরল রাশি।
কোমল কুসুম দামে
লাগায় গলায় ফাঁসি॥
স্বভাবের চারুশোভা
কত প্রেম পরকাশে।
নিত্য রবি শশী তারা
ভাসে হাসে নীলাকাশে।
পূর্ব্বের মতন সব,
নূতন কিছুই নয়।
কিন্তু যেন বিষে ভরা,
নহে আর মধুময়॥
আঁধার নিশায় যবে
নির্লজ্জ তারকা গুলি।
উপহাস ছলে হাসে
আমোদ আহ্লাদে গলি।
বড় ব্যথা পাই মনে,

---

(১) "কবিতারেণু"। কাকিনা রাজষ্টেটের অন্তর মেম্বর ব্রাহ্মভ্রাতা স্বর্গীয় অনাথবন্ধু রায় মহাশয়ের স্ত্রী অনাথিনী মোক্ষদা সুন্দরী রায় রচিত।

কাঁদায় কাঁদা আইসে, ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক। বক্ষ্যমাণ কবিতাটী সেই স্বাভাবিকতার দুই এক ফোঁটা জল মাত্র। রচয়িত্রীর মর্ম্ম বেদনার গভীর উচ্ছ্বাস বড়ই সন্তাপপ্রদ, এমন কি, পাঠকালীন অতি পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত।

সে কথা বলার নয়।
জানেন তা' অন্তর্য্যামী
প্রভুদেব দয়াময়।
মরু-সম এ হৃদয়ে
নাহি তৃণ লতা লেশ।
প্রভাকর খর করে
জ্বলে' পুড়ে হয় শেষ।
তরুণ অরুণ-ভাতি
সিন্দূর মণ্ডিতকায়।
উষার বিমল ভালে
কি সুন্দর শোভা পায়।
আমার এ পোড়া ভাগ্যে
সে সৌভাগ্য গেছে চলে'।
কালের করাল স্রোতে
ধুয়ে' মুছে' হেজে' গলে'।"
কই সে প্রাণের প্রিয়
অমূল্য হৃদয়-নিধি।
অকালে সে কুবলয়ে
কাড়িয়ে লইলি বিধি॥
ডুবিনু শোক-সলিলে
ছিন্ন মৃণালিনী প্রায়।
সুধার অভাবে বল,
সুধাকরে কে শুধায়?
ছিলাম চাঁদের মত
রবির নয়ন পথে।
কত শোভা ধরিতাম
ধরিয়ে হৃদয়-রথে॥
পিতা মাতা ভাই ভগ্নী—
বিয়োগ-বিধুর প্রাণ।—
শোকানলে জ্বলে' পুড়ে'
হইলেও মুহ্যমান॥
মরমের জ্বালামালা
মরমেই র'য়ে যায়।
গুমরি গুমরি মরে,
প্রকাশ্যে নাহিক তায়॥
প্রচণ্ড তপন-তাপে
পাণ্ডুর বরণ শশী।
অতুল রূপের ছটা—
অতলে' তলায় খসি॥
একের অভাবে তাই
বাঁদর সাজিতে হয়।
আদর করে না কেহ,
পোড়া কাঠ পড়ে' রয়॥
কোথা গেলে হে দয়িত!
দয়ামায়া ভুলিয়ে।
সুখের পসার মম,
চিরতরে তুলিয়ে॥

দেব!
স্বর্গে গিয়ে সুখে আছ বলে মোর প্রাণে।
যোগ্য নহি; তবু চাই আকাশের পানে॥
লজ্জা, অবনত মুখে করি ছোট আঁখি।
আকাশ পাতাল গণি তোমায় না দেখি॥
শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ইহা অনেকেই বলে।
পতি-সেবা সতীধর্ম্ম—সে পুণ্যের ফলে॥
হরিলোকে হরিসহ একীভূত নরে।—
পেয়ে নারী, লক্ষ্মীসম সুখে কাল হরে॥
বড়ই আশার কথা—ভরসার স্থল।
সে বাঞ্ছিত ফলে যা'রা বঞ্চিত কেবল॥
নারীকুলে নয় তা'রা পতিপরায়ণা।
সে ঘৃণার কথা আর কবনা কবনা।
আমার দেবতা তুমি, আমি তব দাসী।
তোমায় পূজিতে তাই, বড় ভালবাসি।
কিন্তু পোড়া ভাগ্যে মোর যে সেবার ভার।
ঘুচিয়ে গিয়েছে নাথ! অভাবে তোমার।
স্বর্গের দেবতা তুমি তোমারে ধেয়াই।
( মানসে মনন করে ) তবু নাহি পাই।
খিন্নমনে শূন্য প্রাণে সদা কেঁদে মরি।
কাণ্ডারী-বিহনে যথা তুফানেতে তরী।

আকাশ-কুসুম দিয়ে পূজিলে আকাশে।
প্রেম-প্রীতি ভালবাসা কভু নাহি আসে
তাই মনে মনে এবে করিয়াছি পণ—
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।
কঠোর বিধবাব্রত করি অঙ্গীকার।
এক-বস্ত্র একাহার মাত্র করি সার।
লজ্জা, সজ্জা, সুখশয্যা তেয়াগি সকল।
দেখাইব অবলার হৃদয়ের বল।
তোমার মধুর মূর্ত্তি মরমে স্থাপিয়ে।
ধোয়াইব পা দুখানি চক্ষুঃ জল দিয়ে।
রুক্ষ কেশে মুছাইব চরণ তোমার।
প্রাণের আগ্রহ পোরা অর্ঘ্য দিব আর।
ভাবের কলিকা হার গাঁথি এক মনে।
পঞ্চ উপচারে পূজা করিব যতনে।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য স্বরূপ।
শ্রদ্ধারতি প্রীতি-ভক্তি, দিব অনুরূপ।
সুশীতল স্নেহ-নীর সুবাসিত ক'রে।
অর্পিব তোমায় নাথ! পানীয় অপরে।
অশ্রুপূর্ণ আঁখি দিবে আচমনী-দ্বয়।
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি পদে পড়িবে নিশ্চয়।
অধরে তাম্বুল দিব প্রিয় অনুরাগে।
বিষাদের ছায়া যেন কভু নাহি লাগে।
হৃদয়-নিলয়ে রাখি চরণ যুগল।
নিরখিব নিরবধি মুখ নিরমল।
করিব সেবার কার্য্য যত আছে মনে।
সাধিব তোমার প্রীতি শয়নে স্বপনে।
প্রাণের দেবতা তুমি, আমি তব দাসী।
তোমায় পাইতে তাই বড় ভালবাসি।
অন্তিমে—এ আশীর্ব্বাদ করিও আমায়।
মিটে যেন মোক্ষ-সাধ মিলিয়ে তোমায়।

শ্রীব্রজনাথ মুন্সি।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৯। **কেদার রায় বা বঙ্গের শেষ বীর।** শ্রীঅনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৷০। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এরূপ অবস্থায় প্রতাপ আদিত্যকে "শেষ বীর" আখ্যা না দিয়া কেদার রায়কেই "শেষবীর" আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে কি ?"

নব্যভারতে শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় "বারভুঞা" শীর্ষক প্রবন্ধ সকলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কেদার রায় বঙ্গের শেষ বীর। এখনও তাঁহার কথা অখণ্ডিত রহিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থকারের পুস্তকের নামকরণ ঠিক হইয়াছে। পুস্তক খানির লেখা সুন্দর হইয়াছে। রঙ্গালয়ে ইহার অভিনয় হইলে দেশের অনেক উপকার হইবে।

৩০। **মহারাজ রাজবল্লভ সেন ও তৎসমকালবর্ত্তী বাঙ্গালার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ।** শ্রীরসিকলাল গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১৲। এই পুস্তক খানিতে বাঙ্গালা ইতিহাসের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নব্যভারতের ভূতপূর্ব্ব লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের অনেক কথার প্রতিবাদ এই পুস্তকে আছে। সে সকল কথার প্রত্যুত্তর কৈলাস বাবু দিলে ভাল হয়। অন্যান্য সিদ্ধান্ত

সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, তবে পলাসীর সমর সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করি না। তিনি লিখিয়াছেন—"পলাসীর রণ-ক্ষেত্রই ভগবানের ঐ মহদুদ্দেশ্য সাধনের সোপান-স্বরূপ।" * * "ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি, অজ্ঞান তিমিরের স্থলে শিক্ষার পবিত্র আলোক এবং স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।" এই সকল কথা আমরা মোটেই স্বীকার করি না। স্বদেশের পুণ্যশ্লোক অক্ষয়কুমার এবং নিখিলনাথ সেরাজের কলঙ্ক-কালিমা অপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা মনে করি। ইংরাজ স্বার্থ-সাধনের জন্য দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের মহদুদ্দেশ্য সাধনের সোপান, এ কথা বাঙ্গালী লিখিতেছেন, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ মুসলমান-কলঙ্ক ঘোষণাকে ভারতে রাজত্ব-বিস্তার করার একমাত্র উপায় মনে করিয়া, তাহাই, এতদিন, অবাধে করিয়া, হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন ইংরাজ সেই মুসলমানকে আবার হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন! এমন শাসন-নীতি আর কেহ কখনও দেখে নাই। ইহার গুণ কীর্ত্তন করিতে বাঙ্গালী অগ্রসর—অপদার্থতা এবং গোলামীর চরম দশার আর বাকী কি? হায় রে কালের মহিমা! যে বিভাগ-নীতি ইংরাজশাসনের মূল মন্ত্র, এই গ্রন্থকার সেই নীতি অবলম্বন করিয়া কায়স্থ বৈদ্যের মধ্যগত অসদ্ভাব কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বদেশী-আন্দোলনের দিনে এইরূপ পুস্তক প্রচার হইল, বড়ই দুঃখের কথা।

৩১। মাতার প্রতি উপদেশ। শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৸৹। পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু রুচি-বিপর্যায়ের ভয়ে এ পুস্তক মাতাদিগের হস্তে দিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবুও আমরা বলিব, এ পুস্তকখানি পাঠে আমরা প্রভূত উপকার পাইয়াছি।

৩২। ব্যাধি ও প্রতিকার। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। দেবকুমারের পদ্য লেখা পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, এবার গদ্য লেখা পড়িয়া সুখী হইলাম। লেখকের চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাইলাম।

৩৩। সেবক-সঙ্গীত। শাখুয়াই "সেবক-সমিতি" হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৴১০। কয়েকটী সুমিষ্ট স্বদেশের গান ইহাতে আছে

৩৪। মাতৃপ্রেম। শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ।৹। অতি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই।

৩৫। জাতীয় কবিতা। শ্রীগোপাল চন্দ্র সরকার প্রণীত, মূল্য ৴৹। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম। কত সুন্দর দেখুন।

"মণিবন্ধে এ বন্ধন ঐক্য-বন্ধনের চিন,
মনে মনে প্রাণে প্রাণে বাঁধা থাক্ চিরদিন।
থাক্ এ বন্ধন-সূত্র অজর অমর হ'য়ে,
গৃহ-ভেদ-দুষ্ট-দৈত্য মরুক লাঞ্ছনা স'য়ে।
ধর্ম্মমত-দ্বৈধ আছে মাতৃ-কার্য্যে দ্বৈধ নাই,
আমরা মায়ের পুত্র সকলেই ভাই ভাই।"

৩৬। বিজলী তলা। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৷৹। সব নাটকই একটী উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হয়; কিন্তু এ নাটক

কি উদ্দেশ্যে রচিত, মোটেই বুঝিলাম না। প্রণয়ের জয় কীর্ত্তন যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এ হতভাগ্য বঙ্গে তাহার কি আর প্রয়োজন আছে? গ্রন্থখানি আগস্ত পড়িলাম, কিন্তু শেষে দুঃখ হইল, এ দেশের গ্রন্থকারগণ কবে স্বদেশানুরাগের দ্বারা চালিত হইয়া গ্রন্থ লিখিবেন।

৩৭। মহাশোক। শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ॥০। পুস্তকখানিতে অনেক সুন্দর উপদেশ আছে—যথা—

"রে অন্ধ-অন্তর! হের জ্ঞান-দৃষ্টি-বলে,
নিদারুণ ভ্রান্তি-নাশ হবে অবহেলে,
সৃষ্টির প্রারম্ভকালে, শরীরী প্রাণীর ভালে,
অত্যুজ্জ্বল রক্তাক্ষরে হয়েছে লিখন,
পূর্ণিমা অমার মত, জন্ম-মৃত্যু অবিরত,
হবে, যতকাল নহে নির্ব্বাণ সাধন।
নিয়তি নেমির এই ঘোর আবর্ত্তন।

দ্বিদল চণক সম পুরুষ প্রকৃতি,
এক আবরণে ব্যাপ্ত অভিন্ন মূরতি,
বিজ্ঞান-নয়নে হের রে ভ্রান্ত অন্তর।
রূপান্তর করা বই. প্রকৃতির সাধ্য নাই,
ছিল যাহা, আছে তাহা, জগত ভিতর,
প্রকৃতির লীলা-ছলে শুধু রূপান্তর।

"মিলন" "বিচ্ছেদ" দুই মহাকার্য্য-ছলে,
প্রকৃতি লীলায় মগ্ন যোগ-মায়া বলে,
অণু-রেণু আকর্ষণ, কভু করে চিকর্ষণ,
কোন স্থান নিম্ন হয় অন্যোন্নত করি,
আঁধার আলোক প্রায় দুঃখ সুখ এ ধরায়
কাঁদায় হাসায় জীবে দিবস শর্ব্বরী,
হে আত্ম-প্রবোধ! তুমি চাল শান্তি-বারি।

৩৮। আকুতি। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত, মূল্য ।০। লেখা সরল এবং প্রাঞ্জল।

৩৯। The Sasipada Institute for the year 1906.

ইহা পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মপরায়ণ শশীপদ বাবুর অক্ষয়কীর্ত্তি। কিরূপে আত্মত্যাগ-মন্ত্র সাধন করিতে হয়, এই মহাত্মা আজীবন তাহা দেখাইয়া যাইতেছেন। বিধাতার মহদিচ্ছার জয়। পুস্তকখানি পড়িয়া বিমল আনন্দ পাইলাম।

৪০। দুগ্ধ কি বস্তু দেখুন। শ্রীসাগরচন্দ্র কুণ্ডু কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ॥০। নামেই প্রতিপদ্য বিষয় পরিস্ফুট। পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক ও উপকারী।

৪১। গীতগোবিন্দ। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ৸০। প্রতিভার আদর সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে হইয়াছে,—গীতগোবিন্দ এদেশে জয়দেবের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে অমরত্ব লাভ করিয়া একথা প্রতিপন্ন করিয়াছে। শুধু বিশ্বেশ্বর বাবু কেন, গীতগোবিন্দের অনমুরাগী লোক পাওয়া বড় দুষ্কর। কিন্তু একটী কথা—এদেশে প্রবৃত্তি সাধনার যত আয়োজন হইয়াছে, নিবৃত্তি সাধনার তত হইয়াছে কি? এই স্বদেশী আন্দোলনের মহা পুণ্যময় যুগেও, যে দেশে মাতৃজাতির প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, পথে ঘাটে মহিলাপীড়ন, মহিলা-নিন্দা, মহিলাদিগকে ঠাট্টা তামাসা করিবার সময়, যে দেশের লোকেরা, আপন আপন মা ভগ্নী স্ত্রীর কথা ভুলিয়া যায়, সে দেশে প্রবৃত্তি-প্রেরণার কাহিনী বিঘোষিত করার প্রয়োজন কি? বিলাসের আবল্যে, রিপুপরতন্ত্রতার তারল্যে এদেশ কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে, প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির সে কথা একবার চিন্তা করা উচিত। ক্ষমতা পাইলে, সে ক্ষমতার সুব্যবহার করা সর্ব্বথা উচিত।

বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রস্ফুট প্রতিভা যদি স্বদেশানুরাগের উদীয়মান যুগে স্বদেশ-প্রেমে উদ্ভাসিত হইত,না জানি, কত আনন্দের কারণ হইত। বিশ্বেশ্বর বাবুর রচনা-মাধুর্য্য অসাধারণ, শিল্প-চাতুর্য্য অতি সুন্দর, তাঁহার লেখনীতে যাহা বাহির হইতেছে, তাহা অনিন্দিত হইলেই আমরা সুখী হইতাম। বলিতে চাই এই, গীত-গোবিন্দের এমন সুন্দর অনুবাদ তাঁহার হাত দিয়া না বাহির হইলেই ভাল হইত। তাঁহাকে আর একটু উচ্চ সোপন আরোহণে অভিলাষী দেখিতে চাই। সুন্দর অনুবাদ বলিয়া তাঁহার শত দোষ মার্জ্জনীয় হইয়াছে। তিনি পরম বন্ধু বলিয়া অকপটে সকল প্রাণের কথা লিখিলাম। আশা করি, তিনি বিরক্ত হইবেন না।

৪২। **জাতীয়-কার্পাস-কৃষি-সমিতির অনুষ্ঠান পত্র।** কেবল মাত্র সভা-সমিতি এবং বক্তৃতা দ্বারা দেশের প্রকৃত হিত সাধনের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশী-আন্দোলনে সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করিতে হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম-বীরের পরিচয় দিতে হইবে। আমাদের এই কৃষি-প্রধান দেশ কৃষি কার্য্যের দ্বারা যেরূপ সমৃদ্ধিশালী ও শ্রী-সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য কোন কার্য্যের দ্বারা তাদৃশ ফল লাভের আশা করা যায় না। সম্প্রতি আমরা সাঁওতাল পরগণা হইতে শীর্ষোক্ত সমিতির এক খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। কয়েকটী গণ্য মান্য শিক্ষিত ভদ্র সন্তান যৌথ কারবারে জাতীয়-কার্পাস-কৃষি সমিতির অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃগণ ২৫০ বিঘা কার্পাস চাষের উপযোগী ভূমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন। সমিতির মূলধন দশ সহস্র টাকা এবং তাহা ৫৲ টাকা হিসাবে দুই সহস্র অংশে বিভক্ত। সাঁওতাল পরগণা পার্ব্বত্য প্রদেশ,এখানকার ভূমি সাধারণতঃ উচ্চ এবং শুষ্ক, এই জন্যই এখানে কার্পাস চাষে সমধিক লাভবান হইতে পারা যায়।

গত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ হয় এবং ১৮৮২ সালের ৬ আইন অনুসারে যথা বিধানে উহা রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। তৎকালে সম্পূর্ণ অংশ বিক্রয় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষীয়েরা সমগ্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ জন্য কিয়দংশ জমিতে কার্পাস চাষ করেন। পরীক্ষার ফল সুন্দর হইয়াছে। উৎপন্ন কার্পাস আমরা দেখিয়াছি, কার্পাসের উৎকৃষ্টতা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। সমিতির অনেক অংশ এখনও অবিক্রীত রহিয়াছে, আগামী চৈত্র বৈশাখে সম্পূর্ণ জমিতে কার্য্য হইবে, তজ্জন্য উদ্যোগীগণ অবিক্রীত অংশ বিক্রয় জন্য দেশবাসীকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

বলা বাহুল্য, যে কাল পর্য্যন্ত দেশ-জাত কার্পাস সূত্রে বস্ত্রাদি প্রস্তুত না হইবে, তাবত স্বদেশী বস্ত্রের মহার্ঘতা ঘুচিবে না এবং দেশের আপামর সাধারণ স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে সমর্থ হইবে না। যৌথ কারবারে কার্পাস চাষ-বাঙ্গালীর এই প্রথম অনুষ্ঠান। সংকল্পিত অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলে ইহার দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে এবং এই আদর্শে দেশে কার্পাস চাষের বহুলতা সংঘটিত হইবে। দেশের সুখ দুঃখের কথা যাঁহারা চিন্তা করেন, সেই সকল স্বদেশ-প্রাণ মহাত্মাগণের ইহাঁদের অনুষ্ঠানে সহানুভূতি প্রদর্শন ও পৃষ্ঠপোষকতা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, প্রত্যেক

শিক্ষিত ভদ্র সন্তান সমিতির কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া উদ্যোগীগণকে উৎসাহিত করিবেন এবং দেশের কার্য্যে সহায়তা করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবেন।

যাঁহারা এই সমিতির অংশ গ্রহণেচ্ছু হইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়,মলুটী, মলুটী পোঃ, সাঁওতাল পরগণা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইবেন।

৪৩। ক্লিওপেট্রা। শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ২॥০। ক্লিওপেট্রার জীবন মহা প্রহসনময়। এ কাহিনী পৃথিবী কখনও ভুলিবে না। পাপের চিত্র অঙ্কিত না হইলে পুণ্যের চিত্রের আদর বাড়ে না এ হিসাবে এ কাহিনীর চির কাল আদর থাকিবে। কিন্তু গ্রন্থকারের পক্ষে এত অর্থ ব্যয় করিয়া এই কাহিনী প্রচারের কি উদ্দেশ্য, বুঝিলাম না। গ্রন্থকার একজন অসাধারণ লেখক, তাঁহার ক্ষমতায় পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি নাই।

রুক্মিণী। শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ৷৷৵০। ভাগবতোক্ত বিদর্ভরাজ-নন্দিনী রুক্মিণীর সংক্ষিপ্ত উপখ্যানই এই কাব্যের ভিত্তি। গ্রন্থকাত্রীকে, আমরা জানি না। বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার প্রগাঢ় অধিকারের পরিচয় পাইয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি খেলা কত চমৎকার, দেখুন—

"ওগো,তাঁহার প্রেমের কাছে মোর ক্ষুদ্র প্রেম—
মহা সিন্ধু মাঝে যেন নীহারের প্রায়,
বুভুক্ষু হৃদয় মম সে সুখ-সঙ্গম
লভিতে যে ছুটিয়াছে উৎসাহে আশায়।
ওই যে বাজিছে শুন উৎসব বাজনা,
আকুল করিছে পুনঃ কেন এ পরাণ?
নীরবে উঠিছে প্রাণে বিলাপ বেদনা,
জাগিছে মায়ের মূর্ত্তি প্রফুল্ল বয়ান।
স্নেহের স্বরূপ মম জনক জননী,
আছেন এ মহাপুরে হরগৌরী সম,
ছেড়ে যাব জন্মদাতা, জীবন-দায়িনী,—
ভাবিলে বিকল মোর হয় গো মরম।
কেমনে ছাড়িব এই আনন্দ আশ্রম—
শৈশবের খেলা ঘর নন্দনের প্রায়?
সমগ্র পরাণ ব্যাপি উঠিছে বিষম
ব্যাকুল বিষাদ এক দুর্নিবার হায়!"

পুস্তক খানিতে রচয়িত্রীর বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য অলঙ্কৃত হউক।

৪৭। মক্কাশরীফের ইতিহাস। শ্রীমৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত, মূল্য ৵০। হিন্দু ও মুসলমান, বঙ্গমাতার দুই সন্তান, ঐ দুইয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন বাঙ্গালার উন্নতি সুদুরপরাহত। দুই ভাই এক হয়ে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন না করিলে, জাতীয় ভাষার গঠন হইবে না এবং বাঙ্গালার উন্নতি হইবে না। বাঙ্গালীকে ইংরাজি লিখিতে দেখিলে আমাদের হাসি পায়, মনে হয়, হায়রে কুহক-জালময় গোলামীগিরি, কবে বাঙ্গালীর এ মোহ ভাঙ্গিবে! তাঁহারা মনে করেন, ইংরাজি লেখার লোকের অভাব আছে! তেলা-মাথায় তেল দিতে তাঁহাদের এ সাধের মধ্যে কেবল পরাধীনতার স্ফুট নিক্কণের পরিচয়ে আমরা মরমে মরিয়া যাই! কিন্তু এদেশের শুভ লক্ষণ এই—আজ কাল মুসলমান ভ্রাতারা মাতৃ-ভাষা-সেবায় এরূপ বদ্ধপরিকর হইতেছেন যে, আর বহুদিন বাঙ্গালা ভাষা উপেক্ষিত থাকিবে না, থাকিতে পারে না। মুসলমান ভ্রাতৃগণ আজ কাল সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেছেন দেখিয়া আমরা সকল দুঃখ দূর করিতেছি। তাঁহাদের মঙ্গল হউক।

মক্কাশরীফের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত হই-লেও ভাষা মধুর এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

# মহাকবি ৺ কৃষ্ণচন্দ্রমজুমদার।

শৈশবে বীণা ধ্বনির ন্যায় মধুর রব কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিত। তাহা অন্ধকার দিনের চাকচিক্য-পূর্ণ ভস্মরাশি নহে, মধুর, সারগর্ভ, সাত্বিক ভাব-পূর্ণ, প্রাণস্পর্শী, সকরুণ মধুর কবিতা, যাহা শ্রবণ করিলে প্রাণ আকুল হয়, মর্ম্মের ভিতরে বীণা-ধ্বনি বাজিয়া উঠে, এবং কোন স্বর্গরাজ্যের অপূর্ব্ব সংবাদ হৃদয়-কন্দরে সমানীত হয়, প্রাণ মন উথলিয়া উঠে। যে মোহিনী বীণা-ধ্বনি হাফেজকে পাগল করিয়াছিল,যাহা শ্রীচৈতন্যকে বনবাসী করিয়াছিল, যাহা বিবেকবাণীকে জাগরিত করিয়া শুদ্ধোদনকে শাক্যসিংহ বুদ্ধ করিয়াছিল, এ যেন সেই বাণী। হায়! কতদিন সেই বাণী নীরব হইয়াছে, কতদিন কবিবরের অস্থির মস্তিষ্কে সেই মহান্ ভেরী সমাধি লাভ করিয়াছিল, আজিও যেন মনে হয়, কল্পনার সুদূর প্রান্তরে কপোত ক্রন্দন-ধ্বনিপূর্ণ কান্তারে নীরবে আলুলায়িত কেশে ছিন্ন ভিন্ন বেশে অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুবক কবি দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—

দেশে দেশে প্রিয়তমে করি অন্বেষণ,
না পেলেম কোন স্থানে তাঁর দরশন।
তাঁর সম্মিলন সুখ লাভ হেতু মন,
সদা উচাটন মন সদা উচাটন।
হায়রে কোথায় সেই প্রাণ প্রিয়জন,
কোন্ পথে কোথা আমি করিব গমন।

আবার যেন সেই কবি নিজের জীবনের অসারতা চিন্তা করিয়া বিজন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া লিখিতেছেন,—

গিরি প্রস্রবণ মাঝে প্রান্তর উপরে,
লিখেছিল এই নীতি বাক্য কোন নরে।
কত শত পান্থগণ তৃষাকুল মনে,
এসেছিল এই স্থানে জলের কারণে।
এখন তাদের চিহ্ন নাহি কিছু আর,
আমি গেলে চিহ্ন কিছু রবেনা আমার।

ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ উন্মত্ত হইল, হৃদয় অবশ হইল,জগতের অসারতা অনুভূত হইল, আর সংসারে কি হইবে, ভাবিয়া বীণা-ধ্বনি-আহুত কুরঙ্গীর ন্যায় দৌড়িলেন। তখন অকস্মাৎ বাণ-বিদ্ধ হরিণীর অবস্থা স্মরণ করিয়া লিখিলেন ;—

জাল পেতে নিষাদ করিল মৃগধ্বনি,
চমকিল মৃগগণ তখনি অমনি।
ছুটিল উন্মত্তপ্রায় লক্ষ্য করি শর,
ফুটিল হৃদয়ে শর বাগুরা ভিতর।
রে হাফেজ মত্ত হয়ে কোথা যাও ধেয়ে,
মত্ততায় কি ঘটায় দেখ দেখ চেয়ে।

কবি যেন প্রকৃতির বরপুত্র, কল্পনা কাননের সুমধুর নিনাদী কোকিল। যেন প্রকৃতির ভাষায় প্রকৃতির সহিত আলাপ করিতেছেন,—

"মনে মনে কহিলাম অই সুপ্রকৃতে,
শোভনে বিচিত্র নানা বসন ভূষিতে।"
"অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল,
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার শিরে দিল।"
"জগত মোহিত করি গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ কারে?"
"কমল-নয়ন খুলি কার পানে চেয়ে আছ—
কার তরে [illegible]

কিন্তু কবি সভয়ে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর নিকট বলিতেছেন,—

"প্রবল সংসার স্রোত আমরা দুর্ব্বল অতি
কেমনে করিব নাথ প্রতিকূল মুখে গতি।
যেদিকে বহিছে স্রোত,সেদিকে যেতেছি ভেসে,
নিকটে নরকাবর্ত্ত কি হবে কি হবে গতি।"

কিন্তু হায়, কবি যাহা ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল, কোথায় গেল এই ভুবন-মোহিনী প্রতিভা, কোথায় গেল এই প্রাণ-মন-স্পর্শী আকুলকারী পবিত্র কবিতা, সে কল্পনা-কাননের কলকণ্ঠ কোকিল আর ভবিষ্যতে সে নিনাদ করিল না, আর জগৎ-বাসী উৎকর্ণ হইয়া সে মধুর রচনা শ্রবণ করিল না। সে বীণা অকালে নিস্তব্ধ হইল, কবির সরস হৃদয় হইতে কবিতা দেবী চির তরে অন্তর্হিতা হইয়া তাঁহাকে মরুভূমিতে পরিণত করিলেন, হায় সংসার, হায় * * * কত লোকের তুমি অকালে বিনাশ সাধন করিলে? সামান্য ক্ষুদ্র কয়েকটী মধুর কবিতা এক খানা ক্ষুদ্র গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়া হস্তান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু কবি চিরকাল দারিদ্র্যের কঠোর পেষণে জীবন অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে আমরা কেবল তাঁহার শ্মশান-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিলাতী সমালোচকের ন্যায় বলিতেছি,—"Had Grey written his Elegy,high as he stands, I am not sure he would stand higher."

কবি শেষ বয়সে আরও কবিতা লিখিয়াছিলেন,;কিন্তু তিনি যদি সম্ভাবশতক লিখিয়াই সংসার হইতে বিদায় হইতেন, তবে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। কিন্তু ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে, ঘোর বিপদের সময়ে কবিবরের হৃদয় অন্তর্হিত হয় নাই।

কবির জীবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যশোহর জেলার খুলনা* সবডিবিসনে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশের পরম কুলীন শাখায় মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ চাউ দাশের পৌত্র নরসিংহ দাশ রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গে সেনহাটী গ্রামে প্রথম বাস করেন, এবং তাহার সন্তানগণ পুরুষানুক্রমে ঐ সেনহাটী গ্রামে কবি-কর্ণাভরণ,কবি-ভারতী, কবিকণ্ঠহার, প্রভৃতি উপাধিভূষিত হইয়া আসিতেছিলেন, তাহার বংশ শেষে তিন অংশে বিভক্ত হইল, অরবিন্দ, জয়, ও বিষ্ণু, এই অরবিন্দ ও বিষ্ণু বঙ্গের বৈদ্যগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠকুল। অরবিন্দবংশে নরহরি দাস কবীন্দ্র বিশ্বাস অতি সুবিখ্যাত সাধক ও কবি ছিলেন, তাহার সন্তানগণ কালীয়া, সেনহাটী ও বাণীবহ গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। এই নরহরি দাসের সুবিখ্যাত বংশের একটী শ্রেষ্ঠ শাখায় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাহার পাঠশালার বিদ্যা ও যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত পার্শী জ্ঞান ছিল, এই অবস্থায় তিনি ঢাকা গমন করেন, ও তথায় ঢাকা প্রকাশ নামক সুবিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক হয়েন, সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মিত্র তাহার শিষ্য ও সহকারী ছিলেন, কালে উভয়ের লেখায় এত সুসাদৃশ্য লক্ষিত হইত যে, কোনটী কাহার লেখা, বুঝা কঠিন ছিল। আমি ইহাদিগকে আমার কবিতা লিখার গুরু স্থানীয় মনে করি। প্রথমে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের কবিতা-কৌমুদী ছাত্রবৃত্তির তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিয়া একটু একটু কবিতা লিখিতে যত্ন করিতাম, পরে ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে কৃষ্ণচন্দ্র

* তখন খুলনা জেলা হয় নাই।

মজুমদারের সদ্ভাব-শতক হৃদয়ে স্থায়ী কবিতা লেখার বাসনা উৎপাদন করিয়াছিল, পরে হেম বাবুর সতেজ লেখনী অনেক অংশে প্রাণ মন আকর্ষণ করিল। যাহা হউক, এই কৃষ্ণচন্দ্রের ও হরিশ্চন্দ্রের কবিতা এরূপ এক ভাবাপন্ন যে, কখনও কখনও দুই জনেরই একরূপ ছাঁদ বোধ হইত। যথা—

আয় মন চল যাই সেই সব দেশে।
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে। কৃষ্ণচন্দ্র
আয় মন চল যাই কাব্য সরোবরে
সদ্ভাব-সরোজ যথা সদা বাস করে। হরিশ্চন্দ্র

উভয়ের হস্তে ঢাকা প্রকাশ অতি উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং এই সময়েই কৃষ্ণচন্দ্রের সদ্ভাব-শতক প্রকাশিত হইয়া ছাত্র-বৃত্তির পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইল। কৃষ্ণচন্দ্র সুবিখ্যাত পারসিক কবি দেওয়ান হাফেজের পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু পোপের হোমারের ন্যায় এই অনুবাদ অতি প্রাণস্পর্শী ও মৌলিক হইয়াছিল। পারস্য ভাষায় আমাদের জ্ঞান নাই, দেওয়ান হাফেজ পড়ি নাই, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা অক্ষয় হউক, হাফেজের অভাব আর বাঙ্গালীর অনুভূত হইবে না। পড়িলেই বোধ হয় যেন আকুল প্রাণে পাগল কবি প্রকৃতির দ্বারে দ্বারে গান করিতেছেন ও কান্দিতেছেন। পরিশেষে হাফেজ পড়িলে যাহা হইয়া থাকে, এরূপ প্রবাদ আছে, কবির ভাগ্যে তাহাই ঘটিল, তিনি উন্মাদ রোগ গ্রস্ত হইলেন। তাহার পরে রা. সর জীবন চরিত ও পরেও কোন কোন কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং যশোহর স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষক হইয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সুমধুর যৌবনের মনোহর কবিতা আর সে লেখনীকে আশ্রয় করে নাই, আর সেই ঢাকা-প্রকাশের সতেজ প্রবন্ধ সে লেখনীতে আবির্ভূত হয় নাই। যে ঈশ্বর গুপ্তের সরস কবিতায় ন্যায় শত শত অনুকারী কবিতার বঙ্গ ভাষায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আর তাহা তাহার আকর স্থানে ফিরিয়া আসিল না। কবি যেন আজীবন ছন্নবুদ্ধি হইয়া জীবন কাটাইয়াছেন। এই অবস্থার দুই একটী কিংবদন্তী আমরা প্রকাশ করিতেছি। একবার তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী তাহার বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, আমার ইহাতেই চলিয়া যাইবে, আমার আবশ্যক অতি অল্প, দুই পয়সার চিড়া ও এক পয়সার গুড় হইলেই আমার দিন চলিয়া যাইবে

এই ভাবের কবিতাও তাঁহার অনেক আছে। যথা—

একদা ছিল না মম বিনামা চরণে
চলিলাম বাহিরেতে সমীর সেবনে।
দেখিলাম একজন পদ নাহি তার,
অমনি জুতার ক্ষোভ ঘুচিল আমার।

সর্ব্বদা দরিদ্রের সহিতই তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তাঁহার—

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

বোধ হয়, একদিন নাঃ এক দিন দুঃখী লোক মাত্রেই স্মরণ করিয়াছেন। বিটপী-গণের—

"যখন মানব-কুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়,
কিন্তু ফল-শালী হ'লে এই তরুগণ
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন,
ইহাদের শিরোপরে লোষ্ট্র-নিক্ষেপণে
সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে।"

কি মহৎ কথা, সকলেরই হৃদয়ে গ্রথিত রাখা কর্ত্তব্য। কবির জীবন চিরকাল এই ভাবের পরিচয় দিয়াছি। বাস্তবিক তিনি হাফেজের ন্যায় সংসারকে অবজ্ঞা করিতেন ও বৈরাগ্য-ব্রত আজীবন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই আত্মত্যাগী ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মে মাতোয়ারা মহান্ আত্মা প্রায় সপ্ততি বর্ষ বয়সে জীবলীলা শেষ করিয়াছেন, সেনহাটী গ্রামে অনেক কৃতবিদ্য মহৎ লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেই সেনহাটী গ্রামের চিরস্থায়ী আভরণ। যত দিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, যতদিন অ কুল প্রাণ ভগবানের শ্রীচরণে ব্যাকুল মনে প্রার্থনা করিবে, ততদিন কৃষ্ণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক উন্মাদকারী কবিতা সাধক ও কাব্য পাঠকগণকে মোহিত করিবে। ধনীগণ জগতে চিরবিস্মৃত হইবেন; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কালকবলে সমাহিত হইবেন, কিন্তু কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি, কৃষ্ণচন্দ্র চিরদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়-মন্দিরে জীবিত থাকিবেন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাশ গুপ্ত।

# ত্বক্।

চক্ষু কর্ণাদি যেমন প্রত্যেকেই এক একটী ইন্দ্রিয়, ত্বক্ সেরূপ একটী ইন্দ্রিয় নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে এক্ষণে দুইটী বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সমষ্ঠি বলিতে হয়। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাকে যুগ্ম ইন্দ্রিয় বলাই অধিকতর সঙ্গত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ত্বক-ইন্দ্রিয় সর্ব্বেন্দ্রিয়-সমষ্ঠি। প্রাথমিক জীবগণের কোন ইন্দ্রিয়ই নাই, কিন্তু ত্বক্ আছে। তদ্দারাই তাহাদিগের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। উচ্চতম জীবগণের ইন্দ্রিয় সকল ত্বক্-ইন্দ্রিয়েরই বিকার মাত্র। জীব যতই নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করিয়াছে, ততই ত্বক্-ইন্দ্রিয় হইতে ক্রমশঃ চক্ষু কর্ণাদি জাত হইয়াছে। এই দিক হইতে দেখিলে ইহাকে অন্য ইন্দ্রিয়গণের পিতামহ বলা যায়। অন্যান্য বিশেষ ইন্দ্রিয় সমুদ্ভূত হওয়ার পর, তাহারা স্ব স্ব কার্য্যভার ত্বকের নিকট হইতে গ্রহণ করায় ত্বক এক্ষণে সে সকল কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার প্রতি দ্বিবিধ কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। এই নিমিত্তই তাহাকে যুগ্ম-ইন্দ্রিয় বলিয়াছি। নিম্নে এই তত্ত্ব যথাসাধ্য বিশদ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ ইহার সহিত জীবের বুদ্ধি বিকাশের ইতিহাস ঘনিষ্টরূপে জড়িত রহিয়াছে।

ভ্রূণ তত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, জীবকোষ বহুভাগে বিভক্ত হইয়া জীবদেহ গঠিত করে। একটী কোষ দ্বিখণ্ডিত হইল, উহার প্রত্যেক খণ্ড আবার দ্বিখণ্ডিত হইল, এই খণ্ড চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটী আবার দ্বিখণ্ডিত হইল। এইরূপে মূলকোষ বহুভাগে খণ্ডিত হইতে থাকে। ক্রমে বিভাগ কার্য্য যতই অগ্রসর হয়, ততই কোষখণ্ড সকল কখন বা পাশাপাশি, কখন বা ঊর্দ্ধাধঃ রূপে [illegible] এরূপ বিভাগের ফলে কোষ

পিণ্ড উৎপন্ন হয় ও তাহাতে তিনটী স্তর গঠিত হয়। (১) এই কোষপিণ্ড গোলাকৃতি; সুতরাং যাহা ঊর্দ্ধস্তর, তাহাই ঐ পিণ্ডের বহিরাবরণ হইয়া যায়; যাহা অধস্তর তাহাই কেন্দ্রাবরণে পরিণত হয়; এবং যাহা মধ্যস্তর, তদ্দারা মধ্যাবরণ নির্ম্মিত হয়। এই বহিরাবরণই জীবদেহের বাহ্যত্বক্; ইহা হইতেই ত্বক্, লোম, কেশ, নখাদি (২) উৎপন্ন হয়; এবং অপর দুই আবরণ হইতে দেহের অন্যান্য অংশ সকল নির্ম্মিত হয়। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা—ইহারাও বাহ্য ত্বকের বিকার। ত্বক্ই বিভিন্নরূপে গঠিত হইয়া কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা নির্ম্মিত হইয়াছে; আর ত্বকেরই স্থান বিশেষে স্ফীত কোষ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে বর্ণোপকরণ(৩) সঞ্চিত হওয়ায় চক্ষু সঞ্জাত হইয়াছে। নিম্নতম প্রাণী হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেরই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ। সুতরাং ত্বক্ হইতেই ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না (৪)। নিম্ন প্রাণীগণ মধ্যে অনেকের চক্ষু নাই, কিন্তু দেখিতে পায়; কর্ণ নাই, শুনিতে পায়; জিহ্বা নাই, স্বাদ পায়; এবং নাসিকা নাই, ঘ্রাণ পায়। ইহাদিগের এই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য এক-ত্বক্ ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হয়। চক্ষু না থাকিলেও, দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অভাব সত্বেও,

(১) Foster and Balfour Embryology 2d Edn. p. 319-317.

(২) কেশ, লোম, নখাদি ত্বকের বিকার মাত্র।

(৩) Pigment. নব্যভারত ১৩১২ সন পৃষ্ঠা ৪০১—৪০২।

(৪) "I am inclined to believe that the primal, fundamental sense—the sense of touch—from which all other senses have been evolved or developed, has been in existence almost as long as life. Weir—The Dawn of reason. P. 7.

বাহ্যত্বক্-সংলগ্ন সূক্ষ্ম আঁশবৎ স্নায়ু দ্বারা কোন কোন প্রাণী আলোক এবং অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে পারে। এই সকল আঁশ ত্বকেরই রূপান্তর মাত্র। এক শ্রেণীস্থ উর্ণনাভ (১) নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ গুহামধ্যে বাস করে। উহাকে আলোতে আনিলেই অন্ধকারের দিকে যাইতে চাহে। উহার চক্ষুর কোন কিছুই নাই, এবং আঁশ কি শিরা কিছুই নাই। উহার আলোকের অনুভূতি ত্বক্ দ্বারাই হইয়া থাকে। সমুদ্রের মেডুসা Medusa ছত্রের ন্যায়; ঐ ছত্রের কিনারায় যে সকল গোলাকার কোষ আছে, তদ্দারাই ঐ জীব আলোক অনুভব করিতে সক্ষম হয়। সমুদ্র-বাসী কোন কোন মৎস্যের (Star fish) ডানাতে বর্ণোপকরণ বিশিষ্ট কোষ আছে; তাহাতেই উহাদিগের চক্ষুর কার্য্য হয়। কোন কোন শুগ্লিও (Oyster) তাহার বাহ্যাবরণের কিনারা-সংলগ্ন কোষ দ্বারা অন্ধকার হইতে আলোকের পার্থক্য বুঝিতে পারে।

অধিকাংশ চক্ষুহীন পোকার ত্বকে বর্ণোপকরণযুক্ত যে সকল কোষ আছে, তদ্দারাই তাহারা আলোক অনুভব করে। কেঁচোর আলোক বোধ হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। উহার বাহ্য ত্বকে বর্ণোপকরণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র গোলাকার গাঁইটের ন্যায় যে সকল কোষ আছে,তাহাতেই উহার চক্ষুর কার্য্য হয়। শম্বুকের চক্ষু তাহার শুঁড়ের অগ্রভাগে; তদ্দারা সে দেখিতে পায়। শুঁড় বাহ্যত্বকেরই বিকাশ মাত্র। কোন কোন ছুঁচো চিরদিন অন্ধকারে বাস করে; এ নিমিত্ত তাহাদিগের চক্ষু একরূপ [illegible]
[illegible]

(১) Anthrobia.

হইয়া গিয়াছে; তথাপি তাহারা আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে পায়। দাক্ষিণাত্যের উপকূলে কতিপয় সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়, তাহাদের পৃষ্ঠস্থিত কোষ সকলই দর্শন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। কীট পতঙ্গদিগের মধ্যে অনেকের শুঁড়ের অগ্রভাগস্থ কোষই চক্ষু। মানব জাতির মধ্যেও কোন কোন জন্মান্ধ আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। তাহাদিগের চক্ষু স্থানের ত্বক্ দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। জীবদেহে চক্ষু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, কখন বা ত্বক্ সংলগ্ন বর্ণোপকরণ-যুক্ত স্ফীত কোষ; কখন বা আঁশ, শিরা, অথবা শুঁড়ের অগ্রভাগস্থ ঐরূপ কোষ, দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন করিত। দেহের ত্বক্-সংলগ্ন কোষের বিকারেই আঁশ শিরা অথবা শুঁড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার আঁশ, শিরা অথবা শুঁড়ের খর্ব্বতা বা লোপ বশতই চক্ষু পুনরায় দেহ সংলগ্ন হইয়াছে। প্রকৃত চক্ষু থাকুক, আর নাই থাকুক, জগতে বোধ হয় এমন জীবই নাই, যে আলোক এবং অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে না পারে (১)। ত্বক্ অথবা ত্বকের বিকারই চক্ষুহীনের চক্ষু।

কর্ণের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ত্বক্ সংলগ্ন কোষ, আঁশ, কেশ, কিম্বা, বাহ্য ত্বকের অন্য কোন বিকারের দ্বারা শ্রবণ কার্য্য সম্পন্ন হইত। কতিপয় পিপীলিকা, মশক, প্রজাপতি, ফড়িং, রেশম কীট, গোবরে পোকা এবং আরসোলার মধ্যেও কাহারও বা শুঁড়ে, কাহারও বা পায়ে আঁশ, কেশ অথবা বর্ণোপকরণযুক্ত কোষ আছে; তদ্দ্বারাই তাহারা শুনিতে পায়। উহা কাটিয়া দিলে ঐ সকল জীব বধির হইয়া যায়। এস্থলেও প্রথমতঃ ত্বক্ সংলগ্ন কোষ, পরে আঁশ আদি, অবশেষে তাহার খর্ব্বতা অথবা লোপে পুনরায় ত্বক্লগ্ন শ্রবণেন্দ্রিয় গঠিত হইয়াছে। বাহিরের কর্ণ পল্লব প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় নহে; উহা কেবল শব্দকে ঘনীভূত এবং একত্রিত করে। আর উহার সঞ্চালনে শব্দের দিক্ নির্ণয় হয়। (১)

অতি ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক কীট মধ্যে কতিপয় কীটের (২) বিলক্ষণ স্বাদ জ্ঞান আছে। তাহাদের আহার্য্য বস্তু শ্বেতসার। এই শ্বেতসারের চূর্ণ এবং বালিকণা ঐ সকল কীটের নিকটে রাখিলে প্রথমোক্ত চূর্ণ অস্থায়ীকর দ্বারা গ্রহণ করে, কিন্তু, বালুকা হয়ত গ্রহণই করে না, না হয় গ্রহণ করিলেও পরিত্যাগ করে। বালুকণা সকলকে কদাচ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করে না। প্রাথমিক জীব সকলের অনেকেরই এইরূপ। নিজের দেহ পোষণোপযোগী বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু ধরিলেও দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করায় না। ইহারা আহার্য্য বস্তুর স্বাদ আপনা হইতেই বুঝিতে পারে, এবং বোধ হয় সেই নিমিত্তই কোন বস্তু গ্রহণ এবং অপর বস্তু পরিত্যাগ করে। স্বাদ এবং ঘ্রাণ, এতদুভয় অতি নৈকট্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এবং ইহাদিগের ক্রিয়াও প্রায় এক প্রকার। এই দুইটী ইন্দ্রিয় দ্রব্য-সংস্পর্শেই ক্রিয়া করে; প্রকৃত ত্বগিন্দ্রিয়ও সেইরূপই ক্রিয়া করে; কিন্তু চক্ষু এবং কর্ণ বস্তু সংস্পর্শ অপেক্ষা করে না। এই দিক হইতে লক্ষ্য করিলে নাসিকা,

---

(১) I do not believe that there is a creature in existence today, whether it has eyes or not, which cannot tell the difference between night and day. —Dawn of reason p 12.

(১) [illegible]

(২) Acteroj lyi Eichornii.

জিহ্বা, ত্বক্, এই তিনকেই স্পর্শেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। চক্ষু এবং কর্ণ এতদুভয়ও স্পর্শেন্দ্রিয়েরই পরিণাম অর্থাৎ ত্বকেরই বিকাশ; কিন্তু ইহারা বস্তু সংস্পর্শ অপেক্ষা করে না। আলোক ইথার-সমুদ্রের তরঙ্গ-জনিত; শব্দ বায়ু-সমুদ্রের তরঙ্গ-জনিত; এই উভয়বিধ তরঙ্গ-সংস্পর্শে চক্ষু এবং কর্ণ যথাক্রমে রূপ এবং শব্দ অনুভব করে। এই দুই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তরঙ্গ-স্পর্শের ফল; অপর তিন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বস্তু-স্পর্শজাত। রসনায় চিনি স্পর্শ না হইলে স্বাদ জ্ঞান হয় না; কর্পূরকণা নাসিকায় স্পর্শ না হইলে ঘ্রাণ বোধ হয় না, কিন্তু সূর্য্যদেবকে দূর হইতে দেখিতে পাই; সঙ্গীত দূর হইতে শুনিতে পাই। এই জন্যই বলিয়াছি যে, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রকৃত পক্ষে স্পর্শ ইন্দ্রিয়ই। চক্ষু কর্ণকে দূরেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলিয়াছেন যে Smell and taste are extremes of one sense অর্থাৎ ঘ্রাণ এবং স্বাদ একই ইন্দ্রিয়ের পরিণাম। (১) এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কর্ম্মও ত্বকের উপরই নির্ভর করে। গন্ধ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষ পরীক্ষা করা হয় নাই; তথাপিও লাবক্(Lubbock) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ যাহা কিছু পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, নাসিকা উদ্ভব হইবার বহু পূর্ব্বে জীব-রাজ্যে গন্ধবোধ অজ্ঞাত ছিল না।

এইরূপে অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রাণীদিগের ব্যবহার আলোচনা করিলে জানা যায় যে, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল না থাকিলেও দর্শন-শ্রবণাদি কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না। তাহাদিগের জীবন-ব্যাপারের উপযোগী সমস্ত কার্য্যই কেবল ত্বকের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সতাই ত্বক্ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পিতামহ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, জীব সকলের ডিম্বাবস্থায় কিম্বা ভ্রূণাবস্থার প্রথম ভাগে কোষ বিভাগ হেতু যে তিনটী আবরণ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে বহিরাবরণ হইতেই চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল জাত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বহিরাবরণ অথবা ত্বক্ই যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ব পুরুষ, ইহা স্বভাবতই অনুমিত হইতে পারে; আর নিম্নতম জীবগণের ব্যবহার দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু উচ্চ প্রাণিগণের বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সকল সমুদ্ভূত হইবার পর ত্বকের কার্য্যভার অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকিলেও ত্বক্ অদ্যাপি দ্বিবিধ কার্য্য করিতেছে। ত্বকের কার্য্য এখনও অন্যান্যের দ্বিগুণ। অন্যান্যের প্রত্যেকে এক একটা কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু ত্বক্ এখনও দুইটী পৃথক বিভাগের কার্য্য করে। কোন পদার্থ স্পর্শ করিলে, উহা কঠিন, কি নরম, কি তরল, তাহা আমরা ত্বক্ দ্বারা অনুভব করি; আর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পদার্থ উষ্ণ কি শীতল, তাহাও অনুভব করিয়া থাকি। এই দুইটী বোধ—অর্থাৎ কাঠিন্য এবং তাপ, দুইটী পৃথক অনুভূতি। কোন উষ্ণ বস্তু নিকটে থাকিলেও তাপ অনুভূত হয়, দূরে থাকিলেও তাপ অনুভূত হয়। তাপ অনুভব করিবার জন্য বস্তুর স্পর্শ আবশ্যক হয় না। কিন্তু স্পর্শ ব্যতীত কাঠিন্য অনুভব করা যাইতে পারে না, সুতরাং কাঠিন্য বস্তু-স্পর্শের ফল। কিন্তু কাঠিন্য বোধটা কি? একটা লৌহদণ্ড হাতে লইলাম; উহা কঠিন বোধ হইল। আবার কতকগুলি কাচচূর্ণ

(১) Lord Kelvin — Constitution of matter p. 299.

খর্খরে বোধ হইল, এবং উহা হইতে খোঁচা লাগার ন্যায় বোধ জন্মিল। আর, কতকগুলি বালুকণা হাতে লইলে কেবল খর্খরে বোধই উৎপন্ন হইল, খোঁচা লাগিল না। একটু জল হাতে লইলে তরল বোধ হইল। এই সকল স্পর্শানুভূতির প্রকৃত অর্থ কি? লৌহদণ্ডের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আমার হস্ত-ত্বকের প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশের উপর চাপ দিয়া একটা ভার বোধ জন্মাইয়াছিল। তাহাতেই উহার কাঠিন্য অনুভব হইয়াছিল। আর কাচচূর্ণের প্রত্যেকটী গুঁড়ার কোণ সকল আমার ত্বকের প্রত্যেক অংশের উপর ঐরূপই চাপ দেওয়ায় খোঁচা লাগিয়াছিল; খোঁচা আর কিছুই নহে, তীক্ষ্ণাগ্রভাগের চাপ মাত্র। বালুকা-কণাগুলির স্পর্শানুভূতিও কাচ চূর্ণের ন্যায়, কেবল উহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ না থাকায় উহার চাপ খোচার ন্যায় নহে। জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকলও আমার ত্বকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের সহিত সংলগ্ন হইয়াছিল। জলেরও ভার আছে, সুতরাং এস্থলেও চাপই স্পর্শানুভূতির কারণ। এইরূপে দেখা যাইবে যে, বাষ্পীয় পদার্থ সকলের স্পর্শানুভূতিও চাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদিগের ত্বকের উপর চাপ পড়াতেই কোন বস্তু কঠিন, কি নরম, কি তরল, তাহা বুঝিতে পারি।

কিন্তু চাপ কি? আমি আপনার গায়ে আস্তে হাত দিলাম; আপনার স্পর্শ-বোধ হইল, সুতরাং চাপ বোধ হইল। আমার হাতে ক্রমে একটু একটু জোর বাড়াইতে বাড়াইতে বেশি জোরে উহা আপনার গায়ে চাপিতে লাগিলাম। যতই হাতে জোর বেশি দেই, ততই আপনার গায়ে চাপ বেশি অনুভব হয়, জোর কমাইলেই চাপ কম বোধ হয়। সুতরাং চাপ-বোধ জোরের উপর নির্ভর করে, শক্তির উপর নির্ভর করে। গণিতজ্ঞ জানেন যে, শক্তির কথা ভাবিতে গেলেই শক্তি প্রয়োগের স্থান, শক্তির পরিমাণ, ও শক্তি-পরিচালন-দিকের বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। শক্তি কোন্ স্থানে প্রয়োগ করা হইল, কি পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা হইল, এবং ঐ শক্তির গতি কোন্ দিকে,—এই সকল জ্ঞানের সমষ্টি লইয়াই শক্তি-জ্ঞান। কাঠিন্যাদি বোধ চাপের উপর এবং চাপ যখন শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে, তখন পরিণামে কাঠিন্যাদি বোধও শক্তির প্রয়োগ স্থান, পরিমাণ ও দিকের প্রতি নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ত্বক্—ইন্দ্রিয়ের একটী কার্য্য এই সকলের উপর নির্ভর করিতেছে। (১)

এক্ষণে ত্বকের আর একটী কার্য্যের বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। এই কার্য্য তাপ-বোধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাপ বোধ করিতে তপ্ত বস্তুর সহিত ত্বকের সংস্পর্শ আবশ্যক হয় না। তবে কিরূপে তাপ-বোধ উৎপন্ন হয়? পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র এক লঘু হইতেও লঘুতর, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, অতীন্দ্রিয় বস্তু বিদ্যমান আছে। এই বস্তুর নাম দিয়াছেন, ইথার। তপ্ত বস্তুর পরমাণু সকল কম্পিত হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপাদন করে; সেই তরঙ্গ আমাদিগের ত্বকে আসিয়া আঘাত করিলে ত্বকেও তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ক্রমে সেই তরঙ্গ-জনিত কম্পন উপযুক্ত স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে

(১) It tactile sense is a sense of force, of directions of forces, and of places of application of forces. Lord Kelvin—Constitution of matter, p. 304.

নীত হইলেই তাপ বোধ জাত হয়। তাপ বোধ ইথার-সমুদ্রের কম্পন হইতে জাত। (১) উহা তপ্ত বস্তুর আণবিক কম্পনের প্রতি নির্ভর করে।

ত্বকের দ্বিবিধ কার্য্য গণিতের ভাষায় বলিলে বলা যায় যে ত্বক = চাপ + তাপ।

চাপ ও তাপ-বোধের সমষ্টিই ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য্য। এই নিমিত্তই ত্বক্‌কে যুগ্ম-ইন্দ্রিয় বলিয়াছিলাম।

এক্ষণে, ত্বগিন্দ্রিয়ের তাপ-বোধ-কার্য্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ উভয় কার্য্যই এক প্রকার। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আলোক-বোধ ইথার-সমুদ্রের কম্পন-জনিত; ঐ কম্পন আমাদিগের চক্ষুতে আঘাত করিলেই সেই আঘাত মস্তিষ্কে নীত হইয়া আলোক-বোধ উৎপন্ন করে। শব্দ-বোধ বায়ু-মণ্ডলের তরঙ্গ-জনিত। শব্দায়মান বস্তুর অণুসকল কম্পিত হইয়া বায়ুতে তরঙ্গ উৎপন্ন করিলে উহা কর্ণ-পটহে আঘাত করে, এবং তাহা হইতেই ক্রমে শব্দবোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক্ (অর্থাৎ ত্বকের তাপ-বোধ-ক্রিয়া) সম্পূর্ণ সম-শ্রেণীর ;—সেই এক কম্পন-জনিত বোধ। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ (অর্থাৎ ত্বকের চাপ-বোধ) সম-শ্রেণীর ; কারণ ইহাদিগের ক্রিয়া বস্তু-সংস্পর্শ-জনিত। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইন্দ্রিয় সকলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। (১) চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক্, (২) নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। প্রথম শ্রেণীকে দূরেন্দ্রিয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে স্পর্শেন্দ্রিয় বলিয়াছি। কিন্তু দূরেন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াও ত্বকের উপর ইথার অথবা বায়ু-মণ্ডলের তরঙ্গ-জনিত আঘাত-বশতই উৎপন্ন হয়। এই আঘাত অর্থ শক্তির প্রয়োগ, সুতরাং পূর্ব্ববৎ শক্তির প্রয়োগ স্থান, পরিমাণ ও দিকের প্রতি নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি যে, দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়াও ঐ তিনের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উল্লিখিত দুই শ্রেণীর ক্রিয়াই মূলতঃ এক ; দুই শ্রেণীর ইন্দ্রিয়ই প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার ; অর্থাৎ বাহ্য-জগৎ হইতে ত্বকের উপর যে শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহারই পরিণাম। ত্বক্ দ্বারাই এবং ত্বক্ হইতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয়-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে।

যে জীবের কোন ইন্দ্রিয় নাই, তাহারও ত্বক্ আছে। তখন ত্বক্‌ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিত। কিন্তু সেই অনুন্নত সময়ে জীবন-ব্যাপার জটিল ছিল না ; ক্রমে ত্বগিন্দ্রিয়ের বিকারেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় জাত হইল ; এবং জীবন-ব্যাপারও ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিল। এই সময়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন কার্য্যভার গ্রহণ করায় ত্বকের কার্য্যভার অনেক লাঘব হইয়াছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ লাঘব হয় নাই। উহার প্রতি তাপ ও চাপ, এই উভয় বোধের ভার যুগপৎ ন্যস্ত থাকায় এখনও উহার বল-ক্ষয় হইতেছে। শ্রম-বিভাগ জগতের সাধারণ নিয়ম ; একের

(১) পণ্ডিতগণ এক্ষণে যেন তড়িৎকেই একমাত্র শক্তি বিবেচনা করিতেছেন ; তাপ, আলোক ইত্যাদি উহারই রূপান্তর মাত্র। বস্তু পদার্থ কিছুই নহে, উহা তড়িৎ-শক্তিরই বিকাশ। ঐ শক্তির ক্রিয়া বিশেষ [Vortex motion] হইতে এক ভ্রমাত্মক বস্তু জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই বিষয় প্রবন্ধান্তরে পরিস্ফুট করিবার ইচ্ছা রহিল। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে ইথার-সমুদ্রের ঘূর্ণপাকের ন্যায় গতি হইতেই বস্তু-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কার্য্য অনেকে করায় শ্রম-লাঘব হয়, তাহাতে কার্য্যেরও সুবিধা হয়। এই মৌলিক নিয়ম হইতেই জীব-দেহে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় সকল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শারীর যন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে ত্বকের বর্ত্তমান দ্বিবিধ কার্য্যও কালে অবশ্যই পৃথক্ হইবে, এরূপ আশা করা যায়। তখন ত্বগিন্দ্রিয়ও চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় একটীমাত্র কার্য্য করিবে। অপর কার্য্য অন্য উপায়ে সংশাধিত হইবে। চক্ষু কর্ণের সহিত ত্বকের সমতা রক্ষা করিতে হইলে বোধ হয় যেন ত্বক্ কেবল তাপ-বোধই রাখিবে, চাপ-বোধের ভার অন্যের প্রতি অর্পিত হইবে। আর, নাসিকা এবং জিহ্বার সহিত সমতা রক্ষা করিলে ত্বকের চাপ-বোধ মাত্র থাকিবে; তাপ-বোধ অন্যের কার্য্য হইবে। কিন্তু এতদুভয় প্রকার পরিণতির মধ্যে কোন্‌টী অধিকতর সম্ভব, তাহা কল্পনা করিতে সাহস হয় না। তবে, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ত্বকের কার্য্য-বিভাগ হইবেই। যখন ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয় ছিল, তখন জীব অনুন্নত ছিল; কারণ একা সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে গেলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না; সুতরাং বাহ্য-জগতের জ্ঞানও অপরিস্ফুট হয়। ক্রমে বিবিধ ইন্দ্রিয় জাত হইলে যেমন তাহাদিগের আপন আপন কার্য্যও সুসম্পন্ন হইতে লাগিল, জীবের জ্ঞানও ততই পরিস্ফুট ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমরা বাহ্য-জগতের কম্পন-সমুদ্রের মধ্যে বাস করিতেছি; চারিদিকেই কম্পন, চারিদিকেই স্পন্দন। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ চিরাতীত কাল হইতে কেবল কম্পনের ঘাত-প্রতিঘাত অনুভব করিতেছে। ইহারই প্রতিক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্ক-পদার্থ ক্রমে জটিলতা প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং জীবের বুদ্ধিও পরিমার্জ্জিত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়গণের বিকাশই মানবের বিরাট উন্নতির মূল কারণ।

শ্রীশশধর রায়।

# একটী জাতক-কথা

## ( সুসীম জাতক )

ভগবান বুদ্ধদেব, উপদেশাদি দিবার সময়ে দেশ-প্রচলিত অনেক গল্প এবং উপকথায় দৃষ্টান্ত দিতেন। সেই সকল উপকথা স্বতন্ত্র সংগৃহীত হইয়া "জাতক" কথা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উপকথায় প্রধান পুরুষকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের অবতার বলিয়া লিখিত হইয়া, গল্পগুলি "জাতক" নাম পাইয়াছে। সে প্রকার কল্পনা আমরা এখন উপেক্ষা করিতে পারি; কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের মূল গল্পগুলির আলোচনা করিলে, সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, ইতিহাসের উপাদানের হিসাবে তাহা অমূল্য। প্রাচীনকালের বৌদ্ধেরা সামাজিক রীতি বিষয়ে কোন পার্থক্য অবলম্বন করেন নাই; তৎকালের হিন্দুদিগের মত গৃহস্থ-বৌদ্ধেরা সকল প্রকার অনুষ্ঠান করিতেন। এমন কি, সপ্তম শতাব্দীতেও যখন কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে নানা কথা লিখিয়াছিলেন, তখন

তিনি বৌদ্ধদিগের ব্যবহারের অসঙ্গতি দেখাইতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, যাঁহারা বেদ এবং চৌদিক যজ্ঞ মানেন না, তাঁহাদের পক্ষে বৈদিক প্রথায় গার্হস্থ অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে না।

সে যাহাই হউক, বুদ্ধদেব যখন দেশ-প্রচলিত গল্প গুলি কেবল দৃষ্টান্তচ্ছলে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার কোন নূতন আদর্শের কাল্পনিক সমাজ-চিত্র যোজনা করেন নাই। উহাতে দৃষ্টান্ত হীনবল হইয়া পড়ে; কারণ লোক অস্বাভাবিক এবং অপ্রকৃত সমাজ-বর্ণনার কথায় দৃষ্টান্তটীকে গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই "জাতক" কথা হইতে যথাযথ সমাজচিত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই জন্যই প্রাচীন প্রাকৃত বা পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধসাহিত্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। গল্পটী এই :—

অতীতকালে যখন বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিতেন, তখন একই দিবসে রাজার এবং রাজপুরোহিতের পুত্র লাভ হয়। রাজপুত্রের নাম ব্রহ্মদত্তকুমার এবং পুরোহিত-পুত্রের নাম সুসীমকুমার। উভয় কুমারে খুব সৌহার্দ্দ ছিল এবং দুজনে সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিতেন। উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্ববিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। পরে যখন রাজপুত্র "উপরাজা" হইলেন, সুসীম কুমার তখনো তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতেন। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। প্রাচীন পালিগ্রন্থে "যুবরাজ" শব্দ পাওয়া যায় না; রাজার জীবিতকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন রাজকার্য্যে অভিষিক্ত হইতেন, তখন তাঁহার নাম হইত উপরাজা।

রাজার মৃত্যুর পর রাজকুমার যখন রাজা হইলেন, তখন তাঁহার সুহৃৎ সুসীমকুমার তাঁহার পুরোহিত হইলেন। একদিন রাজা তাঁহার পুরোহিত সুসীমকে নানা প্রকার ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া হস্তি আরোহণে নগর ভ্রমণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার শোভা যেন "সক্কো দেবরাজবিয়" (শক্র দেবরাজের মত) হইয়াছিল। রাজার মাতা যুবক-পুরোহিতের রূপাদি দেখিয়া মুগ্ধা হয়েন, এবং তাঁহাকে লাভ করিতে সংকল্প করেন। "মাতা-পি অদ্দস, পুরোহিতং দিস্বা পটিবদ্ধচিত্তা হুত্বা, সয়নগব্ভং পবিসিত্বা, "ইমং অলভন্তী, মরিস্সামি ইতি।"

মাতার কোন অসুখ করিল ভাবিয়া রাজা তাঁহাকে ক্লেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু পুত্রের কাছে মাতা তাঁহার মনের কথা "লজ্জায় ন কথেসি"। তখন রাজা তাঁহার অগ্রমহিষীকে পাঠাইলেন। বধূ যাইয়া শ্বশ্রূ দেবীর পীঠে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; শ্বশ্রূ তখন বধূকে তাঁহার মনের কথা জানাইলেন। কারণ রমণীকে রমণী লজ্জা করে না। কথাগুলি সহজ-বোধ্য পালিতে এইরূপ আছে :—

সা গন্ত্বা পিট্ঠিম্ পরিমজ্জন্তী পুচ্ছি। ইংথিও ( স্ত্রালোক ) নাম ইৎথীনাং রহস্সং ন নিগূহন্তি। সাতস্সাতং অৎথং আরোচেসি। ইতরাপি তং সুত্বা, গন্ত্বা, রঞ্ঞো আরোচেসি। রাজা, "হোতু, পুরোহিতং রাজানং কত্বা তস্সতং অগ্গমহেসিং করিস্সামি।"

রাজার কাছে সংবাদ যাইতেই তিনি পুরোহিতকে রাজা করিয়া মাতাকে পুরোহিতের অগ্রমহিষী করিয়া দিতে যে স্বীকৃত হইলেন, ইহাতে কেবল বয়োবৃদ্ধা পুত্রবতী বিধবার বিবাহ সূচিত হয়, তাহাই নয়। আরো অনেক প্রথা জানিতে পারা যায়। রাজা যখন পুরোহিতকে নানা প্রকারে সম্মত

করাইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন পুরোহিতই পূর্ব্ব রাজমহিষীকে বিবাহ করিয়া রাজা হইলেন, এবং রাজা নিজে যুবরাজ হইয়া রহিলেন। লিখিত আছে, "সয়ং উপরাজা অহোসি"। পরে এই পুরোহিত যে জন্য সংসার ত্যাগ করিলেন, সে সকল কথা—এখানে লিখিব না। গল্পের এই অংশই পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। ব্রাহ্মণের পক্ষে যে ক্ষত্রিয় বংশের বিধবা বিবাহ করাতেও দোষ ছিলনা, তাহাও এই সহজ বিবৃত কথায় সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# ৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্ম—ইংরাজি ১৮৪৭ অব্দ, ৯ই ফেব্রুয়ারী। বাঙ্গালা ১২৫৩ সাল।

মৃত্যু—৬ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার, ১৯০৭।

সমাধি স্থান—কলিকাতা, সাকুলার রোড্।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর নাই! যিনি ইউরোপীয় ও স্বদেশীয় সমাজে সমভাবে সমাদৃত হইতেন, যাঁহার সুমধুর সম্ভাষণে, সুধামধুর সদালাপে এবং চিত্ত-বিনোদক জ্ঞানগর্ভ উপদেশে, কি প্রবৃদ্ধ পুরুষ, কি অজাতশ্মশ্রু বালক, সকল শ্রেণীর লোকেই সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিত, সেই সর্ব্বজনপ্রিয় কালীচরণ আর নাই! তিনি ভবধামে নরলীলা সমাপন পূর্ব্বক নরোচিত মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি, সদাহাস্যময় বদন, বিস্ফারিত নয়ন, মৃদু মধুর বাণী, আর আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাইব না। সেই অত্যুৎকৃষ্ট বাগ্মী ও পাণ্ডিত্যশালী লেখক, সেই চিন্তাশীল দার্শনিক ও বিজ্ঞানতত্ত্ববিদ্ প্রাজ্ঞ সেই অশেষ গুণশালী অধ্যাপক এবং সেই কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর এত দিন আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে আমোদিত ও আলোকিত করিতেছিলেন; অকস্মাৎ তিনি স্বদেশবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতি দুঃখময় এই দৃশ্যমান সংসারক্ষেত্র হইতে অদৃশ্যমান সংসার ধামে চলিয়া গিয়াছেন। সাধু কালীচরণ মহামতি যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং যে স্বর্গ রাজ্যের অস্তিত্বে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এখন পুণ্যবলে সেই শান্তিময় স্বর্গলোকে তাঁহার চিরাভীপ্সিত যিশুর সম্মুখে অখণ্ডানন্দে ও সহাস্য বদনে কালীচরণ দণ্ডায়মান, আর আমরা এই দুঃখময় মায়াধামে তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া রোরুদ্যমান অবস্থায় অবস্থিত! সংসারের ইহাই যুগযুগান্তরব্যাপী বিধি,—এখানে কেহ আসে, কেহ যায়; কেহ হাসে, কেহ কাঁদে; কেহ উড়ে, কেহ পড়ে; কাহারও আগমনে আনন্দের মহারোল উঠে, কাহারও অন্তর্দ্ধানে বিপদের কোলাহল ছুটে!

মৃত্যুর অধীন সকলেই; যে জন্মে সেই মরে, ইহা ধ্রুব সত্য। এই বিধির বৈপরীত্য সাধনে কেহই সমর্থ নহে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, অশোক, শঙ্করাচার্য্য, নেপোলিয়ন, জুলিয়স সিজর, সেক্ষপির, কালিদাস, আকবর, হেনরী, প্রভৃতি এই দৃশ্যমান সংসার ধামে চিরদিনের জন্য কেহই অমর হইয়া আইসেন নাই,

সুতরাং কালীচরণও শমনের এই সনাতন নিয়মটীকে লঙ্ঘন করিতে পারেন কি? কালীচরণের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত নহি, কারণ মৃত্যুর অধীন সকলেই; কিন্তু তাঁহার অভাবে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্যই আমরা দুঃখিত। মৃত্যুর অপর নাম "অভাব"। যাহার মরণে কোন ক্ষতি বা অভাব বোধ হয় না, তাহার মৃত্যুরও কেহ সম্বাদ লয়না। এই নশ্বর মর্ত্ত্যধামে প্রতি দিন কত অসংখ্যা-সংখ্য নরনারীর মৃত্যু হইতেছে; প্রতি দিন হিন্দুর শ্মশানে ও সমাধিক্ষেত্রে, মুসলমানের গোরস্থানে এবং খ্রীষ্টানের কবর-প্রাঙ্গণে কত প্রাণীর মৃত দেহ প্রদগ্ধ বা প্রোথিত হইয়া যাইতেছে, কে কাহার সমাচার লয়? কে কাহার অভাবে অসুখী হয়? যাহার মরণে সমাজ, জাতি বা দেশ, অভাব বা অলাভ অনুভব করে, তাহার মৃত্যুই আমাদের পক্ষে ব্যথা-জনক। কালীচরণের মৃত্যুতে আমরা অভাব ও ক্ষতি বোধ করিতেছি, সুতরাং এ হেন পুরুষ অবশ্য বরণীয়। গণনীয় ও বরণীয় না হইলে, কাহারও মরণে অভাব অনুভূত হয় কি? বাস্তবিক কালীচরণের মৃত্যুর পরে আর একটী কালীচরণ পাইব না, ইহা নিশ্চয়। কালী বাবুর জীবিতাবস্থাতেও তাঁহার সমতুল্য পুরুষ এদেশে ছিল না এবং এখনও নাই, সুতরাং তাঁহার বিরহ নিতান্তই ব্যথাজনক।

আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ বঙ্গাকাশের উজ্জ্বল তারকাগুলি উত্তরোত্তর নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে অগণ্য অসাধারণ পুরুষ বঙ্গভূমে বর্ত্তমান শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু একে একে তাঁহাদের সকলেই চলিয়া গিয়াছেন; দুই চারি জন ব্যতীত বঙ্গদেশে এখন আর প্রকৃত মহাপুরুষ কোথায়? বিগত পঞ্চত্রিংশ বর্ষ কাল মধ্যে বাঙ্গালায় যত সংখ্যক বড় লোক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে—আর কোন সমাজে—এত অল্প কাল মধ্যে এতগুলি বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা নিতান্তই দুরদৃষ্ট; বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা অতীব অশুভ লক্ষণ। না জানি কি গ্রহদোষে—কি মহাপরাধে—এই মহা ক্ষতির সৃজন হইয়াছে। কালীচরণের মৃত্যুতে সেই জন্যই আমরা অধিকতর ব্যথিত এবং অতীব আতঙ্কিত। বাঙ্গালা দেশ হইতে যে সকল মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সমতুল্য লোক আর পাইতেছি না; যে স্থান শূন্য হইয়া যাইতেছে, সেই স্থান আর পূরণ হইতে দেখিতেছি না; পূরণ হইবার আশাও অল্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সুতরাং বড় লোকের মরণে আমাদের বিষম আশঙ্কা জন্মে। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রকৃত বড়লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বড়ই ব্যথিত।

বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে একটা বিশেষত্ব—একটা অসাধারণত্ব—ছিল, সেই বিশেষত্ব ও অসাধারণত্বটুকু বাঙ্গালী জীবনে সাধারণতঃ প্রায় দেখা যায় না। পৃথিবীর দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানযুগে কোথাও প্রায় সম্পূর্ণ আদর্শ মনুষ্য আদৌ দেখিতে পাই না। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র এবং অতি পরাধীন দেশে সম্পূর্ণ আদর্শ বা আদর্শ মনুষ্য আজি কালিকার দিনে প্রায়ই জন্ম গ্রহণ করেন না। বঙ্গদেশের গৌরব ও সৌরভের প্রশংসা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলা যায়, এখনকার দিনে বাঙ্গালী জাতিতে সম্পূর্ণ আদর্শ বা আদর্শ মানব জন্মুন আর না জন্মুন, এদেশে এমন কয়েকজন মহাপুরুষের আবি-

র্ভাব হইয়াছে যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ আদর্শ মানবের দৃষ্টান্ত হইতে সক্ষম না হইলেও, আদর্শের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাবু কালীচরণ এই শ্রেণীর লোক, সুতরাং ইনি বাঙ্গালার সৌরভ এবং বাঙ্গালীর গৌরব। কথাটীকে বুঝাইবার জন্য অবান্তরভাবে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতে আকাঙ্ক্ষা করি। দেহ, মন ও আত্মার সম্পূর্ণ স্ফুরণ না হইলে মানুষকে "সম্পূর্ণ আদর্শ মানব" বলিতে পারা যায় না। মনে কর, যাহার একটী পদ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অপর পদটী খঞ্জ, অসুস্থ এবং বিকল, অথবা যাহার দেহের বাম অঙ্গগুলি পূর্ণ এবং দক্ষিণাঙ্গগুলি অপূর্ণ, সে ব্যক্তিকে কেহ কি পূর্ণাবয়বসম্পন্ন মানুষ বলিতে পারে? যে বিদ্বান ব্যক্তি কেবল দুই একটী বিদ্যায় অভ্যস্ত বা পারদর্শী, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ক বিদ্যাগুলিতে একেবারে অজ্ঞ, সে ব্যক্তি কখন "পূর্ণ পণ্ডিত" বলিয়া বা আদর্শ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এইরূপে, যাঁহার দেহ, মন ও আত্মার সম্পূর্ণ স্ফুরণ বা বিকাশ প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই "আদর্শ পুরুষ," এই মহাগৌরব-ব্যঞ্জক উপাধিতে সম্বোধিত হইবার যোগ্য। কালীচরণ "সম্পূর্ণ আদর্শ" ছিলেন না, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আদর্শের দিকে তিনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য। বাবু কালীচরণকে আমরা তাঁহার তরুণাবস্থা হইতে দেখিয়া আসিতেছিলাম; তিনি কদাকার পুরুষ ছিলেন না, তাঁহার সমস্ত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাকে সুন্দর সুঠাম পুরুষ বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর একদিকে যেমন প্রাবৃটের নবনীরদের ন্যায় গুরুগম্ভীর, অপরদিকে তেমনি সুকোমল বালকের ন্যায় শ্রুতিমধুর ছিল। তিনি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সভাস্থ সকলকে কম্পিত বা প্রতিধ্বনিত করিতে পারিতেন এবং মৃদুমধুর বাণী দ্বারা নাস্তিক ও পাষাণ হৃদয়বান লোককেও প্রেমমুগ্ধ করিতে পারিতেন। তাঁহার দেহে অসাধারণ বল ছিল। যুবাকালে তিনি একজন পাল্‌হোয়ান বা বীর বলিয়া গণ্য হইতেন। সমস্ত জীবনে তিনি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ হয়, নবগোপাল মিত্রের প্রবর্ত্তিত সে কালের "হিন্দুমেলা"য় একবার বাঙ্গালী বাবুদিগের শারীরিক সামর্থ্যের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। সিটি কলেজের বর্ত্তমান সর্ব্বাধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম, এ, মহাশয়ের মাতুল ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র (শর্ম্মা) এম-ডি, এবং কলিকাতার সুবিখ্যাত কায়স্থ পাল্‌হোয়ান বাবু অম্বু গুহ মহাশয় প্রভৃতি ইহার পরীক্ষক ছিলেন। এই পরীক্ষায় কালীচরণ বাবু সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রবীণ বয়সেও কালীচরণ শক্তিহীন হয়েন নাই। সমস্ত জীবন তিনি সমভাবে অসাধারণ কায়িক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহের সমস্ত অঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অসাধারণরূপে দৈহিক বলশালী হইয়াও কখনও উগ্র প্রকৃতিক হয়েন নাই, কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেন নাই, কাহারও মর্য্যাদার হানি করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই। এত বড় বীর হইয়াও, তিনি সমস্ত জীবন সাধুর ন্যায় কোমল প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মানব জীবনের এই অসাধারণত্বটুকু অতি অল্প লোক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা দেশের নানা জাতীয় লোকের সংশ্রবে থাকিতেন; নানা প্রকৃতির ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংসর্গে তাঁহাকে দিন যাপন করিতে হইত; অথচ তিনি অহঙ্কারী পুরুষ ছিলেন না। এত বড় সম্মান ও সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াও তিনি বিলাসী বা অসংযত পুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন নাই। তিনি চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। শত সহস্র প্রকার প্রশংসার মধ্যে থাকিয়াও তিনি সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন। অহঙ্কার, উচ্চাভিলাষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তিনি বিমল চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। এখনকার দিনে এরূপ সমাজে এমন চরিত্রবান পুরুষ খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ। কালীচরণের জীবনের এই একটী অসাধারণত্ব।

মহাত্মা কালীচরণ তরুণ বয়স হইতে ইউরোপীয় সংশ্রবে দিন যাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কিন্তু পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনে একদিনের জন্যও সাহেব সাজেন নাই। বাবু কালীচরণ, সমস্ত জীবনে হ্যাট্‌স্পর্শ করেন নাই। তিনি ধুতী, চাদর, পিরহান অথবা চোগা, চাপকান, পায় জামা এবং টোপি ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল। দেশীয় জিনিষ পাইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে বিলাতী জিনিষ তিনি আদৌ ব্যবহার করিতেন না। এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টানের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতি বিদেশীয় ভাবাপন্ন ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ভারত মাতার সেবক বলিয়া গৌরব করিতেন এবং সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার বাসাবাটীতে আমি অনেক বার গমনাগমন করিয়াছিলাম, অনেকবার ব্রাহ্মণ পাচক, হিন্দু দ্বারবান, বাঙ্গালী দাসী এবং হিন্দু চাকর দেখিয়াছি। বিশেষ আবশ্যক না হইলে তিনি টেবিল ব্যবহার করিতেন না। অনেক সময়ে ভূমির উপরে কাষ্ঠাসনে বসিয়া পিতলের থালায় অথবা কলাপাতে তিনি ভাত খাইতেছেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি কখন বিলাত গমন করেন নাই, অথচ একজন ইংলণ্ডজাত ইংরাজ যে পরিমাণে সামাজিক আদব্ কায়দা জানে, কালী বাবু (আবশ্যক হইলে) তদপেক্ষাও অধিকতর আদব্ কায়দায় অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিতেন। তিনি বিলাত যান নাই সত্য, কিন্তু ইউরোপ না গিয়াও তিনি যে পরিমাণে ইংরাজি জানিতেন, বিলাতের অসংখ্য লোকের মধ্যেও এরূপ ইংরাজি অতি অল্প লোকেই শিখিয়াছে। ইংরাজি ভাষায় তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইংলণ্ড না গিয়াও বাঙ্গালী যে অসাধারণ ইংরাজী পণ্ডিত হইতে পারে, কালীচরণের জীবন তাহার অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত।

বাঙ্গালী সমাজের অনেক প্রধান প্রধান লোকের একটা প্রধান দোষ আছে। তাঁহারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে শিক্ষা করেন না—"দু'কূল রাখিতে জানেন না।" তাঁহারা প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিলে রাজাকে চটাইয়া দেন; স্বদেশীয় পক্ষ অবলম্বন করিলে ইংরাজকে রাগাইয়া তুলেন। কালীচরণ সম্পূর্ণ ভাবে বঙ্গমাতার সুসন্তান হইয়া, সম্পূর্ণভাবে "স্বদেশী হইয়া" এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় পারদর্শী হইয়া গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা সাধারণকে—ইংরাজ ও ভারতবাসীকে সমভাবে প্রিয় রাখিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার

জীবনে অসরলতা, কপটতা বা দুষ্টস্বার্থাভিলাষ ছিলনা। কালীচরণের জীবনের এই মহত্ত্বটুকু, এই অসাধারণত্ব ও বিশেষত্বটুকু বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক গুণ ছিল, একে একে কতকগুলি প্রধান গুণের কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বঙ্গ দেশে সুরাপান নিবারণী সভা সমূহের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাবু প্যারীচরণ সরকার ও বাবু কালীচরণের নাম এজন্য এদেশে চিরকাল সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইতে থাকিবে। ইহাঁদের পূর্ব্বে এদেশে সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে আর কেহ আন্দোলন করেন নাই। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যখন সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন করেন, বাবু কালীচরণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এতদুপলক্ষে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত যোগ দিয়া মহাত্মা কালীচরণ বঙ্গদেশের অনেক নগরে "সদাচারিণী সভা"(Purity Society) প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কালীচরণ পল্লী গ্রামের পাঠশালার সংস্কার কার্য্যে সাহায্য করিতেন। পাদ্রী মাকডোনাল্ড্ সাহেবের সহযোগীতায় কালীচরণ এদেশে সর্ব্বপ্রথমে উদ্যান, প্রান্তর, রাজবর্ত্ম প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্য ভাবে সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ ও সাহিত্য এবং সমাজতত্ব বিষয়ে ব্যক্তৃতা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। কলিকাতার বিডন গার্ডেনে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রথার সৃষ্টি হয়। কলিকাতা মহানগরীর অনেক "খ্রীষ্টীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের" তিনি স্থাপনকর্ত্তা ছিলেন। অনেক দরিদ্র শিশুকে তিনি প্রতিপালন করিতেন। অনেক বিদ্যালয়ে তাঁহার রীতিমত দান ছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; ডফ্ কলেজের উন্নতির তিনি অন্যতম হেতু; প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের তিনি প্রথম প্রস্তাবক; মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক অবৈধ ৯ আইন উঠাইয়া দিবার তিনি অন্যতম সহায়; এতদ্দেশীয় ছাত্রের বিলাত বা বিদেশ গমনের তিনি উৎসাহদাতা এবং ১৮৭৪ সালের উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ নিবারণের তিনি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। যখন সাহিত্য পরিষদ বা সাহিত্য-সভা ছিল না, সেই অতি পুরাতন কালে কালীচরণ বাবু বঙ্গসাহিত্য সভার সভাপতি থাকিয়া নানা প্রকারে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার ছিল, তিনি সুন্দর রূপে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে, পড়িতে, কথা কহিতে এবং বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কালীচরণের জীবিতাবস্থায় এদেশে এমন কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠান হয় নাই, যাহাতে তাঁহার সম্পর্ক ছিল না। বহু সভা, সমিতি, কমিটি প্রভৃতির তিনি সম্পাদক বা সভ্য ছিলেন। তিনি গোপন বা প্রকাশ্যে নানা ভাবে এদেশের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। যেমন হিন্দুসমাজ, তেমনি খ্রীষ্টীয়সমাজ, তেমনি ইউরোপীয় সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও সহানুভূতি ছিল। কন্‌গ্রেসের তিনি অন্যতম সভ্য ছিলেন; ইহার প্রতিষ্ঠা কালে ইনি ইহার প্রাণ স্বরূপে গণ্য হইতেন। ১৯০৭ অব্দের কলিকাতা কন্‌গ্রেসে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্ব্বলাবস্থাতেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃহতী সভাস্থলে তিনি দুর্ব্বলতা বশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি

কংগ্রেশ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। দেশের প্রতি তাঁহার এবম্প্রস্থার অনুরাগ নিতান্ত অনুকরণীয়।

কলিকাতার কলেজষ্ট্রীটে ইয়ংমেন্‌স্ খ্রীষ্টান আসোসিয়েশন নামে যে সুবৃহৎ অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হয়, ইহা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে। এই অট্টালিকায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ এবং কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। ইহার অন্তর্ভুক্ত সভায় বহুসংখ্যক বালক বালিকা অবস্থান করিয়া আহার ও শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বহু ছাত্র এই সভার হোষ্টেল ও বোর্ডিংয়ে বাস করে। আসোসিয়েশনের হলে সকল শ্রেণীর লোকের প্রকাশ্য সভা হয়। এবং মাসিক বহু অর্থ ব্যয়ে ঐই অট্টালিকা ও অট্টালিকার অন্তর্গত কার্য্যাবলী সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন এই সুরম্য ও সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়, তখন এতদুপলক্ষে একটী টাকাও সাহায্য পাইবার আশা ছিল না। সাধু কালীচরণের অসাধারণ অধ্যবসায়, অমিত যত্ন, অস্থিমাংস-ভেদী পরিশ্রম, সাধুতা এবং উৎসাহে ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া এই অট্টালিকা ও সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জলের ন্যায় টাকা ব্যয় করিয়া তিনি এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কালীচরণ তাঁহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতেও তিনি এখানে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে আসিতেন। একদা সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় নরনারীগণ, এই হলে, কালীচরণ বাবুকে প্রশংসা সূচক অভিনন্দন পত্র এবং তিন সহস্র টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। সার গুরুদাস এই সভার সভাপতির আসন অধিকার করিয়া কহিয়াছিলেন, "আমার প্রিয়তম বন্ধু বিমল চরিত্রবান ও সুপণ্ডিত কালীচরণের যোগ্যতা, সাধুতা এবং স্বদেশহিতৈষণার জন্য তাঁহাকে তিন সহস্র মুদ্রা পুরস্কার স্বরূপে প্রদত্ত হইল। এই মুদ্রা তাঁহার ইউরোপীয় ও দেশীয় বান্ধবগণ গোপনে দান করিয়াছেন। অনেক হিন্দু ভদ্রলোক এই চাঁদার সাহায্যদাতা আছেন।" ঐ দিবস ঐ বাটীতে (ওভারটুন হলে) কালী বাবুর সুবৃহৎ তৈল চিত্র স্থাপিত করা হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ চিত্র তথায় অবস্থিত আছে। সভাস্থলে কালী বাবু কহিয়াছিলেন, "আমার জীবনে যদি কিছু উন্নতি হইয়া থাকে, আমার জীবনে যদি কেহ কিছু ভাল দেখিতে পান, তাহা হইলে বুঝিবেন, ইহা মহামতি যিশুর আদর্শেই হইয়াছে। আমি মহাপুরুষ খ্রীষ্টকে অনুকরণ করিতে সদা সর্ব্বদা অভিলাষী।" কালী বাবু কহিতেন, একটা আদর্শ না থাকিলে মানুষের জীবন পবিত্র, সুন্দর ও উন্নত হয় না।

প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, এবারে কালীচরণের জীবনের একটা আশ্চর্য্য অসাধারণত্ব দেখাইব। কালী বাবুর বুদ্ধি চতুরস্র ছিল; যে দিক দিয়াই তাঁহাকে দেখ, তাঁহাকে বিজয়ী পুরুষ বলিয়াই বোধ হইবে! জেনেরল আসেম্বিলী, ফ্রিচর্চ্চ প্রভৃতি কলেজে কালীচরণ অধ্যাপক ছিলেন; সাহাবেরা কহিতেন "এমন সুযোগ্য, এমন অশেষ গুণশালী, এমন চরিত্রবান, এমন অসাধারণ অধ্যাপক আমরা আর দেখি নাই।" কালীচরণ হাইকোর্টে ওকালতী করিয়াছিলেন; জজেরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এবং আইনাভিজ্ঞতা দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

কালীচরণ গির্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন; বড় বড় পাদ্রীরা অবাক্ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন, তাহাতে এমন সুযোগ্যতা নিরীক্ষিত হইত যে, অনেকে তাঁহাকে Statesman বলিয়া সম্বোধন করিত। বাবু কালীচরণ Concordat এবং Christian Messenger প্রভৃতি পত্র সম্পাদন করিতেন। এই সকল পত্রে তাঁহার অসাধারণ রচনা-পারিপাট্য,ভাষাভিজ্ঞতা, আশ্চর্য্য চিন্তাশীলতা দেখিয়া কলিকাতার "ইংলিশম্যান" একদা লিখিয়াছিলেন—

"Kali Charan writes better English than many English litberati.

অর্থাৎ অনেক ইউরোপীয় সাহিত্য-জীবী অপেক্ষা কালীচরণ উৎকৃষ্ট-তর ইংরাজী লেখক। বাঙ্গালী-বিদ্বেষী "ইংলিশম্যান" সমাচার পত্রের মুখে এই প্রশংসা বড়ই গৌরবজনক। কালীচরণের সাধুতা, নম্রতা ও সাত্ত্বিক ব্যবহার দেখিয়া ইউরোপীয় পাদ্রীরা তাঁহাকে Pious Christian কহিতেন। গোঁড়া হিন্দুরাও তাঁহাকে ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া জানিতেন। বড় লাট এবং ছোট লাট হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই কালীচরণের চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত বাবুর পক্ষে,বিশেষতঃ দেশীয় খ্রীষ্টানের পক্ষে, এই গৌরব অবশ্য অসাধারণ। বঙ্গ-দেশের বর্ত্তমান লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সার্ এণ্ডরু সাহেব কালী বাবুর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সাহেবেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কালীচরণ "দেশীয় খ্রীষ্টান," বিশেষতঃ "গবর্ণমেণ্টানুগ্রহবিরোধী" না হইলে এতদিনে হাইকোর্টের জজ হইতেন, ইহা নিশ্চয়। জজের উচ্চ পদ পাইবারও তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। বাস্তবিক এমন কোন প্রয়োজনীয় বিদ্যা ছিল না, যাহাতে কালীচরণের অধিকার ছিল না। দর্শনশাস্ত্রে ( Philosophy ) তিনি পাকা ওস্তাদ। ইউরোপীয় ফিলসফিতে তাঁহার সময়ে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত এদেশে ছিল না। যুবাকালে বাবু কালীচরণ এমন সুন্দর সুকণ্ঠ গায়ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন যে, গীত গাহিয়া অনেককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিতেন। উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার অধিকার ছিল। এণ্ট্রান্স হইতে আরম্ভ করিয়া রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারশিপ পরীক্ষা পর্য্যন্ত তিনি পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তিনি যে কি বিষয় জানিতেন না, তাহা জানি না। তাঁহার মৃত্যুর পরে একজন প্রগাঢ় ইউরোপীয় পণ্ডিত আমাকে বলিয়াছিলেন, "There was no subject upon which Baboo Kali Charan could not lecture." অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নাই, যাহা পাইয়া কালীচরণ উপদেশ দিতে না পারে। এখন জিজ্ঞাসা করি, সত্য করিয়া বল দেখি, এমন চৌরস বাঙ্গালী আর কভু কি দেখিয়াছ?

যখন ভুবনবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেহ চিনিত না, তখন কালীচরণ একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাস্তবিক যৌবনবয়সে কালীচরণের বক্তৃতা যে ব্যক্তি না শুনিয়াছে, কালীচরণের বাগ্মীতা সম্বন্ধে তাহার কিছুই জ্ঞান হয় নাই। এমন অসাধারণ বাগ্মী এদেশে আর জন্ম গ্রহণ করে নাই। রুসিয়ার প্রসিদ্ধ সম্রাট পিটর দি গ্রেট্ বলিতেন, "It is a good sign when good deeds are honored.

অর্থাৎ মহতের মহৎ কীর্ত্তির সম্মান করা শুভ লক্ষণের বিষয় বলিতে হইবে। পিটরের পরে যিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন "It is an excellent virtue to honor and follow a great man." অর্থাৎ বড়লোককে সম্মান করা ও তাঁহার অনুসরণ করা পরম ধর্ম্ম। আমি বিবেচনা করি, স্বর্গগত কালীচরণকে সম্মান করা এবং তাঁহার জীবনের অনুকরণ করা পরম গুণ বলিয়া গণ্য হইবে।

মহাত্মা কালীচরণ হুগলী জেলার অন্তর্গত খন্নিয়ান গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ-সম্ভূত লোক ছিলেন। ইঁহার পিতা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর নগরে বাস করিতেন, সেইখানেই কালীচরণের জন্ম হয়। এই জন্য সমস্ত জীবনে কালীবাবু জব্বলপুরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও সহাধ্যায়ী মিষ্টর এইচ, বসু মহাশয় যখন জব্বলপুরের আসিস্‌টাণ্ট কমিশনর ছিলেন, তখন সেই সুপ্রিয় খ্রীষ্টীয় বন্ধুর গৃহে গিয়া কালীবাবু অবস্থান করিতেন। উনবিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং ইংরাজীতে এম, এ, ও আইনে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। জেনেরল আসেম্বিলী, ফ্রিচর্চ্চ প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। রিপন কলেজ ও সিটি কলেজেরও তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তদনন্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বঙ্গদেশীয় ছোটলাট সাহেবের কৌন্সিলের সভ্য পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে বড় লাটের কৌন্সিলের সদস্য হওয়ার আশা ছিল। কালী বাবু কলিকাতা মিউনিসিপালীটীর কমিশনর ছিলেন এবং বহুবিধ দেশহিতকর ও কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াও কখনও গবর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। পৈত্রিক সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই। এমন স্বনামধন্য পুরুষ বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল। বাস্তবিক রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে এমন গুণবান "দেশীয় খ্রীষ্টান" অদ্য পর্য্যন্ত কেহ আবির্ভূত হয় নাই। তিনি দেশীয় সমাজের অন্যতম নেতা ( Leader ) ছিলেন। হায়! এহেন পুরুষ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন !!

কালীচরণের হিন্দু জ্ঞাতিবর্গ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, মহাশয়, দ্বারবঙ্গের অধীন সমস্তিপুরে ওকালতী করিতেছেন। পার্ব্বতী বাবু আনুষ্ঠানিক হিন্দু; ইনি হুগলীর সবজজ্ বাবু শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয়ের বৈবাহিক এবং কলিকাতার সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাবু দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। পর্ব্বতী বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর বাবু ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামে সুপরিচিত। কলিকাতার "সন্ধ্যা" নাম্নী দৈনিক পত্রিকার ইনি প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক। উপাধ্যায় মহাশয় তরুণ বয়সে রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমি যে স্থানে বসিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি সেই স্থান কলিকাতা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী; যে দেশপ্রসিদ্ধ ধনবান ও ধার্ম্মিক পুরুষের

রাজপ্রাসাদে উপবেশন করিয়া আমি এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি, সেই প্রাসাদস্বামীর জনৈক কর্ম্মচারীর হস্তে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের একখানি সুন্দর ছবি ছিল, তিনি আমাকে ঐ মনোমোহিনী ছবি দেখাইয়াছিলেন "দেখুন, কেশব বাবুর মূর্ত্তি কি সুন্দর!" ব্রহ্মানন্দের ঐ প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে আমার স্মরণ হইল, একদা কলিকাতা রাজধানীর টাউন হলের বিরাট সভায় কেশব কহিয়াছিলেন, "It is easy to distinguish a greatman but it is very difficult to comprehend him" অর্থাৎ দশজনের মধ্য হইতে একজন বড় লোককে চিনিয়া লওয়া সহজ, কিন্তু তাঁহাকে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি বলি, কালী চরণকে বড় লোক বলিয়া অনেকে বিশ্বাস ও সম্মান করিতে পারেন, কিন্তু এহেন অশেষ গুণশালী পুরুষকে ভাল করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য এখনও অনেকের হয় নাই।

বৃদ্ধাবস্থায় কালীচরণ নানা প্রকার পারিবারিক শোকে দিন যাপন করিয়াছিলেন। মৃত্যু তাঁহার পক্ষে শান্তিদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান তাঁহার আত্মায় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা ও কামনা।*

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে অবগত হইলাম, ইংরাজি ১৮৬৩ অব্দে কালীচরণ বাবু খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষা (বাপ্তিস্মা) হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি একজন মুসলমান খ্রীষ্টান যুবকের সহিত বর্দ্ধমান নগরে গমন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; বক্তৃতার সময়ে কালী বাবু [illegible] হইতে সংগৃহীত [illegible] হাতে [illegible] লইয়া শ্রোতাদিগকে কহিতেন "ইহাই মানবের পরিণাম; অতএব পাপহারী, মুক্তিদাতা, এবং পরকালের সহায় স্বরূপ প্রভু যিশুর সরণাগত হও" ইত্যাদি। কালী বাবুর লিখিত অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বিলাতের টাইম্‌স নামক জগদ্বিখ্যাত সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। অনেক ইউরোপীয় পাদ্রী বলেন, কালী বাবু ফ্রিচর্চ্চ মিশনের লোক না হইয়া যদি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন (এবং বোধ হয় নেটিব বাঙ্গালী না হইলে) এতদিনে কোন স্থানের লর্ড বিশপ হইতে পারিতেন, ইহা নিশ্চয়। শুনা যায়, একাধিক বার তাঁহার নাম বিশপ বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, কিন্তু উপরিউক্ত বাধা বশতঃ তিনি বিশপ হইতে পারেন নাই। কালী বাবু যখন বঙ্গদেশের ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তখন কলেজ ষ্ট্রীটের বিরাট সভায় তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দিবার সময়ে বিখ্যাত পাদ্রী ম্যাকডোনালড্ মহাশয় কহিয়াছিলেন "এই মহাপুরুষ ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টানদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা।" জজ গুরুদাস বাবু বলিয়াছিলেন, "আমার বন্ধু কালী বাবু কেবল খ্রীষ্টানের বন্ধু বা নেতা নহেন, ইনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, খ্রীষ্টান, ইউরোপীয়, আমেরিকান এবং ভারতবাসী, সকলেরই বান্ধব এবং সকলেরই মধ্যে অন্যতম নেতা। ইনি গবর্ণমেণ্টের ও প্রজা সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী"। শুনা যায়, ছোট লাট সার এনড্ ফেজার বাহাদুরের পিতা রেভরেণ্ড ডাক্তার ফেজারের সহিত কালী বাবু কিছু দিবস মধ্য প্রদেশে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে কালীবাবু কন্যা শোকে ও দৈহিক রোগে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ভুবনবিখ্যাত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডফ্ সাহেবের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে রেভরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন, বাবু কালী চরণ, লক্ষ্ণৌ-মিশনের বাবু রামচন্দ্র বসু, সাহাবাদ মিশনের বাবু জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জব্বলপুরের ভূতপূর্ব্ব আসিসটাণ্ট কমিশনর বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু এবং কলিকাতা রামবাগান পল্লীর দত্ত বংশ সর্ব্বাগ্রগণ্য।

কালীচরণ বাবুর পিতার নাম [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। [illegible] লেখক।

# শিশু

বুঝেছি সে সত্য কথা, নয়কো চাটু বাণী ;
প্রাণের মাঝে আছে সুধা, মানি তাহা মানি।
ঢেউ খেলিয়ে যতটুকু লাগে ঠোঁটে চোখে,
সেই টুকুতো'তিনি'পান করেন্ ঢোকে ঢোকে।
প্রাণের বাসা-ঘরে সুধা ছিল জমাট্ করা,—
সেই সুধাতে মোদের যাদুর অঙ্গখানি গড়া।

আমি যবে বাহু-পাশে বেঁধে ফেলি "তাঁয়",
অতি-ঘন স্বপ্ন নাকি লাগে তাঁহার গায়।
তাঁরে যখন্ বাঁধি, আমার বুকে মোহ কাঁপে ;
বুঝেছি, সে পরাণভরা স্বপনেরি চাপে।
প্রাণ-কোটরে শিশুর নীড়ে স্বপ্ন ছিল ভরা,—
সেই স্বপনে মোদের বাছার অঙ্গখানি গড়া।

নয়কো মিছে, বলেন্ 'তিনি' আমায় বেসে ভালো,
আমি নাকি চাঁদের মত আঁধার ঘরের আলো।
এই কপোলের কূলে কূলে পুলক্ যখন জাগে,
সত্য, দেখি, আলোর ছিটে তাঁর কপোলে লাগে,
বিজন্ প্রাণের মাঝে আমার আছে আলোর ঝরা,—
সেই আলোকে মোদের চাঁদের অঙ্গখানি গড়া।

মানি বটে, ফেলে দিতে শিশুর মুখের মাটি,
চোদ্দভুবন্ নন্দরাণী দেখেছিল খাঁটি।
শিশু যখন্ হাসে, তাহার দুধে দাঁতের কোলে;
লক্ষ্য করি শোভা ভরে লক্ষ ভুবন দোলে।
সারা বিশ্বের কচি-শোভা ছিল জড় করা,
সেই শোভাতে মোদের শিশুর অঙ্গখানি গড়া।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# দুষ্টের দমন না দুর্ব্বলদলন

জয় ইঙ্গ ! জয় ইঙ্গ ! জয় ইঙ্গ ! ববম্বম্।
অসংখ্য সিরাজুদ্দৌলা রাজ্যমধ্যে স্থাপনম্॥

বাস্তবিক সিরাজুদ্দৌলা নামে কোন নরপিশাচ বঙ্গের সিংহাসনে বসিয়া নানা উপায়ে প্রজা-পীড়ন করিয়া গিয়াছেন কিনা,সে বিষয়ে অধুনা অনেক ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে। প্রত্যুত নিরপেক্ষ গবেষণা দ্বারা এবম্প্রকার প্রমাণাদি সংগৃহীত হওয়ার কথা শুনা যাইতেছে যে, বাঙ্গালার শেষস্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা অশিক্ষিত অসংযত যুবক হইলেও কোন অংশে অত্যাচারী ছিলেন না ; তাঁহার যৌবন-সুলভ ত্রুটি-দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি নিতান্ত মন্দ লোকের মত ব্যবহার করেন নাই ; কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের জন্যই তাঁহার বহুবিধ অখ্যাতি ঘোষিত হয়, এবং তাহাদেরই দ্বারা তিনি ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়া অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দেন। হইতে পারে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার নামে তাঁহার অধীনস্থ রাজপুরুষগণ অনেক প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন, তাহাই স্বয়ং সিরাজুদ্দৌলার স্কন্ধে আরোপিত হইয়া অতিরঞ্জিত ভাবে নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক; আমরা ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত নই;

দেশে যে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, নবাব সিরাজুদ্দৌলার মত খাম্‌খেয়ালী যথেচ্ছাচারী হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য উৎপীড়ক-নরপতি বাঙ্গালায় কখন হয় নাই, উহা অমূলক বা সমূলক হউক, সত্য বা কাল্পনিক হউক, সিরাজুদ্দৌলা ও অসীম শক্তিশালী ঘোর অত্যাচারী ভূপাল যে একার্থবোধক-রূপে ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যদি সত্য হয় যে দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার রাজধানী ও তৎসন্নিহিত কয়েকটী স্থানে সামান্য কয়দিনের জন্য অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বৃটিশ-শাসনের শ্বেত-কৃষ্ণ উভয় জাতীয় কর্ম্মচারী প্রভুগণ কোম্পানির প্রথম আমল হইতে এ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে যেরূপ বিকট কাণ্ড করিয়া আসিতেছেন, এবং পক্ষপাতী বিচারের আশায় উৎসাহিত আপামর সাধারণ ধবলকায় মহাপুরুষগণের দ্বারা কৃষ্ণমূর্ত্তিগণ মধ্যে মধ্যে যেরূপ সাঙ্ঘাতিক ভাবে নিগৃহীত হইতেছে, তাহাতে যেন মনে হয় যে, শত সহস্র সিরাজুদ্দৌলা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সদর্পে ঘুরিতেছে! প্রভেদ এই যে, সেকালে আইনের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিয়া ঈশ্বরের নিকট দ্বিগুণ অপরাধী হইতে অত্যাচারীগণ সাহস করিতেন না, এখন সুসভ্য সুখ্রীষ্টান বৃটিশ-রাজের বিধিব্যবস্থার দোহাই দিয়া অন্যান্য সভ্যজাতির নিন্দার পথ বন্ধ করিয়া যথেচ্ছাচার চলিতেছে।

ব্যক্তিগত অত্যাচার উৎপীড়নের কথা আমরা তুলিব না, উহার আলোচনা সংবাদ পত্র সমূহে খুব চলিতেছে, সাম্রাজ্যের ধুরন্ধর মহা প্রভুগণ দ্বারা অতি সুবিবেচনার সহিত যে সকল আইন কানুন বিধিবদ্ধ হইতেছে, যাহার কলে পড়িয়া আমাদের দম্ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, যে জগদল পাথরের চাপে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া বুঝিবা জন্মের মত স্থগিত হয়, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার ইচ্ছা আছে।

সিপাহী-যুদ্ধাবসানে সাম্রাজ্য মহারাণীর খাশ হইবার পর ফৌজদারী কার্য্যবিধি ও দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। তদনন্তর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির প্রথম আমলের ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নং বকেয়া রেগুলেশনানুযায়ী খোদ বড়লাট-দপ্তরের ওয়ারেণ্ট দ্বারা কতিপয় ফরাজী মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়া মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগাপরাধে দণ্ডবিধির ১২১ ধারা মত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হয়। উক্ত ফরাজী-ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের দমনার্থ এবং সাধারণ প্রজার শাসনোদ্দেশে ১৮৭০ সালে ১২৪-ক ধারা সন্নিবিষ্ট হয়, যথা—

"ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আইন দ্বারা যে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি উচ্চারিত কি পাঠার্থ কথা দ্বারা, কিম্বা ইঙ্গিতে, কিম্বা দৃশ্য-চিত্রাদি দ্বারা, কি অন্য প্রকারে সেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অভক্তি ভাবের উৎসাহ দিলে কি দিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন কিম্বা নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ-দণ্ড, ও তদুপরি অর্থদণ্ড, অথবা তিন বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড, বা তদুপরি অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, অথবা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

"অর্থ। গবর্ণমেণ্টের কোন ক্রিয়াতে অসম্মতি হইলেও যদি ঐ অসম্মতি গবর্ণমেণ্টের আইনসিদ্ধ আধিপত্যের বশতা ভাবের সঙ্গত হয়, এবং ব্যবস্থা-বিরুদ্ধে ঐ আধিপত্যের উচ্ছেদ কি বিপক্ষতা করণার্থ উদ্যোগ হইলে তৎপরিহার করণ পূর্ব্বক ঐ

গবর্ণমেণ্টের আইনসিদ্ধ আধিপত্যের প্রতিপোষকতা ভাবের সঙ্গত হয়, তবে সেই অসম্মতি অভক্তি নয়। অতএব কেবল সেই প্রকারের অসম্মতির উৎসাহ দিবার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের ক্রিয়ার যে চর্চ্চা করা যায়, তাহাও এই ধারামতে অপরাধ নয়।”

( "Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs, or by visible representation or otherwise, excites or attempts to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India, shall be punished with transportation for life or for any term to which fine may be added, or with imprisonment for a term which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.

[ "Explanation :—Such a disapprobation of the measures of the Government as is compatible with a disposition to render obedience to the lawful authority of the Government and to support the lawful authority of the Government against unlawful attempts to subvert or resist that authority, is not disaffection. Therefore, the making of comments on the measures of the Government, with the intention of exciting only this species of disapprobation is not an offence within this clause' )

সে সময় এই ধারানুসারে কাহারও বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আবশ্যক ছিল, এখন নাই।

অতঃপর কলিকাতায় টালার হাঙ্গামা এবং পুনায় বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের মোকদ্দমা প্রভৃতি কয়েকটী কাণ্ড কাছাকাছি ঘটায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সিডিশন-আইনের পাণ্ডুলিপি হইয়া উহা বিধিবদ্ধ হয়। তৎকালে পাণ্ডুলিপির সমালোচনায় আমরা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

“এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃতিবর্গের উপদেশাদিতে রাজপুরুষগণ কখনও কর্ণপাত করিবেন না; তথাচ উক্ত আইন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে দুই চারি কথা বলা কর্ত্তব্য-বোধ করি; মনোযোগ দেওয়া না দেওয়া তাঁহাদের মর্জ্জি।”

“দণ্ডবিধির ১২৪ ক ও ৫০৫ ধারা সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত। নূতন ১২৪ ক ধারাটী এইরূপ হইতেছে—

"Whoever by words either spoken or *written*, or by signs or by visible representation, or otherwise *brings or attempts to bring into hatred or contempt*, or excites or attempts to excite disaffection towards *Her Majesty or the Government or promotes or attempts to promote feelings of enmity or ill-will between different classes of her Majestys subjects. &c. &c.*

ইটালিক হরপের কথাগুলি নূতন সন্নিবেশিত। নূতনের মধ্যে ‘গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের কথাটা বড়ই বিষম। পুরাতনে ছিল ‘বৃটিশ ভারতে আইনের দ্বারা স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের প্রতি অভক্তি-ভাবের উত্তেজনা।’ সুতরাং তাহার অর্থ ছিল একরূপ। নূতনের গবর্ণমেণ্ট শব্দের অর্থ দেখা যাউক ;—১৭ ধারায় উহা ব্যাখ্যাত, যথা—

"The word 'Government' denotes the person authorized by law to administer Executive Government in any part of British India.

ইহা দ্বারা সোজাসুজি এই বুঝিতে হইবে যে, নূতনের “গবর্ণমেণ্ট” মানে বড়লাট হইতে সব্‌ডিপুটি পর্য্যন্ত, থানার জমাদারে পঁহুছিলেও দোষ হয় না। যদি কেহ ঐ সব নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীকেও ঘৃণার চক্ষে দেখেন বা ফেলিবার চেষ্টা করেন, তিনিও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দায়ে ঠেকিবেন।”

তারপর নূতন ধারায় ব্যাখ্যাতে disaffection মধ্যে disloyalty কে ফেলা হইয়াছে; আমরা যতদূর ইংরাজী বুঝি, তাহাতে "disloyalty খুব লম্বাচৌড়া কথা, disaffection উহার অন্তর্গত হইতে পারে। জানি না, আইনকর্ত্তার এরূপ ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য কি ?”

“নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আর এক কথা এই যে, যখন পণ্ডিতবর ব্যবস্থা-সচিব ইংলণ্ডীয়

আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার বিশেষ প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছেন, তখন sedition শব্দটী তাঁহার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমরা যতদূর জানি, উক্ত শব্দ স্কটলণ্ডীয় আইনে আছে, ইংলণ্ডীয় আইনে উহার আদৌ ব্যবহার নাই; আছে seditious words, seditions conspiracies, seditious libels." শেষোক্ত অপরাধের দণ্ড নিতান্ত লঘু, অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে দেওয়ানী ফাটকের ন্যায় ব্যবস্থা।"

"অবশেষে ইহাও বিবেচ্য যে একই ধারাতে রাজবিদ্বেষ offences against the state ও সাধারণের শান্তিভঙ্গ offences against public tranquility উভয়ের খিচুড়ি করা আইন-পণ্ডিতগণের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। হাঙ্গামা প্রভৃতির জন্য ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রহিয়াছে। টালার হাঙ্গামা ও তিলকের মোকদ্দমা কাছাকাছি ঘটিয়াছে বলিয়া কি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজপুরুষগণ উভয়বিধ অপরাধকে আইন মধ্যে একত্রে স্থাপন করিলেন? এ সব যেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের অভিনব জুরিস্‌প্রুডেন্সের লীলা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

আইন বিধিবদ্ধ হইলে দেখা যায়, ধারাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট, শেষাংশ ১৫৩ক রূপে প্রচারিত। ১২৪ক ধারাতেও "গবর্ণমেণ্ট" শব্দ শুধু না দিয়া পূর্ব্ববৎ গুণবাচক দ্বারা বিবৃত। যাহা হউক, তৎকালে আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম,তাহা এখন কাজে দেখা যাইতেছে। নূতন আইনের ভয়ে কিছুদিন লোকে চুপচাপ ছিল, এখন যাই কেহ কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতেছে, অমনি "পাঞ্জাবী" "বিহারীর" মত উহার কলে পড়িতেছে। দুর্ব্বলতাবশত রাজপুরুষগণ সামান্য ঠুকঠাক শব্দে চম্‌কিয়া উঠিয়া আইনের কল ছুটাইতেছেন। উহা দ্বারা যাহাকে তাহাকে যে-সে-ভাবে ধরা হইতেছে। যে ধারাতে পাঞ্জাবী পড়িয়াছে, উহা আদৌ তাহার ক্ষেত্রে খাটে না।

রাজপুরুষগণের এবম্বিধ সন্দেহ, ভীতি ও আতঙ্কের দ্বারা কি বুঝিতে হইবে না যে, বর্ত্তমান শাসন-শক্তি প্রেমের বলে, ন্যায়ের বলে, সত্যের বলে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আপনাকে সুস্থির রাখিতে অপটু? চিরকাল জানা আছে, বৃহৎকায় হস্তীপৃষ্ঠে ক্ষুদ্রতনু পিপীলিকা নৃত্য করিলে মাতঙ্গ আদৌ তাহার খবর রাখে না; আর যদিও টের পায়, তুচ্ছ পিপীলিকার উক্ত প্রকারের ধৃষ্টতা অবজ্ঞা বা অপমানসূচক মনে না করিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া থাকে। হীনাৎহীনতর পিপীলিকা মশকাদির প্রতি গজরাজের এ ভাব ত হইবারই কথা, রাজপথের উপদ্রবকারী কুক্কুরের দলের সচীৎকার পশ্চাদ্ধাবনও মহানুভব মাতঙ্গকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না; তাহাদের সহস্র হাহারব অগ্রাহ্য করতঃ হস্তী আপনমনে নিজের মন্থরগতিতে গন্তব্যপথে চলিয়া যায়। শারীরিক বলপ্রভাবে মহৎ ক্ষুদ্রকে এই ভাবে দেখিয়া থাকে। নৈতিক জগতেও ঠিক এই নিয়ম। নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র ধর্ম্মপ্রাণ ভদ্রলোক কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া বিবেকের বলে ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে ধীরে ধীরে গমন করেন; দুষ্টমতি নীচাশয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিচলিত করিবার অভিপ্রায়ে নিয়ত বহুতর মিথ্যা রটনা দ্বারা কত কোলাহল-কলরব করিয়াও কিছুতে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইতে পারে না। অপর পক্ষে যাহার মনে নানারূপ কুচিন্তা, কুভাব, কুপ্রবৃত্তি সর্ব্বদা জাগরুক,

সে অতি নগণ্য ব্যক্তির সম্মুখেও যেন নতশির, সদা সশঙ্কিত, চিন্তাযুক্ত, কি প্রকারে কোন্ উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে; নানাবিধ কাল্পনিক বিভীষিকা অষ্টপ্রহর তাহার সম্মুখে বিকটবদনে নৃত্য করিয়া থাকে। অক্ষম অনুপযুক্ত পদস্থ ব্যক্তিকেও এই কারণে নিজের মান মর্য্যাদা রক্ষা হেতু নিরন্তর উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত থাকিয়া বহুবিধ দুষ্ট উপায় উদ্ভাবনে বাধ্য হইতে হয়।

সংসারের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের উক্ত প্রকারের যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে বৃটিশ সিংহের আধুনিক ব্যবহারে মনে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইবার কথা। দেখিতেছি, দেড়শত বৎসরেও ইংরাজ আমাদের হৃদয়-রাজ্যে সিংহাসন স্থাপিত করিতে পারিলেন না; তাই এই সুদীর্ঘকালের পর আজ নানা-বিধ কঠোর ব্যবস্থায় দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপে আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রীতদাসের অবস্থায় ফেলিয়া শাসনে রাখিতে যত্নবান। জানিনা, এই ঘোর দুর্দ্দিনের অবসান কতকালে হইবে। কিন্তু এ কথা বুক ঠুকিয়া বলা যায় যে, শুধু জবরদস্তী দ্বারা শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে কখনই চলিতে পারে না। কেবল মাত্র প্রেমের ভিত্তির উপর যে রাজ্য স্থাপিত, তাহাই কল্পান্তস্থায়ী, আর সব তিন দিনের খেলা, চতুর্থ দিবসে ভোঁ ভোঁ !!!

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

---

# আকাঙ্ক্ষিতা।

রাজবালা পরিণয়ে বাসনা সবার,
অজ্ঞাত সুদূরদেশে বসবাস যার,
সখিগণ সঙ্গে নিয়ে মনঃ কুতহলে
নিত্য আসে স্নানার্থিনী সরোবর জলে।

মধুর মধুর মূর্ত্তি; অঞ্চলে সৌরভ
হৃদয় করুণাময়; চলনে গৌরব;
উত্তপ্লুত সখীদের হাস্য কলকলে;
চিত্ত তার স্থির আছে শান্ত মনোজলে।

নিত্য আসি স্নান করে সখী পরিবার;
সরোবরে নিত্য ফুটে কুমুদ কহ্লার;
তার মাঝে রাজবালা সৌন্দর্য্যে সুবাসে
সরসী সরোজী সম সদা অধিবাসে।

নিত্য আসে ভাটগণ রাজার সভায়,
রাজা রাজ্যান্তর হতে, পাত্রী অভিপ্রায়;
জল কলরব সহ নর্ম্ম কলরব
নিত্য নিত্য স্নান বেলা করে অভিভব।

রাজবালা চাহে বুঝি অমনি গভীর
সরোবর সম মন অমল সুস্থির!
অতলে আকাশগ্রাহী, বিপুল উদার
রাজহংসী পারে যাহে করিতে বিহার!

একদিন, ওকি হ'ল! সরোবর জলে
বিম্বকার! নিরখিল, তটতরু তলে
উদাসী পথিক দীন নিব্যূঢ় তৃষ্ণায়
চাহি সরোবরে, সেই মরীচী মায়ায়।

ছিড়ি পদ্মফুল বালা পরিলা হৃদয়ে,
যথায় যুগল কলি উন্মুখিয়া রহে।
শান্ত নেত্র পাত করি পথিকের পানে
চলিলা আবাসে দেহ বিলীন বসনে।

তার পরে রাজবালা রুদ্ধবাতায়নে
শুনিত জাগিয়া বসি বিনিদ্র নয়নে
কাহার নিশীথ বাঁশি—সুরের সন্ধান
অতর্কিতে প্রাণ মূলে পড়ে যার বাণ।

কভু চন্দ্রালোকসিক্ত সুধায় বিহ্বল,
মালিনী ছন্দের মত উচ্ছ্বাস তরল;
কভু মন্দাক্রান্তা গুরু গুমরে যাহার
মর্ম্মে জাগে গুপ্ত ব্যথা রুদ্ধ হাহাকার!

কভু আসি দেখা দিত নিরুদ্ধ চলনে,
সলজ্জ স্থগিত মূর্ত্তি কক্ষ বাতায়নে;
হে দেবি, দীনেরে দয়া দৃষ্টি কর দান,
অপরূপ ভিক্ষানীতি করিত উত্থান।

কভু অশ্রু কভু হাসি কভু অভিমানে
ভরে দিত বাতায়ন-বাসিনী বয়ানে;
নিত্য নিশাকালে হোথা প্রাণ খানি যার,
সুনিভৃতে ধ্বনিপথে করে অভিসার।

তার পর, স্বয়ম্বর সভায় যখন
লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র, হীরক কাঞ্চন,
অঙ্গদ বলয়হারে ঢাকি প্রাণ খানি
বসেছিল, কত গর্ব্বে সভায় না জানি!

আমি দ্বারদেশে তার, অকথিত দুঃখে,
নিষিদ্ধ প্রবেশ, চাপি বীণাখানি বুকে
দেখিতেছি, ম্লান করি মণি-মুক্তা ঘটা
সভাগতা রূপসীর সৌন্দর্য্যের ছটা।

ধীরে ধীরে চলে বালা, না ফেলে নয়ান
কারো পানে; উপনীতা দ্বারী সন্নিধান;
সভাস্থ সভার মনে বিতর্ক বিচার
কত উঠে, মনস্থ কি রাজ-তনয়ার!

সুতৃপ্ত নয়নে চাহি—অসীম দৃঢ়তা
মুখে তার—মনে মোর দিয়েছিল ব্যথা
ক্ষণেক—অকুতোভয়ে সমক্ষে সবার
পরাল আমার কণ্ঠে বরণের হার!

হেরি তাহা, উচ্ছ্বসিত হাসি টিটকারে
পূরিল সে সভা; রাখি পশ্চাৎ সবারে
ভিখারীর কর ধরি, পূর্ণ গর্ব্ব ভরে
বাহিরিয়া এলা বামা বিশ্বের বাহিরে!

তার পরে, ধীরে ধীরে পাইল প্রকাশ,
জীবনের প্রতি অঙ্কে বিতরি সুবাস
আমারি সঙ্গীত লক্ষ্মী, মানসী যুবতী
এসেছে জীবনে মোর ধরিয়া মুরতি!

সভামাঝে স্বয়ম্বরা পরাণের টানে,
বসায়েছে মোরে নিয়ে পিতৃ-সিংহাসনে;
চারিদিকে মোরে ঘিরে শশী-সূর্য্য-তারা,
সঙ্গীতের সৌরভের সৌন্দর্য্যের ধারা!

সত্যকার রাজবালা—অজ্ঞাত রাজার;
বিশ্বের ধ্যানের ধন কাঙ্ক্ষিতা সবার;
চিরকাল কুমারী সে করে অবস্থান
করেনি কাহারে আজো বরমাল্য দান।

কে তারে বরিবে জানি, সংসারের শেষে
বাজায়ে মনের বাঁশি মনোময় দেশে?
নিস্তরঙ্গ নিরবধির দ্বীপস্থ বিজনে
বসিবে হৃদয়ে ধরি আত্ম-সিংহাসনে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

# লোকশিক্ষার সনাতন আদর্শ।(১)

কোন স্পেন দেশীয় নৃপতি বলিয়াছিলেন, স্পেন-ভাষা পুরুষের ভাষা, ইতালীয় স্ত্রীলোকের, ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষা "গিজের" (geese) উপযোগী। কেহ কেহ এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করেন। আমরা স্পেন-দেশীয় না হইলেও স্বদেশের ভাষার প্রতি এই নৃপতির অতিরিক্ত অনুরাগ অপছন্দ করি না, কারণ রাজার কাছে যেমন, জনসাধারণের নিকটও লিখিত ও কথিত-ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম আয়ুধ। ইহার ভিতর দিয়া মানুষকে দেবতা কিম্বা দানব করা যায়।

সম্প্রতি ব্রিচ্‌লোডার মাঝল্ লোডার প্রভৃতি নানা অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে,প্রকাণ্ড কামানের কারখানার কবল হইতে নানা দৈত্য-দানব ভূমিষ্ঠ হইতেছে, কিন্তু ইহাতে শিশুপালের হৃদয় যতটা বিচলিত হইতেছে না, ততটা নৈশ-অন্ধকারে অর্গল-রুদ্ধ দ্বারের অভ্যন্তরে নিস্তব্ধ অচঞ্চল ক্ষীণালোকমুখী কয়েকটা লোকের অস্পষ্ট ভাষার সংবাদ কিম্বা রাষ্ট্র-নৈতিক দু'চার খানি Eikono-klastes প্রকাশে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। এই অভিনব সূক্ষ্ম শরীরধারী ভাষা তাড়িতের ন্যায় জাতি শরীরে প্রবাহিত হইয়া উহার শরীর, মন, এবং বাক্য রচনা করিতেছে। রাষ্ট্র-জগতের কবি-কথিত সাতটী অঙ্গের নিয়ন্তা এই অশরীরী অলোমুখী ভাষা—হেমদণ্ড এবং হীরক-কীরিট-ধারী রাজা নহে। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের ন্যায় অনেক নৃপতি ইহার গতিরোধ করিতে যাইয়া বিফলপ্রয়াস হইয়া থাকে।

এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যিকগণ ভাষার, বাক্যের প্রশংসা এবং ব্যাখ্যা করিতে করিতে ক্লান্ত হয় না। ইহাকে দেবতারূপে আরাধনা করিয়া, "সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা" কল্পনা করিয়া, প্রাচ্য কবিগণ তৃপ্ত হইয়াছেন।

লিখিত এবং কথিত ভাষার প্রভাব স্থান-ভেদে এবং কাল-ভেদে একেবারে বিভিন্ন, কিন্তু কোন্‌টী সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অধিকতর সক্ষম, নিশ্চয়রূপে বলা যায় না, কারণ ইতিহাসের সাক্ষ্য বিভিন্ন। বাচনিক বা মৌখিক শিক্ষার ভিতর দিয়া অনেক স্থলে যাহা হয় এবং হইয়াছে, লিখিত কিম্বা মুদ্রিত কথার ভিতর দিয়া তদপেক্ষা বেশী হয় নাই,এরূপ দৃষ্টান্ত দিতে কাহারও পরিশ্রম করিতে হইবে না।

ভাব-বিপ্লব জন্মাইতে কথিত, লিখিত এবং মুদ্রিত ভাষা কোনটীই অক্ষম নহে—তবে প্রণালী বিভিন্ন হওয়ায় রুষিয়ায় কিম্বা ট্রান্সভালে যাহা সহজ, চীনে, ভারতে কিম্বা ফিলিফাইন দীপপুঞ্জে তাহা নহে। এজন্য প্রত্যেক স্থানের প্রণালী স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন না করিলে সফলতা যদি সমীপবর্ত্তী না হয়, তবে নিজকে এবং দেশকে ধিক্কার দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

দেখা গিয়াছে, শত বৎসর পর্য্যন্ত সাহিত্যকে বিশেষ সমাজের সম্পত্তি করিয়া অন্যান্য সমাজকে পঙ্গু করা হইয়াছে এবং অন্যান্য সমাজও মন্ত্রমুগ্ধ জীবের ন্যায় এই পঙ্গুত্ব ভার বহন করা লজ্জাজনক মনে করে

নাই। কাজেই উহার দুষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত প্রভাব অস্বীকার করা চলে না।

আক্ষরিক যুগের পূর্ব্বের ইতিহাস ঘটনা-বৈচিত্র্যের কম বিস্ময়-জনক নহে। বক্তৃতা, কোলাহল, রক্তপাত, যুদ্ধাদি বরং তুলনা করিলে তখন বেশী হইয়াছে,স্বীকার করিতে হইবে। এই সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের অতিরিক্তই অক্ষর-সাহিত্য গঠন করিয়া তুলিয়াছে। ফিনিক্ বণিক্‌গণের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিস্তৃতির শক্তির আধিক্য এই জাতিকে পৃথিবীতে ক্রমশঃ গঠিত Hieroglyphic এবং Hieratic হইতে অক্ষর উৎপত্তি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

সে যাহাই হোক্,আক্ষরিক যুগের পূর্ব্বেই হোক্, পরেই হোক্, লোক-শিক্ষা বিস্তৃতির স্রোত চিরকাল অবারিত ছিল। জ্ঞান-বিস্তৃতির জন্য ক-খ-গ-রূপী আশ্চর্য্য-জনক পদার্থের সহিত যোগ সম্প্রতি প্রয়োজন, সন্দেহ নাই,কিন্তু তাহা না হইলে অন্য কোন উপায়ে জ্ঞান-বিস্তৃতি অসম্ভব,একথা কখনও সত্য ছিল না এবং নাই। বর্ত্তমান মুদ্রা-যন্ত্রের যুগে যাহাকে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করা যাইতেছে এবং যাহার অভাবের জন্য বিলাতী পাদ্রীর সহিত দেশের জন-সাধারণকে উপহাস করিতেছি, তাহা একটা সনাতন ব্যাপার নহে—সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

বর্ত্তমান পৌরস্ত্য এবং ইউরোপীয় শিক্ষা-প্রণালী বিচারে আমরা যেন কিছুতেই এই কথাটী না ভুলি।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রস্বাপন-অস্ত্র নামক এক প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। কবি-কল্পনা ইহার ভিতর দিয়া হত্যা-কাণ্ডকে নিতান্ত মাজিয়া ঘষিয়া নিদ্রাতে পরিণত করিয়াছে। রক্তপাত নাই, নিষ্ঠুরতা নাই, অথচ জয় পরাজয় আছে। এই অস্ত্র কবির আগুনে তৈয়ার হইয়াছে, না ভগবান বিশ্বকর্ম্মা অস্ত্র নির্ম্মাণে শ্রান্ত হইয়া কার্য্যক্রম হ্রস্ব করিতে ইহা নির্ম্মাণ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন,জানি না, তবে এটা জানি,বর্ত্তমান সময়েও এই একটী মাত্র অস্ত্রের সাহায্যে একটী জাতি আর একটী জাতির উপর আধিপত্য করিতেছে। ইংরাজ আমাদিগকে Maxim gunএর দ্বারা কিছুই করিতে পারে না,কিন্তু উপরোক্ত অস্ত্র প্রয়োগে আমরা সুশীল বালকের মত অমনি ঘুমাইয়া পড়ি এবং স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও সুষুপ্তির কাল একেবারে ফুরায় না।

এই সুষুপ্তির মাঝে আমরা মনে করি, ঐ আক্ষরিক ইংরাজী শিক্ষা না হইলে আমাদের একেবারে উদ্ধার নাই। ইংরাজ পাদরী যোহান-লিখিত সুসমাচার হাতে লইয়া গ্রাম্য হাটের মাঝে বৃহৎ বটের ছায়ায় দাঁড়াইয়া যে সব কথা বলে, তাহা জীবন-যাত্রার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, নিতান্ত একথা স্বীকার না করিলেও, ছাপার বহি যাহার হাতে নাই, জগতের অস্তিত্ব তাহার কাছে মিথ্যা এবং তাহার নিকট হইতে জগতে কিছুই সম্ভব নহে, একথা গলাধঃকরণ করিতে সকলেই পটু।

ইংরাজের শিক্ষানবীশীতে আমরা অনেক কেকারব তুলিয়াছি, সমাজের সব কিছুই একেবারে প্রাবৃটের ঘন নীলমেঘে ঢাকা মনে করিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের দেশে শিক্ষা নাই, আমাদের জনসাধারণ অশিক্ষিত গণ্ডমূর্খ, এই নূতন পুরাতন—Soprano রাগিণীই বিস্ময়জনক। ইহার জন্য কেহ কেহ তাঁহারা ভাবপ্রধান ক্রন্দনও করেন।

হিসাবী লোকেরা আরাও একটু চতুর। তাহারা অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞের ন্যায় হিসাব করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের জনসংখ্যার হিসাবে আক্ষরিক শিক্ষা দান করিতে হইলে হয়ত ত্রিশ কোটী মুদ্রার প্রয়োজন এবং সময় হিসাব করিয়া বলেন, অন্ততঃ দেড় শতাব্দী না হইলে এই গুরুতর কার্য্য সম্ভব নহে। ততদিন ইংরাজকে আমাদের প্রয়োজন—ইংরাজ না হইলে এই কার্য্য হইবে না। কংগ্রেস্ সাহিত্য রূপী Webster Dictionary হইতে অমনি উদ্ধৃত হয়, ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমন "Providential." ইংরাজ মহলে তৎক্ষণাৎ করতালি পড়িয়া যায়—তাঁহাকে Statesman, Great Indian thinker প্রভৃতি উপাধি দেওয়া, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য করা হয়—ইংরাজ মহিলাগণ কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দেয় কি না, জানি না—বোধ হয় কৃষ্ণচর্ম্মে শিহরিয়া অগ্রসর হয় না।

দেড় শতাব্দী ইংরাজ থাকিবে, একথা বলিলে ইংরাজ আনন্দের আধিক্যে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইবে না কেন এবং soiree বা সান্ধ্য-পার্টিতে তাহাকে আমন্ত্রণ করিবে না কেন?

ইংরাজের প্রশংসা যেখানে বেদবাক্য এবং অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, সেখানে ইংরাজের প্রস্বাপন-অস্ত্র কাজ করিতেছে, এ কথা যেন ভুলিয়া না যাই।

যখন দেখিতে পাই, জগতের যে কোন জাতি ভবিষ্যতের দু চারটী বৎসর সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত নহে, এবং আমরা এক বিশ্বাসে জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় দেড় শত বৎসরের সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে মতামত প্রকাশ করিয়া ইংরাজকে বিস্ময়পূরিত চোখে দেখি, তখন মনে হয়, হয়ত আমরা অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্, না হয় অতিরিক্ত বোকা—বুদ্ধিমান্ যে নহি, তাহার অনেক প্রমাণ পাইতেছি, কিন্তু তবুও নিজকে বোকা বলিয়া ঠাহর করিবার শক্তিও নাই।

অজ্ঞতাবশতঃ কোন পথিক এক পণ্ডিতকে কাঞ্চনা গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী তাঁহার টোলের দূরত্ব জিজ্ঞাসা করে। পণ্ডিত-ঋষি চস্‌মা খুলিয়া তাহার চোখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলে—দেখ বাপু, এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত কঠিন। যদি ঐ কাঞ্চী নদী পার হইয়া, দক্ষিণদিকে যাও এবং সে দিকের হাটের চারিদিকে ঘুরিয়া উত্তরমুখী যাও, তবে উহার দূরত্ব সাত মাইল; সোজাসুজি যদি পশ্চিমদিকে যাও, তবে তিন মাইল মাত্র এবং যদি সোজাসুজি পূর্ব্বদিকে যাও, তবে তিন লক্ষ মাইলেরও অধিক। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা।

আমাদের বিচারের কথাও অনেকটা এইরূপ। এমন পথও আছে, যে পথে দেড় শতাব্দী কেন, দেড় লক্ষ শতাব্দীরও প্রয়োজন হইতে পারে। শুকপক্ষীর ন্যায় ইংরাজের কথা যদি গলাধঃকরণ করি এবং তাহাদের অদ্ভুত আদর্শরূপী পেটিকোটে যদি ভারত-লক্ষ্মীকে ভূষিত করি, তবে লক্ষ্মীকে পাইতে জাতীয় হৃদয়ের সহস্র বৎসর প্রয়োজন হইতে পারে।

কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িবার কাহারও প্রবৃত্তি না থাকিলেও অহরহ যেমন চোখে পড়িয়া স্পর্দ্ধার সহিত উহা মনে লাগিয়া যায়, তেমনি ইংরাজের প্রাধান্য এবং প্রভুত্বের উপযোগী করিয়া রচিত তথাকথিত ইতিহাস জাতীয় অন্তরে যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছে—সে ছবি কেহই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরাজ উহার সাম্রাজ্য সৃষ্টির অব্যবহিত

পরে যে জাল রচনা করিয়াছিল, আজ জাতি কিছুতেই তাহা ছিন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য, বিলাতী সভার সদস্যত্ব, আজ এই ক্ষীণ সূত্রের রচনার দ্বারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে।

হিতোপদেশের গল্পটী মনে হইতেছে। যে পক্ষী বহুদূর হইতে নিজের আহার্য্য দেখে, সে ঘন-রচিত জাল দেখিতে পারে না।

ইতিহাস রচনার একটী উদ্দেশ্য জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা। জাতির ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া ঘটনা সমষ্টিকে গাঁথিতে হয়, এই জন্য একই ঘটনা বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে বিভিন্নভাবে লিখিত হইয়াছে। Crimean War, Franco-German War, Afghan War প্রভৃতিতে বৈরীজাতিদ্বয়ের ইতিহাস একই ঘটনা সম্বন্ধে বিপরীত রচনা দেখা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক জগতে এই জন্যই প্রচলিত ইতিহাস হইতে যথার্থ তথ্য সংগ্রহ একান্ত কঠিন।

একটা দৃষ্টান্ত দিব। বিখ্যাত Franco-Prussian সমর অল্প দিনের ঘটনা। সুসভ্য উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়গণের চোখের সাম্‌নে উহা ঘটিয়াছে। অথচ ফরাসী এবং জর্ম্মন গ্রন্থে উহার বিবরণ কত বিভিন্ন, কারণ ফরাসী ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য ফরাসীভূমির ভবিষ্যৎ, জর্ম্মন ঐতিহাসিক জর্ম্মণী লইয়া ব্যস্ত।

কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কেবল গ্রন্থন কৌশলে পরিবর্ত্তিত হয়, এমন নহে, অনেক সময় অতিরঞ্জিত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে ইংরাজের যুদ্ধ ইতিহাসগুলি এইজন্য সাবধানের সহিত পাঠের যোগ্য।

ইংরাজের একটী উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অসত্যটী প্রমাণ করা যে, ভারতবর্ষ চিরকাল কাটাকাটি মারামারির ভিতর দিয়া আসিয়াছে এবং এই অসত্য নীতি প্রচার করা যে, কাটাকাটি মারামারি জাতীয় জীবনে কখনও প্রার্থনীয় নহে, অথচ তাহার নিজের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা, এক জাতির নহে, সহস্র জাতির রক্তে কলঙ্কিত। ভারতবর্ষে কখনও যে অনর্থক রক্তপাত হয় নাই, একথা তাহারা স্বীকার করিবে না।

এই ইংরাজের ইতিহাসে ভারতবর্ষের শতাধিক জাতি, লঙ্কাদ্বীপ এবং পূর্ব্ব উপনিবেশের জাতিগণ, West Indies, South Africa, British Central Africa, Australasia, Canada প্রভৃতি অসংখ্য লক্ষ লক্ষ জাতির রক্তপাতের কথা আছে। পাঠক Encyclopœdia Britannica র "The British Empire" শীর্ষক জঘন্য প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখিলে এই জাতির পাপের বোঝা কত গুরুতর, উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অথচ ইহারাই ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার সময় হঠাৎ যীশুখ্রীষ্ট হইয়া পড়ে, এবং পিস্‌ বা শান্তির দোহাই দিয়া নিজের পাপের ছবির উপর আবরণ দিতে চেষ্টা করে।

এইরূপে আমরা অনেক ইংরাজী কাণ্ডকে গলাধঃকরণ করিয়া বসিয়া আছি। ইংরাজ স্বল্পসংখ্যক হইয়াও নিজকে এত বড় করিয়া চিত্রিত করিয়াছে এবং আমাদিগকে এত ক্ষুদ্র করিয়া অঙ্কিত করিয়াছে যে, আমাদের নিজের দেশেও আমরা ভীরু। অথচ আমরা সংবাদপত্রে আমাদের স্বায়ত্ব-শাসন প্রাপ্তির ভিক্ষার জন্য নিজকে Educated Indians বলিতে উৎফুল্ল হইয়া পড়ি। এই এডুকেশনের অর্থ কি, আমি কখনও বুঝিতে পারি নাই।

নিজের দেশের প্রাণকে ধিক্কার দিয়া যদি আমরা বড় বড় Finance Minister দের কোটেশন-কার্য্যে দক্ষ হই, এবং গ্লাডষ্টোন বা সলস্‌বেরী, পিট বা এডামস্মিথের দোহাই দিয়া একটু খানি চাকরীর জন্য অর্থাৎ যাহাকে Expansion of Council প্রভৃতি নানা প্রকার নাম দেওয়া হয়, শতবার কোলাহল করি,তবে তাহাতে যে পরিহাসের সৃষ্টি হয়, তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই অনুভব করেন।

ইংরাজ ভারতে সফল হইতেছে,তরবারীর বলে নহে, একটা সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা-পদ্ধতি দিয়া, এতদিন পরে নানা আঘাতে এ বিষয়ে দেশের আংশিক চৈতন্য হইয়াছে। ডাকিনীর যে বিষমন্ত্র মানুষকে মেষে পরিণত করিয়াছিল, আজ তাহার প্রভাব কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিরীহ মেষ আজ যেন বুঝিতে পারিতেছে, সে যথার্থ মেষ নহে—কিন্তু যে মন্ত্র ঐ বিষকে অন্তর্হিত করিতে পারিবে, আজও তাহার প্রয়োগ সরু হয় নাই।

ইংরাজ আমাদিগকে যে পথে চলিতে বলিতেছে, ইংরাজী-শিক্ষার অজীর্ণ পদার্থাদি রোমন্থন করিতে করিতে যে পথ গ্রহণীয় মনে করা যাইতেছে, তাহা দেশের সনাতন পথ নহে—সাময়িক বিশ পঁচিশ বৎসরের রচিত টিয়াপাখীকে কিছুতেই আমাদের দেশকবিরা ময়ূর, ঘুঘু কিম্বা চাতকের স্থানে অভিষিক্ত করিবে না।

ইহার নর্ত্তন-দৃশ্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা এদেশের নাই।

এই খানেই পূর্ব্বকথিত পণ্ডিতের কথাটা মনে পড়ে। টিয়াপাখী লইয়া কিম্বা এমন কি Paradise Bird লইয়াও জাতির ব্যক্তিগত হৃদয় ভুলাইতে যাও,দেখিবে শত বৎসর কেন, শত লক্ষ বৎসরেরও প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু শুক-সারীর কথা শোনাও,অমনি গ্রামের ভাঙ্গা-কুটীর, তকৃতকে আঙ্গিনা, বাঁশের ঝোপ, পুকুরের ঘাট, গ্রাম্য-বধূর গৃহ-কর্ম্মের আসবাব, জীবন্ত হইয়া উঠিবে, নগ্ন ছেলেরা কলহ ছাড়িয়া তোমার কথার দিকে চাহিবে, মেয়েরা বেড়ার ভিতর দিয়া চুরি করিয়া তোমায় দেখিবে, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহীর সহিত বিগত রাত্রের সমগ্র ঝগড়া ভুলিয়া যাইবে।

দেশের কার্য্যের পক্ষে যথার্থ প্রণালী জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। দেশের হৃদয়, মতিগতির সহিত সহানুভূতি প্রয়োজন। তাহা হইলে দেশের পক্ষে উপযোগী প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

আমাদের দেশে ধর্ম্মগত এবং সমাজগত লোক-শিক্ষা বরাবরই ছিল। সম্প্রতি আলোচ্য বিষয় উহার সনাতন প্রণালী সম্বন্ধে দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

আক্ষরিক লোক-শিক্ষা এদেশে কি পরিমাণ প্রচলিত ছিল, জানিবার বিশেষ উপায় নাই, কিন্তু ভাব প্রচারের এবং বিস্তৃতির পক্ষে এখানে তেমন বাধা দেখা যায় নাই। তাহার প্রধান কারণ,আক্ষরিক শিক্ষা ভাব প্রচারের এক মাত্র পথ নহে। শুধু তাহাই নহে,ভারতবর্ষে ইহা প্রধান পথও ছিল না।

কাজেই যাহারা আমাদের অগণ্য জনসাধারণের অক্ষর-জ্ঞান হীনতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের কিছু ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে প্রার্থনা করিতে পারি।

হনলুলু প্রদেশের অধিবাসীগণ কিম্বা নিগ্রো-জাতি এবং আমাদের মধ্যে একটু তফাৎ আছে, এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায়

না। সে প্রভেদ চেহারার নহে—মনের। কাজেই ঐ জাতি গুলির মধ্যে ভাব প্রচার করিতে কোন একটা ধর্ম্মনীতি দ্বারা চরিত্র গঠন করিয়া লইতে হয় এবং জাতিগত পার্থক্যের মূলে দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যৎ গঠনে অগ্রসর হইতে হয়। আমাদিগকে ততটা করিতে হয় না।

আমরা যে এক দিনের পদার্থ নহি,তাহার প্রধান এবং প্রথম প্রমাণ আমাদের ললিত কলা। আমাদের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য বরোদা, কাচ, ভবনবর.গন্তাল,জুনাগড় প্রভৃতি ভারত জুড়িয়া রহিয়াছে—এবং এই সমস্ত হইতে জাতীয় সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং পিপাসা, সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং মার্জ্জিত-রুচি, শ্বেতমর্ম্মরে কঠিন মৃত্তিকায়, মন্দিরে মস্‌জিদে ধরা পড়িতেছে।

আমাদের চিত্র-বিদ্যা,অজহান্তা গুহার অন্ধকার কোণে ধরা পড়িয়াছে। আমাদের শিশুদের হাতের খেলানা, সিন্ধু, সুরাট, গণ্ডাল প্রদেশের ক্রীড়নক জাতীয় হৃদয়কে প্রকাশিত করিয়া ফেলে। এই সমস্ত অবহেলার জিনিষ নহে।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি বলিয়া উহার স্বরূপ অবজ্ঞা মারাত্মক, সন্দেহ নাই। সৌন্দর্য্য-জ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপার জাতীয় প্রকৃতির আংশিক বিকাশজাত জিনিষ নহে—উহা সমগ্র চরিত্র বুঝিবার একটী প্রধান উপায়। কারণ ভাবপুঞ্জের যথার্থ শৃঙ্খলা, রুচির মার্জ্জিত অবস্থা বহু আয়াসলভ্য সাধনার সূচনা করে।

এ শ্রেণীর জ্ঞান জিনিষটাই কখনও এক দিকের হয় না। যে কল্পনা হিন্দু ও মুসলমান ভাস্কর্য্য রচনা করিয়াছে,তাহা সাময়িক উচ্ছ্বাসে হয় নাই।

যদি এজন্য অন্ততঃ এই দুইটী জাতিকে বুদ্ধিমান এবং চতুর আখ্যা দিই,তবে তাহারা 'কখ' জানে না বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠা নিষ্প্রয়োজন। কারণ জ্ঞান প্রাপ্তির উহা একমাত্র পথ নহে। ভগবান্ মানব-সমাজে জ্ঞান-বিস্তৃতির জন্য চক্ষু ছাড়া অন্যান্য বহু ইন্দ্রিয় দান করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান জগতে যে অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তাহা রাশি রাশি মুদ্রিত পুস্তক, পুঁথি হইতে নহে—তখন সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র সৃষ্টি হয় নাই—উনবিংশ শতাব্দীর ভ্রান্তভাগের সংবাদ-পত্র রচিত, ইউরোপীয় বিলাসী নেতা তখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন আরব-সেনাপতি কালেদ রোমীয় সৈন্যসমূহকে চিরকালের জন্য পরাজিত করিল, তখন ত কাগজ, কালি এবং হংসপুচ্ছ কাহাকেও খরচ করিতে হয় নাই।

বস্তুতঃ ভাব প্রচারের নানা পন্থা রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষে তাহা ভিন্ন ভিন্ন।

এসিয়া এবং ইউরোপে আর্য্য-জাতির বিস্তার, তাহাদের সমর-নৈপুণ্য,কাব্যামোদিত্ব আক্ষরিক জ্ঞান হইতে জন্মে নাই।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম, ষষ্ঠ শতাব্দী প্রভৃতিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসার মুখ্যতঃ আক্ষরিক সাহিত্য দ্বারা হয় নাই।

ফ্রাউডের রচিত ডিজরেলীর জীবনীতে ডিজরেলীর একটী কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইংলণ্ডের মন্ত্রীগণের মধ্যে এমন কল্পনা-শক্তি আর কাহারও ছিল কিনা, জানি না। ডিজরেলী যখন তুরস্কপ্রদেশ পর্য্যটন করিতে আসে, তখন তুর্কীদের সহজ অলস ভাব, জীবনকে নেহাৎ নেশা এবং স্বপ্নের মত জ্ঞান, সুদীর্ঘ আলবোলায় কাশনে বা

Divanএ বসিয়া তামাকু কফী কর্ম্ম-বিহীনের বিলাসিতা সেবন, প্রভৃতি তাহার সহজে উত্তেজিত কল্পনা শক্তিকে আঘাত করে। তিনি বলেন, তুর্কীদের এই কাফি-গৃহের শায়িত আরাম, ধূম্র-সেবন, কথাবার্ত্তা, দৈনন্দিন ঘটনাকে মোলায়েম করিয়া উপভোগ, তাম্বুল-রসার্দ্র হাস্য-কৌতুক, পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষুদ্র কোটপ্যাণ্ট-পরিহিত ঝগড়া, করতালি, হৈ চৈ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সুন্দর, স্বাভাবিক, এবং সহজ এবং তিনি গোলাপী আতরের গন্ধে ভরপুর, অগুরু-ধূম্র-রচিত কোন তুরস্কপুরীতে তুর্কীদের পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া জীবন কাটান অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জিনিষ মনে করেন।

আমরা স্বীকার না করিলেও এমন অনেক আছেন, যাহারা ডিজরেলীর কথাগুলিকে খামখেয়ালী নামক অসম্মানজনক বিশেষণে ভূষিত করিবেন এবং কম্পাস্ লইয়া তাহাদের উক্তির একেবারে সীমাবিহীন সত্যতা প্রমাণ করিতে বসিবেন। কিন্তু আশা করি, তাঁহারা একথা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, পার্লিয়ামেণ্ট উহার সুবৃহৎ দপ্তর লইয়া হট্টগোলে দেশের যে সব কথা তোলে এবং টাইমস্ প্রভৃতি পত্র, এঞ্জিনরূপী মানুষের আরাম, আনন্দ, স্বাস্থ্য-বিনাশী কলের চাপে যে কাজ করে, কাফিগৃহের আরাম-কেদারার আলোচনায় দেশের সে সমস্ত প্রশ্ন আরও সহজ ভাবে উঠে এবং জাতি-শরীরে কাফিগৃহের এই কথোপকথনগুলি পার্লিয়ামেণ্ট অপেক্ষা কম স্থান অধিকার করে না। তুরস্কের এবং ইংলণ্ডের ইতিহাসে ভাব প্রচার এক প্রণালীতে হয় নাই।

তবে প্রশ্ন হইতে পারে, তুরস্ক ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ কেন? উত্তর, তুরস্ক যুদ্ধ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইলেও ব্যক্তিগত উদারতা, সততা, শিষ্টাচার, আতিথ্য প্রভৃতি কোন বিষয়ে কোন ইংরাজ বা জর্ম্মন হইতে পশ্চাৎপদ নহে। তাহাদের তথাকথিত অধঃপতনের কারণ, কামান বন্দুক, এঞ্জিন-মিল, প্রভৃতি ব্যাপার তাহারা প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা ফ্যাক্টরীতে মানুষ-কল হওয়ার পরিবর্ত্তে স্নানাগারে সাবান হইতে স্নিগ্ধ-শুভ্র ফেনোদ্গম দৃশ্যে পুলকিত হইতে ইচ্ছা করে, ইহাই তাহাদের ঘোরতর অপরাধ।

আফগানিস্থানে আক্ষরিক শিক্ষা তেমন বিস্তৃত নহে, অথচ এমন কাবুলীওয়ালা কম আছে যে, তাহার নিজের দেশের রাষ্ট্র-নীতি বোঝে না। তাহার আঙ্গুরের কৌটার থাকে এবং বহু দূর হইতে আনীত আখরোট এবং বাদামের ভিতর আফগান-রক্তের সমগ্র ইতিহাস সুপ্ত থাকে।

কারণ কোন প্রবল বিপর্য্যয়ে দেশের সহিত হৃদয়গত বন্ধন তাহাদের ছিন্ন হয় নাই এবং তাহারা নানাবিধ শিক্ষা-বিস্তৃতির উপায়ের সহিত লম্ফ ঝম্ফ পূর্ব্বক বিবাদ করে না। আমির আবদর রহমান আফগানরাজ্যের যুগাগত প্রাণ বজায় রাখিয়া শিক্ষাবিস্তৃতির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এইজন্য আদর্শ প্রণালী না হইলেও উপযুক্ত প্রণালীতে শিক্ষাকার্য্য অগ্রসর হইতেছে। এবং আহারে বিহারে, শয়নে ভূষণে, বিপণি-বাণিজ্যে, হাস্যকোলাহলে, ধর্ম্মে-সমাজে, মস্জিদের মৌন ছায়ায় বা কবরের নিস্তব্ধতায় সর্ব্বত্র আফগান-রক্ত চিরপ্রবাহিত শাখা-জাল-আলিঙ্গিত স্রোতস্বিনীর ন্যায় বর্ত্তমান যুগের ম্যাক্সিমগান, এবং ফ্যাক্টারীর প্রভাব-তরঙ্গ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে অধৃষ্য হইতেছে।

কারণ হ্যাটকোট পড়িয়া টেবিল-চেয়ার-কণ্টকিত, গ্রীক-আদর্শে রচিত এবং বৈদ্যুতিক ভেল্‌কিতে আলোকিত প্রকোষ্ঠে বহু আয়োজন এবং অর্থব্যয় পূর্ব্বক যে পাশ্চাত্য-প্রাণ পাদরী-রূপী মানবের ডিমস্থিনিস-প্রতিদ্বন্দ্বী বাক্যরাজি শোনা যায়,তাহা ঐ আয়োজন-চাকচিক্যই হজম করিয়া ফেলে, তাহা প্রাচ্য-সুলভ, নম্রধীর, সত্য-সংযত প্রাণ-কপোত বড় গ্রহণ করে না। কিন্তু বটগাছের ছায়ায় কিম্বা পথপার্শ্বের ঝরণা-মূলে, মাঠের হাওয়ায় বা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়-আনন্দের মাঝে যাহা আলোচিত এবং প্রচারিত হয়, তাহা অকপট হৃদয়ের উন্মুক্ত আহ্বানে একেবারে প্রাণের মাঝে গাঁথিয়া যায় এবং উহা পারিবারিক সুখ দুঃখের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবিনশ্বর হইয়া যায়।

অবশ্য বটের ছায়াটাই প্রচারের স্থান, এমন কথা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই, প্রত্যেক জাতির মাঝে, ভাব প্রচারের বিভিন্ন উপায় আছে। অনেক পথে জাতীয় হৃদয়-স্রোত অবিরত বহিতেছে। যদি এই স্রোতের মাঝে সহজভাবে আমরা কোন ভাবকে প্রসারিত করি, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা স্বাভাবিক ভাবে সমগ্র জাতিশরীরে প্রবাহিত হইয়া উহার প্রকৃতির মাঝে বিপ্লব আনিবে। নচেৎ অন্যত্র লৌহমুদ্গর লইয়া আঘাত করিলেও জাতীয় প্রকৃতি সচকিত হইবে না।

কারণ প্রকৃতি জিনিষটা কোন ব্যক্তির কিম্বা জাতির আংশিক সম্পত্তি নহে, উহার ধারাবাহিক ইতিহাস রহিয়াছে এবং তাহা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে উহার অণু-পরমাণুতে স্পন্দিত হইতেছে। কোন ইংরেজকে চৈনিক-ভাষায় অভিসম্পাত প্রদান কর, কিম্বা ভর্ৎসনা কর, সে ঐ ভাষা বোঝে না বলিয়া হয়ত হাঁ করিয়া তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে—কিন্তু চীনাম্যান উহা শুনিলে সুদৃঢ় মুষ্টি প্রদর্শন পূর্ব্বক তোমার দিকে ছুটিয়া আসিবে, কারণ তোমার কথাগুলি তাহার জৈবনিক বুদ্ধি-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্ক উষ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

কোন ভাব-প্রচারের পূর্ব্বে, দেশে কোন যথার্থ বিপ্লব আনিবার পূর্ব্বে,. দেশের প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি এবং উহার অনুবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। কেবল হুকুম দিয়া কেহ কখনও কোন জাতির হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। কারণ চিলিয়ানওয়ালা বা আলিওয়াল যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ,কিন্তু চিরস্থায়ী-ভাবে উহার ফলভোগ করা সহজ নহে।

দেশের সহিত ভাবগত এবং কর্ম্ম-গত বিদ্রোহের সূত্রপাত করিয়া উহার উদ্ধারের চেষ্টা হাস্যজনক।

কেহ বলিতে পারেন,দেশের অতীত এবং বর্ত্তমান প্রকৃতির স্বরূপই কোন কাজের নহে, উহার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব কার্য্য নহে, তবে ইহার জন্য নূতন বেদ বেদান্ত, রামায়ণ মহাভারত সৃজন করিতে হইবে এবং অন্ততঃ পাঁচটী সহস্র বৎসর চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু তবুও ফল কি হইবে, নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।

এজন্য আমাদের কার্য্যের বিস্তৃতি হইতেছে না বা ভাবের বিস্তৃতি দেখা যায় না বলিয়া আক্ষেপ করার পরিবর্ত্তে ভাব-বিস্তৃতির প্রকৃষ্ট উপায় আমরা অবলম্বন করিয়াছি কিনা, দেখিতে হইবে।

কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন এবং উপরোক্ত বক্তব্যগুলিকে ভাবের রচনা

বলিতে পারেন। বলিতে পারেন, বর্ত্তমানে শিক্ষা-বিস্তৃতির জন্য যে সকল স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে,তাহাদের শিক্ষার কি কোন ফল দেখা যাইতেছে না?

এইখানেই আমরা যথার্থ প্রশ্নে উপস্থিত হই। আমাদের উদ্দেশ্য কয়েকটা লোকের শিক্ষা, না সমগ্র জাতির শিক্ষা? সংক্ষেপতঃ লোকশিক্ষা বা Mass education কি শুধু বক্তৃতার বিষয়রূপে চিরকাল থাকিবে, কিম্বা নিজের সুলভ প্যাট্রিয়টিজমরূপী ফোয়ারার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন কার্য্যে গোলামী করিবে?

আমাদের সমাজ,ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রতন্ত্র-বিষয়-গত সাধারণ কথাগুলি কি কেবল বি-এ-পাশ-ওয়ালাদের সম্পত্তি হইবে, না তাহা সাধারণ ভাবসম্পদরূপে সকলেই উপভোগ করিবার সুবিধা পাইবে? আর যদি সাধারণের তাহা প্রাপ্য হয়, সেজন্য দেশে কি চেষ্টা করা হই-তেছে? দর্শন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া দেশের বহুমুখী প্রশ্নাদি বুঝিতে যাওয়া সাত কোটি বাঙ্গালীর মাঝে সাত হাজারের পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ। তবে কি যেখানে সেখানে সুবৃহৎ কলেজ না তুলিলে Mass education সম্ভব নহে?

বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকটী স্কুল কলেজ এই বিপুল বাঙ্গালা দেশের বক্ষে ভাসিতেছে, তাহার সংখ্যা অত্যন্ত সামান্য, তাহারা ভূতত্ত্ব এবং ভূগোল, গণিত এবং বীজগণিত লইয়া ব্যগ্র, দেশের কথা লইয়া নহে।

অথচ বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ-সমাগমে আমাদের দেশের প্রশ্ন উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে এবং এতদ্‌সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া জনসাধারণের পক্ষে একান্ত জ্ঞাতব্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই দেশে সামাজিক, ধর্ম্মগত ভাববিপ্লব চিরকাল যে প্রণালীতে সংপ্রসারিত হইতেছে, এই ক্ষেত্রেও তাহা অবলম্বন প্রয়োজন।

১৯০১—১৯০২ সালের সেন্সাস্‌ রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, ভারতের এগার কোটি সত্তর লক্ষ পুরুষের মাঝে মাত্র এক কোটি ত্রিশ লক্ষ লোক লিখিতে এবং পড়িতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, ইহারা মাত্র লিখিতে এবং পড়িতে পারে, তদধিক নহে। অথচ ইহা পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টার ফল নহে। লর্ড হ্যালিফাক্স ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যে ডিস্পাচ্‌ পাঠান, তাহার উপর কলিকাতা, মান্দ্রাজ, এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—কিন্তু নূতন প্রণালীর এই চেষ্টা ছাড়া গ্রাম্য পাঠ-শালা প্রভৃতির দ্বারা উপরোক্ত আক্ষরিক জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই এক কোটির মধ্যে যদি এই পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায় অর্দ্ধ কোটি লোক লেখাপড়া করিয়া থাকে, তবে আমাদের সমগ্র ভারতকে শীঘ্র আক্ষরিক শিক্ষা দিবার কল্পনা টিকে না। এই জন্য অত্যধিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এমন কি, এই আক্ষরিক শিক্ষাও সুষ্টু প্রণালীতে প্রচলিত হওয়া দরকার। ইংরে-জের ছায়াও যেখানে পড়ে নাই,সেখানে দেশ আপনাআপনি নিজের শিক্ষা বিস্তৃতির কার্য্য হাতে লইয়া সফল হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব বলেন—

"Even at the present day knowledge of reading and writing is, owing to the teaching of Buddhist monks, as widely diffused throughout Burma as it is in some countries in Europe."

এখনও দেশের নানাদিকে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রাচীন উপায় রহিয়াছে, আমাদিগকে অবি-লম্বে এই সমস্ত পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

কারণ ইংরাজের কাছে আমাদের বেশী কিছু আশা করা বালকত্ব। যে গবর্ণমেণ্ট চব্বিশ কোটি লোকের শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য মাত্র এক কোটি চারি লক্ষ মুদ্রা মাত্র ব্যয় করে—সে গবর্ণমেণ্টকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিয়া আমাদিগের অন্য দিকে মনোযোগ করা প্রয়োজন। বলা আবশ্যক, গ্রেটব্রিটন সামান্য জন সংখ্যা সত্ত্বেও শিক্ষার জন্য উনিশ কোটি টাকা ব্যয় করিতে ইতস্ততঃ করেনা।

সেখানে সাধারণ শিক্ষা প্রচারের প্রধানতম উপায় স্কুল এবং সংবাদ পত্র, ইহার ভিতর দিয়া রাষ্ট্রীয় সমগ্র শক্তি প্রবাহিত হইতেছে। এই জন্য অর্থ ব্যয়ে কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। বিলাতে প্রাইমারী শিক্ষা দিতে একটী ছেলের জন্য তিন পাউণ্ড বা পয়তাল্লিশ টাকা ব্যয় হয় এবং প্রাইবেট স্কুলে দুই পাউণ্ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক খরচ হয়, অথচ আমাদের দেশে একটী ছেলের জন্য বার্ষিক মাত্র তিন টাকা সাত আনা দেওয়া হয়। ইহাতেই পার্থক্য বোঝা যায়।

শিক্ষক সম্বন্ধেও সেই কথা। বিলাতী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক বার্ষিক একশত উনত্রিশ পাউণ্ড বা ১৯৩৫৲ টাকা পায়—অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে দেড়শত টাকারও অধিক, অথচ আমাদের দেশের শিক্ষকের অবস্থা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে অনুমিত হইবে—

মাসিক বেতন:—

| | |
|---|---|
| বাঙ্গলা দেশ | গবর্ণমেণ্ট স্কুল তিন টাকা হইতে উর্দ্ধে। |
| পঞ্জাব | আট টাকা হইতে ৫৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। |
| বোম্বাই | সাত টাকা হইতে উর্দ্ধে। |
| মান্দ্রাজ | আট টাকা হইতে বিশ টাকা পর্য্যন্ত। |

এই স্কুল এবং স্কুল সংখ্যা বিষয়ে বিলাতের সহিত তুলনা একেবারে অসম্ভব—কারণ স্কুলের ভিতর দিয়া লোক শিক্ষা প্রসারিত করা, তাঁহাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পথ। সেখানে আক্ষরিক শিক্ষা ছাড়া অন্য উপায়ে শিক্ষাবিস্তৃতির জন্য বর্ত্তমান সময়ে তেমন কোন পন্থা নাই। এই জন্য ইহার পশ্চাতে তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা রহিয়াছে।

আমাদের দেশের আক্ষরিক শিক্ষা আমাদের হাতে নাই, রাজকোষ ও বিদেশীর হাতে, কাজেই আমাদের বর্ত্তমান সমগ্র জনসাধারণের মাঝে লোকশিক্ষা বিস্তৃতির জন্য স্কুল প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য উপায়ও আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রায় তিনি বৎসর পূর্ব্বে Hon'ble Mr. Sydney লণ্ডনের শিক্ষা বিস্তৃতির সুবিধা বিষয়ে Nineteenth Centuryতে এক প্রবন্ধ লেখেন—উহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না—

Every year about eight hundred of the ablest boys and girls in the public elementary or lower technical schools, between eleven and thirteen years of age are picked by competitive examination for two or five years or higher education. In addition to the maintenance of these two thousand scholarships there are free places at most of the London secondary schools from St. Paul's downwards which are utilised as is found to be the case with all provision of merely gratuitous secondary education by the lower middle and secondary classes. ......ইত্যাদি।

এক লণ্ডনেই এই ব্যাপার, অন্য জায়গার কথা না তুলিলেও চলে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অহরহ এই স্কুল-শিক্ষা-বিস্তৃতির জন্য ভয়ানক চেষ্টা চলিয়াছে। এই চেষ্টার ফলে বিলাতের ইটন, হেরো, রাগ্‌বী, উইনচেষ্টার, শ্রুস্‌বারী, চার্টার হাউস এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার, এই বিখ্যাত সাতটী স্কুলের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হইয়াছিল।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে মাত্র একটী বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার লোক সংখ্যা সাত কোটি বিশ লক্ষেরও অধিক। ইহার পরিমাণ ফল এক লক্ষ ৯৪ হাজার বর্গ মাইল। ইউরোপের কয়েকটী রাজ্যের জন সংখ্যা প্রভৃতি দিতেছি ;

| | জন সংখ্যা। | বর্গ মাইল। |
|---|---|---|
| বাংলাদেশে | ৭ কোটি বিশ লক্ষ। | ১ লক্ষ ৯৪ হাজার |
| ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ | দুই কোটি নব্বই লক্ষ। | ৫৮,০০০ হাজার |
| জর্ম্মনী | চার কোটি ৯৪ লক্ষ | ২১১,১৬৮ ঐ |
| অষ্ট্রিয়া | চার কোটি ৫৬ লক্ষ | ২৬৫,০০০ ঐ |
| ফ্রান্স | তিন কোটি ৮৩ লক্ষ | ২০৪,০৯২ ঐ |

কাজেই বাঙ্গালাদেশের কার্য্যাদি কিরূপ সামান্য এবং বিশেষতঃ শিক্ষাকার্য্যে বর্ত্তমান সময়ে স্কুল কালেজের প্রভাব অন্যান্য দেশের তুলনায় কত কম,বলিবার নহে। এক ইংলণ্ডেই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কতগুলি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইয়াছে।

মার্কিন রাজ্যেও এই স্কুল-শিক্ষা বা আক্ষরিক শিক্ষা এত বিস্তৃত যে, মার্কিণবাসী শ্বেতকায়ের মধ্যে শতকরা ছয় জনা, প্রবাসী শ্বেতকায়ের মধ্যে তের জন এবং কৃষ্ণকায়ের মধ্যে শত করা ৫৬ জন লিখিতে পড়িতে পারে না।

যে দেশের জনসাধারণ আক্ষরিক শিক্ষায় এতটা অগ্রসর, সে দেশে পুস্তক, সংবাদপত্র দ্বারা দেশে যুগান্তর উপস্থিত করা যায়। এই সমস্ত দেশের রাজকোষ আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য চিরকাল উন্মুক্ত রহিয়াছে। যে সকল দেশ স্বাধীন, সেখানে আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃতির পথে কোন বাধা নাই। এই সে দিন জাপান আক্ষরিক শিক্ষায় ইউরোপীয় দেশগুলির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে. সেখানে আক্ষরিক শিক্ষা compulsory কিন্তু পরাধীন দেশে উপায় কি ? স্কুল কলেজ স্থাপনের জন্য উহা ত অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে পারে না ?

রাষ্ট্রনৈতিক জগতে যে কোন মুহূর্ত্তে, ভিতর হইতে না হোক্, বাহির হইতে বিপ্লব ঘনীভূত হইয়া আসা অসম্ভব নহে—চীন কিম্বা জাপান আত্মবিস্তৃতির জন্য চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবে না, তখন আমরা কোথায় যাইব ? আমাদের দেশে এখনও স্কুল কলেজ হয় নাই, জ্ঞানরাজ্যে সকলেই শিশু,আমাদের এই আবদার কে গ্রাহ্য করিবে ? আমাদের এই সাত কোটির ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন শক্তি কোন্ উপায়ে কেন্দ্রীভূত করা যাইবে ?

এই জন্যই অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে স্কুল প্রভৃতির যে অনুষ্ঠান আছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া, আমাদের জাতির সুখ দুঃখের সহিত বহুদিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রণালী চলিয়া আসিতেছে, যাহা রামসীতার দুঃখ কাহিনী,ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, ধ্রুবের সরলতা, বহন করিয়া আনিয়াছে, যাহা বহু শৃঙ্খলপাশ ভেদ করিয়া, বহু কণ্টক বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া নৈতিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে,যাহা বর্ত্তমান সময়েও লোকের ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উপায়, যাহা আমাদের সামাজিক ইতিহাস রচনা করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

# স্বপ্ন

ভারত-ইতিহাস মহা স্বপ্নময়। কত মহা কীর্ত্তি এই মহারাজ্যে প্রোথিত—কিন্তু সে সকলের কাহিনী সত্যপূত, না স্বপ্নময়? ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, সুবর্ণ লঙ্কা আজও রহিয়াছে,কিন্তু যে অভিনয় হইয়াছিল, তাহা কি সত্যপূত, না শুধুই স্বপ্ন? মেবার, মাড়বার, কানপুর,—ভারতবর্ষের সব যেন প্রহেলিকাময়। যত কাহিনী শুনি, শুনিতে শুনিতে ডুবিয়া যাই—তন্ময় হইয়া পড়ি, চেতনা হারাইয়া শুধু ভাবি, কি স্বপ্ন, কি মোহ, কি প্রহেলিকা!! ভারত,বুঝিবা সত্যই তুমি স্বপ্নময়।

দেবাসুরের সংগ্রাম এ ভারতে কতবার হইয়াছে,—কতবার অসুরের পরাজয় হইয়াছে। এক এক অবতারের ইতিহাস—এক এক মহা স্বপ্নের ব্যাপার। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, নৃসিংহ, বুদ্ধদেব, আসুর-শক্তি বিনাশের এক একটা প্রচণ্ড দাবানল বিশেষ। এরূপ আশ্চর্য্য চিত্র পৃথিবীর কোন দেশে দেখিতে পাইবে না। সত্যই বলি—যাহা পড়িয়াছি, সে সব যেন স্বপ্ন।

ঘোর সুষুপ্তিতে ডুবিয়াছিলাম, চেতনা নির্মেঘ নীলিমায় বিলীন হইয়া গয়াছিল, মহাসাগর যেমন মহা আকাশে লীন, সেই দুর্নিরীক্ষ্য অতীতে বক্ষ পাতিয়া মহা সুষুপ্তিতে ডুবিয়াছিলাম। কে জাগাইল? কে মাতাইল? কে উঠাইল?—কই—কাহাকেও চর্ম্মচক্ষে দেখি না! দেখি কেবল বিরাট প্রহেলিকা—ভারত মৃত, ব্রিটন জাগ্রত! কি সম্মোহন দৃশ্যগো! জাগিয়া দেখি, বড় ভয়, বড় ভয়,—যে দিকে চাই,সেই দিকেই শুধু ভয় বিভীষিকা! কিসের ভয়,কিসের বিভীষিকা?—কারাগার, নির্য্যাতন,রক্তপাত—শেষে মৃত্যু! যদি মরিতে শিখিতাম, এ ভয় ত থাকিত না। অথবা যদি মরিয়াই থাকিতাম, এ বিভীষিকাও আক্রমণ করিত না! তাই বলি,জাগাইল কেন? সেদিন নব্যজাপানের কত লোক স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে,কই মরিতে ভয় ত করে নাই? তার পূর্ব্বে কত বুয়র আত্মত্যাগ করিয়াছে, কই ভয়ত করে নাই? তার পূর্ব্বে কত ইতালী-বাসী মহাযজ্ঞে জীবনাহুতি দিয়াছে,কই ভয়ত করে নাই? তাঁহারা বিদেশী;—মরিতে জানে; তাই স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য মরিয়াছে;—মরিয়া ভয়কে ভুলিয়াছে; কিন্তু ভারতের ইতিহাসে কি সহমরণ, দেশের জন্য আত্মত্যাগ ছিল না? রাজস্থান কি শুধু কল্পনা, শুধু স্বপ্ন? স্বপ্ন কি কুরুক্ষেত্র, সুবর্ণ লঙ্কা,মগধ, হস্তিনাপুর? আমরা জানি কেবল ভয়, কেবল ভয়, কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভয় বিভীষিকা জানিতেন না; তাঁহারা মরিতে জানিতেন, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, আত্মোৎসর্গ করিতে জানিতেন। যে আত্মোৎসর্গ জানে, সে সদা নির্ভয়, সদা নিশ্চিন্ত। পূর্ব্ব পুরুষগণ স্বপ্নাতীত সত্যরাজ্যে বাস করিতেন।

আমাদের দেশের কোন নেতা (?)বলেন, তিনি রাজাকে ভয় করেন না, লাঠিকে ভয় করেন। কাপুরুষতা আর কোথায় বাস করে গো? তিনি আবার দিগ্বিজয়ী গলায় স্বদেশ-উদ্ধারের গান গাইয়া বেড়াইতেছেন! হায় রে ভারত, সকলই তোমাতে সম্ভবে!

যেটা আমাদের সম্মুখে জাগিতেছে, আমরা

সেইটাকেই বেশী গণনা করি, মনে ভাবি, আর কোন সত্য জগতে বা ভারতে ছিল না বা নাই। ব্রিটন দিগ্বিজয়ী প্রতাপে জাগিয়া রহিয়াছে, আমরা কেবল উহাকেই সত্য বলিয়া বুঝিতেছি,আর যা কিছু অতীত হইয়াছে, সবই যেন স্বপ্নের কাহিনী। কোন দেশের কোন রাজা কখনও ভাবেন নাই, তাঁহার পরিণাম কি? কোন দেশের কোন ধনী কখনও ভাবিতে পারেন নাই,তাঁহার পরিণাম কি? যদি ভাবিতে পারিতেন—যদি ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিতেন, কখনও অহঙ্কারী হইয়া কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইতেন না। হিন্দুর পতন, পাঠানের পতন, মোগলের পতন—তদনীন্তন কালের কোন রাজা বা সম্রাট কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন? নেপোলিয়ন কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পরিণাম হেলেনা? সিজর কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিণাম ব্রুটসের হস্তে! কখনও কোন রাজা পরিণাম ভাবিতে পারেন নাই। দিগ্বিজয়ী প্রতাপ,ক্ষমতা, শক্তির লীলায় তাঁহারা তখন অন্ধ, আত্মহারা, মোহাচ্ছন্ন, ভবিষ্যৎ দেখিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল না। শেষে কালের মহাপ্রলয়ে সব কীর্ত্তি যখন ডুবিয়াছে, তাঁহারা বিস্ময়ে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডুবিয়া গিয়াছেন! জগতের ইতিহাস—মহা স্বপ্নময়।

ব্রিটন আজ মহা প্রতাপে অন্ধ,—আমরা সময়ে সময়ে বিস্মিত হইয়া ভাবি, কিরূপে এত ধর্ম্ম, এত চেতনা, এত জ্ঞান, এত বুদ্ধি, এত প্রতিভা—পরিণাম ভুলিয়া রহিয়াছে।—বিধাতার বিধানকে এত অবহেলা কিরূপে করিতেছ? ইহারা ত নির্ব্বোধ নয়—তবে কেন এত ভ্রান্তি? প্রকৃতির নিয়মই, বুঝিবা অজ্ঞতা এবং বিভ্রান্তি। নচেৎ, বুঝিবা,পৃথিবীর উন্নতি হইত না। পতন না আসিলে উত্থানের মাহাত্ম্য থাকিত না, অন্ধকার পরিণামে না আসিলে জ্যোতির আদর থাকিত না? কিন্তু পতন এবং অন্ধকার যে অপরিহার্য্য, দেখিয়াও কেহই তাহা বুঝিবে না। মৃত্যু নিশ্চয়—সকলেই জানে, কিন্তু তবুও সকলেই অহঙ্কারে মত্ত—মনে করে, তাহার আর পতন নাই, তাহার আর মৃত্যু নাই! কি অহঙ্কারের প্রতাপ! কত বন্দুক, কত কামান, কত তরবারি, কত, কত, কত অহঙ্কারের দিগ্বিজয়ী নিশান!! হায়রে জগৎ!

ভাবিতেছিলাম,শুধু স্বপ্নের সেবা করিবার জন্য কে জাগাইল? অসাধ্য, অসম্ভব, সুদূরপরাহত, দুর্লঙ্ঘ্য, দুরতিক্রমণীয়, দুর্নিবার, কত কথাই আজ কাল শুনিতেছি! এত বড় শক্তিশালী ব্রিটন উড়িয়া যাইবে, এবং ভারত কালে স্বাধীন হইবে? তাঁহারা বলেন, ইহা অসম্ভব কথা। নেতারা বলেন, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, অর্থাৎ ইংলণ্ডের অধীন হইয়া ভারত স্ব-স্ব-স্ব-স্বপ্নে মাতিবে! নেতারা বড় ভয়ে ভীত, পুলিসের লাল পাগড়ী, কামানের দুর্জ্জয় নিনাদ, ফাঁসিকাষ্ঠের কঠিন দুশ্ছেদ্য রজ্জু,—সুতীক্ষ্ণ তরবারির প্রাণ-সংহারক চকিতাঘাত!—"রাজাকে ভয় করি না,কিন্তু এ সকল কি ভুলিতে পারা যায়?" স্বরাজের অর্থ—গোলামীর আর একটা রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র,—যেমন স্বায়ত্ত-শাসন, যেমন মিউনিসিপাল শাসন ইত্যাদি। সেখানে কোন ভয় বিভীষিকা নাই, সুতরাং এখন সেই গোলামীর ধুয়া ধরিয়া অনেক লোক প্রমত্ত হইতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কুমিল্লায় একি ব্যাপার হইয়া গেল? হঠাৎ নরহত্যা!! রক্তপাতের জন্য ভারত প্রস্তুত হইতেছে? কি সর্ব্বনাশের কথা! কুমিল্লা কি এদেশের নেতৃত্ব লইবে? হায়, হাজার হাজার

লোকের করতালি, গাড়ী টানা, অভিষেক—পুষ্প বর্ষণ, স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সব উপকরণ তাহারা কাড়িয়া লইবে? আবেদন নিবেদনে যাঁহারা বিরক্ত, তাঁহারা বিনা পরিশ্রমে, বিনা আবেদনে কিরূপে স্বরাজত্ব পাইবে? ইংরাজ কি শুধু বক্তৃতায় ভুলিয়া স্বরাজত্ব দিবেন? স্বরাজত্ব কি আকাশ হইতে পড়িবে? কি কুহক! কি স্বপ্ন!! তাঁহারা বলেন, "এস ভাই—দাঁড়াও, দেশ উদ্ধারের আর বড় বেশী বাকী নাই; বুঝি বা জীবিত কালেই একটা সম্মান পাইয়া যাইতে পারিব;—দেশ উদ্ধার হইবে, অথচ পৈতৃক প্রাণটা বাঁচিবে!" কি মধুর আশ্বাস বাণী! শুনিয়া প্রাণ শীতল হইল। নেতারা বলেন, "সাপও মারা চাই, লাঠিকেও বাঁচান চাই;—অথবা, মাছও ধরিতে হইবে, গায়ে কাদাও না লাগে।" মন্ত্রটা খুব ভাল নয় কি? সশরীরে স্বরাজত্বের ষোল আনা সম্মান আকাশ হইতে পড়িবে—অথচ রাজা কিছু করিতে পারিবে না! টলষ্টয় মূর্খ, ম্যাট্‌সিনি মূর্খ, ক্রুগার বোকা, তাই নির্ব্বাসন-কষ্টে জীবন শেষ করিলেন!! জীবন্ত মানুষ দেখিতে চাও যদি—তবে আমাদের নেতাদের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ কর। তাঁহারা আর কিছু করিবেন না—কোন কাজে হাত দিবেন না, জন সাধারণকে রক্ষিত বা শিক্ষিত করিতে কোন চেষ্টা করিবেন না, অথচ সম্মান পাইবেন লাক লাক এবং স্বদেশও উদ্ধার হইবে। হায় যশোবন্ত সিংহ, হায় রাজসিংহ, হায় রাণা প্রতাপ, হায় শিবাজী, হায় রণজিৎ,—তোমরা কি মূর্খতাই করিয়া গিয়াছ! এত সহজে, শুধু বক্তৃতায় দেশোদ্ধার হয়, তাহা তোমরা জানিতে না!

ভারতের ইতিহাসের কথা, আন্দোলনের কথা, সব কাহিনী স্বপ্নবৎ প্রতিপন্ন—এখন জাগিয়া কেবল ব্রিটনের প্রতাপ! কি ভয়ঙ্কর, কি দুর্জ্জয়, কি বিভীষিকাপূর্ণ! সদা সশঙ্কিত—"ভয়ে ভয়ে চাই, ভয়ে ভয়ে যাই;—গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই।"—আমরা ইহাতেই সঞ্জীবিত। উঃ, কি কুহক!!

কিন্তু বিধাতার বিধানে—এই মহা জাগরিত জাতিও কালে সুষুপ্তিতে ডুবিতে পারে, এই শক্তিও কালে মহা স্বপ্নে পরিণত হইতে পারে। রোম, গ্রিস যদি শ্মশানে পরিণত হইয়া থাকে, ভারত যদি মহা শ্মশানের ধূলিতে পরিণত হইয়া থাকে, হে অহঙ্কারী ব্রিটন, জানিও, তোমার পরিণামও শ্মশান হইতে পারে, কেননা, এত অহঙ্কার ভাল নয়। অতি দর্পে হত লঙ্কা। অতি দর্পে হত নেপোলিয়ন! অতি দর্পে হত সিজর! ধর্ম্ম সাক্ষী, সত্য সাক্ষী—ভারতের স্বপ্ন একদিন তোমাকেও গ্রাস করিতে পারে। এই ভারতে ষষ্টি সহস্র বৌদ্ধপ্রচারক শ্রীমৎ শঙ্করের ও কুমারিল ভট্টের ইন্ধনে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ভারত বড় সর্ব্বনাশকারী স্থান। তোমাদের কীর্ত্তি-গৌরব—এখানে সব ফুৎকারে বিলুপ্ত হইতে পারে, নিশ্চয় জানিও। ভারত মহা স্বপ্নময়—এই দেশে কত বীরের কত বীরত্ব চূর্ণ হইয়াছে, কত মহাত্মার মহা শক্তি নির্ম্মূল হইয়াছে, এই দেশে আসিয়া এত অহঙ্কার করা ভাল নয়। এত ঘটনা, এত কীর্ত্তি যে দেশে স্বপ্নে পরিণত, তোমাদের সব গৌরবও সে দেশে স্বপ্নে পরিণত হইতে পারে। সাবধান, সাবধান।

আর আমরা? আমাদের কি কোন কার্য্য নাই, কোন শিক্ষার কথা নাই? স্বরাজ, স্বরাজ্য ইত্যাদি স্বপ্নময় কথা লইয়া খালি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইব, না সুষুপ্ত দরিদ্র

জাতিকে উন্নত করিবার, রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব? অসম্ভব, সুদূর-পরাহত—এ সকল কথা আর মুখে আনিও না। যদি শুধুই মুখে "বন্দে মাতরম্" বলিতে চাও, কোন কাজ হাতে না নিতে চাও, তবে আবার ঘুমাইয়া পড়, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর! ভয় বিভীষিকার উপরে উঠিতে চাও যদি, স্বপ্নের রাজ্য হইতে, মন্ত্র-গুপ্তি লইয়া, সজাগরণের কার্য্যময় রাজ্যে চলিয়া এস—এবং জাগিয়া বল—যে ভারতে মোগলের গর্ব্ব গিয়াছে, পাঠানের গর্ব্ব গিয়াছে, সে ভারতে ইংরাজের গর্ব্বও যাইবে! জাগিয়া মাতৃভূমিতে প্রণাম কর, এবং বল, "বন্দে মাতরম্।" বল, জয় মাতৃভূমির জয়, জয় বিশ্বাসের জয়, জয় সত্যের জয়, জয় পুণ্যের জয়, জয় ঈশ্বরের জয়, জয় আত্মোৎসর্গের জয়। ত্রিকালজ্ঞ দেবতার নিকট মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গ কর, সকল ভয় বিভীষিকা চলিয়া যাইবে, অসাধ্য সাধিত হইবে। নচেৎ সব আন্দোলন স্বপ্নময় হইয়া যাইবে।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

৪৬। **দুর্গাদাস।** নাটক। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য ১৸০। এই পুস্তক খানি এতই সুন্দর হইয়াছে যে, আমরা ইহা পাঠে আত্মহারা হইযা ভাবিয়াছি, যে দেশে এরূপ সুন্দর পুস্তক লিখিবার লোক আছে, সে দেশের এখনও আশা আছে।

স্বদেশ-আন্দোলন-যুগে আমরা বাঙ্গালীর সাহিত্য-যুগে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে, আশা করিয়াছিলাম। তখন আমাদের মনে জাগিতেছিল, ইতালীর কথা, ফরাশীর কথা—ট্রানস্‌ভ্যালের কথা, জাপানের কথা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এদেশ বক্তৃতার স্রোতে ডুবিয়াছে বটে, কিন্তু কয়েকটী গান ভিন্ন স্থায়ী সাহিত্য বড় কিছুই হয় নাই, বলিতে কি, সাহিত্যে আশানুরূপ নবজীবন সঞ্চারিত হয় নাই। এজন্য সময়ে সময়ে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়াছি। সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া জগতের কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত জাগরিত হয় নাই। কিন্তু হায় সোণার বাঙ্গালা, তোমার ভাগ্যে কি আছে!

স্বদেশ-আন্দোলন-যুগে নূতন সংবাদ পত্র অনেক প্রকাশিত হইয়াছে, পুরাতন কাগজও অনেক চলিতেছে; এবং সকল কাগজের সম্পাদকই যে স্বদেশ-ভক্ত, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখার পারিপাট্য নূতন কাগজের মধ্যে—"যুগান্তর" ও "স্বদেশ" ভিন্ন আর কোন কাগজেরই নাই। পুরাতন কাগজগুলিতেও সেই এক-টানা স্রোতে হিংসা বিদ্বেষ চলিয়াছে, যাহা আজ কাল বাহির হইতেছে, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া কেহ লেখে বলিয়া মনে হয় না। "বঙ্গবাসী" দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যথিত হইয়া, বিশেষ আন্দোলন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন বটে, কিন্তু আর সকলেই এক প্রকার উদাসীন। কেবল আন্দোলন—কেবল আন্দোলন, কেবল সভা সমিতির বিবরণ। বক্তাগণ ও সম্পাদকগণও বিদেশী-বর্জ্জন-কার্য্যে তাদৃশ ব্যস্ত নহেন, যত আন্দোলনে ব্যস্ত। তাঁহারা বিলাতী চিনি দ্বারা প্রস্তুত করা মেঠাই সন্দেশ খান ও বিলাতী কাগজে নিজ ২ কাগজ ছাপান, এই সব ব্যাপারেই তাহা বুঝা যায়। প্রাণ না থাকিলে সাহিত্যে নবজীবন হয় না।

বক্তৃতা ও সভা সমিতির প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, শুষ্ক আদর্শহীন ও কার্য্য-হীন কথায় এইরূপে কি দেশ জাগিবে?

এহেন সময়ে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লেখনী ধরিয়া এই বঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যোদ্দীপক কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্ত, সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি যে স্বদেশভক্ত, স্বদেশ-প্রাণ, তাহা কেহ জানিতেন কি? দ্বিজেন্দ্রলাল আজ যেন কি এক স্বর্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত, বোধ হয় যেন ফরাসীর জেনী বা কৃষক-বালক মৃত জাতিকে জাগাইতে স্বর্গের সুধা-বাণী হাতে লইয়া সমুপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আজ মানব-বেশে আমাদের নিকট উপস্থিত নন, তাঁহার লেখনী দ্বারা আজ এক স্বর্গীয় প্রভা বাঙ্গালা-সাহিত্যাকাশকে উজ্জ্বল করিয়াছে। দুর্গাদাস—সেই স্বর্গীয় প্রভা।

পুস্তক এদেশে অনেক হইয়াছে—আরো হইবে। নাটকও এদেশে অনেক হইয়াছে, আরো হইবে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, আনন্দ-মঠ উপন্যাস-রাজ্যে এবং নীলদর্পণ নাটক-রাজ্যে বাঙ্গালায় যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এবং করিয়াছিল, এরূপ আর কোন পুস্তক করে নাই। যত পুস্তকের কথাই বল—অনেকই মৃত মানুষের পূতিগন্ধময় কথায় পূর্ণ। প্রেমের কাহিনী, প্রণয়ের গাঁথা,—রিপুর উত্তেজনা—বাঙ্গালা সাহিত্য ব্যাপিয়া কেবল পরাধীনতা ও কাপুরুষতার ছবি—কেবল অসার ছবি। অনেক কবির উদয় এই বাঙ্গালায় হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের ন্যায় বীরত্ব-পূর্ণ শোণিত-উষ্ণকারী কবিতা আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। এত দিন পর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণে স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। আজ প্রাণ ভরিয়া, মৃতবৎ, নগণ্য, তুচ্ছ, ঘৃণিত এই ব্যক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। আলিঙ্গন?—মিথ্যা কথা—আজ ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রুশো ও ভল্টেয়ারের ন্যায় বঙ্গে দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবার যোগ্য।

দুর্গাদাস—পুস্তকখানি নাটক বলিয়া কীর্ত্তিত। নাটকের প্রতি অনেকের বীত-শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং—এ পুস্তক অনেকে নাও পড়িতে পারেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই পুরাতন হাস্য-পরিহাসের কবি, তিনি আর কি লিখিবেন, এ কথাও অনেকে ভাবিতে পারেন। কিন্তু সকলে স্মরণ রাখিবেন, কাহার জীবনে কখন কোন্ শুভ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, কেহ জানে না। নাটক ভিন্ন এ জগতের কেহ কাহাকে জাগাইতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ব্বের সেই লেখক কিনা—এবার তাহার পরিচয় দেই—

"দুর্গা। ১০০০০। আমাদের লক্ষাধিক সৈন্য ছিল; যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে—অনেক সৈন্য যুদ্ধ ছেড়ে ব্যবসা কি কৃষি ধরেছে। মহারাণী তাদেরই ডাকতে বেরিয়েছেন। দেখছো গ্রামবাসীদের? যেন জীবন নাই।

ভীম। ওরা কি বলাবলি কর্চ্ছে শুনি!

১ম গ্রামবাসী। আরে জিজিয়া কর করেছে! না হয় করেছে। হয়েছে কি?

২য় গ্রামবাসী। কিন্তু এ যে মাত্রা বাড়্তেই চলেছে ভাই।

৩য় গ্রামবাসী। আফিং খেয়ে ভোঁ হয়ে আছি বাবা। পৃথিম্‌টা উল্টো ঘুর্চ্ছে কি সোজা ঘুর্চ্ছে খবর রাখি নে বাপ। তোদের যদি বড্ড দুঃখ হয়েছে, আফিং ধর্।

৪র্থ গ্রামবাসী। দুঃখ কিসের? আর

যদি দুঃখ হলোই—একবার ভেউ ক'রে উঠ্‌লাম। চুকে গেল।

১ম গ্রামবাসী। ওরা যা করে সৈব্। সৈতেই হবে। কি বল হে?

২য় গ্রামবাসী। কিন্তু আর যে সয় না।

৩য় গ্রামবাসী। বলছি আফিং ধর্।—সব সৈবে।

৪র্থ গ্রামবাসী। আফিং ধর্ত্তে হবে না, আপনিই সৈবে—এত সৈল। এইটে সৈবে না?

গীত।

পাঁচশ বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমুদায়;
এইটে কি আর সৈবে নাক—দুঘা বেশী জুতার ঘায়?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুঘা দেনা বাবা;
দুঘা বেশী দুঘা কমে এমনি কি আসে যায়!
তবে কিনা জুতোর গুতো হয়ে গেছে অনেকবার—
একটা কিছু নূতন রকম কর্লে হতো উপকার;
ধরুনা যেমন 'বেটা' বোলে, দিলি না হয় কাণটা মোলে;
জুতোর খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা পড়ে গেছে সকল গায়।
পড়ে' আছি পায়ের তলায় নাকটা গুঁজে অনেককাল,
সৈবে সবই—নই ত মানুষ, মোরা সবাই ভেড়ার পাল
যেথা করিস দেখিস চাচা, মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা;
শাঁসটা খেয়ে আঁসটা ফেলে দিসরে দুটো দুবেলায়।
খেয়ে তোদের লাথি ঝাঁটা কতক ভরে' আছে পেট;
খোসাভুষী পেলেই কিছু বলবো করে মাথা হেঁট—
"পেলাম হুজুর বহুৎ পেলাম' দুটিহাতে কর্ব্ব সেলাম—
নাইবা যদি দিস্‌রে চাচা কর্ত্তে কিবা পারি তায়।
তোরাই রাজা তোরাই মুনিব—মোরা চাকর মোরা পর;
মনে করিস চাচা এটা তোদের বাড়ী তোদের ঘর;
মোরা বেটা মোরা পাজি, যা বলিস্ তাই আছি রাজি,
রাজার মেয়ে ওগো প্যারি, যা বলিস তাই শোভা পায়।

১ম গ্রামবাসী। ঐ মহারাণী আসছেন। চল্ চল্।

২য় গ্রামবাসী। হাঁ। চল্ চল্।

সকলে চলিয়া গেল।

দুর্গা। কি রকম উদাসীন দেখলে ত। কিন্তু এরাই উত্তেজিত হবে। মহারাণীর মুখে, বক্তৃতায়, উত্তেজনার একটা কি তাড়িত শক্তি আছে।—তিনি আজ যেন একটা কি স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্দীপিত। তাঁর কথায় আজ হিম পাথরকে উষ্ণ করে, মেষকেও ক্ষেপিয়া দেয়।

ভীম। ঐ মহারাণী আস্‌ছেন।

দুর্গা। হাঁ ঐ আসছেন। ভীম! সরে দাঁড়াও।

ভীম। সত্যইত! এ যে অপূর্ব্ব, সেনাপতি। এ ত কখন দেখি নাই। কি দানবদলনী মূর্ত্তি! পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত ঘন কৃষ্ণ কেশবাশি, দু চারি গাছ উদ্ভাসিত কপোলে এসে পড়েছে; চক্ষে কি দিব্য জ্যোতিঃ, ললাটে কি গর্ব্ব? ওষ্ঠে কি বরাভয়প্রদ হাস্য! আর ভয় নাই, সেনাপতি। স্বয়ং মা জন্মভূমি মানবীমূর্ত্তি ধারণ করে' এসেছেন। আর ভয় নাই।

রাণী ও তৎপশ্চাতে গ্রামবাসীরা প্রবেশ করিল।

গ্রামবাসীগণ। জয় রাণীমাইর জয়।

প্রথম গ্রামবাসী। মহারাণীকে জায়গা ছেড়ে দাও।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী। আমরা মহারাণীকে দেখতে পাচ্ছি না।

রাণী একটী সন্নিহিত উচ্চ প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গ্রামবাসীগণ—সৈনিকগণ—পুত্রগণ।"

তৃতীয় গ্রামবাসী। আমরা শুন্তে পাচ্ছি না। আমরা শুন্তে পাচ্ছি না।

রাণী। শুন্তে পাবে। স্তব্ধ হও।

চতুর্থ গ্রামবাসী। স্তব্ধ হও। স্থির হও।

রাণী। শোন আমি আজ এখানে এসেছি কেন—শোন—

পঞ্চম গ্রামবাসী। আহা তোমরা স্থির হও না—শুন্তে দাও।

রাণী। আগে আমার পরিচয় দেই। শোন—আমি কে।

ষষ্ঠ গ্রামবাসী। এই চুপ কর। শুন্তে পাচ্ছি না।

রাণী। মাড়বারবাসীগণ! আমি যশোবন্তের রাণী। সম্রাট ঔরংজীবের কৌশলে হিন্দুকুশের পরপ্রান্তে আফগানিস্থানের তুষার মধ্যে আমার স্বামী তোমাদের রাজা যশোবন্তের মৃত্যু হয়। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমাদের যুবরাজ পৃথ্বীসিংহ ঔরংজীবের কৌশলে বিষ প্রয়োগে প্রাণত্যাগ করে। আমার কনিষ্ঠপুত্র তোমাদের বর্ত্তমান কুমার অজিতসিংহ ঔরংজীবের গ্রাস হতে দূরে নিভৃতে রক্ষিত। আর আমি—তোমাদের রাণী আজ পথের ভিখারিণী!

গ্রামবাসীগণ কোলাহল করিতে লাগিল।

সপ্তম গ্রামবাসী। তা আমরা কি কর্ব্ব?

অষ্টম গ্রামবাসী। আমাদের ক্ষমতা কি?

নবম গ্রামবাসী। সম্রাটের এসব অত্যাচারের কিন্তু একটা প্রতিকার করা উচিত।

দশম গ্রামবাসী। আমাদের ত রাণী বটে। আমরা কর্ব্ব না ত কে কর্ব্বে?

রাণী। শোন গ্রামবাসীগণ—আমি কিন্তু আজ নিজের দুঃখ জানাইতেই তোমাদের কাছে আসিনি। আমি এসেছি আজ আমাদের সুন্দর মাড়বারের জন্য তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা কর্ত্তে। সম্রাট লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ কর্ত্তে আস্ছেন। তোমরা মাড়বারের সন্তান; তোমরা রাজপুত; তোমরা বীর। তোমরা কি নিশ্চিন্ত, উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমিকে পরপদদলিত, নিষ্পেষিত, বিধ্বস্ত হতে' দেখবে।

একাদশ গ্রামবাসী। লক্ষাধিক সৈন্য! হায়, হতভাগ্য মাড়বার!

দ্বাদশ গ্রামবাসী। সেনাপতি আলোর আক্রমণ না কর্লে এটা হতো না।

ত্রয়োদশ গ্রামবাসী। হাঁ। কেন সুপ্তব্যাঘ্রকে জাগিয়ে তোলা।

চতুর্দ্দশ গ্রামবাসী। লক্ষ মোগল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হীনবীর্য্য মাড়বারের পক্ষে সম্ভব নহে।

পঞ্চদশ গ্রামবাসী। কিছুতেই নয়।

রাণী। সম্ভব নয়? সম্ভব নয়? তবে তোমাদের দূর করে' দলিত করে' মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার কর্ব্বে, তাই তোমরা নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়ায়ে দেখ্বে। হা ধিক্। এত তরল কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত কর্ত্তে গেলে সেও বাধা দেয়। আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সঁপে দেবে? হিন্দু তোমরা! রাজপুত তোমরা! ক্ষত্রিয় তোমরা!—সম্ভব নয়? যশোবন্ত সিংহ জীবিত থাক্লে তাঁর সম্মুখে একথা বল্তে সাহস কর্ত্তে না। তাঁর জন্য সকলে প্রাণ দিতে তোমরা প্রস্তুত ছিলে। যশোবন্ত সিংহের এক চাহনিতে তোমাদের রক্ত উষ্ণ হোত, তাঁর একটি কথাতে দশসহস্র তরবারি পিধান হইতে বেরিয়ে আস্তো; তাঁকে অশ্বারূঢ় দেখলেই তোমাদের মিলিত জয়ধ্বনি আকাশ ধ্বনিত কর্ত্ত। আমি নারী! আমি তাঁর বিধবা পত্নী। আমি আজ পথের ভিখারিণী। আমার কথা শুনবে কেন? আমি ত আর তোমাদের রাণী নই।

গ্রামবাসী। আপনি আমাদের মহারাণী। আপনার কথা শুন্‌বো।

রাণী। শুন্‌বে যদি, তবে তোমাদের

গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে' এসো। তরবারি লও; এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ়পণ করে' ওঠো! ওঠো, যেমন তুরীশব্দে লুপ্ত সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো;—যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো;—যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্চার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ কল্লোল ওঠে। ওঠো! রাজস্থান জানুক, ঔরংজীব জানুক যে, তোমাদের শৌর্য্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।

গ্রামবাসীগণ। মহারাণী আমরা যাবো। কিন্তু এ যুদ্ধে জয়াশা নাই। মৃত্যুই সার হবে।

রাণী। মৃত্যু! গ্রামবাসীগণ,—মৃত্যু কি একদিন আস্‌বে না? সে যখন বিছানায় এসে তোমার টুটি চেপে ধর্ব্বে,সে বড় সুখমৃত্যু নয়! কিন্তু স্বেচ্ছায়, দেশের জন্য,পরের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখমৃত্যু।

গ্রামবাসীগণ! আমরা যাবো মহারাণী! যেখানে আপনি নিয়ে যান আমরা যাবো।

রাণী। এই তোমাদের যোগ্য কথা! শোন—আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছিনা! যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকো—সে এসো! সে একাই একশ! ক্ষীণসংকল্প, দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না! একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে বেছে নাও!—একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ। আর এক একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুঃখ! এক দিকে সংসার, গৃহ ও শান্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত ও মৃত্যু। একদিকে নিজের সুখ; আর একদিকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য —বেছে নাও।

সকলে। আমরা কর্ত্তব্য বেছে নিলাম।

রাণী। উত্তম! তবে আজ সব রাঠোর মিলিত হও! তুচ্ছ বিসম্বাদ এই মহাব্রতের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। একবার সকলে এক হয়ে জন্মভূমিকে প্রাণ ভরে ডাক "মাইজির জয়"

সকলে। মাইজির জয়!"—

রাঠোর বীর দুর্গাদাস ভারতের অদ্ভুত কীর্ত্তি। গ্রন্থকার বলেন, "রাজস্থানে বর্ণিত দুর্গাদাসের জীবনী পুনরায় পাঠ করি। পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, সে চরিত্র দেবদুর্লভ,—স্বর্ণপটে আঁকিয়া রাখিবার।" "দুর্গাদাস—ঔরংজীবের সহিত প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং রাজসিংহ ও তিনি সম্রাটকে কার্য্যতঃ রাজস্থান হইতে শৃগালের ন্যায় প্রতাড়িত করিয়াছিলেন।" চিরকাল এদেশবাসী দেশের পরাজয়-বার্ত্তা শুনিয়া শুনিয়া নিস্তেজ ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। সহিতে সহিতে এখন সকলই সহিতেছে। মাতৃ পিতৃ অত্যাচার যে জাতির লোকেরা সহ্য করে, তাহাদের আর কোন্ কলঙ্কিত কাজ করিবার অবশিষ্ট আছে? মাতা পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্মভূমি—যেই জন্মভূমির লাঞ্ছনা ভারতবাসী স্বেচ্ছায়, কেবল ব্রিটনের পরিতৃপ্তির জন্য, নিয়ত সহ্য করিতেছে। কোন স্পন্দন নাই, কোন কষ্ট-বোধ নাই, কোন দ্বিরুক্তি নাই। এহেন মৃত জাতির নিকট দুর্গাদাসের অমূল্য জীবন-কাহিনী উপেক্ষিত হওয়ারই কথা। দুর্গাদাস কারাগারে থাকিয়া একদিন চিন্তা করিয়াছিলেন—

"দুর্গাদাস। শেষে এ দশাও হোল!

যে লাঞ্ছনা এতদিন বিজাতীয় বিধর্ম্মী শত্রুর কাছে হয় নি, তা আজ স্বজাতি স্বধর্ম্ম হিন্দুর হাতে হোল!—তা না হলে মা ভারতভূমি!—তোমার আজ এ দুর্দ্দশা কেন? যদি হিন্দু ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, ক্ষুদ্র প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির জন্য, হিন্দুর নিগ্রহ না কর্‍্বে, তা হলে, হা নির্ব্বোধ জাতি, সকলে একত্রে সমভাবে পরের পদতলে পড়ে' থাক্‌বে কেন! ওরে হতভাগা!—একদিনের জন্য এক হ' দেখি! একদিন নিজের চিন্তা ছেড়ে সবাই ভায়ের চিন্তা কর্ দেখি। একদিন সবাই নতজানু হয়ে করযোড়ে আমাদের এই মাকে প্রাণভরে' মা বলে' ডাক্ দেখি। দেখ্ এই অত্যাচার, এই অন্যায়, এই স্বেচ্ছাচার চূর্ণ হয়ে যায় কিনা। না, যদি আমি তোদের জাগাতে যাই, তোরাই আগে সে খবর শত্রুশিবিরে দিয়ে আস্‌বি!—শম্ভুজি! তুমি ভেবেছো যে মরাঠা একদিন রাজপুত মোসলমানকে এক সঙ্গে পদদলিত কর্‍্বে। তা হলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু তা' হবে না। দেখ্‌বে যে একদিন মরাঠা, রাজপুত, মোসলমান এক সঙ্গে অন্য কোন জাতির পদতলে এসে লোটাবে। বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি আছেই আছে।"

এই দুঃখেই দুর্গাদাস আর এক দিন চিন্তা করিয়াছিলেন—

"দুর্গাদাস। ব্যর্থ হয়েছি। পাল্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জ্জীব হয়েছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে, পুরবাসীরা নিস্তেজ। ছায়ানিবিড় গ্রামগুলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছি, দেখেছি যে, গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন। বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিইছি, দেখেছি যে, কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমি কর্ষণ কচ্ছে! সমস্ত জাতির প্রাণ নাই। অত্যাচারে প্রপীড়িত হলেও পদাহত স্থবির কুকুরের মত নিম্নস্বরে একটা গভীর আর্ত্তনাদ করে মাত্র। প্রতিকারের চেষ্টা করেনা। মোগল সাম্রাজ্য থাক্‌বেনা বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠ্‌বে না।"

যে, যে ধাতুর লোক, সে সেই ধাতুর লোককেই ভালবাসে। পরাধীনতার পূতি-গন্ধের রাজ্যের লোক,—অথবা প্রণয়-পিপাসু লোক ভয় বিভীষিকা ও রিপু চালনা ভিন্ন আর কি ভালবাসিবে? এদেশের অসংখ্য মৃতবৎ জনসাধারণকে দুর্গাদাস কি জাগাইতে পারিবে?

দুর্গাদাস, ক্ষমাশীল বীর, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সংযমী চরিত্রবান পুরুষ এ জগতে বড়ই বিরল। ধর্ম্ম-সমাজ অন্বেষণ করিয়াছি,—এরূপ রিপু-চাঞ্চল্য-বিরহিত সংযমী মহাপুরুষ দেখি নাই;—বড় বড় ধর্ম্ম-প্রচারক দেখিয়াছি, এরূপ গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ, চাঞ্চল্য-বিরহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অটল ব্যক্তি দেখি নাই। চতুর্দ্দিকে প্রতি-নিয়ত যাহা দেখি, যেন স্রোতের শৈবালের ন্যায়, একবার এদিকে, একবার উদিকে, ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক নেতা দেখিয়াছি, ধনমদে মত্ত হইয়া দিগ্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া বিভ্রান্তির পথে, সম্মানের পথে ছুটিতেছেন, এরূপ তেজী, এরূপ লক্ষ্য-স্থির—এরূপ সর্ব্বস্ব-ত্যাগী পুরুষ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বঙ্কিম-চন্দ্রের চন্দ্রশেখরের "প্রতাপ" আশ্চর্য্য সৃষ্টি বটে, কিন্তু তাহা ঐতিহাসিক চিত্র নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক দুর্গাদাসকে যে ভাবে রঞ্জিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এ জগতে তাহা বড়ই দুর্লভ। পুস্তক খানি, কি কবিত্ব, কি স্বদেশ-প্রাণতা, কি নিঃস্বার্থতা,

কি পবিত্রতা, কি দয়া, কি ক্ষমা—এ সকলের যেন আদর্শ। যাহা চাই, তাহাই পাইয়াছি। বাস্তবিকই বলিতেছি—দ্বিজেন্দ্রলাল এই এক খানি পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,কোন দোষ কি এই পুস্তকে নাই?"গাহিতে গাহিতে রাজিয়া অজিতের বালুলীন হইলেন"—সমস্ত পুস্তকের কোন দোষের কথা থাকিলে এই এক স্থানে আছে। এই স্থলে গ্রন্থকার আর একটু সংযত হইলে ভাল হইত। আর সর্ব্বত্রই রুচি মার্জ্জিত, ভাব বিশুদ্ধ—লিপিচাতুর্য্য সুন্দর, কবিত্ব অনন্যসাধারণ,—পড়িবার সময় মনে হয় যেন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেছি, মনে হয় যেন, আত্মত্যাগ-মন্ত্রের এক জীবন্ত ইতিহাস পড়িতেছি;—মনে হয় যেন, স্বদেশ-ভক্তির এক উজ্জ্বল কাহিনী পড়িতেছি। পড়িয়া শেষ করিলাম যখন—মনে হইল কি আশ্চর্য্য কাহিনী পড়িলাম, কি মধুর চিত্র দেখিলাম। এমন তেজ-পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নাটক বাঙ্গালা ভাষায় এ জীবনে আর পড়ি নাই, আর পড়িব কি না, তাহাও জানি না।

আর একটী স্থান উদ্ধৃত করিব—আর না—

"দিলীর। বন্দেগি বীর দুর্গাদাস!—আমায় মনে পড়ে?

দুর্গা। আমার জীবনদাতাকে বিস্মৃত হব কিরূপে? আসুন, আমার আজ পরম সৌভাগ্য! কিন্তু এখানে কি অভিপ্রায়ে সেনাপতি?

দিলীর। তীর্থদর্শনে। দুর্গাদাস! তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে কাশী, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সব তীর্থ আছে না? যেথানে যাত্রীরা মাঝে মাঝে গিয়ে ধন্য হয়ে আসে?—আমিও মর্ব্বার আগে তোমায় একবার দেখতে এসেছি।

দুর্গাদাস ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন—"দিলীর খাঁ!—আমি সামান্যমানুষ; সাধ্যমত নিজের কর্ত্তব্য করে' এসেছি মাত্র।"

দিলীর। এ পাপযুগে তাই কয়জন করে দুর্গাদাস?—যে যুগে ভ্রাতাকে তার অংশ হতে বঞ্চিত করে' আনন্দ; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বজাতিদ্রোহ করে' পরিতৃপ্তি, যে যুগে তোষামোদ, পীড়ন, মিথ্যাবাদ, প্রতারণা চারিদিকে ছেয়ে পড়েছে, সে যুগে তোমার মত ত্যাগী দেখে আত্মা শুদ্ধ হয়। যে প্রভুর জন্য প্রাণ-পণ করে, দেশের পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য দেশ ছাড়ে, অপ্সরা সম্রাজ্ঞীর অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণ রক্ষার্থে নিজের বুক আগিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য নির্ব্বাসিত হয়—সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টা আছে দুর্গাদাস?

দুর্গা। পুরাণে কেন দিলীর খাঁ! তার ছেয়ে উচ্চ চরিত্র দেখ্‌তে চাও যদি—নিজের চরিত্রের সম্মুখে দর্পণ ধর।

দিলীর। আমার!

দুর্গা। হাঁ দিলীর খাঁ; তোমার। আরও দেখ্‌তে পেতে দিলীর—যদি আজ কাশিম এখানে থাকতো। তোমারই জাতভাই কাশিম—

কাশিমের প্রবেশ।

কাশিম। কৈ মহারাজ কৈ—এই যে! আভূমি প্রণত অভিবাদন করিল।

দুর্গা। এ কাশিম যে! কি আশ্চর্য্য! কাশিম, তুমি এখানে খুঁজে এলে কেমন করে'?

কাশিম। খুঁজে খুঁজে আলাম মহারাজ! কত জায়গায় তল্লাস করেছি—তার আর কি বলবো মহারাজ!

দুর্গা। তুমি মহারাজ কাকে বল্ছ কাশিম?

কাশিম। যাকে চিরকাল বলে' আস্‌ছি মহারাজ।

দুর্গা। না কাশিম! তোমার আর আমার মহারাজ এখন যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহ।

কাশিম। তার নাম কর্ব্বেন না মহারাজ! সে নেমকহারাম—

দুর্গা। কাশিম তুমি কার কাছে এ কথা বল্‌ছো মনে রেখো।

কাশিম। জানি! মোর ত্থাবতার কাছে কথা বলছি। তবু বেহক কথা চুপ করে শুনে যাতি পার্ব্বোনা। যাকে আপনি বুকের মদ্দি করে' মানুষ কল্লে, যার কামে বেবাক জানটা দিলে, যাকে তার মা ছাওয়ালের মত দেখতো, সেই তাকে যে বুড়োবয়েসে—মাফ কর্ব্বেন মহারাজা—গলা ধরে' আসছে—আর বলতে পার্ব্বোনা।

জয়সিংহ। কাশিম! ইস্‌লাম ধর্ম্ম ত তোমার মত মানুষও তৈর করে?

দুর্গা। সব ধর্ম্মেই এক কথা এক মহানীতি শিক্ষা দেয় মহারাণা! তবু যদি কেউ মানুষ না হয়ে পিশাচ হয়, সে ধর্ম্মের দোষ নয়! মুসলমান ধর্ম্মে কাব্‌লেস খাঁও আছে, দিলীর খাঁও আছে।

দিলীর। আর হিন্দুধর্ম্মে শ্যামসিংহও তৈরি হয়, দুর্গাদাসও তৈরি হয়।

কাশিম। তবে হুজুর মোর যে এক আর্জ্জি আছে।

দুর্গা। কি কাশিম?

কাশিম। শুনছি যে হুজুর আজর াণার রুটি খায়ে মানুষ! তা ত হতি পারে না।

দুর্গা। কি হতে পারে না?

কাশিম। মোর জান থাকৃতি মহারাজ ত আর একজনের দরোজায় যাবে না। তা ত মুই জান থাকতি হ্যাখবো না।

জয়। সে কি! তুমি কি কর্ত্তে চাও কাশিম?

কাশিম। কি কর্ত্তি চাই? শোন রাণা, মুই মহারাজকে খাওয়াবো।

জয়। কেমন করে?

কাশিম। যেমন করে পারি। মজুর খেটে খাওয়াবো!—ভিক্ষা মেগে খাওয়াবো।

জয়। তুমি কি পাগল হয়েছো কাশিম! তুমি পাবে কোথা থেকে!

কাশিম। যেখিন থেকে পাই! যদি আজ রাণী বেঁচে থাকতো, দুর্গাদাসকে পরের দুয়োরে ভিখিরী হতি হোত না। তিনি নেই, কিন্তু মুই আছি! মুই খেটে খাওয়াবো—খুঁদ কুঁড়ো যা পাই খাওয়াবো—

জয়। তা কি হয়!

কাশিম। হয় না?—দেখ মহারাজ দুর্গাদাস! তোমার যেমন মনে লেয় করো। বেছে লেও মহারাজ!—রাণার ফেলে-দাওয়া রাজভোগ খাবা? কি মোর পুজোয় দেওয়া খুঁদ কুঁড়ো খাবা? বেছে লাও,—রাণার পায়ের তলায় থাকবা? না মোর মাথায় থাকবা?—যেটা লেবা; বেছে লাও!

এই বলিয়া কাশিম নিজবক্ষোপরি বাহুযুগল সম্বদ্ধ করিয়া সাভিমান গর্ব্বে দুর্গাদাসের দিকে চাহিল।

দুর্গা। ঠিক বলেছো কাশিম! দুর্গাদাস তোমার দেওয়া খুঁদ কুঁড়োই খাবে।"—এই বলিয়া দুর্গাদাস উঠিয়া কাশিমকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"ভাই কাশিম! আজ হতে' আমরা দুই ভাই।"—পরে দিলীরকে কহিলেন—"দেখ দিলীর খাঁ, কি উচ্চ!"

দিলীর। সত্য কথা বলেছিলে দুর্গা-

দাস!—দাঁড়াও তোমরা দুজনেই আজ আমার সম্মুখে দাঁড়াও; একবার নয়নভরে দেখি—ঈশ্বর!—তোমার স্বর্গে যাঁরা দেবতা আছেন শুনি, তাঁরা কি এঁদের চেয়েও বড়?"

দুর্গাদাস বাঙ্গালার অক্ষয়কীর্ত্তি। যদি এ জাতি জাগিবার হয়, তবে দুর্গাদাসের ন্যায় গ্রন্থই জাগাইবে। দুর্গাদাস ঘরে ঘরে অভিনীত হউক। আবার বলি, যে দেশে এ পুস্তক প্রকাশিত হইতে পারে, সে দেশ আশাহত নয়। দুর্গাদাসের সঞ্জীবনী মন্ত্রে ভারতবাসী নবজীবন লাভ করুক;—বন্দে মাতরম মন্ত্রের জয় সর্ব্বত্র বিঘোষিত হউক।

পুস্তকখানির মূল্য বড় অধিক হইয়াছে, গ্রন্থকারকে একান্ত অনুরোধ, পুস্তকখানির মূল্য ১৲ করুন। সস্তা না হইলে সকলে কিনিতে পারিবে না।

৪৭। কালিদাস ও ভবভূতি। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত, মূল্য ।৶০।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"এই প্রবন্ধটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—ঐতিহাসিক ভাগ ও সমালোচনা ভাগ। প্রথম হইতে 'কুমারিল ও ভবভূতি' পর্য্যন্ত ইতিহাস, আর 'প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাবলীর বিশেষত্ব' হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমালোচনা। ঐতিহাসিকের হাতে পড়িলে, প্রথমাংশ যেরূপ সরস হইত, আমার হাতে তাহা হয় নাই। পরন্তু নীরস হইয়াছে।" এই উক্তিতে গ্রন্থকারের বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে, তাঁহার হাতে পুস্তক নীরস হয় নাই, খুব সরস হইয়াছে। গ্রন্থকার অল্প কথায় অতি সুন্দর ভাবে প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

৪৮। গার্গী। শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৶০। এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে, রুচি পরিমার্জ্জিত, রচনা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধ। মহিলাদিগের পাঠের অপূর্ব্ব পুস্তক।

৪৯। বঙ্গভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনামের ব্যবহার। শ্রীচন্দ্রশেখর কালী, ১৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে। স্ত্রী সর্ব্বনাম সম্বন্ধে গ্রন্থকার সা, অস্যা, যস্যা, কস্যা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের যে সূচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

৫০। বোধগয়া। শ্রীশ্রীহরি ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।০। বুদ্ধগয়ার যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

৫১। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। শ্রীশ্রীহরি ঘোষ প্রণীত, মূল্য ॥০। পুরীর তীর্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা এই পুস্তকে আছে। গ্রন্থকারের গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

৫২। শুনঃশেপ বা নরমেধ যজ্ঞ। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ॥০। ঋগ্বেদ এবং রামায়ণ-বর্ণিত শুনঃশেপ উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক লিখিত হইয়াছে। বিষয়টী চমৎকার, লেখাও পরিপাটী।

৫৩। গীতিমালিকা। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক, বি-এ, সঙ্কলিত, মূল্য ৸০। জাতীয় সঙ্গীত, ব্রহ্ম-সঙ্গীত, পরমার্থ সঙ্গীত, কালী-বিষয়ক সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, রহস্য-সঙ্গীত, বিবিধ-সঙ্গীত—বহু লোকের বহু সঙ্গীত এই পুস্তকে সুন্দর সাজসজ্জায় প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীতের নীচে গ্রন্থকারের নাম আছে। গানগুলি উদার ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এ পুস্তক সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

৫৪। **হিন্দুস্থান।** শ্রীসতীশচন্দ্র চে রচয়িতা, মূল্য ৵০। নূতন লেখক, কিন্তু তাঁহার রুচি ও ভাব মার্জ্জিত এবং হৃদয় স্বদেশানুরাগে মণ্ডিত। সাধনা করিলে কালে তিনি ভাল লেখক হইতে পারিবেন।

৫৫। **বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ বা বিশ্বকর্ম্মার পুনরুদ্ধার।** শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০। লাভের চতুর্থাংশ স্বদেশী ও দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে দেওয়া হইবে। নামেই বিষয়টী পরিস্ফুট। যে উদ্দেশ্যে এই স্বদেশ-ভক্ত লেখকের লেখনী এই সরস পুস্তক খানিকে রচনা করিয়াছে, সে উদ্দেশ্য সফল হউক।

৫৬। **ছত্রপতি শিবাজী।** শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। নূতন সংস্করণ, এই সংস্করণে অনেক নূতন কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং অনেকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলাম; —ইহাতে প্রশংসার আরো অনেক অধিক কথা আছে। শাস্ত্রী মহাশয়, অদম্য উৎসাহে,যে সকল দুর্লভতত্ত্ব অবগত হইয়া,ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা অমূল্য জিনিষ। বাঙ্গালা সাহিত্য যাঁহাদের গভীর গবেষণার বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতেছে, ইনি তন্মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালা-ভাষার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। এই স্বদেশ-আন্দোলনের দিনে এই অমূল্য গ্রন্থখানি ঘরে ঘরে আদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

৫৭। The Second Annual Report of the Behala Hita-kari Sava for 1905 and 1906। এই সভার বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা বিমল আনন্দ পাইলাম। কথা না বলিয়া যাঁহারা দেশের উপকারজনক নানা কাজে লিপ্ত, তাঁহারা আমাদের পূজ্য। এই সভার সভ্যগণকে প্রণাম করিতেছি।

৫৮। **নব্য-জাপান ও রুষ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস।** শ্রীউমাকান্ত হাজারী প্রণীত, মূল্য ।৵০। দ্বিতীয় সংস্করণ। পুস্তক খানি খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ইহা সময়োপযোগী এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য নানা সংবাদে পূর্ণ। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলাম ও উপকৃত হইলাম। এই পুস্তক ঘরে ঘরে পঠিত হইবে, আমরা আশা করি।

৫৯। **স্বদেশ-গাথা।** শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৴০। স্বদেশ-ভক্তের নানা সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত ও গাথায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পূর্ণ। একটী গানের নমুনা এই—

লাঙ্গল-কাঁধে,কাস্তে হাতে আয়রে ভাই আয়!
সোণার ভুঁয়ে বুনবো সোণা এবার বাঙ্গালায়,
ফালে ফালে ফলবে সোণা,
ঘুচবে জ্বালা বেদনা,
ওরে সোণার ধানে পূজবো মায়ে ভুলে ছলনায়,
লাঙ্গল কাঁধে কাস্তে হাতে আয়রে ভাই আয়!

যে দেশে পাটের চাষের গুণ-কীর্ত্তনে অশেষ গুণান্বিত, স্বদেশ-প্রাণ সঞ্জীবনীও উৎসাহী,এবং হিতবাদী,বসুমতী ও বঙ্গবাসীর গভীর-গবেষণা পূর্ণ পাট-চাষের অযৌক্তিকতা উপেক্ষিত, সেই দেশে কবি আবার ধান-চাষের কথা লিখিলেন কেন? লক্ষ লক্ষ মণ পাট গাঁটবন্দি হইয়া প্রতি বৎসর বিদেশে যাইতেছে, সে কথার আবার নাকি প্রমাণ চাই! ফরিদপুর, যশোহর, পাবনা, নদিয়া পাট-পচা বাষ্পে ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত, স্বচক্ষে দেখি-

তেছি, তাহারও নাকি প্রমাণ চাই! ধান চাউলের বাজার কিরূপ হইয়া উঠিতেছে, ঘরে ঘরে অনাহারের আর্ত্তনাদের কিরূপ উচ্ছ্বাস,—মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী অন্নকষ্টে কিরূপ ম্রিয়মান, তাহারও প্রমাণ চাই! ধান চাউল বণিকেরা চক্ষের উপর কিনিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারও নাকি প্রমাণ চাই! যে ক্ষেতে পাট হয়, সে ক্ষেতে সে বৎসর যে আর ধান হয় না, এই নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনারও আবার প্রমাণ চাই!! হায়রে প্রমাণ, মৃত জাতির শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া তুই নিত্য তাণ্ডব নৃত্য কর, দেখিয়া মরিয়া যাই। তাঁহারা বলেন, স্বদেশ-ভক্ত হইলে পাটের চাষের আদর করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায়, এই গ্রন্থকার কেন ধানের চাষের কথা তুলিলেন? "বঙ্গবাসীই" বা প্রতিবারে পাট-চাষের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন কেন? হায়রে দেশ, এদেশের হিতৈষণা কোন্ ধাতুতে মণ্ডিত, আজও বুঝিতে পারিলাম না।

সে যাহা হউক, এই গ্রন্থকারের উক্তি সফল হউক; ধান-চাষে আবার চাষার প্রাণ মাতুক, পাটের দাদন বন্ধ হইয়া যাক্। নচেৎ দুর্ভিক্ষের করাল-হস্তে এদেশের আর রক্ষা নাই। লেখকের লেখনীতে পুষ্প-চন্দন বর্ষিত হউক।

৬০। আমার দেশ। শ্রীকার্ত্তিক-চন্দ্র দাস গুপ্ত বিরচিত, মূল্য ৵০।

এই পুস্তকের উপস্বত্ব স্বদেশের কল্যাণ-কর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

এই পুস্তকের ৭টী কবিতার মধ্যে ৩টী নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। পাঠকগণ এই গ্রন্থকারের স্বদেশানুরাগের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন; আমাদের মন্তব্যের কোন

৬১। শিক্ষা-কোষ। প্রথম সংখ্যা, বাবু মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক। সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৩৻, রাজ-সংস্করণ ৪৻, প্রতি সংখ্যা ৷৹। এই গ্রন্থখানি শেষ করা কি গুরুতর ব্যাপার, নিম্নলিখিত কথায় তাহা প্রতিপন্ন করিব।

প্রথম ভাগ।

প্রথম খণ্ড—শিক্ষাতত্ত্ব—সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল।

দ্বিতীয় খণ্ড—শিক্ষার দর্শন ও ইতিহাস, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

তৃতীয় খণ্ড—শিক্ষা পর্য্যায় বিজ্ঞান—সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ।

চতুর্থ খণ্ড—শিক্ষা প্রণালী। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম-এ।

পঞ্চম খণ্ড—শিক্ষা-শিল্প। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ।

ষষ্ঠ খণ্ড—মানসিক শিক্ষা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সপ্তম খণ্ড—শিক্ষা ব্যবসায়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডি-এল মহাশয়ের অভিমত সহিত।

অষ্টম খণ্ড—শারীরিক শিক্ষা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

নবম খণ্ড—নীতি শিক্ষা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

দশম খণ্ড—ধর্ম্ম-শিক্ষা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি-এল।

ইহা বাদে দ্বিতীয় ভাগ আছে। তাহার বিবরণেও বহু খণ্ড প্রকাশিত হইবে। সে সকল বিষয়ের সম্পাদকগণের নাম উল্লিখিত

হয় নাই বলিয়া আমরা উল্লেখ করিলাম না। প্রথম সংখ্যা পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। ভাষার পারিপাট্যই অধিকতর মনোযোগের বিষয়। সম্পাদক মহাশয় বহু ব্যয়-সাধ্য যে মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা সমাপ্ত করিতে পারিলে এক অসাধ্য সাধিত হইবে; এবং তাঁহার নাম অক্ষয় হইবে। শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর মহোদয় সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। এই মহৎ কাজটী সুসম্পন্ন হইলে জাতির কলঙ্ক ঘুচিবে।

৬২। **স্বর্ণ-কলিকা।** শ্রীব্রজেন্দ্র-সুন্দর বসাক প্রণীত, মূল্য ৷৷০। কবিতা-পুস্তক। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা এই পুস্তকে আছে। কয়েকটী কবিতা সুন্দর হইয়াছে।

৬৩। **জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি।** শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। এই চিন্তাপূর্ণ পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। সৃষ্টি-রহস্য, ক্রমবিকাশ-নীতি, স্থান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমা, মন্ত্রজাগরণ, স্মৃতির সূত্র ও আরোহ ও অবরোহ-নীতি, জীবনের স্তর-ত্রিতয়, এই কয়েকটী বিষয় আছে। যেমন বিষয় নির্ব্বাচন, তেমনই লেখার পারিপাট্য। এ পুস্তকের সর্ব্বত্র আদর হইলে আমরা সুখী হইব। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ যেমন সুন্দর, লেখাও তেমনি সুন্দর।

৬৪। **বেণু ও বীণা।** শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত বিরচিত, মূল্য ১৲। এই পুস্তক-খানির ছাপা, কাগজ ও লেখাও সুন্দর। একটী কবিতা তুলিয়া দিলাম।

দোলায় শুয়ে ঘুমায় শিশু মায়ের কোলের মত,
মায়ের নয়ন নিয়েছে আজ জাগরণের ব্রত।
পল বিপলে, সকাল সাঁঝে, পাঁচটি মাসের স্নেহ,
হৃদয়টি তা'র ছাপিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দেছে গেহ।
হায় কিশোরী! নূতন খেলা—মানুষ পুতুল নিয়ে,—
প্রদীপ করে, পলক হারা, তাই কি আছিস্ চেয়ে?
ঘুমায় শিশু, পল্লী ঘুমায়, ঘুমে জগৎ ছায়,
কাজল-কাল চোখের কোণে ঈষৎ হাসি ভায়।
হঠাৎ, কেন চোখ দু'টি তা'র, জলছাপিয়ে আসে,
ঘুমের ঘোরে, শিশুর চোখে, কোন্ দুখে জল ভাসে?
ঝিনুক বাটীর ঝন্ঝনা কি নিদ্রা ঘোরে ও শোনে?
তাই কি কাঁপে ঠোঁট দু'টি তা'র—
অশ্রু চোখের কোণে?
ভয় যে আজ শেখেনিক মান অপমান নাই,—
কি বেদনায়, ঘুমের ঘোরে তার চোখে জল তাই?
শিশুর স্বপন—তাও কি নহে সুখের ভগবান!
বিভী[illegible] ছায়া তাতেও বিরাজমান?

৬৫। [illegible]। শ্রীঅম্বুজা-সুন্দরী দাস গুপ্তা প্রণীত, মূল্য [illegible]। সুন্দরীর লেখা অতি সরল এবং মিষ্ট। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিতা আরো সুন্দর হইতেছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ এই দেবীর মস্তকে বর্ষিত হউক।

৬৬। **চন্দ্রধর।** শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত, মূল্য ১৲। অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর নিজস্ব ধন—চন্দ্রধর ও বিপুলার মধুর কথায় এই পুস্তক লিখিত। এই কাব্যখানি প্রাচীন কথায় পূর্ণ, কিন্তু লেখা এত সরস হইয়াছে যে, ইচ্ছা হয়, বহুস্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাই। দুঃখের বিষয়, স্থান নাই। ধর্ম্ম [illegible] এই সুন্দর পুস্তকখানি ঘরে ঘরে পঠিত হইলে আমরা সুখী হইব।

৬৭। **কর্ম্মকার বৈশ্য [illegible]।** শ্রীহর-বিতলাল রায় প্রণীত, মূল্য ৷৷০।

কর্ম্মকার বৈশ্যজাতি কভু শূদ্র নয়।
কর্ম্মকার শূদ্র কহা নিতান্ত অন্যায়।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই দুটী পংক্তি কবিতায় নিবদ্ধ। জাতীয় উত্থানের দিনে জাতীয় ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন; সুতরাং এইরূপ পুস্তক প্রচারে দেশের কল্যাণ হয়; সকল জাতির উন্নতি না হইলে ভারতের উন্নতি হইবে না। সকল শ্রেণীর লোকের আত্মদৃষ্টি খুলিয়াছে, ইহাতে আমরা খুব পরিতুষ্ট। আমরা পুস্তকখানির ভাষা [illegible]।